প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা - ৭০০০০৬

অক্ষর বিন্যাস : নেপালচন্দ্র ঘোষ

ISBN 81-86946-24-1

মুখবন্ধ

দুটি বছর অতিক্রান্ত করে 'শত লেখিকার শত গল্পে'র সংকলনটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩৫১— সন পর্যন্ত ৫০টি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে গল্পগুলি। শতবর্ষের শতলেখিকার গল্প চয়নে এই খণ্ডেও চেষ্টা করেছি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে এমন গল্পকে অগ্রাধিকার দিতে। সব গল্পই যে এই বাস্তবতার সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে পেরেছে এ দাবী করছি না। তবে সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভিন্ন রসের বেশ কয়েকটি গল্প পাঠকদের ভাল লাগবে আশা করছি। পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থায় গল্পের বিষয় ও বস্তুগত ভাবনার রেখাচিত্রও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মূর্ত হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমষ্টিগত চেতনা, যার ছোঁয়ায় গল্পগুলিকে জীবন্ত মনে হয়েছে। বিশাল এক সামাজিক ব্যাপ্তি, সংকট, সমস্যা এবং উত্তরণ ছুঁয়ে গেছে জীবনের বিভিন্ন ধারাকে। সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়বস্তু কিছু গল্পে মুখ্য ভাবনা হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে তার বীভৎসতা নিয়ে যেমন গল্প আছে, তেমনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি বিজড়িত বলিষ্ঠ গল্পও সংকলিত হয়েছে। একশত গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে সমাজ বিবর্তনের ধারাকে। বাংলা আধুনিক গল্পের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে মহিলা লেখিকাদের কলম যে বেশ শক্তিশালী এটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়। বলিষ্ঠ চেতনা প্রতিভাত হয়েছে বহু গল্পের আঙ্গিকে, বিষয়গত ভাবনায়।

প্রথম খণ্ডের মত দ্বিতীয় খণ্ডও পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হবে এটি আমার প্রত্যাশা। এই খণ্ডেও গল্প সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেকের কাছেই অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। মহিলা গল্পকারদের গল্প সংগ্রহ করতে গিয়ে মনে হয়েছে এঁরা অনেকেই 'কাব্যে উপেক্ষিতা'— অর্থাৎ অবহেলিতাই থেকে গেছেন। এঁদের মূল্যায়ন সাহিত্যের বিচারে খুবই জরুরী। এঁদের সবার গল্প সংকলনে ঠাঁই করা সম্ভব হয়নি। অনেক লেখিকাই থেকে গেলেন বৃত্তের বাইরে। শতবর্ষে মাত্র একশত লেখিকার গল্প নির্বাচন করতে গিয়ে একটু নির্মমও হতে হয়েছে। পাঠককুলের আনুকূল্য পেলে অবশ্যই আবারও নতুন করে মহিলা লেখিকাদের গল্প পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করার আকাঙ্ক্ষা রইল।

যে লেখিকাদের গল্প বইতে পরিবেশন করেছি তাঁদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কয়েকজনের কাছে অনুমতি লাভ করেছি পুনঃপ্রকাশের। সবার কাছে সময় ও যোগাযোগের অভাবে অনুমতি নিতে সক্ষম হইনি। আশা করি লেখিকারা আমার অনিচ্ছাকৃত ক্রটির অপরাধ নেবেন না।

কলকাতা বই মেলায় বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেবার জন্য আমি প্রকাশককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ইতি

শ্যামলী গুপ্ত

সূচীপত্র

ডাক্তারের একবেলা

শ্রীঅণিমা মজুমদার

কলিকাতা শহরের ক্ষুদ্র এক পল্লীতে আমি বাস করি। কত রকমের মানুষ, কত বিচিত্র জাতি ও ধর্মের সমন্বয় সেই এক সামান্য পল্লীতে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বস্তীর কুলী মজুর হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক ধনী ব্যবসায়ীর বাস সেখানে। আমি সবেমাত্র এম-বি উপাধি লইয়া মানুষ মারিবার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষ মারিবার বলিতেছি কেন না, এই কয়দিনের অভিজ্ঞতার ফল আমার ইহাই হইয়াছে যে, রোগী আমার হাতে সারে না। লোকমুখে শুধু আমার হাতে রোগী মরিয়াছে ইহাই শুনি ; যে ভাল হইয়াছে সে কোনও বড় ডাক্তার বা কবিরাজ না হয় কোনও সন্ন্যাসী বা দৈবের অনুগ্রহে, আমার চিকিৎসায় নহে। তাহার কারণ সম্ভবত ইহাই যে, বাল্যকাল হইতেই আমি এই পল্লীতে বাস করি। এখানকার প্রাচীন বাসিন্দারা আমাকে অত্যন্ত চিনেন এবং আমার নিতান্ত অখ্যাত ডাকনামটির সহিত ডাক্তার শব্দটি যোগ করিয়া "বোচাডাক্তার" নামে আমাকে সম্মানিত করেন। আমি তাঁহাদের নিকট অতিপরিচিত সুতরাং আমার চিকিৎসায় উপকৃত হইলেও সেটা স্বীকারযোগ্য নহে। আমাকে তাঁহারা ডাকিয়া চিকিৎসা করিবার সুযোগ দিয়াই আমায় ধন্য করিতেন।

সকাল বিকাল টাইকলার আঁটিয়া, গৃহের দেওয়ালে নেমপ্লেটটি বসাইয়া আমি বহুবাধা সত্ত্বেও পরম উৎসাহে ব্যবসায় সুরু করিলাম। আমার মুরুব্বিদের নানা প্রকার তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও সেই পাড়ার ভিতরই আমার নানাপ্রকার রোগী জুটিতে লাগিল এবং আমার পসার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার প্রাত্যহিক অভিযানে নিত্যই নূতন নূতন অভিজ্ঞতা হইতে লাগিল, তাহার মধ্যে একটি দিনের একবেলার অভিযান বৈচিত্র্যময়।

সেদিন প্রথমেই বাড়ীর পিছনেই বস্তীতে এক ঘরে গেলাম। সেখানে একটি শিশু আমার "পেসেন্ট"। রোগা কাঠির মত তার হাত পা—দু বছরের শিশু আজও বসিতে পারে না। তাহার জন্য করিবার আমার কিছুই নাই। তাহার যাহা ঔষধ ও পথ্য প্রয়োজন সে ব্যয়ভার বহনের সাধ্য তাহাদের নাই। তাহারা আমাকে সকল সময় ভরসা করিয়া ডাকিতে পারে না, তথাপি আমি মাঝে মাঝে যাই। আজ সকালে বাহির হইতে প্রথমেই সেই রুগ্ন শিশুটির পিতা-মাতার ম্লান করুণ মুখচ্ছবি আমাকে সেখানে লইয়া গেল। আমার মুখের দুটি মিষ্ট কথা শুনিয়াই তাহারা ধন্য হয়।

আজ গিয়া দেখিলাম তাহাদের মুখে আনন্দের ছায়া। শিশুটির মা বলিল যে, তাহার দশ বৎসরের ছেলেটি সামনের বড় বাড়িতে চাকরী পাইয়াছে। খাওয়া পরা ব্যতিরেকে এক টাকা মাহিনা। সেই এক টাকা আয় ও বড় ছেলেটির খোরাকী খরচ বাঁচিয়া যাহা হইবে তাহাতে শিশুর জন্য দুধ কেনা চলিবে ও গায়ে মালিশ করার তেলও কিনিতে পারিবে। এই এক টাকা বেতনের চাকুরীতে তাহারা ধন্য হইয়া গিয়াছে। সেই "ঐশ্বর্য" লইয়া তাহারা কি করিবে সেই জল্পনা করিতেছে। কি তৃপ্তি ও আশাই তাহাদের মুখে

ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি রোগী সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া চলিয়া যাইতেছি—দেখি সেই শিশুর মাতা অতি সঙ্কুচিতভাবে আঁচলের খুঁট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু! অনুগ্রহ করিয়া এটা নিন। কোনও দিন কিছু দিতে পারি না আপনাকে।" আমার বহু আপত্তি সত্ত্বেও এই টাকা লইতেই হইল। তাহার ধারণা, আমি ইহা গ্রহণ করিলে তাহাদের সন্তানের মঙ্গল হইবে। সময় কম ছিল আমি টাকাটি পকেটে ফেলিয়া চলিলাম দ্বিতীয় রোগীর উদ্দেশ্যে।

সেই বস্তীর পিছনেই একটি কেরাণীবাবুর গৃহ। তাঁহার স্ত্রী অসুস্থ। ম্যালেরিয়া জ্বরে শরীর শীর্ণ। তাহা লইয়া তাঁহার বিশ্রাম নাই। কুইনাইন দুর্মূল্য, দুধ দুষ্প্রাপ্য সুতরাং সে রোগীর ঔষধও জোটে না পথ্যও জোটে না। তথাপি আমার মাঝে মাঝে যাইতে হয় ; চিকিৎসার ভাণটুকু রক্ষা করা হয়। সেদিন সেই পরিবারে দেখিলাম কেরাণীবাবুর দশ টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে। মাসে সেই দশ টাকা আয়বৃদ্ধিতে তাহারা যেন অতুল সম্পদের অধিকারী হইবে এইরূপ ভাব তাহাদের। এইবার হয়ত একটি ঝি রাখা সম্ভব হইবে ও স্ত্রীর জন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা যাইবে মনে হইতেছে। তাহাদের তৃপ্তি দেখিয়া আমিও তৃপ্ত মনে ফিরিতেছি এমন সময় কেরাণীবাবু আমার পকেটে দুইটি টাকা ফেলিয়া দিলেন। তাহার ছলছল নেত্রের কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে যে গভীর আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাই আমার পরম সম্পদ মনে হইল। আমি টাকা দুইটি লওয়াতে তিনি ধন্য—তাহা প্রকাশের ভাষাও তাঁহার মুখে জোগাইতেছিল না। ইহাদের নিকট হইতে টাকা লইলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়,—কিন্তু তথাপি লইতে হইল।

ইহার পর আমি গেলাম দুইখানা বাড়ি পার হইয়া অন্য এক গলিতে। গৃহস্বামী ব্যাঙ্কে চাকুরী করেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার। ইঁহার বড়ছেলে দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। আমি যাই, ইনজেকশন দিই, ঔষধ দিই কিন্তু এ-রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কিছুই হয় না। বায়ু পরিবর্তনের ব্যয় সঙ্কুলান তাহাদের সাধ্যাতীত। রোগী দিন দিনই মহাযাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এত বিপদ সত্ত্বেও এ গৃহে শান্তি বিরাজমান। রোগী অসীম ধৈর্যের সহিত তাহার রোগভার বহন করে—সে জানে তাহার পিতামাতার অবস্থা, কোনও অভিযোগ নাই তাহার। রোগীর মাতা মূর্তিময়ী ধৈর্যশীলা কল্যাণীমূর্তি। তাঁহার স্নিগ্ধ শান্ত করুণ দৃষ্টিতে চতুষ্পার্শ্ব শান্তিময়। কর্তার একশত টাকা মাহিনা বৃদ্ধি হওয়াতে গৃহে আজ আশা ও আনন্দের বাতাস বহিতেছে। আমি যাইবামাত্র রোগী তাহার আয়ত উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপন করিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু! এবার আমি ভাল হব। আমি চেঞ্জে যাব।" তাহাদের এই একশত টাকার আয় বৃদ্ধির আশাতেই এই পরিবার আজ মহাখুসী। আমি ইহাদের নিকট হইতে নিত্যকার দক্ষিণা লই না। সবেমাত্র ব্যবসায় সুরু করিয়াছি এখনও অপারগের নিকট অর্থ লইতে সঙ্কোচ হয়। যে যাহার সাধ্যমত যাহা দেয় তাহা লইয়াই আমি তৃপ্ত। আজ আসিবার সময় রোগীর মাতা আমার হাতে একটি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। যে রোগী পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দিন দিন শীর্ণ হইতেছে তাহার নিকট হইতে অর্থ লইতে হাত ওঠে না কিন্তু রোগীর মাতার সানুনয় উপরোধ এড়াইতে

পারিলাম না। মনে হইল, কিন্তু ইহাই ত আমাদের ব্যবসায়। রোগীর পথ্য জুটুক বা না জুটুক, আমার অর্থ চাই। এই সকল গৃহের সামান্য দানের পরিমাণ অর্থের মূল্যে যাচাই হয় না—এই অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহারা ব্যথিত হয়। ইহার সহিত আছে তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা। আজ আমার রোগীদিগের ন্যায় আমার ভাগ্য বিধাতাও সুপ্রসন্ন। চলিলাম অপর রোগীর সন্ধানে।

দুইটি রাস্তা পার হইয়াই বোসেদের বৃহৎ অট্টালিকা। গৃহকর্তা একজন বড় উকিল। বাড়িতে মোটর আছে, বহু দাসদাসী, বড়লোকের সকল আয়োজনই আছে বর্তমান। ফটকে দরওয়ান ও কর্মচারীদের গণ্ডী পার হইয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

পূর্বেই আভাস পাইয়াছিলাম কর্তাবাবু আমার দেরী দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। আমি যুক্তকরে নমস্কার করিয়া তাঁহার বিরক্তবদন দেখিলাম। এই বাড়িতে আমার ডাক প্রায়ই পড়ে। গৃহিণীর সামান্য মাথাধরা হইতে দাসদাসীদের পীড়ার জন্য। উকিলবাবু অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি এত দেরী করলেন?" রোগী দেখিতে গেলাম। ছোট একটি ছেলের সামান্য জ্বর। তাহাই লইয়া বাড়ির কর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী পর্যন্ত সকলে তটস্থ। আমি ইহাদের ব্যস্তভাবে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া আপন কর্তব্য সমাধা করিলাম। রোগীর বুক দেখা, জিভ দেখা ইত্যাদি করিতে নানা প্রকার কলা কৌশল অবলম্বন করিয়া, বাড়িশুদ্ধ লোককে ব্যস্ত করিয়া পাঁচ মিনিটের কাজ এক ঘণ্টায় সারিয়া মহাবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। বাহ্যিক প্রশান্তভাব বজায় রাখিয়া বাহির হইতেই উকিলবাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু তিন দিন হয়ে গেল, জ্বর ত খোকার ছাড়ছে না। আমরা বড়ই ব্যস্ত হয়েছি। একবার কাউকে কন্‌সালট করবেন না? যদি serious কিছু হয় আপনি হাজার হলেও ত ...।" বাকীটা বুঝিলাম সদ্যপাশ করা ছেলেমানুষ ডাক্তারে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। আমিও "করতে পারেন" বলিয়া বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। তাঁহারাও দেখিলাম আমাকে অর্থ দিয়া কোনও মতে বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচেন। উকিলবাবু আজ মফঃস্বলে যাইতেছেন একটি বড় কেস্‌-এ দৈনিক হাজার টাকা তাঁহার ফি। আমার সহিত ভাল করিয়া কথা বলিবার বা রোগী সম্বন্ধে ব্যবস্থা লইবারও সময়াভাব। আমারও অপেক্ষা করিবার আগ্রহ ছিল না। এইসব গৃহে চিকিৎসা করিয়া কোনও সার্থকতা নাই। জানি আজ জ্বর না সারিলে কাল আসিবে বড় বড় ডাক্তার। আমার মত সদ্যপাশ করা ডাক্তারকে ইঁহারা কোনও পর্যায়েই ধরেন না। বাড়ির সামনে থাকি একবার ডাক পড়ে। এই সকল গৃহে টাকাটাই একমাত্র লাভ। আন্তরিকতা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই—দুই চারি টাকা হাতের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়ে ইহাই আমার ভাগ্যে মাঝে মাঝে জোটে।

ইহার পূর্বে যাহাদের দেখিয়াছি তাহারা সকলেই দরিদ্র—সেখানে আমি দুই দিন পরে গেলেও তাহারা করযোড়ে আমাকে অভ্যর্থনা করিবে; আমাকে অর্থ দিয়াও তাহারা মনে করে কিছুই দেয় নাই। অগাধ বিশ্বাস তাহাদের আমার প্রতি—আমাকে তাহারা শ্রদ্ধা

করে। আমি গেলে তাহাদের গৃহে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। আমি সেই জন্যই সেইসব গৃহে প্রথম যাই—সবেমাত্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি আমি—টাকাটাই এখনও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে নাই।

বোসেদের গৃহেও আজ হাজার টাকা উপার্জন হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে আনন্দের আভাসও নাই—সারাগৃহে কি অসীম বিরক্তি ও নিরানন্দতা। ঐশ্বর্যের অভাব নাই, কিন্তু কোথাও তৃপ্তির চিহ্নমাত্র নাই। ছেলের সামান্য জ্বর হয়ত কালই সারিয়া যাইবে ; সেইজন্য দাসদাসী, কর্মচারী চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। খেলনায় ছেলের ঘর ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাহার আবদার মেটে না। ঘরে নানারকমের ফল, দুধ ও পথ্যের আয়োজন—ছেলে তাহা মুখে তুলিতে চাহে না। তাহার বায়নার শেষ নাই। আমার মনে হইল সেই বস্তীর শিশুটির কথা। কি শান্ত মলিন মুখশ্রী—কি অসহায় দৃষ্টি অথচ কোনও অভিযোগ নাই। নীরবে যাহা পাইতেছে খাইতেছে। যে সকল বহুমূল্য সামগ্রী এখানে মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে ইহার শতাংশের একাংশ পাইলেও সে ছেলেটি ধন্য হইত।

বাড়িশুদ্ধ সকলের নিকট জবাবদিহি করিতে করিতে আমি হয়রাণ হইয়া গেলাম—জ্বর কেন ছাড়ে না—কি রোগ হইয়াছে—খাইতে কেন চায় না ইত্যাদি। যেন আমার দোষেই তিনদিন হইয়া গেল জ্বর ছাড়ে না। টাকাটি লইয়া বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতেই দেখিলাম একটি প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া থামিল এবং সহরের একজন নামজাদা বড় ডাক্তার নামিলেন। গৃহকর্তা ছুটিয়া আসিয়া ফটকের নিকট হইতে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।

আমার পরবর্তী রোগী এক মারোয়াড়ী ধনী শেঠের গৃহে। গৃহে পৌঁছাইতেই শুনিলাম শেঠ এক দালালের সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। কণ্ঠস্বরে তাঁহার গভীর হতাশা। বলিতেছেন, "ঈস্ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার আজ লোকসান হয়ে গেল।" আমি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম, "আহা! আজ ত আপনার তা'হলে বড়ই ক্ষতি হ'ল'। আমি ভাবিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকার লোকসান বড়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। কিছু বলা প্রয়োজন। শেঠজী বলিলেন, "না না! লোকসান হয় নি। পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার আজ লাভ হতে পারত—শেয়ারগুলো যদি হঠাৎ বিক্রী না করে ফেলতো আমার দালাল। আমার দশ হাজার টাকা মাত্র লাভ হ'ল। বলুন ত কি আফশোষের কথা!"

সত্যই ত! কি দুঃখ! আমি মনে মনে হাসিলাম। দশ হাজার টাকা লাভ হইয়াও আজ ইহার কি হতাশা। ইহারই দুইখানা বাড়ি ছাড়াইয়া কেরাণীবাবুর পরিবারে মাত্র দশটাকা মাহিনা বৃদ্ধিতে কি তৃপ্তি, কি আনন্দের ছবি দেখিয়া আসিলাম মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে! চলিলাম রোগী দেখিতে।

শেঠ গৃহিণী দ্বিতীয়পক্ষের পত্নী, নিঃসন্তান। তাঁহার রোগ সম্পূর্ণ মানসিক। মুখে তাঁহার হাসি নাই, শরীরে শান্তি নাই, কোনও না কোনও গ্লানি লাগিয়াই আছে। সহরের বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ পালা করিয়া আসেন এবং নিত্যনূতন ঔষধের ব্যবস্থা ও ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা হয়। আমি তাঁহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় ছুঁচ ফুঁড়িয়া যাই।

এখানে আমার চিকিৎসা চলে না বা মতামতের কোনও মূল্য নাই। কোনও কোনও দিন একত্রে তিন চারিজন ইংরাজ, বাঙালী ডাক্তারদের আলোচনা হয়—তাঁহারা বিলাতী কোম্পানীর দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি ঔষধের তালিকা লিখিয়া দিয়া স্মিতবদনে পকেট ভরিয়া টাকা লইয়া চলিয়া যান—আমি সেই সকল ঔষধ সংগ্রহ করিতে ও তাহার মর্ম বুঝাইতে হিমসিম খাইয়া যাই।

শেঠজীর বিরাট অট্টালিকায় বিলাসের কোনও সামগ্রীর অভাব নাই। শ্বেত পাথরের ঝক্ঝকে মেজে তাহার উপর নানাবিধ আসবাবপত্র ও ঐশ্বর্য লইয়া থম্ থম্ করিতেছে। গৃহে একটি গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। শয়নগৃহের দ্বারে একটি দাসী বসিয়া গৃহিণীর জন্য পানের সরঞ্জাম সাজাইতেছে। পালঙ্কে গৃহিণী শুইয়া আছেন। একটি দাসী হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে, একটি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার এই রোগিণীকে নিত্য ইনজেকশন দেওয়া একটি দুরূহ ব্যাপার। শেঠজী একসেট হীরার গহনা আজ লইয়া আসিয়াছেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার যুবতী ভার্যার একটু হাসিমুখ দেখিতে চান, তাহাও পান না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। রোগিণীর মনে কোনও সুখ নাই, আনন্দ নাই—তাহার গভীর অতৃপ্তি ফুটিয়া উঠে শারীরিক যন্ত্রণার আকারে। আজ তাঁহার মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশী ; মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছেন। নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী টেবিলের উপর সাজান রহিয়াছে, তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই। শেঠজীর বহু অনুনয় বিনয়ে তিনি ইনজেকশন নিতে রাজি হইলেন এবং মহা বিরক্তিভরে হাতখানা বাড়াইয়া দিলেন। আমিও ইন্জেকশন দিয়া চলিয়া আসিলাম। আমার মতামত ইঁহারা কখনও জিজ্ঞাসাও করেন না—আমিও কিছু বলি না। না হইলে জানাইয়া দিতাম কোথায় এ নারীর ব্যথা ও কোথায় ইহার রোগ। ইঁহার সত্যকার ব্যাধির প্রতিকার নাই। শেঠজী ধনী, সুপুরুষ, বিনয়ী ও ভদ্র। তাঁহার বহুবিধ কর্মের অবসরে ভার্যার মনোরঞ্জনের প্রয়াস তিনি সাধ্যমত করেন। এই নিঃসন্তান নারীর প্রচুর কর্মহীন অবসরই ইহার রোগের কারণ। হীরার গহনা পরিয়া শত সহস্র বিলাসের সামগ্রীর ভিতর শুইয়া ইহার অসীম বিরক্তি দেখিয়া মনে পড়িল সেই যক্ষ্মারোগীর মাতার কথা। সেই নারীর পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে রুগ্ন, স্বহস্তে সকল কার্য করিতে হয়, পরিধানে একখানি মোটা শাড়ী অলঙ্কার শুধু হাতে দুগাছি শাঁখা ও সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুররেখা। সেই নারীর একনিষ্ঠ সেবা, নীরব সহিষ্ণু শান্ত মূর্তি, কি ভক্তিভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে স্বামী পুত্রের অক্লান্ত সেবা করিয়া যাইতেছেন। গৃহে আসবাব নাই, প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও অভাব কিন্তু সকল অভাব ভরিয়া রাখিয়াছেন সেই মহীয়সী নারী। আমার প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার। আর আমার সামনে শায়িত এই বিলাস বেষ্টিত জহরতসজ্জিত নারীর বিবর্ণ মূর্তি—কি নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে ইঁহার ব্যবহারে। রোগ নাই তথাপি চিকিৎসার এই ভাণ আমার নিকট অসহনীয়। কিন্তু ইঁহাদের কৃপায় পকেট আমার ভরিয়া উঠিতেছে সুতরাং অর্থের সহিত বিরক্তি লইয়াই বাহির হই।

এবার চলিলাম গৃহাভিমুখে। পথে এক ধনী রোগী আছেন। গৃহকর্তা স্বয়ং রোগী। তিনি কণ্ট্রাক্টর। যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ বড়লোক হইয়া গেছেন। পূর্বে তিনি সুস্থ ছিলেন। নিজে পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করিতেন এখন বহু টাকার মালিক হইয়া পড়িয়াছেন। সারাগৃহে তাঁহার এই হঠাৎ বড়লোক হইবার ছাপ সুস্পষ্টরূপে বর্তমান। খুব সস্তা দামের একটি পুরাতন পালঙ্কের পার্শ্বে বহুমূল্য দামী ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবিল ও নানাপ্রকার মূল্যবান সামগ্রীতে ভর্তি। গৃহ সজ্জায় না আছে রুচি, না আছে কোনও সামঞ্জস্য। যেন টাকা রাখিবার জায়গা নাই সেইজন্য রাজ্যের দামী জিনিষ আনিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। কর্তার এখন নিত্য অসুখ। রোগ ক্ষুধামান্দ্য ও বাতব্যাধি। দিনে দিনে মোটা হইতেছেন, অথচ শরীরে বিন্দুমাত্র বল পান না। তাঁহারও রোগ নির্ণয়ের ভার বড় ডাক্তারের হাতে আমি শুধু ইনজেকশনের যন্ত্র।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে গৃহকর্তার গর্জন শুনিতে পাইলাম। তাঁহার কর্মচারীর উপর রাগ করিতেছেন কারণ সে মাত্র দশ লাখ টাকার অর্ডার আনিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহাতে মাত্র এক লাখ টাকা লাভ থাকিবে। আর একটু চেষ্টা করিলেই এক কোটি টাকার অর্ডার আনা যাইত। ইহাতে তিনি ভীষণ রাগিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহাকে সামনে পাইতেছেন তাহাকেই গালি দিতেছেন, হাতের কাছে যাহা পাইতেছেন ছুঁড়িয়া ফেলিতেছেন। আমার সামনেই তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বকিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জন্যই এই অঘটন। সকালে শরীর খারাপ বলিয়া তাঁহাকে বাহির হইতে স্ত্রী নিষেধ করেন ইহাই তাহার অপরাধ। আমি বিস্ফারিত লোচনে ইহাদের কাণ্ড দেখিলাম। এত আক্ষেপ তাঁহার মাত্র এক লাখ টাকা লাভের জন্য?

আমাকে দেখিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। কিন্তু রোগী আমাকে দেখিয়া আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন কারণ আমি এত দেরীতে আসিয়াছি। তিনি শুনিয়াছেন সকালে আটটার সময় আমি তাঁহার গৃহের নিকটেই বস্তীর ছেলেটিকে দেখিতে গিয়াছি। তাঁহাকে কেন এতক্ষণে দেখিতে আসিলাম। তিনি অনর্গল বকিয়া গেলেন, যেন আমি তাঁহার মাহিনা করা ভৃত্য। তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে আমি আমার কার্য সম্পন্ন করিলাম। ভৃত্য আসিয়া এক গ্লাস বেদানার সরবৎ রাখিয়া গেল। আমি মৃদুকণ্ঠে আপত্তি করিয়া বলিলাম, "এতগুলো বেদানার রস খাবেন না। একেই পেট ফাঁপা।"

তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক এক ফোঁটা বেদানার রসে এক এক ফোঁটা রক্ত হয়। তিনি ক্রমশঃই বলহীন হইয়া যাইতেছেন, ইহা না হইলে বাঁচিবেন না। আমি নীরবে ইনজেকসন দিয়া গেলাম। এই রোগী সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছানুযায়ী চলিবেন। ডাক্তারের বিধান যেটা তাঁহার মনোমত হয় সেইটাই তিনি মানিবেন। তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া নিষ্ফল। নিজের শরীরের যাহা গ্লানি সে সকলের জন্যই অপরে দায়ী ; তিনি নিজে নহেন। এক লক্ষ টাকা রোজগারে যিনি এত ক্ষিপ্ত ও অসন্তুষ্ট তাঁহার তুষ্টিবিধান কে করিতে পারিবে? তাঁহার এ অজীর্ণ রোগ সারিবার নহে। খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহার বাছবিচার। গুরুপাক খাদ্য ভিন্ন মুখে রোচে না। তিনি নিজে জুতাটাও পরেন না, শরীর চালনার কোনও প্রয়োজনই নাই। সম্প্রতি বাতব্যাধির জন্য একটি চেয়ার আসিয়াছে যাহা চাকরে

ঠেলিয়া লইয়া যায়। বাহিরে যখন যান—মোটর ভিন্ন এক পা নড়েন না—ইঁহার অজীর্ণ রোগ বা বাতব্যাধি কে সারাইবে? ইন্‌জেকশন না পেটেন্ট ঔষধ। টাকাটি পকেটে লইয়া নিষ্ফল আক্রোশে বাহির হইলাম। ইহারই নাম স্বাধীন ব্যবসায়। অপমান নিঃশব্দে হজম করিয়া হাসিমুখ বজায় রাখাই এই ব্যবসায়ের উন্নতির একমাত্র উপায়। পকেট ভারি হইলে অপমান হজম করিতে হইবে এটুকু বুঝিয়াছি। না হইলে ইহাকে আজ মুখের উপর একথা বলিতে কি বাধা ছিল যে, এ অজীর্ণ রোগ তাঁহার ইনজেকশনে সারিবে না। যদি তিনি পূর্বের ন্যায় কর্মঠ জীবন যাপন করেন তবেই সারিবে। কি বাধা ছিল শেঠজীর স্ত্রীকে বলিতে যে দাসদাসী না রাখিয়া সকল কর্ম আপন হস্তে করিলে তাঁহার রোগ সারিবে। না, সে কথা বলিলে ত ডাক্তারের পেট ভরিবে না। পকেটে হাত পড়িতেই আমার রাগ অনেক কমিয়া আসিল। কি বিচিত্র রূপ অর্থের। ইহা কাহারও মেজাজ গরম করে, কাহারও ঠাণ্ডা করে। কণ্ট্রাক্টরবাবু লক্ষ টাকা পাইয়া চটিলেন। আমি কয়েকটি টাকা পাইয়াই শান্ত হইলাম।

গৃহে যাইয়া পকেট খালি করিয়া দেখি নানা প্রকারের মুদ্রায় নোটে আজ পকেট ভর্তি। আজ আমার ভাগ্য বড়ই সুপ্রসন্ন। এত উপার্জন একটি বেলায় আমার ব্যবসায়ী জীবনে এই প্রথম। কি আশ্চর্য! আজ সকালে যে কয় স্থানে গেলাম সকলেরই গৃহে অর্থাগম হইয়াছে সেই সঙ্গে আমারও হইয়াছে আশাতীত উপার্জন। ইহাদের সকলের সহিত আমার ভাগ্য দেবতা কি একই সূত্রে গাঁথা? ইহারা প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে নিজেদের ভাগ্যকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে, কেহ তৃপ্তির সহিত কেহ বিরক্তির সহিত। আমিও স্তরে স্তরে বিভিন্ন গৃহের ফি-গুলি সাজাইয়া রাখিতে লাগিলাম টেবিলে এবং প্রত্যেকটির স্পর্শের সহিত এক একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল মনের মধ্যে—যাহাতে রহিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন মনের পরিচয়। কেহ কেহ কি বিরক্তি ভরে টাকাটা দিয়াছেন, কেহ কেহ কত শ্রদ্ধা ভরে। টাকাগুলি নাড়িতে নাড়িতে অর্থের সহিত মনের সংযোগের কথা ভাবিতে ভাবিতে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে হঠাৎ ঠুং করিয়া একটি শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখি আমার হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে একটি ঝক্‌ঝকে রূপার সিন্দুর মাখানো টাকা। টাকাটি দিয়াছিল বস্তীর রোগীর মাতা। লক্ষ্মীর ঝাপি হইতে সেই টাকাটি বাহির করিয়া দিয়াছিল, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এক টাকা মাহিয়ানার চাকুরী হওয়াতে রুগ্ন পুত্রের মঙ্গল কামনায়। কি গভীর তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার মুখে। সেই কৃতজ্ঞ সহৃদয় দৃষ্টি যেন ভরিয়া রহিয়াছে ওই টাকাটিতে। তাহার ওই টাকাটির স্পর্শে আমার মনের সকল গ্লানি কাটিয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল আমার মন। আমার সারা সকালের উপার্জনের মধ্যে ওই একটি টাকা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে হইল।

দেশ ১৩৫১

মাটির মানুষ

সাবিত্রী রায়

চৈত্র মাস—। রৌদ্রের কি তেজ! বলাই আর চলিতে পারে না। তাহার নরম পায়ের তলায় মাটিটা যেন আগুনে তাতিয়া গিয়াছে। এই প্রথম বলাই নীলপূজার সন্ন্যাসী হইয়াছে। বলাইয়ের মা প্রথমে রাজী হয়নি—অতটুকু ছেলে সংযম নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিবে না—অযথা ঘরে পাপের ছিদ্র তৈয়ার করা। নাছোড়বান্দা বলাইয়ের কান্নাকাটির চোটে তাহার বাপ হারাধন ভূমালী রাজী হয় অগত্যা। খুনী রং কিনিয়া কাপড় ছোপাইয়া দেয়। বড় বোন যমুনা বারে বারে তাকাইয়া দেখে ভাইকে—নীলপূজার সন্ন্যাসীর বেশে লাল কাপড় পরা বলাইকে কি সুন্দর মানায়। গৃহস্থ বৌ-ঝিরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখে ছোট্ট বলাইলালের নাচ। সন্ন্যাসীরা গান করে—'ওগো মা—ওগো মা—তোমার অনন্ত নীলে…

ঢাকের তালে তালে নাচের পা ফেলে বলাই উঠানস্থিত সিন্দূর মাখান মহাদেবের ত্রিশূল প্রদক্ষিণ করিয়া।

বাড়ীর গৃহিণীরা থালায় করিয়া ভিক্ষার চাউল ফুটী তরমুজ ঢালিয়া দেয় সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার থলির ভিতর।

পথে বুড়ো শিবের দলের সঙ্গে দেখা—তাহারা আজ রাতে বলাইদের বাড়ীতেই অতিথি হইবে। বুড়োশিবের দলের নিকুঞ্জকে এরই মধ্যে ভাল লাগিয়া যায় ছোট্ট বলাইয়ের। একটা লাল রুমাল দিয়া মাথার উস্কো খুস্কো চুলগুলি বাঁধিয়া রাখিয়াছে—কেমন সুন্দর লাগে। সন্ধ্যার পর বলাইদের বাড়ীর গোবর দিয়া লেপা ঝকঝকে উঠানের উপর সারি দিয়া খাইতে বসে সন্ন্যাসীরা। কোমরে শাড়ির আঁচল জড়াইয়া যমুনা পরিবেশন করে। পরিবেশনরত যমুনা ঠিক নিকুঞ্জর পাতে ডালের হাতাটা প্রসারিত করে। বুড়ি ঠাকুরমা অদূরে দাঁড়াইয়া রসিকতা করে, 'ওলো অন্নপূন্না! মহাদেব সন্ন্যাসীদের ভাল করে পরিবেশন করিস—শিবের মত সোয়ামী পাবি।'

যমুনার কানের পাশটা লজ্জায় লাল হইয়া উঠে—হাতের লাল কাঁচের চুড়িগুলি একটু কাঁপিতে থাকে—নিকুঞ্জও লক্ষ্য করে।

নিকুঞ্জ একটু তাকাইয়া দেখে যমুনাকে, তাহার ডাগর চোখ দুইটিকে।

খাওয়া হইয়া গেলে সন্ন্যাসীরা হরিতকি চিবায়, তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ—।

কালীখোলার মাঠে কাঁচনাচান শুরু হয়। অনাবৃত ছোট্ট মাঠটীর চারদিক ঘিরিয়া সরল দর্শকের ভিড়। আড়ম্বর বিহীন সহজ গ্রাম্যজীবনের একান্ত অভীপ্সিত সন্ধ্যা!

নাচ শুরু হইয়া যায়—। ঢাকের তালে তালে আসে হনুমানের বেশে ভূমালী হারাধন। কাটা বস্তা ও কাগজের মুখস আঁটা হনুমানের ফল ভক্ষণ। হাসি হল্লার ধূম

পড়িয়া যায়—একটা বোকা ছেলে কাঁদিয়া ফেলে। তারপর শুরু হয় কালো বোষ্টম-বোষ্টমীর তীর্থযাত্রা—সরস ছড়া আর গানের পটভূমিকায় 'কামারে ধইরা নেরে হাত ধরে কানা বলে তো ডাকলো মোরে··

কামার কুঞ্জর ডেলা বার করা চোখের তারাটা অবিকল কানার মত দেখায়।

যমুনা আর বলাই ঠাকুমাকে ঘেরিয়া মাঠের এক কোণে বসিয়া দেখে। পান্তা-খাওয়া দিনগুলি একরাতের জন্য দূরে মিলাইয়া যায়। শিশুমনে অপূর্ব বিস্ময় কৌতুকভরা সরল মনগুলিতে দোল খাইয়া যায় এক অমায়িক পরিবেশ।

বুড়োশিবের দলও খুশিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া গানের ধুয়া ধরে। রৌদ্রে পোড়া ঘর্মাক্ত দিনের এক সহজ বিস্মৃতি। ডুরে-শাড়ি পরা শূদ্র ব্রজমোহনের মধ্যাহ্নের মাংসপেশীগুলি নাচে—বেদেনীর নাচের কি অপরূপ ঢং! নিকুঞ্জও দেখে প্রশংসমান দৃষ্টিতে বেদেনীর নাচ আর দেখে আড়চোখে যমুনার কৌতুকভরা ডাগর চোখ দুটি। 'ভালই দেখতে মেয়েটা।' মনে মনে ভাবে নিকুঞ্জ, মুহূর্তের জন্য দু'জনের চোখে চোখ পড়িয়া যায়।

পূরা চৈত্রমাসটা নীলপূজার সন্ন্যাসীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে হরগৌরীর পূজা হয়। ঘরে ঘরে বিশেষ আয়োজন।

পুণ্যলোভাতুরা এয়োস্ত্রীরা শিবের হাতে ফল দিবার আকাঙ্খায় ভাল ভাল ফল সংগ্রহ করে।

দিনের প্রারম্ভেই ভূমালীর বাড়ীর উঠানে হরপার্বতীর সাজের আয়োজন আরম্ভ হইয়া যায়। বুড়ির বর পার্বতী সাজে। হলুদ বাটিয়া মুখের রং হলদে করে, তাহার উপর সিন্দুর গুলিয়া ফুল আঁকে। জমিদার বাড়ী হইতে চাহিয়া আনা বেগুনী রংয়ের পুরান আসমানি শাড়িখানা মেয়েলী ঢংয়ে ঘুরাইয়া পরে পার্বতী। বুকের উপর দুইটা নারকেলের মালা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া হাতকাটা একটা জরির পাড় বসান ব্লাউজ পরিয়া লয়। দাড়ি গোঁফ কামান হলুদমাখা উন্নত বক্ষ পার্বতীকে দেখিয়া রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ত্রিশূলধারী মহাদেবও কটাক্ষ হানে। দেখিয়া বৌ-ঝিরা হাসিয়া কুটিপাটি। ঠাকুরমা বুড়িও হাততালি দিয়া নাচের ভঙ্গীতে রঙ্গ করে নাতনীজামাই রামমোহনের সঙ্গেঃ পার্বতীকে পাইয়া মহাদেব যেন তাহার নাতনীটিকে ভুলিয়া না যায়।

ওদিকে বুড়োশিবের দলের হরগৌরীও আসিয়াছে জমিদার বাড়ীতে। নিকুঞ্জ মহাদেব সাজিয়াছে এইবার। উহাদের মহাদেবকে কেমন সুন্দর মানাইয়াছেঃ যমুনা বারে বারে তাকাইয়া দেখে। নৃত্যরতা পার্বতীর ফাঁকে ফাঁকে জটাধারী মহাদেবের প্রশান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয় কিশোরী যমুনা।

চৈত্র মাস শেষ হইয়া যায়। আবার নূতন বছর আরম্ভ হয় নূতন সম্ভাবনা নিয়া। কামার কুঞ্জর কাজের চাপ খুব। সারাদিনই হাপর চলে।

ভূমালী হারাধন আর একা পারিয়া উঠে না। বলাইকেও সঙ্গে নিয়ে যায় কাজে। জমিদার বাড়ীর সখের ফুলবাগানের কাজ।

পদ্মদীঘির গায়ে একান্ত পরিত্যক্ত জমিটায় নূতন পরিকল্পনা। বিদেশী ফুলের বীজের নিত্য নূতন আমদানী। ত্রিকোণ ফুলের বেদীতে সাদা পাথরের সীমানা। ছাপার বইতে কত কি বাহারে ছবি।

হারাধন শুধু কোপায় আর বলাই আগাছা বাছিয়া তোলে বেতের ঝুড়ির ভিতর।

শক্ত মাটি কাল মানুষের ঘামে ঘামে নরম হয়। তুলতুলে নরম মাটির সোহাগ লাগে বিদেশী ফুলের অঙ্কুরে। ওদিকে পঞ্চমুখি জবার লাল অভিনন্দন বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

বাড়ীতে বলাইয়ের মা ধান সিদ্ধ করে। লাল মিঠা আউষের ধানের সোঁদা গন্ধ ভুর ভুর করে। জমিদার বাড়ীর কামধেনু গাইয়ের বাড়তি খুদকুঁড়াগুলি উপরি লাভ। বলাইয়ের মা মনে মনে হিসাব করেঃ কয় সন্ধ্যার ফ্যানভাত হইবে গরুর চাউলের ক্ষুদ দিয়া। তুঁষগুলি জমান থাক শীতের জন্য। তুঁষের পাতিল ছাড়া শীতের একরাতও চলে না শাশুড়ী ধরণীবুড়ির।

ঘরের পেছনে বসিয়া ধরণীবুড়ী তামাকের টিকা দেয় জমিদার বাড়ীর সেরেস্তাঘরের জন্য। মাটির গামলায় ফ্যান আর কাঠ কয়লার গুঁড়া দিয়া টিনের উপর টিকা দেয় আর মনে মনে গুণিতে থাকে কয় কুড়ি হইল।

মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত ধরিত্রী। গৈরিকমাটির বুকে কালমানুষের রুদ্র প্রচেষ্টা।

হারাধন আর বলাই কোদাল হাতে ঘরে ফেরে ঘর্মাক্ত দেহে। দাওয়ায় বসিয়া এক ছিলিম তামাক খাইয়া লয়—বুড়িমা আসিয়াও একটু টান দেয় কল্কিতে। ভাগ্নীজামাই রামমোহন আলাপ করে হারাধনের সঙ্গে। নিকুঞ্জর বাপ খবর পাইয়াছে—আজ বৈকালে সে যমুনাকে দেখিতে আসিবে।

ধরণী বুড়ি দক্ষিণের ঘরের সুন্দরবৌকে ডাকিয়া আনে নাতনীকে সাজাইতে। মাষ্টারবাবুর বৌ-এর কাছ হইতে একটু ফুলতেল চাহিয়া আনে। সুন্দর বৌ চকচকে করিয়া তেল মাখাইয়া যমুনার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়। তেলমাখা হাত দুইটা যমুনার সলজ্জ তুলতুলে গালে মাখিয়া দিয়া কাঁচ-পোকা কাটিয়া সবুজ টিপ একটি পরাইয়া দেয় কপালে। ফুলতেলের মিষ্টি গন্ধে যমুনার মন একটা ভয়-মিশ্রিত আনন্দে খুশি হইয়া উঠে। নিকুঞ্জকে সে ভালভাবেই দেখিয়াছে—তবু শ্বশুর বাড়ীর বিভীষিকা শিশুমনকে শঙ্কাতুর করিয়া তোলে। যমুনা লুকাইয়া আয়না দিয়া একবার মুখখানা দেখিয়া লয়। যমুনার মা বারে বারে ইষ্টদেবকে ডাকে—অমন চমৎকার ছেলে—যমুনার সঙ্গে মানাইবে ভালই।

ধরণী বুড়ি—এরই মধ্যে হাসি-মসকরায় মত্ত হইয়া যায় ছেলের ভাবী বেয়াইয়ের সঙ্গে।

যথাসময়ে মেয়ে দেখান হয়—মেয়ে পছন্দও হয় ছেলের বাপের। কিন্তু টাকার অঙ্কে মেলে না। নিকুঞ্জর বাপ—তিন কুড়ি এক টাকার উপরে এক পয়সাও দিতে রাজী নয়।

ওদিকে হারাধনের ঘরের চাল না বদলাইলে সামনের বর্ষা কাটান দায়। ঐ একটি মেয়ে, তাহাকে সোনার নাকছাপি না দিলে মেয়ের মার মন উঠিবে না—পাঁচজনকেও ত অন্ততঃ পান বাতাসাটা দিতে হইবে হলুদ কোটার দিনে। কাজেই সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়।

একটা দমকা কাল মেঘে বিকালের সোনালী আলোটুকু যেন ম্লান হইয়া যায় এক মুহূর্তে।

আবার কিছুদিনের মধ্যে আরেকটা সম্বন্ধ আসে চাকলাদার পাড়ার পঞ্চাশ বছরের শশীভূমালীর সঙ্গে। শশীর বৌ মরিয়া গিয়াছে অনেকদিন আগে সোমত্ত ছেলে ও ছেলের বৌ রাখিয়া।

বুড়া নিজেই মেয়ে দেখিতে আসে। যমুনা লুকাইয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখে। শশীর চকচকে টাক মাথাটাই চোখে পড়ে শুধু। ভীত হইয়া উঠে যমুনা—মনে মনে ভাবে—এত কাশে কেন বুড়াটা...কি বিশ্রি কাশির শব্দ।

নিকুঞ্জের চেহারাটা বারে বারে মনে পড়ে—আর মনে মনে ভগবানকে ডাকে।

এবারও সুন্দরবৌ আসিয়া মেয়ে সাজায়—টিপ পোকা কাটিয়া আমের আঠা দিয়া কপালে টিপ লাগাইয়া দেয়। যমুনা ঘরে গিয়াই নখ দিয়া খুটিয়া টিপ তুলিয়া ফেলেঃ হে ভগবান, যেন পছন্দ না হয় তাকে। কিন্তু তবু মেয়ে পছন্দ হইয়া যায় শশী ভূমালীর। টাকার অঙ্কেও মিলিয়া যায়।

কাজেই পাকা কথা হইয়া যায় সেই দিনই। ডাগর মেয়েকে আর বসাইয়া রাখা যায় না—সমাজের ভয় আছে।

যমুনার মা আড়ালে চোখ মুছে।

পাঁজি দেখিয়া দিনক্ষণ দেখিয়া শশীর সঙ্গে যমুনার বিয়ে হইয়া যায়। মেয়ে জামাই রওনা হইয়া গেলে বৌঝিরা সব যে যার ঘরে ফেরে পান বাতাসা হাতে নিয়া।

বলাই কিছু দূর পর্যন্ত দিদির পেছনে যায়। মস্তবড় ঘোমটার ভিতর যমুনার কচি মুখখানি চোখের জলে ভিজিয়া একাকার। বলাই একটা উঁচু বাঁশের সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া দেখে—দূরে বধূবেশী দিদির অস্পষ্ট ছবি। ঐ বুড়ার সঙ্গে কেন যে দিদির বিয়ে হইল—বলাই কিছুতেই বুঝিতে পারে না। উহারা মারিবে না ত দিদিকে! বলাইএর চোখ দুটা জলে ভরিয়া উঠে—প্রীতিভরা সহজ আবেগের এক অবুঝ গুমরানি ভীরু মনে।

সদ্যো-বিবাহিত শশী ভূমালী বৌকে নিয়া পদ্মদীঘি পার হইয়া হরিখোলার মাঠের ধার দিয়া হাঁটিয়া চলে। দক্ষিণে অনেক দূরে চাকলাদার পাড়ার তালগাছের সারি। মাঝে বিস্তৃত চষা ক্ষেত। সরু মেঠো পথের উপর দিয়া অগ্রসর হয় শশী ভূমালী। হাতের শিথিল চামড়ায় বাঁধা দশগ্রন্থীর হলুদ সূতা। যমুনার পরনে কোরা লালপাড় শাড়ি, হাতে সিন্দুরের রাজ কৌটা।

ভীরু পদক্ষেপে ছোট ছোট পা ফেলে যমুনা, পেছনে ঘন ঘন কাশির শব্দ শূন্য মাঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। এক অজানা আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠে যমুনা। চোখের জল শুকাইয়া যায় অলক্ষ্যে।

শশী বারে বারে তাকাইয়া দেখে যমুনার দেহের গড়ন, খুশি হইয়া উঠে সে মনে মনেঃ 'বাড়ন্তই আছে মেয়েটা।' কামাতুর মৃদু হাসি খেলিয়া যায় বৃদ্ধের গোঁফের আড়ালে। লোল চামড়ার ভিতর হইতে নিষ্প্রভ চোখ দুইটিতে একটা লোভী দৃষ্টি জ্বল

জ্বল করিয়া উঠে।

দুই মাস হইয়া গিয়াছে যমুনা শ্বশুর বাড়ীতে। এর মধ্যে একবারও হারাধন মেয়েকে দেখিতে যাইতে পারে নাই। বলাইয়ের মার তাগিদের চোটে হারাধন অস্থির। কিন্তু মেয়ে মানুষের বুদ্ধি দিয়া সে ত আর বুঝিবে না—কর্তাবাড়ীর তরকারী বাগানে এখন একদিনও কামাই দেবার উপায় নাই। কামলারা সব জ্বরে পড়িয়া, শুধু সে আর রামমোহন এখন জোগান খাটিতেছে। তাছাড়া একেবারে খালি হাতে মেয়ের বাড়ী যাওয়া যায় না।

বলাইয়ের মার মনটা কয়দিন যাবৎ ভাল নয়, যমুনার জন্য মন কেমন করে। সেদিন বিকালে একটা ফেরিওয়ালা শাড়ি ব্লাউজ, সিটের কাপড় নিয়া তাদের পাড়ায় আসে।

বৌ-ঝিরা ভিড় করিয়া দাঁড়ায়—সবাই এটা সেটা নাড়িয়া দেখে,—কেউবা নাড়িয়া ফেরৎ দেয়—'দাম বড় বেশী সেখের পো'।

বলাইর মার একখানা ছাপার শাড়ি বড় পছন্দ হইয়া যায়। মনে মনে ভাবে—যমুনাকে মানাইবে ভাল। কিন্তু দাম বড় বেশী। নগদ টাকা, কোথায়ই বা পায়। হারাধনকে জানানোর উপায় নাই। সেবারে, বলাইয়ের অসুখের সেই ওষুধের দাম এখনও বাকী ডাক্তারবাবুর কাছে। ভয়ে ভয়ে বলাইয়ের মা সুন্দরবৌর শরণাপন্ন হয়—'বেশীদিন রাখবো না বৌ, এই বাড়তি ধানের দাম দিয়াই শোধ কইরা দিমু।'

ছাপার কাপড়খানি কিনিয়া বলাইর মা চুপিচুপি পুরানো পোর্টম্যান্টটিতে বন্ধ করিয়া রাখে। সুন্দর বৌও ত তারিফ করিয়া বলিযাছে: 'কাপড়খানি যমুনাকে মানাইবে ভালই।'

সন্ধ্যাবেলা দাওয়ায় বসিয়া হারাধন তামাক টানে। শরীরটা একটু গরম করিয়া লয়, সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া চুপসিয়া আছে। আষাঢ় মাস পড়িতে না পড়িতেই যা বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, শ্রাবণের ধারা ত পড়িয়াই আছে। সদ্য-লাগানো ঘরের চালের দিকে তাকাইয়া মনে মনে ভাবে, দিনে ত ভিজিতেই হইবে, রাত্রিতেও যদি একটু ঘুমানো না যায় তবে মানুষ বাঁচে কি করিয়া। গেল বছর ছেলে মেয়ে মা বৌ মায় ছাগলগুলি সুদ্ধ ঐ ঘরের এক কোণায় কি কষ্টেই না কাটিয়েছে। তার ফলেইত ছেলেটার সেই কি কাল ম্যালেরিয়া ধরলো। দুই দুইটা ইনজেক্সান দিয়া তবে তাকে বাঁচান যায়। তার দাম এখনও বাকী। ডাক্তারবাবুকেই বা কি যে বলিবে সে। তিনি নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন 'ছোট লোকের জাতই নিমক্হারাম।'

ওদিকে মেয়েটাকেও আনিতে হয়—ছেলেমানুষ, তারও মনটা কেমন হইয়া আছে কে জানে। বুকটা কি রকম একটু ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করিতে থাকে।

ঘরে বসিয়া বলাইয়ের মা গজ গজ করিতে থাকে—'বলি প্রথম বছর যে শ্বশুর বাড়ীতে শ্রাবণের জল পারাইতে হয় না—সে কথাও ভুইলা গেল, এক বাহাত্তুরে বুড়ার সঙ্গে ঐ কচি মাইয়াটার বিয়া দিয়া কি আমার হাড় জুড়াইয়াছে।'

হারাধন আর সহ্য করিতে পারে না—তাহারও বুকে ঐ একই জ্বালা। তবু যুক্তি দিয়া সে মনকে প্রবোধ দেয় যত গণ্ডগোল ঐ ছিঁচকাঁদুনে মেয়েলোক লইয়া।

সেও ঝাঁজিয়া উঠে, বড় যে আজ মেয়ের উপর সোহাগ উপছে পড়ে। বলি কি রকম বর্ষা হইছে চোখে পড়ে। খুব ত আরামে চালের তলায় বইসা ধর্ম কথা শোনান হইতাছে। গেল বছরের কথা মনে পড়ে!

অদূরেই কোথায় যেন একটা বাজ পড়ে কড়মড় করিয়া, সবাই একসঙ্গে আচমকা কাঁপিয়া উঠে। বলাই ছুটিয়া আসিয়া বসে মার গা ঘেঁষিয়া। কোণের একটা বেড়ার বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে বাতাসে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভিজিয়া একাকার। হারাধন উঠিয়া পড়ে বাঁধনটা শক্ত করিয়া দিতে। বলাইয়ের মাও চুপ হইয়া যায়, ভাবে ঃ এই ঝড় জলে যমুনা কেমন আছে কে জানে। সুখেই আছে নিশ্চয়। বুড়া হইলে কি হইবে অবস্থা ত ভালই ঃ মনকে প্রবোধ দেয়।

সেই রাত্রেই জল বৃষ্টির মধ্যে যমুনা শ্বশুর বাড়ী হইতে পালাইয়া রওয়ানা হয় তাহার আশৈশবের অতি পরিচিত গ্রামের উদ্দেশ্যে। বারে বারে ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকায়—শশীর কঠিন হাত দুইটা যদি তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরে! কি বিশ্রী সোহাগ।

দিন গড়াইয়া যাওয়া যমুনার এক একটি দুঃসহ দিনের ছবি ভাসে চোখে। শশীর গায়ের ঝুলিয়া পড়া চামড়ার স্পর্শে যমুনার গা ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। মনে হইতেছে, এখনও যেন তাহার বুকটা ঢিব ঢিব করিতেছে শশীর সাদা লোমে ভরা বুকের ভিতরে।

বুড়োর ছেলের বৌয়ের ঘরে যাইত যমুনা যখন তখন—কি সুন্দর সূতায় ফুল তোলে সে পাখায়। যমুনা পাড় হইতে সূতা খুলিয়া দিত আর বসিয়া বসিয়া দেখিত ছেলের বৌর ফুলতোলা। দেখিয়া পিত্তি জ্বলিয়া উঠে শশীর—'ছেলের ঘরে ঘরে অত আনাগোনা কিসের?' রাত্রিতে ব্যর্থ কামনার বহ্নিতে জ্বলিয়া এক হিংস্র মত্ততায় শশী দুয়ারে খিল আঁটিয়া দেয় সশব্দে। ভয়ার্ত যমুনা ঘরের বেড়াটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া শুধু কাঁপিতে থাকে। তাহার ছোট মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ পাংশু হইয়া উঠে—গাঢ় অন্ধকারের ভিতর হইতেও শশীর সেই দৃষ্টি জ্বল জ্বল করিয়া উঠে—হিংস্র বাসনার শাণিত লালসা...।

যমুনা আরও তাড়াতাড়ি পা চালায়—আবার কোন দিন যদি ঐ বুড়ার পাশেই শুইতে হয়! যমুনা শিহরিয়া উঠে। তাহার কচি গালের উপর শশীর অতি সোহাগের চিহ্ন স্বরূপ গরম কষের ছাপ কাল হইয়া আছে—হয়তো চিরদিনই থাকিবে! দ্রুতপায়ে হাঁটে যমুনা।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া পরনের শাড়ি চুপসিয়া একাকার। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—তবু চেনা পথের অঙ্গুলী নির্দেশে যমুনা ঠিক পথেই চলে।

অরণি ১৩৫২

সুধা সেনের গল্প

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বি. এ.

সেদিন হঠাৎ সুধা সেনের সঙ্গে দেখা। বি এ পাশ করে বেরিয়ে সাপ্লাইতে ঢুকেছিল শুনেছিলাম। না ঢুকে ওর উপায় ছিল না। বড়ো দুটি উপার্জনক্ষম ভাই সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ছোটো ভাই-বোন্, বৃদ্ধা মা-র পোষণের ভার সমস্তই পড়েছে ওর ওপর। কলেজ জীবনেও দেখেছি,—টুইশান করে, খাওয়ায়, পোষাকে পয়সা বাঁচিয়ে কী চেষ্টা ও করেছে বাড়ির সাহায্যের অঙ্কটা বাড়াবার। মনটা বোধহয় ওর সত্যিই স্নেহকোমল ছিল,—তা নইলে এতোখানি স্বার্থত্যাগ কে করে? কিন্তু ওর চেহারায় ছিল না সে কোমলতার বিন্দুমাত্র আভাস। না-খাওয়ায় রোগা, চিম্‌সে মুখ, কণ্ঠার হাড় বের করা জিরজিরে চেহারা,—কী এক ধরণের জ্যোতিহীন দৃষ্টি চোখে। মনে হ'ত ও যেন মেয়েই নয়,—মেয়ের উপযুক্ত লালিত্য ওর কোনোখানে নেই।

কিন্তু যা বলছিলাম। বহুদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম,—"কী করছিস আজকাল?"

বললে—"রিট্রেঞ্চমেণ্টে সে চাকরিটা গেছে। এখন একটা স্কুলে কাজ করি।"

তাইতেই চেহারাটা আরো বিশীর্ণ হয়েছে। আন্দাজ করলাম, এখনো সুধা সেন প্রাণপণে না খেয়ে, না পরে পয়সা জমাচ্ছে, উপার্জন কমে যাওয়াতে ওর পরিবারের গায়ে যাতে না লাগে অভাবের একটুও আঁচ, তার জন্যে নিজের গায়ের রক্ত জল করে চেষ্টা করছে মণিঅর্ডারের টাকার অঙ্কটা ঠিক রাখবার।

দুঃখ হল। ও প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বললাম "তারপর—কলেজের আর সব মেয়েদের কী খবর—বল্।"

ও দুয়েকজনের নাম করলে, সাপ্লাইতে ঢুকেছিল। তার পর বললে, "মীরাদের বাড়ি আগে মাঝে মাঝে যেতাম—সে এক মজার ব্যাপার—" বলে টেনে টেনে হাসতে লাগল।

বললাম—"মীরার তো বিয়ে হয়ে গেছে,—না?"

বললে—"হ্যাঁ—তাই তো বলছি। ওর দেওর আমাকে নিয়ে এক গল্প লিখেছে, পড়িস নি এবারকার শারদীয়া 'দেশ'?"

বললাম—"না তো। কী গল্প হ্যাঁ রে?"

—কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ও হল—সুধা সেনের মতো মেয়েকে নিয়ে গল্প,—সে আবার কী রকম!

সুধা বললে—"বলছি গল্পটা। তার আগে একটা কথার জবাব দে দেখি। আমাকে কি খুবই বিচ্ছিরি দেখতে?"

ওর এ প্রশ্নের কী জবাব দেব, ভেবে পেলাম না। কলেজে থাকতে ওর উপোসী শুকনো মুখ, রোগা লিকলিকে চেহারা, আর ভাবহীন চোখ নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি কম করিনি। কিন্তু সত্যি কথা সব সময়ে বলা চলে না।

আমাকে নীরব দেখে ও ম্লান একটু হাসল—বললে,—“বুঝেছি। আয়নাতেও তো দেখি নিজেকে। তবু যে কেমন করে এমন ভুল করলাম!”

কৌতূহলী হয়ে বললাম—“কী ব্যাপার রে? বল্ না। বন্ধুব কাছে বলতে তো কিছু আপত্তি নেই?”

ও বললে—“আপত্তি কিসের! গল্পই যখন ছাপা হয়ে গেল, তখন আমাকে লোকে চিনবেই। জানবে না শুধু আমার দুর্বলতাব কথাটা, সেটা লেখকও ধরতে পারেনি। সেই কথাটা তোকে বলি। দুর্বলতায় মেয়েরা লজ্জা পায় না—আনন্দই পায়। অবশ্য—” গলা নীচু করে বললে—“আমার মতো মেয়েরা বাদে।”

“মীরাদের বাড়িতে তখন প্রায়ই যেতাম—এক অফিসেই কাজ করতাম কি না! রাতে থাকতাম বড়দার বাড়িতে, বৌদির ভয়ে ভোর হলেই চুপি চুপি বেরিয়ে পড়তে হত। আবার রাত বারোটায় এসে কড়া নাড়তাম—বড়দা জেগে থাকত—দরজা খুলে দিত। জানিস তো, বড়দা আমায় খুব ভালোবাসে, শুধু বৌদির জন্যে—”

ও থেমে যেতেই আমি প্রশ্ন করলাম—“সারাদিন তো বাইরে বাইরে ঘুরতিস্—চান-খাওয়া করতিস্ কোথায়?”

“চান করতাম ছোড়দার মেসের কলে। আর খেতাম যেখানে সেখানে।”

ওর ‘যেখানে-সেখানে’র অর্থ বুঝলাম। হয়তো সমস্ত দিনে চার-পাঁচ কাপ চা—আর নয়তো খিদেয় নাড়িভুঁড়ি কুরে খেতে শুরু করলে কোন রেস্টুরেণ্টে কিংবা তেলে-ভাজার দোকানে ঢুকে সামান্য কিছু খাওয়া। পেট ভরে খাবার মত পয়সা একদিনও সে প্রাণ ধরে খরচ করতে পারে না। আর এই কৃচ্ছ্রসাধনা করেই সুধা সেন বাঁচিয়ে রেখেছে গ্রামের পরিবারটিকে।

ও বলে চলল—“এমন করে আর কদিন চলে। ছোড়দাও মেস ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। অগত্যা মীরাকে একদিন বললাম, একটা বোর্ডিং দেখে দিতে। মীরা ওর দেওরকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল—বললে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কোন একটা বোর্ডিংয়ে জায়গা করে দিতে। ভদ্রলোক রাজি হলেন। কয়েকটা হোস্টেলে গেলাম, কিন্তু জায়গা পেলাম না। ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম দুজনে, সুরাহা হল না কিছুই। ভদ্রলোক খুব চেষ্টা করছিলেন আমার জন্যে। তখন বুঝতে পারি নি, সে চেষ্টার মূলে ছিল আমার মতো বিশ্রী কম্প্যানিয়নের কাছ থেকে মুক্তি পাবার ব্যগ্রতা। ভেবেছিলাম, উনি আমার সুবিধের জন্যেই ব্যাকুল। ভারি কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম, ভীষণ ভালো লেগেছিল। ভদ্রলোক মোটে বিরক্ত হননি দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমার জন্যে এটুকু করতে বোধ হয় তাঁর ভালোই লাগছে। পরে তাঁর গল্প পড়ে বুঝলাম, আমি ছিলাম তাঁর কাছে এমন একটা জীব, যার ওপর বিরক্তিও আসে না, দয়া হয়, ঘৃণায় মেশানো দয়া।” সুধা সেন ঠোঁট কামড়ালো, তার নিষ্প্রভ চোখ দুটোও একবার সামান্য একটু ঝকঝক করে উঠল যেন।

"রেস্টুরেণ্টে খাওয়ানোর প্রস্তাব করলেন উনি। আপত্তি করলাম না। পরের পয়সায় পেট ভরে খাওয়ায় আপত্তি হবে কেন। তা ছাড়াও, তাঁর দান নিতে আমার অদম্য একটা ইচ্ছে হয়েছিল—ইচ্ছে করছিল সমস্ত দিক দিয়ে তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকতে। পেট ভরেই খেলাম, অনেকদিন পরে। সাপ্লাই অফিসে কাজ করেছি, কিন্তু অন্য মেয়েরা যখন পরের পয়সায় বিলাসিতা করেছে, তখন আমার অভাব নিয়ে আমি রয়েছি একেবারে নিঃসহায়। কেউ আমার জন্যে সামান্য একটু মনোযোগ খরচ করেনি কোনদিন। অতএব সেদিন সে ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় আমার চিত্ত যদি উদ্বেল হয়ে ওঠে—সে কি অস্বাভাবিক? তখন তো জানতাম না—তিনি অনুকম্পা করছেন আমাকে, বুভুক্ষু একটা ভিখিরীকে লোকে যে অনুকম্পা করে। আমার খাওয়ার ধরণটা পর্য্যন্ত নাকি তাঁর বিশ্রী লেগেছিল। কিন্তু আমি যদি রোজ পেট ভরে খেতে পারতাম, তবে কি আমার খাওয়ার ধরণ এত বিশ্রী থাকত?—থাকত না। তবু এইটুকুর জন্যে আমাকে এত ঘৃণ্য ভাবলেন উনি।

"শেষ পর্য্যন্ত গোয়াবাগানে একটা বোর্ডিংয়ে জায়গা পেলাম। চলে গেল সে ভদ্রলোক, কিন্তু ভুলতে পারলাম না তাকে। আমার জীবনে সে-ই যে প্রথম পুরুষ, যে দিয়েছিল আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। আমার সমস্ত দৈন্য, সমস্ত কুশ্রীতা অতিক্রম করে আমাকে তাঁর ভালো লেগেছে, এ কথা ভেবে মনে যতো আনন্দ হচ্ছিল,—ততোই এ দৈন্য, এ কুশ্রীতা আমায় পীড়া দিচ্ছিল, ঠিক করলাম—এবার থেকে নিজের জন্যে কিছু কিছু জমাতে হবে, উন্নত করতে হবে জীবনযাত্রা। পাঁচ টাকা বেশি মাইনের একটা চাকরিও পেয়ে গেলাম ধানবাদে। তারপর এক বছরের ইতিহাস আর না-ই বললাম। বাড়ীর খরচ আর নিজের খরচ প্রাণপণে কমিয়ে হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন আবার ফিরে এলাম পুরোনো চাকরিতে। মস্ত বড়ো হোটেলের সবচেয়ে ভালো রুম নিলাম। ডিনারে, লাঞ্চে, টিপ্‌সে অপর্যাপ্ত খরচ করতে শুরু করলাম। মীরাদের বাড়িতেও গেলাম। মীরা অবাক হল আমার চালচলনের বদল দেখে। হাসল-ও বোধ হয় মনে মনে। ওর দেওরকে দেখলাম না। ভারি দুঃখ হল তাকে দেখতে পারলাম না বলে।

"সুযোগ মিলে গেল। তারি এক বন্ধু, সুবোধ রায় সেই হোটেলেই এসে উঠলো, দেখা করতে এলো সে-ও। খুব সাজসজ্জা করে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে। ইচ্ছে করেই তাকালাম আমি তার দিকে। আশা ছিল সে-ই এগিয়ে এসে কথা বলবে, কিন্তু কোনো কথাই সে বললে না।

"লজ্জা হল দুঃখ হল। সত্যিই তো কী বোকা আমি! ঐশ্বর্যের সমারোহ দেখিয়ে অন্তর জয় করব এমন অসম্ভব স্পর্ধা আমার কী করে হ'ল? সেদিন যখন আমি দীন ছিলাম, অসহায় ছিলাম তখন তো সে আমাকে সাহায্য করেছিল ভালোবেসেছিল। ভাবলাম পুরোনো জীবনেই আবার ফিরে যাব। এদিকে পুঁজিপাটাও এসেছিল ফুরিয়ে। মা ভাই ভাজকে কতো কষ্ট দিয়ে জমানো টাকা সমস্তই খরচ করে ফেলে তবে আমার শিক্ষা হল।

কয়েকদিন অভিমানে দগ্ধ হয়ে অবশেষে একদিন রিক্সা ডেকে হোটেল থেকে চলে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। কোথায় যাব, তারও ঠিক ছিল না। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম।

"হঠাৎ দেখি রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে আছে। দৈব যোগাযোগ বুঝি একেই বলে। আমার মন মুহূর্তে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। ওর কাছে গিয়ে বললাম,—"একটু আসুন। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।"

"নিঃশব্দে আমার পেছন পেছন ও এসে উঠল গাড়ীতে। বললাম,—"আমি আবার নিরাশ্রয়। আপনাকে একটা জায়গা খুঁজে দিতে হবেই আমার জন্যে—" ওর হাতের ওপর হাত রেখে সমর্পণ করতে চাইলাম ওকে আমার সমস্ত ভার।

"ওর কোন্ বন্ধুর বাড়ীতে আমাকে জায়গা করে দেবার কথা আগের বারে ও বলেছিল। সেই কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিলাম। বললে,—"আচ্ছা চলুন দেখি।" একটা গলির মোড়ে ট্যাক্সি থামিয়ে ও নেমে বাড়ী খুঁজতে গেল, আর এল না। ঘড়ির কাঁটা গড়িয়ে চলল।

"রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে মীরার ওখানে গেলাম। বললাম, "আবার অভাবে পড়েছি। রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরে উঠেই চলে যাব।" মীরা খুব বকতে লাগল, বললে,—'সেই সময়েই জানি। তোর কোনো কিছুতে ব্যালেন্স নেই। খরচ কি মানুষ এমন করেই করে? হিসেবী-ও ছিলি চরম। বে-হিসেবীও হয়ে উঠলি চূড়ান্ত রকমের।' সত্যি বলছি বে-হিসেবী আমি কোনোদিন ছিলাম না। ওকে ভালোবেসেই আমার হিসেবী স্বভাবের গোড়ায় ধরেছিল ভাঙ্গন। কিন্তু এ কথা মীরাকে বলতে পারতাম না। তাই চুপ করেই রইলাম। রাতের আশ্রয় মিলল সিঁড়ির ঘরটাতে। ঘুম এল না, ভাবলাম শুধু ওর এ ব্যবহারের অর্থ কী।"

হাসল সুধা সেন। বললে,—"এতদিন পরে ওর গল্পটা পড়ে বুঝেছি আগাগোড়া ও আমাকে ঘৃণা করেছে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে আর আমি—উঃ এমন ভুলও মানুষের হয়।"

থেমে গিয়ে সুধা সেন আমার হাত চেপে ধরল। বললে,—"আমার কি ভালবাসা পাবার একটু যোগ্যতাও ছিল না রে?"

হায় সুধা সেন! তোমার উপবাসী দেহে যে যৌবন আসেনি তোমার মনকে কে দেখতে পাচ্ছে আর কে-ই বা ভালোবাসছে বলো? শুধু ভালবাসা দিলেই কি আর ভালোবাসা পাওয়া যায়?

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে বসে রইলাম। ওঠার আগে সুধা সেন বললে,—"সবচেয়ে দুঃখ এই—এই সময়েই আশি টাকা মাইনের চাকরিটা গেলো। এখন পাই মাত্র চল্লিশ টাকা। মাকে দিয়ে মোটে বাঁচে না। তা নইলে একটা টনিক খেয়ে দেখতাম গালে মাংস ভরে কি-না দেহ পুষ্ট হয় কি-না, চোখে ঝলসায় কি-না যৌবনের দীপ্তি।"

দেশ ১৩৫৩

দধীচি

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

প্রহ্লাদের আর পৈত্রিক গ্রাম না ছেড়ে উপায় রইল না বুঝি—; ভূমিহীন কিষাণের ঘরে উনিশ বছরের ছেলে প্রহ্লাদ, ওর মিশ্‌মিশে কালো রঙের চোখের বিকট আকৃতিতে আদিম মানুষের পরিচয়টা সুস্পষ্ট রয়েছে, চোয়াল বের করা, উঁচু হাঁ মুখ আর উঁচু কপালের মধ্যে চওড়া নাক আর কোটরগত চোখ দু'টিতে ঠিক ওকে গরিলার মত দেখতে মনে হয়।

ওর বাপ গোবিন্দ মণ্ডল তিন-পুরুষ বংশানুক্রমে বর্গা জমীতে ভাগে চাষ-আবাদ করছিল, অর্ধেক ফসল ওরা ঘরে তুলে আনে। উদ্‌বৃত্ত অর্ধেক জমীর মালিক জোতদারকে পৌঁছে দিয়ে আসে।

বঞ্চিত মানুষের আকাশে আকাশে যে স্তূপাকার মেঘরাশি পুঞ্জিত হয়েছিল, ইতিমধ্যে ঘন দুর্য্যোগ নেমে এল। তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী ঝড় উঠলো,—কিষাণ-মজদুরগণের উচ্ছ্বাস আর আনন্দের অন্ত নেই, এবার ওরা জীবন-জীর্ণ কর শ্রমের যোগ্য পুরস্কার পাবে,—ফসলের তিন ভাগ গোলায় তুলতে পারবে।

হৈমন্তিক ধান-কাটা সুরু হয়েছিল, ইতিমধ্যে জমীর মালিক জোতদার সতীশ চৌধুরী পুলিশ নিয়ে মাঠে এগিয়ে এল। পুলিশ-পেয়াদার জুলুমবাজ, নির্ম্মম অত্যাচারের নির্য্যাতনকে প্রতিরোধ করবার সাধ্য কি দুর্বল চাষী গোবিন্দ মণ্ডলের,—সাতশ জোতদার পুলিশের সাহায্যে দূর-দূরান্তর থেকে কিষাণ-মজদুর আনিয়ে হৈমন্তিক পাকা ধানে গোলা ভর্তি করে ফেললো। জাগরণের জোয়ার বুঝি ভূমিহীন চাষী গোবিন্দ মণ্ডলকে উন্মত্ত প্লাবনে দিশেহারা করে তুলেছিল,—সে জোতদার সতীশ চৌধুরীর জমী বে-আইনি দখল করতে যেয়ে, তার গোলার ধান লুঠ করতে যেয়ে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের কবলে বন্দী হয়ে গেল।

ভূমিহীন কিষাণের ছেলে উনিশ বছরের প্রহ্লাদের সম্মুখে নিরন্ধ্র অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এল। জননীকে বললো—"ইবারে আমারে যাতি দে মা বিদেশে, টাকা রোজগার করা তো লাগবি, মালদয়ে হারাণ কাকারে পত্তর দি,—তেনা একডা কাম ঠিক করায়ে দেবনা—"

মণ্ডলের স্ত্রী হরিপ্রিয়া কী উত্তর দেবে? গ্রাম্য রমণী সে; অন্তরে ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ওর অসহায়তার খর রেখায় নৈরাশ্যের ভাবব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে,—"মানুষটারে ধরি লইয়া গেল। কে জানে কবে ছাড়ান দেবানে,—বিদেশে তুরে যাতি তো হবি, হারাণরে পত্তর পাঠায় দে—"

হারাণ মণ্ডল এই গ্রামেই কৃষকদের ছেলে। ওর বিঘে কয়েক জমী ছিল, বার বার দুই বার যখন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ফসল ঘরে তুলতে পারলো না, সেই সময় ওদের গ্রামের ননী সান্যাল শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে মালদহে বসবাস করবার আয়োজন করছিল। এই সময় নিঃসঙ্গ হারাণ ননী সান্যালের সঙ্গী হয়ে বলেছিল—"ঠাকুর মশায়, কার লাগি আর

গাঁয়ে থাকতি হবি কয়েন,—জমীতে ফসল নাই—বউটাও মারা পড়লে—"

ননী সান্যাল শ্বশুরের সম্পত্তির সঙ্গে খান পাঁচ-ছয়েক এক্কা গাড়ীও পেয়েছিল। হারাণকে সে গাড়োয়ানের কাজে নিযুক্ত করে নিয়েছিল।

দিন কয়েকের মধ্যে প্রহ্লাদ হাটে যেয়ে হারাণের চিঠির উত্তর নিয়ে এল।

হারাণ লিখেছে—"ঠাকুর মশায়ের একখানা গাড়ী আস্তাবলে পড়ি রয়েছে,—তুই যদি আসিস্, কামটা হয়ে যাবানে—ত্রিশ টাকা বেতন খাওয়া-পরা পাবানে।"

ভূমিহীন নিঃস্ব প্রহ্লাদের কী আর আপত্তি থাকতে পারে? কূল-হারানো অথৈ জলে ও যেন তৃণখণ্ড লাভ করলো, জননীকে বললো,—"গাঁয়ের পিরতিবেশীদের তুকে দেখবার লাগি কয়ে দিলাম। পত্তর পাঠাস,—বাবার কত দিনের হাজত-বাস হবি, খবর জানাস,—আমি বেতন পালি তুরে পাঠায়ে দেবানে।"

নিরুত্তর হরিপ্রিয়া কী উত্তর দেবে? আসন্ন নিঃসঙ্গতার একটা অব্যক্ত রিক্ততা যেন মাকড়সার জালের মত ওর চতুর্দ্দিকে বিস্তার করেছিল,—অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর,—মূক ওষ্ঠপ্রান্ত, সে নিঃশব্দ অশ্রু-সজল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গ্রাম্য প্রহ্লাদের দূরান্তরের যাত্রা—

ভাগীরথী ও গঙ্গার শাখা-প্রশাখা নদ-নদীগুলি অতিক্রম করে ইছামতী ও ভৈরবের প্রান্ত বেয়ে, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলাগুলির সীমানা ছাড়িয়ে, সীমাহীন উত্তাল তরঙ্গায়িত পদ্মা নদীর গৈরিক স্রোতে শীর্ণা মহানন্দার নীলাভ জল যেখানে এসে মিশেছে,—তারই উপকূলে মালদহের প্রান্তে প্রহ্লাদের বিপর্যস্ত ভাগ্য-তরণী এসে ভিড়লো।

সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ অনভ্যস্ত জীবনযাত্রা! লাঙ্গল ছেড়ে প্রহ্লাদ এবার ঘোড়ার লাগাম ধরলো।

হারাণ বললো,—"দিন কয়েক আমার সাথে সাথে যাবানে,—পথ-ঘাট চিনি নিতি পারবানে,—লাগামও দুরস্ত হয়ে আসবানে।"

প্রহ্লাদের গরিলার মত বিকৃত আকৃতি মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো,—ছোট ছোট চোখ দু'টি বার বার ওঠানামা করছিল।

ননী সান্যাল মহকুমা মোক্তার,—প্রচুর সম্পত্তি,—পাঁচ-সাতখানা টাঙ্গা গাড়ীর মালিক সে,—প্রকাণ্ড বাড়ী,—এক প্রান্তে ঘোড়ার আস্তাবল,—গাড়ীর ঘর,—গাড়োয়ান-সহিসের খুপরিগুলি নিয়ে একটি ছোট-খাটো বস্তি গড়ে উঠেছে।

ভূমিহীন কিষাণ প্রহ্লাদ, টাঙ্গা গাড়ীর গাড়োয়ান হয়েছে, বিস্তৃত উন্মুক্ত মাঠে কয়েক দিন গাড়ী চালিত করে লাগাম অনভ্যস্ত হাত সে আয়ত্তাধীন করে নিল, বন্য ঘোড়ার শীর্ণ গায়ে মমতার হাত বুলিয়ে নিয়ে তাকে নিকট-আত্মীয়ের মত আদর করতে লাগলো।

তবে ওর বিপর্যস্ত ভাগ্যের প্রভাবে বুঝি ঘোড়াটির ডান দিককার পায়ে একটি ঘা ছিল,—সেই ক্ষতস্থানটির প্রতিও প্রহ্লাদের যত্নের অন্ত রইল না।

হারাণ ওকে সতর্ক করে দিয়ে বললো "মঙ্গলবার করি পশুর ডাগ্‌দর বড় সড়কের ধারে দাঁড়ায়ে রবানে, উরে এড়ায়ে যাতি চেষ্টা করবানে। "গলার স্বর-নামিয়ে আরও চুপিচুপি হারাণ বললো,—"যদি ধরা পড়িস লাইছেও কাড়ি নিবে পারে" একটু ভয়-পেয়েছিল বৈ কি প্রহ্লাদ,—গরিলার মত ওর ছোট চোখ দু'টি ভীরু-চঞ্চল হয়ে উঠলো,— একটু আক্ষেপ প্রকাশ করে বললো,—"খোঁড়া ঘোঁড়া কেউ নিতি চায় না,—তাই আমারে গছায়ে দিলি? আমি গ্যাঁয়ের বোকা-হাবা, ছাওয়াল কি না?"

হারাণ ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলো—"না না, তা লয় রে, তুই পথ-ঘাট না চিনস,— দূরে দূরান্তে যাতি পারবানে তাই মালিক ইটা তুরে দিবার লাগি কইল।"

নিরীহ প্রহ্লাদের গ্রাম্য মন এই যুক্তিকেও সমর্থন করতে পারলো না; আবার সে আগ্রহ প্রকাশ করে প্রশ্ন করলো—"মালিক ধনী লোক, আর একটা ঘোঁড়া কিনতি পারি,—সব ডাগতর তো ঘুস না লয়, যদি বা গাড়ী-ঘোড়া দখল করি লেয়?"

হারাণ বললো—"বড়লোকের মতি আমরা না বুঝি,—তুই না ঘাবরাস, মঙ্গলবার করি দুপুরের সময় সড়কের ধারে না যাস—ধরা পড়বার ভয় নাই।"

প্রহ্লাদ ক্রমশঃ সদরের গন্তব্য স্থানগুলি জেনে নিল,—থানা, আদালত, ব্যাঙ্ক, বাজার ইত্যাদিও যাতায়াত করে,—পশু-চিকিৎসকের গতিবিধি সে আয়ত্তাধীন করে নিয়েছিল,— আত্মগোপন করবার কৌশলটা তাই সহজ হয়ে এসেছিল।

প্রত্যহ সে দশ কিম্বা বারো টাকা উপার্জন করে,—মালিকের হাতে তুলে দেয়, ত্রিশ টাকা বেতন বাড়ীতে মা'কে মণি-অর্ডার যোগে পাঠায়।

হরিপ্রিয়া প্রায় তাকে চিঠিতে জানায়,—"ত্রিশ টাকার একটা প্রাণীর স্বচ্ছন্দে না হোক, কায়ক্লেশে চলে,—চালের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে,—বাড়ীর খাজনার জন্যে পেয়াদা অত্যন্ত জুলুম সুরু করেছে—"

সেদিন বিকেল বেলা আস্তাবলে গাড়ী তুলে দিয়ে প্রহ্লাদ নিবিষ্ট মনে যেটুকু অক্ষর পরিচয় ছিল, তারই সাহায্যে বানান করে, মা'র একখানা চিঠি পড়েছিল।

প্রহ্লাদ নূতন গাড়োয়ান, সকাল দশটায় গাড়ী বের করে,—পাঁচটায় আবার তুলে দেয়, কিন্তু পুরাতন গাড়োয়ানদের গাড়ী চালনা সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই।

এই সময় হারাণ বাইরে গাড়ী রেখে ঘরে ঢুকলো, গাঁজায় সে কয়েকটা টান দিয়ে খানিকটা শ্রমশক্তি সঞ্চয় করে নেবে।

গাঁজার কলকেতে কয়েকটা টান দিয়ে হারাণ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলো,—"দ্যাশের কী খবর রে?"

"খবর ভালো নয় হারাণ কাকা"—বিমর্ষ ম্লান মুখে প্রহ্লাদ বললো,—"খাজনা ইবার না দিতে পারলি ভিটে-মাটি খাস হয়ে যাবানে।

বলতে বলতে প্রহ্লাদের বিকৃত আকৃতির কালো রঙের মুখ ঔৎসুক্যের আতিশয্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো,—"হারাণ কাকা, প্রচুর টাকা উপায় করতি হবি, একটা পথ করে দেবার পারবানা হারাণ বললো—"পারবানে ক্যান? ঘাটের মড়ার লাগি গতর বিলায়

দে,—প্রচুর অর্থ কামাইতে পারবানে,—বিহান বেলা মনিবের কাছে গাড়ী জমা নেবানে, —ঘোড়ার দানা-পানি লিয়ে লেবানে সাথে, বহু দূরে, গ্রামের মধ্যি চলি যাবানে, রোজ বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পাবানে,—মালিক টাকা-পিছু চারি আনা তুরে কমিশন দেবানে।"

প্রতি টাকায় চারি আনা কমিশন,—মনে মনে হিসাব-নিকাশ করলো প্রহ্লাদ, আশাতীত অর্থ সে উপার্জন করতে পারবে,—মুখ খুশির প্রাচুর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; তবু একটু চিন্তা-বিবর্ণ মুখে সে বললো—"ক্ষুদার সময় ভাত না পালি যে খাটতে যে না পারি হারাণ কাকা,—শরীরডা কেমন যেন অবশ হইয়্যা আসতি চায়—"

হারাণের বহুদূর গ্রামান্তরে আদালত ফেরত আরোহীদের নিয়ে যেতে হবে, ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—"তু নিশ্চিন্ত র, তুরে আমি খাটবার কৌশল শেখায়ে দেবানে—"

গাঁজার কয়েকটি টানে প্রভূত দৈহিক শ্রম-শক্তি অর্জন করে নিয়ে হারাণ বাইরে বের হয়ে পড়লো।

এই সময় মালিক মোক্তার ননী সান্যালের ভৃত্য কয়েক জন নূতন গাড়োয়ানকে জানাল, "ওরা স্নান করে নিক্—ভাত আনবে পাচক ঠাকুর।"

এক দিকে ঘোঁড়া ও গাড়ীর আস্তাবল, অপর দিকে গাড়োয়ান ও সহিসদের ছোট-ছোট খুপরী ঘর,—মধ্যেকার ছোট নোংরা, প্রাঙ্গণে কয়েক জন গাড়োয়ান খেতে বসেছে, মোটা রাঙা চালের ভাত,—পাতলা ডাল, একটু চচ্চড়ী,—তাই ওরা পরম পরিতোষের সঙ্গে খাচ্ছে,—পাচক ঠাকুর পরিবেশন করছে, আদালত-ফেরৎ ননী মোক্তার তদারক করে করে বেড়াচ্ছেন। প্রহ্লাদ এক সময় চুপি-চুপি বল্লো,—"বাবু খুব ভালো, দ্যাবতার মত জন-মজুরের পতি দয়া—"

পাচক ঠাকুর মনিবের তত্ত্বাবধানে পরিবেশন করতে রাজী নয়, তাই সে নিম্ন কণ্ঠস্বরে প্রহ্লাদের কথার উত্তর দিয়ে বল্লো—"দয়া না করলে বাবুর ব্যবসা যে অচল্ হয়ে যাবে,—বাবুরা নিজেরা তো আর লাগাম ধরতে পারবে না—তবু ভালো খাদ্য তো তোরা কিছুই পাস না—"

আস্তাবলে তখন ঘোড়ার খুরের আর হ্রেষা রবের একটা সম্মিলিত শব্দ শোনা যাচ্ছিল, পরিশ্রান্ত ঘোড়াগুলিও তৃপ্তির সঙ্গে দানা চিবুচ্ছিল। আস্তাবলের দুর্গন্ধ অন্ন-ব্যঞ্জনের সুগন্ধকেও যেন বিষাক্ত করে তুলেছিল।

অসাধারণ দৈহিক শ্রমশক্তি অর্জ্জন করবার গোপন কৌশলকে আয়ত্তাধীন করতে প্রহ্লাদের দেরী হয়নি।

প্রভূত অর্থ ওকে উপার্জন করতে হবে,—পিতা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্দী, কবে মুক্তি পাবে, তার জানা নেই,—ভিটে-মাটির খাজনা পাঠাতে হবে, তা নাহলে ঘর-বাড়ী খাস জমি দখল হয়ে যাবে। হারাণ বলে "তোর ভাবনা নাই রে, তুই ঘাটের মড়া বনে গেছিস্, যত খুশি খাটতে পারবানে, এক ফোঁটা পিপাসাও তুর ঠাওর হবিনে।"

সত্যই তাই।

প্রহ্লাদের বিড়ির ছাড়া আর কিছুই নেশা ছিল না,—সকালে সে কয়েক কলকে গাঁজায় টান দেয়।—একটু ভাঙ,—সন্ধ্যের পর গাড়ী তুলে দিয়ে এক বোতল মদ নিঃশেষে পান করে।

প্রহ্লাদ যেন মৃত সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেয়েছে,—একটু জলের পিপাসা, একটু ক্ষুধা সে অনুভব করতে পারে না,—দূর-দূরান্তরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে যায়,—পরিশ্রান্ত ঘোড়া দানা খায়, জল পান করে কয়েক বার,—মুখে যখন তার ফেনা নির্গত হয়,—গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মধ্যাহ্নের তপ্ত রৌদ্রে শীতল জলের কূপের পাশে দাঁড়িয়েও এক ফোঁটা জল পান করে না।

প্রহ্লাদ নিজেও এই সঞ্জীবনী সুধা—মদ, ভাঙ আর গাঁজার প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞ,—এই নেশাই তাকে অসীম দৈহিক শ্রম-শক্তি দিয়েছে,—ক্ষুধা-পিপাসা সে অনুভব করতে পারে না। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, টাকা-প্রতি চার আনা কমিশন সে পায়,—যদি তার অভিরুচি হয় অনেক টাকাই সে মালিককে ফাঁকি দিতে পারে,—কিন্তু গাড়োয়ান সে কিন্তু চোর নয়, মালিক ননী মোক্তার ওকে প্রত্যেক দিন নেশার জন্যে তিনটে টাকা হাতে তুলে দেয়;—জীবনের বিনিময়ে ওরা অর্থ উপার্জন করুক না কেন। মালিক ননী মোক্তার গাড়োয়ানদের অপরিসীম ভালোবাসে। দিন ও রাত্রির মধ্যে একবার সে ভাত খায়,—যত রাত্রে সে ফিরুক না কেন,—পাচক ঠাকুর ওর ভাত গরম রাখবেই।

অনেকগুলি অর্থ সঞ্চয় করেছে প্রহ্লাদ, খাজনা বাবদ দেনাগুলি ডাকযোগে পাঠাতে সে ভরসা পায় না। গ্রামে তস্কর ডাকাতের দলের অভাব নেই। ও নিজে ছুটি নিয়ে দেশে যাবে।

ওরা—গাড়োয়ানরা পর্য্যায়ক্রমে ছুটি পায়,—আবদুল গণি ফিরলে সে দেশে যাবে।

দিন এগিয়ে চলে—

সেদিন প্রহ্লাদ দূরান্তর যাত্রার এক বায়না পেয়েছিল,—কয়েক জন সহরের আরোহী নিয়ে ওকে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থান গৌড় যেতে হবে, ঘোড়ার ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে তার দানা ও জল সঙ্গে নিয়ে রাত্রি তিনটের সময় সে বের হয়েছে। নিজে এক কলকে গাঁজা টেনে নিয়েছে।

দুই সারি রোপিত আম্রকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে শীর্ণ ঘোড়া ছুটে চলে, থেকে থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে যায়—প্রহ্লাদ ওকে চাবুকের পর চাবুক আঘাত করে তবু সে নড়ে না,—আবার আঘাত,—তবু অনড় অচল ওর পা দু'টি। প্রহ্লাদ ভাবে,—এই পশুগুলো কেন মদ গিলে দৈহিক শক্তি অর্জন করে না? কিন্তু ও যা চেয়েছিল, তা হয়ে উঠলো না,—পশুর স্বাধীন চলার উপর সে হস্তক্ষেপ করতে পারলো না,—স্বাধীন বাঙলার স্মরণীয় রাজধানীর ভগ্নস্তূপ,—গড় আর পরিখা-বেষ্টিত জঙ্গল-আকীর্ণ গৌড়েশ্বর রাজ-প্রাসাদের প্রান্ত ঘুরে সন্ধ্যের পর সে আস্তাবলে ফিরলো।

মহানন্দার নীল জলের তীরে সে আরও তিনটি যাত্রী পেয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহী ঘোড়ার স্তব্ধ পা দু'টি অনড় অচল—এক ইঞ্চিও সে আর নড়বে না। বাড়ী পৌঁছে আস্তাবলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রহ্লাদ হঠাৎ জননীকে দেখে একান্ত ভাবে চমকে উঠলো—

এ কি মা, তুই,—হেথায় আলি যে?"

"কী করি বাপ—" ম্রিয়মাণ মুখে হরিপ্রিয়া বললো—"বাকী খাজনার লাগি প্যায়দা আসি বাড়ী-ঘর পোড়ায়ে দেয়া গেলনে,—প্রাণডা লয়ে পথের মানুষরে শুধাইতে শুধাইতে তুর কাছে পালায়ে আলাম—"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রহ্লাদ ঘোড়ার সাজগুলি খুলতে সুরু করলো। হরিপ্রিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো—"তু খাটে আলি, সহিসকে দে, উ ইবার করবানে।"

প্রহ্লাদ ওর গরিলার মত বিকৃত আকৃতি মুখে একটু হেসে বললো—"আট ক্রোশ রাস্তা লয়ে যাতি যে চাবুক উরে কষছি,—আমারেই সবগুলা বেদ্‌না নামায়ে দিতি হবানে—নতুবা মুখে উ দানা না কাটবি,—ঘোড়া শুকায়ে গেলে বাবু রাগ করবানে—" এবার প্রহ্লাদ ঘোড়াটিকে দলাই-মালাই করতে সুরু করলো।

মা এবার দুঃখ প্রকাশ করে বললো—"তু রাত তিনডা থাকৃতি বার হয়েছিস্, প্যাটে কিছু নাই—চান করে মুখে দুডা ভাত দে বাবা—"

মৃদু হেসেই প্রহ্লাদ বললে,—"আমার কথা ছাড়ি দাও না,—ক্ষিদে-তেষ্টা ভুলায়ে গিছি,—ঘাটের মড়া ছাড়া মুই আর কিছু লয়—"

মা আর কী বলবে? নিরুত্তরে শ্রান্ত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে না, প্রহ্লাদ এত কর্মক্ষমতা কী উপায়ে অর্জন করলে? পান্তা হোক্ বাসি হোক্—দিনে তিন বার ভাত না পেলে যে হাল-আবাদ করতেই পারতো না।

ইদানিং হরিপ্রিয়াকে এমনি ধাক্কা প্রায় পেতে হয়,—আস্তাবলের পাশেই বস্তির মধ্যে সে ঘর ভাড়া নিয়েছে,—মা ও ছেলে থাকে। ননী মোক্তার প্রহ্লাদের খোরাকী বাবদ টাকা নগদ দিয়ে দেয়। হরিপ্রিয়া সকালে পুত্রকে কর্‌করা ভাত দিতে যেয়ে আবার আঘাত পায়। প্রহ্লাদ বলে—"বিহান বেলা ভাত খালি ছরীর ভারী হয়ে যাবানে,—গাড়ী হাঁকাতে না পারব—" মায়ের দৃষ্টির আড়ালে যেয়ে কয়েক কলকে গাঁজা টেনে প্রভূত শ্রমশক্তি অর্জন করে নেয়,—তার পর এক গেলাস ভাঙ, সন্ধ্যের পর এক নিশ্বাসে এক বোতল মদ নিঃশেষে পান করে স্নায়ুতে পরম তৃপ্তির এক অনুভূতি,—ও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠে স্নান করে যখন সমস্ত দিনের পর একবার ভাত খায়,—মা ওর দিকে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না—প্রহ্লাদ এই অমানুষিক শ্রম করবার প্রভূত শক্তি কী উপায়ে অর্জন করলো? হরিপ্রিয়ার জানা ছিল না, এমনি করেই এক দিন দধীচি মুনির পুণ্য হাড়ে বজ্র নির্মিত হয়েছিল, সেই বজ্রেই দেবরাজ ইন্দ্র মহাবলশালী দানবরাজ বৃত্রকে সংহার করেছিলেন।

আস্তাবলে ঘোড়ার খুট-খুট আর হ্রেষা রবের সম্মিলিত শব্দ নির্জন পল্লীকে চকিত করে তুলছিল। এই মূক পশুগুলো কবে প্রাচুর্য নেশার বিনিময়ে প্রভূত দৈহিক শ্রম-শক্তি অর্জন করে পুঁজিপতিদের সঞ্চয়ের ঘর স্ফীত আর সমৃদ্ধ করে তুলবে? সে কবে?

বসুমতী ১৩৫৪

সর্ব্বংসহা

শ্রীপ্রীতিরেণু বসু

বৈশাখের মাঝামাঝি। অসহ্য গরম পড়িয়াছে! গরমের দৌরাত্ম্যে কলিকাতা সহরবাসীরা অতিষ্ঠ। বরং সহরের উপকণ্ঠে ছোট ছোট ফাঁকা মাঠ, পুকুর, গৃহস্থদের বাড়ী-সংলগ্ন বাগান ইত্যাদি থাকায়, গরমের হাত হইতে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কতকটা অব্যাহতি পাইয়াছে।

সুলতাদের বাড়ীখানা সহরের উপকণ্ঠের একবারে শেষপ্রান্তে। সারাদিন অসহ্য গরমের পর বৈকালে গা ধুইয়া, সুলতা পশ্চিমের বাগান-সংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়াইল। অমিতের অফিস হইতে ফিরিতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী, সুলতা একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়ে। সদ্যফোটা বেল, যুঁইয়ের গন্ধ বহিয়া বৈশাখী হাওয়া এক ঝলক বহিয়া যায়। ফুলের সুগন্ধে ক্ষণিকের জন্য সুলতার মনটা বিহ্বল হইয়া উঠে!—কিন্তু সুলতার এই তন্ময়তায় বাধা পড়ে। ঝি বামা আসিয়া ডাকে—"ও বৌদি, পাড়ার গিন্নিরা সব বেড়াতে এসেছেন, এসো না গো।" সুলতার মনটা নিমেষে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; এমন সুন্দর বৈকালটা পাড়ার যত প্রৌঢ়া-বৃদ্ধাদের সঙ্গে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও বাজে প্রসঙ্গে কাটাইতে হইবে ভাবিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে। বামা ডাকে—"এস না গো," সুলতা উঠিয়া পড়ে। সুলতার শ্বাশুড়ী জীবিতকালে পাড়ার গিন্নীদের সদাসর্ব্বদা যাতায়াত চলিত। গিন্নির মৃত্যুর পর অবশ্য সে পাট উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। তবুও ইঁহারা আসেন বলিয়া সুলতাকেও মাঝে মাঝে পাড়ায় বাহির হইতে হয়।

সেদিন পাড়ার গিন্নিরা অনেকেই আসিয়াছেন, পানের ডিবাটি নামাইয়া দিয়া সুলতা একপাশে বসে। দু'চার কথার পর সেনগিন্নি বলেন—"শুনেছ বৌমা, ঘোষগিন্নি ছেলের বিয়ে দিচ্ছে, আসছে শনিবার ভুলোর বিয়ে?" সুলতা বিস্মিত হয়, সে তো কিছুই জানে না! তাহাদের পিছনের বাগান-সংলগ্ন ঘোষেদের বাড়ী। সুলতাদের ভাঁড়ার ঘরের জানালা ও উঁহাদের একখানা ঘরের জানালা রুজুরুজু, (ঘরখানা অবশ্য ঘোষগিন্নির ভাসুরপোর বউ কমলার ছিল) ঘোষগিন্নির মেয়েরা ঐ জানালা দিয়া তো প্রায়ই তাহার সহিত গল্প করে। কেন কি জানি, দুই-তিন দিন উহাদের সাড়া পাওয়া যায় না।

সুলতাকে মৌন দেখিয়া সরকার-গিন্নি বলেন—"কাল পাকা দেখা, শুনছি পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছে—মেয়েও নাকি সুন্দরী! জানি না কোন্ প্রাণে মেয়ের মা-বাপ অমন দুর্দ্দান্ত ছেলের হাতে মেয়ে দিচ্ছে! ভাল চাকরীই করুক আর টাকা রোজগারই করুক, গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে দড়ি-কলসী কিনে দেওয়াও শতগুণে ভাল।"

সরকার-গিন্নির মেয়ে পাঁচী বলিল—"ঘোষগিন্নির গুণের কথাই বা কে না জানে? শ্বাশুড়ী চোখ বুজতে বুজতে, দেওর-জা'কে ভিন্ন করে দিলে, ভাসুরপো নীরদের বিধবা বউ কমলার কি দুর্গতিটাই না করলে? ইদানীং রান্নাবান্না ইত্যাদি সংসারের সমস্ত কাজ

সে-ই করতো। উনি নিজে, ওঁর চার মেয়ে তো শুয়ে বসেই কাটাতেন। তাও কমলা হাসিমুখেই সব সহ্য করে স্বামীর ঘরটুকু আঁকড়ে পড়ে ছিল। তবু পাছে তাকে বিষয়ের ভাগ দিতে হয়—এই ভয়ে ছলছুতো করে সতীলক্ষ্মীকে স্বামীর ভিটে ছাড়া করলে গো! যাবার দিন কমলার কি কান্না! সে কলকাতায় বাপের বাড়ীতেও থাকতে পারলে না, বিধবা দিদিমা কাশীবাসিনী—তাঁর কাছে চলে গেল।"

কমলার প্রসঙ্গ হইতেই সুলতার তাহাকে মনে পড়িয়া যায়। কমলার ও তাহার একদিনে বিবাহ হইয়াছিল, কমলার স্বামী নীরদ ছেলেবেলায় মা-বাপ হারাইয়া ঠাকুরমা ও কাকাদের স্নেহে-যত্নে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছিল, ভাল চাকুরীও পাইয়াছিল। মনের মত কনে খুঁজিয়া ঠাকুরমা কত সাধ করিয়া নাতীর বিবাহ দিয়াছিলেন, বধু কমলা রূপে গুণে সাক্ষাৎ কমলাই ছিল। কিন্তু বিবাহের দেড় বৎসর পর—হঠাৎ কলেরা হইয়া নীরদের মৃত্যু হয়। বিধবা কমলা নিদারুণ শোক বুকে লইয়াই স্বামীর ঘরখানায় পড়িয়া থাকিত। বাপের বাড়ীর শত আহ্বানেও যাইত না। যতদিন বিধবা দিদিশ্বাশুড়ী জীবিত ছিলেন—তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া দিন কাটিতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধার মৃত্যুর পর ঘোষগিন্নির নির্য্যাতনে বেচারী কমলা স্বামীর শত স্মৃতিপূর্ণ তাহার তীর্থস্বরূপ ঘরটি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। সুলতার সহিত গলাগলি ভাব ছিল। আজ কতদিন হইল কমলা ঘরখানা ছাড়িয়া গিয়াছে! সুকুমারের পিসি ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলে—"কর্ত্তা তো এইসব দেখেশুনেই ব্যায়রামে পড়লেন, তাই কি কর্ত্তাকে রোগে ওষুধ দিয়েছে না পথ্যি দিয়েছে? ছি! ছি! পরের মেয়েকে নিয়ে আবার ঘর করবে!" সুলতার মনে পড়িয়া যায় ঘোষকর্ত্তার জীর্ণ শীর্ণ চেহারাখানা! মনে পড়ে—মৃত্যুর দিন-দশেক আগে আসিয়া অমিতের সহিত কত গল্প করিয়া গিয়াছিলেন; সুলতা এক কাপ হরলিকস্ করিয়া দিয়াছিল—তাহা খাইয়া বৃদ্ধের কত আশীর্ব্বাদ!

পাঁচী একখিলি পান মুখে দিয়া বলে—"আমাদের বাড়ী থেকে তো ওদের সব কিছুই দেখা যায়। দেখেছি গো বাপের উপর ছেলেমেয়েদের ছেদ্দা, ভক্তি! ভুলোর এখন টাকা হয়েছে—ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সেদিন তো বড়বোন কুসুমের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া লেগেছিল।"

সুলতা জিজ্ঞাসা করে—"কুসুম শ্বশুরবাড়ী যায় নি?"

পাঁচী ঠোঁট উলটাইয়া বলে—"হুঁ, কুসুম আবার শ্বশুরবাড়ী যাবে? যেমন মা, তেমনি মেয়ে! শুনছি শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে, তারা ছেলেটাকে পাঠায় নি, মেয়ে দুটোকে এনেছে। জামাই খুব ভাল, তাই মাঝে মাঝে আসে। ওদের কথা বলো কেন?"

বামুনগিন্নি নথটা নাড়িয়া বলেন—"ঘোষগিন্নির আইবুড়ো মেয়ে দুটোই কি কম? সেদিন আমাদের রাণুর সঙ্গে কম ঝগড়াটা করলে, ফুল তোলা নিয়ে দুই বোনে? বরং মেজমেয়ে বকুল বেশ ঠাণ্ডা। তিন ননদকে নিয়ে বউয়ের ঘর করা দায় হবে।"

সেনগিন্নি ফোড়ন দিয়া বলেন—"দেওর দুটিও কম হবে না।"

পাঁচী একটু দোক্তা মুখে দিয়া বলে—"কমলার ঘরখানাই বউকে দিচ্ছে। বৌ কেমন ঘর করছে, তুমি খানিকটা জানতে পারবে।"

সুলতা নিঃশ্বাস চাপিয়া বলে—"তাই না কি?"

বৈকাল পড়িয়া যাইতেই মহিলাবৃন্দ বিদায় লইলেন। অমিত তখন অফিস হইতে ফিরে নাই। সুলতা সন্ধ্যা জ্বালাইয়া ভাঁড়ার-ঘরে ঢোকে। কমলার ঘরখানা চোখে পড়িতে সুলতা খানিক সেই দিকে তাকাইয়া থাকে। সে ও কমলা জানালায় দাঁড়াইয়া কত গল্পই না করিত! কমলা ওই ঘরটিকে কেন্দ্র করিয়া কতই না আশার সৌধ গড়িয়াছিল। আবার ওই ঘরটিতে নীরদের শেষশয্যার পাশে উন্মাদিনী কমলা জীবনেব সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে। এখন ওই ঘরটিতে আসিবে এক কিশোরী নববধূ তাহার সরমজড়িত পদে, সলাজকম্পিত বক্ষে শত শত আশা-আকাঙক্ষা লইয়া, ওই ঘরটি মুখরিত হইবে নবদম্পতির কলগুঞ্জনে। নিঃশ্বাস-ফেলিয়া সুলতা প্রদীপটা জ্বালায়। অফিস হইতে ফিরিয়া অমিত বলে—"তুমি অত বিমর্ষ হয়ে আছ কেন সুলতা?" বৈকালের ঘটনাগুলি স্বামীর নিকট বলিয়া সুলতা মনটা হাল্কা করিয়া ফেলে।

শনিবারে সকালে ঘন ঘন শাঁখের রোল শুনিয়া, সুলতার মনে পড়ে আজ ভুলোর বিবাহ। সুলতার প্রতিদিনকার অভ্যাস, ভাঁড়ারে প্রতি জিনিষটি ঝাড়িয়া, মুছিয়া, ফিটফাট করিয়া রাখা। সেদিনও ছেলেমেয়েদের জলখাবার দিয়া, রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সুলতা ভাঁড়ার গুছাইতেছিল। কমলার ঘরের জানালা খুলিয়া ঘোষগিন্নির মেজমেয়ে বকুল ডাকে—"ও বৌদি, শুনছেন?" সুলতা জানালার কাছে আসিয়া বলে—"কবে এলে বকুল? ভাল আছ তো?" বকুল বলে—"কাল বিকেলে এসেছি বৌদি, মোটে সাতদিন ছুটী পেয়েছেন—আসছে সপ্তাহেই যেতে হবে। বিদেশে থাকার কম অসুবিধা ভাই!" একটু থামিয়া বকুল যেন একটু লজ্জিত ভাবে বলে—"এমন সময় দাদার বিয়েটা হলো ভাই, পাঁচজনকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ—কিছুই করা গেল না। বে-আইনী কাজে দাদার চিরকাল ভয়—জানেন তো? পাছে পুলিশের কোন হাঙ্গামা হয়—এই ভয়ে যে কটী লোক বলা যেতে পারে,—মাসী-পিসীরা, মামার বাড়ী—এই কটী লোককে বলা হয়েছে। মা কত দুঃখ করছিলেন, পাড়া বাদ দিয়ে কখনও ক্রিয়াকর্ম্ম হয় নি। আজ সকালেও বলছিলেন—পাশে বৌমাকে বলতে পারলাম না। আমাদের বে'থাতে শেষ পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে গুছিয়ে কাজ তুলেছেন বড়বৌদি ও আপনি—তাই কাল থেকে এসে পর্য্যন্ত বড়বৌদির কথাটাই বারে বারে মনে পড়েছে!" বকুলের গলার স্বরটা ভারি হইয়া আসে;—সে সামলাইয়া বলে—"যা হবার হয়ে গেছে। ঘরের বউ ঘরে থাকবে। পরে কত আমোদ-আহ্লাদের দিন পাওয়া যাবে।" এখন কনের গায়-হলুদের জিনিষগুলো দেখে নিন—জানালাটা খুলে দিই। কাল বেলা দু'টার আগে, কনে আসবে, কিংবা বেলা পাঁচটার পর। মাঝে কাল বেলা পড়বে। জিনিষগুলো দেখুন, আমি আসছি।" জানালাটা খুলিয়া দিয়া বকুল চলিয়া যায়। ঘরের সব জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়ায়—সদ্য কলি-ফেরান ঘরে আলো আসিয়া ঘরখানা যেন ঝলমল করিতেছে! ধবধবে দেওয়ালে সুদৃশ্য দেয়ালপঞ্জী ও ভুলোর বাবার একখানি আবক্ষ অলোকচিত্র মাত্র। পরিচ্ছন্ন, তকতকে মেঝের উপর ট্রে'তে সাজানো রংবেরংয়ের শাড়ী-ব্লাউস, সেন্ট-সাবান, প্রসাধনের দ্রব্যাদি, লিখিবার সরঞ্জাম, শেলাইয়ের বাক্স ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিষ বেশ গুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুলতা জিনিষগুলির প্রশংসা করে।

বেলা তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে—অফিস, স্কুলের ভাতের তাড়ায় সুলতা রান্নাঘরে ব্যস্ত—সুলতার বড় মেয়ে মীনা ডাকে—'ও মা, শীগগির এসো, ওদের গায়-হলুদ যাচ্ছে।' সুলতা হাতের কাজ ফেলিয়া দ্রুতপদে ছাদে যায়, সুলতাদের ছাদ হইতে ভুলোদের সদর দেখা যায়। গায়-হলুদের তত্ত্ব চলিয়াছে—গোলাপী রংয়ের ছোপানো ধুতি-চাদরে সাজিয়া-গুজিয়া সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছে পাড়ার সার্ব্বজনীন নাপিত শ্যামাপদ—তাঁহার কাঁধে ঝুড়িতে দশসের আন্দাজ একটা মাছ, মাথায় সিঁদুর মাখানো—মুখে পান গোঁজা; কাঁখে একটা কাঠির মাদুর। শ্যামাপদর পাশে তাহার ছেলে নরহরির হাতে একটা থালায় তেল-হলুদের বাটি ও ফুলের মালা ইত্যাদি। আরও আট-দশজন ঝি-চাকর ঐ রংয়ের কাপড় পরিয়া চলিয়াছে বিচিত্র খঞ্চিপোষঢাকা ট্রে, থালা ইত্যাদি লইয়া; খঞ্চিপোষগুলি প্রায় সবই কমলার হাতের তৈয়ারী। কতদিন কমলা আসিয়া তাহার নিকট শেলাই শিখিয়া যাইত! পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িয়া মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়।

সুলতা পরদিন দুপুরে কাজকর্ম্ম সারিয়া অভ্যাসমত কোলের খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া নিজে শুইয়া পড়ে। ঘুম আসিতে চায় না, দু'টার মধ্যে ভুলোর বউ আসিবে ভাবিয়া একটা শেলাই লইয়া বসে। বেলা সাড়ে তিনটার সময় উচ্চ শাঁখের রোল শুনিয়া হাতের শেলাই ফেলিয়া সুলতা ছাদে যায়। ঘোষেদের বাড়ীর সুমুখে সদর রাস্তায় ফুলে-মোড়া মোটরে বর-কনে আসিয়া থামিয়াছে। ঘোষগিন্নি বাদে বাড়ীর সবক'টি লোক কনের অভ্যর্থনায় আসিয়া সদরে জমা হইয়াছে। পাড়া ঝাঁটাইয়া বালক-বালিকার দল, ওপাশের খোট্টাপাড়া হইতে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ইত্যাদি সব বয়সের মেয়েছেলে বর-কনে দেখিবার প্রবল ঔৎসুক্যে ছুটিয়া আসিয়াছে। আশেপাশের বাড়ীগুলির ছাদ, জানালা ও বারান্দায় ছোট-বড় সকল বয়সী মেয়ের দল কনে দেখিবার আগ্রহ লইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জংলা বেনারসীর আঁচলখানা গায়ে জড়াইয়া কুসুম গম্ভীরমুখে কনের হাত ধরিয়া নামায়, ছোটখাট বধূটিকে চকিতের মধ্যে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাওয়ায় কেহই ভাল করিয়া দেখিতে পায় না।

সুলতা কনে দেখিবার আশায় ভাঁড়ারের জানলায় মুখ বাড়ায়, কিন্তু কনে দেখিবার পরিবর্ত্তে কুসুমের রাগত কণ্ঠ শোনে—"কি আক্কেল বাপু কনের মার, ভর কালবেলায় বরকনে পাঠিয়ে দিলে?" বকুলের চাপা কণ্ঠ শোনা যায়—"বার বার বলছি দিদি চুপ করো, কনের বাড়ীর কারু দোষ নেই। পথে মোটরের টায়ার ফাটায় এই বিভ্রাট হয়েছে। বরং তুমিই ভুল করেছ, সোণার জল দিয়ে চোখ না ধুইয়ে কনেকে নামালে। বড় বৌদির বেলাতেও তুমি এই ভুলটুকু করেছিলে...।" আর কিছু শোনা যায় না। কনে দেখিবার আশা ছাড়িয়া দিয়া সুলতা বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থায় মন দেয়।

সেদিন অফিস হইতে ফিরিয়া অমিত জানায়, সুলতার মা ২।৩ দিন পরে কাশী যাইতেছেন, এখন ছেলে-মেয়েদের ছুটী আছে স্কুলের, তাহাদের লইয়া সুলতা দিন কতকের জন্য কাশীটা বেড়াইয়া আসুক। সুলতা কখনও কাশী দেখে নাই। মায়ের অনুরোধে সে সহজেই রাজি হইয়া গেল।

পরদিন ঘোষবাড়ীতে বউভাতের উৎসব লাগিয়া যায়। সারাদিন কাশীযাত্রার উদ্যোগে সুলতার কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার দিকে ভাঁড়ারে কাজে আসিয়া সুলতা বকুলের ডাক শোনে—"ও বৌদি, এদিকে আসুন না ভাই, জা কেমন হ'লো দেখুন।" সুলতা আসিয়া জানলায় দাঁড়ায়—লাল টুকটুকে বেনারসী পরা, গয়নায় মোড়া, ছোটখাট, গোলগাল, ফর্সা কনেটিকে দেখিতে সুলতার ভালই লাগে। কোঁকড়া চুলের নীচে সুষমামণ্ডিত মুখখানি—টানা টানা চোখ দু'টীর নিবিড় চাউনী দেখিয়া সুলতার কেমন একটা স্নেহ জাগে কিশোরী বধূটির উপর। সস্নেহভাবে সুলতা বলে—"মুখখানা তোল তো ভাই, তোমার নামটি কি? আমার কাছে লজ্জা করতে হবে না, আমি দিদি হই।" বকুল সুলতার কথায় সায় দিয়া বলে—"ওর কাছে তোমার ভয় বা লজ্জা করতে হবে না বৌরাণী, উনি আমাদের বৌদি হন। আমাদের সকলকে খুব ভালবাসেন। আমার মতই ওঁর কাছে তুমি স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা বলতে পারবে।" নতমুখী বধূ ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিয়া বলে—"আমার নাম সন্ধ্যারাণী।" মুকুল আসিয়া ডাকে—"ও মেজদি, শীগ্‌গীর বৌরাণীকে নিয়ে এসো, দাদার একজন বন্ধু এসেছে।"—"যাই তবে বৌদি।" বলিয়া কনেকে লইয়া বকুল চলিয়া যায়। সুলতা নিজের কাজে মন দেয়।

অনেক রাত্রে ঘন ঘন শাঁখের বোল শুনিয়া, সুলতা উঠিয়া পড়ে। ফুলশয্যার অনুষ্ঠানটা একবার দেখিবার জন্যই সে জাগিয়া ছিল। ভাঁড়ারের জানালা দিয়া উঁকি মারে। উহাদের জানালাগুলি খোলাই ছিল। কনের বাড়ীর নূতন আসবাবগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ফুলে মোড়া খাটে সাদা ধবধবে বিছানা—মেঝেতে সবুজ গালিচার উপর বর-কনেকে বসাইয়া তরুণীর দল হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া ফুলশয্যার নিয়ম কর্ম্মগুলি করাইতেছে। কৌতূহলভরে সুলতা খানিক দেখে। সহসা নবকিশলয়ের মত ফুলাভরণা কিশোরী বধূটির পাশে, বরবেশী ভুলোর রুক্ষ কর্কশ শ্রীহীন চেহারার পানে চাহিয়া সুলতার মনটা এত পীড়িত হয় যে, সে জানালাটা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসে।

সুলতার কাশীযাত্রার দিন বৈকালে বকুল সুলতার সহিত দেখা করিতে আসে। কিছুক্ষণ থাকিয়া বিদায় লইবার সময় সুলতার হাত দুটী ধরিয়া মিনতি করিয়া বলে,—"ভাই বৌদি, আপনাকে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি। কাশী থেকে এসে আপনি নূতন বৌকে ডেকে একটু কথাবার্ত্তা বলবেন। বেচারী বড়ই শান্ত নিরীহ—অনেকটা বড় বৌদির মত ভালমানুষ, আর দাদা তার বিপরীত; আমার ভাইবোন ক'টিকে তো চেনেন, কি রকম দুর্দ্দান্ত রাগী সব, আবার দিদিও এখন এইখানে থাকলেন। বৌ তো সর্ব্বক্ষণ আমার আঁচল ধরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমি তো চলে যাব, বছরে তো একবার আসি। ঘর করতে হবে ওকে এদের নিয়ে, কি করে মানিয়ে চলবে—ভেবে পাচ্ছি না। দেওয়া-থোওয়া নিয়ে মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ওরাও সব এর মধ্যে ঠারেঠোরে বৌকে নানা কথা শোনাচ্ছে—তবু আমি রয়েছি।" সুলতা বলে—"আমার দিক্ থেকে তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দেবার ত্রুটি হবে না ভাই। তবে তোমাদের বাড়ী আসা-যাওয়াটা আমার বেশী হবে না। জানলা দিয়ে কথা বলবো।" বকুল সুলতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নেয়।

যাই যাই করিয়া প্রায় সাড়ে তিন মাস কাশীতে কাটাইয়া সুলতা ছেলেমেয়েদের লইয়া ফিরিয়া আসিল। গৃহকর্ত্রীর এতদিনের অনুপস্থিতির সুযোগে, বাবুর কাজটা কোন রকমে চালাইয়া, ঝি-চাকরের দল যে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া বেড়াইয়াছে—গাড়ী হইতে নামিয়া ঘরদোরের অবস্থা দেখিয়া সুলতার বুঝিতে বাকি থাকে না। আসবাবপত্রের উপর জমা ধূলা, ঘরের কোণে কোণে ঝুল ইত্যাদি, চারিদিকে অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সুলতার গা ঘিন ঘিন করে। তখনি ইচ্ছা হয়—ঝাঁটা লইয়া ঘরদোর ঝাড়ামোছায় লাগিয়া যায়। সে রাত্রি কোনরকমে কাটাইয়া, পরদিন সকাল হইতেই ঝাঁটা হাতে সুলতা ঝি-চাকরদের লইয়া ধূলা সাফ করিতে লাগিয়া যায়। প্রায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘরদোরের পূর্ব্বশ্রী ফিরিলে—সুলতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্নান করিতে যায়। স্নান সারিয়া ফিরিয়া দেখে—পাড়ার কয়েকজন গিন্নীরা বেড়াইতে আসিয়াছেন। পাঁচীও বলে—"এস বৌদি। কেমন কাশী বেড়িয়ে এলে—খবর নিতে এলাম।" সুলতা স্মিত হাসিয়া আসিয়া বসে। প্রায় ঘণ্টাখানেক একথা সেকথার পর পাঁচী বলে—"ঘোষবাড়ীর খবর শুনেছ বৌদি?" সুলতা বলে—"সবে কাল এসেছি, গোছগাছ করতে ব্যস্ত ছিলাম, খবর নেবার অবসর পাইনি।" পাঁচী একটু দোক্তা মুখে ফেলিয়া দিয়া বলে—"সে এক ব্যাপার চলছে! ঘোষগিন্নি কচি বউটাকে এমন কষ্ট দিচ্ছে—দেখলে অবাক্ হবে বৌদি। এক মাস হলো রাঁধুনী চলে গেছে। নতুন বউকে দিয়ে রান্নাবান্না এদিকে সমস্ত কাজকর্ম্ম সব করাচ্ছে। কেউ রান্নায় যায় না। ভালমন্দ খেতে দেয় না। বেচারী রোগা কাঠ হয়ে গেছে। আহা! তার ঘরে-বাইরে পীড়ন! ভুলো কি কম শাস্তি দেয়! এতটুকু কাজের ত্রুটী হলে সকলের সাক্ষাতে তেড়ে যায়, মারে আর কি! এইতো সেদিন বিয়ে হয়েছে। বৌয়ের দাদারা এলে দু'দণ্ড কথা বলতে দেয় না। মা কতবার নিয়ে যাবার কথা বলে পাঠায়। নানা অছিলা করে বৌ পাঠায় না। এদিকে ভুলো বেশ মিষ্টিমুখে শ্বাশুড়ীর মন রেখে তত্ত্ব আদায় করে, নিমন্ত্রণ খায়; মেয়ের যে এত কষ্ট—তারা জানতেও পারে না!" সুলতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—"আহা! অতটুকু মেয়ের এত লাঞ্ছনা!" পাঁচীরা বিদায় লয়। অমিত অফিস হইতে ফিরিলে, সুলতা জলখাবারের রেকাবটা হাতে দিয়া বলে—"শুনছ গো, ভুলোর বউকে ওরা নাকি বড্ড কষ্ট দেয়।" খাইতে খাইতে অমিত বলে—"শুনলাম বটে শ্যামাপদর কাছে, কামাতে এসে বলছিল: তত্ত্ব পছন্দ হয়নি বলে গিন্নি বৌকে একদিন মাত্র জোড়ে পাঠিয়েছিল, আর যেতে দেয়নি।" অমিত বেড়াইতে চলিয়া যায়। সুলতা সন্ধ্যা দিতে ভাঁড়ারে ঢোকে। সন্ধ্যা জ্বালাইয়া, ভুলোর ঘরের জানালায় বধূটিকে বসিতে থাকিতে দেখিয়া, সুলতা জানলায় আসিয়া বধূটিকে ডাকিয়া বলে—"কি করছ ভাই, কেমন আছ?" সুলতার স্বরে বধূটি চম্‌কাইয়া উঠিয়া চোখ দুটী আঁচলে মুছিতে থাকে। আলোটা জ্বালিয়া সুলতা বলে—"চিন্‌তে পারছ না ভাই? আমি এখানে ছিলাম না, কাল এসেছি।" বধূ সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলে—"অন্ধকার ছিল বলে আপনাকে চিনতে পারিনি। অন্য কেউ মনে করে ভয় পেয়েছিলাম। মেঝ ঠাকুরঝি বলে গেছেন, এখানে একমাত্র আপনাকে..." সুলতা হাসিয়া বলে—"ভুলো ঠাকুরপোর চেয়েও বন্ধু বলে জানবে।"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলে—"হ্যাঁ, তার চেয়ে তো নিশ্চয়। দয়া করে এই সময় আপনি একবার করে জানালায় এসে দাঁড়াবেন। এক একদিন আমি এই সময়টা সম্পূর্ণ একা থাকতে পাই। শ্বাশুড়ী-ননদরা বলে দিয়েছে—কারো সঙ্গে কথা কইলে ভীষণ শাস্তি পাবো। তাই তাদের লুকিয়ে একটু আপনার সঙ্গে কথা বলে মনটা সুস্থির করবো। আজ তিন মাস মায়ের কাছ ছাড়া। তাঁকে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখবার ক্ষমতা আমার নেই। দাদারা এলে সকলের সাম্‌নে কথা বলতে হয়। মেজ ঠাকুরঝিকে চিঠি লিখলে, ননদরা পড়ে তবে সে চিঠি পোষ্ট করে।" আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সন্ধ্যা বিদায় লয়। সন্ধ্যার কথাগুলি যা শুনিল, পাঁচীর কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। সুলতার মনটা কেমন করিতে থাকে।

ইহার পর সুলতা প্রতিদিনই সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় আসিয়া জানালায় দাঁড়ায়। যেদিন দেখা পায়—সন্ধ্যা তাহার সুখদুঃখের কাহিনী সুলতাকে শোনায়,—সন্ধ্যারা দুইভাই ও সন্ধ্যা একমাত্র বোন। মাত্র এক বৎসর হুইল সন্ধ্যার বাবা মারা গিয়াছেন। তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করিয়া মেয়েকে মনের মত করিয়া সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। মায়ের চিরকালের সাধ—মেয়েকে অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ দেন। দুই দাদা নিজেরা নিঃসম্বল হইয়া এমন কি দেশের ভিটাটুকু অবধি বেচিয়া বোনের বিবাহ দিয়াছেন। বোন সুখে থাকিলেই তাহাদের সুখ। মা ও দুই ভাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়া মনে এই আশা লইয়া আছেন। তাহাদের সন্ধ্যা সুখে আছে। সন্ধ্যার লাঞ্ছনার কথা জানাইতেও সন্ধ্যার মন সরে না। মা হয়ত এ আঘাত সহ্য করিতে পারিবেন না।

আরও কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। পূজার সময় সন্ধ্যার বাপের বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই। সুলতার স্নেহটুকু অবলম্বন করিয়াই তাহার দিনগুলি কাটিতেছে নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া। সুলতার ইচ্ছা করে—ঘোষেদের বাড়ী গিয়া সন্ধ্যার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করে। কিন্তু পাড়া-বেড়ানোয় তাহার প্রবৃত্তি হয় না। পূজার পর হইতে প্রায় মাসখানেক সন্ধ্যাকে দেখিতে পায় না। একদিন পাঁচী বেড়াইতে আসিয়া বলে—"মুকুলের বিবাহের ঠিক হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রথমেই বিবাহ। সন্ধ্যার ঘাড়ে পড়িয়াছে, ফুলশয্যার তত্ত্বের যত শেলাইয়ের ভার। বেচারী একেবারে বিশ্রামের সময় পায় না। ইহার উপরে কি একটা সামান্য অপরাধে সেদিন ভুলো সন্ধ্যাকে সারা দিনরাত্রি অনাহারে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।' সুলতা নির্ব্বাক্ হইয়া, বেচারী সন্ধ্যার দুরদৃষ্টের কাহিনী শোনে। সন্ধ্যার দেখা না পাওয়ার কারণও বুঝিতে পারে।

আবার বৈশাখ ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হয় নাই। সুলতার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, অজস্র ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ধ্যা নিজের নির্য্যাতনের কাহিনীগুলি বিবৃত করে। সুলতা তাহাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দেয়, নানান রকম গল্প করিয়া তাহার মনটা প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করে। আর দুই মাস কাটিয়া যায়। আষাঢ় মাস। আকাশে ঘনঘটা মেঘের বিরাম নাই। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া সুলতা অভ্যাসমত জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়। প্রায় ২০।২২ দিন পর সন্ধ্যাকে জানালায় দেখিতে পায়। দু'চারটি কথার পর সুলতা সহসা জিজ্ঞাসা করে—"সন্ধ্যা, তোমাকে এত শ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন? সারাদিন কি উপোস

করে আছ?" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিত ভাবে সন্ধ্যা বলে—'দুপুরে ভাতে কম পড়ে গিয়েছিল বলে খাওয়া হয় নি। রাত্রে রান্না হবে না। ওঁরা সকলে নিমন্ত্রণে গেছেন। আমার মুড়ি কেনা আছে, তাই রাত্রে খাবো। আপনার সঙ্গে গল্প করবো বলে, নানা ছুতো করে যাই নি। অবশ্য ওঁরাও আমায় না নিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।" একটা অসহায় কিশোরী মেয়ের উপর এরূপ বর্ব্বর অত্যাচার দেখিয়া সুলতা স্তম্ভিত হয়। কি ভাবিয়া সন্ধ্যাকে বলে "তোমাদের খিড়কীর দোরটা খুলে দাও; বাড়ীতে কেউ নেই, তোমার কাছে বসে খানিক গল্প করা যাবে। আমি যাচ্ছি।"—"সত্যি আসবেন?" পুলকিত হইয়া সন্ধ্যা প্রায় ছুটিয়া দোর খুলিতে নীচে যায়।

সুলতা একটা থালায় লুচি, তরকারী, আম, মিষ্টান্ন, একবাটি দুধ প্রভৃতি লইয়া খিড়কীর দোর দিয়া ঘোষেদের বাড়ীতে ঢোকে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া অভুক্ত মেয়েটিকে খাওয়াইয়া, নানান গল্প করিয়া বুঝাইয়া, ভুলাইয়া, সুলতা বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়ে। কিন্তু দুঃখিনী সন্ধ্যা সুলতার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সুলতা সান্ত্বনা দেয়—"কেঁদ না সন্ধ্যা, আবার জানালায় দু'জনের দেখা হবে।" সন্ধ্যা বলে—"আগেই তো বললাম দিদি, সেজ ননদ এসেছে, ও এখন পূজা পর্য্যন্ত থাকবে। সে সর্ব্বক্ষণ গোয়েন্দার মত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে আমার উপর—কখন কি করছি। আবার ভাই এলে—আমার গতিবিধির রিপোর্ট তার কাছে যায়, তিনি বিচার করে শাস্তির বিধান করেন। তোমরা দেবতার মত স্বামী পেয়েছ দিদি, এ হতভাগিনীর দুঃখ তোমরা বুঝবে না। শ্বাশুড়ী-ননদের শত লাঞ্ছনা হাসিমুখে সহ্য করে যেতাম, যদি এতটুকুও স্নেহের কণা স্বামীর কাছে পেতাম। সেদিন জ্বরের ঘোরে পড়ে ছিলাম—উপরে থাকতে দিলে না, নীচের ঘরে পাঠিয়ে দিলে। জলতেষ্টায় গলা শুকিয়ে যায় রাত্রে, এক ফোঁটা জল পাইনি। সময় সময় মনে হয়—মার কাছে চলে যাই; কিন্তু তাঁরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ভাল বাড়ী ছেড়ে তিনজনে একটা মাত্র ঘর ভাড়া করে আছেন। রোজগারের অর্দ্ধেক অংশ চলে যায় আমারই বিয়ের দেনা শোধের জন্য। তবু তাঁদের শান্তি মনে করে আমি পরম সুখে আছি। তাঁদের এই ভুল ভেঙে দিয়ে কেন তাঁদের বুকে বজ্র হানি, কেন তাঁদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকি! যে কটা দিন ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারি—থাকি। তারপর সব পথই তো খোলা আছে।" সুলতা সন্ধ্যার কথার ভাবে কেমন একটা আশঙ্কা বোধ করে। সন্ধ্যার চোখ দুটী মুছাইয়া দিয়া বলে—"কেঁদ না ভাই, মনকে যতটা পারো শান্ত রাখতে চেষ্টা করো, আমার দ্বারা তোমার যতটুকু সাহায্য হয়—নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না, আমাকে তোমার আপন দিদি বলেই জেন।" সন্ধ্যা সুলতার পায়ে প্রণাম করিয়া বলে—"আপন দিদি বলে জানি ও আপনার স্নেহটুকু পেয়েছিলাম বলেই এতদিন এদের বাড়ীতে থাকতে পেরেছি।" সুলতা বিষণ্ণভাবে বিদায় লয়।

ইহার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে ঝড়বৃষ্টির গর্জ্জনে, সুলতার ঘুম ভাঙিয়া যায়। মনে পড়ে—ভাঁড়ারের জানালাটা খোলা! বৃষ্টির ঝাঁটে সমস্ত জিনিষ ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া সুলতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভাঁড়ারে আসে। জানালা বন্ধ করিতে গিয়া সুলতার

কানে যায়—বর্ষণের শব্দ ভেদ করিয়া পুরুষ কণ্ঠের গর্জ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠের চাপা আর্ত্তনাদ। সন্ধ্যার নির্য্যাতনের পালা চলিতেছে—সুলতার বুঝিতে বাকী থাকে না। সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসে।

দু'তিনদিন পরে সেদিন বৈকালে সুলতা ভাঁড়ারের কাজ করিতে করিতে সন্ধ্যার "দিদি দিদি" ডাক শুনিয়া জানালায় দাঁড়ায়, বলে—"আজ এমন অসময়ে সন্ধ্যা?" সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে বলে—"ওরা সব সিনেমা দেখতে গেছে, কেবল মেজ দেওর নীচে ঘুমুচ্ছে। এই সময় দয়া করে মীনাকে একবার একটা খাম দিয়ে পাঠিয়ে দিন না দিদি। ঠিকানাটা লিখে, চিঠিখানা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি পোষ্ট করে দেবেন।" সন্ধ্যার স্বরে অজস্র কাতর মিনতি ঝরিয়া পড়িতেছিল। সুলতা বলে—"এই সামান্য জিনিষের জন্য এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ভাই, আমি মীনাকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি, চিঠি দাও, ঠাকুরকে দিয়ে এখনি পোষ্ট করিয়ে দেব।" সুলতা মীনার হাতে একটা খাম ও শাল পাতায় চারটি সন্দেশ মুড়িয়া দিয়া বলে—"কাকীমাকে বলিস্ সন্দেশগুলো খেয়ে দেখতে—মা নিজের হাতে তৈরী করেছেন। দেখিস্ গোলমাল করিস্নি। নীচের ঘরে গুপী ঘুমচ্ছে, তোকে যেন দেখতে না পায়!" মাথা নাড়িয়া মীনা চলিয়া যায়। চিঠিখানা আসিলে ঠাকুরকে ডাকবাক্সে ফেলিতে দিয়া সুলতা নিশ্চিন্ত হয়। সন্ধ্যার সহিত আর দেখা হয় না।

পরের দিন দুপুরে প্রতিদিনকার মত কাজকর্ম্ম সারিয়া সুলতা খোকাকে লইয়া ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ একটা কিসের দারুণ কোলাহলে সুলতার ঘুম ভাঙিয়া যায়! উৎকর্ণ হইয়া সুলতা শোনে—ঘোষদের বাড়ী হইতে একটা আর্ত্ত কলরব আসিতেছে—"ভাঙো, দরজা ভাঙো", "আগুন", "ফায়ার ব্রিগেডে খবর দাও!" সুলতা ধড়মড় করিয়া উঠে ও ছুটিয়া ছাদে যায়। দেখে, সন্ধ্যার ঘরের উপরের ঘুলঘুলি দিয়া, কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। পাড়ার ছেলেরা সশঙ্কিতভাবে ছুটাছুটী করিতেছে—কি করিয়া আগুন নেভানো যায়। বাড়ীর পুরুষেরা অধিকাংশই অফিস-স্কুলে, বাকি যাহারা ছিল—এবাড়ী-ওবাড়ী খবর দিতে ছুটিতেছে। সহসা ঘোষগিন্নি পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া সদর রাস্তায় নামিয়া পড়েন, অদূরে পথের কাজে নিযুক্ত মজুরদের চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলেন—"ওগো, তোমরা কুড়ুল গাঁইতি যা নিয়ে পারো এসে আমার ঘরের দরজা ভাঙো। ঘরের ভিতর আগুন লেগেছে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, খোলা যাচ্ছে না।" কয়েকজন মজুর হাতের গাঁইতি, কুড়াল—যে যা পারিল লইয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে পর পর পাঁচখানা ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া ঘোষেদের বাড়ীর সুমুখের রাস্তায় থামে। সুলতা বিস্ময়ে, আতঙ্কে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে আসিয়া ভাঁড়ার ঘরে ঢোকে, সন্ধ্যার ঘরের দরজায় তখন দমাদ্দম কুড়ুল পড়িতেছে। এদিকের জানালাগুলি সব বন্ধ। সুলতা ছুটিয়া আবার ছাদে যায়। ফায়ার ব্রিগেডের শব্দে আতঙ্কিত হইয়া দলে দলে লোক তখন ঘোষেদের বাড়ীর সুমুখের রাস্তা ছাইয়া ফেলিয়াছে, দু'চারজন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াও গেল। ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলিয়া উঠে—"ওহে, শীগগীর মেডিকেল কলেজে ফোনটা করে দাও।" একটী ছেলে ছুটিতে ছুটিতে দত্তদের

বাড়ী ফোন করিতে ঢোকে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া হাজির হয়। জনতার বিস্ফারিত, শঙ্কাকুল দৃষ্টির সাম্‌নে সন্ধ্যার অর্দ্ধদগ্ধ, নগ্ন দেহ ষ্ট্রেচারবাহিত হইয়া অ্যাম্বুলেন্সে উঠে। দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া সুলতা নীচে আসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়ে।

রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। অমিত সুলতার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে,—"আর কেঁদ না লক্ষ্মীটি, কিছু না খাও, অন্ততঃ এক গ্লাস সরবৎ খাও।" স্বামীর একান্ত অনুরোধে সুলতা চোখেমুখে জল দিয়া এক গ্লাস সরবৎ খায়। সুলতা একটু সুস্থির হইলে, অমিত বলে—"পাড়ায় শুনলাম—মেয়েটি নাকি ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে, তিন চারখানা কাপড়, এমন কি পাছে আগুন নিভে যায়—একখানা লেপ পর্য্যন্ত জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়েছিল! প্রথমটায় কেউ টের পায়নি। অনেকক্ষণ পর পুতুল কি রকম করে জানতে পেরে সকলকে ডাকে। পাছে আত্মহত্যা প্রকাশ পায়, পুলিশ কেস হয়—এই ভয়ে ওরা তাড়াতাড়ি ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেয়। আরও শুনলাম—এই ঘটনার পরই নাকি মেয়েটির দাদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে, ওরা বেলা দু'টার সময় সন্ধ্যার চিঠিখানা পায়, চিঠিতে লিখেছিল মাকে—'যে জ্বালায় জ্বলছি মা, আগুনের জ্বালা তার কাছে বরফের মত ঠাণ্ডা। তাই আগুনের আশ্রয় নিয়ে বাবার কাছে চলে গেলাম। আমার জন্য কেঁদ না। আমার অভিশপ্ত জীবনের জন্য কাউকেই দায়ী করো না, আমার ভাগ্যই অভিশপ্ত। তোমাদের একবার শেষ দেখা দেখতে পেলাম না, দুঃখ রয়ে গেল!" এখানের ব্যাপার শুনেই ভদ্রলোক মেডিকেল কলেজে যায়, কিন্তু তখন সব শেষ! পাড়ার সকলে একবাক্যে ঘোষেদের ধিক্কার দিচ্ছে।" সুলতা চোখ মুছিয়া বলে—"ও চিঠি তো আমার হাত দিয়ে গিয়েছিল, তখন কি জানি চিঠিতে এই সব লিখেছে! জানলে হয়ত কোন উপায় করা যেত—বাপের বাড়ীতে খবর দিয়ে।"

সন্ধ্যার মৃত্যুর পর একমাস কাটিয়া গিয়াছে। শ্রাবণের মাঝামাঝি। সেদিন রবিবার, অফিস-স্কুলের ছুটী বলিয়া কাজকর্ম্মের তাড়া নাই। সুলতা অলসভাবে বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের জনস্রোত দেখিতেছিল। হঠাৎ তাহার চোখে পড়ে—শ্যামা নাপিতের ছেলে নরহরি এক হাতে একটা ছোট থালায় তেল-হলুদের বাটি, গামছা, শাড়ী ও অন্য হাতে একটা আধসের আন্দাজ মাছ এবং বগলে একটা কাঠির মাদুর লইয়া ঘোষেদের বাড়ী হইতে বাহির হইল। পিছনে ভুলোর মেজ ভাই গুপী। সুলতা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যায়। সেই সময় অমিত আসিয়া বলে—"কি এত মনোযোগ দিয়ে দেখছ গো?" সুলতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলে—"ভুলোর আবার বিয়ে গো, গায়হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যাচ্ছে, তাই দেখছিলাম।" অমিত সবিস্ময়ে বলে—"বল কি গো?" রাস্তার অদূরে নরহরির সহিত গুপীকে যাইতে দেখিয়া অমিত বলে—"কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরং!"

প্রবর্ত্তক ১৩৫৫

মেয়ে

সুরুচি সেনগুপ্ত

গ্রামখানা যেন জনশূন্য হ'য়ে গেছে, সন্ধ্যাবেলায় কোনো বাড়ীতে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে, কোনো বাড়ীতে জলে না। গোয়ালঘরে কঙ্কালসার গরুগুলো চোখ বুজে ব'সে থাকে, জাবর কাট্‌বার মত জীবনীশক্তিও যেন তাদের নেই। পাঁজর বের করা কুকুরগুলো পথের ধুলো শুঁকে শুঁকে বেড়ায়, কখনো গাছতলায় ব'সে জিভ বের ক'রে ধুঁকতে থাকে।

রাত হ'য়েছে। সুষুপ্ত রাত্রির তিমিরস্তব্ধ প্রহর। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চাঁদ মাথার উপরে উঠে এসেছে। খণ্ড খণ্ড মেঘ ব্যস্ত হ'য়ে আকাশের এদিক্-ওদিক্ কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়।

হঠাৎ শাখী জেগে ওঠেঃ 'বাবা!'

বৃদ্ধ যোগজীবন অপ্রস্তুত হ'য়ে বলে, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে মা, কলসীতে জল আছে নাকি দেখ্‌ছিলাম—'

—'জল নেই বাবা, কাল আর দীঘিতে জল আন্‌তে যেতে পারিনি, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।'

যোগজীবন সব বোঝে ঃ 'কেন রে? জমিদারবাড়ীতে কাল ভাতের ফ্যান পাস্‌নি বুঝি?'

—'না বাবা, কাল ফ্যান দিলে না, বলে—দেশে কাঙালের অভাব নেই, সবাইকেই তো দিতে হবে। রোজ একজনকে দেব কেন?'

—'বোস বাড়ীতে গেলিনে কেন?'

—'ওরা এখন আর ভাতের ফ্যান গালে না বাবা, ফ্যান না গাল্‌লে ভাতে নাকি খুব আয় দেয়।'

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। শাখী বলে, 'তেষ্টার সময় একটু জলও খেতে পেলে না বাবা।'

—'থাক্—ভোর হ'য়ে এলো, মুখ ধুতে গিয়ে পুকুর থেকে খেয়ে আস্‌ব'খন।'

—'না না, ও পুকুরের জল তুমি মুখেও দিয়ো না বাবা, ওদের বাড়ীর কাঙালী কলেরায় ম'রেছে, তার ময়লা সব ঐ পুকুরে ধুয়েছে। ঐ জল খেয়ে মা গেলেন, তুমিও তো যেতে ব'সেছিলে, আয়ু ছিল তাই বেঁচেছো, ও জল তুমি খেয়ো না।'

যোগজীবন বলে, 'কাঙালীর মত আমিও যদি ম'র্‌তে পারতাম! ও তো মরা নয়, ওই তো বাঁচা। তোর মা ভাগ্যবতী ছিলেন, দু'বার ভেদবমি ক'রেই চোখ বুজ্‌লেন। রোগের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে উপোস ক'রে মর্‌বার জন্যে বেঁচে উঠ্‌লাম আমি। তুই চ'লে গেলে ঐ পুকুরের জলই তো আমায় খেতে হবে শাখি, অত দূরের দীঘি থেকে কে আর আমাকে জল এনে দেবে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, 'আমি তো সেরে উঠেছি তুই এখন শ্বশুরবাড়ী চ'লে যা শাখি! আমাদের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলি, তাতেই জামাই বেয়ান চ'টে আছে, তাদের আর চটাস্‌নে। তা' ছাড়া এখানে না খেয়েই বা ক' দিন বাঁচ্‌বি?'

—'বাবার যেমন কথা! তুমিই বা না খেয়ে ক' দিন বাঁচ্‌বে শুনি?'

—'আমাদের বুড়ো হাড়ে সব সয় মা, তোদের কাঁচা বয়েস, তোদের কথা আলাদা।' তারপর বেড়ার ফাঁকে উঁকি মেরে বলে, 'ভোর হ'য়ে এলো নাকি রে? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

শাখী দরজার ঝাঁপ খুলে ফেলে: 'একটু ফর্সা হ'লেই তোমাকে জল এনে দেব বাবা।'

—'অম্‌নি দেখিস্‌ তো মা, ঘোষেদের পুকুরপানে হেলেঞ্চা পেলে তুলে আনিস্‌। তাই দিয়ে একটু ঝোল ক'রে দিস্‌ আজ। অসুখের পরে এমন ক্ষিদে পায়!'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ঘরে চাল আছে তো?' মেয়ের আনত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ রেগে বলে, 'কাল যে চেয়ে চিন্তে নিয়ে এলি, সে কি সব ফুরিয়েছে? তুই খেয়েছিস্‌ বুঝি?'

—'না বাবা, আমি খাইনি। ঐ ক'টা চাল তোমারি লেগে গেছে। তুমি ভেবো না, তোমার চাল ক'টা যে ক'রেই হোক্‌ আমি যোগাড় ক'র্‌বই।'

বৃদ্ধ আশ্বস্ত হয়: 'তুই চ'লে গেলে আমার কি দশা হবে শাখি! আমি তো না খেয়েই ম'রে যাব।'

—'তুমি একেবারে সেরে না উঠ্‌লে আমি যাব না বাবা!'

বৃদ্ধ ধড়মড় ক'রে উঠে বসে: 'যাবিনে? কতদিন থাক্‌বি এখেনে? জামাই রেগে আছে, তুই চ'লে যা শাখি!'

শাখী হাসে: 'এইমাত্র ব'ল্‌লে আমি চ'লে গেলে তুমি না খেয়ে মর্‌বে। তা' হ'লে আমি যাই কি ক'রে বল তো?'

—'কিন্তু জামাই সে কথা শুন্‌বে কেন? নিতে এলেই যেতে হবে।'

—'দু'বার নিতে এসেছিল, আমি যাইনি।'

বুড়ো ব্যস্ত হ'য়ে বলে, 'কে এসেছিল? দেবদাস? কই, আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি।'

—'তখন তুমি বেহুঁস ছিলে বাবা!'

—'সে রাগ করেনি তো?'

—'হ্যাঁ, খুব রাগ ক'রেছে। বিয়ের সময় দু' ভরি সোনা দেবার কথা ছিল, দাওনি, সে জন্যই তো রাগের শেষ নেই, তারপর তোমাদের অসুখের খবর পেয়ে জোর ক'রে চ'লে এসেছি, তাতেই আগুন হ'য়ে ছিল, নিতে এলে যাইনি ব'লে আবার বিয়ে ক'র্‌বে ব'লে গেছে।'

—'বিয়ে ক'রবে? এ কথা শুনেও তুই যাস্‌নি শাখি! ধন্যি মেয়ে তুই! আজই কাউকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে যা মা! দু'বার এসেছিল বললি না? আবার কবে এসেছিল?'

—'সেই মাত্র মাকে বিদায় ক'রে দিয়েছি, শ্মশানযাত্রী তখনো ফেরেনি। তোমার ময়লা ধোবার জন্যে ঐ ডোবায় গিয়েছিলাম। এসে বলে—এক্ষুণি যেতে হবে। তা বল তো, সে কি সম্ভব? বল্‌লুম তোমাকে একটু দেখে যেতে, তা-ও এলো না, পথ থেকেই ফিরে গেল।'

—'আচ্ছা, এখন তো আমি ভালো হ'য়ে গেছি, এখন তুই চ'লে যা। আজই যা।'

—'ওরা তো গাঁয়ে নেই বাবা, এ-আর্‌-পিতে কাজ ক'র্‌বে, ব'লে বাড়ী ঘর বেচে, ক'ল্‌কাতায় চ'লে গেছে। তাই আমাকে নিতে এসেছিল।'

—'দু' দিন পরে গেলে কি হ'ত না?'

—'গাঁয়ে থেকে খাবে কি? চাল তো পাওয়া যায় না, যা' যায়, সে-ও তো কেন্‌বার সাধ্যি নেই।'

মুখে ব্যস্ততা প্রকাশ ক'র্‌লেও যোগজীবন মনে মনে খুশী হ'য়ে ওঠে, মস্ত একটা দুশ্চিন্তা দূর হ'ল ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

—'গিয়ে চিঠি দিয়েছে?'

—'না। তুমি একটু ভালো হ'লে চল আমরাও ক'ল্‌কাতায় চ'লে যাই। সেখানে গেলে আর কিছু না হোক্‌ অন্ততঃ ভিক্ষে তো জুট্‌বেই। আর ওর সঙ্গেও দেখা হ'তে পারে।'

যোগজীবন ঘাড় নাড়ে ঃ 'তাই চ'।'

বেড়ার ফাঁকে উষার আলো ঘরে দেখে কলসী হাতে শাখী বেরিয়ে গেল।

(২)

যোগজীবন আরেকটু সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লে শাখী একদিন তার হাত ধ'রে ক'ল্‌কাতার রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ল। অনাহারে শরীর জীর্ণ, শাখীর নিজেরই পথ চল্‌বার শক্তি ছিল না, তার উপর কাঁধে একটা বড় পুঁটুলি নিয়ে দু'পা গিয়েই সে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়তে লাগ্‌ল। তবু সে নতুন উৎসাহে পথ চ'ল্‌ছিল, যদি শেষ পর্য্যন্ত চ'ল্‌তে না পারে, পথের উপরেই মরণশয্যা পাত্‌বে, সেজন্য সে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিল। কিন্তু মরণও তাকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌ল, তাই তারা নির্ব্বিঘ্নে ক'ল্‌কাতায় এসে পৌঁছাল।

গ্রামের মেয়ে শাখী, এত বড় শহর দেখা দূরের কথা, সে কল্পনাও করেনি কখনো। সেই জনবহুল পথে বৃদ্ধ রুগ্‌ণ পিতাকে নিয়ে চ'লতে তার সাহস হয় না, ফুট্‌পাথের উপরেই ব'সে পড়ে সে।

বাপ বলে, 'বস্‌লি যে, দেবদাসের খোঁজ কর্‌, খাবার দাবার যোগাড় কর্‌—'

শাখী বলে, 'দেখ্‌ছ না কত গাড়ী চ'ল্‌ছে, কি রকম লোকের ভিড়, কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।'

সেই ঐশ্বর্য্যময়ী নগরীর বুকে তাদেরই মত শত সহস্র ভিখারী ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে তারা আশ্বস্ত হয়। বিশিষ্ট কোনো ভদ্রলোককে যেতে দেখ্‌লেই যোগজীবন ব্যাকুল কণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করে, 'বাবু, আমার জামাই দেবদাস মণ্ডল, এ-আর্-পিতে কাজ করে, তাকে কি আপনি চেনেন? সে কোথায় থাকে বাবু?' তারা বিস্মিতদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়, কেউ বিদ্রূপ ক'রে হাসে, কেউ ঠুন্ ক'রে একটা ডবল পয়সা ফেলে দেয় ওদের সাম্‌নে।

কত লোক আসে যায়, দেবদাস মণ্ডলের খোঁজ দিতে পারে না কেউ। স্বামীর দর্শনাশায় শাখী রাস্তার জনতার দিকে চেয়ে থাকে; নির্লজ্জ, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকায় সকলের মুখের দিকে। সহরে এসেই স্বামীর দেখা পাবে এই আশাতেই সে রুগ্‌ণ বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে গ্রামের বাইরে পা বাড়াতে সাহস ক'রেছিল, কিন্তু এখন সে নিরাশ হ'য়ে পড়ে। স্বামী ব'লেছিল—আবার বিয়ে ক'র্‌বে। তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর প্রকৃতির যে পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে এ কথা অবিশ্বাস্য নয়। তুব স্বামীর ঘরেই শাখীর আশ্রয়, সে আশ্রয় যদি সে না পায়, তবে সে দাঁড়াবে কোথায়? এই বিস্তীর্ণ শহরে এত লোক চ'ল্‌ছে, শুধু শাখীর স্বামীই অদর্শন হ'য়ে থাকে!

শাখী তবে কি ক'র্‌বে? কি ক'র্‌বে সে?

(৩)

যোগজীবন রেগে ওঠে ঃ 'টেনে তো নিয়ে এলি ক'ল্‌কাতা শহরে, এখন তো পেটের ক্ষিদেয় প্রাণ যায়। একেই বলে মেয়েলোকের বুদ্ধি!'

—'গাঁয়ে থেকেই বা খেতে কি?'

বুড়ো মুখ খিঁচিয়ে ওঠে ঃ 'খেতে কি! কেন, শাকপাতা কুড়িয়ে খেলেও কি পেট ভ'র্‌ত না?'

—'বনে কি শাকপাতা কিছু আর আছে? সব উজাড় ক'রে খেয়েছে।'

—'বেশ ক'রেছে, খাওয়া না জুট্‌ত, ভিটেয় প'ড়ে মর্‌তাম। এখানে যে মর্‌বার জন্যে এক হাত জায়গাও পাব না। পরশু সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছি, রাস্তায় দুটি দুটি মুড়ি ছাড়া কিছু জোটেনি। এখন ক্ষিদেয় চোখে আঁধার দেখ্‌ছি।'

শাখী উঠে দাঁড়ায় ঃ 'তুমি এখানে বোসো বাবা, তোমার জন্যে দু' পয়সার মুড়ি মুড়কি নিয়ে আসছি।'

—'না না'—মেয়ের আঁচল চেপে ধরে যোগজীবন ঃ 'কোথায় হারিয়ে যাবি; চ', আমিও তোর সাথে যাই।'

দোকানী টিট্‌কারী দিয়ে ওঠে ঃ "দু' পয়সার মুড়ি মুড়কি—বেশ আছো বাবা, কোন্ দেশ থেকে এলে, জাপান না জার্ম্মাণ?"

সঙ্কোচে কুঁক্‌ড়িয়ে যায় শাখী, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে মুড়ি মুড়কির ধামার দিকে।

মুড়ি মুড়কি দুটি এক থাবায় খেয়ে নেয় যোগজীবন, শাখীও দুটি খায়, রাস্তার কল থেকে বাপকে জল এনে দেয়, নিজেও পেট পুরে জল খেয়ে নেয়।

বৃদ্ধ হতাশ হ'য়ে বলে, 'দেবদাসের সঙ্গে তো দেখা হ'ল না, এখন কি হবে শাখি! রাস্তায় প'ড়ে মরাই বুঝি বরাতে লেখা আছে!'

মনের আতঙ্ক গোপন ক'রে বাপকে সাহস দেয় শাখী : 'এই তো কত ভিখিরী ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে বাবা!'

সে ফুট্‌পাথের একপাশে কাঁথা পেতে বাপকে শুইয়ে দেয়, সেই উন্মুক্ত জনবহুল স্থানে ঘুমুতে তার সাহস হয় না, সে ব'সে ঢুল্‌তে থাকে, রাত বেড়ে চলে, শহরের কোলাহল ক'মে আসে। আকাশে মেঘ এগিয়ে আসে গুটি গুটি, অকস্মাৎ একসময় নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করে চারদিক্ কাঁপিয়ে; বিদ্যুৎ চমকায়, শীতল বায়ুর স্পর্শে শাখীর ক্লান্ত অবসন্ন চোখ দুটি ভেঙ্গে আসে, কোন্ সময় বাপের পাশে গুটি গুটি শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে শাখী দেখে ফুট্‌পাথে বিস্তর লোক জমা হ'য়েছে, বুড়ো বাপকে এখনি পায়ের তলায় পিষে ফেল্‌বে দেখে সে তাড়াতাড়ি তাকে জাগিয়ে স'রে দাঁড়ায়।

—'আর শুয়ো না বাবা, ওরা পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবে।'

—'অত গোল কিসের শাখি, আগুন লেগেছে?'

—'আগুন তো দেখ্‌ছিনে। তুমি দাঁড়াও, আমি দেখে আসি।' একটু এগিয়ে গিয়ে সাহস ক'রে সে একজন বৃদ্ধাকে এই জনসমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করে। বুড়ী সংক্ষেপে বলে, 'চাল মিলেগা।'

খুসী হ'য়ে শাখী বাপকে বলে, 'ওখানে চাল দেবে বাবা, তাই অত লোক জ'মেছে। তুমি এই রোয়াকের ওপর ব'সে থাকো, আমি চাল আন্‌তে যাচ্ছি।'

—'কতক্ষণ লাগ্‌বে তোর? শীগ্‌গির আসিস্'—মেয়েকে চোখের আড়াল ক'র্‌তে বুড়োর সাহস হয় না।

বাপকে আশ্বস্ত করে শাখী : 'দেরী ক'র্‌ব কেন বাবা? আঁচলে চালটা ঢেলে দিলেই চ'লে আস্‌ব। কতটা চাল দেবে, ব'য়ে আন্‌তে পার্‌ব কিনা কে জানে!'

সকলে যেখানে লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, শাখীও সেই লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়। একজন স্ত্রীলোকের গায়ে একটু ধাক্কা লাগ্‌লে সে অশ্রাব্য কটূক্তি ক'রে ওঠে। কিন্তু শাখীর আর কথা বল্‌বার ক্ষমতা নেই, তার হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করে, শেষ রাতের ফিকে অন্ধকারও তার চোখে জমাট বেঁধে আসে। কতবার ভাবে, এ সংগ্রামের আর আবশ্যক নেই,—থাক্ চাল, থাক্ খাওয়া, থাক্ জীবন, রাস্তার ধূলোর ওপরেই সে তার অসমর্থ তনুটিকে লুটিয়ে দেবে। কিন্তু পিতার সেই অনশনক্লিষ্ট মুখ মনে পড়ে, কোনোমতে দুটি চাল পেলে হয়তো তার জীবন রক্ষা হ'তে পারে।

সহসা ঝর্ ঝর্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু কারো চাঞ্চল্য দেখা যায় না, পায়ের তলায় যে মাটিটুকু অধিকার ক'রে দাঁড়িয়েছে সেটুকু যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায়, সেই-ই সকলের লক্ষ্য। সিক্ত ওষ্ঠাধর লেহন ক'রে শাখী তৃষ্ণা দূর করে।

রাত্রি প্রভাত হয়, মেঘ কেটে গিয়ে চারদিকে নির্ম্মল রোদ ছড়িয়ে পড়ে, সেই আলোতে দেখা গেল, রাস্তায় পা ফেল্‌বার জায়গা নেই, দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে। এই ক্ষুধাতুর নরনারী যেন লজ্জা-ঘৃণা-ভয়মুক্ত অমানব অথবা অতিমানবে পরিণত হ'য়েছে।

রোদে আর্দ্র বস্ত্র শুকিয়ে ওঠে, চারদিকে কোলাহল বাড়্‌তে আরম্ভ হয়। কত সুসজ্জিত সুপরিচ্ছন্ন নরনারী নাকে রুমাল চাপা দিয়ে এই ক্ষুধিত মানব-মিছিলের দিকে অবজ্ঞামিশ্রিত করুণদৃষ্টিতে চাইতে চাইতে চ'লে যায়, চারটি চালের জন্য এই ঘৃণিত উদ্যম দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করে। কেউ রোণাল্ড কোল্‌ম্যান আর গ্যারী কুপারের অভিনয় নিয়ে সমালোচনা করে; ছেলের জন্মদিনের উৎসবের খাদ্যতালিকা কি রকম হ'লে বেশ রুচিকর হয়, বড়লোক বন্ধুর বিবাহে কি উপহার দিলে বেশ শোভন ও সুরুচিসঙ্গত হয়, পূজার ছুটি কোথায় কিভাবে কাটালে অধিক উপভোগ্য হয়—এ সব নিয়ে তারা তর্ক করে, পরামর্শ করে; কার গহনার ডিজাইন আর শাড়ীর রং কত বিচিত্র, লঘু হাস্য-পরিহাসের সহিত এ কথা আলোচনা ক'র্‌তে কর্‌তে পথ অতিক্রম করে। বাবু মোটর হাঁকিয়ে তাদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে যায়, মাথায় মোট নিয়ে ফেরিওয়ালা হেঁকে হেঁকে জিনিষ বিক্রয় করে, কিন্তু তারা নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে—মরণপুরীর মৃতের মিছিলের মত।

সহসা সকলেই চঞ্চল হ'য়ে হাত বাড়ায়, তাদের অনুসরণ ক'রে শাখীও হাত বাড়িয়ে দেয়, একখানা টিকিট পায় সে। সকলের পায়ে-পায়ে সেও এসে দোকানের সাম্‌নে দাঁড়ায়, আঁচলখানা বিছিয়ে দেয় কম্পিতহস্তে। পলকে সেই ছিন্ন অঞ্চলখানি সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে ওঠে। ঝক্‌ঝকে চাল্! হোক্ মোটা, হোক্ লাল—তবু চাল! আঁচলে দ্রুত গেরো বাঁধে শাখী।

দোকানী বলে, 'পয়সা কই? ডবল পয়সা এনেছো তো?'

—'পয়সা! পয়সার কথা তো ওরা কিছু বলেনি।'—সংকুচিত হ'য়ে শাখী বলে।

—'চাল নিতে এসেছো বিনিপয়সায়! মামাবাড়ীর আবদার পেয়েছো নাকি? দাও পয়সা'—দোকানী ধমক দিয়ে ওঠে।

—'পয়সা আমার নেই।'

রূঢ়হস্তে চালগুলি ঢেলে নেয় মুদী। অন্য ক্রেতা আসে, একপাশে স'রে দাঁড়ায় শাখী। আঁচলখানার যেখানে চাল বাঁধা ছিল, বারবার সেখানকার আঘ্রাণ নেয়। একজন বৃদ্ধা বলে, 'নিলে তো চাল ক'টা কেড়ে! আহা বাছা রে!'

এবার শাখীর চোখে জল এসে পড়ে। চোখ মুছে সে ধীরে ধীরে পিতার কাছে এসে দাঁড়ায়। মেয়েকে দেখে ধ'ম্‌কে ওঠে যোগজীবন: 'এই তোর শীগ্‌গির ক'রে আসা? আকাশে এক পহর বেলা হ'য়েছে, বুড়ো বাপটা রইল কি গেল, সে খেয়ালই নেই তোর?'

—'আমি তো আর মিছামিছি ব'সে ছিলুম না।'

—'কই, চাল কই দেখি?' হাত দিয়ে সে চালের স্পর্শ পেতে চায়।

—'চাল দিলে না বাবা', শাখীর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে আসে ঃ 'চালের জন্যে কত কষ্ট সইলাম, কিন্তু চাল দিলে না।'

—'দিলে না তো কি এতক্ষণ তোর গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছিলি? সবাইকে দিলে, তোকে কেন দিলে না শুনি।'

—'সবাই পয়সা দিয়ে কিনে নিচ্ছে, আমার যে পয়সা নেই।'

—'পয়সা দিয়ে? পয়সা দিয়ে চাল নেবে তাতেও এত সমারোহ! কেন, পয়সা দিলে দোকানে চাল পাওয়া যায় না?'

—'জানিনে বাবা!'

—'কিছুই তুমি জানো না, মুখ দিয়ে একটা কথা কি কাউকে জিজ্ঞেসও ক'র্‌তে পার না? নির্গুণ কোথাকার!'

একটা ছোক্‌রা সিভিক গার্ড্ এগিয়ে আসে, পাণে লালকরা দু'পাটি দাঁত বের ক'রে বলে, 'বুড়ো বুঝি তোমার বাপ? ব'ক্‌ছে কেন তোমাকে? চাল আনোনি ব'লে?'

শাখী চুপ ক'রে থাকে। ছোক্‌রা বলে, 'তোমাদের দেখে মনে হয় তোমরা অনেকদিন খাওনি। আজও তো চাল পেলে না, খাবে কি?'

অযাচিত সহৃদয়তায় বিরক্ত হ'য়ে শাখী পিতার হাত ধ'রে বলে, 'ওঠো বাবা, চল।'

বুড়োর রাগের সীমা থাকে না ঃ 'কোথায় যাব? কোন্ রাজ-অট্টালিকায় নিয়ে যাবে শুনি?'

ছোক্‌রা মমতাগদগদ কণ্ঠে বলে, 'আহা, নির্দোষ মেয়েকে ব'ক্‌ছ কেন গা?' তারপর শাখীর দিকে চেয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে চল, আমার ঘরে চাল আছে।' ব'লেই একটা অভদ্র ইঙ্গিত করে।

—'চালের আমার দরকার নেই।' ব'লে এককঝট্‌কায় শাখী উঠে দাঁড়ায়।

যোগজীবন খেঁকিয়ে বলে, 'দরকার নেই? ভদ্রলোকের ছেলে সেধে চাল দিতে চাইছে, তা' নবাবের বেটীর দরকার নেই। হ্যাঁ বাবা, তুমি দেবদাস মণ্ডলকে চেনো? আমার জামাই, এ-আর্-পিতে কাজ করে।'

ছোক্‌রা বলে, 'সে চিন্‌তে আর কতক্ষণ, আমি খুঁজে তাকে বার ক'রে দেব, আপনারা আমার ঘরে চলুন, সেখানে কোনো কষ্ট হবে না।'

যোগজীবন উঠে দাঁড়ায় ঃ "চ' শাখি, চ', দেরী করিস্‌নে—ক্ষিদেয় তেষ্টায় প্রাণ গেল।"

—'তোমার যেতে হয় তুমি যাও বাবা, আমি যাব না—'

বৃদ্ধের বাক্ রুদ্ধ হ'য়ে যায়, মেয়েটা বলে কি? মনে হ'চ্ছে পেটের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বল্‌ছে, দেহটা এখনই যেন অচল হ'য়ে প'ড়্‌বে, আর হতভাগী কি না সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌ছে!

লাঠি হাতে মেয়েকে মার্‌তে যায় যোগজীবন, কিন্তু মেয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এক পা'ও অগ্রসর হয় না।

(৪)

পিতার হাত ধ'রে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায় শাখী : 'বাবু, একটা পয়সা—'

—'কোন্ দেশ থেকে এলে শুনি? এক পয়সা যে নেই, সে তো সবাই জানে, তবে এ ন্যাকামো কেন?'—কেউ চোখ রাঙায়, কেউ ব্যাগ্ খুলে একটা ডবল পয়সা ছুঁড়ে দেয়।

—"ক' পয়সা হ'ল রে শাখি?"

—'মাত্র তিন আনা হ'য়েছে বাবা!'

—'ঐ দিয়ে মুড়ি কিনে খাইগে চ'।'

—'ক'টা মুড়িই বা পাওয়া যাবে ও পয়সাতে, ও গালে দিয়েই বা কি হবে? এ পয়সা খরচ ক'রে কাজ নেই, আরো কিছু পয়সা পেলে কাল এক সের চাল পাওয়া যাবে।'

তারা একটা পার্কে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে অসংখ্য ভিক্ষুকের ভিড়। ছিন্ন মলিন পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি খুলে তারা জাঁকিয়ে ব'সেছে। ভাঙ্গা কালিমাখা এলুমিনিয়মের হাঁড়ি, পেতলের গ্লাস, দাঁতবেরকরা এনামেলের থালা—এই সব তৈজসপত্র নিয়ে সেখানেই তারা সংসার পেতেছে।

শাখী বলে, 'তোমরা ফ্যান কোথায় পাও ভাই?'

এত দুঃখেও তারা হাসে, শীর্ণ মুখের বিকৃত হাসি।

—'কেন, ঐ যে রাস্তার দু' পাশে সারি সারি বড় বড় বাড়ী দেখ্‌ছ, ওদের অনেক টাকা, ওদের দু'বেলাই ভাত হয়। তুমি গিয়ে চাইলেই ওরা ফ্যান দেবে। তুমি বুঝি নতুন এসেছো? ওই বুড়ো বুঝি তোমার বাপ?'

মুহূর্ত্তে তারা অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়ে।

'দু'টি ভাত, একটু ফ্যান দেবে মা?'—শাখীর প্রায় মুখস্থ হ'য়ে এলো। চাকর গামলা ক'রে ফেন নিয়ে আসে, ঢেলে দেয় ওর মাটির ভাঁড়ে। কী উষ্ণতা। কী সুগন্ধ! ইচ্ছে হয় এক চুমুকে খেয়ে ফেলে সে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে রুগ্‌ণ বৃদ্ধ পিতার কথা, আজ পেটে কিছু না দিলে সে আর বাঁচ্‌বে না। শাখী দ্রুত হাঁটে।

'মা গো!'—

পেছন থেকে কে তার আঁচল ধ'রে টানে। পথের ধারে প'ড়ে আছে একটি ভিখারিণীর মৃতদেহ, তার কুঞ্চিত উদর আর কঙ্কালসার দেহ কী বীভৎস! একটা বছর তিনেকের ছেলে মৃতা জননীর শীর্ণ শুষ্ক স্তন দু'টিকে প্রাণপণে চাট্‌ছিল, এখন ফেনের ভাঁড় দেখে ছুটে এসেছে।

মুখখানা শুকিয়ে দু' পাটি দাঁত বেরিয়ে এসেছে তার, মাথার চুলগুলি ঝ'রে গেছে, গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে দোয়াতের কালির মত হ'য়েছে। দু' হাতে শাখীর হাঁটু জড়িয়ে

ধ'রে সে ঝুল্‌তে থাকে। তার ব্যগ্র দৃষ্টির দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতেই শাখী ভাঁড়টা তার মুখের কাছে ধরে। ঐ এককোঁটা ছেলে চোঁ চোঁ সেই এক ভাঁড় ফেন খেয়ে ফেলে। রোগা শরীরে পেটটা ঢাকের মত হ'য়ে ওঠে, কাঠির মত পা ফেলে মায়ের শবের পাশে শুয়ে মনের আনন্দে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করে সে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে শাখী আবার ফেন ভিক্ষার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু সে আর হাঁটতে পারে না, পেটের অন্ত্রগুলো পর্য্যন্ত যেন হজম হ'য়ে গেছে। দারুণ বুভুক্ষা যেন এবার রক্তমাংস কুরে কুরে খাচ্ছে। মাথাটা টল্‌ছে, হাতে পায়ে সাড় নেই, সে আর পারে না—আর পারে না।

সহসা দূর থেকে কে তার নাম ধ'রে ডাকে। বিস্মিত হ'য়ে তাকায় শাখী, কাছে এসে দাঁড়ায় তাদের গাঁয়ের নাপিত রতন। খুসীতে শাখীর নির্জীব মন টল্‌মলিয়ে ওঠে ; তাঁদের গাঁয়ের লোক, পরিচিত লোক, যেন পরমাত্মীয়।

রতন বলে, 'তুমি এখানে কবে এলে শাখি? কার সঙ্গে এসেছো? মণ্ডলের সঙ্গে?'

রাস্তার পাশেই ব'সে পড়ে শাখী, তার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে : 'না, ও তো আগেই এ-আর্‌-পিতে কাজ পেয়ে বাড়ী ঘর বেচে মাকে নিয়ে চ'লে এসেছে। বাবাকে নিয়ে এই হপ্তাখানেক আমি এখানে এসেছি। কিন্তু ওর কোনো খোঁজই পেলাম না। তুই জানিস্‌ রতন ও কোথায় আছে?'

রতন চিন্তিত হ'য়ে বলে, 'জানিনে, খোঁজ ক'রে দেখ্‌তে পারি। ক'ল্‌কাতা তো আর এক হাত জায়গা নয় যে টপ্‌ ক'রে খুঁজে বের করা যাবে। তবে আমি চেষ্টা ক'র্‌লে পার্‌বোই—'

তার মুখের রেখায় এই ভাবটাই ফুটে উঠ্‌ল, যে তার অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে কিছুই নেই। তবু শাখী ব্যাকুল হ'য়ে বলে, 'তবে কি হবে? তুই পার্‌বি তো রতন? পার্‌বি বের ক'রতে?'

রতন তার দু' ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট নাচিয়ে বলে, 'আমি যখন ব'লেছি, তখন আর ভেবো না। তোমরা আছো কোথায়?'

—'কোথায় আবার? ঐ পার্কে, যেখানে হাজার ভিখিরী র'য়েছে, সেইখানে।'

—'আ—হা! বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে তো তোমাদের! চেহারা দেখে মনে হ'চ্ছে অনেকদিন পেট পুরে খাওনি। হাতে ভাঁড়, ফ্যান চেয়ে খাও বুঝি?'

শাখী ম্লান হাসে : 'চাইলেই বা পাই কই? ফ্যান খাবার লোক এত বেড়েছে যে ফ্যানও পাওয়া যায় না। আজ কিছু না খেলে বাবাও বাঁচ্‌বেন না, আমিও আর চ'ল্‌তে পার্‌ব না।'

জিহ্বা আর তালুসংযোগে শব্দ সৃষ্টি ক'রে রতন সহানুভূতি প্রকাশ করে : 'কোথাও কাজকর্ম্ম কর্‌বার চেষ্টা কর না কেন?'

—'ক'রছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা অজানাকে কেউ রাখ্‌তে চায় না।'

—'সে তো বটেই', রতন বলে, 'তোমার ভাবনা নেই, আমি তোমাকে একটা ভালো কাজে লাগিয়ে দেব।' পকেট থেকে রতন একমুঠো টাকা বার করে, শাখীর দিকে মুঠোটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এ টাকা তোমাকে আগাম দিচ্ছি। আজ দু' বাপ বেটীতে হোটেল থেকে ভাত কিনে খাওগে। নারকেল তেল মেখে ভালো ক'রে স্নান ক'রে একখানা ফর্সা শাড়ী প'রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থেকো, কাল এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

গ্রামের নাপিত রতন, দুঃখ-দুর্দ্দশার যার অন্ত ছিল না, সুদিনে শাখীই কতদিন তাকে ভাত বেড়ে খাইয়েছে। তার আজ বেশভূষার কত চটক, তার পকেটে থাকে এখন মুঠো মুঠো টাকা। অন্তরঙ্গ ও সমকক্ষ হ'বার জন্য সে আজ শাখীকে নাম ধ'রে ডাকে, 'তুমি' ব'ল্‌তেও তার আট্‌কায় না। গ্রামের লোক যাকে ধূর্ত্ত এক পশুর সঙ্গে তুলনা ক'রেছে, কূটবুদ্ধিতে গ্রামে যার জোড়া ছিল না, সেই রতনের আজ উদারতার সীমা নেই, বিনা স্বার্থে মুঠো মুঠো টাকা দান ক'র্‌তেই তার আজ কত উৎসাহ!

তাগাদা দিয়ে রতন বলে, 'ধর ধর, টাকাগুলো ধর।'

হাত সরিয়ে নেয় শাখী : 'আগে কাজ করি, এখনই টাকা নেব কেন রতন?'

—'খেটে শোধ দিয়ো, তবেই হবে। এই তো ব'ল্‌ছিলে আজ না খেলে বাবা বাঁচ্‌বেন না, তুমিও আর চ'ল্‌তে পার্‌বে না—'

তবু শাখী হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—'তোমার সাম্‌নে তোমার বাবা শুকিয়ে ম'র্‌বেন তবু কাজ ক'র্‌বে না?'

—'কাজ ক'র্‌ব, কিন্তু আগে টাকা নেব কেন?'

—'পারবে না-খেয়ে খাট্‌তে? আর তোমার ঐ ক্যাংলা চেহারা দেখে কে-ই বা তোমাকে রাখতে রাজী হবে? পাগ্‌লামি কোরো না, নিজে বাঁচো, বুড়ো বাপকে বাঁচাও।'

টাকা ক'টা সে শাখীর হাতে গুঁজে দেয়। টাকার স্পর্শে শাখীর সর্ব্বাঙ্গ যেন কুঞ্চিত হ'য়ে পড়ে।

(৫)

বৃদ্ধ যোগজীবনের চোখ চক্ চক্ করে : 'ভাত, মাছ কোথায় পেলি রে শাখি? ভিক্ষে ক'রে আনলি?'

সংক্ষেপে শাখী বলে, 'হ্যাঁ বাবা!'

—'আহা, দাতা বেঁচে থাক্ তোর একশ' বছর পরমায়ু হোক্ মা!'

ক্ষুধার্ত্ত পিতার পরিতৃপ্ত আহারের দিকে চেয়ে শাখী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

দু'-তিন দিন পর রতন এসে বস্তির মধ্যে ওদের একখানা ঘর ভাড়া ক'রে দিল। শাখীর জন্য সে ভালো কাজ ঠিক ক'রেছে, সেখানেই থাক্‌তে হবে, রোজ আস্‌তে পার্‌বে না শাখী, মাঝে মাঝে এসে বুড়ো বাপকে দেখে যাবে। হোটেলের সঙ্গেও রতন বন্দোবস্ত

ক'রেছে, সেখান থেকে দু'বেলা যোগজীবনকে ভাত দিয়ে যাবে, কোনো কষ্ট হবে না তার।

দু' হাত তুলে যোগজীবন রতনকে আশীর্ব্বাদ করে। রতন যখন উঠে দাঁড়ায় তখন গভীর আলস্যে শাখী মাটিতে শুয়ে পড়ে : 'আজ থাক্ রতন, আজ আর যাব না, তুমি বরং আরেকদিন এসো।'

রতন বলে, 'একি ছেলেখেলা? আজই যাবার কথা—'

যোগজীবন রেগে ওঠে : 'নবাবের বেটীর কথা শোনো, কত ভাগ্যের জোরে এমন ভালো কাজ পেয়েছিস! কাজে যাবার আগেই টাকা দেয় বাপের বয়েসে শুনিনি, তার আবার অশ্রদ্ধা! যা, যা শীগগির।'

—'তুমি বরং ভালো ক'রে ওর খোঁজ কর একটু, চাক্‌রী এখন থাক্ রতন!'

রতন মুখ ভার করে : 'আমার পজিশন্ কোথায় থাক্‌বে বল তো? ব'লে ক'য়ে এতগুলো টাকা আনলুম।'

আঁচল খুলে শাখী টাকা দিতে যায় : 'বেশী খরচ হয়নি, যা' আছে তুমি নিয়ে যাও, ওর সঙ্গে দেখা হ'লেই বাকিটা দিয়ে দেব।'

রতন পীড়াপীড়ি করে, ক্রোধে উন্মাদ হ'য়ে কটূক্তি করে যোগজীবন। অবশেষে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে শাখী বাপকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে যায় রতনের সঙ্গে।

(৬)

দু' দিন পর শাখী হঠাৎ চ'লে আসে। যোগজীবন বলে, 'রতন ব'লেছিল শীগ্‌গির আস্‌তে পার্‌বিনে, কি ক'রে এলি?'

—'তোমাকে দেখ্‌তে এলাম বাবা। কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

—'কষ্ট?'—দাঁত বার ক'রে হাসে যোগজীবন : 'রাজার হালে আছি মা! পোনামাছের ঝোল, মুড়িঘণ্ট, মুগের ডাল—চমৎকার খাবার দিয়ে যায় দু' বেলা। কে ব'ল্‌বে যে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ। তোকে যেন বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে শাখি, কষ্ট হচ্ছে কিছু? খাটুনি কি খুব বেশী?'

শাখী মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সন্ধ্যার আগেই যোগজীবন ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে : 'কখন যাবি তুই, সন্ধ্যে হ'লে পথও তো চিন্‌তে পার্‌বিনে মা? তারা রাগ ক'র্‌বে যে!'

—'আমি আর যাব না বাবা!'

—'যাবিনে? কেন?' নিজের শ্রবণকে অবিশ্বাস করে যোগজীবন : 'যাবিনে তবে গিল্‌বি কি? ঘরভাড়াই বা দিবি কোত্থেকে? এই ভরা বর্ষায় কি মাঠে প'ড়ে ভিজে ম'র্‌ব? এখনো যা ব'ল্‌ছি!'

—'চাক্‌রী আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

—'খুব বাহাদুরী ক'রেছ, এখন আকাশের তলায় ব'সে বাপ-বেটীতে উপোস ক'রে মরি!'

এবার শাখীর কণ্ঠ প্রখর হ'য়ে ওঠে : ' না হয় ম'র্‌বই, তাই ব'লে কি ইজ্জৎ খোয়াব

নাকি? ধর্ম্মের কাছে কি জবাব দেব?'

রতনের উদ্দেশ্যে সে একটা কটূক্তি করে।

—'ওরে আমার ইজ্জৎওয়ালি, বলে—বিষ নেই সর্পের কুলোপানা চক্কর। বুড়ো বাপকে না খেতে দিয়ে মার্‌লে ধর্ম্মের কাছে জবাব দিতে হবে না? সুমুখ থেকে দূর হ'য়ে যা হারামজাদি!'

দিন দুই পরে হোটেলের ভাত বন্ধ হ'য়ে যায়, ঘর ছেড়ে দিয়ে শাখী বাপের হাতে ধ'রে আবার এসে পার্কে আশ্রয় নেয়। কোনোদিন কিছু খাবার মেলে, কোনোদিন মেলে না, অপরিচ্ছন্ন পার্কের ধূলিশয্যায় দু'জনের দেহ ক্রমে অচল হ'য়ে পড়ে।

চোখের সমুখে ম'রে পড়ে আছে দুটি বালিকা ও বৃদ্ধা,—বাসি বীভৎস শবদেহ! ঘোলাটে চোখের তারা উল্টে গেছে, কয়েকটা মাছি ঢুকেছে মুখে, পিঁপড়ে আসছে সার বেঁধে।

জোরে নিশ্বাস ফেলে যোগজীবন: 'এক—টু জ—ল।'

কণ্ঠস্বরে চ'ম্‌কে তাকায় শাখী, কিন্তু তারও দৃষ্টি তামাটে হ'য়ে এসেছে, গোঙিয়ে গোঙিয়ে বলে, 'ঐ ভাঁড়ে জল আছে, তুমি নিয়ে খাও বাবা! আমি আর উঠ্‌তে পার্‌ছিনে!'

নূতন জুতার শব্দ শোনা যায়, চার্‌দিকে আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। রতন এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে।

—'আমি দিচ্ছি জল।'

শুধু জল নয়, দু'জনের মুখেই সে খাদ্য গুঁজে দেয়, বলে, 'সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয় শাখি! বুড়ো বাপকে না খাইয়ে মার্‌ছ, একি ধর্ম্মে সইবে?'

খেয়ে গায়ে জোর হ'য়েছে যোগজীবনের: 'চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যাও। রতন, বেঁধে নিয়ে যাও, দেখি ওর জেদ কত বড়—'

আবার ঘরে আশ্রয় পায় যোগজীবন, আবার হোটেল থেকে দু'বেলা খাবার আসে। সেই যে শাখী গেছে আর আসেনি, তার সুমতির জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেয় যোগজীবন। মাঝে মাঝে রতন এসে ব'লে যায় যে, সে ভালো আছে। তাকে আস্‌তে ব'ল্‌তে সাহস হয় না যোগজীবনের, যে জেদী মেয়ে, এলে যদি আর যেতে না চায়! মাঝে মাঝে বলে, 'দেবদাসের কোনো খোঁজ হ'ল না রতন? অ্যাঁ—'

রতন বলে, 'কই আর হল।'

(৭)

প্রায় বছর ঘুরে এলো। শাখী এখন মাঝে মাঝে বাপকে দেখ্‌তে আসে। রোগ আর অনাহারে বৃদ্ধের শরীর ভেঙ্গে প'ড়েছিল, বর্ত্তমানে সে হাঁপানিতে একেবারে কাবু হ'য়ে পড়েছে। অনেক টাকা খরচ ক'রে শাখী বাপের চিকিৎসার বন্দোবস্ত ক'রেছে।

শীতের প্রভাতে একখানা গরম আলোয়ান গায়ে দিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে

যোগজীবন কাস্‌ছিল। হঠাৎ কে কাছে এসে বলে, 'আপনি এখানে? কবে এলেন?'

বৃদ্ধ ফিরে দেখে দেবদাস। এ-আর্-পির পোষাকপরা তার জামাই দেবদাস মণ্ডল।

একটু বিকৃত হাসির আভাস মুখে টেনে এনে যোগজীবন বলে, 'তুমি? অ্যাদ্দিন ছিলে কোথা? কত খুঁজেছি তোমাকে। বোসো।' ব'লে, একটা মোড়া এগিয়ে দেয়।

শ্বশুরকে প্রণাম ক'রে দেবদাস মোড়া পেতে বসে। একটা সিগারেট্ ধরায় : 'শাখী কোথায়?'

ক'ল্‌কাতা শহরে এ-আর্-পিতে কাজ ক'রে সে বেশ আধুনিক হ'য়ে উঠেছে।

—'শাখী?'—বুড়ো ঢোঁক গিলে বলে, 'তোমার খোঁজ ক'র্‌বার জন্য শাখীই তো আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলো।'

—'কোথায় সে? দেখ্‌ছিনে তো?'

ঘরের মধ্যে উঁকি মারে দেবদাস।

—'সে এখানে নেই। চাক্‌রী করে, নয়তো খাবে কি? সেখানেই থাকে। রোজ আস্‌তে পারে না, মাঝে মাঝে আসে।'

—'কোথায় থাকে? ঠিকানা কি?'

বৃদ্ধ গোবেচারীর মত বলে, 'ঠিকানা আমি জানিনে বাপু, এত কি আর আমার মনে থাকে? রতন এলে ঠিকানা পাওয়া যাবে। সেই-ই চাক্‌রী ক'রে দিল কিনা, নয়তো না খেয়েই ম'র্‌তে হত দু'জনের।'

—'কে রতন, আপনাদের গাঁয়ের রতন নাপিত? তার সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়, সে তো এ সব কথা কিছু বলেনি।'

—'দেখা হয় তোমার সঙ্গে? অ্যাঁ, বল কি? সে যে বলে দেখা হয় না।'

—'রতন লোক ভালো নয়, তার সঙ্গে গিয়ে শাখী ভালো কাজ করেনি।'

হঠাৎ একখানা মোটর এসে গলির মুখে দাঁড়ায়, শাখীকে নামিয়ে দিয়ে মোড় ঘুরে চ'লে যায়। শাখীর সেই শীর্ণ দেহ আজ যৌবনের লালিত্যে পরিপুষ্ট, নিখুঁত রূপসজ্জায় সে সুষমা অতুলনীয় হ'য়ে উঠেছে।

অগ্রসর হ'য়ে এসেই অতর্কিতে শাখী দেবদাসের সমুখে পড়ে, তার রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে, অপরিসীম একটা লজ্জা ও আতঙ্কে সে গতিহীন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু দেবদাসের বিচারকের মত কঠিন দৃষ্টি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারও চোখের দৃষ্টি আর ওষ্ঠাধর কঠিন হ'য়ে ওঠে। দেবদাস একদৃষ্টিতে তার দেহসজ্জা আর দেহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'র্‌ছিল। হঠাৎ রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করে : 'কোথায় কাজ কর? কি কাজ কর?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়ে শাখী বাপের কাছে গুটিকয়েক টাকা রেখে দেয়।

এতক্ষণে ক্রোধে ফেটে পড়ে দেবদাস : 'লজ্জা করে না বাপকে টাকা দিতে? লজ্জা

করে না মুখ দেখাতে?'

যোগজীবন বিহ্বলভাবে একবার কন্যা ও একবার জামাতার মুখের দিকে তাকায়। তার নিরুদ্বিগ্ন সুখের জীবনে অতর্কিতে এ লোকটা যেন বজ্রাঘাত ক'রতে এসেছে।

স্থিরকণ্ঠে শাখী বলে, 'না, টাকা দিতে লজ্জা করে না। কারণ ঐ টাকা খেয়েই আমার বাপকে বেঁচে থাকতে হ'য়েছে। আর মুখ দেখাতেই বা লজ্জা ক'রবে কেন? আমার লজ্জা রক্ষা ক'রেছে কে?'

দেবদাস লাফিয়ে ওঠে, শ্বশুরকে উদ্দেশ ক'রে বলে, 'দেখুন আপনার মেয়ের স্পর্দ্ধা দেখুন! মুখে চুণকালি মেখেছে, তবু তার দম্ভ কত! ঈজ্জৎ খোয়াবার আগে গঙ্গায় ডুবে মরিস্নি কেন?'

যোগজীবন চেঁচিয়ে ওঠে : 'অ্যাঁ—বল কি দেবদাস? মুখ পোড়াবার আগে তোর মরণ হ'ল না কেন হারামজাদি!'

শাখী শান্তকণ্ঠে বলে, 'মুখ পোড়াবার কথা কি আজই জান্‌লে বাবা, আগে জানোনি? ইজ্জতের ভয়ে চাক্‌রীতে যেতে চাইনি, কাজ ছেড়ে এসেছিলাম। অপমান ক'রে যখন পাঠিয়েছিলে, তখন জানোনি? এই যে খেয়ে পরে, ডাক্তারে ওষুধে সুখে দিন কাটাচ্ছো, দু' হাত তুলে আমার দীর্ঘজীবন কামনা ক'রছ, এ সব আমি কোত্থেকে জোগাচ্ছি সে কি বুঝ্‌তে পারোনি? তখনই কেন মরণ কামনা করোনি, তা' হ'লে তো ম'রেই সব জ্বালা জুড়োনো যেত। আজ তো মরণের প্রয়োজন ফুরিয়েই গেছে, মিথ্যে মরণ কামনা ক'রছ কেন?'

যোগজীবনের কাসির ধমক আসে, সে ব'সে ব'সে কাসে। সিগারেট্‌টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেবদাস বলে, 'দোষ ক'রে আবার চোখ রাঙানি। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।'

শাখী এবার হাসে : 'তা তো দেবেই, যুগ যুগ ধ'রে তোমরা মেয়েদের এম্‌নি শাসনই ক'রে এসেছো। নিজের স্ত্রীকে সেই শূন্য গ্রামে ফেলে রেখে চ'লে এসেছিলে কি অপরাধে? পিতার একমাত্র সন্তান আমি, তাঁকে একা মৃত্যুমুখে ফেলে রেখে চ'লে আস্‌তে পারিনি, সেই অপরাধে? এই দেড় বছরে একটিবার খোঁজ করনি কিসের জন্যে? ভেবেছিলে নারীদেহ ধারণ ক'রেছি বলে আমার কোনো ক্ষুধা-তৃষ্ণাবোধ নেই? ভেবেছিলে আমি পাথরের তৈরী?'

নিরুত্তরে দেবদাস কোটের বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

শাখী বলে, 'যে বাপ মেয়ের ধর্ম্মবেচা টাকা খেয়েও বেঁচে থাক্‌তে চান, তাঁর মেয়ে হ'য়ে আমি ম'র্‌ব কেমন ক'রে? তাঁকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে বেঁচে থাক্‌তে হ'য়েছে। নিয়তি আমাকে যে পথে টেনে নিয়ে গেছে, সে পথ থেকে ফের্‌বার উপায় আমাদের সমাজে নেই। দেহেমনে মৃত্যু ঘট্‌লেও আমার বাবাকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে বেঁচে থাক্‌তে হ'য়েছে।'

একখণ্ড ইট্ কুড়িয়ে নেয় যোগজীবন, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারে শাখীর দিকে। কাতরোক্তি ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শাখী, তীরবেগে রক্ত ছোটে।

বস্তির লোক ছুটে আসে, জল ঢালে ক্ষতস্থানে, শ্বশুর জামাইকে খুনের দায়ে জেল খাটাবে ব'লে চোখ্ রাঙিয়ে সংজ্ঞাহীনা শাখীকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে নিয়ে যায় হস্‌পিটালে।

স্তব্ধ দেবদাস সহসা মুখ তুলে বলে, 'শাখী হয়তো বাঁচ্‌বে না, স'রে পড়ুন এখান থেকে, নয়তো ফাঁসিতে ঝুল্‌তে হবে।'

মুঠো ক'রে তুলে টাকাগুলো গুণে দেখে যোগজীবন।

তালগাছের শীর্ষে ওঠে মর্ম্মরধ্বনি।

মহিলা ১৩৫৬

পরিবর্ত্তন

পুষ্প দেবী

লোকে হাসতো, বলতো, মা গো, বুড়ো বয়সে কী সাজের ঘটা? আরসীতে কি নিজের মুখ দেখতে পায় না? কিন্তু কেউ খবর রাখতো না তাদের মনের। বিশ বছরের সুঠাম সুন্দর তরুণ যেদিন বার বছরের কিশোরী মেয়েকে ঘরে এনেছিল তারপর প্রতি দিনে দিনে যে পরিবর্ত্তন তাদের দেহে এসেছে, তা তাদের মনের মধ্যে পৌছায়নি। বাস্তবের রং তাদের মুখের উপর গাঢ় ছায়া ফেলতে পারেনি, মন তাদের সবুজ রংয়েই ভরপুর ছিল। এই অপরাধটুকু সংসার ক্ষমা করতে চায় না।

অমর গিছলো পাটনায় বন্ধুর বাড়ী। পারুল সেখানকার মেয়ে। তাকে দেখে অমরের বড্ড ভালো লেগেছিল। কিন্তু সে তো আজকের যুগ নয়? অত্যন্ত কুণ্ঠায় সঙ্কোচে অমর সে কথা দিদিমাকে দিয়ে মাকে জানালো। স্নেহময় পিতা নিজে গিয়ে মেয়ে আশীর্ব্বাদ করে এলেন। কামনালব্ধ ধন পেয়ে অমরের আনন্দের সীমা রইলো না। পারুলেরও এই নতুন কিশোরী জীবনে প্রবল প্রেমের আকর্ষণ গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই মুগ্ধ তরুণ ভক্তের কাছে সেও নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। দু'জনেরই তখন কিশোর বয়স। দেহের আকর্ষণ কারুরই মনে প্রভাব ফেলেনি। অতি সুন্দর পবিত্র ফুলের মতই দু'জনের জীবন ফুটে উঠলো। দু'জনের দেহের ও মনের সব কিছু নতুন সবই সাথীর হাতে প্রথম তুলে দিয়ে তাদের প্রাণে সে কী পরিতৃপ্তি।

ভোর বেলা শাশুড়ী মায়ের পূজার ফুল তুলতে যেতো পারুল। পড়ার ঘর থেকে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এসে অমর হত তার সঙ্গী। লাল পাড় গরদের শাড়ী-পরা সদ্যস্নাতা পারুল তখন যেন বড় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। জুতো পরে বাসী কাপড়ে তাকে তখন ছোঁয়ার উপায় নেই। উঁচু গাছের ফুল ডাল শুদ্ধু নুইয়ে দেওয়া বা শিউলী গাছের ডাল ধরে ঝাঁকি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো সাহচর্য্যের উপায় নেই তখন। তবুও কি দুর্ণিবার আকর্ষণ! বিকেলে দু'জনে দু'দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে একত্র হবার যে কি গভীর আনন্দ ছিল, তা আজকালকার অবাধ মিলনের দিনে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বন-জঙ্গল পেরিয়ে নিভৃত পুকুর-পাড়ে বসে অমর বাজাতো বাঁশী আর তারি কোলে মাথা রেখে তন্ময় হয়ে পারুল নির্ণিমেষে সেই প্রিয় মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। হয়তো এক-এক দিন সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত, বাড়ীতে খোঁজ পড়ত পারুলের। গৃহকর্ত্তা হরনাথ বলতেন, দেখো তো আমার পড়ার ঘরে আছে কি না? দেখা যেত, সেখানেও এক জন নিখোঁজ। নীরব স্নেহময় হাস্যে বৃদ্ধের মুখ ভরে উঠতো। গৃহিণীর গুরু-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলতেন, এক দিন বিপদ বাধাবে দু'টোতে দেখছি। সাপ-খোপ কিছুরই ভয় নেই ওদের।

আর এক দিন এমনি রাত হওয়ায় কর্ত্তার আদেশে দরোয়ান গেট বন্ধ করে দিয়েছিল। পারুলের তো ভয়ে কান্না পাবার জোগাড়। কিন্তু অমর একটুও দমেনি। নিজে পাঁচীলের ওপর উঠে অবলীলাক্রমে পারুলকে ভেতরে নাবিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তাতেও বিপদ

কাটেনি। বাড়ীর দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ, শেষে বামুন কল্পতরু রান্না-ঘরের দরজা খুলে তাদের বাড়ীর ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সকালে উঠে আর কারুর দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না পারুল। আর একবার বাপের বাড়ী থেকে পারুলের ফিরতে দু'-চার দিন দেরী হয়েছিল। হঠাৎ পারুলের বাবার কাছে তার শ্বশুরের নামে এক টেলিগ্রাফ হাজির। '—পারুলকে শীঘ্র পাঠাও।' নানা বিপদের আশঙ্কায় মহা বিব্রত হয়ে ভদ্রলোক মেয়ে নিয়ে চললেন। পরে দুই বৈবাহিক দেখা হতে প্রকাশ পেল ঘটনা। টেলিগ্রাফের কথা হরনাথ বাবু বিন্দু-বিসর্গ জানেন না। উচ্চ হাস্যে বৈঠকখানা মুখরিত করে তিনি বললেন, 'এ সব অমরের কাণ্ড'। এধারে বাড়ী ফিরতে পারুলের ঠাকুরদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কি বল তো'? পারুলের বাবার সে এক সমস্যা। শেষে সব জেনে পারুলের ঠাকুদ্দা পারুলকে চিঠি লেখেন, 'দিদি টেলিগ্রাফটি কে করিয়াছিল?'

তাস দাবা পাশা বন্ধু-বান্ধব পান-সিগারেট কোন প্রকার নেশা অমরের ছিল না। গভীর যত্নে এই সব রকম সংস্রব থেকে তাকে হরনাথ বাবু সরিয়ে মানুষ করেছিলেন। লেখাপড়া, বই, ছবি-আঁকা, বাঁশী বাজান—এ ছাড়া বাইরের জগতে তার শুধু ছিল বাবা। অমর বাবাকে ভয় করতো না, সম্ভ্রম করতো আর ভালোবাসত প্রাণ দিয়ে। তার সঙ্গীসাথীহীন জীবনে প্রথম মাধুর্য্য এনে দিয়েছিল পারুল। তাকে পেয়েই অমরের জীবন পরিপূর্ণতায় ভরে উঠেছিল। পারুলই তার জীবনে গভীর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক মুহূর্ত্ত পারুল না হলে তার চলতো না।

আর এক দিনকার কথা মনে পড়ে। কি জানি কি কারণে পারুল তার শাশুড়ী মায়ের কাছে শুয়েছিল। অমরের তখন মাথার ওপর এম-এ পরীক্ষা। পড়া শেষ হতে সে ঘরে এসে দেখলো পারুল নেই, ঘরের কোণে ছিল অর্গানটা, কিছু করতে না পেরে সেইটেই বেতালা বেসুরো ভাবে বাজিয়ে চললো। ঘণ্টা খানেক বাদে মা পারুলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পারুলের পরনে ছিল লাল টুকটুকে শাড়ী, লজ্জায় তারও চেয়ে লাল হয়ে পারুল বলেছিল, কি কাণ্ড তোমার পাগলের মত? অমর বলেছিল, জানো তো পাগল করো কেন?

অমরের চিঠি সাধারণ টিকিটে যেত না। মস্ত খামে করে অনেক চিহ্নিত সে চিঠি লজ্জায় মাথা হেঁট করে পারুল নিতো, কিন্তু গভীর আনন্দে বুক তার উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠতো। বাপের বাড়ীতে যেটুকু সময় থাকতো চিঠি লিখতেই কেটে যেত। এ নিয়ে সেখানে সমবয়সী মহলেও কম কথা শুনতে হয়নি পারুলকে। এই সংসার-অনভিজ্ঞ দুই কিশোর-কিশোরীকে যাঁরা একত্র করে দিয়েছিলেন, সেই দুই বৈবাহিকের স্নেহের প্রশ্রয়ে তারা নির্ব্বিবাদে বেড়ে চলেছিল। বাপের সঙ্গে কোথাও বিদেশে যেতে গেলে পারুল নিঃসঙ্কোচে বাবাকে বলতো, ওখান থেকে যে একদিনে চিঠি যাবে না বাবা? বাবা অনেক হাঙ্গামা করে যথাসময়ে চিঠি পৌছনোর ব্যবস্থা করে তবে মেয়েকে নিয়ে যেতে রাজী করাতেন। আবার অমরও যখন ক্লাস কামাই করে পারুলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, হরনাথ বাবু হেসে বলতেন, কি হে অমর, তোমাদের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে তো দেখছি বেজায়

ছুটি। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধের অজানা কিছুই ছিল না। অমর বিব্রত হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকতো।

বাইরে কোথাও নেমন্তন্ন হলে পারুল শরণ নিতো শ্বশুরের। বলতো, আমি যাব না বাবা, অনেক রাত হয়ে যাবে, ভীষণ ঘুম পায় আমার। কর্ত্তা গৃহিণীর কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিতেন। অমর যেতো না, পড়ার ক্ষতি হবে বলে। আর একবার গৃহিণীর বোনপোর বিয়েতে তিনি একটু জোর করেই পারুলকে নিয়ে গিছলেন। সত্যি তাঁরও তো সখ-সাধ আছে, অমন সুন্দর বউ কেউ দেখবে না? সঙ্গে সঙ্গে অমর গিয়ে হাজির, বাবা পারুলকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। যখন তারা দু'জন ফিরলো হরনাথ বাবুর তখন মাঝ-রাত্তির। গহনার রাশ খুলে ফেলে বাঁচলো পারুল, কিন্তু ময়ূরকণ্ঠী রং-এর বেনারসীটা অমর কিছুতে ছাড়তে দেয়নি, সারা রাত ধরে পারুলকে দেখে অমরের আশ আর মেটে না।

অমরের বড্ড লোভ ছিল পারুলের আলতা-পরা পায়ের ওপর। অন্য কোনও সাজ-গোজের ওপর অমরের অত লক্ষ্য ছিল না। পারুলও ও-বিষয়ে তত সচেতন ছিল না। কিন্তু আলতা না পরলেই অমরের নজর পড়তো। বহু দিন রাতে নিজ হাতে করে আলতা পরিয়ে দিয়েছে সে। অমর যখন কলেজ থেকে ফিরতো, শত কাজ ফেলে পারুল গিয়ে জানলায় দাঁড়াতো। দেখতে পেলে দু'জনের মুখ ভরে উঠতো সার্থকতার আনন্দে। পারুলের বিয়ের পর কি এক কারণে তাদের ফুলশয্যা কয়েকদিন পেছিয়ে গেছলো। গলির দিকে জানলায় বসে পারুল আনমনে চেয়েছিল, হঠাৎ দেখে, রাস্তা থেকে অমর নির্ণিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে আছে। তার স্বল্প জীবনে ঠিক এ ধরনের দৃষ্টি আর দেখেনি পারুল, তাকে যে কারুর এতো ভালো লাগতে পারে একথা সেদিন সে প্রথম জেনেছিল। যে ঘরে সে থাকতো তার দরজায় পুরু কাপড়ের পরদা দেওয়া। সামনের ঘরে চায়ের আসর বসতো। মেঝেতে আসনে বসে শাশুড়ী মা চা করতেন। অমর আসতো চা খেতে, তার সুন্দর, ফরসা হাতে হলদে সূতোয় দূর্ব্বো-বাঁধা, প্রিয় পরিচিত হাতটি পরদার তলা দিয়ে দেখে দেখে পারুলের যেন আশ মিটতো না।

সেবারে দেওঘরে এক দিন বেড়াতে গিয়ে কি এক লতানে ফুল তুলে অমর সাজিয়েছিল পারুলকে, তারপর বাড়ীতে ফিরতে সে কি বকুনি খেলো দু'জনে, সত্যি সত্যি বউ-মানুষকে কি অমনি করে ফুলের গয়না পরে আসতে আছে রাস্তা দিয়ে? তাদের জীবনে যা-কিছু রোমান্স যা-কিছু আনন্দ তা শুধু দু'জনকে নিয়েই। সে আনন্দের পরিপূর্ণতার জন্যে গয়না কাপড় মোটর সিনেমা কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। কখনো বা পারুল পড়তো কবিতা, অমর মুগ্ধ হয়ে শুনতো। কি কবিতা কার কবিতা সবই সেখানে ছিল অবান্তর, একমাত্র দ্রষ্টব্য ছিল পাঠিকা। এমনি আনন্দের মধ্যে তারা চলেছিল। সংসারে দুঃখ ছিল না তা নয়। কিন্তু তাদের যুগল প্রাণের সরসতা সেটা হাসিমুখে সয়ে যাবার শক্তি তাদের দিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সংসারে কত কি পরিবর্ত্তন এলো গেলো, কিন্তু

তাদের মনে আজো সেই রং অটুট। বাড়ীতে জামাই এসেছে, রঙ্গীন কাপড় পরতে কুণ্ঠা হয় পারুলের, কিন্তু অমর বুঝতে চায় না। বলে, কি যে বিধবাদের মত কাপড় পর তুমি, দেখলে মনে হয় আমি বুঝি মরে গেছি। মনে মনে শিউরে উঠে পারুল বলে, যা-তা বোলো না, রঙ্গীন কাপড়ই পরব আমি। বাড়ীতে ও পাড়ায় কানাঘুষোর সীমা থাকে না—মাগো, জামাই-এর সামনে কি সাজের ঘটা। এক দিন কি একজিবিসান দেখতে গিয়ে লাল টুকটুকে একটা গালার কানের গয়না নিয়ে এল অমর। এক্ষুণি পরা চাই—দেখে দেখে অমরের আশ যেন মেটে না।

পারুলের মুখের চামড়া কুঁচকে এসেছে, সামনের চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু কিছুই অমর দেখতে পায় না। পারুল কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু এই উদ্দাম পাগলকে বাধা দিতে পারে না। মনে মনে ভাবে, বাইরের লোকে কি ভাববে বলে ওকে কষ্ট দেব আমি?

কোথাও নেমন্তন্ন যেতে হলে পাঁচবার পারুলকে শাড়ী বদলাতে হবে—অমরের কি সে ঝোঁক? সেই জামদানী শাড়ীটা পরো না? না, সেই কালো জংলী বেনারসীটা। হাসে নাতি-নাতনী হাসে, বৌ-মেয়ে। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যায় পারুল। বড় নাতনী স্কুলে পড়ছে, সে একটা কমলা রং-এর জর্জেট পরে দাঁড়ায়। নাতনীর পাশে জংলী শাড়ী পরে যেতে ভীষণ লজ্জা করে পারুলের। কিন্তু মুখখানা ধরে অমর যখন বলে, এ ভুবন-ভোলা রূপ। পারুল অমরের মুখ চেপে ধরে বলে, কি যে বলো তার মাত্রা থাকে না। বুড়ী হচ্ছি তাও কি দেখতে পাও না? শেষে রফা হয়, অমর বলবে না। আমার ভুবন ভরা রূপ বলবো তাতে তো আপত্তি নেই। মায়ের সাজে মেয়েরা কুণ্ঠিত হয়। পাড়ার পাঁচ জনের কাছে নাতনী নানা কথা শোনে। এক দিন নাতনী রমা এসে বললো, জানো দাদু, সামনের বাড়ীর ছায়া বললো তোর দিদি তো সাজবুড়ী—দাঁত পড়ে গাল তুবড়ে গেছে তবু কি সাজের ঘটা! অমর বোধ হয় শুনতেই পেলো না কথাটা। অন্যমনস্ক ভাবে শুধু হুঁ বললো। পারুল শুনলো কথাটা—কিন্তু অমর যে কিছুতে বুঝতেই চায় না, বলে কে কোথা কি বলছে বলে তুমি আমার আনন্দে বাদ সাধবে?

পারুলের মনে একটা দুর্ব্বল জায়গা ছিল—সে অমরের স্বাস্থ্য। ছোট বেলায় নিমোনিয়া হয়েছিল তার, অনেক কষ্টে তা থেকে বাঁচলেও করাল রোগ তার কিছু রেখে যেতে ছাড়েনি। ফলে হার্টে ড্যামেজ হয়ে গেল বরাবরের মত। ভালো স্কলার হয়েও তাই অমর সরকারী চাকরী পেলো না। একটা সামান্য চাকরীতে নিযুক্ত হল অতি সামান্য বেতনেই। প্রিয়তম স্বামীর প্রতি অদৃষ্টের এই নিদারুণ পরিহাস পারুলের বুকে গভীর হয়েই বেজেছিল। অসুস্থ স্বামী ট্রামে-বাসে করে কি কষ্টে যে উপার্জন আনেন, সে কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারতো না। সেই পয়সায় বিলাসিতা করা সম্ভব নয় কিন্তু অমর তা বুঝতো না, বলতো, আমারও তো সাধ হয়? স্নো-পাউডার সেণ্ট-ক্রীম এ সবের প্রয়োজন ছিল না। পা দু'টি আলতায় টুকটুকে, কপালে সিঁদুরের টীপ আর হাতে রঙ্গীন কাচের চুড়ী আর রঙ্গীন শাড়ী পারুলের পরনে—এইটুকু মাত্র ছিল তার সাধ।

ডাক্তাররা বারে বারে বলতো, অমরের স্বাস্থ্য মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, হৃৎযন্ত্র অত্যন্ত

দুর্ব্বল, যে-কোন সময়ে তা বিকল হতে পারে। তারো চেয়ে দুর্ব্বল ছিল অমরের মন। সহজেই বড় বেশী আঘাত পেতো সে। এই আপনভোলা মানুষটিকে নিয়ে পারুলের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। স্বার্থপর সংসারে ছল-চাতুরীর অভাব ছিল না, যে যেভাবে পারতো অমরকে ঠকিয়ে নিতো, ঘরের কোণে পারুল জ্বলে মরতো সেই দাহে। সংসারের শত অভাবের মধ্যে পারুল অমরের ওষুধ ও আহারের বিন্দুমাত্র অভাব সইতে পারত না, সে জন্য পরিশ্রমের তার অন্ত ছিল না। কিন্তু দেবে কি? অদৃষ্টের পরিহাসে সব কিছু ভালো জিনিষেই তো অমর বঞ্চিত। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ দৈহিক সম্বন্ধ তাদের বহু দিনই শেষ হয়ে গিছলো, কিন্তু অন্তরের গভীর প্রেম তাতে আরো সুগভীরই হয়েছিল—এক বিন্দু কমেনি।

অমরের মনে হত, সেই তরুণী পারুলের চেয়ে এ পারুল যেন আরো সুন্দর, এ যেন ভোগবতী পার হয়ে অমরাবতীতে পৌঁছেছে, এ মহিমান্বিতা সৌন্দর্য্যের যেন তুলনা হয় না। আর পারুলের মনে হত, এমনটি আর দেখিনি ত কভু আমার যেমন আছে। তার চোখে অমরের সেই প্রথম দিনের দেখা অতুল রূপ চিরদিন অটুট ছিল। সেই পাটনায় হলদে জিনের কোট আর কালো পাড় ধুতি পরা ফর্সা ছেলেটি—টকটক কচ্ছে রং, কালো কোঁকড়া চুল আর বিস্ময়-বিমুগ্ধ দু'টি চোখ, তাতে স্নেহ ও ভালোবাসা যেন ঝরে পড়ছে।

পারুলের সখ ছিল গাছের, কলকাতার স্থানের দুর্লভতা তাকে আটকাতে পারেনি। টবে গামলায় নানা রকম ফুলগাছে তার ছাদ-বারান্দা ভর্ত্তি ছিল। যতক্ষণ অমর বাড়ীতে থাকতো সেই পারুলের হাতে তৈরী কুঞ্জবনে ইজি-চেয়ারে বসে বইএর মধ্যে ডুবে থাকতো, সে বই ও পারুল ছাড়া আর কিছু সম্বন্ধেই সে সচেতন ছিল না।

সংসারে এমন ঘটনাও হয় যা কেউ কখনো ভাবেনি। পারুল মারা গেল, অমর প্রথমে যেন অবাক হয়ে গেলো। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসে দাঁড়ালো পারুলের শিয়রে। পারুলকে খাট শুদ্ধ নিয়ে এসেছে বারান্দায়। আজ পারুলের সাজে কারুর কুণ্ঠা নেই। বিয়ের লাল টুকটুকে জংলা বেনারসী তার পরনে। মাথায় লাল টকটকে সিঁদুর। সে সিঁদুরের আভায় পারুলের টকটকে ফরসা রং আরো যেন সুন্দর লাগছে। কপালে তাঁর চন্দন আঁকা, কাঁধের ওপর সেই পরিচিত নীল তিলটি। হাতের দিকে চেয়ে অমর চমকে উঠলো। কই হাতে তো সেই মীনে-করা রুলি নেই যা সখ করে পারুল গড়িয়েছিল। শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের টানা খুলে অমর এক-রাশ কাচের চুড়ী নিয়ে এল। যা সখ করে মাঝে মাঝে কিনে আনতো অমর, কিন্তু লজ্জায় দিনের বেলা পারুল তা পরতো না, রাত্রে পরে আবার খুলে রাখতো। আজ দিনের আলোয় বহু পরিচিত বন্ধু-আত্মীয়ের সামনে অমর তা পারুলের হাতে পরিয়ে দিলো। কেউ হাসলো না, কেউ বিদ্রূপ করলো না। কালো শিং-এর একটা আংটি অমর মুলোজোড়ের মেলা থেকে এনেছিল পারুলের জন্যে সেটি পরিয়ে দিলো। তারপর নিজের কোঁচা দিয়ে তার পা দু'টি মুছিয়ে আলতা পরিয়ে দিলো। বারে বারে মনে পড়লো, ওই পায়ে হাত দেওয়া নিয়ে কত মান-অভিমান হয়ে গেছে। পারুল বলতো, এ কি কাণ্ড তোমার? তুমি গুরুজন পায়ে হাত দেবে আর

আমি নরকে পড়ে মরি? অমর বলতো, আর স্বামীর মনে কষ্ট দিলেই বুঝি অক্ষয় স্বর্গ? প্রত্যেক বারই হার মানতে হয়েছে পারুলকে। আলতা পরানো শেষ হলে বরাবর পারুল অমরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত। আর মনে মনে বলতো, ঠাকুর, আমার এ জায়গা তুমি অক্ষয় রেখো। আজ আলতা পরানোয় কেউ বাধা দিলো না। কেউ উঠে প্রণাম করলো না। শুধু পারুলেরই পোঁতা শিউলী গাছ থেকে ফোটা ফুল ঝরে পড়লো তার মাথায়। অন্যমনস্ক অমর বার কয়েক হাত বুলালো পারুলের শুভ্র ললাটে। পারুলের ঠোঁটের কোণে আজো তেমনি দুষ্টু হাসি। সুন্দর মুখে মৃত্যু বিন্দুমাত্র কালিমা আঁকতে পারেনি। অমর অবাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো, যেদিন প্রথম এই শাড়ী পরিয়ে এ বাড়ীতে এনেছিল সেদিনের চেয়ে আজকের পারুল এক ফোঁটা কম সুন্দর নয়। দিনে দিনে পারুলের রূপ যেন বেড়েই চলেছিল।

সেদিনের পারুলের দিকে চেয়ে দেখতে তার অধিকার ছিল না, কি লজ্জা কি কুণ্ঠা যেন কি একটা মস্ত অপরাধ করছে। আজ সহানুভূতিতে সকলের হৃদয় ভরা, আজ পারুলের সাজাও যেমন সহজ তেমনি সকলের সামনে প্রাণ ভরে পারুলকে দেখা যায়, কোন অপরাধ হয় না, চিরদিনের মত হারানর পূর্বে বুঝি এই অবাধ স্বাধীনতা। স্থির হয়ে অমর দেখলো, রাশি রাশি ফুলের গয়নায় পারুলকে সবাই সাজিয়ে দিলো—অমরের মনে পড়লো সেই অনেক দিন আগে গ্রামের কথা। সেদিন ফুলের গয়না পরিয়ে রাস্তা দিয়ে আনায় কি বকুনি খেতে হয়েছিল। আজ এ সাজে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে বুঝি আর কিছু দোষ নেই।

মাসিক বসুমতী ১৩৫৭

কাঠগড়ায়

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

বিরক্ত হয়ে নরেন দু'টো হাত আড়াআড়ি ভাবে ষ্টিয়ারিং এর উপর রেখে বাঁ পা দিয়ে এ্যাকসিডেণ্ট ব্রেক কষে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক একটা শব্দ করে গাড়ীটা রাস্তার মাঝখানে থেমে গেল। ইঞ্জিনের সামনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল একটি বৃদ্ধ এবং তার পিছনে কয়েকটি শিশু সহ জড়পুত্তলীবৎ একটি নারী। অভ্যাস বশতঃ নরেন বৃদ্ধটিকে একটি কটূক্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার গতিবিধি লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারল, এরা কলকাতার নূতন আমদানী; কাজেই এই পথে হাঁটায় এরা এখনও অভ্যস্ত হয়নি। বৃদ্ধকে কটূক্তি করা নরেনের আর হোল না, কিন্তু পিছন থেকে ওকে অনুযোগ শুনতে হোল। যেন বৃদ্ধটিকে গাড়ীর সামনে হুড়মুড় করে এসে পড়তে নরেনই বলেছিল। পিছনের আসন থেকে মনিব-কন্যা রুমা তখন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলছে, "এত দেরী করলে ট্রেণ ধরা যাবে কি করে নরেন?"

নরেন এখন অনেকগুলি গাড়ীর পিছনে রীতিমত পিছিয়ে পড়েছে। পার্ক ষ্ট্রীটের ট্রাফিক এখন বন্ধ, চৌরঙ্গীর খোলা, প্রমত্ত ঝঞ্ঝার মত অবিশ্রাম গতিতে গাড়ীর স্রোত চৌরঙ্গীর বক্ষ মন্থন করে ছুটে চলেছে। সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়ালে তার প্রচণ্ড গর্জন শোনা যায়; কিন্তু এই যন্ত্র-যানের তীরে দাঁড়িয়ে এক ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। গাড়ীর হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ হওয়ায় আনাড়ী লোকেদের পক্ষে পথ চলা আরও বিপদের হয়ে উঠেছে। অন্যমনস্ক ভাবে নানা কথা ভাবতে ভাবতে নরেন বলল "ট্রেণ আপনাকে ঠিক ধরিয়ে দিতে পারবো দিদিমণি; হর্ণ না দিয়ে গাড়ী চালানো বড় অসুবিধে—

"ঠিক বলেছ"—পিছন থেকে রুমা বললে, "বুড়োটা যদি চাপা পড়তো নরেন, তা'হলে কি হোত?"

"কি আর হোত!"—অম্লান কণ্ঠে নরেন বললে, "আমার ফাঁসী হোত—"

পিছনের আসন থেকে উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ ভেসে এল, "পিছনের বউটা কি অদ্ভুত! রাস্তায় হাঁটতে পারছে না তবু ঘোমটা টানা চাই।" মিষ্ট হাসির শব্দে অন্য গাড়ীর আরোহী চকিত হয়ে উঠল, কিন্তু নরেন মনে মনে সরোষে মন্তব্য করল, "তোমাদের কাছে সবই অদ্ভুত বটে।"

চৌরঙ্গীর ট্রাফিক খুলেছে, কোনও রকমে ভীড় কাটিয়ে এখন রেড রোডে গিয়ে পড়তে পারলে হয়, তার পর ষ্ট্রাণ্ড রোডে একেবারে ফিফটি মাইল স্পীড; তখন নরেনকে পায় কে? অদম্য উৎসাহে সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই দেখা গেল, গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে বাস্তুহারাদের এক বিরাট মিছিল এগিয়ে আসছে; আবার ট্রাফিক বন্ধ হোল। গাড়ীর মধ্যে রুমা অধৈর্য্য হয়ে উঠল; "নাঃ, আজ আর মাদ্রাজ মেল ধরা যাবে

না। তপন এসে ওকে দেখতে না পেয়ে কি ভাববে? এরা এসব পথে আসে কেন? ওদের জন্য ত নর্থ ক্যালকাটা পড়ে রয়েছে, যত খুশী সেখানে গিয়ে সভা শ্লোগান করুক।"—গভীর বিরক্তিতে রুমার রক্ত-রঞ্জিত অধর-প্রান্ত বিকৃত হয়ে উঠল। হাতের কাচ-বসানো রেশমের ঝোলা থেকে রুমাল বার করে সে বার বার মুখ মুছতে লাগল।

এদিকে সেই মিছিলের পানে চেয়ে নরেনের মনটা হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেল। এই চাকরীটা না থাকলে সেও ত গিয়ে ওই দলে ভিড়তো। এই মিছিলটাকে বাস্তুহারা না বলে বেকারদের মিছিল বললেও ভুল বলা হয় না। ভীড় একটু পাৎলা হতে নরেন পাশ কাটিয়ে গাড়ী বের করে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ষ্ট্রাণ্ড রোডে এসে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অপেক্ষাকৃত শান্ত নির্জন পথ। হু-হু করে ছুটে আসছে গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া, নরেনের উত্তপ্ত দেহ-মন ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসতে লাগল। বাঁ হাতে কাঁধটা একবার মুছে নিয়ে সে অস্পষ্ট স্বরে বললে, "আঃ, কি মিষ্টি হাওয়া, ঠিক যেন ভুলে-যাওয়া মায়ের হাতের স্পর্শের মত মৃদু কোমল, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়ার হাতের স্পর্শের মত রোমাঞ্চকর!" নরেনের দেহের মধ্যে কেমন যেন শির-শির করে ওঠে, ওর চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্য ঝাপসা হয়ে যায়।

"এই গেল গেল, ধর ধর। শালা, চোখ নেই? নেশা করে গাড়ী চালায়?" উত্তেজিত জনতার চিৎকারে ও আক্রমণে কি হয়েছে ঘটনা বুঝবার আগেই হতভম্ব হয়ে নরেন গাড়ী থামিয়ে দিল। জনতা হাত ধরে তাকে গাড়ী থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে গালাগালির সঙ্গে মারপিট সুরু করে দিল। দু'হাতে ভীড় ঠেলে নরেন ঝুঁকে পড়ে দেখল, তার গাড়ীর ইঞ্জিনের সামনে ধূলিতে লুটিয়ে পড়ে আছে একটি মলিনবসনা রমণী। মুখখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত। কপালের দু পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ক্ষীণ একটি রক্তের ধারা। মুহূর্ত্তের মধ্যে নরেনের চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে গেল। কে এই নারী? একেই সে একটু আগে স্মরণ করছিল না?

সেটা ষ্ট্রাণ্ড রোড আর ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়। পুলিশের আগমনে জনতার ভীড় দেখতে দেখতে পাৎলা হয়ে গেল। রুমার সকাতর অনুরোধে গাড়ীর নম্বর টুকে নিয়ে তারা নরেনকে ছেড়ে দিল। নির্বাক্ নরেনের হাতে যন্ত্র-যান আবার গর্জে উঠল। পশ্চাতে ধূলি-ধূসরিত রাজপথে মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে রইল রক্তমুখী নারী।

হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ওদের গাড়ীর পাশে এসে থেমে গেল। তার আরোহীর ইঙ্গিতে নরেনও সঙ্গে সঙ্গে তার গাড়ী থামিয়ে দিল। ট্যাক্সির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি যুবক বললে, "হ্যালো ডারলিং, হোয়াই সো লেট্?"

রুমার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়; সজল চোখে যুবকের পানে চেয়ে সে বললে, "এক্সকিউজ মী ডিয়ার, তুমি চলে এস এই গাড়ীতে;"

অবস্থা বুঝে নরেন সেখান থেকে সরে গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাহায্যে যুবকের মাল-পত্তর নিজের গাড়ীর কেরিয়ারে তুলে ফেলল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সাহেব এসে

রুমার পাশে বসল। জ্বলন্ত চোখে নরেনের পানে চেয়ে রুমা আদেশ করলে, "কোঠী চলো।"

ভিটে-মাটি-ছাড়া স্ত্রীহন্তারক নরেনের মনে আহত পৌরুষ গর্জে উঠল। চাপা ক্রোধে গাড়ীতে উঠে বসে সে ষ্টার্ট দিল। পিছনের আসনে কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠেছে। নরেনের বুকে আগুন জ্বলছে, আর চোখের সামনে ভাসছে একটি সুন্দর পরিচিত মুখ, তার ললাটে ক্ষীণ রক্তের ধারা! ঠিক তার মনিব-বাড়ীর সাদা চুণকাম করা দেওয়ালে লাল রেশমের পর্দার মত।

হাজতের অপরিচ্ছন্ন কক্ষে অন্যমনস্ক ভাবে বসে আছে নরেন। তার জামীন কেউ হয়নি। খুনী আসামীর আবার কেউ জামীন হয় নাকি? তার জন্য ওর মনে কোনও দুঃখ নেই, আসন্ন শাস্তির আশঙ্কায় ও মোটেই বিচলিত হয় না। একটি প্রশ্ন ওকে শুধু দিবা-রাত্র বিমনা করে রেখেছে, সেটি হচ্ছে সেই রক্তমুখী নীলার প্রসঙ্গ। তার কি হোল? সে বেঁচে আছে, না মারা গেছে? তার চোখের সামনেকার সূর্যালোকিত উজ্জ্বল সকাল বেলাটি ধীরে ধীরে ঘন কুয়াসায় আবৃত হয়ে যায়। তার পিছনে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে ওঠে শ্যামল বনে ঘেরা শান্ত একটি গ্রামের দৃশ্য। তার আম কাঁটালের ছায়ায় ঘেরা পর্ণকুটিরের মৃন্ময় অঙ্গনে লক্ষ্মীপূজার আল্পনা আঁকছে একটি লাবণ্যবতী তরুণী, সর্বাঙ্গে তার কাঞ্চন ফুলের শুভ্রশ্রী। নরেন বিদেশে চাকরী করে, তিন মাস, ছয় মাস অন্তর সে দেশে যায়; তার প্রতীক্ষায় ঘরে বসে প্রহর গোণে নীলিমা। সেই কথা ভেবে নরেনের প্রবাসের কর্ম-নীরস দিনগুলি রসসিক্ত হয়ে ওঠে। এমন সময় দেশে বেঁধে গেল দাঙ্গা; বিদেশে বসে নানা রকম গুজব শুনে শুনে নিজের গ্রামে যাবার জন্য নরেন মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু গাড়ী চলাচল না হলে লোকে দেশে যাবে কি করে? সে সব দিনের কথা মনে হলে আজও নরেনের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তারপর দেশের অবস্থা কিঞ্চিৎ শান্ত হলে নরেন দেশে গিয়ে ভাবল, এখানে না এলেই ভালো ছিল। কেন না তাদের গ্রামে কোনও লোক-জন নেই। বাড়ী-ঘর সমস্ত গভীর শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে। তার মধ্যে দামী বস্তু আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুঃসংবাদ হোল এই যে, তার স্ত্রী নীলিমার সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না—ভিন্ গাঁয়ের লোকেরা কেউই কোনও সঠিক খবর দিতে পারল না। নরেন তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভাবত, কিন্তু কোনও চিন্তাই শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করত না। সেই থেকে নরেন আর দেশে যায়নি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, তার দেশের পরিত্যক্ত ভিটেতে একটি ভিখারিণী রমণী যেন শূন্য মনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে—তার কুটিরের শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে রমণীর সমস্ত সৌন্দর্য্যও যেন মায়ামন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাস্তবিক, এ পৃথিবী থেকে অনেক বস্তু অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটি অস্পষ্ট কোলাহলে নরেনের চোখের সামনে থেকে পাৎলা কুয়াসা কেটে গেল। তার হাজতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জেলার; আদালতে যাবার সময় হয়েছে। স্তিমিত দীপশিখার মত তার আচ্ছন্ন দেহটা সকালের জ্বলন্ত আলোয় প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে

স্তিমিত দীপশিখার মত তার আচ্ছন্ন দেহটা সকালের জ্বলন্ত আলোয় প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে কেঁপে কেঁপে এসে কয়েদী-গাড়ীর অন্ধকার আবর্ত্তের মধ্যে হারিয়ে গেল।

লোকে লোকারণ্য আদালত-কক্ষ। বিচার আরম্ভ হতে আর দেরী নেই; কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে নরেন। তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ ভাবলেশহীন। পাগলের মত সে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে দর্শকমণ্ডলীর দিকে। এক সময় সবিস্ময়ে সে দেখল, অপরিচ্ছন্ন বসন-পরিহিতা তার স্ত্রী নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে ও কে আসছে? সেই কজ্জলটানা চক্ষু, রক্তবিম্বাধরা তার প্রভুকন্যা রুমা নয় কি? হ্যাঁ, তাই ত! কিন্তু এ যে অসম্ভব ব্যাপার! যারা তার হাজতবাসের সময় পুরাতন ভৃত্য বলেও তাকে একবার স্মরণ করেনি, আর আজ!—ওঃ বুঝেছি, আজ বিচার দেখতে এসেছে কিন্তু নীলিমাকে সংগ্রহ করল কোথা থেকে? নরেন নিজের চোখকে কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছে না। ওদিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় নীলিমা বেশ সপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে বলবে যে, সে পথের ভিখারিণী? বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে; রুমা চকিত হয়ে বার বার নীলিমার দিকে দৃষ্টিপাত করছে; না সে ঠিক আছে। এক সময় আদালত-কক্ষকে স্তম্ভিত করে দিয়ে নীলিমা বেশ স্পষ্ট স্বরে বললে, "আমি যে গাড়ীর নীচে পড়েছিলুম, তাতে গাড়ীর চালকের কোনও দোষ ছিল না; কেন না, আমি ইচ্ছে করেই চলন্ত গাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরে ওর কাছে ভিক্ষা চাইতে আসছিলুম। ও আমার স্বামী!"

জোড়া জোড়া বিস্মিত দৃষ্টি অগ্নিগোলকের মত বিদ্ধ করতে লাগল লাবণ্যবতী নীলিমার কম্পিত দেহলতাকে। ইতিমধ্যে সকলে শুনলো যে মামলা ডিসমিস হয়ে গেছে। কলগুঞ্জনে আদালত কক্ষ মুখর হয়ে উঠল।

উত্তাল জনসমুদ্রে আন্দোলিত মধ্যাহ্নের রৌদ্রতপ্ত রাজপথ। নরেন সেই মুক্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে মুক্তির একটা পরিপূর্ণ নিশ্বাস নিল। রুমা এবং নীলিমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সে গাড়ী-ষ্ট্যাণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় অদূরে গাছের আড়ালে দেখা গেল লাল শাড়ীর জরীর আঁচল, তার পাশে ময়লা ডুরে শাড়ীর ফুলপাড়। ওরা এদিকেই আসছে; নরেনের হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্-ধ্বক্ করে উঠল। যে রুমাকে ধনিকন্যা বলে ও চিরদিন মনে মনে অবজ্ঞা করে এসেছে, আজ নিজের স্ত্রীর পাশে দেখে ওর মন অকারণ সহানুভূতিতে ছল্‌ছল্ করে উঠল। এক জন ছিল আহত হয়ে পথে পড়ে, আর এক জন ছিল মিলনের নেশায় বিভোর হয়ে প্রাসাদের উচ্চতম শিখরে, এ দু'জনের মধ্যে মিলন সম্ভব হোল কি করে?

নরেন বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, এমন সময় তার কানের পাশে পরিচিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল, "এই যে নরেন, কেমন আছ? তোমার জন্য এই কয় দিন ধরে আমার যা পরিশ্রম করতে হয়েছে, সে কথা নীলিমা জানে।"

বিনীত হেসে নমস্কার করে নরেন বললে, "দিদিমণি, আপনি এ সবের মধ্যে কেন এলেন? বড় সাহেব শুনলে কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হবেন।"

সুন্দর ভ্রুভঙ্গী করে রুমা বললে, "কচু, তোমার বড় সাহেব জানবেন কি করে? জানতে পারলে আমি কিন্তু নির্ঘাৎ ত্যাজ্য কন্যা হবো।"

কথা বলতে বলতে তারা একটি ছোট্ট গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। রুমা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "এখন আমাদের বাড়ী চল নরেন, বাবা-মা তোমাদের দু'জনকে দেখলে খুব খুশী হবেন; কেমন, যাবে ত?"

নরেন চকিতে নীলিমার দিকে দৃষ্টিপাত করল; কিন্তু সে মুখ তখন গুণ্ঠনে আবৃত। নরেন ভাবল, পুরানো আবাসে ফিরে না গিয়ে সে স্ত্রীকে নিয়ে যাবেই বা কোথায়? এত বড় পৃথিবীতে আজ তার নিজের বলে কোথাও এক ফোঁটা মাটি নেই। এই শোচনীয় বেকারত্বের যুগে অন্য চাকরিই বা সে পাচ্ছে কোথায়? ঘাড় নেড়ে সে বললে, "হ্যাঁ দিদিমণি, সেখানেই আমি যাবো।"

"তুমি নীলিমাকে নিয়ে ভেতরে বোসো।"—বলে রুমা চালকের পাশে গিয়ে বসল। নরেন দেখলো, ষ্টিয়ারীং ধরে বসে আছে সেদিন হাওড়ার পথে দেখা সেই যুবকটি।

পরিচিত পথ দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। নরেনের প্রভুর আসনে বসে মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার পাশে সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছে নিতান্ত গ্রাম্য-বধূ নীলিমা। পথের এলোমেলো বাতাসে তার মাথার গুণ্ঠন খসে গেছে। মুখখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত। শ্রমশ্রান্ত হলেও ভারী কমনীয়। কপালের পাশের ক্ষতচিহ্নটি দগ্‌দগ্‌ করছে। এ মুখ নরেনের অত্যন্ত পরিচিত। সে চকিতে একবার বাইরের আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখল, তাদের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে রুমা আর তপন গল্পে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নরেন অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে ডাকল, "নীলা?"

নীলা তার স্তিমিত দীপশিখার মত দৃষ্টিখানি তুলে ধরল নরেনের মুখের পানে। নরেন তার পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললে, "তুমি কোলকাতায় এলে কি করে?"

নীলিমার চোখ দু'টি ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। সে বললে, "মরে যাইনি কেন সেই কথা জিগ্যেস কর? কিন্তু মরতে পারিনি শুধু তোমার জন্য—"

নরেনের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল; না জানি এবার কি সাংঘাতিক কথা শুনতে হয়, সে ভালো করে নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—যাঃ, মুখের কোনও রেখা কলঙ্কের কালিমায় কুটিল হয়ে ওঠেনি; সেই রকম ঠিক পূর্বের মতই ভীরু রজনীগন্ধার মত প্রাণ-রসে টলটল করছে। তবে—

নরেনের দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিতা হয়ে নীলিমা বললে, "দাঙ্গার ভয়ে তখন দেশের কি অবস্থা, তুমি ত জানো না? সকলে ভিটে-মাটি ছেড়ে পালাবার জন্য ছটফট করছে। শুধু প্রাণটুকু রক্ষা করবার জন্য লোকে টাকা-পয়সা জলের মত খরচ করছে, নানা লোকে নানা রকম ভয়ের কথা বলছে। একলা ঘরে দুয়ার বন্ধ করে আমি সারা দিন কেঁদে মরি, এমন সময় বামুনপাড়ার এক জনরা কোলকাতায় যাচ্ছে শুনে অনেক কেঁদে-কেটে আমি তাদের সঙ্গী হলাম—তারা কোলকাতায় পৌঁছে আমায় ইষ্টিশানে ফেলে চলে গেল। আমি

জানতুম তুমি গাড়ী চালাও, তাই সেই থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়াই, গাড়ী দেখলেই গিয়ে ভিক্ষে চাই, এই ভিক্ষে করে খেয়ে কোনও রকমে বেঁচে আছি; রাত্রে একটা বুড়ীর কাছে থাকি, তাকে রান্না করে দিতে হয় শুধু সন্ধে বেলা।" নীলিমা থামল, উত্তেজনায় তার দেহ থর-থর করে কাঁপছে; একটু চুপ করে থেকে আবার সে বললে, "সেদিন তোমায় দেখেই গাড়ীর সামনে দিয়ে ছুট্‌ছিলুম, ইচ্ছে ছিল তোমায় গিয়ে ধরে ফেলবো, কিন্তু তা হোল না। হাসপাতালে যখন জ্ঞান হোল, তখন পাশে এই দিদিমণিকে দেখতে পেলুম, বড় ভালো মেয়ে, আমায় বড় যত্ন করেছে। সেই ত বুদ্ধি করে আজ আমায় এখানে নিয়ে এসেছে।'—নরেনকে নীরব দেখে সে আবার বললে, "আমি ভিখিরী হয়েছি বলে কি তুমি আমায় ঘেন্না কোরছো?"

নিতান্ত সরল প্রশ্ন—কিন্তু এর উত্তর নরেনের কণ্ঠে এসে আটকে গেল।

মাসিক বসুমতী ১৩৫৮

সিঁদূরে মেঘ

সুলেখা সান্যাল

তার এই ঘর!—বড় আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল দেওয়া মোটামুটি সাজানো! আরামের উপকরণগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রাখা। সচ্ছলতার ছাপ দেওয়া পরিবার! আশ্রয় তো নিরাপদ! তবু খুশি হয় না—খুশি হয়নি আজ কবছরেও। ঘুরে-ফিরে, সেজে-গুজে মটরে চড়ে বেড়ালে কি হয়, ফাঁকটাকে ভরবে কি দিয়ে! এ যেন নদী আর সমুদ্রের ব্যবধান, ব্যবধান দেহ আর মনের। লোকটার কী কূল পাওয়া যাবে না! এতদিন তো বিয়ে হয়েছে তাদের দুজনের, দারিদ্র্যের নিম্নস্তর থেকে তাকে উঠিয়ে এনে অনন্ত বসিয়ে দিয়েছে অনেকখানি উঁচুতে—কর্তব্য কি তার শেষ ওখানেই? বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে যায়। কিছুতেই কি লোকটা মন খুলতে পারে না—মেলে ধরতে পারে না তার কাছে। অমন করে বেড়ায় কেন অপরাধীর মতো?

নাকি মালতীর সব কথা সে জেনে ফেলেছে, ভাবতে গিয়ে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এল। জেনে ফেলেছে তার অতীতকে—তার জীবনের মুছে ফেলা আর এক অধ্যায়কে। তাই বুঝি অমন করুণ ভাবে তাকিয়ে থাকে মালতীর মুখের দিকে, রাতে ঘুম ভেঙে পায়চারি করে, অনুশোচনা করে নিজের কৃতকর্মের জন্যে! নাকি তা-ও নয়—পছন্দ হয়নি ওর মালতীকে। যাকে হারিয়েছে তার মতোই খুঁজছিল নাকি কাউকে সে, মালতীকে দেখে—কাছে রেখেও তাই অমন বিতৃষ্ণা তার।

ঘুরতে-ফিরতে চোখ যায় ঘরের দেওয়ালের অর্ধেকটা জোড়া অয়েল-পেন্টিংটার দিকে, প্রথম দিন বিয়ের পর এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল বিস্ময়ে। আবক্ষ মূর্তি অপরূপ এক মেয়ে বুঝি দেওয়ালে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। শাশুড়ি কাছে এসে বলেছিলেন, "প্রণাম করো মালতী। এ ললিতা—অনন্তের আগের বউ"—বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়েছিলেন, সেটাও তার চোখ এড়ায়নি। প্রণাম করেনি সে—জেদী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়েছিল ছবিটার নিচে, শাশুড়িকে দীর্ঘনিশ্বাসটা চাপতে দেখে। মনটা দমে গিয়েছিল এক মুহূর্তে।

রাতেও সেই একই পর্ব—চেয়ারে বসে একদৃষ্টে অনন্তকে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাগে গা জ্বলে গেল, অনন্তও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "অতই যদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার ব্যাপার তবে আবার বিয়ে করলে কেন তুমি?"

ম্লান একটু হাসি ফুটল স্বামীর ঠোঁটে, "ললিতার কথা বলছ? বলব একদিন সব কথা তোমাকে, দীর্ঘনিশ্বাস তুমিও ফেলবে।"

তারপর কত রাতে স্বামীকে দেখেছে বিছানা ছেড়ে উঠে যেতে—অনেকগুলো দীর্ঘনিশ্বাস শুনেছে, ছবিটার নিচে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

সেই থেকেই শুরু হয়ে গেছে ফাঁকটা। অদ্ভুত শূন্যতার বোঝা নিয়ে দিনগুলো কাটাতে হয় তাকে। কতদিন লুকিয়ে কেঁদেছেও। একটা ছবির দিকে তাকিয়ে ওরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আর সে যে জীবন্ত মানুষটা…! অতীতকে মুছে ফেলে, চোরের মতো বাঁচতে এসেছে, নাম লুকিয়ে, ইতিহাসকে চেপে রেখে; অনন্ত ডেকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেছে তাকে? কোনোদিন মন খুলে কথা হয়েছে দুজনের? যে কথা অন্ধকার ঘরে একা বসে আওড়ায় নিজের মনে মনে—গল্প করে যায় দেওয়ালকে, অনন্তর কি এতটুকু প্রাণ নেই, শুনতে চায় তার কাছে?

মাঝে মাঝে বুক ভেঙে যেন কান্না আসে—ক্ষত-বিক্ষত এ শরীরটার কথা ভেবে সর্বনাশের স্তর থেকে কোনোমতে উঠে আসার উত্তেজনায়। তারই পরিশ্রমের অবসাদে। কতদিন মনে হয়েছে অনন্তকে সব কথা বলে দেবে সে, বলে হাল্কা হয়ে যাবে, আশ্রয় নেবে আর একজনের মনের কোণে। চিন্তা-ভাবনাটাকে ভাগাভাগি করে নেবে, ভাগাভাগি করে নেবে দুঃখ-বেদনাগুলো। কিন্তু হল কই? ভেবেও আবার অন্ধকারেই মুখ ঢেকে থাকা। সে তো আজ কতদিনের কথা তবু যেন ভোলা যায় না? ভোলা তো দূরের কথা, তারই আশংকায় শিউরে ওঠে মনটা মাঝে মাঝে খবরের ফুল্‌কিতে এখনো?

মা পুঁইডাঁটা-কুটছিলেন, বঁটিখানা কাত করে রেখে উঠে এলেন ডেকে ডেকে মেয়ের সাড়া না পেয়ে। বারান্দার একপাশে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে মেয়ে রুদ্ধ কান্নায় ফুলছিল—গায়ে হাত রেখে হেসে ফেললেন, "নে বাপু। দেবনা গলায় দড়ি। কর তুই চাকরি। মন মানে না—তাই বলেছিলাম। কত কি শুনি—অলক্ষুনে সব কথা! বলেছিলাম তাই।"

সন্ধ্যে থেকে মেয়ের আজ এমনি ধারা ভাব, কোন্ বন্ধু সাপ্লাইতে কাজ করে সে নাকি চাকরি করে দেবে ওকে।

এমনি যে হবে সে কথা সেদিনই বুঝেছিল মানদা, অসময়ে বিনয়কে বাড়ি ফিরতে দেখে। জ্বরতপ্ত মুখখানার দিকে তাকিয়েও মায়া হল না একটু ঝংকার দিয়ে উঠেছিল, "যুদ্ধের সময়! কত বসে থাকা লোক চাকরি পাচ্ছে, কচি কচি মেয়েগুলো পর্যন্ত একশো, দেড়শো করে ঘরে আনছে! আর তুমি চাক্‌রে মানুষ কিনা, চাকরি খুইয়ে বাড়ি ফিরলে—হ্যাঁগো?"

উত্তর সেদিন বিনয় না দিলেও, ক'দিন পরেই পেয়ে গেল মানদা যেদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকা বউ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "এই জন্যেই। চাকরিটা গেল কেন বুঝলে তো?"

কলেজে পড়া বন্ধ করে চাকরির খবর নিয়ে বাড়ি ফিরল মালতী তার কয়েকটা দিন পরেই। বিনয় নিজেই চেষ্টা করে গিয়ে উঠল এক ফ্রি বেডের হাসপাতালে। দেখতে গিয়ে চাকরির কথা জানালে খুশি হয়ে মত দিয়ে দিল, "তুই আমাকে পাঁচটা করে টাকা দিস খুকি—ফল খেতে। ভালো হয়ে যাব।" মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ জানাল। কিন্তু গোলমাল বাধাল মালতীর মা, "চাকরি কি আবার! গলায় দড়ি দেব তবে। যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে, যা খুশি তাই করবে ভেবেছ!"

মেয়ে প্রথমে রাগে লাল হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ—তারপর কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে, "তবে চলবে কি করে শুনি? বাবার একটু পথ্যি জুটছে না—মণ্টুটার পড়া বন্ধ। রোজ রোজ তোমার ওই উঠোনের পুঁই-এর চচ্চড়ি আর ভাত—পারবো না খেতে। কখ্‌খনো না।"

ছেলেমানুষের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না দেখে অত দুঃখেও হাসি পেল মানদার—এমন সুন্দর মেয়েটা তার কী ছেলেমানুষ। জানিনে কপালে ওর কি আছে। কতক্ষণ কেটে গেল—সাড়া না পেয়ে পেয়ে শেষে মাকেই উঠতে হল—বলতে হল, "কর তুই চাকরি।"

এ বাড়িটার উত্তর-পুব কোণটায় তাকালে বুঝি বা দেখা যায় এস্‌প্লানেড্ ইস্টের সেই মৃত্যুপুরী, কতদিন আগে ইস্কুলে পড়বার সময় বিনয়ের হাত ধরে ফ্রক পরা মালতী ঘুরে গেছে ও রাস্তায়। আঙুল দেখিয়ে বিনয় বলত, "ওটা কি বল্‌তো খুকি? চিনিস্‌নে? দূর বোকা। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। বল্‌তো—লাইব্রেরি মানে কি?"

আজ সেখানে ঢুকে অফিসি কায়দার চমক দেখে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল—সমস্ত শরীর ঘেমে উঠল নিজের অজ্ঞাতে।

ভারি মামুলি পরীক্ষা, সব যেন ঠিক করাই ছিল তার জন্যে, চাকরিটা নিতেই যা বাকি। মাইনে সে পাবে দেড়শো টাকা, বন্ধু শেফালীর সমান। অতগুলো টাকা! ভেবে যেন থৈ পায় না। একসঙ্গে অতগুলো টাকা দেখেছে নাকি কোনোদিন, তাই নাকি মাসের শেষে তার হাতেই আসবে।

বাসে আসতে আসতে শেফালী কিন্তু ভারি হতাশ করে দিল তাকে, "ভারি তো টাকা! দেড়শো। ভাবছিস সংসার চালাবি? প্রথমে অনেক মেয়েই ভাবে তা, কিন্তু মাসের শেষে চলে যাবে কোথা দিয়ে টের পাবিনে। তোমার ওই ছেঁড়া শাড়ি আর অমন ফাটা মুখ নিয়ে অফিসে গেলে চলবে বুঝি? তাহলে আর উঠতে হবে না ওপরে, শাড়ি পাউডারেই দেখবি কত বেরিয়ে যাবে মাসে। ও দেড়শোর একশোই ধরে রাখ্ সে বাবদ।"

শুকনো গলায় সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, "বা, তাহ'লে মা আর মণ্টুকে খাওয়াব কি? বাবার টাকা দিতে হবে।"

"সে টাকা তো তোমাকে আদায় করে নিতে হবে। আসল টাকায় তোমার হবে নাকি কিছু? উপরি পাওনা নেই বুঝি? সে তো অফিসারদের হাত। দেখিসনি আমাদের ক্লাসের রেখাকে? ও তো তিন-চারশো টাকা পায় মাসে। সব বড় অফিসারদের সঙ্গে ওর ভাব।" গালে একটা টোকা মেরে হেসে বলেছিল, "ধ্যেৎ তুই ভাই ভারি বোকা। ঢুকেছিস তো—এবার বুঝবি। ওদের খুশি রাখবি—। তোর যা চেহারা। সবাই দেখবি সেধেই আসবে।"

সারাটা পথ সেদিন ভেবেছিল মালতী—ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে নোংরা আর বোকা মেয়ে ছিল শেফালীটা, পরিবর্তনটাও হয়েছে অদ্ভুত, সবাই-এর আগে দায়ে পড়ে নিয়েছিল চাকরি! উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দেবার অধিকার তো আছেই ওর। কিন্তু এ কেমন উপদেশ, কেমন পথ নির্দেশ। কথাগুলো ঠিক যেন বোঝা যায় না—কি এক আড়াল দেওয়া কথা। মনটা শান্ত হয় না—অস্বস্তিতে কাঁপে থর থর করে।

কিন্তু সংকোচ, ভয়, সম্ভ্রম সে তো দুদিনের ব্যাপার। এস্‌প্ল্যানেড্ ইস্টের বিরাট দরজা দিয়ে যে একবার ঢুকেছে ভিতরে তার ওসব কেটে গেছে দুদিনে। মালতীর তো কই যেতে চায় না!

সুন্দর বড় বড় চোখ, মাখনের মতো ঠাণ্ডা রং-এর মেয়েটাকে ক'দিন থেকে বড্ড বেশি চোখে পড়ছিল সুশান্ত সেনের, এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে। ড্রিংকওয়াটার সাহেবের সেই অর্ডারটার কথা মনে পড়ল, ভালো মেয়ে চাই একটা—চাই কম্‌পেনিয়ন। যাকে দেখলেই হোমে ফেলে-আসা তার সাথীর কথা মনে পড়বে। কাছে কাছে থাকবে এমন মেয়ে চাই। সুশান্ত সেনের আর এক গ্রেড উন্নতি হবে এ-জন্যে এ কথাও আভাসে জানিয়েছিল।

বেয়ারা দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে সে বলে, "করবেন? পার্ট টাইম জব। খাটুনি নেই—অথচ টাকা বেশি। বাড়ির খবর তো শুনেছি সব, ও দেড়শো টাকায় আপনার হবে কি!"

কথা বলে না মেয়েটা।

হো হো করে হেসে সে বলে, "জানি, বাঙালি মেয়ে তো! সাহেবের পার্সোনাল সেক্রেটারি বললেই মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ধরে মারবে নাকি আপনাকে? ভেবে দেখুন গে যান।"

সেদিন কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই বাড়ি ফিরেছিল মালতী, কিছুতেই না! দরকার হলে এ চাকরিও ছাড়বে সে তবু নেবে না সাহেবের কাছে।

কিন্তু বাড়ি ঢুকে দেখে বিনয়কে। হাসপাতাল উঠে গিয়ে মিলিটারি ব্যারাক হয়েছে—তাড়িয়ে দিয়েছে রোগীদের।

হাসবার চেষ্টা করে সে বলে, "বুঝলি খুকি? একশোটা টাকা! মাসে মাসে কোনোমতে একশোটা টাকা পেলেই ভালো হয়ে যাব আমি! স্যানাটোরিয়ামে থাকতে পারি যদি—ছ'মাসে ভালো হয়ে ফিরে আসব দেখিস।"

বাঁচবার চেষ্টায় যেন পাগল হয়ে গেছে সে। চোখদুটো জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে কেবল।

মানদা কোথায় গিয়েছিল—দরজা ঠেলে ঢুকে বিনয়কে দেখে থমকে দাঁড়াল একটু তারপর হাসিমুখে এগিয়ে গেল, "ভাল হয়ে গেছ? ছেড়ে দিল বুঝি ওরা?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মালতীর মুখের দিকেও খুশি মুখে তাকাল, "কাল অফিস যাবিনে কিন্তু। পাকা দেখতে আসবে তোকে খুকি।"

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "সেই ছেলেটি গো। মজুমদার বাড়ির এম-এ পাশ। ওদের খুব আগ্রহ। এই বোশেখেই দিতে চায়।" আগ্রহ তাদেরই নাকি বেশি—দাবি নেই কিছুই। অনর্গল বলে চলল মানদা। বিনয় একবার কেবল বলেছিল, "কিন্তু সংসার চালাবে কে?"

জ্বলে উঠে সে কেঁদে ফেলল, "চুলোয় যাক সংসার। তোমার ক্ষমতা না হয় ছেলের হাত ধরে ভিক্ষে করব আমি। তাই বলে মেয়ের বিয়ে হবে না। মেয়েগুলোর কি দশা হচ্ছে, আশে-পাশে দেখছিনে। উঃ এ কি দিন! মেয়ে আমার কল্যাণী হয়ে থাক্ তা দেখে আমি মরতেও পারব।"

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দু'চোখে জল নিয়ে বসে থাকে মালতী, মা তো দেখেনি কার্জন পার্ক, দেখেনি ডাস্টবিনের কুকুর আর মানুষের মারামারি একটু মাংসের হাড় নিয়ে। এখন রাস্তায় বুভুক্ষুদের আর্তনাদ শুনলে মানদার চোখ ভরে জল আসে, ফেন দিলে দুটো ভাতও দেয় খেতে। অমানুষ এখনো হয়ে যায়নি সে—দুবেলা কাঁকর মেশানো চালের গ্রাস মুখে যাচ্ছে বলেই। তাই পেটভরে খাওয়ার বিকার ধরেছে তাকে— মেয়ের মাথায় সিঁদুর দেখতে চায় সে। বড়লোকদের খেয়ালের মতোই একটা খেয়ালের পাগলামী চেপেছে মাথায় তার।

চোখ মুছে ফেলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মালতী বিনয়ের সামনাসামনি দাঁড়াল, "কালই তুমি মাদ্রাজ রওনা হয়ে যাও বাবা। একশো টাকা করেই পাঠাব আমি।"

বিস্ফারিত চোখে মানদা তাকাল মেয়ের দিকে। হিংস্র শ্বাপদের মতো দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজছে মেয়ের মুখে-চোখে শরীরে। মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে যেন ব্যাঙ্গের হাসি ছুঁড়ে দিল মেয়ে, "এ চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। অনেক বেশি টাকা মাইনের চাকরি পাচ্ছি একটা। তোমার টাকা ঠিক পাঠাব।"

খুশি হল সুশান্ত, হেসে ফেলে বলল, "এই তো চাই। আমার মুখ রাখবেন কিন্তু। মানে, একটু চট্‌পটে, স্মার্ট হতে হবে আপনাকে। সাহেব মানুষ—তার ওপর খেয়ালী। কখন যে কী মাথায় ঢুকবে, সেগুলোকে হাসি মুখে একটু মেনে নেওয়া এই আর কি। ওকে খুশি রাখতে পারলে সংসারের ভাবনা আপনার ঘুচে যাবে এ ঠিক বলে দিলাম, দেখে নেবেন।"

কান্নায় ফোলা ফোলা চোখ দুটো মালতীর—কাল সারারাত ধরে কেঁদেছে, নিজে সঙ্গে করে বিনয়কে তুলে দিয়ে এসেছে গাড়িতে, মাথায় সিঁদূর পরা নববধূর মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সে চিন্তার গলা টিপে হত্যা করেছে। বাঁচাতে হবে বাবাকে, মাকে, ছোট ভাইটাকে।

যতক্ষণ পারবে ততক্ষণ বাঁচাবে সে সবাইকে— কেবল বাঁচবে না সে নিজে। কোন সর্বনাশের অতলে নিজেকে নিয়ে চলেছে মালতী, হেসে আর মিষ্টি কথায় সে কথা কি ভুলিয়ে দিতে পারে সুশান্ত সেন।

ক'টা দিনও গেল না, মালতী এসে কেঁদে ফেলল, "ও মাতাল সাহেবটার হাত থেকে বাঁচান আমাকে। আমার পুরনো চাকরি ফিরিয়ে দিন সুশান্তবাবু।"

হেসে ফেলল সে, "করছেন কি! আচ্ছা পাগল তো আপনি। সাহেব মানুষ—মদ-ফদ খাবে না একটু? একটু আধটু অমনিতো করবেই। ছিঃ মালতী দেবী—ভুলে যাবেন না যে আপনার বাবা আছেন স্যানাটোরিয়ামে। আপনার পোস্টে লোক নেওয়া হয়ে গেছে, ছেলেমানুষী করবেন না।" মেয়েটার কান্নায় ফোলা চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে দুর্বল হয়ে যায় মনটা। কিন্তু মন! সেতো অবাধ্য ঘোড়া! চাবুক না মারলে যে সোজা হয় না। শান্ত করে পাঠালে কি হবে, আবার ছুটে আসে মেয়েটা। "আমাকে ছোট-খাট চাকরিই দিন একটা—বেশি টাকা চাইনে, আর নয় তো—", সুশান্তর দু'চোখের ওপর নিজের ব্যগ্র ব্যাকুল দুই চোখ মেলে উপযাচিকা হয়ে বলে মালতী, "আপনিই বিয়ে করুন আমাকে।

তাহলেও বাঁচবে আমার মা—ভাই। টাকা ছাড়া যে চলবে না আমার। আপনার তো অনেক টাকা—তা থেকে সামান্য কিছু করে পেলেই হবে।"

প্রায় কানের কাছে মুখ এনে সুশান্ত বলেছিল, "অমন করলে চলে না মালতী—ছিঃ। ছোটভাই, বাবা-মা, ভুলে যাবেন না। আর তা ছাড়া—" গোপন কথা বলার মতো করে বলে, "যুদ্ধ তো শেষ হয়ে এল। ইম্ফল থেকে লাস্ট জাপানি ট্রুপ রিট্রিট করেছে বার্লিনতো ফল করেছে কবেই, দেখছেন না হন্যে হয়ে উঠেছে বিলিতি সাহেবগুলো—? আর ক'টাইবা দিন? তারপর আবার আগের দিন ফিরে আসবে।"

গ্লানিতে, লজ্জায় মালতীর মরে যেতে ইচ্ছে করল সেই মুহূর্তে—তার কথাকে কেমন সহজ হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে গেল লোকটা। ঠেলে দিয়ে চলে গেল সর্বনাশের মুখে।

নড়তে গেলেই, চলতে গেলেই বিনয়ের চোখদুটো মনে পড়ে, বাঁচবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে ওঠা দুটো চোখ। মালতীর যেন মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল—এ নাগপাশের বন্ধন থেকে তার বুঝি আর মুক্তি নেই।

যুদ্ধ শেষ হবার খবরের সঙ্গে তার খবরও এসে পৌঁছল—মানদা নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল, কাঁদেনি একটু। কাঁদছিল মালতী পাগলের মতো মাথা কুটে—বুকের মধ্যেটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল, চুলগুলো বুঝি দু'হাতে ছিঁড়তে পারলে শান্তি হত। বিনয় যদি বাঁচবেই না তবে এ আত্মগ্লানির মধ্যে ডুবিয়ে গেল কেন তার খুকিকে! এখন করবে কি সে! গ্রামগুলো না হয় শহরের পথে পথে প্রাণ দিয়েছে। মরে বেঁচেছে তারা। যে মেয়েরা সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, তারাতো ছেঁড়া জুতোর মতো পরিত্যক্ত এখন, ঠোঁটের রং চোখের জলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, ইস্কুল-ছাড়া পথ না-পাওয়া মেয়েগুলোর ভবিষ্যত ঠিক হয়ে রয়েছে চোরা-গলিগুলোর মধ্যে—মালতী করে কি এখন! ড্রিংকওয়াটার তাকে ধন্যবাদ দিয়ে গিয়েছে যাবার সময়—কমপেনিয়ানশিপের জন্যে। সেদিনকার ছোট্ট মালতী তিক্ততার আর গ্লানির সমুদ্রে স্নান করে উঠে নিজের দিকে আর চাইতে পারে না সে যেন। অসহ্য দাহ সারা শরীরটায়!

মানদা দেখছিল মালতীকে—কাঁদতে না পেরে বুকের ভেতরটা তার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল, এবার দু হাত বাড়িয়ে ডাকল, "আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দে খুকি, জ্বলে যাচ্ছে।" মালতী ছুটে এসে দু'হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে রইল নিস্তব্ধ হয়ে, ফিস্ ফিস্ করে মা বলল, "লক্ষ্মীর মতো স্বভাব তোর। তোর জীবন ব্যর্থ হতে দেব না আমি, দেখি এ যুদ্ধের কত বড় ক্ষমতা।"

তারপরের দুটো বছরের ইতিহাসে মানদার অংশ। শিকারী পাখীর মতো জ্বল্‌জ্বলে দুই চোখ নিয়ে ডানা মেলে মেয়েকে আড়াল করে রেখেছিল ভাই-এর সংসারে। দুবেলা দাসীবৃত্তির পরিবর্তে ছেলে-মেয়ে দুটো বাঁচুক, এতেই খুশি মানদা। ছোট মতো মাস্টারী জোগাড় করে মাসের মাইনের টাকা কটা তুলে দিয়েছে মালতী মামীমার হাতে। তবু খুশি হয়নি কেউ—টানা-টানির সংসার ওদেরও মুখ থুবড়ে থাকা স্বল্পবিত্তের। বিরক্তিকে গায়ে মাখেনি মানদা, পাগলের মতো পাত্রের খোঁজ করেছে।

বিয়ে ঠিক হলে আপত্তি করে মালতী বলেছিল, "না মা থাক্।" বাঘিনীর মতো দুই চোখ নিয়ে শক্ত মুঠোতে মা হাত চেপে ধরল মেয়ের, "কেন? না কেন? সেবার গলায় দড়ি দিইনি—এবার দেব।"

কেঁদে ফেলে মেয়ে বলেছিল, "তুমি, মণ্টু, ওদের দেখবে কে?"

"—ও কথা ভাবতে গিয়ে সেবার নিজের সর্বনাশ ডেকেছিলি—মনে নেই?"

তারপর আর কোন আপত্তিই টেঁকেনি। সে তো কতদিনের কথা। তবু কেন ভোলা যায় না, মুছে ফেলা যায় না অতীতটাকে, বুকের মধ্যে থেকে দিনরাতের এ রক্তক্ষরণকে সারিয়ে তুলতেই হবে যে তার, নইলে জীবনে তার থাকবে কি!

কিন্তু—আবার চোখ ফিরে যায় ওই ছবিটার দিকে—ওই হয়েছে যত বাধা। মনের ফাঁকটাকে কিছুতেই ভরতে দেবে না—খুলতে দেবে না মনটাকে। ওই নির্জীব, প্রাণহীন কয়েকটা রেখা।

ওটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে এ-ঘর থেকে, অনন্তের চোখের সামনে থেকে। হাত বাড়িয়ে ছবিখানাকে নিচে টেনে নামাবার অনেক চেষ্টা করল মালতী—বিরক্ত হয়ে শেষে চেয়ারে গিয়ে বসল। চোখদুটোয় কী অপূর্ব সুষমা মেয়েটার! কে বলবে প্রাণহীন!

আবার উঠে টেবিলের ওপর থেকে ফুলদানিটা নিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে দাঁড়াল—আর কিছু না হোক ভেঙেতো ফেলা যায়? বিকৃত করে দেওয়া যায় অমন সুন্দর চেহারাটাকে। তারপরে তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

বাইরে জুতোর শব্দ করে ঘরে ঢুকল অনন্ত, চমকে হাতের জিনিস নামিয়ে রাখতে হল।

—"অমন বিরক্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে কেন? কী হয়েছে তোমার মালতী?"

শুকনো হাসি টেনে এনে উত্তর দিতে হয়, "কিছু তো হয়নি! তুমি অমন রাত করলে যে।"

ক্ষুব্ধ স্বরে অনন্ত বলে, "করব কি? আমার তো এদিকে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। মাসের পয়লা কাল, রাত পোহালেই এক যজ্ঞশালার খরচ।"

ধপ করে বসে পড়তে দেখে শান্ত গলায় বউ বলে, "খেয়ে নেবে না?"

—"খাবো পরে, বোসো তুমি—ঐ—চেয়ারটায়" হাত ধরে অনন্ত বউকেও বসিয়ে দেয় সামনের চেয়ারটায়, "বলি তোমাকে শোনো। কত যে কথা জমা আছে মনে। পাগল যে হয়ে যাইনে কেন!"

রাজ্যের বেদনা যেন ঝরে পড়ে স্বামীর কথায়, বুকের ভেতরটা টন টন করে মালতীর, এই প্রথম স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি বসেছে, মনটাকে খুলে ধরছে লোকটা, কান পেতে থাকে সে।

—"ক্রকারীর ব্যবসাটা একেবারেই ফেল পড়ল মালতী, নবীন জানিয়ে গেছে। আগে তো ছিলাম দু'ভাই একসঙ্গেই। তখন থাকতাম একতলায়, অল্প ভাড়ার ঘরে। এ সব কিছু ছিল না। ছোট্ট মতো একটা ব্যবসা ছিল, তাও চলত না ঠিকমতো। মা নিজের হাতে রান্না করতেন, ছেলেরা খেতে বসত, বউরা পরিবেশন করত। খেতাম তো শাক-পাতার চচ্চড়ি

কিন্তু তাতে যেন প্রাণ ছিল। এখনকার এই ঠাকুর-চাকর, ড্রাইভার-বাবুর্চির পাত্তা কোথায় তখন।...যুদ্ধের সময়। বরাতে জুটে গেল মিলিটারি কনট্রাক্ট, হু হু করে টাকা এল, ফুলে-ফেঁপে যেন এতবড় হয়ে উঠলাম। গাড়িই কেনা হল দু'খানা। ড্রাইভার, বেয়ারা—চাকর, ঠাকুরে বাড়ি ভর্তি। নবীনের ছেলে দার্জিলিং-এ সাহেবদের স্কুলে ইংরিজী শিখতে গেল মাসে আড়াইশো টাকা খরচে তবু হচ্ছে না। খুঁত খুঁত করতে লাগল নবীন—তার বউ। শেষে বালিগঞ্জে আলাদা বাড়ি করে নবীন চলে গেল তার বউকে নিয়ে। তারপর কত রকম ব্যবসা করেছি, একটা ছেড়ে একটা ধরেছি, শান্তি পাইনে কোনোটাতেই। দাঁড়ায়না একটাও। শেষের ব্যবসা এটা তাও ফেল পড়ল। তাইতো বলছিলাম মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল আমার। সকালে উঠেই ঠাকুর-চাকরের টাকা, কর্মচারীদের তাগাদা—ভাবো তো। যুদ্ধের দৌলতে চালটাই বেড়েছে কেবল, টাকা তো খোলাম-কুচির মতো উড়ে গেছে। এখন মনে হয়, আগের জীবনেই ছিলাম ভালো।"

একটুখানি আঘাত দেবার লোভটা সামলানো গেল্ না; মুখ টিপে হেসে মালতী বলল, "ভালো তো ছিলেই, ললিতা ছিল যে তখন!" এ কথাটায় যদি একটু আলোড়ন তোলা যায় লোকটার মনে, স্বীকারোক্তি বার করা যায় মুখ দিয়ে—যে গেছে সে তো গেছেই কিন্তু মালতীকে যে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে অনন্ত, সে কথা কি বলে দিতে হবে। তাহ'লেও নির্ভয় হতে পারে সে, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কাছে আসতে, একটু একটু করে মেলে ধরতে পারে মনটাকে। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন হতবাক হয়ে গেল, রক্ত শুকিয়ে সমস্ত মুখখানা শাদা হয়ে গেছে স্বামীর—নির্বাক আহত পশুর মতো যেন ছটফট করছে অনন্ত ভেতরে ভেতরে। কিসের এক প্রবল স্রোত যেন ওর গলা পর্যন্ত উঠে আসছে—।

সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল মালতী, কি এক দুর্বোধ্য আশংকায় বুক কেঁপে উঠল। অনন্ত বুঝি সোজা হয়ে বসবে এখুনি, তার ব্যঙ্গকে সত্য বলে ঘোষণা করতে, ব্যাখ্যা করবে তার গত জীবনের ক্লেদাক্ত কাহিনী। ভীত দৃষ্টি নিয়ে একমুহূর্ত সেও তাকিয়ে রইল স্বামীর মুখের দিকে তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে স্বামীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কত যে রাত হয়েছে, বাইরের বারান্দায় চাঁদের ম্লান ছায়া এসে পড়েছে লুটিয়ে। সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যুর চওড়া রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর সারি—জ্যোৎস্না চোখে ধরা যায় না। নিস্তব্ধ পথ—গাড়ি-ঘোড়া চলছে না, মাঝে মাঝে দু'একটা মাতালের হল্লা আর অনেকদূরে কার বাড়ির পোযা কুকুর যেন ডাকছে, রাস্তার কুকুরের খেঁকানি শুনে।

অনন্ত ডাকে, "ওঠ মালতী। বলি শোনো। সব কথা তো জানো না" বলে হাত ধরে জোর করে তুলে বসায় ওকে—চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, "যুদ্ধে টাকা করলাম আমি কিন্তু কাকে আহুতি দিয়ে, জানো তা?" ম্লান একটু হেসে ছবিখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "ওই মেয়েটাকে। বেশি দিন বিয়েও হয়নি। লেখা-পড়া জানা সুন্দরী মেয়ে। তখন আমার ব্যবসা চলছে না, এক বেলা খাওয়া জুটছে কি জুটছে না, এতটুকু দুঃখ করতে দেখিনি। বাধল যুদ্ধ, চাকরি নিল ললিতা। আমাকে তুলে ধরবেই এ ছিল ওর প্রতিজ্ঞা।

বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল, তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করাল। তারা আবার নিয়ে যেত তাদের ওপরওয়ালাদের কাছে। একটা দু'টো করে বেশ মিলিটারি কনট্রাক্ট পেলাম, যত টাকা পাই, লোভ তত বাড়ে। শেষে হাত বাড়িয়েছি একটা বড় কনট্রাক্টের দিকে, একটুর জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। মিলিটারি অফিসার—পাজী বলে বদনাম খুব। তার শর্ত বিশেষ কিছু নয়, ললিতাকে দেখেছে, কেবল একবার আলাপ করবে। ও রাজি হয় না—বলে, 'আর না। আর এগিও না।' টাকার নেশায় আমি তখন পাগল। শেষে সেই সাহেবকে আর ললিতাকে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম—। ফিরে এসে দেখি সাহেব নেই। আমার ঘরের দরজা বন্ধ—। ভাবলাম ললিতা অভিমান করেছে, আসবার সময় দোকান থেকে একটা জড়োয়া হার এনেছিলাম—দামি শাড়ি—ব্লাউজ। পেলে ললিতার রাগ পড়ে যাবে বিশ্বাস ছিল। ধাক্কাধাক্কি করে, অনেক ডেকেও সাড়া না পেয়ে ভয় হল তখন মনে।" থর থর করে কাঁপছে অনন্তের হাত, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, উচ্ছ্বসিত এক আবেগকে দমন করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, "ড্রয়ার থেকে রিভলবার বার করে ছুটে গেলাম সাহেবের অফিসে, সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে তার বাড়িতে, সাহেব বসে মদ খাচ্ছিল, স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় শপথ করে জানাল, সে ললিতার গায়ে হাত দেয়নি, তার দু'চোখের দৃষ্টিতে নাকি আগুন ছিল। ভয়ে পালিয়ে এসেছে। শুনে আবার আশা হল মনে, ছুটে গেলাম বাড়িতে। তখনো দরজা তেমনি বন্ধ। লোক দিয়ে দরজা ভেঙে যখন ঘরে ঢুকলাম দেখি দড়িতে ঝুলছে ললিতা," কপালের ঘাম মুছে ফেলে হাত দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল—"ওই যতটা জায়গা জুড়ে ছবিটা দেখছ—ওখানটায়। বুঝলাম আমার ওপর অসীম এক ঘৃণা আর অভিমান নিয়ে চলে গেছে মেয়েটা।" থর থর কেঁপে উঠল অনন্তর ঠোঁট, অতবড় মানুষটার দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল, লজ্জিত মুখে তাড়াতাড়ি রুমালে মুছে ফেলে হাসল ম্লানভাবে, "তুমি তো দেখেছ, রাতে ঘুমোইনে আমি। ঘুমোব কি— ? শান্তি পাইনে যে। সারাদিনে কতরকম খবর শুনি, গুজব আর সত্যি, রটনা আর কুৎসা। এমন ভয় করে। উঠে তোমাকে পাহারা দিই। ললিতাকে তো হারিয়েছি, তোমাকেও যেন না হারাই। গাছটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলেই তো চারাটাকে আরও সাবধানে রাখতে চাই। তার গায়ে আর যেন ঝড়ের ঝাপটা না লাগে।"

দু'চোখ ভরা জল নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মালতী বলে, "আমার কথাও তো জানো না তুমি?"

সেই জলভরা থমথমে মুখখানাই দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ভারি গলায় স্বামী বলে, "সব জানি মালতী। আমরা দু'জনেই যে ঘরপোড়া গোরু তাইতো সিঁদূরে মেঘ দেখে মুখ শুকোয়।" বলে হাসার চেষ্টা করলে হবে কি! চোখ দিয়ে জল পড়ে। কাঁদে মালতীও ললিতার কথা ভেবে।

সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতো দু'টো মনের আবেগ চোখের জল হয়ে ঝরে প'ড়ে এতদিনের ব্যবধানটা ঘুচিয়ে দেয়।

পরিচয় ১৩৫৯

ছেঁপী

শ্রীমতী বীণা দে

ঘাটের পথে একা চলেছি। খেয়ে উঠতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। দুপুরের সঙ্গী যে-ক'জন বৌ সকলেই চলে গেছে যে যার বাড়ীতে।

বাড়ীর পাশের পুকুরটি চৈতের আগেই শুকিয়ে উঠে—অন্তর্নিহিত বড় বড় পাথর ক'খানি চোখের সামনে জাগিয়ে দিয়ে সার্থক ক'রে তুলেছে তার 'পাথুরে' নামটি। একরত্তি জল চিক্‌চিক্ করছে তার বুকের মধ্যে, ঐ তপ্ত পাথরের নুড়ি ভরতি উঁচু পাড় ভেঙে আর নামতে ইচ্ছে হয় না।

উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এক-একবার তপ্ত-ঝলকে হাওয়া আসছে—সঙ্গে ব'য়ে আন্‌ছে তালগাছের খড়খড়ে শুকনো ঝাঁকড়া মাথা নাড়ার শব্দ, ঘুঘুর ডাক—আর গানের এক কলি—"আন্তে যমুনার জল সরে না ম-অ-অ-ন্"। 'আনতে যমুনার জল'—ঐ একটী লাইনই কেবল বারে-বারে ঘুরে-ঘুরে কানে আসছে মন-এর উপর টানটা খুব জোর। গলাটি খুবই মোটা, তবুও বোঝা যায়—মেয়েরই গলা। সুরটা ভেসে আস্‌ছে 'নতুন পুকুর'-এর দিক থেকে।

চল্‌লুম 'নতুন-পুকুর'-এর দিকেই।—একটু হাঁটতে হবে, তা হোকগে, তবু তো বেশ জল পাব।—চারিদিকে তালগাছ। বেশ ছায়া আছে।—মানুষও আছে।

গিয়ে দেখি, ডোমেদের মেয়ে 'ছেঁপী' গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে, মাছ না গুগ্‌লি কী তুল্‌ছে। পিছনে একটা হাঁড়ি ভাস্‌ছে, আর সে উচ্চৈস্বরে তার ভাঙা মোটাগলায় গান গাইছে—'আন্তে যমুনার জল সরেনা ম-অ-অন্'। দ্বিতীয় প্রাণী কেউ কোথাও নেই....

"ও ছেঁপী কী করছিস?"

"গুগ্‌গুলী তুল্‌ছি গো বোওমা, আপনি এত খরায় আইছ কেন?" জল থেকে গা তুলে ছেঁপী একমুখ হেসে সামনে দাঁড়ায়।

নিটোল স্বাস্থ্য। ভরাট যৌবন ছেঁপীর বেঁটে খাটো মোটা শরীরটায় যেন আর ধরছে না। একখানা পাথরকে কুঁদে কেটে, পিটিয়ে ছোট করে কে যেন গড়েছে মেয়েটার এই দেহখানা। গোল চাকাপানা মুখে ছোট্ট একটু থ্যাবড়া নাক, ফুলো ফুলো গাল, পুরু পুরু ঠোঁট আর কুঁৎকুঁতে কালো চোখ দুটিতে খুসীর হাসি যেন উপ্‌চে উঠছে। পরনে একখানি ছেঁড়া গামছা, কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হাঁড়ি, জল থেকে উঠে দাঁড়াতেই সে হাঁড়িটা তার পিছনে ঝুলতে লাগল।

তার প্রাচুর্য্য-ভরা দেহটার দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, "কী রে কত গুগ্‌লি পেলি? কী দিয়ে রাঁধবি?"

"তা বেশ পেঁয়্যাছি গো বোওমা।—পুঁস্ত দিঁয়ে রাঁধব। আমাদের দু'মানুষের অ্যানেক হবে। খালভরা পুঁস্ত গুগ্‌গুলী পেল্যে যা' ভাত খায় গো বোওমা? একটা হোঁড়োলা ঠাসা ভাত খাবেক আজ।"

ছেঁপীর পরিপূর্ণ তৃপ্তিভরা মুখে তার সোহাগের খালভরা অর্থাৎ স্বামী হরিপদ মীর্‌ধার অসামান্য পোস্ত-গুগ্‌লি প্রীতির গল্প শুনতে শুনতে ভাতখেগো কাপড় কেচে গা ধুয়ে ভরাকলসী কোমরে তুলে যখন বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম, ছেঁপীর ভাষায় তখন—দুকুরে-খরা মর্‌য়ে আল্‌ছে—

দুই

দিন দশেক পরের কথা। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। বার দুয়োরে ছড়া দিয়ে—উঠোনে মাড়ুলি দিচ্ছি—হৈ হৈ করে সারা ডোমপাড়া একেবারে উঠোনে হাজির—

"টাঠিয্যামশাই, ট্যাঠিয্যামশাই গো—আমরা আল্‌ছি—বিচার করে দ্যান—বিচার করেন—ল্যায় বিচার"—বলতে বলতেই নিজেদের দুই দলের মধ্যে গালিগালাজ চেঁচামেচি সুরু করে দিল।

চাটুজ্যেমশাই—আমার শ্বশুর—গাঁয়ের মধ্যে মুরুব্বি মানুষ, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, এক কথায় গাঁয়ের মাথা। এ গাঁয়ের লোক কথায় কথায় কেউ দুমকা দৌড়য়না। গাঁয়ের ঝগড়া গাঁয়েই মিটিয়ে নেয়। গ্রাম থেকে দুমকার পথ দূর ও দুর্গম দুই-ই বটে। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, তখন বাস চলাচল সুরু হয়নি। নেহাৎ ভদ্রলোকের বাড়ী হলে বা খুব বড় কিছু ব্যাপার ঘট্‌লে তবেই লোক থানা আদালত করতে দুমকা ছোটে।

চাটুয্যেমশায় এসে দাঁড়াতেই, আবার একবার দুইদলে হৈ-হৈ চেঁচামেচি করে উঠল। একদলে, চার পাঁচজন লোক হরিপদকে চেপে ধরে আছে। সর্ব্বাঙ্গে ধুলোমাখা, ছেঁড়া কাপড়পরা, আলুথালু ঝাঁক্‌ড়াচুল, রক্তচক্ষু নিয়ে হরিপদ ফোঁসাচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে ছেঁপীর দিকে তেড়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে...

অন্যদলে চার পাঁচজন স্ত্রী পুরুষে ছেঁপীকে ধরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। ছেঁপী তার ভাঙা মোটাগলায় একটানা গালাগালি দিয়ে চলেছে—"নামুনি নামুক খালভরা—আমাকে বলে কিনা শাল্‌কেমুখী? একদিন এক দশান ত্যাল দিতে পারলেকনি মাথায়, আজ আল্‌ছে মাথায় লাদনা ভাঙতে? ভাত দেবার ভা—লন্‌ কীল মারবার গোঁসাই" ইত্যাদি।

তার কপালে শুক্‌নো রক্তের দাগ, মাথায় ছেঁড়া ময়লা পট্টি বাঁধা। কাদামাখা খোলাচুল, ফোলা চোখে জলের চেয়ে ক্রোধেরই প্রকাশ বেশী। ছেঁপী, রাগে মাটীতে পা ঠুকছে—দাঁতে দাঁত ঘস্‌ছে আর চেঁচাচ্ছে—

গাঁয়ের আরো পাঁচজন মুরুব্বিলোক জড়ো হয়ে বসার পর, দুইদলের বাদবিতণ্ডা ও নালিশের মধ্যে থেকে যা উদ্ধার হল, তার সারমর্ম্ম;—হরিপদর কথা হচ্ছে, ছেঁপী তার বিয়েলো বৌ বটে, কিন্তু এদানিকে তার ব্যাভার বড়ই খারাপ। সে ঝুম্‌রিদের মত ভোম্‌রাপেড়্যে কাপড় চায়, কপিপাতা মাকুড়ি চায়। চুলে তার নিত্যিদিন ত্যাল চাই। সবচেয়ে রাগের কথা—আলকাটার কাপ এর সেই বদ ছোঁড়া তানু হাজরার মুখের দিকে ছেঁপী হাঁ করে তাকায়। এমন কি দু' একদিন তার সঙ্গে মস্করা করতেও যেন দেখেছে। আজ দু'দিন থেকে আবার ভাতও রাঁধছে না, সাঁঝ লাগ্‌লেই ঘুম...

আর ছেঁপীর কথা হচ্ছে—আগে যখন খালভরা চরণবাবুদের বাড়ী মাহিন্দারি কর্‌ত—তখন বাবুদের দেওয়া ধানে তাদের ছ'মাসের খাবার বেশ পুর্‌য়েপেট চলত—হরিপদা বাবুদের বাড়ী দিনে ভাতমুড়ী খেত—রেতে-একবেলা ঘরে খেত। ছেঁপী ধান ভেনে ঘোসি বেচে শাক গুগ্‌লি তুলে নিজেরটা বেশ করে নিত।—মাঝে মধ্যে পালপার্বণে মনিব-বাড়ী যেত—ভালমন্দ খেতে পেত দু' একখানা পুরনো শাড়ীও দিত বৌঠাক্‌রুণরা। সাঁঝ লাগলেই হরিপদ মাথায় ত্যাল ঘস্‌তে ঘস্‌তে ঘরে ফিরত। যা রাঁধত ছেঁপী, তাই সোনাহেন মুখ করে খেত। আর, আজকাল—বাবুদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনমজুরী করতে লেগেছে। ভিনগাঁয়ে 'দলান' এর কাজে সারাদিন খেটে যাই পয়সা পায়, সনজে হলেই গিয়ে পচুইএর দোকানে বসে, পয়সা পত্তর কোথায় যেছে ঠিক নেই—বাড়ী এসে বলে—ভাত দে। ভাত কোতি পাব? পয়সা চাইলেই রাগ মার্। সাতজন্মে মাথায় একদশান ত্যাল দিলেক্‌নি, পরনে একখান কাপড় দিলেক্‌নি—উ-মরদের ঘর কে করবেক? যে যাবেক যাক্—ছেঁপী লয়।

অনেকক্ষণ বকাবকি চেঁচামেচির পর, শেষে ঠিক হ'ল হরিপদার দাঁড়ম্ অর্থাৎ দণ্ড দিতে হবে, পাঁচটাকা। তিন টাকায় ছেঁপীকে একখানা কাসিপাড় শাড়ী কিনে দেওয়া হবে, দু'টাকা খরচ করে ছেঁপীর বাপ মা আত্মীয়স্বজনদের জল খাওয়াতে হবে। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হরিপদাকে বল্‌তে হবে যে ছেঁপীকে আর মারধোর করবেনা। আর ছেঁপী হরিপদার ঘর করবে!

বেশ তাতেই রাজী। কিন্তু টাকা এখনি চাই, নহলে ছেঁপীর দল রাজী হয় না। হরিপদা মুখ গুঁজে বসে পড়ে। বলে টাকা কোথায় পাই? শুধু হাতে তো কেউ হাওলাত দেবে না?

আমি শ্বশুরমশায়ের কথামত পাঁচটি টাকা বার করে দি। হরিপদার হাতে দিয়ে তিনি বলেন—"এইনে ছেঁপীর হাতে দে।—আর মনে রাখিস, দুমাসের মধ্যে আমার টাকা ফেরৎ চাই, তা নয়তো কুড়িদিন ব্যাগার দিতে হবে।"

হরিপদ এসে তাঁর পায়ের গোড়ায় ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বলে—আজ্ঞে মশায় আমি তো আপনারই, আপনার হুকুম আমি মাথা পেত্যে লিব'।

ছেঁপীর হাতে টাকা দিতেই ছেঁপীদের দল থেকে একজন বলে উঠল—কুকুর করে ভেক্। অপর সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—যার মেয়্যা সে লেক্। হরিপদ গিয়ে ছেঁপীর হাত ধরে নিজের দলের দিকে নিয়ে এল। তারপর সবাই মিলে হৈ হৈ কর্‌তে-কর্‌তে বেরিয়ে গেল।

প্রায় মাস পাঁচ ছয় পরের কথা। হরিপদা আমাদের বাড়ী মুনিষ খাটে, জমীতে কাজ করে। কারণ, সেই পাঁচ টাকা আর শোধ করতে পারেনি। হঠাৎ একদিন শুন্‌লুম, ছেঁপী পালিয়ে গেছে—কোথায় গেছে কেউ জানে না। কেউ বলে, ঝুম্‌রির দলে গেছে—কেউ বলে, আলকাটার কাপ-এর ছোঁড়ার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে; কেউ বলে, মল্লারপুরের ইষ্টেশনে

দেখে এসেছে প্যাঁজ ফুলুরি ভাজ্‌ছে, ইত্যাদি আরো কত কী।

তিন

বছর তিনেক পর—পিত্রালয়ে চলেছি। ন'মাইল রাস্তা। গোযানে এসে, রামপুরহাট ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি। ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরী।

হঠাৎ পিছন থেকে—'পেন্নাম হই, কেমন আছেন গো বোওমা'—বলে, কে যেন পরিচিত সুরে ডাক দিল।

ছেঁপীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ এই অভিনব বেশে তাকে দেখে অবাক। তার পরণে ঘন নীলরঙের শাড়ি, সামনে কুঁচি আর ঘুরিয়ে আঁচল দিয়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মতন করে পরা। গায়ে পুরোহাতা গোলাপী রঙের জামা। দু'হাতে একগোছা করে কাঁচের রেশমি চুড়ি। মাথার চুলটি বাঁকা সিঁথি কেটে পরিপাটী করে আঁচড়ানো। আরো যেন মোটা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি বদ্‌লে গেছে। গায়ে বিড়ির গন্ধ।

বললুম, কী রে ছেঁপী কেমন আছিস? কোথায় আছিস? গাঁয়ের কথা মনে হয় না?

সত্যি কথা বুল্‌তে কি বোওমা, গাঁয়ের লেগে আমার খুব মন ঘোরে। আবার গাঁয়ের *লোক দেখলেই সানকুড়ি মুখ নুকোই, পাছে চিন্যে ফেলে। পালিয়্যো আল্‌ছি তো?' বোলে একটু কুণ্ঠার হাসি হাসে।*

'তা' *আমায় দেখে যে সানকেড়ে পালালিনি—আমি বুঝি গাঁয়ের লোক নই?'*

'ওমা তা কেনে—আপুনি আমাদের *গাঁয়ের নোক লও তো কী? গাঁয়ের* মুরুব্বিঘরের বৌ বট তুমি। তা লয়, তোমাকে দেখেই আলাম যে, দুটো কথা বুলে গাঁয়ের খপর শুধোই গা। তুমি তো মা দ্যাবতা হেন নোক। শরীলে কত দয়া। ছোটনোক আমাদেরকে ডেকে রা কাড়ো, ভালমন্দ শুধোও, আর কে তা করে বল? তোমার কতা বোওমা খুব মনে হয় আমার'। কথার শেষের দিকে তার গলাটা যেন কেঁপে যায়।

বলি, 'ভাল আছিস তো বেশ? কেমন লোক? কী করে? আদর যত্ন করে তো?'

বলে,—'হেঁ তা ভালই আছি—যার সাথে আলছিলাম তার কাছে তো নাই।—সে ঠগ—তার ঘরে তিন বেট্টা বিট্টি, বিয়েলো বো, সে বো আবার পোতি—বুড়ি মা—ঘরে ভাতজল করার লোক নাইকো। ধান ভেন্যে পাত কুড়িয়েঁৎ ভাতজল কর্যে মরি। খাবার বেলায় ভাত নাইকো, মাথার বেলায় ত্যাল নাইকো—আর, দিনরাত কাজিয়া—'

একটু থেমে আবার বলে, 'এখন ভালই আছি, যার কাছে আছি, সে একটো বুদ্ধিমান নোক—ভাল চাকুরে। সায়েব সুবোর সাথে কথা কয়—ভদ্দরলোকের মত সব্বদা গায়ে পির‍্যান—' ইত্যাদি। তার ভাষায় সে তার বর্ত্তমান পুরুষটির অনেক কিছু গুণ-গরিমার পরিচয় দিল।

মোদ্দাকথায় জানলাম যে, সে যার কাছে এখন আছে, সে ডাকবাংলোর চৌকীদার। ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই তাদের থাকবার ঘর, দুজন থাকে। লোকজন সায়েব সুবো এলে, চৌকীদারই মুর্গী কাটে, রাঁধে—বেশ ভাল রাঁধতে জানে। লোকজন এলে ছেঁপীও বেশ ভাল খুস্‌বুইওলা মাংস, অর্থাৎ গরম মশলাযুক্ত মুর্গী খেতে পায়। নিজেরা

মুর্গী পুষেছে, তার ডিম সায়েবদের কাছে বিক্রি করে। ছেঁপীরা দু'বেলা চা খায়—মাটীর ভাঁড়ে বা টিনের মগে নয়—কেঁচের বাটীতে অর্থাৎ পেয়ালা পিরিচে। ছেঁপীর ঘরে এলুমিনির বাসন আছে। বাতে ডি বি জ্বালতে হয় না, ঘরে হাঁরিকেল আছে। চৌকীদার তার কানে সোনার বেলকুঁড়ি, নাকে চিঁড়িতন গড়িয়ে দিয়েছে। খাতির যত্নও করে। তবে—ছেঁপী সারাক্ষণ ঘরের কাজ নিয়ে ঘরের মধ্যে থাক্‌তে পারে না—ছেলেপিলেও হয়নি, মন ছট্‌ফট করে। আজ দু'মাস হল ডিপ্‌টি সায়েবের বাড়ী কাজ নিয়েছে—ছেলের কাজ। তারা ওকে ডাকে আয়া বলে। জামা কাপড় তারাই দিয়েছে, চৌকীদারের এতে মত নেই তেমন। বলে, 'তোর অভাব কিসের? কাজ করবি কেনে?' কিন্তু ছেঁপীর খুব ভাল লাগ্‌ছে কাজ করতে। সে তাদের সব ঘরে ঢুক্‌তে পায়, তারা ছেঁপীর ছোঁয়া ভাত জল সব খায়। রবিবারে সেজেগুজে গীর্জে যায়। ছেঁপীও ছেলের ঠেলাগাড়ি ঠেলে সঙ্গে যায়। ছেলেটাকে খুব ভালবাসে। সেখানে কাজ ক'রছে বলেই তো ইষ্টেশনে বেড়াতে আসতে পেল—তাতেই তো আমায় দেখতে পেল—ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করি, 'এ কাজ জোগাড় করলি কী করে?'

বল্‌লে, 'সায়েববাড়ীর বাবুর্চি আস্‌ছিল মুর্গী কিন্‌তে। তা'পর সে রোজই খরারবেলা আসত, বসত, ডিম কিনত। সেই ঠিক কৎর‍্য দিল কাজটা। লোকটি বেশ ভাল। আমাকে চা খেতে দ্যায়, কাজ বুলেৎ দ্যায়। সেই তো ছিম্‌ছাম্ থাক্‌তে শিখোলেক...।'

ছেঁপীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প শেষ হতে না হতেই ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল।

ট্রেনে ওঠবার সময় পর্য্যন্ত ছেঁপী প্রায় কাছে কাছেই রইল। আমি উঠে বসতে, সেও একবার কামরার মধ্যে ঢুকে আবার তাড়াতাড়ি নেমে গেল। বল্‌লে, কখনও কলগাড়ীতে চাপি নাই, ভাগ্যি আজ আলছিলাম তাই আপনার সাথেও দেকা হ'ল—কলগাড়ীতেও চাপা হ'ল—

ট্রেন ছাড়ার পর যতক্ষণ দৃষ্টি যায়—দেখলাম ছেঁপী একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...

আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল সেই চৈতের দুপুরে নতুন পুকুরে গুগ্‌লি-চয়ন-রতা ছেঁপী...

চার

প্রায় আঠারো বছর পরে আমরা ওঁর কর্ম্মস্থল থেকে দেশের বাড়ীতে ফিরেছি। এই আঠার বছরে আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। দেশের পরিবর্ত্তন আরো ঢের বেশী। ময়ূরাক্ষীর পরিবর্ত্তনও বড় ছোটখাটো নয়। আমরা সদলবলে সিউড়ী এসেছি, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ দেখতে।

সারকিট হাউস-এর বারান্দায় বসে আছি। সাম্‌নে বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সিভিলসাপ্লাই অফিসারের স্ত্রী মিসেস বাগ্‌চী বসে গল্প করছেন।

তাঁরা সারকিট হাউস-এর একরকম স্থায়ী বাসিন্দা বল্‌লেই হয়। বীরভূমে প্রায় দশমাস বদলি হয়ে এসেছেন সিউড়ী সহরে, তবুও ভালবাড়ি খালি পাননি। কাজেই সারকিট

হাউস-এর ঘরেই অস্থায়ী সংসার গুছিয়ে বসেছেন। আমরা তাঁদেরই নিমন্ত্রিত।...

চা ও মিসেস বাগচীর গল্প দুই-ই বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় তাঁর ছেলে চেঁচিয়ে উঠ্ল—মা, মা, দেখ ফের সেই পাগলিটা এসেছে।

মিসেস বাগ্চীর কথায় জানা গেল—এই পাগলির দৌরাত্ম্যে তাঁরা নাকি অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। পাগলির মজা হচ্ছে—সে নাকি হাটে বাজারে, সাধারণ লোকের বাড়ীতে, কোথাও যায় না—ডাকলেও যেতে চায় না। তার ঝোঁক খালি—সারকিটহাউস, ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো, সিভিলসার্জন-এর বাংলো অর্থাৎ এককথায় সরকারী কোয়ার্টার্স-এর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ানো। বিশেষ করে' তার সারকিটহাউসটার উপরেই রোখটা যেন বেশী। এমন কি ফাঁক পেলে যখন তখন ডাইনিং হল্, বাবুর্চিখানার মধ্যেও ঢুকে পড়ে। চীনেমাটির বাসন এর উপরে নাকি সাংঘাতিক রকমের লোভ। ভাঙা কাপ, ডিসের টুকরো পেলে তখনি কুড়িয়ে ঝুলিতে ভরে। চুরির অভ্যাসও আছে। অন্য কিছু নয় শুধু কাঁচের বাসন, চামচ আর খাবার জিনিষ। আর পাগলি বল্লেই, লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে।...

কথা হতে-হতেই পাগলি এগিয়ে এল। জরাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, চাকা-চাকা ঘা ও চুলকানিতে ভরা। পা ফুলো। বাঁ পাটাতে কী হয়েছে—লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাথা প্রায় ন্যাড়া—এখানে ওখানে শনের মত দু একগাছা চুল। কোটরগত চোখে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পরনে শতছিন্ন কাপড়। গায়ে ততোধিক ছেঁড়া একটা জামা। জামার ডানহাতটা একেবারেই নেই।

আস্তে আস্তে হেঁট হয়ে কী যেন একটা কুড়িয়ে বাঁ-কাঁধে ঝোলানো প্রকাণ্ড পুঁটুলিটার মধ্যে ভর্ল। বিড়্বিড় করে কী বলতে বলতে এসে বারান্দার সিঁড়ির উপর ধপাস করে বসে, চায়ের টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—দ্যান দ্যান চা দ্যান তো খানিক।

মিসেস বাগচী আমায় ইঙ্গিতে বল্লেন—দেখুন মজা।

উঠে ঘর থেকে একটি খালি সিগারেটের টীন এনে তাতে চা দিতেই, পাগ্লি মাথা নেড়ে বলে' উঠ্ল, 'মগে লয়, মগে লয় কেঁচ্যের বাটিতে চা খাব।'

'দেব না বাটি, মগে খাবিতো খা। না-খাবি তো যা'—মিসেস বাগ্চী বলেন।

পাগ্লি মুখখিঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে 'এহ্ঁ, না খাব্বি তো যা, অম্নি গেল্যেই হ'ল্য? চা খাবনা? আমার কি বাটি নাইখো? ভাবচো কি আমার কিছুই নাই?—হেই দ্যাখ্স্যে।'

বলে, ঝুলির ভিতর থেকে হাত্ড়ে একটি ডাঁটভাঙা কাপ বার করে চা ঢেলে নিল।

চাপরাসী এসে তাড়া দিল, এই পাগ্লী ফের এসেছিস? যা উঠে যা।

রেগে লাঠি নিয়ে পাগ্লি তেড়ে যায়—খালভরা ফের পাগলী? কেনে আমার কি নাম নাই? আমি কেনে পাগলি হ'তে যাব? তোর মা-বুন পাগল হোক, তু পাগলহ আখামুখো।

আমার যেন কী রকম মনে হয়। ডেকে বলি বিস্কুট খাবি—চায়ের সঙ্গে?

পাগলি খুসীতে ভরে ওঠে—" হেঁ মা খাবো, আহা তুমার কতা কীযে মিষ্টি মা! কেউ একটা ভালকর্‌য়ে রা কাড়েনা গো বাছা। খালি বলে—পাগলী দূর দূর।"

বিস্কুট দিয়ে বলি—তোমার নাম কি? লোভী ছোট্টমেয়ের মত বিস্কুটে কামড় দিয়ে, দুলে দুলে নিজের নাকে হাত বুলিয়ে বলে—আমার নাম? ছোটতে আমার নাকটো খুব ছুট্টই পারা ছিল তো, তাথেই না বুলতো ছেঁপ্পী। সেই হতে সব্বাঁই বল্‌ত ছেঁপ্পী। গাঁয়ের মধ্যে এই ছেঁপ্পী বুল্‌লে সব্বাঁই চিন্‌ত আমাকে। আমায় জান্‌তো-না এমন লোক নাইখো। চৌকীদার আবার সগ কর্‌য়ে, বুল্‌ত ছেঁপু। কুন দিকে যে গেল? তাথেই খুঁজতে আমার এই—'

আমার সন্দেহ সত্য হল। এই সেই ছেঁপী! চোখের সামনে ভেসে উঠল, রামপুরহাট ষ্টেশনের সেই ছেঁপীর ছবি।...

চোখের দিকে চেয়ে বলি—'হ্যাঁরে ছেঁপী তোদের গাঁয়ের সেই চাটুয্যেদের বড়বৌকে তোর মনে পড়ে? সেই নতুন পুকুরের ঘাটে যাকে গান শোনাতিস? গাঁয়ের কথা মনে আছে তোর?'

পাগলী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কী যেন খোঁজে। তার দৃষ্টি যায় বদ্‌লে। হাউ হাউ করে কেঁদে পাগলি পায়ের কাছে এসে আছ্‌ড়ে পড়ে,—'মাগো তুমিই সেই—তুমি সেই বড়বোওমা? মাগো তাই তোমার এমন মধুর রা। আমি সেই ছেঁপী গো মা—আরো জোরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে...

কেঁদে-কেঁদে সে যা বল্লে, তাতে জানতে পারি—চৌকীদার-এর সুখের ঘরও বেশীদিন সে করতে পারেনি। ডেপুটীবাবুরা বদ্‌লি হবার সময়ে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। চৌকীদার তাকে অনেক করে বারণ করেছিল, কেঁদেছিল, কিরে দিয়েছিল—সে শোনেনি। বাবুর্চির বুদ্ধিতে পড়ে, আর কলগাড়ী চেপে নতুন সহর দেখার লোভে—সে সায়েবদের সঙ্গে শহরে অর্থাৎ বহরমপুরে যায়। সেইখানেই তার ভারি খারাপ ব্যামো হয়। বাবুর্চিটা ছিল যত নষ্টের মূল। সায়েব কিছু টাকা ধরে দিয়ে দুজনকেই চাক্‌রী থেকে বরখাস্ত করে। বাবুর্চি তখন তাকে জঙ্গীপুর হাঁসপাতালে রেখে তার সর্ব্বস্ব চুরি করে, চৌকীদারের দেওয়া সেই বেলকুঁড়ি আর চুড়িতন পর্য্যন্ত চুরি করে কোথায় যে পালায় কেউ জানে না। যখন হাঁসপাতাল থেকে ওকে বার করে দিল—ভাল করে ও পথ চলতে পারে না। হাঁসপাতালের এক মেমসাহেব দুটী টাকা দিয়েছিল। তাই নিয়ে টিকিট কেটে রামপুরহাটে আসে, চৌকীদার-এর খোঁজে। এসে দেখে, অন্যলোক সেখানে বাস করছে। সে নেই—কোথায় চলে গেছে—সেই থেকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে চৌকীদারকে...

ওর মনে হয়, এই সব সরকারী সায়েবদের বাড়ীর কাছেই সে কোথাও আছে। লোকের বাড়ী কাজ করতে গেলে কেউ কাজে লাগায়না। খারাপ রোগ দেখে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, অথচ খেতেও দেয় না! ছেঁপী কী করবে? চৌকীদারকেই খুঁজে বেড়ায়।—বলি—গাঁয়ে যাবি ছেঁপী?

খানিক গুম হয়ে থেকে, মাথানেড়ে বলে—না। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

বড় কান্নাই কাঁদে, কে বলবে ছেঁপী পাগল!

সহজ মানুষের মতই বলে—না মা যাব না—গাঁয়ে আর এ মুখ দেখাব না। লোকেই বা আমায় গাঁয়ে ঢুকতে দেবে কেনে মা? আমি তো পতিত—বাবুর্চি মোচনমান—

বলি—পাড়ায় ঢুকতে যাবার তোর দরকার কী? তুই আমাদের খামারে থাকবি, গোয়ালের পাশে চালা তুলে দেব। গোয়াল কাড়বি, খামার ঝাঁট দিবি, আঙ্গা নিকোবি, খাবিদাবি থাকবি—ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যাবে—যাবি?

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সে বলে—না—বলতে-বলতেই চোখের দৃষ্টি আবার অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

ঘর থেকে একখানা সাড়ি বার করে এনে দি তার হাতে। বলি, পর ছেঁপী কাপড়খানা।

সাড়িখানা হাতে নিয়ে প্রথমটা খুব খুসী হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাড়ের বাহার দেখে, তারপরেই সেটাকে জড়ো করে ঝুলির ভিতর ভরে ফেলে বলে—থাক্ কাপড়খানা বোওমা, চৌকীদার এলে পরব। এখন পর্‌লে লোকে মেরেৎ কেড়্যে লিবেক্। আগে খালভরাকে খুঁজ্যে বার করি—

বলতে বলতেই লাঠিটি তুলে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়ল—যাই খুঁজ্যে দেখি তাকে—

বাড়ী ফেরার পথে মোটরে সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ময়ূরাক্ষীর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও বিপুল সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে। আমিই শুধু নীরব। আমার সমস্ত মনটা নিয়ে জুড়ে থাকে ছেঁপী।

ভারতবর্ষ ১৩৬০

দখিন হাওয়া

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

"হোলী হ্যায়", "হোলী হ্যায়", চেঁচাতে চেঁচাতে এক দল কিশোর একখানা ছোট্ট কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কিশোর কানাইয়া ধীরে ধীরে পা টিপে গিয়ে হঠাৎ কমলীর চোখে মুখে একরাশ আবীর মাখিয়ে দিলে। কাহারদের চৌদ্দ বছরের মেয়ে কমলী নিবিষ্ট মনে অঙ্গনের এক কোণে বসে দোলপূর্ণিমার উৎসবের জন্য রং গুলছিল। আচমকা আক্রান্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে, ছাড় ছাড়, ভাল হবে না বলছি", বলে জোর করে হাত ছাড়িয়ে চোখের আবীর মুছে দেখতে পেল পড়শী কানাইয়া মুচকি মুচকি হাসছে। কৃত্রিম ক্রোধে কমলী বললে, "লজ্জা করে না কানাইয়া, মেয়েদের সঙ্গে রং খেলতে এসেছিস?"

কোঁকড়া কোঁকড়া অবিন্যস্ত চুলের মাঝে আবীরমাখা গৌর মুখখানার দিকে চেয়ে কানাইয়া বললে, "জানিস না দোলপূর্ণিমায় রং খেলতে হয়?" বলে চলে যেতে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি একগাল হেসে হঠাৎ রঙের ঘটি তুলে কমলী কানাইয়ার মাথায় ঢেলে দিল। ছেলের দল "হোলী হ্যায়" বলে চেঁচিয়ে উঠল। কানাইয়ার মাথা গাল বেয়ে গাঢ় সবুজ রং গড়িয়ে পড়তে লাগল টপটপ করে, বিচিত্র মুখের শোভা নিয়ে কানাইয়া পালিয়ে গেল ছেলের দলের সঙ্গে।

চল্লিশ বছর পূর্ব্বের কাহিনী, দোলপূর্ণিমায় অজন্তী গ্রামখানি উৎসবের আনন্দে ভরপুর, আবালবৃদ্ধবনিতা হোলীর উৎসবে মত্ত, রঙের ছোপ সবার মনেই লেগেছে, দলে দলে ছেলেবুড়ো ঢোল করতাল বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ফিরেছে গান গেয়ে, হুল্লোড় করে একে অন্যকে রং ঢালছে, আবীর মাখাচ্ছে। চেহারা এক এক জনের হয়ে উঠেছে অদ্ভুত।

সমৃদ্ধ সম্পন্ন অজন্তী গাঁ শ্যামলশ্রীমণ্ডিত। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। বিশেষতঃ উৎসব উপলক্ষ্যে যে যার ঘরদোর অঙ্গন গেরিমাটি দিয়ে লেপে মুছে সুন্দর করে তুলেছে।

সাত দিন ধরে গ্রামের কিশোর ও বালকের দল বাড়ী বাড়ী "হোলী হ্যায়" চেঁচিয়ে হাত পেতেছে। সবাই দু'চার আনা পয়সা, গণ্ডাছয়েক ঘুঁটে দিয়েছে। দেয় নি শুধু শেঠ লছমন দাস। ছেলের দল প্রতিশোধ তুলতে রাতে চুপি চুপি তার বাগিচার একদিককার সুদৃশ্য কাঠের গেটখানা খুলে নিয়ে লুকিয়েছে। নিরুপায় শেঠ মনের দুঃখে 'হা হতোস্মি' করলেও কিছু বলতে পারে নি। হোলীর উৎসবে সাতখুন মাপ। লাকড়ির গাড়ী শহরে বিক্রী করতে যাচ্ছে। তা থেকে চুপি চুপি কাঠ টেনে বের করে নিয়েছে ছেলের দল। সে সব সংগৃহীত ঘুঁটে ও চুরি-করা কাঠ এনে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রেখেছে, পূর্ণিমারাতে শুভ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণঠাকুরের পূজো করে তাতে লাগিয়ে দিয়েছে আগুন। আর সমস্বরে ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠেছে "হোলী হ্যায়"। বিরাট কাঠ আর ঘুঁটের স্তূপে জলে উঠেছে আগুন দাউ দাউ করে। ছেলেরা তাতে ছুঁড়ে ফেলছে নারকেল উৎসর্গ করে। তার পর সেই প্রসাদী নারকেল, বাতাসা, পেড়া সবার হাতে বেঁটে দিয়েছে। এই মধ্যরাতে হোলীজ্বালানো উৎসব দেখতে বউ-ঝি-বুড়ীরাও যোগ দিয়েছে। আগুনের তাতে কমলীর সুন্দর টক্‌টকে মুখখানার

দিকে চেয়ে, "কাল রং খেলবি ত?" বলে কমলীর দু' হাত ভরে কানাইয়া তুলে দিয়েছে নারকেল আর বাতাসা।

পূর্ণিমারাতে হোলী-জ্বালানোর পরদিনই পাড়ায় পাড়ায় রং খেলা সুরু হয়ে গেল। কমলী আজ সাধ মিটিয়ে রং খেলছে সখীদের সঙ্গে। বউঝিরা তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে লোটাভর্ত্তি রং হাতে নিয়ে দল বেঁধে চলল গান গাইতে গাইতে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায়। ঘরে ঢুকে একজন আর একজনকে টেনে মুখে মাথায় আবীর মাখিয়ে গায়ে রং ঢেলে ভিজিয়ে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-তামাসাতে এ ওর গায়ে পড়ল ভেঙ্গে। রং খেলা শেষ হলে বিচিত্র ভূষণে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে ফিরে চলল ঘরে। পরিষ্কার হয়ে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হবে, বিকেলে মেয়েদের জলসা আছে। বয়স্কা নারীদেরও আজ অনেক কাজ, সিদ্ধির সরবত বানাতে হবে খুব ভাল করে। কানাইয়ার মা সিদ্ধির সরবত বানাতে ওস্তাদ, তার হাতেই এপাড়ার সিদ্ধি বানাবার ভার পড়ে প্রতি বৎসর। বিকেল হতে না হতেই কানাইয়ার মা সিদ্ধি ঘুটতে বসে গেল। রামভরসার মা, ভগবানদীনের মা, শিউরতনের বউ হাতে হাতে সব জিনিস যোগাতে লাগল। কানাইয়া দাওয়ার এক পাশে বসে মার সিদ্ধি বানানো দেখছিল, পরিধানের বসনখানা তার বিচিত্র রঙে রাঙানো, মাকে আবদার করে বলে, "মা, আমাকে আজ বেশী করে সিদ্ধি দিস কিন্তু, তোর হাতের সিদ্ধির মত কেউ সিদ্ধি করতে পারে না।"

মা বললে, "কমলীকে আমি শিখিয়ে দেব কি করে সিদ্ধি তৈরি করতে হয়।" রামভরসার মা ছেলের কথাগুলো শুনছিল, সে বলে উঠল, "কানাইয়ার মা, ছেলের বিয়ে কবে দিচ্ছিস?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শিউরতনের বউ বললে, "তোমার কানাইয়ার সঙ্গে কমলীকে খুব মানাবে দিদি, তা কমলীকেই ত বউ করে আনছ?"

কানাইয়ার মা গম্ভীর ভাবে বললে, "এ ইচ্ছাই ত মনে আছে বোন। ভগবান যদি মঙ্গল করেন তবে আসছে দোলপূর্ণিমায় কমলীকেই আমার বউ করে ঘরে আনব।" বলে মা আড়চোখে একবার ছেলের দিকে চাইলে। কানাইয়ার মা পাঁচ বছরের পিতৃহারা কানাইয়াকে কত কষ্টে মানুষ করেছে, আজ কানাইয়া উনিশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক। শ্যামবর্ণ, দেহের গড়ন মজবুত, মুখখানাতে বেশ একটু শ্রী আছে। কমলীর বাপ কানাইয়ার বাপের বন্ধু, অনেক সাহায্য করেছে সে কানাইয়ার মাকে সংসার চালাতে। কানাইয়ার মা ছেলের দিকে সগর্ব্বে চেয়ে বললে, "যা বলেছিস বউ ঠিকই, আমার কানাইয়ার সঙ্গে কমলীকে মানাবে ভাল, কমলীর বাপমায়েরও সেই ইচ্ছে। তারপর দেনাপাওনাও বেশী নেই, পাঁচ রকমের গয়না দিলেই চলে যাবে।"

কানাইয়া বারান্দায় বসে বসে মা আর প্রতিবেশিনীদের কথা মন দিয়ে শুনছিল। আর নিজের বিয়ের একটা রঙীন চিত্র মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিল। এই কমলীর সঙ্গে শৈশবে সে কত খেলেছে। মারধোর করেছে, আজ সেই কমলী তারই বউ হয়ে আসবে ভাবতেই তার কি রকম মজা লাগছিল। কৈশোরে পা দিয়ে কমলীর একটু সঙ্কোচ এসে গিয়েছিল।

এত অবাধে চলাফেরা মেলামেশা করত না, আর সেই ব্যবধানটুকুই কানাইয়ার মনে একটা আকর্ষণ এনে দিয়েছে কমলীর প্রতি।

টাক্ ডুমা ডুম্ করে বাজনা বেজে উঠল পাড়ায়, বউঝিরা সাজগোজ করে ছুটল নাচের আসরে। কমলী তার সইদের নিয়ে নাচবে। নাচের মেয়েরা নানা সাজগোজ করে এসেছে। গ্রামের 'মুখিয়া' মানে সর্দ্দারের বাড়ীতে জলসা বসেছে। গ্রাম্য নারীরা বৃত্তাকারে বসেছে, আর একজন বর্ষীয়সী মহিলা ক্ষিপ্রহস্তে ঢোল বাজাচ্ছে তাল রাখতে। সই সেজেছে কৃষ্ণকানাইয়া, মাথায় ময়ূরের পালকের মুকুট। পরনে পীত বসন। পায়ে নূপুর, গলায় ফুলের মালা, হাতে বাঁশী, কমলী সেজেছে রাধা, নকল জরির বর্ডার দেওয়া লালটুকটুকে ঘাঘরা পরেছে, গায়ে ফুলতোলা চেলী। মাথায় বাসন্তী রঙের পাতলা ফিন্‌ফিনে ওড়না, খোঁপায় এক থোকা রক্তকরবী ফুল। কোমরে রূপার চন্দ্রহার, পায়ে পায়েল, লচ্ছে, গলায় ফুলের মালা, হাত দুটি মেহেদী পাতার রঙে রাঙানো, চোখে কাজল, কপালে বিন্দি।

মেয়েদের আসরে পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। তবু কানাইয়া আজ থাকতে পারল না। চার পাঁচ জন সমবয়সীকে নিয়ে ছুটে গিয়ে এক কোণে কৃষ্ণচূড়ার আবডালে লুকিয়ে বসে রইল। রাধাবেশে কমলী বড় সুন্দর নাচ নাচলে। বহুক্ষণ রকমারি নাচগানের পর মেয়েদের আসর ভাঙল। যে যার ঘরে ফিরে চলল।

রাধা-সাজে কমলী খানিকটা আবীর নিয়ে চলল, কানাইয়ার মাকে প্রণাম করতে। কানাইয়ার মা প্রতিবেশিনীদের নিয়ে বসেছিল। কমলীকে ডেকে আদর করে আবীর কপালে মাখিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে। শিউরতনের বউ বললে, "ও কমলী, আসছে বছর ত তুই এই বাড়ীতেই রং খেলবি।" কমলী লজ্জায় মাথা নোয়ালে। ততক্ষণে কানাইয়া এসে গেছে, কমলী বাড়ী ফিরে চলল। শিউরতনের বউ বললে, "আয় কানাইয়া, কমলীকে আবীর দিয়ে যা।" কানাইয়া একটু এগিয়ে গিয়ে কমলীর কপালে আবীর দিয়ে চুপি চুপি বলল, "তুই নাচলি, আমাদের দেখালি না কেন?" কমলী একগালে হেসে বলল, "গাছে চড়ে বানরের মত বসে নাচ দেখছিলি সেটা কি?" বলে হঠাৎ কোঁচড় থেকে আবীর নিয়ে কানাইয়ার চোখে মুখে ছুঁড়ে ছুটে পালাল। কানাইয়াও পিছু ছুটবে ভেবেছিল, কিন্তু পেছন ফিরে শিউরতনের বউয়ের মুচকি হাসি দেখে থমকে দাঁড়াল। রাধা-সাজে কমলীর রূপটা কানাইয়ার মনে গেঁথে রইল। ভাবতে লাগল, আসছে বছর এমনি সাজে কমলি তার ঘরণী হয়ে আসবে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতেই গ্রামের পুরুষেরা জায়গায় জায়গায় একত্র হয়ে সিদ্ধির সরবত পান করতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে হৈ হৈ চীৎকার অট্টহাসি। ঢোল মৃদঙ্গের আওয়াজ গ্রামটাকে তোলপাড় করে তুলল। তার পর কখন সবাই একে একে বেহুঁস অচেতন হয়ে পড়ল কেউ বুঝতেও পারলে না। উৎসবোন্মত্ত গ্রাম সিদ্ধির নেশায় নীরব নিঝুম হয়ে পড়ল।

আবার ধারাবাহিক গ্রাম্য জীবনযাত্রা সুরু হয়ে গেল। বসন্তের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে খরতর গ্রীষ্মের আবির্ভাবে গ্রামবাসী ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। একটানা কঠোর পরিশ্রমের পর কাজে শৈথিল্য আসে। কৃষকেরা আরাম বিশ্রাম করে নেয় এই গ্রীষ্মকালে। গত বৎসর কতক

অনাবৃষ্টি ছিল, ফসল খুব ভাল হয় নি। কিযাণরা আশায় আশায় ছিল এবার বর্ষাকালে গাঁয়ে সোনা ফলবে।

বর্ষাকাল এল, কিন্তু আবহাওয়া দেখে কৃষকদের মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল। বিদ্যুৎ চমকায়, গগনে ঘনঘটা করে মেঘ আসে, কিন্তু কোথায় ভেসে চলে যায় ঐ মেঘ, ঝর্ ঝর্ বারিধারায় কঠিন উষর জমিকে সিক্ত উর্ব্বর করে তোলে না। কিযাণরা কুয়োর জল সেচে সেচে বীজ বুনল, কিন্তু রোদের তাতে, অনাবৃষ্টিতে সব্জীক্ষেত, জোয়ার-গম-ক্ষেতের নবকিশলয়গুলি ঝলসে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে শ্যামল প্রান্তরগুলি ধূসর রুক্ষ প্রান্তরে পরিণত হ'ল। কৃষকেরা চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। শস্যশ্যামলা অজন্তী গাঁ, যার শ্যামলশ্রী দর্শকের নয়ন জুড়াত, সেই গ্রামখানি আজ রিক্তবসনা বিধবা সেজেছে। কোথাও এতটুকু সবুজ আভরণ নেই। গ্রাম আজ মরুভূমি, চারিদিকে হাহাকার উঠল। জল যে ভাবেই হোক্ মিলাতে হবে। জোয়ান ছোকরারা গাঁইতি নিয়ে, কোদাল নিয়ে প্রাণপণে মাটি খুঁড়ছে। টপ টপ করে তাদের মাথা থেকে ঘাম ঝরছে। হাতের মাংসপেশীগুলো হয়ে উঠেছে শক্ত, চওড়া বুক পিঠ ভিজে গেছে ঘামে, শ্যামবরণের মুখ হয়ে উঠেছে আরক্ত কঠিন। কিন্তু জলের দেখা পাওয়া যায় না।

পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট বালিকারা হাতে একখানা পিতলের থালায় নারকেল বাতাসা রেখে বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে মাগনী মাগতে লাগল। "হে ভগবান, জল দাও।" গৃহস্থবধূরা এক এক ঘটি জল নিয়ে তাদের উপর ছিটিয়ে, ভিজিয়ে দিয়ে বলে, "তোদের যে-রকম ভিজিয়ে দিলাম, বর্ষা যেন তেমনি করে আমাদের ধরিত্রী মাতাকে ভিজিয়ে দেয়।" মন্দিরে মন্দিরে গ্রামবাসীরা মিলিত হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, "হে ভগবান জল দাও, জল দাও।" জায়গায় জায়গায় সারাদিন কীর্ত্তন ভজন চলল, কিন্তু বরুণ দেবতার কৃপা হ'ল না। কার পাপে আজ বিধাতার এই নিষ্ঠুর দণ্ড নেমে এসেছে কেউ বুঝতে পারে না।

সব কুয়ো শুকিয়ে গেছে, বিশ-পঁচিশ হাত রশি ফেলে টেনে তুলে দেখা যায় বালতি ভরে উঠেছে শুধু কাদাগোলা জল। গ্রামের বউঝিরা মাথায় 'ঘাঘর'এর পর 'ঘাঘর' বসিয়ে চলে দূরে বহু দূরে একটা জঙ্গলের ভিতর, একটা বড় কুয়ো থেকে জল আনতে। কমলী কাজের মেয়ে, সেও মাথায় দুটি ঘাঘর চড়িয়ে চলে বউদের সঙ্গে জল আনতে। চলার তালে চুনটকরা ঘাঘরা দোলে ভাঁজে ভাঁজে, পায়ের পায়েল বেজে ওঠে ঝম্ ঝমাঝম্।

কানাইয়া জঙ্গলে যায় তার বলদজোড়াকে চরাতে। একদিন তার নজরে পড়ল, কুয়োতে রশি ফেলে কমলী আর টেনে তুলতে পারছে না, তার ছোট হাতদুটি হয়ে উঠেছে আরক্ত, পরিশ্রমে মুখখানা হয়েছে স্বেদসিক্ত রাঙা। কানাইয়া এগিয়ে গেল সাহায্য করতে। কমলী কৃত্রিম রাগের ভান করে বলে, "কে বলেছে তোকে জল টেনে দিতে, আমার হাত নেই নাকি?"

সুকুমার ঘর্ম্মাক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে তার কথা অগ্রাহ্য করে মোটা রশি হাতে নিয়ে কানাইয়া বালতির পর বালতি জল তুলে ঘাঘর ভরে দিল কমলীর। একটি বউ বসে ঘাঘর ঘষছিল, তাদের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

কমলীর পরিশ্রমকাতর মুখের দিকে চেয়ে কানাইয়ার মনটা ভরে উঠে ব্যথায়। পরদিন থেকে সে তার বলদজোড়াকে জল খাওয়াবার অছিলায় বসে থাকে কুয়োর পারে। কমলী এলে জল ভরে দেয় তার ঘাঘরে। কৈশোর তাদের মধ্যে যে ব্যবধান এনে দিয়েছিল, অনাবৃষ্টি তা মুছে দিলে।

আকাল দেখা দিল জলাভাবে। ধীরে ধীরে গ্রামের লোকের রসদ ফুরিয়ে এল। এত দিন ছিল অর্দ্ধাহারে, এবার অনাহারে থাকতে হ'ল। সম্পন্ন গৃহস্থরাও আজ অন্নহীন। গ্রামের জোয়ানরা বসে আছে মাঠে—কাজ নেই, জমিতে কোদাল বসে না। হাল চলে না। একটুকরো মাটি উঠে না। বৃষ্টির অভাবে ধরা পাষাণ হয়ে গেছে। কিষাণরা হাটবারে হাটবারে তাদের সযত্নে পোষিত গরু মোষ বইল শহরে নিয়ে জলের দরে বিক্রী করে আনতে লাগল। কোমরের বটুয়াতে টাকাগুলো গুনে ভর্ত্তি করে কাঁধের লাল গামছাখানি দিয়ে মুছে ফেলে দু'ফোঁটা অশ্রু, একটা বুকভরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে ভিতর থেকে।

একদিন কানাইয়াও তার সাধের বইলজোড়াকে বাজারে বিক্রী করে এল। সেদিন কমলীকে কুয়ো থেকে জল তুলে দিতে দিতে বললে, "জানিস কমলী, আমার বইলজোড়া ত বাজারে বিকিয়ে এলাম। এবার নিজের পাটও উঠাতে হবে এ গাঁ থেকে।" চকিতে কমলীর মুখ ম্লান হয়ে উঠে। উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে, "কেন, কোথায় যাবি?"

কানাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "বাপদাদার ভিটে, আমাদের সোনার অজন্তী গাঁ ছেড়ে কি কেউ বাইরে যেতে চায় রে কমলী? কিন্তু উপায় নেই, পেট ভরাব কি দিয়ে? দেখতে পাচ্ছিস না আমার কত সাধের বইলজোড়াকে কেমন জন্মের মত পরের হাতে তুলে দিয়ে এলাম।"

অনেক লোক হতাশ হয়ে চলে গেল গ্রামের বাইরে কাজের খোঁজে পেট ভরতে। যখন গ্রামের এমনি দুর্দ্দশা, তখন রামচরণ একদিন উৎফুল্ল মুখে খবর আনলে, একটা লোক শহর থেকে এসেছে, তার হাতে নাকি অনেক কাজ আছে, খেতে-পরতে দেবে ভাল, মাইনে দেবে ভাল, তবে গ্রাম ছেড়ে বহু দূর যেতে হবে। গ্রামের মুখিয়ার কাছে নিয়ে এল তাকে। সকল গ্রামবাসী সমবেত হ'ল সেখানে, লোকটা কি আশার বাণী এনেছে শুনতে। লোকটির নাম পিয়ারীলাল। গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী, ভিতর থেকে হাত-কাটা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। পরনে ফিন্‌ফিনে ধুতি, মুখে সিগারেট, বাঁ হাতের আঙুলে একটা একটা আংটি চক্‌চক্ করছে। শরীরখানা নাদুসনুদুস। লোকটা বেশ ভারিক্কী চালে এসে বসল। অনাহারে দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের মধ্যে এই ধোপদুরস্ত ভদ্রলোকটিকে নিতান্ত বেমানান দেখাতে লাগল। পিয়ারীলাল সালঙ্কারে বলতে লাগল, এমন একটা দেশের সন্ধান সে জানে যেখানে সোনা ফলে। সেখানে কোন কিছুর অভাব নেই। ভাল খাওয়া পাবে, পরতে কাপড় পাবে, থাকতে ঘর পাবে, কি মজার জীবন, কাজ কিছু কঠিন নয়। শুধু চায়ের বাগানে ঘুরে ঘুরে পাতা সংগ্রহ করা। তার বক্তব্য শেষ হলে সে পকেট থেকে একরাশ লজেন্স ছেলেমেয়েদের হাতে বেঁটে দিল।

রাতে কানাইয়া কমলীর বাপের কাছে দাওয়াতে বসে বললে, "মামা, কি করা যায় বলত, দিন ত আর চলে না, বল ত আমি চলে যাই ওই সোনার দেশে।" এক পাশে কমলী আর তার মা বসেছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কমলীর বাপ বললে, "কানাইয়া তুই আমাদের ছেড়ে কোন্ দূরদেশে চলে যাবি। তোর উপরই ত আমাদের ভরসা ছিল।" কানাইয়া ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল, "মামা, তবে তুমিও সবাইকে নিয়ে চল না, আমি পিয়ারীলালের কাছে খোঁজ নিয়ে এসেছি, যারা কাজের লায়েক এমনি সবাইকে ও কাজ দিতে রাজী আছে। ছাড়াছাড়ি করে লাভ কি মামা, এমন আকালের সময় সবাই একত্রে থাকা কি ভাল নয়?"

ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পোড়াতে পোড়াতে কমলীর বাপ অনেক ভাবলে, তারপর বললে, "চল কানাইয়া তাই করি। মেয়েটার কথাও ত ভাবতে হবে। আগামী দোলে তোদের দু' জনের বিয়ে দেব বলে কত আশাই না করেছিলাম। আজ যে বাপদাদার ভিটেয় বাতি জলবে না। তালা বন্ধ করে ঘরদোর ফেলে চলে যেতে হবে কে ভেবেছিল? চল কানাইয়া শুকিয়ে মরার চেয়ে ওই দেশেই চলে যাই।"

ওদিকে শিউরতনের ঘরেও বৈঠক বসেছে। পিয়ারীলালের কথা ঠিক কিনা। ভাল মাইনে, খেতে-পরতে দেবে কিনা কে জানে! বুড়ীরা তাদের জোয়ান ছেলেদের ছেড়ে দেবে কিনা সুদূরে, তাই বলাবলি করতে লাগল। ইতিমধ্যেই পিয়ারীলাল আশপাশের গাঁয়ে ঘুরে আরও বহু লোক সংগ্রহ করল। কমলীর মা বাপ আর কানাইয়া তার মাকে নিয়ে তাদের দলে ভিড়ল। এই প্রলোভনে পড়ে দেখাদেখি আরও কয়েক ঘর গৃহস্থও গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজী হ'ল। এক দিন সবাইকে নিয়ে পিয়ারীলাল নিকটবর্ত্তী এক শহরে যাত্রা করল। সেখানে তাদের একটা বিরাট পড়ো বাড়ীর গৃহে জমা করল। তারপর সিগারেট টানতে টানতে একটা কাগজে স্ত্রী-পুরুষ সবাইয়ের নাম লিখে বুড়ো আঙুলে কালি দিয়ে টিপসই নিতে লাগল। তাদের সবাইকে অনেক মিষ্টি কিনে খাওয়ালে পিয়ারীলাল। তার মিষ্টি কথায় আর আদর-আপ্যায়নে গ্রামবাসী মুগ্ধ হ'ল, তাদের মনে হ'ল তাদের দুঃখ দূর করতে দেবতাই বুঝি বা পিয়ালীলালের বেশে দেখা দিয়েছেন। পিয়ারীলাল ঘুরে ফিরে কমলীকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল, কিন্তু কানাইয়ার চোখে তা বিশেষ ভাল লাগল না। পিয়ারীলাল সকলের জন্য রেলের টিকিট কিনল। যাত্রীদের অনেকেই দূর থেকে শুধু রেলের বিপুল গতি দেখেছে, তীব্র বংশীধ্বনি শুনেছে, তাতে চড়ে বসবার সৌভাগ্য হয় নি, ভয়ে ভয়ে সবাই চড়ে বসল রেলগাড়ীতে। বিপুল বিস্ময় নিয়ে কমলী আর কানাইয়া রেলের কামরার প্রত্যেকটি জিনিষ পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর রেল যখন হুইসেল দিয়ে গতিশীল হ'ল, তখন কমলী ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে।

হুস হুস করে রেলগাড়ী চলতে লাগল। কমলী জানালার গরাদে মাথা রেখে দেখতে লাগল। গাড়ীর দোলনে ঘুম এসে যায়। কমলী নিজেকে জোর করে সজাগ রাখে দু'ধারের দৃশ্য দেখতে। পুরোপুরি দু'দিন রেল-ভ্রমণের পর মধ্যপ্রদেশ পেরিয়ে দু'একটা জংসনে গাড়ী বদল করে যখন বাংলাদেশে পৌছল, তখন চারদিকের শ্যামলশ্রী দেখে সকলের চোখ

জুড়িয়ে গেল। তারপর ষ্টীমারঘাটে এসে দেখে রূপালী নদী বিছানো রয়েছে শ্যামল ক্ষেতের গা ঘেঁষে। প্রভাত রবির সোনালী আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে নদীর জল। ভীতি বিস্ফারিত নেত্রে ওরা পিয়ারীলালের সাহায্যে উঠে বসল ষ্টীমারে। ক্ষিপ্র গতিতে দু'ধারে জল কেটে চলেছে জলযান। এধারে ওধারে ভাসছে ছোট ছোট পালতোলা নৌকা, নদীর জল তোলপাড় করে থেকে থেকে মাছগুলি ডিগবাজী খেয়ে যাচ্ছে জলে, তাদের রূপালি আঁশগুলো ঝক্‌মক্ করে ওঠে সূর্য্যকিরণে। বহুদিনের তৃষিত চাতকের মত অজন্তী গাঁয়ের লোকেরা পূর্ণকায়া স্বচ্ছসলিলা নদীর বিচিত্র রূপ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল। বিশাল নদী পার হয়ে আবার তারা ট্রেনে উঠে বসল। এবার তারা বাংলার সীমা ছাড়িয়ে আসামের বুকে এসে যাচ্ছে। রেল কখনও সর্পিল গতিতে চলেছে এঁকেবেঁকে, কখনও পাহাড়ী নদীর লৌহ-সেতুর উপর গুম গুম আওয়াজ করে। কানাইয়া কমলী বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে বসে দু'ধারের দৃশ্য দেখে। কোথাও টিলা থেকে ঝরণা ঝর্ ঝর্ করে বয়ে আসছে জঙ্গলের ভিতর পথ কেটে, মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড় ছায়াকীর্ণ করে রেখেছে স্থানটিকে। এবার তারা এসে গেছে সোনার দেশে। ঐ যে পাহাড়ের টিলায় টিলায় চা-বাগিচার শ্যামলশ্রী দেখা যাচ্ছে। সিগরেট টানতে টানতে পিয়ারীলাল মাতব্বরী চালে বলতে লাগল, "বলেছিলাম কিনা তোমাদের সোনার দেশে নিয়ে আসব, চোখ জুড়াবে।" গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যে যার পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে নেমে পড়ল রেল থেকে। পিয়ারীলাল সবাইকে নিয়ে চলল চা-বাগিচায়।

পাহাড়ের নীচে সারি সারি কুটীর, মজুরেরা তাদের সংসার পেতে বসেছে। দুখানা পাশাপাশি কুটীরে কানাইয়া আর কমলীর মাও সংসার সাজিয়ে বসল পোঁটলা -পুটলি গুছিয়ে।

পরদিন পিয়ারীলাল তাদের সবাইকে নিয়ে চুক্তিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়ে নিলে, অন্ততঃ পাঁচ বছর এরা চাক্‌রি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। তারপর তাদের চায়ের পাতা তোলার কাজে লাগিয়ে দিলে। কমলী দেখলে কত দেশের নর-নারী, বালক-বালিকাতে চা-বাগিচা পূর্ণ। পিয়ারীলাল কমলীর কাজ একটু কমিয়ে দিলে; কানাইয়ার মনটা যেন কেমন বিষিয়ে গেল এই নতুন আবেষ্টনে। কমলীর প্রতি পিয়ারীলালের অতিরিক্ত আদর যত্ন কানাইয়াকে বিমর্ষ করে তুললে! সারাদিন কানাইয়া কমলীকে এক রকম দেখতেই পায় না। পিয়ারীলাল তাকে অন্য বিভাগে কাজ দিয়েছে।

ধীরে ধীরে অজন্তী গাঁয়ের লোকগুলোর নূতনের আকর্ষণ কমে এল, প্রলোভন দূর হ'ল। এরা দেখতে পেল চা-বাগিচা খেতে দেয় ডাল ভাত, পরতে দেয় মোটা কাপড়, আর ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে যেতে হয়। এক চুল এদিক-ওদিক হলে তিরস্কার গঞ্জনা শুনতে হয়, বেত পড়ে পিঠে সপাং সপাং। ভয়ে কমলীর বুকের ভিতরটা শুকিয়ে ওঠে।

এই নিষ্ঠুর নতুন আবেষ্টনে ওরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না। কমলী কানাইয়া প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠেছে। তারা হাঁপিয়ে উঠল চা-বাগিচার এই ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনে। কমলী বিষণ্ণ মুখে বলে, "আমাদের অজন্তী গাঁখানা কি সুন্দর ছিল রে কানাইয়া। সেই বনে বনে ঘুরে বুনোকুল কুড়ানো, তুঁতে করমচা পেড়ে খাওয়া, কি মজাই না লাগত!

আজও জানি লছমী, কুলী, ক্ষেমী, বনে বনে ঘুরে ফল-ফুল কুড়োয়" বলতে বলতে কমলীর দু'চোখ ভরে উঠল জলে।

"কাঁদিস নে কমলী, পাঁচ বছর কাটিয়ে দেব কোন রকমে, তারপর আমরা চলে যাব আমাদের সোনার গাঁয়ে। আবার আমরা সুখের সংসার পেতে বসব ভগবানের দয়ায়," কানাইয়া বলে।

কিন্তু এই নতুন আবেষ্টনের ধাক্কাটা কাটাতে পারলে না কানাইয়ার মা। অত্যধিক পরিশ্রমে আর নির্য্যাতনে শয্যাশায়িনী হ'ল। কানাইয়া সারাদিন ছটফট করে কাজ করত। মন পড়ে থাকত তার দুঃখিনী মায়ের কাছে। সন্ধ্যে হলেই ঘরে ছুটে এসে মার রোগক্লিষ্ট মস্তক কোলে তুলে নিত। ছোট শিশুর মত মাকে যত্ন করে দুধ চা পথ্য দিত।

কমলীর মাও ছুটি পেলেই এসে বসত কানাইয়ার মার কাছে। এক সন্ধ্যায় কানাইয়ার মা কমলীর মার হাত ধরে বললে, "বোন, বড় সাধ ছিল কমলী-কানাইয়ার বিয়ে দিয়ে সুখের সংসার পাতব, তা আর হ'ল না। বুঝতে পারছি আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।" কমলীর মা বললে, "এমনি অলক্ষুণে কথা বলিস নে বোন। অসুখ হয়েছে, ভাল হয়ে যাবি। কমলী-কানাইয়ার বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসার করবি। তোর কি এখন চলে যাবার বয়েস? আসছে দোলপূর্ণিমায় কমলী-কানাইয়ার বিয়ে দিয়ে দে।"

কানাইয়ার মা উত্তেজিত হয়ে বলে, "এখানে কি বিয়ে হয় দিদি? যমপুরীতে কি বিয়ের বাঁশী বাজে? এরা মানুষ নয়, রাক্ষস দিদি। কি সুখেই আমরা অজন্তী গাঁয়ে ছিলাম",—বলতে বলতে কানাইয়ার মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, "ভুলে গেছিস দিদি, সেই ভোরে উঠে অঙ্গনে গোবরছিটা দিয়ে তুলসীতলা নিকানো। ঘরদোর ঝাটপাট দিয়ে চলে যেতাম আমরা কুয়োতে জল আনতে। কি সুন্দর মজলিস বসত আমাদের কথাবার্ত্তা আর গল্পের। রামভরসার মা, শিউরতনের বউ, সোহাগী, ভক্তন এরা কত গল্প বলেছে, কত হাসিয়েছে। পূর্ণিমায় সাজগোজ করে দল বেঁধে যেতাম আমরা বটগাছের নীচে বটপূজা দিতে। বর্ষার জল পেয়ে আমাদের ক্ষেতগুলি হয়ে উঠত কত সুন্দর সবুজ। ক্ষেতের দেবতার পূজা দিতাম কত মিষ্টি তৈরি করে। তারপর দিদি মনে পড়ে সেই শ্রাবণ মাসে ঝুলনপূর্ণিমায় কাজরী গান গেয়ে দোলনায় দোলা? সে সুখের দিন চলে গেছে, আছে শুধু যন্ত্রের মত কাজ করে যাও। হাতের কাজ একটু ঢিলে হলে দেবে অকথ্য গালি। কুলীর সর্দ্দারের বেত যখন-তখন লিক্‌লিক্ করে উঠে পিঠে পড়বে। এখানে মন খুলে হাসিগল্প করবার অবসর নেই। মানুষ এখানে পাষাণ হয়ে গেছে, আমি আর এই জীবন বইতে পারি না।" বলতে বলতে উত্তেজিত কানাইয়ার মা মলিন উপাধানে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। কমলীর মায়ের অশ্রুজল টপটপ করে ঝরে পড়ে কানাইয়ার মার শীর্ণ হাতে। কানাইয়ার মা ফুঁপিয়ে বলে, "কোথায় আমার কানাইয়াকে বিয়ে দেব এই পাষাণপুরীতে? কোথায় আমাদের গৃহদেবতা, কোথায় আমাদের গ্রামের দেবমন্দির? কোথায় তাঁকে অর্ঘ্য দিব? পাঁচ সোহাগিন কোথায় যাবে সোহাগ মাগতে? আমার সব সাধ-আহ্লাদ ভগবান কেড়ে নিয়েছেন।"

তিন দিন পর কানাইয়ার মা কমলী কানাইয়ার হাত ধরে চোখ বুজল। কানাইয়া 'মা, মা' করে চেঁচিয়ে উঠল আর্ত্তস্বরে। কিন্তু মা আর ফিরে এল না। কানাইয়ার মার অকালমৃত্যুতে অজন্তী গ্রাম থেকে আগত সবাই মুষড়ে পড়ল। তাদের মন হাহাকার করে উঠল—মুক্তি চাই এ রাক্ষসপুরী থেকে, মুক্তি চাই। কিন্তু মুক্তি নেই, এক পাও নড়তে পারবে না চা-বাগিচার গণ্ডী থেকে। পাঁচ বছরের কড়ারে তারা আবদ্ধ। মার মৃত্যুতে কানাইয়া ভেঙে পড়ল, যেন মনে হয়, দেহমনের শক্তি অনেক কমে গেছে। সে বলিষ্ঠ যুবক, পিয়ারীলালের আদেশে কুলীসর্দ্দার তাকে দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নেয়। একদিন তার ক্লান্তি এল, হাতের কাজ ফেলে সে খানিকক্ষণ বসে রইল। মন ডুবে গেল তার অতীতের মধুর স্মৃতিতে। হঠাৎ পেছন থেকে কুলীসর্দ্দারের বেতখানা আচমকা কানাইয়ার পিঠে পড়ল সপাং করে। "কিরে বড় কাজে ফাঁকি দিতে শিখেছিস।" বলে সর্দ্দারের সে কি অট্টহাসি। পলকের মধ্যে কানাইয়া লাফ দিয়ে উঠল। শ্যাম মুখখানা হয়ে উঠল আরক্ত, নাসাবন্ধ্র ফুলে উঠল, সে রুদ্ধ আক্রোশে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্দ্দারের উপরে। কিন্তু সে নিরস্ত্র, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র, তার কি চাবুকধারী ধূর্ত্ত সর্দ্দারের সঙ্গে এঁটে উঠবার শক্তি আছে। চাবুকের পর চাবুক পড়তে লাগল কানাইয়ার পিঠে। একটা আর্ত্তনাদ করে কানাইয়া লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ওদিককার ক্ষেতে কমলী চায়ের পাতা তুলছিল, গোলমাল আর আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে এসে ভূলুণ্ঠিত কানাইয়াকে দেখে তীব্র চীৎকার করে সে চোখ বুজলে। কুলীসর্দ্দার হিংস্রমুখে বলে উঠল, "ওঠ কাজ কর, আজ তোর মাইনে কাটা গেল, বেশী শয়তানী করিস ত আরও চাবুক পিঠে পড়বে।" পিয়ারীলাল এসে কমলীর হাত ধরে টেনে বললে, "তুই এখানে এসেছিস কেন, চল ওখানে।"

বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত দেহখানা নিয়ে উঠে বসে কানাইয়া নির্জীবের মত কাজ করতে লাগল। দুপুরে কিছু খেল না। সন্ধ্যায় শরীর এলিয়ে দিল মলিন শয্যায়। কমলী সারাদিন কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। ছুটি হতেই সে ছুটে গেছে কানাইয়ার কাছে। কানাইয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, "চল্ কানাইয়া আমরা এ রাক্ষসপুরী ছেড়ে পালাই।" কানাইয়া হতাশ ভাবে বলে, "কোথায় যাব কমলী, হাত-পা যে বাঁধা কড়ারে, পালালেও ওরা ধরে নিয়ে আসবে, এই যমপুরী ছেড়ে নিস্তার নেই।"

কমলী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, মনে মনে বলে, "হে ভগবান, এখান থেকে আমাদের মুক্তি দাও।" রাত্রে কানাইয়ার প্রবল জ্বর হ'ল, সে বেহুঁস হয়ে পড়ল। চা-বাগিচার মজুরদের চিকিৎসাই বা কি? খানিকটা কুইনিন মিকশ্চার গিলিয়ে রাখে। অবসর সময়ে কমলী আর তার বাপ-মা প্রাণপণে যত্ন করে। কিন্তু রোগের উপশম হয় না, কানাইয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল।

কিছুদিন পর হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ। সে ঘরে ফিরে এল, পিলেভরা বড় পেট। কাঠির মত হাত-পা। সে কাজের বার হয়ে গেছে, চা-বাগিচায় তার ঠাঁই নেই। কমলী এ কয় দিন কানাইয়াকে না দেখে হাঁপিয়ে পড়েছিল,

খাওয়া-দাওয়া একরকম সে ছেড়েই দিয়েছে। তার সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে এই নিষ্ঠুর পরিবেশে। সে কানাইয়ার এই মূর্ত্তি দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দু'চোখে নামল জলের ধারা। কানাইয়াকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বাগিচার কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, আর তাকে চা-বাগিচার এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হ'ল। নিজের টুকিটাকি জিনিস পুটুলি বেঁধে কানাইয়া পথে ভাসল। যাবার আগে কমলীর হাত দুখানা ধরে বলল, "কাঁদিস না কমলী, দু'বছর কেটে গেছে, আর তিন বছর আমি তোর অপেক্ষায় থাকব। দেখিস আমাকে ভুলে যাস নে যেন।"

কানাইয়া চলে গেল। কমলী ছিন্ন লতার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কানাইয়া চা-বাগিচা ছেড়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু কমলীকে ছেড়ে টিকতে পারে নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে সে কমলীকে দেখতে আসে। একদিন পিয়ারীলাল দেখতে পেয়ে বলল, "তোর বেত খেয়ে সাধ মেটে নি। আরও বেত খেতে চাস বুঝি। এখুনি চলে যা। আর যদি কখনও তোকে এখানে দেখা যায় তবে পুলিসে দেব।"

কানাইয়া ক্লান্ত শরীরে দুর্ব্বল পা দুটো টেনে টেনে চলল। একটা গাছতলায় আজ চার-পাঁচদিন হ'ল ঠাঁই নিয়েছে। সে আজ গৃহহীন, আশ্রয়চ্যুত, কোথায় যাবে জানে না। পরদিন সে গাছতলা ছেড়ে পোঁটলাপুটলি নিয়ে বটগাছ-ছাওয়া রাজপথ ধরে চলতে চলতে রেল-ষ্টেশনে চলে এল। এতদূর হেঁটে সে হাঁপিয়ে উঠল, প্লাটফর্ম্মে রেলের অপেক্ষায় বসে রইল। সে অজন্তী গাঁয়েই চলে যাবে, সেখানেই ধৈর্য্য ধরে তিন বছর কমলীর জন্যে অপেক্ষা করবে। রেল এলেই সে একটা কামরার এককোণে উঠে বসল। তারপর বেঞ্চিতে সটান লম্বা হয়ে গাড়ীর দোলনে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল।

রেল তাকে কমলীর সান্নিধ্য থেকে কোথায় কোন সুদূরে বিপুল গতিতে নিয়ে চলেছে জানতেও পারল না। হঠাৎ হাতে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ খুলে দেখতে পেল টিকিট চেকার কর্কশ স্বরে টিকিট চাইছে। সে উঠে অসহায় ভাবে বলে—"টিকিট, টিকিট কোথায় পাব? আমি গরীব মানুষ।" টিকিট চেকার তার হাত ধরে টেনে তাকে গাড়ী থেকে এক ষ্টেশনে নামিয়ে দিলে। রেল নিমেষে চোখের আড়াল হয়ে গেল, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আসাম তার সম্পূর্ণ অজানা, সে চা-বাগিচা ছেড়ে কোথায় কোন্ দিকে এসে গেছে কিছুই বুঝতে পারল না। নিরুপায় হয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে রাজপথ দিয়ে চলতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল এক দল অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু বুড়ো বুড়ী হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলেছে। সে তাদের অনুসরণ করে একটা বড় বাড়ীতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে অনাহারক্লিষ্ট দেহ নিয়ে সে আচ্ছন্নের মত বারান্দায় শুয়ে পড়ল। গৃহকর্ত্তা বসে ছিলেন ইজিচেয়ারে, তার নজর পড়ল এই দুঃস্থ লোকটির উপর। তিনি কানাইয়াকে খাইয়ে সতেজ করে তুললেন। তার পর সংক্ষেপে তার কাহিনী শুনে তাকে আশ্রয় দিলেন।

গৃহকর্ত্তা ধনী বৃদ্ধ, মাসেকের মধ্যে কানাইয়া তাঁর আশ্রয়ে থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। তাঁর সেবাতে কৃতজ্ঞতায় সে মন ঢেলে দিল। সারাটা দিন কানাইয়া কাজ করত,

কিন্তু সন্ধ্যা হলেই চুপ করে এককোণে বসত, চোখে ভেসে উঠত তার জীবনচিত্র, কমলীর সুন্দর মূর্ত্তি তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। সে কাজে একনিষ্ঠ ছিল, বৃদ্ধ কর্ত্তা তাকে খুবই স্নেহ করতেন। কিন্তু তার মুখে হাসি কেউ দেখে নি। অন্যান্য ভৃত্যেরা কত আমোদ-আহ্লাদ হাসি-তামাশা করত অবকাশ সময়ে, কিন্তু কানাইয়া সে আসরে যোগ না দিয়ে গম্ভীর ভাবে বসে থাকে এককোণে। কারও কাছে সে মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করে না। সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলে ছিল সে। ভাগ্যদোষে আজ সে বিড়ম্বিত। ঝড়ের ঝাপটাতে সে জীবন-নদীতে দুলছে। আঘাত খেয়ে এধার থেকে ওধারে যাচ্ছে। শেষ পরিণতি কি, কে জানে।

দিন দিন কানাইয়া বেশী গম্ভীর হয়ে উঠছে। আগে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় দুঃখিনী মাঁ আর কমলীর কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছে। এখন অশ্রু শুকিয়ে গেছে। শুধু একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। চা-বাগিচা শুধু তাকে আশ্রয়চ্যুত, কর্ম্মচ্যুত করে নি। কিশোরী কমলীকে নিয়ে যে নীড় বাঁধবার রঙীন স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল, সে রঙীন স্বপ্ন, উজ্জ্বল সুখের ভবিষ্যৎ নিষ্ঠুর ভাবে চা-বাগিচা চূর্ণ করে দিয়ে তাকে ভাগ্যহীন করে তুলেছে। তাই আজ সে গৃহহীন হয়ে ব্যর্থ জীবন বহন করছে।

আবার বসন্ত ফিরে এসেছে। গাছে গাছে ঝরাপাতা খসে গিয়ে নতুন পাতা গজাচ্ছে। দখিন হাওয়া সবার মনে দিয়ে যাচ্ছে দোলা। এসেছে দোলপূর্ণিমা। সবার মনে রং লেগেছে।

দোলপূর্ণিমায় রং-খেলা শুরু হ'ল। সখীরা বলল, "আয় কানাইয়া রং খেলবি," কানাইয়া পাথরের মত নিশ্চল নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল। মণিপুরী যুবকের দল সাদা ধবধবে ধুতি শার্ট পরে মাথায় রং-বেরঙের পাগড়ী বেঁধে জয়ঢাক নিয়ে নাচতে নাচতে এল রং খেলতে। মণিপুরী বুড়ী মনোরমা একদল বালিকা নিয়ে এল। তারা নাচবে গাইবে রং খেলবে, মুঠি ভরে বকশিশ নিয়ে যাবে। বালিকাদের গায়ে রঙীন কোর্ত্তা, বুকে গিঠ দিয়ে রঙীন কাপড় বেঁধে পা অবধি ঝুলিয়ে দিয়েছে—মাথায় কানে গুঁজেছে ফুল, গলায় পলার মালা। মনোরমা গান ধরেছে, "এই দেশেতে এল নিতাই, আর ভাবনা নাই," আর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বালিকারা দু'হাতে তালি দিয়ে সমান তালে নাচছে। এককোণে বসে কানাইয়া দেখছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা তীব্র শিহরণ খেলে গেল, অজন্তী গাঁয়ের হোলীদৃশ্য চোখে ভেসে উঠল। কানাইয়া দেখতে পেল রাধার সাজে কমলী নাচতে নাচতে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। গলায় দুলছে ফুলের হার। কানাইয়া এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "কমলী দাঁড়া, আবীর নিয়ে আসছি।" এক পলকের জন্য চারদিক আঁধার হয়ে এল, কানাইয়া বেহুঁস হয়ে পড়ল। জল, পাখা, হৈ চৈ। কিছুক্ষণ পরে কানাইয়ার হুঁস হ'ল।...

বসন্ত উৎসব, দোলপূর্ণিমা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কানাইয়ার মনে এদিনের ঘটনাটা দিয়ে গেছে প্রবল ধাক্কা। কানাইয়া ভুলে গেছে কমলীকে। ভুলে গেছে অজন্তী গাঁ। শুধু দখিন হাওয়া বইলেই তার মন উদাস হয়ে যায়। সে ছুটে যেতে চায় দক্ষিণদিকে। দেখতে পায় এক সুন্দরী মেয়ে দখিন হাওয়ার সঙ্গে এসে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ধরতে যায়, ধরতে পারে না, দখিন হাওয়ায় সুন্দরী মেয়ে মিলিয়ে যায়।

প্রবাসী

বিভ্রাট

রাণু ভৌমিক

সেবা এই সেবা—উর্দ্ধশ্বাসে চেঁচাতে চেঁচাতে মীনা ঘরে ঢুকলো।

নেই...উত্তর দেয় অপর রুমমেট তনিমা।

কোথায় গেছে?

যেখানে যায়, তনিমার ওষ্ঠ অর্থদ্যোতক বাধা।

মীনা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হোষ্টেলের ঘণ্টা বেজে উঠলো ছেদ ডাকলো বক্তব্যে।

খাবার টেবিলের দিকে এক নজর তাকিয়ে মেট্রন বলে ওঠেন দুজন আসেনি দেখছি।

'সেবা আর তপতী' উত্তর দেয় একটী মেয়ে।

তপতীর জ্বর হয়েছে, ও খাবে না। মেট্রন বললেন, 'কিন্তু সেবার কি হলো?'

তাহলে আর সেবা খাবে কি করে? আসরে গাইবার মত সুরে বলে ওঠে কয়েকটি মেয়ে।

হাসে সবাই।

কথাগুলি শুনতে আশ্চর্য্য লাগছে—তাই না।

নতুন মেয়ে সুধাও অবাক হল।

তপতীর জ্বর তা সেবা খাবে না কেন?

মেয়েরা মুখ টিপে হাসে। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন মেট্রন 'তাও-জানো না, ওরা যে জোড়া পায়রা'।

বেশ লাগে দুজনকে দেখতে। মাথায় ওরা সমান। কেউই বেশী লম্বা নয়। তা নইলে চেহারায় আর কোন মিল নেই। একের রং ফর্সা কাগজের মত, ফ্যাকাসে, অপরের রং চাপা। তপতীকে বয়স আন্দাজে বড় ছেলে মানুষ মনে হয় আর সেইজন্যই বোধ হয় সেবাকে অনেকটা বয়স্ক লাগে। একজন একটু অসহায় ধরনের কিন্তু সেবা বেশ কর্মপটু। ওদের দুজনেরই স্বভাব এত ভাল, এত মধুর যে কেউ ও'দের না ভালবেসে পারে না।

ভালবাসলেও হোষ্টেলের মেয়েরা ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। ওরা হাসে—অতিরিক্ত বললে চটে মুখ গম্ভীর করে।

সমস্ত সময় কি যে কথা বলে ওরা, কথা যেন ফুরোয় না। মিতা বলে, আমাদের হয়েছে এক জ্বালা, তিনজনের ঘরে চারজন থাকতে হবে। তপতী তো সব সময়ই সেবার কাছে বসে আছে।

কেন যে ওদের এক ঘরে সীট দেয়নি?

বন্ধুত্ব হলো সীট নেবার পর, আগে তো নয়।

ওপরের ঘরে তপতী ও সেবা এই আলোচনাই করছিল। এক ঘরে থাকতে পারলে কি মজাটাই না হতো? যাকগে, সামনের সেসনে দেখা যাবে।

'তুমি এখন খেতে যাও'—তপতী বলে। 'খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'মানে? আমি খাব না বলে তুমিও খাবে না!'

'তা কে বলেছে? খেতে ইচ্ছে করছে না এই হচ্ছে আসল কথা।'

'তোমার আসল নকল সব কথাই বুঝি, বেশ চল, আমিও ভাত খাইগে।'

'এই অসুস্থ শরীরে?'

'কি করবো?'

'আচ্ছা আমি যাচ্ছি'।

খেতে যায় সেবা। কিন্তু সত্যই খেতে পারে না। ভাল লাগে না খেতে।

এমনি ধারার বন্ধুত্ব ওদের। প্রবল, প্রগাঢ় প্রাণদ।

পাশ করে ওরা বি. এ-তে ভর্তি হয়। বন্ধুত্বও গাঢ়তর হতে থাকে। এমনকি ছুটির সময়ও একে অন্যের বাড়ী গিয়ে থাকতো।

একদিন তপতী হোষ্টেলে একা ছিল। দারোয়ান এসে শুধালো সেবা দিদিমণি কোথায়?

কেন?

একজন বাবু এসেছেন। আজ তো ভিজিটিং দিন নয়, তবু উনি বাইরে থেকে এয়েছেন বলে…

…আর কিছু বখশীযও মিলেছে বলে, তপতী মনে মনে বলে।

আচ্ছা আমি দেখছি প্রকাশ্যে বলে সে।

দারোয়ান আর কিছু না বলে চলে যায়। সবাই জানে ওদের একজনের ভিজিটর এলে অপরে দেখা করলেও চলে যায়।

ভিজিটিং রুম বন্ধ। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি।

তপতী গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটি বলে আপনি?

আমি ওর বান্ধবী তপতী।

ও আপনার নাম জেনেছি, ওর কাছ থেকে। আমি ওর পিসীমার ছেলে…

বারীনদা—বাধা দেয় তপতী।

কি করে জানলেন?

আমিও জেনেছি।

ততক্ষণে ওরা হোষ্টেলের সামনের গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে।

কি দরকার সেবার কাছে।

দরকার আমার না আপনাদের?

'আমাদের'—অবাক সুরে বলে তপতী। চোখদুটি তুলে তাকায় উপরের দিকে।

যুদ্ধ হচ্ছে তা জানেন তো!

এতক্ষন বলতে ভুলে গেছি এ হচ্ছে গত মহাযুদ্ধকালীন ঘটনা।

জানি তাই কি?

তাই কি? বারীন ওর দিকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থেকে বলে, আপনি কলেজে পড়েন তো?

হায়রে, এরাই নাকি জাতির ভবিষ্যৎ।

আপনি কি গালাগালি দিতে এসেছেন নাকি? তা হলে আমি সেবার বদলি দিতে রাজী নই। ও এলে বরঞ্চ একদিন এসে...

না, ন্যা, আমার সময় কোথা? আর এরকম মানসিক পরিণতি তো হামেশাই দেখছি। তবে ভেবেছিলাম উপক্রমণিকা জানা আছে শুধু উপসংহারটুকু করে শীঘ্রই বিদায় হবো। তা আদ্যোপান্ত বলতে হলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না। চলুন সামনের ঐ পার্কটায় যাই।

যুদ্ধের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা বুঝিয়ে বারীন বলে এখন যদি আমরা স্বাধীনতা চাই তবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দিতে বাধ্য হবে। কারণ, ওরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঘরের শত্রুকেই রুখছে ওরা—বাইরের বিশেযতঃ এত দূরের অশান্তি দূর করা কষ্ট।

আমরা এই বিষয় নিয়ে কাল একটা সভা করবো। সেখান থেকে নিশ্চয়ই ওরা আমাদের ধরবে। তখন, আপনারা চালাবেন আন্দোলন। একজন চলে যাবে পরিবর্তে দাঁড়াবে অপর। এভাবে চলবে মিছিলের পর মিছিল।

বাইরের ছায়ার মত তপতীর মনেও যেন কোন এক ছায়ায় ভরে উঠলো, তবে তার বর্ণ ধূসর নয়, উত্তেজনার রং-এ রক্তিম। সে যেন স্বপ্নের মত দেখতে পেল মিছিলের পর মিছিল চলেছে—আর তার পুরোভাগে সে। হাতে তার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা।

তপতীর মন ছিল শুভ্র নিরঞ্জন। তাই এত শীঘ্র রাজনীতির রং ফুটলো।

ফিরে গিয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো ও কখন সেবা ফিরবে?

তখন সব কথা বলে একটু হাল্কা হবে মন। তাছাড়া কাল সভায় যাবার ব্যবস্থাও করতে হবে।

সেবা ফিরতে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছাদে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, চারিদিকে যুদ্ধের সুর। এখন আমরা চুপ করে আছি তা কি ঠিক?

নিশ্চয়ই না। সেবাকে উৎসাহিত দেখা যায়।

আমাদের উচিত এখন পড়াশুনা বাদ দিয়ে রাজনীতি করা, কারণ, আমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ।

ঠিকই বলেছ।

দুই বান্ধবী পরস্পরের হাত ধরাধরি করে পায়চারী করতে থাকে।

এই মোক্ষম সময় যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা যায়। স্বপ্নালু সুরে বলে চলে তপতী।

তার মানে? সেবা হাত ছেড়ে দেয় ওর। তুমি কি...তুমি কি মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা ভাবছ?

মিলিত শক্তি কি? তাই জান না? ওদের পরিচয়ের ইতিহাসে এই প্রথম বোধহয় তপতীকে বিদ্রূপ করে সেবা। আবার রাজনীতি করতে এসেছ? রাশিয়া ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাতে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি সবই বদলে গেছে। এখন এ হচ্ছে জনযুদ্ধ।

জন যুদ্ধ।

এই যুদ্ধকে আমরা স্বীকার করবো আর এই যুদ্ধের ফলেই আমাদের জনগণ স্বাধীন হবে। দুনিয়ার মজদুর এক হবে।

দেশের স্বাধীনতা।

সংকীর্ণ দেশপ্রেম, রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার অর্থ বিদেশী বুর্জোয়াদের হাত থেকে দেশী বুর্জোয়ার হাতে যাওয়া। তাতে শোষণ ব্যাহত হলো কই? দেশের লোক কি পেল?

আমি তোমার কথা মানি না!

তা মানবে কেন? তুমিও যে শোষক শ্রেণীর। তপতী বিরক্তি ও রাগে চুপ করে থাকে। একমিনিট পরে নেমে যায় ও।

সেবা ছাদেই বসে থাকে।

পরদিন একই সঙ্গে কলেজ থেকে বেরোয় দুজন। রাস্তার দুধারে দুটি সভা। একটু হয়তো দ্বিধা করে, তারপর দুজন দুদিকে চলে যায়, বিচ্ছেদ পূর্ণ হয়।

কাঁচের পাত্রের মতই ঠুনকো এই দুনিয়া—সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যায় আর ভাঙ্গা টুকরো জোড়া লাগে না।

এরপর বহু দিন চলে গেছে। তন্বী-তরুনী তপতী আজ মেদবহুলা উত্তর তিরিশা।

সংসারের নানা কাজ, স্বামী, সন্তান পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে কলেজ জীবনের বান্ধবী সেবার কথা। মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক কলহের কিছুদিন পরই ওরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। তারপর দাঙ্গা, স্বাধীনতা, রাষ্ট্রবিভাগ, ইত্যাদির ভিড়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ে কেউ জানে না। সবাই ব্যস্ত যে যাকে নিয়ে।

এখন স্বাধীনতার নিশ্চিন্ত আসরে মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেবার কথা। সেবাকে স্মরণে আনবার আরও কারণ ঘটলো।

জনযুদ্ধবিরোধী তপতীর স্বামী সাম্যবাদী। শুধু তাই নয়, সাধারণ নির্বাচনে সে পার্টি মনোনীত হয়ে দাঁড়ালো।

স্বামীর জন্য ভোট সংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে তপতীর মনে হতো ইস্ আজ যদি সেবা থাকতো! কি চমৎকার কাজের মেয়ে ছিল ও আর ও তো এই দলেরই ছিল।

তপতী ভাবে সেবা ঠিকই বলেছিল। দেশের জনগণের মুক্তি না হলে কিছুই হবে না।

আমি মিছিমিছি রাশিয়ার দালাল বলে গালাগালি দিয়েছি। এখন একবার দেখা হলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

দেখা আর হয় না। বহুদিন কেটে গিয়ে আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, তখনই একদিন দেখা হলো।

বাস্তব জগতে সত্য এমন ভূমিকাবিহীন ভাবে ঘটে যে বলতে গেলে মনে হবে

বানানো। এক দিন দেখা হলো ওদের। পথচারী তপতী আর যানচারী সেবা। রাস্তার লাল আলোটা যেন বিধাতার নির্দেশের মত ইঙ্গিতে থামিয়ে দিল দুজনকে।

তারপর···রাস্তা পার হয়ে থমকে দাঁড়ায় তপতী আর গাড়ী থেকে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরে সেবা। ও এখনও ঠিক তেমনি আছে। শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে মুখের রেখায়। টানতে টানতে তপতীকে নিয়ে এলো গাড়ীতে।

কোথায় যাবি—চল পৌঁছে দিচ্ছি।

বাড়ীতে। তুইও চল।

নিশ্চয়ই যাব।

তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যে কি ভাল হলো, ধীরে ধীরে তপতী বলে, তা আর কি বলবো?

যে বিপদে পড়েছি এখন একমাত্র বাঁচাতে পারিস তুই।

কি ব্যাপার?

তপতী খুলে বলে সব। লক্ষ্য করে না যে ভূমিকা শুনেই সেবার মুখের রেখা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

কথা শেষ হলে সেবা আঁধার মুখে বলে কংগ্রেস হচ্ছে দেশ, আগে বুঝতে পারিনি, ভাই তুই কত বলেছিলি।

তারপর একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে আমার স্বামীর পরিচয় তোকে দেওয়া হয়নি। ওর নাম প্রদীপ সরকার।

চমকে ওঠে তপতী। চোখের সামনে ভেসে ওঠে গান্ধীটুপি পরা একটি মুখ। প্রদীপ সরকার কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, এই নির্বাচনে তিনিই তপতীর স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

সেবা বলে আমি একটা সভায় যাচ্ছি। কংগ্রেস থেকে মেয়েদের জন্য এইটে করা হচ্ছে। তোকে এখানেই নামিয়ে দি।

তপতী বলে, তাই দাও।

মোড়ের মাথায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। মসৃণ গতিতে গাড়ী চলে যায়।

সাধারণ নির্বাচন, উত্তেজিত জনসাধারণ, সমস্ত রাজনৈতিক দলই যোগ দিয়েছে, তবে কংগ্রেস আর কম্যুনিষ্টের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর।

কর্মীদের দল থেকে দুটি মেয়ে এগিয়ে এলো। ভূতপূর্ব সাম্যবাদী সেবার কাঁধে কংগ্রেসের আর ভূতপূর্ব সাম্যবাদী বিরোধী তপতীর কাঁধে কম্যুনিষ্টের ব্যাজ। দুজনেই পতির পুণ্যে···। দুজন তাকালো দুজনের দিকে। তারপর অপরিচিতের মতো মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

যুগান্তর

মেঘনামতী

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো কালো ঢেউ। আকাশের মুখ কালো হলেই মেঘনাব বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। কেমন যেন থম্থমে দেখায়। কালো মুখ ঝাম্টানো ঢেউ তুলে মেঘনার অথৈ জল তাতা থৈথৈ করে নেচে ওঠে।

আর আকাশ কালো হলেই, মেঘনার গায় গাঢ় রঙ্ ধরলেই একটি কালো মেয়ের চোখে স্বপ্ন নামে। বর্ষার স্বপ্ন। তার ঢেউ খেলানো চুলের ডগা যখন ভিজে হাওয়ায় দোলে যখন তার আঁচলের খুঁট দম্কা হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়ায়, ঘন হয়ে আসে ভেতরটা, তখন ভারি ইচ্ছে জাগে মনে। স্বপ্ন আর ইচ্ছে।

বর্ষা নামলে পাড় ধ্বস্বে। পাড় ধ্বস্লে ঘর ভাঙ্গবে। নৌকো ডুববে। তবু বর্ষার 'কামনায়' মেঘনা গুমরোয়, পাড়ের কালো মেয়ে ছট্ফটিয়ে মরে। আর জমি? জমির বুক তেষ্টায় হা-হা করে। বড্ডো তেষ্টা। বর্ষার তেষ্টা।

সারাটা গ্রীষ্ম আকাশ তবু রেগে টং হয়ে থাকে। তেষ্টা পাক। চেয়ে চেয়ে মরুক না সব। মরুক মেঘনা রাক্ষুসী। আর মরুক মেঘনা পাড়ের কালো মেয়েটা।

আকাশে রী রী করে সূর্য। তবু মরে না কেউ। দগ্ধায় আর বর্ষার আশায় আশায় বেঁচে থাকে। মেঘনার বুক সূর্যের দাপটে ফ্যাকাশে দেখায়। গরম হাওয়ার ঝাপ্টায় ঝির্ঝিরে ঢেউয়ের ওপর সাঁই সাঁই শব্দ। মেঘনা সহ্য করে। ভেতরটা শুধু গুম্রোয়। বড়ো ইচ্ছে জাগে মেঘনার। স্বপ্ন আর ইচ্ছে।

"ম্যাঘ্। আরে, আরে, আসমান পানে চাইয়া দ্যাখ্। ম্যাঘ্ জম্ছে কালা কালা।"

ওসমান কথাগুলো বলার আগেই মেঘনা পাড়ের সব মানুষগুলো আকাশের দিকে না চেয়েই জেনে ফেলেছে যে মেঘ জম্ছে আকাশে।

বাঁশের লক্ড়ি দিয়ে কযেকখানা ঘর বাঁধা আছে এলোমেলো। মেঘনার পাড়ের সব ঘরই রণ-পায়ে চড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেঘনার ভয়ে। বর্ষার ভয়ে। তবু মেঘনাকে, বর্ষাকে তাদের না হলেই নয়।

ঘরে ওঠার মইটা বেয়ে তর্তর্ করে নেমে এলো সেই কালো মেয়েটা। জেলেদের মেয়ে।

ওসমান উস্খস্ করে ওঠে—

"ম্যাঘ্ জমছে, দ্যাখ্ছস্?"

কালো মেয়েটা থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ে তার নিখুঁত টানা নাকের ওপর সামান্য জোড়া ভুরুটা ধনুকের মত বাঁকালো মাত্র। তারপর মুখ ঘুরিয়ে মেঘনার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

মেঘ, মেঘ। মেঘের কোলে মেঘনা। মেঘনার কোলে কালো মেয়ে কাজ্লি। ওসমান পায় পায় এসে ডাকলো—"কাজ্লি!"

কাজ্‌লি উত্তর দিল না। সামনের মাঠ পেরিয়ে ওদিকটায় নমপাড়া। সেখানে একবার যেতে হবে কাজ্‌লিকে সব্জি কিনতে। তখন ও পাড়ার মেয়েদের ডেকে আনবে একবার। ওরা দল বেঁধে সাঁতরাবে খেপা মেঘনার বুকে।

ওস্‌মান আবার ডাকলো—"কাজ্‌লি!"

যেতে যেতে মুখঝাম্‌টা দিয়ে কাজ্‌লি বললো—কি একশ'বার কাজ্‌লি ডাকস্‌?

"তোরে সাদি করুম কাজল্‌!"

"ফের! মোছ্‌লার পোলা—সখ দেইখ্যা বাচি না—।"

ওসমান হাসে—

"মোছ্‌লা মানুষ না?"

কাজ্‌লি ততক্ষণে মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলে গিয়েছে নম পাড়ায়। কাজ্‌লি চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত ওসমান কাজ্‌লির চলে যাওয়াটুকুকে নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকে বলে—"দুৎ তেলি ন্যিকুচি কর্‌ছে।"

ঘোর বর্ষা নামলো মেঘনার বুকে। জেলেদের মুখে হাসি ধরে না। কিন্তু সে হাসি দেখবে কে?

সবাই যেন নিশ্বাস ফেলার সময়টুকু অপব্যয় করতে চায় না। মেঘনা কখন কোথায় পাড় ধ্বসাবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। সব সময় একটা আতঙ্ক নিয়ে পাড়ে বাস করতে হয়। সতর্ক দৃষ্টি মেলে থাকে পাড়ের জমিনে। অন্ধকার হলেই অবশ্য রুপোলি ইলিশের লোভে যেখানে যত জেলে আছে লম্বা নৌকো আর জাল নিয়ে নদীর বুকে পাড়ি জমাবে।

সেদিন ভোর বেলা মাঠ পেরুতে গিয়ে কাজ্‌লি থম্‌কে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মাটির দিকে খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কালো সুতোর মত সরু চিড় ধরেছে জমিতে। উবু হয়ে বসে পড়ে কাজ্‌লি মাটি পরখ করে সোজা গুমোট আকাশের দিকে চেয়ে যেন কি শুঁকলো। তারপর ভূতে-পাওয়ার মত ছুটলো পাড়ের দিকে।

ভাঙ্গন! মাটির পৃথিবী গ্রাস করতে আসছে মেঘনা। যে সব স্থলচর তার সব চাইতে নিকট, সেই জেলেদের রণ-পায় চড়া বাড়িগুলো আত্মসাৎ করতে আসছে। তাদের ঐ রূপসী মেঘনা।

খবরটা ছড়াতে কয়েক মিনিট সময়ও লাগলো না কাজ্‌লির। জেলেরা সবে ভিজে গা মাথা মুছে ঘরে যাবার কথা ভাবছে। অঢেল ইলিশ ধরেছে তারা। ওসমানের তামাটে পেশিগুলো ভোরের আলোয় ইলিশের গায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝল্‌মল্‌ করছে। কাজ্‌লির হাঁক শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো সে।

এক মুহূর্ত নষ্ট করা যায় না। এমন শক্ত জমিন—তা দেখতেই শক্ত। ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে নিয়েছে মেঘনায়। বর্ষায় তার ক্ষিদে বড়ো সাংঘাতিক আকার নেয়। কবে পাড় ধ্বসবে তা যেমন কেউ বলতে পারে না, তেমনি একথাও কেউ জানে না কবে প্লাবন

আসবে, কবে উপ্‌ছে পড়ে নিজেকে নিজে ভাসিয়ে দেবে মেঘনা।

যে কোনো মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে পাড়টা। আর সঙ্গে সঙ্গে টুপিয়ে, নাইয়ে, ডুবিয়ে দেবে সব ক'টা বাড়ি, সব ক'টা মানুষ। পাড়ের যে অংশগুলো ধ্বসে না, সে বছর রণ পায় চড়া বাড়ির তলাগুলো জলে ডুবে যায়। নৌকোয় এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতে করতে অনেকেই হাঁটতে ভুলে যেতে বসে।"

ওস্‌মানের মা হাঁড়িকুঁড়ি গুছোতে ব্যস্ত। তার বাবা করিম বাঁশের ঘরের গাঁটে গাঁটে বাঁধা বাঁশগুলো তাড়াতাড়ি খুলতে শুরু করে দিয়েছে। হাতের কাজ পুরোমাত্রায় চালু রেখেই এ বাড়ির লোক অন্য বাড়ির সঙ্গে হেঁকে হেঁকে কথা বলছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটা মস্ত মৌচাকে কে ঢিল মেরে সরে পড়েছে।

ওস্‌মান বাড়ির আর একটাদিকে বসে বাঁশের বাঁধন খুলতে ব্যস্ত, কিছু ফেলে যাওয়া যাবে না। কেননা ঠিক এমনি ঘর তাদের দু'একদিনের মধ্যেই বানিয়ে ফেলতে হবে অন্য কোনো এক জায়গায়।

কাজ্‌লিদের ঘরে কাজ্‌লি একা মেয়ে। তার মা আর বাপের বয়েস নেহাৎ কম নয়। বুড়ো বয়েসের বহু সখের পালিতা মেয়ে কাজ্‌লি। লোকে বলে, "হ, বাইগ্য কইর‍্যা আস্‌ছিল বটে সনত জাউল্যা।" কেন না কাজ্‌লি একাধারে ছিল সনত জেলের ছেলে আর মেয়ে। তাই মাছ ধরা ছিপ্‌ নৌকোয় কাজ্‌লিকে দেখলে কেউ অবাক হত না। বাপের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে কাজ্‌লি "জাউল্যা" বৃত্তিতে হাত পাকাতো।

আজও কাজ্‌লি তার বাপ-মার আগেই তর্‌তর্‌ করে করে মই বেয়ে উঠে বিদ্যুৎ গতিতে পালাবার বন্দোবস্তর কাজে লেগে গেল। বুড়ো মাকে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে জিনিষপত্র নামাতে শুরু করে দিল বাপ-বেটিতে। কাজ্‌লি সনতকে বললো—"বাবু তুমি মারে পৌঁছাইয়া দাও গিয়া। আমি বাশগুলা খুলি ততক্ষণ।"

ওস্‌মানদের সমস্ত কাজ শেষ। এমন কি চিহ্নিত এলাকার বাইরে জিনিষপত্র পৌঁছান পর্য্যন্ত। কাজ্‌লির বাড়ীর নীচে এসে একটু ইতস্ততঃ করে সে সোজা ওপরে উঠে গেল। কোনো কিছু না বলেই বাঁশ খোলার কাজে হাত লাগালো ওস্‌মান।

হাতের কাজ না থামিয়ে কাজ্‌লি বললো—"তোগো কাম শ্যাষ নাকি রে?"

"হ', ভারি তো কাম।"

"এইখান আইলি যে বড়?"

ওসমান হাসলো—

"কমু?"

"না, না, আবার কতগুলা বাজে বকবি তো? দরকার নাই শুইন্যা।" কাজ্‌লি ব্যস্ত হয়ে নীচে নাম্‌তে গিয়ে পা হড়্‌কে জিনিষপত্র সমেত পড়ে গেল মই থেকে।

"কি অইলো, কি অইলো" করে মুখ বাড়ালো ওস্‌মান। তারপর আঘাত গুরুতর নয় দেখে হেসে উঠে বললো,

"আরে বাবা, বেশি দেমাক অইলে অমন অয় মান্‌যের।"

দুপুর গড়িয়ে যাবার আগেই কাঠকুটোটি পর্যন্ত গুছিয়ে নিয়ে গাঁয়ের অনেক ভেতরে, চিহ্নিত এলাকার ভেতরকার জেলেরা পাৎতাড়ি গুটিয়ে চলে গেল। প্রায় বিশ খানা ঘর খুলে গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে তাদের গোটা দিনটাও লাগলো না।

সরু সুতোর মতো লাইন কাটা ধ্বংস চিহ্নের এলাকার খানিকটা দূরে একটা মস্ত বট গাছ। গাছের গোড়াটায় একটা ছোট্ট মন্দির। একেবারে নতুন। গোপালের একটা বিগ্রহ ফুলে চন্দনে সাজানো আছে মন্দিরটার মধ্যে। ছিম্‌ছাম্‌ পরিষ্কার মন্দিরটার চারধারের নিকোনো মাটি এখন ভিজে সপসপে হয়ে আছে।

সন্ধ্যের একটু আগেই কাজ্‌লি এসে বসলো মন্দিরের গা ঘেঁষা মোটা একটা শেকড়ের উপর। সবে ঘর হারানো বাসিন্দাদের অনেকেই এসে জড় হলো গাছটার চারিধারে। দু'একটা টুক্‌রো টুক্‌রো কথা। বেশীর ভাগ চোখই মেঘনার জলে তাদের দৃষ্টি ডুবিয়ে বসে আছে।

বৃষ্টি পড়ছে না। কিন্তু বৃষ্টির আশঙ্কায় থম্‌থমে হয়ে আছে গোটা আকাশটা। হাওয়া নেই। গুমোটে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বিনা কারণেই মেঘনার গজরানি আছ্‌ড়ানিতে পরিণত হচ্ছে। মেঘনা পাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে চায়। সেই চাওয়ার গতি কেটে দিয়েছে সে। নিস্তার নেই।

হঠাৎ গুমোটের বুক ফাটিয়ে কাজ্‌লি গান ধরলো। বোষ্টমীদের কাছে শেখা কীর্ত্তন। এমন দরাজ গলা এ তল্লাটে আর কারও নেই। জেলেরা গর্ব করে। কাজ্‌লির গলার সঙ্গে পাল্লা দিতে নাকি পারে এক মেঘনা।

সনত জেলের বাঁজা বউ যে বছর কাজ্‌লিকে এমনি এক বর্ষার রাতে এ গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল সে সময়ের কথা অনেকেরই মনে আছে। মেঘনার ওপারে নম পাড়ায় কোন্‌ এক বামুনের ছেলের কেলেঙ্কারিতে নাকি অল্প বয়সী একটি বউয়ের এই কালো মেয়ে জন্মেছিল সনতের বউকে খবর দেওয়া ছিল আগে থেকে।

অন্ধকার বর্ষার সে রাতে বিপদ বুঝে মাঝি হেঁকে হেঁকে উঠেছিল—"আল্লা পার কর!" ছইয়ের মধ্যে বসে জেলে বউ বুকে আঁকড়ে ধরেছিল ছোট্ট মেয়েটাকে জলের ঝাপ্‌টা থেকে তার প্রাণটুকু আড়াল করে করে পারাপার হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিল—"কাজ্‌লি।"

লোকের কাছে জেলে বউ বলতো কাজ্‌লি তার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে—দেবতায় দিয়েছে। ভগবান তার দেহে ফল দেননি তাই পথের ফল কুড়িয়ে নেবার অধিকার দিয়েছেন তাকে। কাজ্‌লি যদি ছেলে হতো তবে, সনত বলে, সে তার নাম রাখতো—কেষ্ট। কেননা এমন দুর্য্যোগের রাতে নতুন মা-বাপের কোলে আসা গত জন্মের পুণ্যি ছাড়া আর কি?

শুনে লোকে হাসতো। এসব কথা চাপা থাকে না। চেপে রাখা যায় না। তারা বলতো, বামুনদের রক্ত আছে বলেই কি আর কাজ্‌লিকে কেষ্ট ঠাকুরের বংশধর বলা চলে?

কাজ্‌লি বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার জন্ম রহস্যের

কথা। কিন্তু সনত জেলে ভোলেনি। যেদিন কাজ্‌লীকে এক গণক ঠাকুর বললো যে এ মেয়ের কপালে বামুনের মেয়ের ভাগ্য লেখা আছে সেইদিন থেকে সনত জেলে মনে মনে মেয়েকে সমাজে সবার উপরে ঠেলে দেবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়লো।

বোষ্টমীদের কাছে কাজ্‌লি নিজের তাগিদেই ক'খানা গান শিখেছিল। ওর বাবা বলে বেড়াতে লাগলো—"মাইয়ার আমার বড় ভগবৎ ভাব। ওর পূজায় মন দেখলে চোখে জল আসে হরদম।"

লোকে গান শুনলো—সত্যিই আশ্চর্য্য গলা কাজ্‌লির। যদিও ছেলেছোক্‌রারা কাজ্‌লির বাপের আশার কথা সম্পর্কে আলোচনা করে হাসতো তবু তাদেরই আবার দেখা যেতো শ্রোতার ভীড় বাড়াতে। বুড়োরা এবার কানাকানি করতে লাগলো। মাথা নেড়ে নেড়ে বলাবলি করলো,

"বলি নাই! সনত জাউল্যা কপাল কইর‍্যা আইছিল বটে!"

একটা পোড়ো মন্দির ছিল গাঁয়ে। একদিন সাহস করে সনত জেলে সেই মন্দিরে কাজ্‌লিকে দিয়ে পূজো করানোর প্রস্তাব তোলাল। ইতিমধ্যে কেবল এ গাঁয়ের লোক নয়, দূর দূর গাঁয়ের লোকেরা পর্য্যন্ত কাজ্‌লির গলায় নাম কীর্ত্তন শুনে ধন্য ধন্য করে গেছে।

প্রস্তাব শুনে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠলো—"জীব্‌ব্যা কাইট্যা দিমু না ছেম্‌ড়ির।"

এবার কাজ্‌লির পেছনে গুন্‌গুন্ করে উঠলো হিন্দু আর মুসলমান গ্রামবাসীর গলা—

"জ্যাউল্যা মাইয়া মানুয না! ভগবান ওর গলা দিছে ক্যান্ যদি পূজা করতে দিবার ইচ্ছা না থাকবো ভগবানের? আর ও হগল মন্দিরের কত যত্ন তা তো দেখত্যাছি। বিগ্রহ পর্য্যন্ত নাই। ঠাকুর আইলে এখনে যামু আমরা তার কাছে। দেখি ঠাকুর কি কয়।"

গাঁয়ের মাথারা রুখে উঠলো—

"বেশ, ঠাকুর এবার মেলায় আইলে দীক্ষার লেইগ্যা পাঠাইস্ গিয়া তোগোর ঐ মাইয়ারে।"

মেলায় ঠাকুর এলেন। লোকে লোকারণ্য। দীক্ষার আশায় আকুল বহু ভক্তের ভীড়ের মধ্যে সৌম্য প্রশান্ত মুখে ঠাকুর বসে আছেন। নদীয়া জেলার কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মেও এই মহাপুরুষ যে এ ভাবে গেরুয়া পরেছেন, তা নাকি শুধু বিস্ময়ের নয়, ভক্তির বিষয়।

কাজ্‌লিকে ধরে নিয়ে ঠাকুরের সামনে দাঁড় করালো তার মা—"দীক্ষা দাও ঠাকুর।"

অনেক গণ্যমান্য ধনী অধনীর মাঝখানে এই অপরূপ মেয়েটিকে চোখ ভরে দেখলেন ব্রহ্মচারী।

জিজ্ঞেস করলেন—"গান জান?"

"জানি।"

"গাও তো একটা গান।"

কি জানি কি হয়েছিল সেদিন কাজ্‌লির। ভাবে ডুবে এলো তার কালো চোখ। গানে প্রাণের সমস্ত সুর ঢেলে দিয়ে গেয়ে উঠলো—

"গৌর রূপ দেইখ্যা হইয়াছি পাগল, ঔযধে আর মানে না, চল সজনী যাইলো নদীয়ায়।"

শুধু ঠাকুরের চোখে নয়, অনেক গণ্যমান্য ধনীর চোখেও সেদিন কাজ্‌লি কি এক মোহ বিস্তার করে দিয়েছিল। গান শেষ হলে ঠাকুর উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেছিলেন—

"এ যে দেবশিশুর কণ্ঠস্বর!"

কাজ্‌লি দীক্ষা পেয়েছিল। কেউ আপত্তি তুলতে পারেনি। কিন্তু ঠাকুর যখন খুব কম লোককেই দীক্ষা দিয়ে সেবার তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। কুৎসা রটে গেল কাজ্‌লির নামে। অনেকে এমন কি জেলেদের অনুরোধ করলো সনতদের একঘরে করবার জন্যে।

মন্দিরের দরজা তেমনি বন্ধ রইলো। কিন্তু জেদ চেপে গিয়েছিল জেলেদের মনে। ওরা বটগাছের গোড়ায় নিজেদের মন্দির গড়ে তুললো। সনত জেলে টাকা দিল অনেক। কাজ্‌লি হল সেবায়েৎ।

দীক্ষা নেবার আগে কাজ্‌লির চোখে মুখে যে ভগবৎ ভাব ফুটে উঠতো, দীক্ষা পাবার পরে সে মুখে ক্রমশঃ একটা অন্যমনস্ক ভাব ফুটে উঠলো। নতুন মন্দিরে পূজো করতে গোড়ায় গোড়ায় ভালই লাগতো। কিন্তু কাজ ফেলে, মেঘনা ফেলে, ছোট্ট একটা পুতুলের মত এতটুকু গোপাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে না আর কাজ্‌লির।

প্রায়ই পূজোর ফাঁকে ফাঁকে মেঘনার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। আগের মত গলায় যখন তখন গানও আসতে চায় না। তবু লোকে চাইলে গাইতে হয় সন্ধ্যেবেলা। অন্যমনস্ক কাজ্‌লি গায় আর উস্‌খুস্‌ করে—তার বাবা তৈরি হলেই ও ছুটবে মেঘনায় মাছ ধরতে।

আজকাল বাবা একটু আধটু আপত্তি তোলে। কিন্তু কাজ্‌লি শুনতে চায় না। লাফিয়ে পড়ে নৌকোয়।

আর মেঘ ডাকলে কাজ্‌লিরও ভেতরটা ডেকে ওঠে। গলা খুস্‌খুস্‌ করে।

গাছের গুঁড়িতে তার খানিকটা দূরে বসে ওসমান সেদিন ডাকলো—

"আর একখান কেত্তন গা না কাজ্‌লি।"

"মরি আর কি?"

"ক্যান্‌ আমি কইলেই বুঝি মরণ অয়?"

"সর্‌ সর্‌—মোছলার পোলা মন্দির ছুইয়া বসছস্‌ ক্যান রে?"

"তুই কোন বায়ন আইলি রে—।"

"ওসমান ভাগ্‌ এইখান থিক্যা।"

কাজ্‌লি একটা শুকনো ফুলের মালা ছুঁড়ে মারলো ওসমানকে। মালাটা ওসমান তুলে নিতেই কাজ্‌লি চাপা গলায় বললো—"হায় গোপাল, একি করলাম আমি?" ওসমান ফিস ফিস করে বললো—"কাজ্‌লি তুই মরছস এক্কারে মরছস। মোছলার পোলার গলায় গোপাল ঠাকুরের মালা দিলি?"

"দিই নাই অসইভ্য।"

"তোরে বিয়া করুম কাজল।

"চুপ যা। চেচামু ওসমান।"

"কিন্তু বিয়া আমি তোরে করুমই।"

"মইর‍্যা গেলেও আমি করুম না!"

"দেখা যাউক।"

রাত ঘন হয়ে এলো। মেঘনা যেন কল্‌কল্ করে কথা বলছে অনর্গল। ওসমান চুপ করে গিয়েছে। খানিকক্ষণ উস্‌ফুস্ করে কাজ্‌লি গেয়ে উঠলো "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।"

কালো কালো মূর্ত্তিগুলো অন্ধকারে নড়ে চড়ে সরে এলো কাজ্‌লির আরও কাছে। মুহূর্ত্ত, মিনিট, ঘণ্টা কাটলো। কাজ্‌লির গলা যেন মেঘনার সঙ্গে সঙ্গতে বসে গিয়েছে। সে গায়। ওরা বসে বসে শোনে। সাঁ সাঁ হাওয়ায় মেঘনা দোলে! কড়াৎ করে মেঘ ডেকে উঠে চারিদিক এক মুহূর্ত্তের আলোয় কানা করে দিয়ে দপ্ করে নিভে যায়।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি বেড়ে ফোঁটায় পরিণত হলো। যখন গা মাথা সব ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেল তখন মূর্ত্তিগুলো একে একে উঠে দাঁড়ায়। কে যেন বলে "চল ঘর যাই হক্কলে।" ভুলে যায় যে আজ যাবার মত ঘর নেই কারু।

হঠাৎ গুম্‌গুম্ করে ওঠে পৃথিবী। পায়ের তলা নড়ে ওঠে। কালো মূর্ত্তিগুলো ছিট্‌কে সরে দাঁড়ায়। ভাঙন শুরু হয়েছে। অন্ধকার। তবু স্পষ্ট দেখা যায় মেঘনা ভয়ঙ্কর গর্জন করে উন্মত্ত আবেগে চিহ্নিত এলাকার মাথা থাব্‌ড়ে, ধ্বসিয়ে, ডুবিয়ে দিয়ে নেচে উঠলো।

থৈ থৈ জল। বট গাছ থেকে কয়েক হাত দূরে থৈ থৈ করে উঠলো মেঘনার জল। প্রত্যেক বছর এই দৃশ্য প্রতিবার তার নির্ম্মম মূর্ত্তি নিয়ে আসে। প্রতিবার মানুষ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে নেশা লেগে যায় ওসমানের। কানের কাছে মুখ এনে বলে—

"সাদি করুম কাজ্‌লি।"

কাজ্‌লি কিছু বলে না। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জলের দিকে। নেশা লেগেছে কাজ্‌লির। হাত নিস্‌পিস্ করছে তার।

জেলেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। জলের হুংকারের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ওরা উঁচু গলায় কথা কয়—

"জাল ফালাইতে চল্ গা।"

"ইলশ্যা আইজ খুব সরেশ অইবো।"

"হ হ জাল ফালাইতে জান্ নিক্‌লাইয়া যাইব না।"

হাতে হাতে নৌকো এলো। লম্বা ছিপ্‌নৌকোর মত হাল্কা। সূরু সূক্ষ্ম জালে এরা বর্ষার সরেশ ইলিশ ধরে আনবে পাগ্‌লি মেঘনার বুক থেকে। এই মাত্র মেঘনা হাতে নাতে তার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছে। রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছে সে। জান্ প্রাণ এক এক

ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে পারে ঐ রাক্ষুসী। বড় ভয় লাগে। যখন মেঘনা ক্ষেপে যায়। জ্ঞান থাকে না, প্রাণগুলো ধুক্‌পুক্ করে আতঙ্কে। মাঝি হাঁকে—"আল্লা পার কর!" জেলে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত কেটে যায়।

তারপর জাল ওঠে হাতে হাতে

"হালির অহঙ্কার দ্যাখলে গা জ্বইল্যা যায়!"

সরু লম্বা নৌকো গুলোর গা ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা মেঘনার বুকে। মোচার খোলার মত ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ওরা পৌঁছে যায় মাঝ দরিয়ায়।

ওসমানের চাচা হালিমের পাশের নৌকা খানায় বসেছিল কাজ্‌লির বাপ—সনত জেলে। গাদা করা জালের উপর বসে ইলিশ মাছ ধরার কালো কালো আশঙ্কায় বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে—জালে উঠবে কি ওরা?

জাল টেনে তোলে পাড়ে। একরাশ ইলিশ মাছের মাঝখানে অচেতন কাজলিকে জলকন্যার মত দেখায়। সম্পূর্ণ নগ্ন কাজ্‌লিকে গামছা ঢাকা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা শুরু করে দেয়।

জালের গায় গায় ভেসে ওঠে ওস্‌মান। মেঘনার জলে এই অন্ধকারেও তার কালো পেশী ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। তার চাচা হালিম দেখতে পেয়ে টেনে তোলে তাকে—"ওসমান!"

নৌকায় উঠে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে সে বসে পড়ে। হালিম সস্নেহে কি রকম গলায় বলে "এ হগল পাগলামি বলে না।"

ওসমানের কোমরে কাজ্‌লির পরনের কাপড় খানা বাঁধা ছিল। জলের নিচে বার বার ডুব দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে কাপড় খানা পেয়ে ওসমান বুঝেছিল কাজ্‌লি বেশী দূরে নয়। ঠিক সেই সময় জাল টানা শুরু হয়। জালের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান ভেসে ওঠে। যদি কাজ্‌লিকে জালে না পাওয়া যেত, আবার ঝাঁপ দিতে হতো ওকে।

ডাঙায় গাছতলায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে কাজলিকে। একটু পরেই ভোর হবে। জেলেদের আর সময় নেই। বৃষ্টি থেমে এসেছে। ধরাধরি করে কাজলিকে ভাঙ্গা মন্দিরের দাওয়ায় শুইয়ে দিয়ে গেল ওরা। কাজলির সবে জ্ঞান ফেরা চোখে তখনও ঘোর লেগে। যাবার সময় সনৎ জেলে বলে গেল—"তুই শুইয়া থাক কাজল্—আমি আইলাম বইল্যা।"

সামনের মাঠে টাঁই করা আছে কাজলির সঙ্গে ওঠা ইলিশগুলো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। ফরসা হয়ে আসছে চার ধার।

এক পা দু'পা করে উঠে এলো ওসমান। ফ্যাকাশে আলোয় সামান্য একটা পাৎলা গামছায় ঢাকা কাজলির দিকে চেয়ে রইল ওসমান। পাহারায় আর প্রতীক্ষায়।

"কাজলি!"

"কি?" সলজ্জ কাজলি ম্লান হাসলো।

"সাদি দিয়া দিল ম্যাঘনায়।"

"ইস!"

"এই তর শাড়ি। এবার লাফ্ দিলে আমারে ঐ কাপড়ের কোণায় বাইন্দ্যা লইয়া যাওন চাই। ওইটা তো আমাগো গাইট ছড়া—না?"

"তুই মোছলা না? বায়ণরা এ মন্দিরে আমারে উঠতে দেয় নাই। আর তুই বেশ বইস্যা আছস তো? বয় ডর নাই দেখি প্রাণে।"

"না আমার বয় ডর নাই। কিসের ডর দেখাস্ রে—ওস্মানরে!"

"হ' হ'।"

"মেঘনা তো বায়ণ মোছলমান মানে না। সাদি দিয়া দিছে ম্যাগনায়।"

"আমার গোপাল ঠাকুর?"

"শুনস্ না? মন্তর পড়ত্যাছে গোপাল ঠাকুর?"

কাজ্‌লি হাসে। গামছায় ঢাকা নিজের শরীরটার দিকে চেয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে—

"কাপড়টা দিবি?"

ওসমান একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বলে—

—"বড় ভিজা যে।"

তবু চেয়ে নিয়ে শরীরে জড়িয়ে নেয় শাড়িটা। ভিজে চপ্‌চপে শাড়িখানা গায় লেপটে লেপটে যায়।

"ওসমান!"

"কি রে বউ?"

"বড় ভাল লাগত্যাছে।"

ভোর হয়ে এলো। শীত শীত হাওয়া সকালের সঙ্কেত দিচ্ছে। গায় কাঁটা দিয়ে উঠলো কাজ্‌লির। গা শির্‌শির্ করছে ওসমানের।

"ওসমান!"

"আয়।"

"ওসমান!"

"কাজল!"

মেঘনার কালো বুকে আশ্চর্য এক শান্ত সকালের প্রথম আলো ফুটি ফুটি করে শেষে ফুটে উঠেছে। পূবের মেঘ না সরলেও স্নিগ্ধ সকালের মুখ দেখে ছল্‌ছলিয়ে উঠলো মেঘনা।

থৈ থৈ করছে মেঘনার বুক। কূল ছাপিয়ে উঠছে মেঘনার।

ঘরে বাইরে

লখিয়া

অর্চ্চনা গুহ

বড় রাস্তার পাশেই বস্তি—রাস্তাটা প্রশস্ত, বস্তিটা নোংরা ও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু তাতেই যা হোক ক'রে মাথা গুঁজে দিনগুলো কাটিয়ে দেয় ওরা। দুঃখ কষ্ট সয়ে সয়ে বছরের পর বছর কাটায়—জীর্ণ শীর্ণ দেহেও মৃত্যুর সাথে লড়াই করে আর ভাঙ্গা পাঁজরেও পরিশ্রম করে প্রচুর। ওদেরই একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে—সূতাকলের মিস্ত্রী রামপ্রসাদের মেয়ে লক্ষ্মী মানে ওরফে লখিয়া। লক্ষ্মীর বেশ ভূষায় বস্তিবাসিনীর চিহ্ন স্পষ্ট, কিন্তু শরীরের গঠনে ও মুখের সৌন্দর্য্যে যেন ভদ্র আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। লখিয়া সত্যিই চিরদিন বস্তির মেয়ে ছিল না। মা, বাবা, ভাই বোন নিয়ে সহরেই একটা ভদ্র পল্লীতে বাসা ভাড়া করে থাকতো। মোটামুটি ভালই অবস্থা ছিল কিন্তু ওর বাবা মারা যাওয়ায় সংসারের অবস্থার ঘটে দ্রুত অবনতি। তখন লক্ষ্মীর বয়স মাত্র পাঁচ। পরের বাড়ীতে মা করতেন রাঁধুনীর ও ঝিয়ের কাজ। কিন্তু তিনিও যখন চোখ বুজলেন তখন ১১ বছরের সমর আর ৭ বছরের লক্ষ্মী—নিজেদের ভাগ্য ঠিক করে নিয়েছিল ভিখিরীদের দলে মিশে। রোজই ছোট্ট একটা টিনের কৌটা হাতে করে এসে বসতো লক্ষ্মী সূতোকলের বড় ফটকটার সামনে। ঐ কলেরই মিস্ত্রী রামপ্রসাদ—লক্ষ্মীকে কোলে তুলে নিয়ে এসেছিল নিজের বাড়ীতে, অর্থাৎ বস্তিতে। বৃদ্ধ রামপ্রসাদ বিয়ে থা করে নি, ছোট্ট মেয়েটীকে সে নিজের মেয়ের মতই আদরে মানুষ করতে লাগলো, কেউ শুধালে বলতো নিজেরই মেয়ে। লক্ষ্মী কিন্তু তার দাদার কথা আর পুরানো দিনগুলির কথা একেবারেই গেল ভুলে। সে রামপ্রসাদকেই বাবা বলে জানতো। এমনি করে কাটলো প্রায় দশ, বারোটা বছর, কিন্তু রামপ্রসাদ এখন সূতোকল থেকে ছাঁটাই হয়ে বাড়ীতে বসেছে, খাটবার আর সে সামর্থ নেই তাই লক্ষ্মীকে কাজে বেরুতে হলো অন্নসংস্থানের জন্যে। কাজ মিলতে দেরী হ'ল না। বড় রাস্তার ওধারেই তিনতলা বাড়ীটাতে লখিয়া কাজ নিলো। ঠিকে ঝিয়ের কাজ, মাইনেও মন্দ নয়। মাস গেলে পুরো দশ টাকার নোটখানাই বাড়ীওয়ালী গিন্নী তার হাতে দেন আর তারও দশগুণ কাজ হাসিল করে নিতেও কসুর করেন না। নীচতলায়ও সে ঠিকে কাজ করে শোভা দিদিমণীর ঘরে। বিধবা শোভা রায় স্কুলে টিচারী করে বুড়ো বাপমাকে প্রতিপালন করে। টানাহেঁচড়ার সংসার তাই ঝিয়ের মাইনেও কমই। কিন্তু লখিয়া তাতে দুঃখ করে না। বরঞ্চ উপরের গিন্নীমায়ের চাইতে এই দিদিমণীকে তার অনেক ভালো লাগে। ফাঁক বড় মেলে না লখিয়ার—শোভারও নয়—কিন্তু তারই মাঝে লখিয়াকে অনেক কিছু শেখায় শোভা, লখিয়ার রূপ ও মিষ্টি স্বভাবের জন্য শোভা ওকে সত্যিই স্নেহ করে। একটু আধটু লেখাপড়াও তাকে শিখিয়েছে। তাই লখিয়াও দিদিমণীকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখে যেটা উপর তলার ধনীগৃহিণী মোটেই সহ্য কর্‌তে পারেন না। অথচ স্পষ্ট ক'রে বলাও যায় না, তাই অকারণে লখিয়ার উপর তিক্তবাণী বর্ষণ করেন একটা

কাজ পাঁচবার করিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেন। লখিয়া প্রতিবাদ করে না, কাজ তাকে করতেই হবে, নইলে বুড়ো বাবার ভাত জুটবে না যে। মাঝে মাঝে লখিয়ার মনে হয় দিদিমণীর মত অনেক লেখাপড়া শিখতে—আবার নিজের মনেই হেসে উড়িয়ে দেয়। এমনি করেই চলে। কিন্তু লখিয়ার মনটা দুদিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না—বস্তির হিন্দুস্থানী ছেলে সুন্দরলাল রোজই কাজে আসবার সময় ওর পেছন নেয়। সুন্দরলাল উন্নতদেহী সুপুরুষ, গায়ের রং তামাটে কিন্তু এককালে ফর্সা ছিল বোঝা যায়। কোন এক কারখানায় কাজ করে সারাদিন, রাতে বসে নেশা করে সঙ্গিদের সাথে, আর সকালে জবা ফুলের মত টক্‌টকে লাল চোখ দুটো নিয়ে, টলতে টলতে এসে গলির মুখে দাঁড়ায়। জানে আর একটু পরেই লখিয়া এ পথে বাবুদের বাড়ী যাবে। সুন্দরলাল লখিয়াকে ভালবাসে, ওকে সাদী করার তীব্র বাসনা ওর মনে। এ কথা সে লখিয়াকে জানিয়েছে, কিন্তু লখিয়া রাজি হয় না। নেশাখোর সুন্দরলাল যখন দাঁত বার ক'রে হাসে লখিয়ার ভয় হয়, সুন্দরলালের চোখে শুধু নেশার ঘোরই নয়, কেমন যেন তীব্র, তীক্ষ্ণ লোলুপতা দেখতে পায় লখিয়া। পশুর মত জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর মধ্যে যেন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ইঙ্গিত মেলে। সুন্দরলাল ওকে অনেক প্রলোভন দেখায়—"তুই হামারে সাদী কর লখিয়া। হামার তো কোন লোক নাইরে, তোকে হামি রাণী বনায়ে রাখেবে। তোকে বর্ত্তন মাজতে হবে না, কোনও কাম করতে লাগিবে না। হাঁরে, পরের বাড়ী কাম কর্‌নেসে তো ইজ্জত নষ্ট হো যায়গা। হাম তোকে আউর রামপ্রসাদকে লিয়ে কাম করবে। তোর কোনও কষ্ট আউর দুখ হ'বে নাই।" মুখ থেকে তখনও তাড়ির গন্ধ বেরিয়ে আসে। ঘৃণায় গা রি-রি করে লখিয়ার। বস্তির ছেলেরা ওকে জ্বালাতন ক'রে মারে, অশ্লীল ইঙ্গিত শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে লখিয়া। কিন্তু সুন্দরলাল লখিয়ার রূপে আকৃষ্ট, কিন্তু কখনও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় না। ইতিমধ্যে হয়তো গত কালই একটু বেশী নেশার ঝোঁকেই লখিয়ার পথ আট্‌কে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরলাল—"তু তো রোজ পাইলিয়ে পাইলিয়ে কাম করনেসে যাস লখিয়া, লেকিন আজ তো তুকে ছাড়োবো না।" শক্ত পেশীবহুল হাতে লখিয়ার শীর্ণ হাত দুটি চেপে ধরেছিল সুন্দরলাল, কিন্তু সে তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না, তাই এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়েছে লখিয়া। লখিয়া দেখেছে অস্বাভাবিক মাদকতাপূর্ণ টক্‌টকে লাল চোখ দুটোয় লোভাতুর হিংস্র দৃষ্টি। কিন্তু উপায় নেই কাজে তাকে আসতেই হবে যথানিয়মের ব্যতিক্রম হলেই আবার মাইনে কাটা যাবে। লখিয়া ভাবে দিদিমণীকে বললে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। তাই সে ঝট্‌পট উপরের কাজগুলো সেরে নেয়। গিন্নীর বক্‌বকানিকে গ্রাহ্য না করেই সে কল্‌তলা থেকে বাসনের গাদা নিয়ে আসে তারপর টুকিটাকি কাজগুলো তাড়াতাড়িই করে ফেলে—না হ'লে দিদিমণীর স্কুলের বেলা হয়ে যাবে তার সাথে কথা বলা হবে না আবার। ক্ষিপ্র পদে সিঁড়ির বাঁকে শিঙের শব্দে ও চম্‌কে ওঠে—দেখে সেখানে ওরই জন্যে অপেক্ষমান বাবুদের ছোট ছেলে অজিত। অপগণ্ড এই ছেলেটীর অপকীর্ত্তির জন্যে পাড়ায় নাম আছে। ছোট দাদাবাবুকে লখিয়ার

পছন্দ হ'তো না বলেই এড়িয়ে চলতো। কিন্তু আজ তার পালাবার পথ নাই, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে, ইচ্ছে হয় চীৎকার ক'রে কাঁদে কিন্তু তাতেও সুফল হবে না জানে। তাই স্তব্ধ হয়েই নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে লখিয়া। অজিত ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, অস্ফুটে কি যেন বলে। শুনতে পায় না লখিয়া, সমস্ত শরীর ওর শিউরে ওঠে যেন। লখিয়া এতটা ভাব্‌তে পারে নি। ভদ্রলোকের ছেলের আচরণে এতটা ইতরতা সত্যিই লখিয়া আশা কর্‌তে পারেনি। অজিত তখনও ওকে ছাড়েনি, চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সেই ব্যগ্র বিশ্রী পশুত্বের লোলুপতা।

'একি'?—

লখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করে—এ দৃষ্টি যে, সে সুন্দরলালের চোখেও কাল অনুভব করেছিল। আর্তনাদ করে ওঠে লখিয়া। অজিত ওর মুখ চেপে ধরে, লখিয়াও নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টার ত্রুটী করে না। লখিয়ার আর্তনাদ অজিতের মা শুনতে পেয়েছিলেন—তিনি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েই মুহূর্তে সমস্তই—উপলব্ধি কর্‌তে পারেন। কিন্তু নিজের ছেলের এই আচরণ প্রকাশ পেলে আর ইজ্জত থাকবে না, তাই তিনি গর্জ্জে ওঠেন যেন—"লখিয়া, ছোটলোকের মেয়ে, তোর পেটে পেটে এত শয়তানি, এত স্পর্ধা তোর কেমন ক'রে হ'ল তাকি আর আমি বুঝি না। ভদ্রলোকের বাড়ী কাজ কর্‌তে এসে এ সব বদ মতলবে সাহস হ'ল কেমন ক'রে?" অজিত তখন লখিয়াকে ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে, নীচেতলার দিদিমণী ও তার মা সিঁড়ির নীচে না এসে দাঁড়ালে হয়তো পালিয়েই যেতে পার্‌তো, কিন্তু তার আগেই তারা এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাপারটা তাঁরাও অনুমান কর্‌তে পেরেছেন একথা অজিতের মা বুঝতে পেরেছেন ব'লেই তাঁর রাগ আরও বেশী, লখিয়ার চোখ দিয়ে জল নেমে আসে। শোভা আর স্থির থাক্‌তে পারে না—"কি রে লখিয়া, কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে খুলেই বল্‌ না?" স্নেহের সুরে লখিয়ার কান্না আরও বেড়ে যায়—ধরা গলায় বলে "দিদিমণী আমি আপনার কাজে নামছিলাম, পথে ছোট দাদাবাবু—আমি কিছু বদ মতলব করিনি—ছোট দাদাবাবুকে শুধিয়ে দেখুন।" অজিতের মা ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন না আর।

"থাক আর সাফাই গাইতে হবে না—বেরো এখুনি দূর হয়ে যা আমার সামনে। কাল থেকে খবরদার আর এ বাড়ী ঢুকবি না বলে দিলাম"—বলেই এক ধাক্কা মেরে ওকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেন। লখিয়া গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়, মাথা ফেটে দরদর ক'রে রক্ত পড়তে থাকে। একবার মাত্র সেদিকে তাকিয়েই অজিতের হাত ধরে তর্‌তর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যান উপরতলার গিন্নী মা। শোভা অবাক হয়ে যায়।

"মাইজি—আমি মিথ্যে বলিনি, মাইজি সত্যি বলছি—আমি—কিন্তু কথা ওর শেষ হয় না, অজ্ঞান হয়ে যায় লখিয়া। শোভার চোখেও জল আসে যেন। প্রতিবাদ করার উপায় নেই, দু'মাসের ঘরভাড়া বাকী। তাই নীরবেই চোখে মুখে জল দিয়ে লখিয়ার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। লখিয়া এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেনি মাথায় বড্ড চোট পেয়েছে—

সামলাতে সময় লাগবে। শোভাই ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়, দুধ গরম ক'রে খাওয়ায় আস্তে আস্তে। লখিয়া সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করে যেন কিন্তু সব কেমন গুলিয়ে যায় কেবল বারবার সুন্দরলালের কথাগুলোই তার বেশী মনে পড়ে। "হামি তোকে রাণী বনায়ে রাখবো—পরের কাম করনেসে ইজ্জত তো নষ্ট হো যায়গা। হাম্ সব কাম ক'রবে, তোর কোনও দুঃখ থাকিবে নারে। তুই হামাকে সাদী কর লখিয়া।" আজ সুন্দরলালের সেই চোখের দৃষ্টি যেন ওর কাছে অত্যন্ত সহজ বলেই বোধ হ'ল—ছোট দাদাবাবুর মত সুন্দরলাল ভীরু নয়—ইতরও নয় এতটা। সে ওকে সাদী করতে চায়। অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় মন স্থির ক'রে ফেলে লখিয়া, সুন্দরলালকে সে সাদী করবে। পরের বাড়ী কাজ করে সত্যিই তার ইজ্জত নষ্ট হয়েছে। আর সে সুন্দরলালকে ফেরাবে না। ইচ্ছে করে ছুটে সে কথা সুন্দরলালকে জানিয়ে আসে, উত্তেজনায় উঠে বসতেও চেষ্টা করে। শোভা ওকে শুইয়ে দেয়, সুস্থ হ'লেই নিজে সঙ্গে করে বস্তিতে পৌঁছে দিয়ে আসে। শোভা ভাবে কালই সে ভাড়া মিটিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—লখিয়া ভাবে ছোট দাদাবাবু আর সুন্দরলালের তফাৎ কোথায়?

ঘরে বাইরে

গহনা

উমা দেবী

সুবাসিনী সবে বাসি পাট সেরে চায়ের গেলাস নিয়ে বসেছিলেন এমন সময় একটি গাড়ী এসে থামল।

—দেখ তো পিণ্টু কে এল?—চেঁচিয়ে বললেন সুবাসিনী।

পিণ্টু তখন তারস্বরে বারান্দায় বসে নামতা মুখস্থ করছিল—সে উঠল না, মুখ নীচু করে নামতার বইতে রাবার ঘযতে লাগল। বিরক্ত হয়ে চায়ের গেলাস সরিয়ে তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখলেন জামাই মনমোহন নামছে পেছনে ঘোমটা ঢাকা একটি বউ—কোলে তার বাচ্চা মেয়ে। বুঝতে দেরী হোল না—ওটি মনমোহনের নতুন বৌ।

তার মেয়ে মারা গেলে দুমাস যেতে না যেতেই জামাই আবার বিয়ে করেছে। ছোট্ট নাতনিটিকে তিনি কাছে এনে রেখেছিলেন। কিন্তু এমনই কপাল তাঁর যে বছর না ঘুরতে উট্‌কো অসুখে মারা গেল—চিকিৎসাও তেমন করে করতে পারেননি। মেয়ের গায়ের গয়না আর নাতনির গায়ের টুকিটাকি সোনার হার বালা—সবই তোলা আছে। প্রাণ ধ'রে বিক্রী করতে পারেন নি। শিকড়টুকুতে যদি কালে পাতা গজায় তখন তো এসব লাগবেই—বিয়ে তো দিতেই হবে নাতনীর। কিন্তু সে আশাও ভেঙে গেল তাঁর।

সেই সব পুরোনো দিনের কথা আজও তাঁর মনে পড়ে। তাঁর মেয়ে বিরজা রোগা ভোগা ছিল। কিন্তু তাইতে কি সে শুয়ে বসে দিন কাটিয়েছে? যতদিন বেঁচেছিল দু-বেলা হেঁসেল ঠেলতে ঠেলতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ঐ হেঁসেল ঘরেই একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। খবর পেয়ে সুবাসিনী ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু মেয়ের আর জ্ঞান ফেরেনি।

হাত-গলা কান থেকে সব গয়না তাঁকেই খুলতে হয়েছিল। জামাই চোখের জল মুছতে মুছতে শাশুড়ীকে বলেছিল—ও সব জঞ্জাল আপনিই রাখুন মা, আর দেখুন এটাকে যদি বাঁচাতে পারেন—আর শাশুড়ীর কোলে তুলে দিয়েছিল মেয়েটাকে। কিন্তু সেই-টুকু রাণীকেও তো ধরে রাখতে পারলেন না। এতদিন পরে জামাই কি মনে করে এলো? আর সঙ্গে ওরাই বা কেন?

ওরা এতক্ষণ নেমে পড়েছে, জ্বল জ্বল করে তাকাচ্ছে কোলের মেয়েটা। কাজল থেবড়ে গালে লেপটে রয়েছে—বড় বড় চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। একহাতে বোতল ধরে আর এক হাতে মেয়ে ধরে সামলে-সুমলে নীরজা কোনোমতে ঘরে এসে ঢুকল—সুটকেশটা ধরে পেছন পেছন এল মনমোহন।

সুবাসিনী বললেন—বেঁচে বর্তে থাকো বাবা—থাক থাক—এখন আর রেল-কাপড়ে ছুঁয়ো না মা চা টুকুন খেতে পাবো না—তৈরী চা জল হ'য়ে গেল।

নীরজা লজ্জা পেল। বলল—আমি বুঝতে পারিনি মা—থাক থাক— মাদুরের দরকার নেই—এই তো পরিষ্কার মেঝে—এইখানেই বসছি।

পিণ্টু এতক্ষণে বই খাতা ফেলে উঠে এসেছে। খাটের পায়া ধরে বড় বড় চোখে

রাজ্যের অবাক মেখে সে তাকাচ্ছিল নতুন যারা এসেছে তাদের দিকে, আর কোলের ওই ছোট্ট মাংসপিণ্ডটার দিকে।

একটা আঙুল খুকুমণি মুখে পুরে দিয়েছে আর জ্বল জ্বল ক'রে তাকাচ্ছে পিণ্টুর দিকে। তারপর পিণ্টুকে সে চিনতে পেরেই যেন হেসে ফেলল—সঙ্গে সঙ্গে একরাশ লালা গড়িয়ে পড়ল মুখ থেকে।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে নীরজা বুকে চেপে ধরল—এটাকে কোথায় একটু শোয়াই মা—বলুন তো—

সুবাসিনী ঠিক তাল পাচ্ছিলেন না। এতদিন পরে এভাবে আসবার মানেই বা কি? জামাই নতুন বিয়ে করবার পর সামাজিকতার অনুরোধে তিনি লোকমুখে খবর পাঠিয়েছিলেন আসতে। কিন্তু জামাই-বৌ কেউই আসেনি। এখন তো তাদের কথা আর মনেই পড়ে না। তবে হঠাৎ এতদিন পরে আবার আসা কেন?

নীরজা আবার জিজ্ঞাসা করল—এটাকে কোথায় শোয়াই—

সুবাসিনী বললেন—ঐ মাটিতেই দেয়ালের ধার ঘেঁসে শোয়াও মা—খাটে শোয়ালে পড়ে যেতে পারে—

এদিক ওদিক তাকিয়ে নীরজা হঠাৎ বলে উঠল—বাঃ কি সুন্দর ছোট্ট দোলা—ঐ তো-ঐতেই চলবে—

সুবাসিনী বিরক্ত হলেন। ওটি তাঁর মরা নাতনীর দোলা—প্রাণ ধরে বেচতে পারেন নি—কারুকে দিতেও পারেন নি। বেতের তৈরী দোলাটা কড়িকাঠ থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থাতেই তাকের ওপর তোলা ছিল। কোণ থেকে একটা ছাতা তুলে নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে অপূর্ব কৌশলে মুহূর্তে নীরজা নামিয়ে নিল। আঁচল দিয়েই ঝেড়ে-ঝুড়ে কাঁথা পেতে রেখে মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়াতে বসল।

মনের বিরক্তিটা সুবাসিনী ছেলের ওপর দিয়েই প্রকাশ করলেন—এই হতভাগা পিণ্টু কোথায় গেলিরে—দৌড়ে দোকানে যানা—কিছু খাবার নিয়ে আয় না—

নীরজা বলল—আপনার জামাই গরম জিলিপি ভালবাসে মা—কিছুটা আনিয়ে দেবেন—আর খুকুর জন্য কয়েকখানা বিস্কুট—বলেই নীরজা মেয়েকে কোলের উপর দাঁড় করিয়ে গুন গুন করে ছড়া বলতে শুরু করল—

খুকু আমাদের সোনা
সেকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেবো দানা—
তোমরা কেউ করো না মানা।

গেলাসের চা-টুকু নর্দমায় ঢেলে ফেলে দিলেন সুবাসিনী। পিণ্টুর হাতে একটা টাকা দিয়ে যা যা আনতে হবে বলে কলঘরে ঢুকলেন। মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। কি বেহায়া বৌটা—যেন সব কেড়ে কুড়ে নিতে রাক্ষুসীর মতো হানা দিয়েছে। বলিহারি জামাইয়েরও আক্কেল। না বলে কয়ে বৌকে নিয়ে এই বাড়িতে ঢুকলি কেন? চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিয আছে। থাবড়ে থাবড়ে এই সাতসকালে অনেক জল তিনি মাথায় ঢাললেন—তারপরে চেঁচিয়ে উঠলেন হারামজাদী ঝি মাগী পথের ওপর

বাসনগুলো রেখে গেল গা—এখন কোথা দিয়েই বা যাই—

নীরজা ঘর থেকে উঁকি দিয়ে বলল—কেন মিথ্যে চেঁচাচ্ছেন মা—বাসনগুলো তো সিঁড়ির এক ধারে জড়ো করা—এ পাশ দিয়ে আসুন না—

—এ পাশ দিয়ে আসুন না—যেন নীরজার নিজের বাড়ী—গিন্নী হুকুম করছেন—মনে মনে খিঁচিয়ে উঠলেন সুবাসিনী। মুখে বললেন—ও মা, তাইতো পোড়া চোখের মাথা খেয়েছি? তুমিই বা আর কতক্ষণ বসে থাকবে বাছা, চান ক'রে কাপড়-চোপড়গুলো কেচে ফেল—তারপর মুখে একটু জল দাও—

নীরজা বলল—বড্ড খিদে পেয়েছে মা! আপনার জামাই কাল সারারাত ট্রেনে কিছুই খায়নি। যে ধকল—মানুষটারই বা দোষ কোথায়। মাছি নড়বার জায়গা নেই—তা সে মানুষটা নামবে কি?

সুবাসিনী বললেন—তবে মুখ হাত ধুয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেল—বাসি-কাপড়ে বাসি-মুখে কি কিছু দিতে আছে গা—

নীরজা বলল—সে সব পরে হবে মা। ষ্টেশনে নেমেই মুখ ধুয়েছি, আর ধোয়ার দরকার নেই। তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে—খিদেয় চোখে ধুলো পড়ছে—আপনার জামাইকে দিন।

বলতে বলতেই পিণ্টু এসে হাজির হল। মাঝারি গোছের একটা ঠোঙা হাতে নিয়ে। পিণ্টুর হাত থেকে ঠোঙাটা নীরজাই তুলে নিল। তারপর তা থেকে একখানা সিঙারা আর দুখানা জিলিপি তুলে পিণ্টুর হাতে দিয়ে বলল—যা ভাই লক্ষ্মীটি, একটা ডিস কি বাটি যা হয় কিছু নিয়ে আয় আমি গুছিয়ে দিই—তোর জামাইবাবুকে দিয়ে আয়—

পিণ্টুর ভারি ভালো লেগে গেছে নীরজাকে। আদর ক'রে নীরজা তাকে কোলে বসিয়েছে—তোরঙ্গ খুলে একটা নতুন জামা তার গায়ে পরিয়ে দিয়েছে—আর দুটো বড় বড় রঙীন লাট্টুও দিয়েছে। পিণ্টু প্রথমে বলেছিল নীরজা দিদি—নীরজা শিখিয়েছে শুধু দিদি। নীরজার ছোট্ট বাচ্চাটাকেও পিণ্টুর খুব ভালো লেগে গিয়েছে, সর্ব্বক্ষণ সে নীরজা আসা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।

জলটল খেয়ে একটু সুস্থ হলো নীরজা। তারপর পিণ্টুকে কোলে টেনে বসাল। তার চুলের ওপর আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে খুব সুন্দর একটি গল্প শোনাল আর সবচেয়ে যেটা পিণ্টুর ভালো লেগে গেল—তা হচ্ছে ঐ ছোট্ট তুলতুলে বাচ্চাটাকে, পিণ্টুর দিকে কাজল ধ্যাবড়ানো চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখে আঙুল পুরে দিয়ে সকাল বেলার মতন আবার হেসে ফেলল।

মনমোহন এতক্ষণ ঘরে এসে বসেছে চৌকির ওপরে।

নীরজা বলল—যা ভাই পিণ্টু লাট্টু ঘোরাগে যা—ডাকলেই আসবি কিন্তু।

আস্তে আস্তে এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা সুরে মনমোহন বলল—পাবে বলে তো মনে হচ্ছে না সব বেচে-বুচে খেয়েই ফেলেছে হয়তো—

চোখ মুখ ঘুরিয়ে নীরজা বলল—তুমি থাম তো, গয়নাগুলো হাতছাড়া করবার সময় মনে ছিল না? অমন ভাবে সব কিছু শাশুড়ির হাতে তুলে দিতে গিয়েছিলে কেন?

মনমোহন হাসলো বলল—তখন কিছু মাথার ঠিক ছিল গো—

এখনই কি কিছু ঠিক আছে—কটাক্ষপাত করল নীরজা। যাই বল না কেন—আমার ভালো লাগছে না। মা কি মনে করবেন? এখনই কি কিছু টের পাচ্ছেন না ভেবেছ—ও গুড়ে বালি শেষ পর্যন্ত—বলে দিলুম।

মনমোহন চুপ করে রইল। বলল—একটা বালিশ দাও—একটু জিরোই—কাল বড় ধকল গেছে। এখন সর্ব্ব রক্ষে হলে হয়, ট্রেণ খরচা বড় কম লাগে নি।

দুপুর গড়িয়ে এল। সুবাসিনী নিরামিষ যা রেঁধেছিলেন নীরজা আর মনমোহন তাই খেয়েছে। পিন্টুকে আধ পোয়াটাক মাছ আনতে দিচ্ছিলেন, নীরজা বারণ করল—আর কেন মা এসব—এ বেলা হেঁসেলে যেতে পারব না—আপনি কেন আর আঁশ রাঁধবেন।

সুবাসিনী অবাক হলেন—সে কি মেয়ে, তোমার হেঁসেলে যাবার কথা কি করে ওঠে বাছা—আমারি হয়েছে মরণ—

মরা মেয়ের নাম ধরে তিনি কাঁদতে বসলেন। নীরজা তাড়াতাড়ি তাঁর দুহাত ধরে বলতে লাগল—কাঁদবেন না মা, তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন তাই মাথায় সিঁদুর নিয়ে গেছেন। আমি তো আপনার আর এক মেয়ে—আমার মুখের দিকে তাকান মা—

সুবাসিনী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠলেন—কাঁথা-নেতা-ছোঁয়া কাপড়ে আমাকে ছুঁলে বাছা—আবার এই অবেলায় চান করিগে বাছা—

নীরজা বলল—কাপড়খানা যদি ছাড়তেই হয় ছেড়ে ফেলুন কেচে দিচ্ছি, এখন আর গায়ে জল ঢালবেন না—মানুষের শরীরে কি সব সময়ে সব সহ্য হয়?

পিন্টু এসে পিছন থেকে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরল—দিদি ও দিদি আমাকে একটা রঙীন বল কিনে দেবে? আর একটু পুতুল? ঝুড়িতে করে বিক্রী করতে এনেছে।

নীরজা বলল পুতুল কিরে? তুই না বেটা ছেলে!—বলেই হেসে উঠল নীরজা। তারপর পিন্টুকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে কোলে টেনে নেয় আর মুখে মাথায় কয়েকটা চুমু খেয়ে বলে—গয়না পরবি পিন্টু গয়না? সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো দানা?

পিন্টু বলে—ধ্যেৎ

—তবে পুতুল খেলবি কি করে?

—খেলব না?

—কিছুই খেলবি না?

বল খেলব দিদি—গহনা

আঁচল থেকে একটা সিকি খুলে নীরজা পিন্টুর হাতে দিয়ে বলল—যা কিনগে যা—

সুবাসিনীর চোখের ওপর দিয়েই, পিন্টু নাচতে নাচতে চলে গেল।

কি জানি কেন—সুবাসিনী আর চান করতে কলঘরে ঢুকলেন না।

খেতে বসে নীরজা কথাটা পাড়ল। বলল—মা, দিদির গয়নাগুলো আপনার জামাই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান।

ভাতের দলাটা বুঝি সুবাসিনীর গলাতেই আটকে গেল। বাঁ হাতে জলের ঘটী তুলে ঢকঢক করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে ফেললেন।

নীরজা আবার বলল—ওসব তো দানের জিনিষ মা, ওসব ধর্মত আপনি রাখতে

পারেন না—আপনার জামাইয়েরই পাপের কথা। এতক্ষণে সুবাসিনী তাকালেন স্থির দৃষ্টিতে নীরজার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—এই জন্যেই বুঝি তোমরা এয়েছ বাছা—

নীরজা জিভে একটা ছোট্ট কামড় খেয়ে বলল—সে আপনার জামাইয়ের কথা আপনি বলতে পারেন। আমি এসেছি মা পেতে—সেই ছোট্ট বেলায় মা হারিয়েছি—মায়ের মুখ মনেও পড়ে না—

পিণ্টু নতুন কেনা লাল বলটা হাতে নাচতে নাচতে ফিরল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে—বাচ্চাটা কি করছে রে—

পিণ্টু বলল ঘুমোচ্ছে—তোমরা আর কতক্ষণ খাবে? খেয়ে উঠে নীরজা হাত পেতে বলল—মা পান?

—পানের পাট তো নেই বাছা—

পিণ্টু বলল—পয়সা দাও—এনে দিচ্ছি সাজা পান—ঐ সমীরদার দোকানের কাছেই একটা নতুন দোকান খুলেছে—

ভাত-ঘুম ঘুমোল অনেকক্ষণ নীরজা—গা এলিয়ে মেঝেয় আঁচল পেতে—একপাশে বাচ্চা আর একপাশে পিণ্টু। ঘুম-ঘুম-ঘুম—জামাই বাইরের ঘরে মাদুর পেতে হাতপাখা নিয়ে শুয়েছে নীরজা ভেতরের ঘরে মেঝেতেই আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে তার নিঃশ্বাসের ওঠানামায় গলার খাঁজে খাঁজে জমা ঘাম-জল গড়িয়ে পড়েছে বুক বেয়ে। চুল এলো—মুখ হাঁ—পান-খাওয়া দাঁতের গোলাপি রং চিক চিক করছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সুবাসিনী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মেয়ে আজ বেঁচে থাকলে এই বয়সেরই হতো।

নীরজাকে দেখে বার বার ঘুরে ফিরে মেয়ে বিরজার কথা মনে পড়তে লাগল সুবাসিনীর। আর ছোট্ট বয়েস থেকে সুরু করে বড় বয়েস পর্যন্ত নানান সুখ দুঃখের অনুভূতি ঐ একটি মেয়েকে ঘিরে কেমন করে তাঁর যৌবনকালকে ভুলিয়ে রেখেছিল তারই নানান স্মৃতি নদীর ঢেউয়ের মতন তাঁর মনের তটে বিচিত্র সুরে আছড়ে পড়তে লাগল। পিণ্টু তো হয়েছে অনেক বয়সে—কপালে ছিল—তাই হয়েছে না হ'লে ও বয়সে আর কেউ নতুন ক'রে ছেলে মানুষ করতে চায় না। আর তাছাড়া তাঁর কপালও তো পুড়লো পিণ্টু হবার পরেই। না-হলে পিণ্টুর বাপের কি যাবার বয়েস হয়েছিল? যাক সে সব কথা—

হঠাৎ সুবাসিনীর মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠল মেয়ের গয়নাগুলি দিয়ে নীরজাকে একবার সাজিয়ে দেখতে। সেই বিয়ের বেনারসীটি পরিয়ে দিয়ে মুখে কনে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে একবার মুখখানি তুলে ধরতে—দেখতে যে সে মুখে নিজের মেয়ের কোনো ছায়া পড়ে কিনা! পর মুহূর্তেই মনকে শাসন করলেন তিনি—গয়নাগুলো তা হলে আর তিনি রাখতে পারবেন না।

কিন্তু রাখবারই কি অধিকার তাঁর আছে? যে জিনিষ তিনি দান করে দিয়েছেন সে জিনিষ রাখবার ইচ্ছে কেন? হরি—হরি—সুবাসিনী ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করলেন। তাঁর পিণ্টুর যেন কোন অকল্যাণ না হয়। গয়না তিনি নীরজাকে দিয়েই দেবেন।

বুঝি বা মেয়ের কথাই ভাবছিলেন সুবাসিনী—কখন যে ঘুম ভেঙে নীরজা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষও করেন নি, নীরজা ঘুম ভাঙতেই দেখল—সুবাসিনী চোখ বুজে বসে আছেন—দুচোখ দিয়ে অশ্রুজলের ধারা বইছে।

নীরজা ডাকল—মা, ওমা, মা—

সুবাসিনী তখন স্মৃতির অকূলে ভাসছেন। তাঁর মনে হল সেই সমুদ্রের অনেক দূরের তীর থেকে তাঁর মেয়ে তাঁকে ডাকছে—মা, ওমা, মা—

শোকাচ্ছন্ন স্মৃতির সুখে বিভোর হয়ে চোখ বুজেই ছিলেন সুবাসিনী—কোনো জবাব দিলেন না।

নীরজা উঠে ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত দিয়ে ডাকল—মা,—ওমা—মা।

সুবাসিনী যেন তাঁর মেয়ের হাতের স্পর্শটি পেলেন—যেন মনে হোল তাঁর মেয়েই মরণের সমুদ্র পেরিয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে—মা,—ওমা—মা

তিনি চোখ খুললেন। নীরজা দম ছেড়ে বলল বা-বা-বাঁচলাম—কি ভয়ই না হয়েছিল।

নীরজার মুখে ভয়ের আভাস দেখে কি জানি কেন সুবাসিনীর এখন আর আদিখ্যেতা বলে বোধ হল না। তিনি দুহাতে নীরজাকে বুকে টেনে ধরে ঝর-ঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন।

সন্ধ্যেবেলায় নীরজা পিণ্টুকে নিয়ে দাওয়ায় বসে গল্প করছিল, আর ঠাকুরের দীপের জন্য সলতে পাকাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সুবাসিনী বাইরের ঘরে নিজের ও পিণ্টুর বিছানা পেতে রেখে ভেতরের ঘরটিতে মেয়ে জামাইয়ের বিছানা পেতে রাখলেন। রাতের রান্না আছে—এদিকে কাজ না সারলে ওদিকে যেতে পারবেন না। নীরজার জন্যে মনের মধ্যে একটু স্নেহকাতর হয়ে পড়েছেন। মেয়েটা কেমন যেন একটু গাপড়া বেহায়া। কিন্তু তবু ভালোই লাগে। পিণ্টুকে কেমন আপন করে নিয়েছে—শুধু যদি গয়নার ব্যাপারটা না থাকত—ঐতেই কেমন যেন মনটা খচখচ করতে থাকে। যাকগে—ভগবান যত মায়া কমিয়ে দেন ততই ভালো। ইষ্টনাম স্মরণ করে সুবাসিনী কপালে হাত ঠেকায়।

অনেক রাত্রে মনমোহনের সঙ্গে নীরজার দেখা হল। মায়ের পায়ে গরম তেল মালিশ করে বাতের গুজিগুলো টিপে টিপে আরাম করে দিয়েছে সে, সুবাসিনী জল হয়ে গেছেন, মনে মনে ভেবেছেন—আহা যদি এটিও তাঁর মেয়ে হোত—আর নয়ই বা কিসে—মেয়েরই তো সতীন—সেও মেয়েরই তুল্য। তবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—বলেন—এবার শুতে যাও মা—সতীলক্ষ্মী হ'য়ে বেঁচে বর্তে থাকো—

অনেক রাত্রে শোবার ঘরে যখন নীরজা এল—তখন মনমোহন খাটে বসে পা দোলাচ্ছে, এবেলাও সাজা পান আনিয়ে রেখেছিল নীরজা, তারই একটা মুখে তুলে দিল।

বাচ্চাটার পাশে খেলা করতে করতে পিণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে তার বলটা ধরাই আছে। ঘরে তেলবাতি জ্বলছে—বারান্দার একপাশে লণ্ঠনটা কমানো। শলতেয় মিঠে মিঠে জ্বলছে। পিণ্টুর রোগা রোগা মুখের দিকে তাকিয়ে নীরজার মনে ব্যথা আর স্নেহ জেগে উঠল। আহা বেচারা—মায়ের তো ঐ শরীরের হাল—তারপর?

মনমোহন বলল—মাকে বলেছিলে?

—বলেছি।

—কি বললেন ? উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ল মনমোহন। নীরজা চাপা গলায় বলল—তোমার লোভ দেখে আমার ঘেন্না করছে। মরা মেয়ের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছেন—

মনমোহন বলল—কি বললে, ঘেন্না করছে? গয়নার লোভটা কার ছিল? অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলে আমায়—মেয়েমানুষ এমনি বেহায়া বটে—এখন লজ্জা করে না ঘেন্নার কথা তুলতে—

নীরজার মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। কিছু না ব'লে পিণ্টুকে জড়িয়ে ধরে মাটিতেই শুয়ে পড়ল সে।

মনমোহন আস্তে আস্তে বলল—নিচেয় কেনো চৌকিতে উঠে এসো—

—যাচ্ছি গো—যাচ্ছি—পান-ঠাসা ফুলো ফুলো গালে খানিকটা দোক্তা ফেলে সে উঠে দাঁড়াল—

ফুঁ দিয়ে মনমোহন তেলবাতি নিভিয়ে দিল।

পরদিন সকালে উঠে মনমোহন সুবাসিনীকে বলল—আজ আমাকে যেতে হবে—আমি যে কেন এসেছি সে কথা নীরজার মুখে নিশ্চয়ই শুনেছেন—

—শুনেছি বাবা—ধরা-ধরা গলায় সুবাসিনী বললেন মেয়েকে যদি নিঃস্বত্বে সঁপে দিতে পারি—তার জঞ্জালগুলো কি আর পারব না?

মনমোহন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এত সহজে কাজ সমাধা হবে ভাবতেও পারেনি। এক সময়ে নীরজাকে আড়ালে পেয়ে হঠাৎ তার গালটা টিপে দিয়ে বলল—কি কায়দাই করেছ মণি ধন্যি অভিনয়—চালিয়ে যাও—না আঁচানো পর্যন্ত কারুকে বিশ্বাস নেই।

নীরজার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। এই লোভের কুশ্রীতা আর হীন চক্রান্ত তার সমস্ত মনটাকে যেন বিষিয়ে দিল।

মনমোহন বলল—ওকি মুখে মেঘ কেন?

নীরজা চুপ করে রইল।

সকাল বেলাটা কেটে গেল টুকিটাকি গুছিয়ে নিতে। এর মধ্যে দশবার সুবাসিনী এসেছেন। সাগুদানা বেঁধে জুড়িয়ে বোতলে ভ'রে দিয়েছেন। দুধ জ্বাল দিয়ে রেখে গেছেন। চিনিটুকু, মিছরিটুকু, দুখানা বিস্কুট, লজেঞ্চুস, একটু আমসত্ত্ব এনে দিয়েছেন—

নীরজা হেসে—মা কি করছেন—ঐ টুকু বাচ্চা কি আমসত্ত্ব খেতে পারে?

সুবাসিনীও হাসলেন—পারে গো পারে—আমার মেয়েকে কতো খাইয়েছি—সলতের মতো জড়িয়ে মুখে ধরলে চুষে চুষে খাবে—তা হলে আমাকেও কিছু আমসত্ত্ব দিন—নীরজা হেসে হেসে বলল—আর খানিকটা তেঁতুলকাসুন্দি—দুপুরের রান্নায় সুবাসিনী কিছুতেই নীরজাকে যেতে দিলেন না। শেষকালে রফা হোল আঁশ রান্নাটা নীরজা করবে।

—আঁশের কি দরকার মা—রাগ ক'রে নীরজা বলল—এক দিন দু-দিন কি নিরামিষ খাওয়া যায় না?

সুবাসিনী বললেন—কী যে বল বাছা—সধবা মেয়ে আঁশ মুখে না দিয়ে কি শ্বশুর বাড়ী যায়?

তারপর পিণ্টু যখন মাছ এনে ফেলল—তখন সুবাসিনী নীরজাকে কিছুতেই মাছটুকুও

ছুঁতে দিলেন না। বললেন—এদিকের রান্নাতো সব হোয়েই গিয়েছে---ভাত চাপিয়েছি উনুনে, এদিকে কাঠের জ্বালে মাছটুকু আমিই করে দিই। তুমি গোছগাছ করগে—দুপুরের গাড়ী খেয়ে উঠে আর জিরোতে সময় পাবে না।—বলেই হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে ধরা-ধরা গলায় বললেন—মা আমার কি ভালোই বাসত আমার হাতের আঁশ রান্না খেতে। আর সেই মাছ কি আজ পিণ্টু এনেছে এ আমি আজ কারুকেই রাঁধতে দিতে পারবো না।—বলে আর একবার চোখের জল মুছলেন সুবাসিনী।

দু'টোর গাড়ী—খাওয়ার পর যাত্রার উদ্যোগ করিয়ে নিলেন। নীরজা বলল—তেরাত্তির পেরোয় নি—যাত্রার কি দরকার—

সুবাসিনী তার চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে মুখে চুকচুক শব্দ করে বললেন—একদিনের চেনা—তবু মনে হচ্ছে কতকালের চেনা। পিণ্টু ইতিমধ্যে গাড়ী ডেকে এনেছে। মনমোহন ব্যাগ থেকে দুটি টাকা বের করে তার হাতে দিল মিষ্টি খেতে। তারপর শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল এবার তো যেতে হয়—হ্যাঁ বাবা, এই যে এনে দিই—সুবাসিনী ধরা-ধরা গলায় কথাটা বলে ঘরে ঢুকে তোরঙ্গ খুলে একটা ছোট্ট বিস্কুটের টিনের বাক্স বার ক'রে নিয়ে এলেন। মনমোহনও নোটবই খুঁজে একটা চিরকুট বার করে বলল—একটু মিলিয়ে নেবো।

বারান্দার কোণে জলচৌকিটা রেখে গয়নাগুলি বার করলেন সুবাসিনী। একটা টিকলি শুধু মিলল না। সুবাসিনী বললেন নাতনীর চুলে ওটা বেঁধে দিতুম—একদিন আর পাওয়া গেল না।

ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান তাগাদা দিতে লাগল। মনমোহন বিস্কুটের টিন থেকে গয়নাগুলি তুলে নিয়ে একটি রুমালে বেঁধে সুটকেশে ভরল। তারপর স্ত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—কই গো পিণ্টু কই?

—পিণ্টু গাড়ীতে মাল তুলতে গেছে—পিণ্টু কখনো পারে? মনমোহন বলল

ঠোঁট উলটে নীরজা বলল—কীই বা—মাল—একটা সুটকেশ আর একটা ছোট্ট বিছানা—

সুবাসিনী ধরা-ধরা গলায় বললেন—বেঁচে থাক বাবা সুখী হও—আমার শেষ স্মৃতির চিহ্নটুকুও তোমাদের হাতে তুলে দিলুম—আপদে বিপদে তাকাবার মতন সম্বলটুকুও আর রইল না। যদি অসময়ে চোখ বুঁজি—আমার পিণ্টুকে একটু দেখো মা—বলতে বলতে ঝরঝরিয়ে সুবাসিনী কেঁদে ফেললেন।

পায়ের ধূলো নিয়ে মনমোহন এগিয়ে এল। গাড়ীর মধ্যে বসে নীরজার দিকে তাকিয়ে বলল—কই গো এস—

বাচ্চাটাকে সুবাসিনীর কোলে দিয়ে নীরজা মনমোহনের পায়ের ধুলো নিল। তারপর হেসে বলল—মায়ের শরীরের হাল দেখছো তো—এ সময়ে তাঁকে ছেড়ে যাই কি করে—পৌঁছে কুশল দিও।

খেলা

মীরা সরকার

বিপিনের যেন মনে হোলো বারবার চাইছেন মহিলা।

অবশ্য মেয়েদের দিকে ফ্যালফেলিয়ে চাইবার না আছে রূঢ়তা বিপিনের, না অসংস্কৃতি। তবু এমন অস্বস্তি লাগছে! চোখ তুলে চাইতেই হোলো।

চোখাচোখি হতেই ভারী অপ্রস্তুত। মুখ ফিরিয়ে নিলেন মহিলা। পানপাতা মুখ, শাঁখাপরা কালো হাতখানা, সাপজড়ানো ব্রোঞ্জের চুড়িগাছি অতি ব্যবহারে কালচে। হলদে ছোপ্ মাখা কর্মখিন্ন নখের মোটা মোটা আঙ্গুল। ক্যানভাসিং ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝোলানো। তার ওপরে রাখলেন মহিলা হাতখানা।

বিপিনের চোখদুটো যেন অত্যন্ত অভদ্রভাবেই সেখানে আটকে গেল। কে জানে কেন। ঐ ধরণের স্বল্প স্থূলকায়া, স্বল্প সিঁদুর লেপটানো, আটপৌরে ধরণের শাড়ী জড়ানো মহিলা ; ফাটা পায়ে ছেঁড়া আমসত্ত্ব স্যাণ্ডাল। সেও তো দেশভাগের কদর্য বিপর্যয়ের পর নতুন কিছু দৃশ্য নয়।

কিংবা হয়ত কোনো একদিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না আপাতত।

কলেজ স্কোয়ার, হ্যারিসন রোডের তেকোনা মোড়। কোন্ ভাগ্যবানের মর্মর মূর্তি ঘিরে লোহার বল্লম উঁচানো বেড়া। আর সে রেলিং-এর আগা-পাশ-তলা ঝুলন্ত ব্যাগের বাদুড় সমারোহ। সেটা ছাড়িয়ে চলেছে এদিকে যতদূর চোখ যায় কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ। ওদিকে যতদূর গড়ায় হ্যারিসন রোড, পড়েছে আপার সার্কুলাবে ; সেখান থেকে শিয়ালদা। সংকীর্ণ ফুটপাথ হাঁকড়ে ঝুঁকে পড়েছে হকাররা। বিচিত্র পশার আর বিচিত্রতর মানুষের জড়াজড়ি ভিড়।

এতোক্ষণ তো এদিকেই ঠায় চেয়ে ছিল বিপিন ; মহিলার দিকে নয়। বেকার উমেদার যে বিপিন বেচারী পাঁচটার ট্রেনের হাতল ধরে বাড়ী পৌছাবে বারাসতে, তার সময় কই অন্যদিকে দেখবার।

দেখলেই বোঝা যায় কি সাংঘাতিক নির্লক্ষ্য মানুষটি। ছিন্নমূল বহু ইতিহাসের আরো একজন উদ্‌ভ্রান্ত। আরো একটি সংখ্যা যোজন। শুধু অনন্য—একজন নয়।

আধাময়লা পাঞ্জাবীর ঝুল পকেটে হাত ঢুকিয়ে অকারণেই নীচের দিকে চাপ দেয়, যেন তাতেই চটকানো জামাটা স্মার্ট লাগবে। গালে খোঁচা খোঁচা কদিনের না-কামান দাড়ী। একটা বেপরোয়া ছটফটে ভাব। তবু রোগা ক্লান্ত চোখে মুখে এমন তিক্ততা মাখানো যেন যৌবনটাকে মেরেই এনেছে প্রায়।

নিজের তালিমারা পামশুটার দিকে এবার কেন্দ্রীভূত বিপিন, মহিলার হাতের ওপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে। কাঁটা কি বিঁধছে কোথাও জুতোটায়? কাঁটা যে কোথায় ঠিক

ঠাউরে পাচ্ছে না?

ফের চোখ তুলতেই মহিলার সাথে দৃষ্টি বিনিময়।

এবার ভালো করেই চাইলো বিপিন। চেয়ে নিঃসংশয় হোলো। ঝোলাটি ক্যানভাসিং-এর। কিছু গছাবার মৎলবে আছেন মহিলা।

ধুত্তোর। মেয়েছেলেদের কেন যে এ কাজে ঢুকোয়! পুরুষ হলে রূঢ় সংক্ষিপ্ত 'না মশাই'—বলে···এখানেই গ্যাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যেত··পাঁচটার ট্রেন না আসা তক্। মেয়েছেলে, তায় বিবাহিতা। বয়সটা তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে মনে হয়। না হোক্ তাকে 'না' বলতে বাঁধবে গলায়।

পাঁচখানা অবান্তর এটাসেটা বলতেই হবে অতি মোলায়েম গলায়। এই যে পেটের মধ্যে জ্বালাটা এতোক্ষণে পাঁজরার তলায় দিচ্ছে তুঁষের তাপ। ঘৃণা হচ্ছে সমস্ত মানুষ জাতটার ওপরে, মানুষের সবকিছু শ্রদ্ধা ভালোবাসার মোলায়েম জিনিষগুলোর ওপরে, সেকি বলা যাবে?

—কি জিনিষ? হেঁ হেঁ। দেখুন—ওসব আর আমার কি কামে লাগবে বলুন? হেঁ। যা দিনকাল। এখানে চাকরী খুঁজতেই আসা যাওয়া। মা বোন—এঁরা গাঁয়ে ঘরে যাহোক কিছু করে আব্রু, আত্মীয়তা বজায় রাখে। ওসব আর—হেঁ হেঁ। পড়াশোনাও হয়নি। বেকার। সুতরাং বেবী ফুডই বলুন আর আলতা সিঁদুরই বলুন—কি কাজে লাগবে।

সব। সব বলতে হবে গুষ্টির সমাচার? খেঁকিয়ে উঠল নিজের মনেই। ঠোঁট কামড়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে বিপিন। অবিলম্বে স্থান ত্যাগটাই বাঞ্ছনীয়।

কয়েক পা এগিয়েও গেছে নাকি।

—এ্যাই যে, শোনেন।

ঠিক্। যা ভেবেছে তাই।

কিন্তু কই, হাতটা ঝোলার মধ্যে ঢুকলো না তো মহিলার। যেমন ছিল বাইরে তেমনি করে ভারী হয়ে পড়ে রইল। ক্লান্ত বিবর্ণ শুকনো চামড়ার ঠিক নিচেই যেন পেলব ছলছল একটা চেনা পরিচয়ের উষ্ণতা। বিষণ্ন চোখদুটিতে অমন বিশ্রী শূন্য দৃষ্টি না থাকলে হয়ত চিনি কি না চিনি হাসিটার প্রতিধ্বনি কাঁপতো বিপিনেরো মুখে।

শোনেন—বললেন অবশেষে মহিলা ইতস্ততঃ করে। আপনারে কেমুন চিনা চিনা লাগে। কিন্তু ঠাহর পাই না। হয়—ঠিক হইছে। পদ্মপিসীর বাড়ীর হয়েন নাকি?

—হ্যাঁ। উনি—(আশ্চর্য! এমন ব্যক্তিগত প্রশ্ন কি সাংঘাতিক অসঙ্কোচে করছেন!) আমার সম্পর্কে খুড়ীমা।

—হয়। ঠিক ধরিছি। আপনি তাহলি বিপিন?

উত্তরোত্তর বিস্ময়।—আপনি চিনলেন কি করে?

শুধু মুহূর্তের জন্যে ছলছল করে ভেসে উঠলো ক্লান্ত চোখের আড়াল থেকে অদ্ভুত এক ঘরোয়া হাসি। অনেকখানি স্মৃতি জড়ানো।—তোর সানুদিরে ভুইলা গেছস্ নাকি?

—'সানুদি'—এমনভাবে হাঁ করে চেয়ে রইল বিপিন!

—হয়। সেই সানুদিই! একটু যেন বাধল মহিলার এমন অত্যন্ত অপরিচিত হয়ে গিয়ে।

চকিতে সানুদিকে ঘিরে কতগুলো উৎসবমুখর মুখ এলো ভিড় করে। তেইশ বছরের বউ, কোমরে আঁচল, পায়ে আলতা, ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এ দালান থেকে সে দালান। পাশ কাটিয়ে কুঞ্জ চাকর কলাপাতা ঘাড়ে ছুটল ভিতরে।

—অ। এই বুঝি তোমার বড় ছেলে দিদি! বা—সোন্দর।

একটু বিরক্তই হয়েছিল বিপিন। সবে ম্যাট্রিক দিয়েছে। সে-সময় মেয়ে জাতটাকে একটা কি রকম যেন অভাবনীয় মনে হয়। মনটা হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়তে চায়। বাইশ-তেইশ বছরটা তো কিছুই নয়, অনাত্মীয় কোন মহিলাও অমনি বাবা-বাছা করলে আত্মসম্মানে বাজে।

মুখটা তাই ভোলেনি বিপিন। তবে চেহারার প্রশংসাটা ভালই লেগেছিল। তাই হয়ত বিয়ে বাড়ীর ভিড়ে লুকিয়ে যতবার দেখা সম্ভব দেখেছিল। বার কয়েক চোখাচোখি হতে মুখ টিপে হেসেছিল সানুদি।

অতএব যাওয়ার সময় সানুদির হাতে লাজুক ছেলেটির যা একখানা হ্যানস্থা হোলো। যত ঝুঁকে পড়ে বিপিন, ততই যেন নিষ্ঠুর মজায় মেতে ওঠে সানু।

—আরে দেখই না একবার। হ্যাঁ, আমি তোমাগো গুরুজন কিন্তু, আমার কাছে আবার লজ্জা!

আজ কিন্তু ভা'লো করেই চাইল বিপিন। সেই বয়সের ব্যবধানটা তো আর মনে উঠছে না। তিরিশের বেড়া ডিঙ্গোলেই, পাঁচ দশ বছরের এদিকটাতেও বেশ একটা সঙ্গীবোধ জেগে ওঠে। তিরিশের মন চল্লিশকে যত অন্তরঙ্গ করে বুঝতে পারে উনিশ আর তেইশে তা কল্পনাও করা যায় না।

হাসলো বিপিন আপন মনেই। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা। সারা জীবনে দ্বিতীয় বার মনে পড়ত কিনা সন্দেহ। যেন হাজার বছরের শীতঘুম ভেঙ্গে মাথাটা তুলল। সত্যিই কি অমনভাবে জাগিয়ে তোলার কিছু আছে মহিলার মধ্যে।

বেশ করে নাড়া দিতে পারে এমন কোনো মেয়েই তো আসেনি জীবনে। দেখেছে শুধু আহ্লাদী-গিন্নী পুতুলের দল, দুনিয়ার সম্বন্ধে নিষ্ঠুরভাবে (শিশুসুলভ?) অনবহিত, অনাগ্রহী। কেউ বা প্রাণপণ যুঝেই চলেছে যৌবনটাকে অজরামর রাখতে। নয়ত কীটের আঁকুবাঁকু বাঁচা আজ থেকে কাল। ভিড়েই হয়ত মারামারি করে উঠেছে বাসে যাতে অফিসে 'বসের' দাঁতখিচুনী আর লেটমার্ক না ঘটে ললাটে। নয়ত বয়স্কা গৃহিণী অবিশ্রাম খেটে চলেছেন চব্বিশ ঘণ্টার কাঁটায়--একটা হাতের কাজ করবার লোক রাখারও নেই সঙ্গতি।

ঠিক যেন সানুদি'র মতো। ক্লান্ত। অপরিসীম ক্লান্তিতে বেঁচে আছে কিনা সেটাও

ভাবতে চায় না।

সব কিছু কদর্য। বিশ্রী!

নাঃ। —কোনো খেদ নেই। এই শালপাতা খুঁটে বাঁচার অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে কি চমৎকার নির্লিপ্তি জমেছে বিপিনের হাড়ে হাড়ে!

ভিতরে কি একটা প্রাণপণে অট্টহাস্য করে উঠতে চাইলে। চাইলে মানুষের ঐ যে দুটি ধারা ক্রশরোডে মিলেমিশে জট পাকিয়ে যাচ্ছে তাদের মুখের ওপর কঠোর বিদ্রূপে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠতে।

কিন্তু ঠিক সময়, একেবারে সেকেণ্ড মাপা যথাসময় সামলে গেল বিপিন। আপোষ কি তাকেও শিখতে হচ্ছে না? কাদায় গেঁথে যাওয়া পা ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে আঁতাত!

সত্যি! হেঁ হেঁ, কতোদিন পরে দেখা। তা এখানে, ইয়ে মানে কোন দিকে?

একটু নিভলো সানু।—আমাগো কামকারবার তো ফুটপাতিই! নয়ত গেরস্থ ঘরে শিকলি নাড়া। বললি বিশ্বাস কইরবা না। জিনিষডা বালো কি মন্দ সেটা বলতাই হয় না। কেউ শুইনত্যাও চায় না।

—বটে,—একখানা হাই চেপে বলল বিপিন।

বিদ্রূপটা ইচ্ছে করেই ফস্কে যেতে দিল যেন সানু। আবরণ সরিয়ে নিজেকে আরো এতটুকু নিবিড় করে পাবার অবকাশ ছাড়তে নারাজ মন।

—হয়। আমাদের যে কি বিরাট একটা গল্প ফাঁদতি হয়েছে, জানো বিপিন। একখান গল্প। স্বামীর যক্ষা। চিকিচ্ছে নাই। শ্বশুর গিয়া টাকার যখ। তিনটে কাচ্চাবাচ্চা। এ বেলা ভাত দিতি পারি তো ফ্যানটা আর বেলার জইন্যা তুইলা রাখি।

কোথা থেকে জাগছে বিন্দু বিন্দু আগ্রহের শিশির।—বাঃ—চমৎকৃত হতে চায় যেন বিপিন।

—ওই কি। আরো আছে না। হয়ত ভাতার খেদায় দিছে গিয়া। কি করা, অসহায়। জ্ঞাতি কুটুমের বাড়ী পইড়্যা দিন গুইনত্যাছি। মরণও হয় না।

—অনেক গল্পের নায়িকা হয়ে পড়েছো যে সানুদি? আছো ভালো।

—ওঃ। একখানা ইতিহাস কাণ্ড। যাইও একদিন, বলবনে। ঐ যে ঢাকুরিয়ার নতুন কলোনীডা? ওনার নাম কইরো গিয়া। ছেলিরা চিইন্যা দিবেনি।

ইতিহাস!

নির্জন তিক্ত মনখানা বিপিনের হঠাৎ যেন নড়ে চড়ে ওঠে। দরজায় কার ধাক্কা পড়ছে যেন!

ইতিহাস ঘনালো নাকি কোথাও? এই দীর্ণ-জীবনের অন্ধকার ফাটলে ফাটলে? এই ফুটপাথেই প্রাণপণ বেঁচে থাকবার জীবন-লুব্ধ উল্লাসে?

...ছেলেটা এসে একেবারে হুড়মুড়িয়ে পড়ল ঘাড়ে। জড়িয়ে ধরল বিপিনের হাঁটু। বাকী কটা ঊর্ধশ্বাসে ছুটছে তখনো—ভো কাট—

সোনালী বিকেলে, খেলার ঝোঁকেই যেন ব্যাকুল দিশাহারা, ঘুড়িটা লাট খেতে খেতে চলেছে। ঠোক্কর খাচ্ছে পাঁচিলে কার্নিশে। সুতোটা জড়িয়ে যেতে চাইছে এরিয়েলের তারে। নীচে শিশু মনগুলি দিগবিদিক হারিয়ে ছুটছে, চিৎকারে ভেঙ্গে যাচ্ছে গলার স্বর।

শুধু বিপিন নয়, ফিরিওয়ালাদের অনেকেই যেন উদ্‌গ্রীব। চেয়ে আছে সানুও। খেলার নেশায় সন্তর্পণে চঞ্চল বয়স্ক মনগুলো। সত্যি! হাসলো বিপিন। খেলতে না জানলে বড়োরা কবেই আত্মহত্যা করতো।

খেলা বইকি! বউ-বসন্তী খেলায় শুরু। তারপর জীবন ভোর সব ক্লান্তি ছাপিয়ে কলরব করে ওঠে খেলাগুলো। বেঁচে থাকাটা যেন আশ্চর্য লোভনীয় মনে হয়!

মুখ তুলে চাইল বিপিন। সোনালী রোদটা তখনো নরম হয়নি, চোখে লাগছে।

আরো নীচুতে নেমে এসেছে হলদে ঘুড়িটা। ঠোক্কর খাচ্ছে সমানে। লটকে পড়ছে এখানে ওখানে। তবু সোনালী রোদে দেহটা ভাসিয়ে নেবার অদ্ভুত একরোখা যন্ত্রণাভরা এক খেলার নেশায় পাগল হয়ে গেছে ওটা।

হাসছে সানুদির শ্রান্ত চোখদুটো।

ঝুলব্যাগটা সানুদির ঘাড় থেকে নামিয়ে নিজের কাঁধে নিল বিপিন।

—আরে—আরে—

ব্যাগটা ততক্ষণে বেশ করে বগলদাবাই করেছে বিপিন।

—আর তুমি নিয়া কইরবা কি?

পোলাপানের নাগাল। তোমার কতাই কেউ শুইনব না।

ব্যাগটা পুনরুদ্ধার করতে হাত বাড়ায় সানু। খেলার দুষ্টুমি। রোদপোড়া মুখখানার খোলস ছেড়ে সুন্দর সতেজ সেই 'তেইশ' বছর বেরিয়ে আসছে।

—আঃ। বড়ো জ্বালালে তুমি সানুদি। ঐ অভ্যেসটা তোমার কি কিছুতেই যাবার নয়? যাও দেখি। ঐ বাসষ্ট্যাণ্ডটার কাছে গিয়ে দাড়িয়ে থাকো।

চারদিক তাকিয়ে একবার গলা খাঁকারি দিল বিপিন। হাঁ করে ফের মুখবন্ধ। চুক করে একটা টোঁক গেলা। পরমুহূর্তে তীব্র তীক্ষ্ণ খুশির চিল যেন বিদ্যুতের মত ডানা ঝাপটে নিল ফুটপাথের চলমান ভিড়ে।

—সরে যান—সরে—যান—সরে যান—সরে যান মহোদয়গণ।

ভিড়টা দলা পাকিয়ে গেল।

—এই—এই—এই দ্যাখেন। দেখুন আপনারা। স্নোর শিশিটা সযত্নে ফুটপাথের মাঝখানে নামিয়ে রাখল বিপিন।

—দ্যাখেন। দেখছেন? হ্যাঁ শিশি। স্নোর শিশি। আপনাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে আছে নিশ্চয়ই। উনি মাখেন স্নান সেরে, তিনি মাখেন অফিসের বেলায়— সে মাখে হামাগুড়ি দিতে শিখেই! কেমন? অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিযটি?

বিচিত্রভাবে ভ্রূ তুলে টেনে টেনে হাসতে থাকে বিপিন।

শিয়ালদাগামী মোটা ভিড়টার পায়ে পায়ে মন্থরতা। উৎকর্ণ দৃষ্টিগুলি ভেল্কিওয়ালাকে খুঁজছে। জিনিষ ছেড়ে জিনিযোত্তরের দিকেই কৌতূহল মানুষগুলোর। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ডিঙ্গি মারছে পিছনের লোকেরা।

বুকে হাতটা আড়াআড়ি। ফের শুরু করে বিপিন।

—সমবেত ভদ্রমণ্ডলীগণ। ভাত জোগাড় না হলেও তিনি কিচ্ছুটি বলবেন না, যদি স্নোটি পকেটে করে ফেরেন। আর মাত্র দশ আনা—দশ—আ—না! মহাশয়গণ—হের্ ফুয়েরার—নেবেন নাকি? তুষার-কন্যা স্নো। মখমল ক'রে দেবে ফাটা চামড়া 'ঘি' না খেলেও। একটু হাতে ঘসে দেখুন। কি, বসোরার গুল-বাগিচায় বসে আছেন না?

বসোরার লোভে ভিড়ের কারো কারো হাত এলো এগিয়ে—পকেটের কথা মনে পড়ে পিছিয়ে পড়ে কেউ। একটা বিক্রী—ভিড় পাতলা।

—চলো সানুদি, ঐ মোড়টায়। এক জায়গায় বারবার স্টেজ খাটানো ঠিক যুৎসই হবে না।

সেখানেও খসল একটা।

সাফল্যের উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে ঘামতেলে ভেজা মুখখানা বিপিনের। যেন ট্রফি জিততে চলেছে। আরো একটা—ঐ যে ঐ মোড়টা—যেখানে আরো এক মানুষের জটা রাস্তার পারাপারে।

উৎসাহের চোটে সানুদিকে প্রায় ঠেলে নিয়ে চলল বিপিন।

...ঢাকুরিয়ার প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিয়ে দিয়ে জানলায় স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকলো বিপিন। খেলা জেতার গর্বে তার তিক্ত মনখানা ভোঁ ভাঁ পলাতক। উনিশ বছরের হাসি হেসে বললে—পাঁচখানা তো খসল সানুদি। কি বলো? একবেলার পক্ষে অনেক। আবার আসো যদি এপাড়ায়, খুঁজো কিন্তু। চাকরী খুঁজতেই আসছি রোজ। দেখলেই ডেকে নিও—ট্রেণের জানলা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললে বিপিন।

জোরে ট্রেণ চলছে। জানলায় মাথা রেখে আধময়লা কাপড়টার ঘোমটা টেনে নিলেন মহিলা। চোখের তারায় উন্মনা মনখানা আরো এক নতুন গল্পের নীহারিকা হাতড়াচ্ছে কি!

পঞ্চশীলার কুলত্যাগ

শ্রীঅমিয়া সেন

‘লছমিয়া কুটীরে’ আজ ছোটখাটো রকমের একটি জমকালো সভা আছে। কুটীরস্বামী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র কুণ্ডুপ্যাটেল একটি সংস্কৃতি সম্মেলন করতে ইচ্ছুক। তাই তাঁর আমন্ত্রণে এ সম্বন্ধে পরামর্শদান করতে আসছেন নগরীর বিশিষ্টতম কতিপয় ব্যক্তি।

সভা আরম্ভ হবার এখনো আধঘণ্টাখানেক বাকি। অতিথিরা সবাই এসে পৌছননি। এই ফাঁকে, সভারম্ভের পূর্ব্বে, ‘লছমিয়া কুটীরের’ যে একটি ইতিহাস আছে, সেটি পাঠকদের জানা দরকার। নইলে এ সভার তাৎপর্য্য বুঝতে একটু অসুবিধা হবে।

‘লছমিয়া কুটীর’ হ’ল নন্দন কানন সরসিতে শ্রীযুক্ত কুণ্ডুপ্যাটেল মহাশয়ের নবনির্ম্মিত গৃহখানির নাম। ‘গৃহ’ কথাটি আমার নয়, ওটি কুণ্ডুপ্যাটেলের বিনয়। আসলে এটি একখানি ম্যানসন। বিঘা আড়াই জমির ওপর তাঁর ভাষায়, ‘একটু ভদ্রগোছের ভদ্রাসন।’ চারধারে মার্ব্বেল পাথরের প্রাচীর। তার কোল ঘেঁষে উপছে পড়ছে ফুল কুমারীদের রংবেরঙের হাসি। বাড়ীর সামনে কৃত্রিম কাঞ্চনজঙঘা। চুড়ো থেকে আঁকা-বাঁকা ভাবে অষ্টপ্রহর উৎসারিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জলপ্রপাত। সেই জল আবার পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোটখাটো পার্ব্বত্য নদীর মত। প্রবেশপথের দু’ধারে ছায়াসুশীতল ঝাউ আর বিলাতী পামের সারি। তার ওধারে ফুলের বাগান।

এই ঝাউ, পাম আর ফুল-বাগানের পিছনে কুণ্ডুপ্যাটেলের যত পয়সা খরচ হয়েছে, সারা বাড়ীতে তত লেগেছে কিনা সন্দেহ। কারণ, চার-ডবল রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি একটা বাড়ী ফিনিশ করা যায়, গাছের চারাকে তত তাড়াতাড়ি বড় করা যায় না। তাই কুণ্ডুপ্যাটেল মহাশয়কে সারা পশ্চিমী দুনিয়া ঝেঁটিয়ে বৃক্ষ-বিশেষজ্ঞ আমদানি করতে হয়েছে। তাঁরা এসে ইঞ্জেকসনের পর ইঞ্জেকসন দিয়ে দিয়ে গাছগুলিকে তড়িৎঘড়িত যৌবনবতী করে তুলেছেন।

নন্দন কাননের কোন নন্দনের বাড়ী গৃহপ্রবেশ উৎসবে এসে অতিথিরা যদি পথের দু’ধারে সাজানো বাগান আর যত্নপালিত-লালিত কুসুমের নীরব অভ্যর্থনা না পান, তবে উৎসবের বারো আনা মাহাত্ম্যই, কুণ্ডুপ্যাটেলের মতে, ডুবুডুবু প্রায়।

তা ছাড়া নন্দন কানন সরসিতে কুটীর খাড়া করা বড় সামান্য কথা নয়। কুণ্ডুপ্যাটেলের বহুকালের সখ এই সরসির একজন হওয়া। ব্যাপারী সমাজে সম্মানের কল্কে পেতে হলে এ ছাড়া যে কোন উপায় নেই, তা তিনি কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য ততখানি ছিল না। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা হলেন ব্যাপারীকুলের শের। এই সব ভাটিয়া ভুটিয়া মহাজনদের কারুর ভুঁড়িতে একটু টোল পড়লে তাবৎ ভারতবর্ষ বাসুকির মাথায় পৃথিবীর মত থর্থরিয়ে কেঁপে ওঠে। এঁদের মান-সম্মান-প্রতাপ সারা দুনিয়া জুড়ে।

বাইরের লোকদের এই সরসিতে ঢুকতে হলে, গেটপাশ দেখিয়ে, দু’ধারে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে ঢুকতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে কুণ্ডুপ্যাটেলকে প্রায়ই আসতে হ’ত

এখানে। সেবার কি হ'ল, লছমিয়া দেবী বায়না ধরে বসলেন, "শুনছি ওখানে গেলে নাকি এ জীবনেই স্বর্গ-দর্শন হয়ে যায়, আমাকে নিয়ে চল, আমি যাব।"

কুণ্ডুপ্যাটেল অনেক বোঝালেন, কিন্তু দেবী একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনিও ত কেউকেটা নন, লাখপতি বিজনেসম্যানের মেয়ে, স্বামীও ডান হাতে বাঁ হাতে অনবরত লাখ লাখ টাকা ঢালছেন, ছুঁড়ছেন, সিন্দুকে পুরছেন দেখতে পান, তবে?

বেকায়দায় পড়ে গেলেন অক্ষয়মশায়। বুঝতে পারলেন স্ত্রীর কাছে মান-মর্য্যাদা আর রইল না। দুর্গা নাম জপতে জপতে রওনা হলেন সস্ত্রীক।

গেটপাশ, সেলাম বাজানো সবই দেখলেন লছমিয়া দেবী। কিন্তু ষোল-কলা পূর্ণ হলো যখন শেঠ বিশ্বম্ভর ভাটিয়ার গেটের গোড়ায় দারোয়ানের পাশে তাঁকে বসিয়ে কুণ্ডুপ্যাটেল ভিতরে গেলেন শেঠজীর সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। ওড়নায় মুখ ঢেকে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন কুণ্ডুপ্যাটেল-গিন্নী। দারোয়ানজী খৈনি টেপা বন্ধ করে, নিজের দাড়ির গোছা চেপে ধরে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করলে, "ক্যা বাত হ্যায়, অরে রোতী কেঁও? রোনা মৎ মাঈজী, নন্দন কানন কী তো এহী আদত হ্যায়। ছোটা ব্যপারী লোগোকী ঔরতে অন্দর নহী ঘাস পাতী, শেঠজী লোগ নারাজ হোতী হ্যায়। কই বেকুব বিনা সোচ সমঝ ঘুস ভী জায় তো বড়ী মুসীবৎ প্যায়দা হো জাতী হ্যায়। সারা সকাল গোউ কা গোবর সে ঘোসা পড়তা। ইস্‌কা নাম হ্যায় নন্দন কানন..."

বাড়ী ফিরে লছমিয়া দেবী একেবারে যাচ্ছেতাই করলেন স্বামীকে। নেহাৎ বঙ্গ-সন্তান, তাই মুখ বুজে সহ্য করলেন কুণ্ডুপ্যাটেল। জাতকুলীন হলে সেদিন কি ঘটত, বলা যায় না। তা নয়, গৃহদেবতা হনুমানজীর সামনে তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন লছমিয়া দেবী, ঐ নন্দন কাননের বাসিন্দে হয়ে এই অপমানের শোধ তুলতে হবে কুণ্ডুপ্যাটেলকে।

মনে বড়ই দাগা পেলেন কুণ্ডুপ্যাটেল। আবুহোসেনের মত হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেন দেখতে পেলেন, তিনি রাজাও নন, বাদশাও নন, মাত্র ছেঁড়া কাঁথার মালিক। তবে আবুহোসেনের মত বেকুব বা আলসে তিনি ছিলেন না। উঠে পড়ে লাগলেন। প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের কাছে শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হলো গণেশজীকে। গুটি গুটি এসে ধরা দিলেন। উনিশ শো পঁচাত্তরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো ১৯৮৫-তে। নন্দন কানন সরসির রেজিষ্টারে প্লাটিনামের হরফে জ্বল জ্বল করে উঠলো একটি নূতন নাম, "শিরি অক্ষোয় চোন্দ্র কুন্ডুপ্যাটেল।"

কয়েকদিন আগে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে বিস্তর ধূমধাড়াক্কা হয়ে গেছে। লণ্ডনের ব্যাণ্ডপার্টি, রাশিয়ার কন্‌সার্ট, আফ্রিকার সার্কাস, ফ্রান্সের অপেরা—এ সব ছাড়া চায়নার মুখোস-নৃত্য ত ছিলই। লোকে ধন্য ধন্য করেছে। এতটা আবার কেউ কল্পনা করতে পারে নি। সত্যিকথা বলতে গেলে আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে তিনি প্রায় সব শেঠজীদের ছাড়িয়ে গেছেন। ছাড়াবেন না-ই বা কেন, যে মাটি ধরে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেই মাটির সঙ্গে এই তাঁর শেষ কারবার। এবার থেকে আর নগরীর রাজপথে নয়, তাঁর মোটর

সন্ সন্ করে ছুটবে ঝুলন্ত হাওয়াই পথ দিয়ে। নন্দন কাননের বাসিন্দারা কেউ মাটিতে চলাফেরা করেন না, তাই এটি তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। সারা ভারতের আকাশ আর মাটির মাঝামাঝি শূন্য দেশে তাঁদের জন্য তৈরী হয়েছে অসংখ্য হাওয়াই রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে শেঠজীরা যখন মোটর হাঁকিয়ে যাবেন, তখন কোন এরোপ্লেনেরও এক্তিয়ার নেই সেই মোটরের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া। হোক্ না প্লেনের আরোহী কোন মহামান্য ব্যক্তি। একবার কঙ্গু-চেঙ্গুর প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসার সময়ে না জেনে এই রকম একটা ভুল করে ফেলেছিলেন, এজন্য আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁকে পকেট খালি করে মানহানির খেসারত দিতে হয়েছিল।

এ থেকেই বোঝা যাবে নন্দন কাননের আভিজাত্য কি বস্তু। সুতরাং কুণ্ডুপ্যাটেলের সোল্লাস অর্থ ব্যয়ের কারণ খুব স্পষ্ট।

গৃহ-প্রবেশ পর্ব্বের পর এই তাঁর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, স্বদেশী সংস্কৃতি সম্মেলন।

এক এক করে এলেন সবাই! সরকারী বড়কর্ত্তা তারিণীতারণ চৌধুরী, হেড অব দি পুলিস মিষ্টার করঞ্জাক্ষ, মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে শ্রীযুক্ত বিপদভঞ্জন ভড়, সংস্কৃতি সাহিত্য আকাদেমীর সভাপতি রামদুলার চোবে, এ ছাড়া চারটে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার প্রধান, কল্যাণগঞ্জ—শ্রীযুক্ত শশধর পট্টনায়েক, চেংড়াপুর—শ্রীযুক্ত হংসবাহন তরফদার, গোবরহাটি—শ্রীযুক্ত কমলদলন বর্ম্মা, পুরাণ বাজার, শ্রীযুক্ত রুদ্রাক্ষ সান্যাল।

অতিথিরা আসন গ্রহণ করলে অক্ষয়চন্দ্র চা লেমনেড ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের প্রাথমিক সৎকার সমাধা করলেন। তারপর নিয়মমাফিক বললেন, "আমি প্রস্তাব করছি, শ্রীযুক্ত রামদুলার চোবে মশায় এই সভার সভাপতি হয়ে আমাদের ধন্য করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার করঞ্জাক্ষ মুখ থেকে লেমনেডের গেলাস নামিয়ে, বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা সামলাতে সামলাতে বলে উঠলেন, "আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।"

বৃহত্তম কলকাতার ওয়াটার সাপ্লাই অধিকর্ত্তা বিপদভঞ্জন ভড়ের বারোমাস বরফ-চা খাওয়ার অভ্যেস। স্রেফ মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জন্য। কারণ, স্বাধীনতার আদিপর্ব্বে কলকাতায় যা জনসংখ্যা ছিল, তার জল যোগাতেই নাকি কর্পোরেশন হিমসিম খেয়ে যেত, আর এখন ভড় মশায় সেই একই ট্যাঙ্কের সাহায্যে তার চেয়ে বিশগুণ বেশী লোকের জলীয় প্রয়োজনের ধাক্কা সামলাচ্ছেন।

সোঁৎ করে এক চুমুক চায়ের সঙ্গে আস্ত একখানা বরফ গালে পুরে যতটা সম্ভব একগাল হেসে বললেন, "সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার যোগ্যতা চোবে মশায়ের চেয়ে আর কার বেশী আছে? ওঁর বিশটা চালের আড়ত, পঞ্চাশটি সর্ষের গোলা আর কাপড়ের গুদাম হচ্ছে গিয়ে—"

কমলদলন বর্ম্মা বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু ভড় মশায়, এটা সংস্কৃতি সম্মেলন নয়, সে সম্বন্ধে এক্সিকিউটিব বডি তৈরি করবার—

রুদ্রাক্ষ সান্যালের সন্ধ্যের সময় একটু মৌতাত করার অভ্যেস।

অরেঞ্জ কোয়াসের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তিনি মুখের কাছে তুলবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ঝিমুনির জন্য পেরে উঠছিলেন না। কানের কাছে বিরামহীন ভাবে ধ্বনিত হচ্ছিল রম্ভা ষোড়শী ইত্যাদি স্বর্গীয় অপ্সরীদের নূপুর নিক্কণ।

বর্ম্মার প্রতিবাদের স্বরে চম্‌কে উঠে দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল অপ্সরীরা।

রুদ্রাক্ষ রক্তিম চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন, রম্ভাও নয়, ষোড়শীও নয়, অক্ষয়চন্দ্রের বিরাট হলঘরে রেডিও গ্রামে শান্তিনিকেতনের ভারত-নাট্যম্ নাচ হচ্ছিল।

মনটি খিঁচিয়ে গেল। সরবতের গ্লাসটা টেবিলের ওপর ঠুকে বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, "আমরা যদিও স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু সভ্য হয়েছি কি না সেটি এখনো বিবেচনা সাপেক্ষ।"

হংসবাহন তরফদার এই যূথের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক্ কাণ্ড ঘটাবার জন্য অনেক মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় এই দরিদ্র বিশ্ববিদ্যালয়-অধিকর্ত্তার পদ বরণ করেছেন। দেশ এবং দেশবাসী সম্বন্ধে তাঁর আশা অনেক। গরম হয়ে বললেন, "এ কথা বলার মানে?"

শশধর পট্টনায়েক ধীর বুদ্ধি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি কেবল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্ত্তাই নন, একজন অপ্রকাশিত সাহিত্যিকও। যৌবনে তিনি একখানা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন, লিখতে লিখতে এখন পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছেছেন। তিনি আশা করেন, আর দু'চার বছরের মধ্যেই তাঁর দীর্ঘ দিনের সাধনা সমাপ্ত হবে, এবং সমাপ্ত হলে ঈশ্বর যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, অর্থাৎ নন্দন কাননের জনৈক কুবেরের আমন্ত্রণ লাভের মত অলৌকিক ঘটনা যখন জীবনে সম্ভব হয়েছে, তখন একে ধরে বইখানি নোবেল কমিটিতে পেশ করবেন।

কুণ্ডুপ্যাটেলের আমন্ত্রণ পাওয়া থেকে মনে মনে এইসব কল্পনাই তিনি করেছিলেন। এখন সান্যাল-তরফদারের কাণ্ড দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। মনে মনে এই শিক্ষিত হস্তীমূর্খদের মুণ্ডপাত করতে করতে প্রকাশ্যে কোমল কণ্ঠে মোলায়েম হেসে বললেন, "ডিয়ার ব্রাদারস্, এ আপনারা করছেন কি! ভুলে যাবেন না আপনারা কার বাড়ীতে কি উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন। মিষ্টার কুণ্ডুপ্যাটেলের অমূল্য সময় এই ভাবে ধ্বংস করা কি আমাদের উচিত?"

কথাগুলিতে কাজ হলো। অতিথিদের প্রত্যেকেরই যুগপৎ খেয়াল হ'লো, এটা রাইটার্স বিল্ডিং, কর্পোরেশন হল, লালবাজার থানা বা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নয়, তার চেয়েও মহৎ, বৃহৎ এবং সুদৃঢ় এক শেঠ ভবন।

মিষ্টার করঞ্জাক্ষ হেঁ হেঁ করে খানিক হেসে বললেন, ঠিক ঠিক। আচ্ছা আসুন, আমরা এখন খস্‌ড়াটা করে ফেলি।

কুণ্ডুপ্যাটেলজী বললেন, হ্যাঁ, খসড়াটা আপনারাই করবেন, তবে তার আগে আমার দু'চারটি কথা বলবার আছে।

—"বলুন, বলুন" একসঙ্গে আট জোড়া চোখ কুণ্ডুপ্যাটেলের মুখের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কুণ্ডুপ্যাটেল বললেন, "দেখুন, বাংলা দেশের জলমাটির সঙ্গে এতদিন আমার কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। ঠাকুরদা চাকরি করতে আমেদাবাদ গিয়ে হয়ে গেলেন ব্যবসায়ী। তার পর ওখানকার পাকাপাকি বাসিন্দা। ছেলের বিয়ে দিলেন গুজরাটি ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে। সেই ছেলের ছেলে আমি। আমার স্ত্রী হলেন নির্ভেজাল কুলীন গুজরাটীর মেয়ে। আমেদাবাদে খুব ভালোই ছিলাম। কিছুর কমতি ছিল না আমার। তবু যে কলকাতায় এলাম তার কারণ শুধু নাড়ীর টান। বাঙালী মাত্রই আমার প্রিয়। নন্দন কাননের বাসিন্দে বলে আপনারা যে ভাববেন আমি নিজেকে সবার থেকে পৃথক মনে করি—"

চারদিক থেকে একটি প্রতিবাদের ঐকতান উঠল, "না—না, সে কি—"

স্মিত হেসে কুণ্ডুপ্যাটেল বলে চললেন, "বিয়ের পর শ্বশুর বললেন, 'অক্ষয়, তুমহারা ও সারনেম ছোড়নে পড়ে গা। প্লুটোক্রেসীকে কানুনমে বাঙালী সারনেম গস্কুগসপুন্দ্ববন্ধন্দ্ব. তুম হমারা সারনেম লে লো।"

অত বড় মানী লোক, ইণ্টার ন্যাশনাল ব্যাপারী, তাঁর কথা ত ঠেলতে পারি নে। কি করি, ছাড়লুম। কিন্তু দেখুন বাংলা দেশে এসেই আমি সেটিকে আবার নামের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছি। অবশ্য শ্বশুরের পারমিশন নিয়েছি। তিনি কেবল মানী নন, জ্ঞানীও। লিখলেন, "য্যাসা দেশ এ্যাসা ভেস, তুমহারা কর্ম্ম যোগ মে সুবিস্তা হোগা তো জরুর বাপ দাদা কা সারনেম ভী প্যাটেল কে সাথ জোড় লো।"

—"অতি বিচক্ষণ লোক—অতি বিচক্ষণ লোক—" চার দিক থেকে সাধুবাদ।

—"তবেই দেখুন, আমি বাঙালীদের কি রকম ভালোবাসি। আপনারা যে কলাশিল্পীদের নামের লিষ্ট করবেন তার মধ্যে কেবল প্রথিতযশা শিল্পীরাই নন, আমার ইচ্ছে, চুনো-পুঁটি কেউ যেন বাদ না পড়ে।"

অতিথিরা আর একবার সাধুবাদ দেবার উদ্যোগ করছিলেন, হল ঘরের ভিতরের দিকের পর্দ্দা নড়ে ওঠায় বাধা পড়ল। ব্যগ্র কৌতূহলে সবাই চেয়ে দেখেন, লছমিয়া কুটীরের ভৃত্য-প্রধান আকন্দরাম ঘরে ঢুকলো। পিছনে নানাবিধ খাবারের প্লেট পূর্ণ হাতে গুটি তিনেক বালক ভৃত্য। সবার পিছনে এক রূপসী, তন্বী তরুণী।

ট্রেগুলি যথা স্থানে ন্যস্ত হলো। ভৃত্যের দল অন্তর্দ্ধান করলো। পানীয় পরিবেশন করবার জন্য তরুণী টেবিলের এক ধারে একটি সোফায় উপবিষ্ট হলো।

কুণ্ডপ্যাটেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আমার একমাত্র কন্যা বলুন, পুত্র বলুন এই কুমারী পঞ্চশীলা। গ্লাসগো ইউনিভারসিটি থেকে তর্কশাস্ত্রে এম্-এ পাশ করে এসে এখন এখানে ডাক্তার মবলঙ্করের আণ্ডারে গবেষণা করছে। গবেষণাটি যেন কিসের ওপর মা পঞ্চু?"

পঞ্চু কেটলী থেকে টিপটের ভিতর গরম জল ঢালছিল। সংক্ষেপে জবাব দিল, রবীন্দ্রনাথের "ছেলেটা।"

হংসবাহন একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "আপনাকে নমস্কার করব কি মিস কুণ্ডুপ্যাটেল, প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। উঃ, কি কঠিন বিষয়ই না আপনি রিসার্চের জন্য চুজ করেছেন। এ সাহস আজ পর্য্যন্ত কারুর হয়নি।"

পঞ্চশীলা বেজার মুখে বললে, "এত বড় নাম-করা লোক, এত লেখা। কিন্তু পড়ে দেখলাম সবই যেন কেমন পান্‌সে পান্‌সে। ঐ 'ছেলেটীর' মধ্যেই যা একটু এ্যাডভেঞ্চারের স্পিরিট পাওয়া গেল।"

পট্টনায়েক নিমীলিত চোখে খাবারের ট্রেগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "লক্ষ্মী সরস্বতী দুই-ই কুণ্ডুপ্যাটেল মশায়ের ঘরে এসে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। মা লক্ষ্মী তোমাকে তুমি বলছি, কিছু মনে কোরো না—"

পঞ্চশীলা তাঁর দিকে এক নজর তাকিয়ে সংক্ষেপে বললে, "আপনি বয়সে আমার পাপার চেয়ে বড়ো, বলবেন বৈকি!"

—"হ্যাঁ তাই। বলছিলাম কি, তোমার রিসার্চের বিষয় অতি দুরূহ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি চমৎকৃত হচ্ছি কুণ্ডুপ্যাটেল মশাইয়ের বাংলা বুলি শুনে, এত সুন্দর সুস্থ ভাষা আর উচ্চারণ, কে বলবে উনি জন্মাবধি বাংলার বাইরে মানুষ।"

কুণ্ডুপ্যাটেল হেসে বললেন, "কলকাতায় এসে শিখেছি। ঐ যে আমার শ্বশুর লিখে ছিলেন না, য্যাসা দেশ এ্যাসা ভেস, বড় মূল্যবান কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমি আমার এ সংস্কৃতি-সম্মেলনকে নিছক শো হিসেবে খাড়া করতে চাইনে। আমি চাই, খ্যাত অখ্যাত সবাই একত্র হয়ে এখানে এসে মন খুলে হৃদয় বিনিময় করুক। দেশের লোকের অন্তরের স্পর্শ পেয়ে আমিও ধন্য হই।"

পঞ্চশীলা প্লেটে প্লেটে চামচ দিয়ে খাবার তুলছিল। বললে, "তুমি ধন্য হও বা না হও, তারা অন্ততঃপক্ষে এক পেয়ালা চা পেলেও ধন্য হবে। পুওর ফেলোরা চায়ের স্বাদ প্রায় ভুলেই গেছে। রং-করা কাঠের গুঁড়োর পাউণ্ডও ত এখন দশ টাকার কম মেলে না।"

বিদুষী পঞ্চশীলা লেখাপড়া ছাড়া আরও একটি কাজ করে থাকে। কার্লমার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ ও হিটলারের নাজীবাদ—দুইয়ের সংমিশ্রণে একটি নতুন ইজম সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট পার্টি সংগঠন করেছে। সে-ই এ পার্টির নেত্রী। পুওর ফেলোদের প্রতি তার ভালবাসা ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তারিণীতারণ চৌধুরী বৃদ্ধ ব্যক্তি। ইংরেজ, কংগ্রেস দুইয়ের সম্বন্ধেই তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। টাকায় এক মণ চালের যুগে জন্মে এখন একের পিঠে দুই শূন্য দামের চাল খাচ্ছেন। (অবশ্য পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঢাকায় চালের দাম একশো কুড়ি টাকা অবধি উঠেছিল। তবে সেটা ছিল আকস্মিক সঙ্কটকাল। আমি নরম্যাল টাইমের কথা বলছি।)

অভিজ্ঞতা প্রচুর বলে তাঁর মুখে শব্দ নিঃসরণ হয় কম। এসে অবধি চুপ করেই বসে ছিলেন। এখন পঞ্চশীলার মুখে কাঠের গুঁড়োর দাম শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কোমল হেসে বললেন, "মা লক্ষ্মী, জিনিসের দাম বাড়াটা কিসের সাক্ষ্য দেয়?"

করঞ্জাক্ষ ঝটিতি বলে উঠলেন, "হাই লিভিং ষ্টাণ্ডার্ডের।"

এতক্ষণ পরে কুমারী পঞ্চশীলার চারুমুখে অশনিপ্রভাবৎ এক ঝিলিক হাসি ঝিল্‌মিলিয়ে উঠলো। করঞ্জাক্ষকে অগ্রাহ্য করে চৌধুরীর দিকে চেয়ে বিনীত হেসে জিজ্ঞেস করলে, "জ্যাঠামণি, মনুমেণ্টের গোড়ায় রোজ সন্ধ্যায় ডাষ্টবিন কারগুলো গিয়ে জমা হয় কি জন্য?"

এবারো উত্তর দিলেন করঞ্জাক্ষ—"জানেন না বুঝি? মড়া তুলবার জন্য, স্রেফ মড়া তুলবার জন্য। দেশপ্রেমিকের মুখোস-পরা একদল লোফার ময়দানটাকে করে তুলেছে যেন হাইড পার্ক। ভাগাড়ে শকুনের মত দেশের সর্ব্বত্র নিটোল শান্তি ত ওদের সহ্য হয় না, তাই দু'দশ জন লোক জড়ো করে মনুমেণ্টের গোড়ায় গিয়ে খামোকা সরকারকে গালাগাল দেবে আর 'অন্ধকার—অন্ধকার'—বলে পরিত্রাহি চেঁচাবে। লোকগুলোও এমনি বোকা তাই শুনে হিটেড হয়ে টপাটপ মনুমেণ্টের চুড়োয় উঠবে আর ঝপাঝপ লাফ দেবে। যেন মরাটাই বাঁচার মস্ত বড় উপায়।"

নিজের রসিকতায় নিজেই খানিক খি-খি করে হাসলেন করঞ্জাক্ষ।

বিপদভঞ্জন ভড় শিরঃসঞ্চালন করে বললেন—"হাসির কথা নয়। প্রসেসন, সত্যাগ্রহ, আন্দোলন—এ সবের মত অর্ডিন্যান্স জারী করে সরকারের উচিত ঐ হাইড পার্কের আপদও দূর করে দেওয়া। কিন্তু তা ত সরকার করবেন না। গণতন্ত্রের গায়ে আঁচড়টি লাগতে পারবে না এ দেশে। সাধে কি আর বিদেশীরা একে বলে রামরাজ্য।"

রুদ্রাক্ষ সান্যালের ধাতটাই বিরক্ত বিরক্ত।

বলে উঠলেন, "নিকুচি করেছে রামরাজ্যের। সব কিছু ব্যাস করেছেন আর গাছে চড়াটা ব্যাস করতে পারছেন না? রাস্তা দিয়ে হাঁটবার জো নেই, গাছের ডালে ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে বেটা-বেটিরা। মড়ার লাথি খেতে খেতে রাস্তা হাঁটো। ছ্যাঃ"

বিদুষী পঞ্চশীলা খুকু খুকু মুখ করে বললে, "তা সেজন্য রাগ করার কি আছে কাকামণি? ওটা ত হাই লিভিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডেরই ফল। মরবার জন্যও লোকে দৌড়ুচ্ছে মনুমেণ্টের মাথায় নয় ত গাছের মগডালে।"

তারিণীতারণ মাঝে মাঝে কানে কম শোনেন। বয়স ত হয়েছে। এ সব কিছুই শুনতে পেলেন না। বললেন, "উনিশ শো সাতচল্লিশে সরকার যখন দেশের ভার নিলে, কি ছিল অবস্থা? আর আজ, উনিশ শো পঁচাশীতে চেয়ে দেখ, রাস্তায় একটা ভিখিরী নেই, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নামে কোন দপ্তরের অস্তিত্বই নেই।"

পঞ্চশীলা হেসে বললে, "সে কথাই বলছিলেন আমাদের পার্টির সেক্রেটারী ওল্ড ফেলো পিনাকীরাম। কি কাণ্ডই না হ'ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের আমলে। একবার কি করে যেন বাইরের গোটা দুই ছোকরা ঢুকে পড়েছিল চাকরিতে, কাউন্সিলে তাই নিয়ে হাতাহাতি-ফাটাফাটি। তা জ্যাঠামণি, তার পর থেকেই বুঝি তুলে দেওয়া হ'ল ঐ দপ্তরটা?"

করঞ্জাক্ষের গলায় রসমালাই আটকে গিয়ে বিষম খেলেন, পট্টনায়েক উপন্যাসখানির পরিণাম চিন্তা করে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, "মা পঞ্চু, শিক্ষার অগ্রগতিটা

একবার দেখ, নাইন্টিন সিক্সটি সেভেন টু নাইন্টিন এইট্টি ফাইভ, কম্পেয়ার কর। একটা জমাদার, ঝাড়ুদারও তুমি এখন নন্-গ্রাজুয়েট পাবে না। রুরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদির মিস্ত্রি মজুরগুলো পর্য্যন্ত সায়েন্স স্কলার—"

—"পুওর ফেলোরা ও ছাড়া চাকরিই পায় না, তা ছাড়া ওরা বোধ হয় রামধুনও গাইতে পারে না—"

আহ্লাদী শেঠনন্দিনীর জ্যাঠামিতে ক্রমশঃ ফায়ার হয়ে উঠছিলেন তারিণীতারণ, এবার বার্ষ্ট হতে হতে অনেক কষ্টে সেটাকে ছাদফাটানো হাসিতে পরিবর্ত্তিত করে ফেললেন। বাকীরা ভরামুখে যথাসাধ্য তাতে যোগ দিলেন।

হংসবাহন কোঁৎ করে মুখের ভীমনাগটি গলাধঃকরণ করে সোচ্ছ্বাসে বললেন, "মিস্ কুণ্ডুপ্যাটেলের কথা ত নয়, যেন কাব্য। হিউমারের মধ্যেও বাজে ছন্দের জলতরঙ্গ"—

পট্টনায়েক বললেন, "আর স্মরণশক্তি? সেই যে দু'বছর আগে ত্রক বাঙালী সাইন্টিষ্ট বৈরিগী সেজে রামধুন গাইতে গাইতে দিব্যি বর্ডার পার হয়ে চায়নায় পালিয়ে গেল, মা লক্ষ্মী তা এ্যাগ্জ্যাক্টলি মনে করে রেখেছেন। শুনেছি সে বেটা নাকি সেখানে একটা চীনা মেয়ে বিয়ে করে সরকারী সিক্রেট গবেষণাগারে বসে রাতদিন খালি নতুন নতুন বোমার ফরমুলাই বানিয়ে দিচ্ছে। খুব খাতিরযত্ন পাচ্ছে।"

তারিণীতারণের তোবড়ানো গাল বিরক্তিতে কুঁচকে গেল। ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, "ও কুলাঙ্গারের কথা আর বোল না। ব্লাণ্ট ইনষ্টিটিউটে কেরাণীর কাজ করত। তা ছেড়ে চায়নায় গেল বোমা বানাতে। এর চেয়ে"—

—"আত্মহত্যা করাও ভালো ছিল।"

পাদপূরণ করে পঞ্চশীলা রিষ্টওয়াচের দিকে তাকালে, তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলো। নমস্কারের ভঙ্গিতে দু' হাতের দুটি আঙ্গুল একত্র করে বললে, "জ্যাঠামণি, কাকামণিরা আমার একটা মিটিং লীড করতে হবে সাড়ে সাতটায়। সওয়া সাত বাজে। আমি চললাম, সংস্কৃতি সম্মেলনে আবার দেখা হবে।"

নাচের তালে পা ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

কুণ্ডুপ্যাটেল এতক্ষণ হাস্যমুখে অতিথি-দুহিতা যুদ্ধপর্ব্ব এনজয় করছিলেন। এখন বিগলিত স্নেহে বললেন, "পঞ্চুকে বলেছিলাম ব্যারিষ্টারী পড়। কিন্তু পুওর ফেলো, পুওর ফেলো করেই আমার এই মা-টি অস্থির। বড্ড দয়ার শরীর।"

পৌনে ন'টায় মিটিং শেষ করে কুণ্ডুপ্যাটেল অন্দরে এলেন। খুব খুশী খুশী মুড। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে বিদেশী শিল্প-সংস্কৃতির মেলা বসিয়ে দিয়েছিলেন। এবার স্বদেশী। নন্দন কাননের তাবৎ নন্দনদের ত্রিলোকপূজ্য হতে যে সময়টা লেগেছে, তার চেয়ে ঢের কম সময়ে তিনি জাতে উঠবেন। চাই কি, অদূর ভবিষ্যতে এই সরসির প্রধান পাত্থপাদপ হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

অন্যমনস্ক কুণ্ডুপ্যাটেল ঠিক পান নি লিফ্টটা কখন তাঁকে লছমিয়া দেবীর ঘরের সামনে এনে ছেড়ে দিয়েছে। একটা কাতর বিলাপের শব্দে তাঁর চমক ভাঙল। ঘরে ঢুকে

দেখেন, লছমিয়া দেবী হাতীর দাঁতের পালঙ্কে বপু এলিয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে আছেন। মুখ থেকে অবিরত নির্গত হচ্ছে, "উঃ-আঃ, জ্বলে গেল রে—জ্বলে গেল" ইত্যাদি ধ্বনি।

দেবীর খাস দাসী রামপ্যারী তাঁর পায়ে সন্তর্পণে চন্দনকাঠের পাখা দিয়ে মৃদু মৃদু হাওয়া দিচ্ছে।

পায়ের কাছে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে লছমিয়া দেবীর সান্ধ্যকালীন পায়ে তেলমালিশ করার ঝি বিনীতা চ্যাটার্জ্জী।

কুণ্ডুপ্যাটেল উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "এ্যাঁ, ব্যাপার কি? কি হলো?"

উত্তরে লছমিয়া দেবীর কাতরোক্তি ছাদের কড়িবরগা ছুঁই ছুঁই হলো।

রামপ্যারী জানাল, বিনীতা চ্যাটার্জ্জী গরম তেল উপযুক্ত রকম ঠাণ্ডা না করেই মাঈজীর পায়ে ঢেলে দিয়েছে। তাইতে মাঈজীর পা জ্বালা করছে।

মুডটাই খারাপ হয়ে গেল কুণ্ডুপ্যাটেলের। বিনীতার দিকে চেয়ে ধমকের সুরে বললেন, "এ্যাঁ, কিরকম মেয়ে তুমি, পড়াশুনা কি অশ্বডিম্ব নাকি?"

বিনীতা কেঁপে উঠে কাঁদো কাঁদো সুরে বললে, "আজ্ঞে ডোমেষ্টিক সায়েন্স নিয়ে এম.এস-সি. পড়েছিলাম।"

—"পড়ে তো ছিলে, বলি পাশ করেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাতে পায়ে তেলমালিশ করার কোর্স ছিল?"

—"আজ্ঞে ছিল।"

—"তবে পা পোড়ে কি করে?" প্রচণ্ড ধমক দিলেন কুণ্ডুপ্যাটেল।

এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললে বিনীতা চ্যাটার্জ্জী। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "আজ্ঞে ছেলেটিকে রোজ বস্তিতে একলা রেখে আসি। পাশের বাড়ীর দুটো বড় বড় ছেলে আমি বেরিয়ে এলেই ওকে মারধর করে। কাল পাথর মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে, আজ তাই কিছুতেই একলা থাকতে চাইলে না, নিয়ে এলাম। ওরই জন্য—"

—ছেলে? তাজ্জব হলেন কুণ্ডুপ্যাটেল, বলে কি! একশো টাকা মাইনের পায়ে তেলমালিশ করার ঝি, তারও আবার পুত্রসাধ?

ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন, ঘরের মধ্যে কোথাও ছেলের টিকি দেখা গেল না। বললেন, "কোথায় সে ছেলে?"

—"আজ্ঞে ঐ যে পেছনের বারান্দার এক কোণে বসে আছে।"

লছমিয়া দেবী পাখী পুষতে ভালোবাসেন। পেছনের বারান্দায় ময়না, টিয়া, হরবোলা আদি হরেকরকম পাখীর খাঁচা ঝুলছে। একপাশে একটি রূপোর কাজ করা পাথরের পিলারের ওপর একটা কাকাতুয়াও রয়েছে। এই পাখীরা রোজ সকালে রামধুন গেয়ে লছমিয়া দেবীর ঘুম ভাঙায়।

সন্ধ্যার সময়ে 'জয় জগদীশ হরে' বলে এরা দশাবতার স্তোত্র গীত করে। হাতীর দাঁতের পালঙ্কে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে লছমিয়া দেবী পায়ে তৈল মর্দ্দন করান।

কুণ্ডুপ্যাটেল দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, বারান্দার এক কোণে একটা হাড় জিরজিরে বছর পাঁচেকের ছেলে মুখে আঙ্গুল পুরে হাঁ করে পাখীগুলোর দিকে—না, পাখীগুলোর দিকে নয়, পাখীদের খাবারের প্লেটের দিকে চেয়ে আছে। ওর মুখের আঙ্গুল বেয়ে টপ টপ করে লালা ঝরছে।

কিছুই বোধগম্য হলো না কুণ্ডুপ্যাটেলের। ফিরে এসে বললেন, "ও ত বসে পাখী দেখছে, তবে?"

এবার মুচকে হেসে উত্তর দিলে রামপ্যারী, "জী, ও চিড়িয়া নহী দেখতা। চিড়িয়া কে ডিনার পরহী উসকী আঁখে জম গয়ী। বৃজলাল উসটাইম চিড়িয়াকী খানা লগা রহা থা ঔর উস লড়কা বার বার হিঁয়া আকর মাসে পুছ রহা থা এ ক্যা হ্যায়—ও ক্যা হ্যায়, বস উসী ফিকর মে হী তো অচানক গরম তেল—"

—"এটা কি ওটা কি মানে? ও কখনো পাখী দেখেনি?"

লছমিয়া দেবী এতক্ষণে ককিয়ে উঠলেন, "পাখী কেন দেখবে না, যত সব হাড়হাবাতে—ও নাকি কখনো আপেল আঙ্গুর কলা পাঁউরুটি বিস্কুট এসব চোখে দেখেনি, ওই সব দেখেই—"

—ন্যাষ্টি, কুণ্ডুপ্যাটেল এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ সব হাবাতে বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে আসা কেন? দু'দিন পরে আমার বাড়ীতে এত বড় একটা কাজ আর এখন এই বিপদ।"

—"কি হয়েছে পাপা"? নাচতে নাচকে কুমারী পঞ্চশীলা এসে ঘরে ঢুকলো।

—"এই দেখ না, বি, সি, চ্যাটার্জ্জী গরম তেল ফেলে তোমার মামির পা পুড়িয়ে দিয়েছে।"

—"কই দেখি", পঞ্চশীলা এগিয়ে গিয়ে মায়ের মেদমন্থর শ্রীচরণখানি ভালো করে নিরীক্ষণ করলে, হেসে বললে, 'ষ্ট্রেঞ্জ! এই চর্ব্বির পাহাড় ভেদ করে তেলের উত্তাপ তোমার শরীরে পৌছল কি করে মামি?"

—"নে-নে, তুই আর জ্বালাস নে বেটি। য-ত্তো সব জোটে এসে আমার নসীবে…। মিসেস ঢন্‌ঢন্‌ওয়ালার বাড়ীতে এর বড় বোন তেল মালিস করে, শুনলুম ভারী মিষ্টি হাত। তাই শুনেই না একে রাখা। আগে কি জানি!"

পঞ্চশীলা ঠোঁট উলটে বললে, "মামির যে কি বুদ্ধি পাপা, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! এর বড় বোন বিমলা চ্যাটার্জ্জী হ'ল গিয়ে একটা স্কলার আর এ হ'ল গিয়ে একটি মামুলি এম,এস-সি, তার মত হাত এর কি করে হবে?"

বিনীতা চ্যাটার্জ্জীর মুখ দেখে রামপ্যারীর বোধ হয় দয়া হলো। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি ভাবে কথার চাবুক খাচ্ছে, এটা তার ভালো লাগলো না। হাজার হোক স্ব-শ্রেণীর লোক ত! বললে, "পহলী কসুর মাফ কিজিয়ে মাইজী। পাঁচ রূপয়া জর্ম্মানা করকে ছোড় দো। পর গরীব বেচারী নকদা রুপয়া কহাঁ সে দেগী, আপ তলব সে হী কাট লো।"

শুনে বিনীতা চ্যাটার্জ্জী হাউমাউ করে একেবারে লছমিয়া দেবীর পোড়া পায়ের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো, "দোহাই মা-জী টাকা কাটবেন না, মরে যাব। যাট-টাকার···কমে যে এখন চালের খুদও পাওয়া যায় না।"

পঞ্চশীলা সহানুভূতিতে গলে গিয়ে বললে, "আহা, তোমার বর বুঝি বেকার?"

—"ওই বেকারীর জন্যেই ত", গলা বুজে এলো বিনীতা চ্যাটার্জ্জীর।

—"বেকারীর জন্যে, কি?" পঞ্চশীলা অবাক।

—"জাহাজের খালাসী হয়ে কি জানি কোন্ মুল্লুকে পালিয়ে গেছে। বলত, মরতে আমার সাধ নেই বিনু, আমি বাঁচব।"

—"খুব করেছে। য-ত্তো সব। এখন যাও। ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে কাজ করবে। আর ও সব ছেলে-টেলে সঙ্গে করে কখনো আসবে না।"

মামলা ডিস্‌মিস্ করে দিলেন কুণ্ডুপ্যাটেল। মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "দেখেছিস পঞ্চু, বেশী লেখাপড়া শিখে দেশের হাল কি হচ্ছে? ছেলেগুলোর খালি বিদেশ বিদেশ বাই হয়েছে। কেন, চাকরি—চাকরি না করে ব্যবসা করতে পারিস্ নে?"

বাড়ীর পূব-দিকের খোলা জমির ওপর অস্থায়ী বিরাট কুণ্ডুপ্যাটেল প্যাভেলিয়ন খাড়া হয়ে উঠেছে। ভিতরে ঘূর্ণায়মান বিরাট মঞ্চ। এক সঙ্গে এক শো শিল্পী নাচবে, গাইবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গত করবে একশো বিশ আর্টিষ্ট। একই সময়ে মঞ্চের অপর দিকে হাজারখানেক সাহিত্যিক বসে স্ব স্ব রচনা পাঠ করবেন। মঞ্চ ক্রমাগত ঘুরবে আর দর্শকরা একই সঙ্গে নাচ, গান, গল্প, কবিতা উপভোগ করবেন। অবশেষে হবে চিত্রতারকা প্রদর্শনী।

দক্ষিণ দিকে এক কোণে কানাত দিয়ে ঘেরা আলুকাবলির কিচেন। বড় বড় লোহার পিপেয় চায়ের জল সিদ্ধ হচ্ছে।

কুণ্ডুপ্যাটেল ভীষণ ব্যস্ত। যদিও শ'য়ে শ'য়ে লোক খাট্‌ছে, তাঁর নিজের বিশেষ কিছু করবার নেই—তবু আসলে যজ্ঞটা ত তাঁরই। এই সংস্কৃতি-সম্মেলনের সাফল্যের উপর তাঁর ব্যবসা-জীবনের সফলতাও অনেকখানি নির্ভর করছে। সুতরাং তাঁর আর দম নেবার সময় নেই। দুপুরে খাবার জন্যও ভিতরে যাননি। চাকরের হাত থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাওয়াটা সেরে নিয়েছেন।

সাতটায় সম্মেলন আরম্ভ। পাঁচটা বাজে বাজে। এদিকের কাজ প্রায় শেষ। এখন একবার আলুকাবলির কদ্দুর হলো দেখে অন্দরে যাবেন। স্নানটান সেরে ফিটফাট হয়ে স্ত্রী-কন্যা সহ পুষ্পতোরণে এসে দাঁড়াতে হবে বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য।

কুণ্ডুপ্যাটেল কিচেনের সামনে দাঁড়িয়ে আলুকাবলির খোশবু টেষ্ট করছিলেন, এমনি সময়ে মূর্ত্তিমান ছন্দপতনের মত হঠাৎ সঙ্গীত শিক্ষক (চিড়িয়াদের) বলবীর শর্ম্মা ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে তাঁর কাণে কাণে কি যেন বললেন।

কুণ্ডুপ্যাটেলের চোখের সামনে গোটা প্যাভেলিয়নটাই যেন সহসা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি লিফটের দিকে দৌড় দিলেন।

লছমিয়া দেবীর ঘন ঘন ফিট হচ্ছে।

রামপ্যারী শুক্‌নো কাপড়ে চোখ ঘষে ঘষে চোখের চামড়া প্রায় তুলে ফেলেছে। বাড়ীশুদ্ধ ঝি, চাকর, আমলা, কর্ম্মচারীর দল—যারা ভিতরে ছিল, কাঠের পুতুলের মত কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে।

কুণ্ডুপ্যাটেলকে দেখে লছমিয়া দেবী ফিট ভেঙে ডুকরে উঠলেন, "ওরে পঞ্চু, তোর মনে এই ছিল রে—"

কুণ্ডুপ্যাটেল পালঙ্কের এক পাশে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "রোসো, রোসো, অত অস্থির হোয়ো না। আমি এখনি প্লেন ছুটিয়ে দিচ্ছি—ব্যাপারটা সঠিক জেনে নিই আগে—"

—"জেনে আর নেবে কি, ঐ হতভাগা চতুর মিত্তিরকে যখন তুমি হেড সোপারের (লছমিয়া দেবী বলেন সোপার) পোষ্ট দিলে তখনি আমার ভালো লাগেনি। একটা বি-এ পাশ মুখ্যু ওকে দিলে তুমি মাথায় চড়িয়ে—কত বিদ্বান বিদ্বান লোক এসেছিল, তোমার পছন্দ হলো না। তুমি কিনা চেহারা দেখেই গলে গেলে—"

—গেছে গেছে একটু ঝাড়ুদারের সঙ্গে বেড়াতে, তাতে দোষটা কি হয়েছে। চাঁদের কলঙ্ক কি কেউ দেখে? আমার মেয়ের নামে কথা বলবে সাহস কার?"

রামপ্যারী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, "লেকিন উনকো তো সাদি ভী হো গয়া—"

—"এ্যাঁ, সাদি—"

—জী হাঁ। এ খত দেখিয়ে—

লছমিয়া দেবীর বালিশের তলা থেকে একখানা চিঠি বের করে রামপ্যারী কুণ্ডু প্যাটেলের হাতে দিলে।

পঞ্চশীলা লিখেছে,

"পাপা, কাল সন্ধ্যায় মিষ্টার চতুর মিত্র ঝাড়ুদারকে আমি কোর্টে গিয়ে যথারীতি বিয়ে করেছি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—তোমাদের দেশের গেঁয়ো কবির এই থিয়োরীটা কিন্তু ভারী চমৎকার। আমার প্রাণের কথা তোমাকে জানাচ্ছি পাপা, ঐশ্বর্য্যে আমার অরুচি এসে গেছে। আমি চাই একটু নিরিবিলি শান্তির জীবন।

তুমি যখন এ চিঠি পাবে, তখন বোধ হয় আমি ওয়েষ্টার্ণ কান্ট্রির কোন বরফ ঢাকা পাহাড়ের ওপর চতুরকে স্কেটিং শেখাচ্ছি। পুওর ফেলো এ জগতের কিছুই দেখেনি। যাক, আমি আমার হাত খরচার লাখখানেক টাকা—যা আমার কাছে ছিল—তাই নিয়ে চলে এসেছি। তবে এতে কুলোবে না। চতুরকে সারা ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। সব জায়গাতেই নন্দন কানন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আছে। তুমি ওদের ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়ো, যখন যেখানে যাব, আমি যেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাই। আর একটি দরকারী কথা, চতুরের জন্য একটি কাজকর্ম্ম কিছু ঠিক করে রেখো। তা বলে তুমি

ওকে ব্যবসায় ঢুকাতে যেয়ো না। ও সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের ছড়া ছাড়া আর কিছুই ভালো বোঝে না। বড্ড সরল আর ধর্ম্মভীরু। বেশী টাকার আমাদের দরকারও নেই, আমরা চাই দরিদ্র হয়ে দেশের অন্তরের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে। তুমি বরং ওর জন্য একটি মন্ত্রীত্ব উপমন্ত্রীত্ব কিছু ঠিক করে রেখো। মন্ত্রীত্বে ঝামেলা কম। কাজকর্ম্ম ত অফিসিয়ালরাই যা করবার করবে, ও শুধু নাম সই করবে আর আবোল তাবোল আবৃত্তি করবে।

আমি জানি এজন্য মুখের একটি কথা খসানো ছাড়া তোমার আর কোন কষ্টই করতে হবে না। তোমার জামাই মন্ত্রী হতে চায় শুনলে তারিণী জ্যাঠার দল হাতে স্বর্গ পাবে।

আশা করি তোমার সংস্কৃতি সম্মেলন খুব সুষ্ঠু ভাবেই উদ্‌যাপিত হবে। পুওর ফেলোদের একটু পেট ভরে চা আর আলুকাবলি খাইয়ে দিও।

মামি আর তুমি টা—টা—পাপা, টা—টা—

তোমার আদরের পনচু।"

দু'হাতে মাথা টিপে আর্ত্তনাদ করে উঠলো কুণ্ডুপ্যাটেল,—"আমার জামাই—নন্দন কাননের জামাই হবে একটা মন্ত্রী! হা রামজী—"

হাতীর দাঁতের পালঙ্ক কাঁপিয়ে আর একবার মূর্চ্ছা গেলেন লছমিয়া দেবী।

প্রবাসী ১৩৬৭

আলো-আঁধারে

বারি দেবী

আট-ন'বছর আগেকার কথা! গরানহাটার রাধু মল্লিকের বাড়ীর উঠানে একটা ছোটখাটো ভিড় জমেছে। ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো একটা ময়লা ছেঁড়া ফ্রকপরা দশ-বারো বছরের মেয়ে।

দোতলায় চকমেলানো বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন, বাড়ীর গিন্নী আর মেয়ে-বৌরা! বাড়ীর পুরোনো দাসী হাবলার মা, তার মোটা সোনার তাগা পরা হাতখানা নেড়ে বলছে,—সকাল বেলা গঙ্গাচান গিয়ে কি দুর্ভোগ গো! ঐ ঘাটে থাকতো। একটা ভিকিরি মা এই মেয়েটাকে নিয়ে। তা ক'দিন ধরে দেখছি মাগীটা কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে আছে,—ওমা আজ দেখি যে মরে ঢোল হয়ে গেছে। এই ছুঁড়িটার কি কান্না গো। তারপর মড়ার-গাড়ী এসে তো মাগীটাকে টেনে নে গেলো, এখন ছুঁড়িটা যায় কোথায়? আমার পায়ে পড়ে সে কি কান্না!—মাসী আমার একটা কাজ ঠিক করে দাও। আমি খেটে খাবো, ভিক্ষে করবো না। তা কি করি মা। মনে ভাবনু এ বাড়ীতে তো কত নোক গতর খাটিয়ে পেটের ভাত করছে, ও না হয় এটোকাঁটা খেয়ে গতর খাটাবে। তাই নিয়ে এনু সঙ্গে করে।

মল্লিক গিন্নীর দয়া হলো মেয়েটাকে দেখে। হাবলার মাকে বললেন—এনেছিস যখন তখন থাক—ছোটবৌমার কোলের ছেলের কাজ করবে। তবে বাপু নাপতে ডেকে মাথাটা নেড়া করে দে। কি জানি উকুন টুকুন আছে হয়তো। আর সাবান সোডা দিয়ে গা ঘসে, কৃষ্ণার একটা পরিষ্কার ফ্রক ওকে দে পরতে।

তাই হলো, মাথা নেড়া করে গায়ের ময়লা সাফ করে, কৃষ্ণার পুরোনো ফ্রক পরে, মেয়েটা ছেলের কাজে লেগে গেলো।

গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন—তোর নাম কি রে?

মেয়েটা বললো—নেকী।

—দেশ কোথায় তোদের?

—দেশ নেই তো, আমার মা যে ভিকিরি ছেলো। তাই রাস্তার ফুটপাতে আর গঙ্গা ঘাটে থাকতুম আমরা।

—মা মাগী তো মলো, আর আছে কে তোর? বাপ আছে?

—তা তো জানিনা, বাবাকে কখনও দেখিনি। তবে অন্য ভিকিরিরা বলতো—ও তো তোর নিজের মা নয়; তোকে রাস্তার জঞ্জাল থেকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছে।

সকলে হেসে উঠলো ওর কথা শুনে। মল্লিক-গিন্নী বললেন—মেয়েটা ঐ রকম নেকা হাবা বলেই বোধ হয় ওর মা নাম রেখেছিলো নেকি।

গিন্নীর ছোট বৌ সরমা কিন্তু তা বলে না। সে বলে মেয়েটা খুব সরল আর সত্যবাদী। সরমার ছেলের কাজ করে ও'।

ছ'মাস না যেতে যেতেই মেয়েটার চেহারা ফিরে গেলো। গায়ের রং বেরুলো, নেড়া মাথাটা থোপা থোপা কাল চুলে ভরে গেলো। চোখ দুটো ওর বেশ বড় আর জ্বলজ্বলে,

ঘন পল্লবে ঘেরা। কপাল. নাক, ঠোঁট, চিবুক, সবটা মিলিয়ে মুখখানা ভারি মিষ্টি!...মেয়েটা খুব বাধ্য আর কাজের। তবে একটা ওর ভারি দোষ ছিলো, সব জিনিষ জানবার অদম্য কৌতূহল,··· যেটা গরীবের মেয়ের পক্ষে গুরুতর অপরাধ।

রেডিওর সামনে বসে যখন বাড়ীর মেয়ে-বৌরা ভালো মন্দ গান সম্বন্ধে আলোচনা করতো, এটা হেমন্তর গান সবে রেকর্ড করা হয়েছে, অথবা সন্ধ্যা মুখুজ্যের এই গানটার তুলনা নেই এই সব কথা, নেকি একটু দূরে বসে মন দিয়ে শুনে শুনে শিখে নিয়েছিলো নামগুলো। শুধু নাম নয়, গানগুলোও যেন গিলতো মেয়েটা। আবার গিন্নীর একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণাকে যখন নাচ শেখাতো মাষ্টার মশাই, তখনও সামনের বারান্দায় বসে, হাঁ করে চেয়ে থাকতো সেইদিকে।

কৃষ্ণা ঘাঘরা আর কাঁচুলি পরে, ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচতো আর নাচের বোল বলতো—ধা, ধা, ধা, ধা, ধা, ধিন্, ধিন্, ধেরে কেটে, ধেরে কেটে, ধা। নেকি বোলগুলো শুনতো মন দিয়ে, আর বিড় বিড় করে আওড়াতো আপন মনে।

একদিন ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এলো হাবলার মা,—সরমার কাছে।

—দেখো গো বৌদি। অত আদর দিওনি ছুঁড়িটাকে। খোকন সোনাকে একটা বেগুন হাতে দিয়ে বসিয়ে রেখে, ছুঁড়িটা হাত নেড়ে ধেই ধেই করে নাচচে গো! আর ই দিকে খোকন সোনা বেগুন কামড়ে খাচ্ছে, ছুঁড়ির তা হুঁস নেই।

হাবলার মার চিৎকার শুনে সেখানে বাড়ীর সকলে ছুটে এলো! নেকির সাজ দেখে সকলে হেসেই বাঁচে না।

কৃষ্ণার পুরানো একটা রঙিন শাড়ী পেয়েছিলো ও—সেখানা ঘাঘরার মতো করে পরেছে।· ঠোঁটে গালে আলতা লাগিয়েছে, আর একটা ন্যাকড়ার ভেতর কতগুলো পাথরের নুড়ি আর ভাঙা ভাঙা কাঁচের টুকরো জড়িয়ে সেটা পায়ে বেঁধেছে!

হাবলার মা ওকে বারকতক মার দিয়ে বললো—ভিকিরির মেয়ের সখ দেখো না! কৃষ্ণা দিদির মতো নাচতে সাধ গেছে। মরণ আর কি!

হি, হি, করে হেসে কৃষ্ণা বললো—দেখো, দেখো মা। ঠিক যেন বাঁদরীর মতো দেখাচ্ছে ওকে।

আরো হয়তো নির্য্যাতন চলতো ওর, সরমা এসে বাঁচালো নেকিকে। বললো সরমা—আহা, হাজার দোষ করলেও ছেলেমানুষ তো! অমন করে মারাটা তোমার উচিত হয়নি হাবলার মা।

কৃষ্ণা ফোঁস করে উঠলো—এই ছোটবৌদির আস্কারা পেয়েই তো ওর এত বাড় বেড়েছে। ফের যদি তুই আমার নাচের কাছে আসবি তো মেরে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

আরো ছ' মাস গেলো। সেদিন জলসাতে কৃষ্ণার নাচ দেখতে বাড়ীশুদ্ধ সবাই গেছে, সরমাও নিয়ে গেছে নেকিকে।

এত ভালো জামা-কাপড় পরা লোকজন, এমন আলো সে কখনও দেখেনি। কৃষ্ণাদিদিকে তো চেনাই যাচ্ছে না। ছোটবেলায় সে মায়ের কাছে পরীর গল্প শুনেছিলো। কৃষ্ণাকে দেখে মনে হলো—এই সেই পরী।

নাচের ক'দিন পরে একদিন নেকি জিজ্ঞেস করলো সরমাকে—আচ্ছা ছোটবৌদি, কৃষ্ণাদিদির ঐ নাচের ঘাঘরা আর ঘুমুরের দাম ক'গণ্ডা টাকা?

—কেন রে? দাম জেনে তোর কি হবে? হেসে জবাব দিলো সরমা।

—না, কিছু নয়। আমি যখন বড়-ঝি হবো, মাইনে পাবো, তখন আমি ঐ রকম একটা ঘাঘরা আর ঘুমুর কিনবো।

—কিনে কি করবি? ঝি হয়ে কাজ করবি, না নাচবি?

—না বৌদি, প্রথমে কাজ করে যেটুকু সময় পাবো, নাচ শিখবো। ঐ বস্তিতে থাকে পট্‌লি, ও নাচ শেখে, অ্যাক্টো করে, কত মটর গাড়ী আসে ওকে নিতে। ও বলছিলো, আমাকে নাচ শেখাবে, ভালো নাচ শিখতে পারলে তখন আমাকে থেটারে চাকরী করে দেবে, আমি তখন আর ঝি থাকবো না।

সরমা ওকে চুপি চুপি বললো—এসব কথা আর কারুর কাছে বলিসনি নেকি। মার খেয়ে মরবি।

— বৌদি, তুমি যে আমাকে ভালোবাসো, তাই বলছি তোমার কাছে। আর তো কেউ আমাকে ভালোবাসে না, কার কাছে আর বলবো?

এমনি করে দুটো বছর কেটে গেলো। খোকা ঘুমুলে, নেকি লেখা-পড়া শিখতো সরমার কাছে। দু বছরে সে বাংলা লিখতে পড়তে ভালোই শিখলো। লেখাপড়া শিখে ওর উপসর্গ আরো বাড়লো, কৃষ্ণার ঘর থেকে বাংলা গল্পের বই, সিনেমা পত্রিকাগুলো মাঝে মাঝে উড়ে যেতে লাগলো। পরে সেগুলো পাওয়া গেলো নিচে কয়লার ঘরে নেকির কাঁথা মাদুরের ভেতর থেকে। আবার নেকির মারধোর চললো। এত অত্যাচারেও ওর মাথার ভূত নামলো না! কৃষ্ণার নাচ সে উঁকি মেরে দেখবেই, আর খোকনকে ঘুম পাড়াবার সময় দোলনায় শুইয়ে দোল দিতে দিতে গুনগুন করে গাইবে হেমন্তর গান।

কৃষ্ণার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা হয়েছে খুব বড়লোকের বাড়ীতে। সেদিন এক গা হীরে মুক্তোর গয়না, আর দামী শাড়ী পরে, মস্ত ঝক্‌ঝকে গাড়ী চড়ে মল্লিক বাড়ীতে এলেন কৃষ্ণার ভাবী শাশুড়ী। সঙ্গে এনেছেন কত রকমের খাবার, ফল, কেক, বিস্কুট, আর তার সঙ্গে কৃষ্ণার জন্য দামীদামী শাড়ী, ব্লাউস্‌, সেণ্ট, সাবান, পাউডার, ক্রীম, কত কি! তিন জন বয় আর আয়া এসেছে গাড়ীতে, ওরা সব জিনিষগুলো নামিয়ে বড় ঘরে সাজিয়ে রাখতে লাগলো।

দুপক্ষই বড়লোক, বিয়ের যখন পাকা কথা শেষ হয়েছে তখন আদর আদিখ্যেতা চলবে বৈকি। তবে বিয়ে এখন হবে না। পাঁচ ছ' বছর বাদে হবে, কারণ পাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, পাশ করে বিলেত থেকে ঘুরে এলে পর বিয়ে হবে। পাত্রীও পড়াশোনা করবে ততদিন।

কৃষ্ণাকে হীরে-মুক্তোর গয়নার জরির শাড়ীতে চমৎকার দেখাচ্ছিল, বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত মাননীয়া অতিথির তদারকীর কাজে।

কৃষ্ণার ভাবী শাশুড়ী ওকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগলেন। নেকি ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিলো সব। ওর দিকে চোখ রাঙিয়ে চাইলো কৃষ্ণা, ভয় পেয়ে নেকি ছুটে পালাতে গিয়ে টেবিলে পা আট্‌কে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটা কাত হয়ে কৃষ্ণার উপহারের জিনিষগুলো মাটিতে ছিট্‌কে পড়লো, কতকগুলো জিনিষ ভেঙেও গেলো।

রাগে জ্ঞানহারা হয়ে কৃষ্ণা ছুটে এসে পায়ের চটি খুলে, এলোপাথারি ভাবে মারতে লাগলো ওর পিঠে মাথায় গালে। মল্লিক-গিন্নী ব্যস্ত হয়ে এসে মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে বললেন—আরে তুই কেন হাত নোংরা করিস্ মা, ও ট্যাঁট্‌রা মেয়েকে সায়েস্তা করা তোর কম্ম নয়। তারপর হাঁক পাড়লেন তিনি।

—ওরে হাবলার মা, নিয়ে যাতো ভিকিরি ছুঁড়িটাকে, রেলিংএ বেঁধে আচ্ছা করে ঠেঙা।

জিনিষগুলো কুড়োতে কুড়োতে সখেদে বললেন তিনি—দেখুন তো বেয়ান এক ভিকিরির মেয়ে পুষে আমার কি জ্বালা! আপনার আশীর্ব্বাদী জিনিষগুলো একেবারে নষ্ট করে দিলে।

গুরুগম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন ভাবী বেয়ান—ছুঁড়ির আস্পর্দ্ধা মন্দ নয়তো! ওদের ঘরে ঢুকতে দেন কেন? আমার বাড়ীর নিয়মকানুন কিন্তু ভাই বড় কড়া! এই সব ন্যাষ্টি ঝি-চাকরের বালাই নেই। সব কায়দাদুরস্ত বয়, বাবুর্চ্চি, আয়া মোতায়েন করেছি বাড়ীতে।

মল্লিক-গিন্নী হারবার পাত্রী নন! তিনিও হাত নেড়ে জবাব দিলেন—আমার বাড়ীতে তো কবেই ঐ রকম ব্যবস্থা হয়ে যেতো দিদি, খালি ঐ বুড়ো শাশুড়ীর জন্যে কিচ্ছুটি হবার জো নেই। বলেন, ওসব মেলেচ্ছপনা করলে আমি কাশী চলে যাবো। কি আর করা যায়। যে ক'দিন আছেন, সে ক'দিন এই সব ভূত পেরেতের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে।

হাবলার মা এসে ধরে নিয়ে গেলা নেকিকে।

কৃষ্ণার ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে যাবে পাল্টা তত্ত্ব! বাড়ীর চাকর চাকরানীরা সাজগোজ করছে। হাবলার মা সরমাকে বললো—কি গো বৌদি, তোমার নেকি আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি? বড়লোকের বাড়ী, ভালো মন্দ খেতে পাবে।

—হ্যাঁ যাবে বৈকি। কিন্তু ওর তো ভালো জামাকাপড় নেই! আচ্ছা আমি দিচ্ছি ঠিক করে ওকে।

নিজের আলমারী থেকে একখানা পুরোনো চাঁপা রং-এর সিল্কের শাড়ী আর একটা ব্লাউস একটু ছোট করে সেলাই করে নেকিকে ডেকে দিয়ে বললো সরমা—নে এগুলো ভালো করে গুছিয়ে পরে নিগে যা! আর দেখিস্ কুটুম বাড়ী গিয়ে দুষ্টুমি করিস্ নি যেন।

কাপড় জামা, আনন্দে বুকে চেপে ধরলো নেকি! বারবার নাকের ওপর চেপে ধরে শুঁকলো আলমারীর গন্ধটা, তারপর দৌড়ে চলে গেলো।

সকলের সঙ্গে কৃষ্ণার শ্বশুর বাড়ীতে এসেছে নেকি। দেখছে অবাক হয়ে—ইস্ কি প্রকাণ্ড বাড়ী, কৃষ্ণা দিদিদের বাড়ীর চেয়ে অনেক সুন্দর বাড়ীটা। কত রকমের আলো, ফুলের বাগান। আবার এখানকার চাকররা কেমন কোট প্যাণ্ট পরা। কোটের বুকে চক্ চক্ করছে সোনার মতো যেন কি সব আঁটা। দাসীরা ঠিক ও বাড়ীর বৌদিদিদের মতো ফিট্‌ফাট্!

জিনিষপত্তোর তুলতে তুলতে হাঁক পাড়লেন গিন্নিমা—ও অভিজিৎ! দেখে যা, তোর শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্ব।

ওর কথায় বছর উনিশ-কুড়ির একটি স্যুট পরা ছেলে ঘরে এসে দাঁড়ালো, তার পেছনে পেছনে এলো একটা প্রকাণ্ড কুকুর। বামুনের গা টিপে ফিস ফিস করে বললো হাবলার মা—এই আমাদের জামাইবাবু।

নেকিও ফ্যালফেলিয়ে দেখলো কৃষ্ণাদিদির বরকে। কৃষ্ণাদিদির মতো অত ফর্সা নয়, কিন্তু মুখটা কি সুন্দর। ঠিক যেন গঙ্গার ঘাটের সেই বাঁশি হাতে করা কেষ্টঠাকুরের মতো।

কুকুরটাকে বড় ভালো লাগলো নেকির। ওদের গঙ্গার ঘাটে ছিলো একটা নেড়ি কুকুর, তার সঙ্গে খুব ভাব ছিলো ওর। কুকুরটাকে দেখে হাবলার মা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বললো—মাগো ঠিক যেন বাগের মতো হাঁ করে চেয়ে আছে কুত্তাটা। একটা কুকুর দেখে অমন দজ্জাল মাসী ভয় পেয়েছে দেখে ভারি মজা লাগলো নেকির। নিজের সাহস দেখাবার সাধ গেলো ওর।

টপ করে উঠে গিয়ে নেকি যেই কুকুরের মাথায় হাত দিয়েছে অমনি কুকুরটা লাফিয়ে উঠে হাউ করে ওর হাতটা কামড়ে দিলো। ঘরে উঠলো চেঁচামেচি গোলমাল। তত্ত্ববাহকরা হুড়মুড় করে পালালো ঘর ছেড়ে।

অভিজিৎ ছুটে এসে কুকুরটাকে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে নেকির হাতটা পরীক্ষা করে বললো—ইস দাঁত বসিয়ে দিয়েছে দেখছি। ওর গায়ে হাত দিতে গেলে কেন? এসো ওষুধ লাগিয়ে দিই। ওর হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলো সে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছিলো ওর হাত থেকে। অভিজিৎ রক্তটা মুছিয়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো, একটা ওষুধের বড়ি খাইয়েও দিলো। তারপর ওর দিকে চেয়ে বললো—খুব লেগেছে তো? দুষ্টু মেয়ে।

বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিলো নেকি—নাতো, বেশী লাগেনি। লাগলেও আমার কিছু হয় না। কত মার খাই, গা কেটে যায় আমার কিছু হয় না।

—মার খাও? কে তোমায় মারে।

—সবাই মারে দুষ্টুমি করলে। আমি ভিকিরির মেয়ে তো, ওরা দয়া করে রেখেছে তাই।

ওর কথা শুনে একটু আশ্চর্য্য ভাবেই ওর দিক চাইলো অভিজিৎ? চেহারাটা তো ঠিক ভিকিরির মেয়ের মতো নয়। জিজ্ঞেস করলো—তোমার নাম কি?

—নেকি।

—নেকি? এমন বিশ্রি নাম কে রেখেছে তোমার? ভালো নাম নেই?

—আমার সেই ভিকিরি মা ছিলো, যে আমাকে রাস্তার জঞ্জাল থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলো? সে-ই ঐ নাম দিয়েছে। নিজের মা তো ছিল না তাই ভালো নাম হয়নি!

—তাই নাকি? আচ্ছা আমি তোমাকে একটা খুব ভালো নাম দেব! তোমার নাম দিলাম দেবযানী। কেমন পছন্দ হলো তো? এবারে কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে ঐ নাম বোলো।

দেবযানী! দেবযানী! বার বার নামটা উচ্চারণ করলো নেকি। তারপর বললো এমন ভালো নামটা কি আমায় মানাবে?

—খুব মানাবে! তোমাকে দেখতে তো ঠিক দেবযানীরই মতো! দেবযানী মানে কি জানো? যারা সত্যিকথা বলে, খুব ভালো মেয়ে হয়, তাদেরই বলে দেবযানী! তুমি তো ভালো মেয়ে আছোই আর এই নামটার জন্যে আরো ভালো হবার চেষ্টা করবে কেমন?

—কিন্তু কৃষ্ণাদিদি যে আমায় বলে,—তুই বাঁদরী, শাঁকচুন্নি, পেত্নি! পেঁচি, খেঁদি?

—কৃষ্ণাদিদি কে? জিজ্ঞেস করলো অভিজিত?

—চোখ নিচু করে একটু হেসে বললো নেকি,—ঐ যে যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।

—ও! সে তোমাকে হিংসে করে বলে। জবাব দিলো অভিজিত।

সেদিন বাড়ী ফিরে এসে সারারাত নেকির চোখে ঘুম এলো না! বিড় বিড় করে আপন মনে বলতে লাগলো, দেবযানী! আমি দেবযানী!

পরদিন সকালে নেকিকে আর পাওয়া গেলো না বাড়ীতে!

মল্লিক-গিন্নী বললেন— কোথায় পালালো ছুঁড়িটা? দেখো আবার কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেলো না কি। তখনই বারণ করেছিলাম যে, ওসব পাপ বাড়িতে রেখে কাজ নেই।

খোঁজ করা হলো। না কিছু সে নিয়ে যায়নি, শুধু নিয়ে গেছে কালকে সরমার কাছে পাওয়া শাড়ী-ব্লাউসটা আর তত্ত্বের বিদেয় পাওয়া দুটো টাকা।

কেউ বললে—পুলিশে খবর দাও! গিন্নী জবাব দিলেন, ঘরের মেয়ে-বৌ তো নয়। রাস্তার জঞ্জালের জন্যে এত হাঙ্গামায় কাজ কি?

সরমা খালি আড়ালে চোখ মুছলো। প্রার্থনা করলো—ভগবান মেয়েটার তুমি ভালো কোরো।

দেখতে দেখতে আরো ছ' সাত বছর কেটে গেলো। কৃষ্ণা বি,এ, পাশ করেছে তবে তার বিয়ে আজো হয় নি। কারণ অভিজিৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবার পর জার্ম্মানী গিয়ে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসে এখন বোম্বেতে কাজ করছে। ছুটি বড় কম,—তবে আশা করা যাচ্ছে মাস তিনেক পরেই তার ছুটি মিলবে, তখন বিয়ে হবে।

ঠিক এই সময়ে যেন বজ্রঘাত হলো বোস বাড়ীতে। অভিজিৎ চিঠিতে জানিয়েছে যে, সে এখানে একটি মারাঠী মেয়েকে বিয়ে করেছে, এখন ওর বাপ-মা যদি এই বিয়েকে সমর্থন করেন, তবে ছুটিতে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারে।

কিছুদিন ধরে খুব কান্নাকাটি করলেন বোস-গিন্নি। কর্ত্তা বললেন, অমন ছেলের তিনি মুখ দেখবেন না—কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই গিন্নির বিরস বদন দেখে কর্ত্তার মন নরম হলো। তিনি বললেন—বড় ছেলে হাত ছাড়া হলেও, ছোটটি তো আছে, ওর বিয়ে স্বঘরে দেওয়া যাবে। অভিকে লিখে দাও আসতে, এখানে ওরা এলে পর একটা জাঁকালো গোছের পার্টি দিলেই সব দোষ চাপা পড়ে যাবে।

মল্লিক-বাড়ীতেও যথাসময়ে খবরটা পাঠানো হয়েছিল। কৃষ্ণার মা মুখটা বিকৃত করে বললেন—অমন ছেলের মুখে আগুন। আমার মেয়ের রূপ আছে, গুণ আছে, আমার পয়সা আছে। কত সোনার চাঁদ ওর জন্যে আমার দোরে গড়াগড়ি দেবে।

বোস-বাড়ীর পার্টিতে মল্লিক-বাড়ীর ও নেমন্তন্ন হয়েছিলো! কেমন বৌ হল, পাওনা থোওনাই বা কি? জানবার তো কৌতূহল আছে। তাই সরমাকে পাঠালেন গিন্নি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

আলোর ছটায় ফুলের গন্ধে আর অভিজাত মহিলা পুরুষের কলগুঞ্জনে জম জমাট বোস-বাড়ী। তবে নতুন বৌ সেজে গুজে প্রতিমার মতো সিংহাসনে বসে নেই। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝেই ঘোরা ফেরা করছিলো।

সরমার খুব ভালো লাগলো বৌকে। কৃষ্ণার মতো ফর্সা না হলেও চমৎকার মিষ্টি চেহারা। দামী বেনারসী পরনে, হাতে গলায় কানে, কমলহীরের গয়না ঝলমল করছে।

বোস-গিন্নী বৌকে ডেকে সরমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সরমার পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করলো বৌ।

বোস-গিন্নী বললেন বৌ আমার বড্ড গুনের গো। যেমন মিষ্টি স্বভাব তেমনি নাচ গান সব বিষয়ে তৈরী। কথাকলি নাচে ওর বোম্বেতে খুব নাম হয়েছে, কত মেডেল পেয়েছে। আর এই সব গয়না দেখছো সবই ওর বাপ দিয়েছে, একখানা বাড়ীও দিয়েছে বোম্বেতে।

সরমা বললো—সত্যিই আপনার বৌ চমৎকার হয়েছে মাসীমা। একদিন আসবো ওর নাচ দেখতে।

—আর মা! সখেদে বললেন বোস গিন্নী—সাত দিনের ছুটিতে এসেছে, কালই তো চলে যাবে ওরা। আচ্ছা তোমরা গল্প করো, আমি টেবিল সাজানোটা দেখে আসি।

সরমা নতুন বৌকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি ভাই?

—দেবযানী! চোখ নত করে জবাব দিলো বৌ। তারপর একটু হেসে সরমার দিকে চেয়ে কৌতুকভরে বললো,—আমাকে চিন্‌তে পারছেন না ছোট বৌদি? আমি আপনাদের সেই নেকি।

হঠাৎ সরমার সামনে যদি ছপাৎ করে একটা গোখরো সাপ এসে পড়তো, তাহলেও বোধ হয় এতটা চম্‌কে উঠতো না ও।

অস্ফুট স্বরে বললো সরমা—তুই! তুমি সেই আমাদের নেকি? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন উন্নতি হল কি করে?

—সেই কথা বলবো বলেই তো আমার আসল পরিচয় দিলাম। অবশ্য আমার স্বামী ছাড়া একথা আর কেউ জানেন না, উনি বলতে নিষেধ করেছেন। তবে আপনাকে বলছি, আপনি শুনে খুশি হবেন বলে।

সরমাকে নিয়ে দেবযানী নিজের ঘরের সামনের ঝুল বারান্দায় গিয়ে বসলো। তারপর নিজের কথা সংক্ষেপে বলে গেলো ও।

এই বাড়ীতেই তত্ত্ববাহকদের সঙ্গে প্রায় সাত বছর আগে এসেছিল সেদিনের নেকি। আর সেদিনের কুকুরের কামড় থেকেই হলো ওর জীবনের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। অভিজিৎ ওর হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিতে দিতে ওর নাম দিয়েছিলো দেবযানী। সেই নামটাই যেন ওকে সারারাত বলেছিলো তুমি নেকি নও ; তুমি দেবযানী। কি এক আনন্দে সারারাত ওর চোখে জল ঝরেছে! ছোটবেলায় ওর ভিখারী মায়ের সঙ্গে ও রোজ গঙ্গাস্নান করতো, মা গঙ্গার ওপর ওর বড় ভক্তি ছিলো। সেই রাতে ওর মনে হলো, মা গঙ্গা যেন ওকে ডাকছেন। তখনও ভালোভাবে ভোরের আলো ফোটেনি। সরমার দেওয়া সেই চাঁপা রং-এর শাড়ী আর ব্লাউসটা পরে, একটা ছেঁড়া শাড়ী আর তত্ত্বে বিদেয় পাওয়া টাকা দুটো নিয়ে নেকি সোজা চলে এলো বড় রাস্তায়। তখন বাস চলাচল সবে শুরু হয়েছে! ও' একটা বাসে উঠে বললো যে সে গঙ্গায় যাবে। বাস ড্রাইভার ওকে হাওড়ার পোলের কাছে ছেড়ে দিলো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ঘরের ভেতর ভালো জামা কাপড় ছেড়ে,—কাপড়ের আঁচলে টাকা দুটো বেঁধে রেখে, নেকি ছেঁড়া কাপড়টা পরে গঙ্গায় ডুব দিলো। অনেকদিন পরে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ওর মন প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেলো,—।

মা গঙ্গাকে প্রণাম করে ও প্রার্থনা জানালো—মা! আমি যেন দেবযানী হতে পারি।

স্নান সেরে উঠে এসে দেখলো নেকি, ওর কাপড়জামা কিছু নেই! ভয়ে ও কাঁদতে লাগলো! একজন বয়স্থা ভদ্রমহিলা, ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলেন,—তিনিও স্নান করতে এসেছিলেন ঐ ঘাটে।

তিনি ভাঙা বাংলায় ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ও কেন কাঁদছে।

নেকি কাঁদতে কাঁদতে বললো—আমার জামা কাপড় টাকা পয়সা সব কে নিয়ে গেছে মা।

মহিলাটি ভালো করে ওর মুখখানা দেখলেন—তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাড়ী কোথায়? কোথায় যাবে? সঙ্গে কে এসেছে?

—বাড়ী আমার কোথাও নেই মা। আমার কেউ নেই—বলে কাঁদতে কাঁদতে নেকি সব কথা বলে গেলো!

সব শুনে মহিলাটি ওকে বললেন—তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আমাকে মা বলবে?

নেকি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললো —মা! মাগো!

বোম্বের বিখ্যাত রত্ন ব্যবসায়ী মহেশ্বর ভাবে,—কার্য্যোপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রী গঙ্গাবাঈও এসেছিলেন সঙ্গে। গঙ্গাবাই নেকিকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বে

চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে নেকি জানলো, ওঁদের ঠিক ওর মত দেখতে একটি মাত্র মেয়ে বছর দুয়েক হলো মারা গেছে। তার নাম ছিলো যমুনাবাঈ। ওকে সেই নাম দিলেন ওর নতুন মা।

ওঁদের একটি মাত্র ছেলে বিয়ের পর বৌ নিয়ে 'আলাদা থাকে। তাই যমুনাই হলো ওদের এখন একমাত্র অবলম্বন।

এরপর সুরু হলো ওর শিক্ষার ব্যবস্থা।

নাচের মাষ্টার, গানের মাষ্টার, লেখাপড়ার মাষ্টার ; আর তার সঙ্গে এলো, দামী দামী শাড়ী, গয়না। যমুনাও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, মা, বাবাকে।

কথক্ নাচ আর মণিপুরী নাচে ওর উন্নতি দেখে, নাচের মাষ্টার মশাই বিভিন্ন জলসায় ওর নাচের ব্যবস্থা করলেন। তিন চার বছরের মধ্যেই ওর নাচের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। অনেক মেডেল পেলো ও নাচের জন্য।

বিচিত্র বসনে ভূষণে সজ্জিতা হয়ে বড় বড় জলসায় নাচের সময় ওর মাঝে মাঝে মনে পড়তো কৃষ্ণাদিদির কথা—মনে পড়তো বড় হয়ে ঐ রকম ঘুমুর, আর ঘাঘরা কিনবে, সেই সব সাধের কথা। চোখে জল আসতো মা গঙ্গার অপার করুণার কথা ভেবে।

মাস দু'য়েক আগে, এই রকম একটি জলসায় ওর নাচ দেখতে এসেছিলো ওর বান্ধবী রুক্মিনী ও তার স্বামী, আর তার স্বামীর এক বাঙালী বন্ধু। নাচের পর রুক্মিনী ঐ বাঙালী বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো যমুনার। বন্ধুটি ইঞ্জিনিয়ার—নাম অভিজিৎ বসু।

যমুনা ওকে দেখেই চিনলো এ সেই কৃষ্ণাদিদির বর। কিন্তু অভিজিৎ ওকে মোটেই চিনতে পারেনি কারণ সেই নেকিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এই যমুনাবাঈয়ের ভেতর।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যোবেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতো যমুনা। সেখানে দেখা হয়ে যেতো অভিজিতের সঙ্গে। চওড়া বাঁধটার ওপর বসে ওরা গল্প করতো দু'জনে। আলাপ ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হলো। যমুনা অভিজিৎকে বাড়ীতে এনে চা খাওয়ালো, ওর মা, বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। মাঝে মাঝে রুক্মিনী আর তার স্বামী জুহু বীচ-এ, মালাবার হিলে, কখনও বা সহরের বাইরে যেতো পিক্নিক্ করতে সঙ্গে নিতো অভিজিৎ আর যমুনাকে। ওদের অন্তরঙ্গতা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হলো।

মনের মধ্যে কিন্তু যমুনা মাঝে মাঝে অনুভব করতো বিবেকের তিরস্কার। কৃষ্ণা যে ওর অনেক দিনের বাগ্দত্তা। সে কথা জেনেও তার প্রতি এই অনুরাগ অন্যায়। এই কথাটা যেন ফুটতো কাঁটার মতো ওর মনের পর্দ্দায়। তাই ও ঠিক করলো—অভিজিৎের কাছ থেকে নিজেকে এবারে দূরে রাখবে।

দিন আষ্টেক যমুনা আর গেলো না সমুদ্রের ধারে। একদিন ও পেলো অভির টেলিফোন—তুমি কি অসুস্থ যমুনা? আর আসো না কেন?

—না এমনিই। একটু ব্যস্ত ছিলাম—জবাব দিলো যমুনা।

—আজ একটু এসো, বড় দরকার তোমাকে। বললো অভিজিৎ। আবার এলো যমুনা কুণ্ঠিত মন নিয়ে। বসলো ওরা পাশাপাশি সমুদ্রের ধারে।

কোনো ভূমিকা না করেই বললো অভিজিৎ—আমি বাঙালী বলে কি তুমি সরে যাচ্ছো আমার কাছ থেকে? চাওনা আমার ভালোবাসা।

বুকের নদীতে জেগেছে ওর কান্নার তুফান। কয়েক মুহূর্ত্ত লাগলো নিজেকে সংযত করতে! তারপর শান্ত চোখ দুটি তুলে জবাব দিলো যমুনা—আমিও বাঙালী।

—বাঙালী? তবে মারাঠীর ঘরে কেন? সবিস্ময়ে প্রশ্ন অভিজিতের কণ্ঠে?

—বলছি সব। তবে অনেক আগেই এসব কথা তোমাকে আমার বলা উচিত ছিলো। আমার সে অপরাধ ক্ষমা কোরো। আচ্ছা তোমার কি মনে পড়ে? বছর সাতেক আগে, তুমি একটি মেয়ের নাম দিয়েছিলে দেবযানী। যার আসল নাম ছিলো নেকি?

একটু ভাবলো অভিজিৎ। তারপর বললো হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে আমার কুকুর সেই মেয়েটির হাতে কাম্‌ড়ে দিয়েছিলো।

—সেই দাগটা এখনো আছে, বলে যমুনা নিজের হাতটা আলোর দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

ওর হাতখানা ধরে অভিজিৎ দেখলো দাগটা, তারপর আপন মনে বললো—আশ্চর্য্য। এও কি সম্ভব?

—তোমার দেওয়া দেবযানী নামই যে একান্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সে কথা যদি বলি, তুমি কি বিশ্বাস করবে? তবে শোন—অকপটে নিজের সব কাহিনী বললো ওকে যমুনা।

কথার শেষে বললো—তুমি যে কৃষ্ণাদিদির সেই বর, তা আমি তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলাম, কিন্তু নিজের পরিচয় দিতে পারিনি। ভেবেছিলাম সে পরিচয় আর কোনদিন কারুকে জানাবো না, কিন্তু আমার বিবেক সায় দেয় না, মনের এই অন্যায় প্রস্তাবে। নিজেকে অনেক বেদনা দুঃখ সইতে হলেও, তোমাকে ঠকাতে পারবো না, তাই, আজ এসেছি আমার সব কথা তোমাকে জানিয়ে ক্ষমা চাইতে।

গভীর অনুরাগে ওর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো অভিজিৎ—তোমাকে যে আমি প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম, যে তুমিই সত্যি দেবযানী। তবে একটা কথা জনিয়ে দিচ্ছি যে—আমি তোমার সেই হিংসুটে কৃষ্ণাদিদির বর নই—আমি আমার দেবযানীর বর।

বড় কান্না কেঁদেছিলো সেদিন যমুনাবাঈ। যমুনার মা বাবা শুনলেন ওদের কথা। ওর মা গঙ্গাবাঈ অভিজিতের সব পরিচয় জানলেন। ওকে দেখেও খুব ভালো লেগেছিলো তাঁর। তিনি বললেন—দুটি সর্ত্তে উনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। প্রথম খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে হবে। দ্বিতীয়—বোম্বেতে ওকে বাস করতে হবে, সেজন্য মেয়েকে ওঁরা, নিজের বাড়ীর কাছেই একখানা বাড়ী দেবেন। রাজি হলো অভিজিৎ। তারও একটি সর্ত্ত যে, যমুনা তার বাড়ীতে এসে হবে দেবযানী।

খুব সমারোহের সঙ্গে ওদের বিয়ে হয়ে গেলো। আত্মকাহিনী শেষ করে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললো দেবযানী তখন কি, স্বপ্নেও ধারণা করতে পেরেছি বৌদি—যে আমি আবার মা পাবো, বাপ পাবো,—এমন দেবতার মতো স্বামী পাবো! মা গঙ্গার দয়াতেই আমি সব পেয়েছি! আজ আমার মতো সুখী পৃথিবীতে আর কেউ আছে কিনা জানা নেই আমার। আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি এঁদের মর্য্যাদা দিতে পারি আমার জীবন দিয়ে।

চুপ করলো দেবযানী!

ততক্ষণ সরমা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলো কোনো আরব্য রজনীর কাহিনী! এবারে সে দেবযানীকে জড়িয়ে ধরে বললো—তুমি যে বড় ভালো মেয়ে ছিলে! আমি বুঝেছিলাম যে একদিন এই পাঁকের ভেতর থেকেই তুমি পদ্ম হয়ে ফুটে উঠবে!.... তোর সৌভাগ্য দেখে বুকটা আমার আনন্দে ভরে উঠছেরে!

দেবযানী বললো—আপনি একটু বসুন বৌদি।

সে ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো ছোট একটি ভেলভেটের কেস! সেটি সরমার হাতে দিয়ে বললো—এটা আমার খোকন ভাইটিকে দেবেন তার দিদির আশীর্ব্বাদ।

বাক্সটা খুলে—চম্‌কে উঠলো সরমা। তার ভেতর এক সেট কমলহীরের বোতাম জ্বলজ্বল করছে।

—একি কাণ্ডরে? এর যে অনেক দাম! বললো সরমা।

—হলেই বা বৌদি—ভাইকেই তো দিচ্ছি। অত সুখের মধ্যে থেকেও খোকনের জন্যে আর আপনার জন্যে আমার যে কি মন কেমন করতো বৌদি। ইচ্ছে ছিলো নিজে গিয়ে খোকনকে দেখে আসবো, আর এটা দিয়ে আসবো। কিন্তু তা ত হবার নয়। আমার পূর্ব্ব পরিচয় জানাতে যে উনি বারণ করেছেন। সকলে এখানে জানেন যে আমি মারাঠী মেয়ে।

একটু হেসে বললো সরমা—তবে আমাকে বললি কেন? তুই এখনো দেখছি সেই নেকিই আছিস।

সততার জ্যোতি বিচ্ছুরিত দুটি ডাগর চোখ তুলে ওর দিকে চাইলো দেবযানী। তারপর বললো—আমার মা, বাবা, আর স্বামী ছাড়া, শুধু আর একজনকেই সব কথা বলা যায়, যিনি ছিলেন আমার সেই অন্ধকার জীবনের একমাত্র আলো। তাঁকে চিনতে ভুল সেদিনের নেকিও করেনি,—আর আজকের দেবযানীও করবে না।

জতুগৃহ

সুলেখা দাশগুপ্ত

একটা বাড়ি বদল করা কি চাট্টিখানি কথা। স্বামী-স্ত্রী দুটো মানুষ হিমশিম খেয়ে গেল। খাট পালঙ্ক খোলো, টানো, নামাও। নামাও বইপত্তর। বোঝাই কর ঠেলায়। আবার নামাও এসে নতুন বাড়ির দরজায়। সাজাও। গোছাও। পাতো।

এ তো হলো শেষের পর্ব। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর। তখন গোছ গাছ করে হাত পা টান করে শুয়ে পড়তে পারো। এর পূর্ব পর্ব আরো সাংঘাতিক—অর্থাৎ কিনা বাড়ি খোঁজা।

রিপন ষ্ট্রীট আসতে বাধা দিয়েছিল আত্মীয় বন্ধু সবাই। অঞ্চলটা নাকি ভালো নয়। ভালো মন্দ বিচার করতে গেলে কি ওদের চলে? বন্যার জল যেমন তরতর করে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, পূব বাঙ্গলার মানুষ, ওরাও তেমনি প্লাবনের মত এসে; প্লাবনেরই মত ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। যে যেখানে মাথা গোঁজবার মত জায়গা পেয়েছে সেখানেই মাথা গুঁজেছে। বন মানেনি। জঙ্গল মানেনি। মুসলমান পাড়া, খ্রীষ্টান পাড়া বাছেনি। স্থান অস্থান বিচার করেনি। বাস করা তো দূরের কথা, সন্ধ্যার পর যে সব পল্লীতে কলকাতার বাঙ্গালী সমাজ পা ফেলতে চায় না ভয়ে, সে সব স্থানেও নির্ভয়ে নরেশবাবু যোগেশবাবুর দল এসে পুত্র পরিবার নিয়ে সংসার পেতে বসেছে।

হেমন্তও তার ছোট্ট সংসারটা নিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে রিপন ষ্ট্রীটের এই ম্যানসন বাড়ির এক ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল, যার বেশীর ভাগ বাসিন্দেই হলো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নয়ত খ্রীষ্টান, পার্শি, সিন্ধি, গোয়ানীজ।

ভারী খুশি সুমনা। দোতলা ফ্ল্যাট। বড় বড় দুটো ঘর। রাস্তার উপর দিব্যি একটা ঝোলানো বারান্দা। স্নানের ঘর আর রান্নাঘর—তা যতই ছোট হোক বন্দোবস্তটা প্রায় রাজসিক। নয়ত কি—সিমেণ্ট বাঁধানো উনোনে দাঁড়িয়ে রাঁধার ব্যবস্থা। বাথরুমে বেসিন! অকল্পনীয়। ভাড়া একশ টাকা। আনন্দে ঘুর ঘুর করে সুমনা বলে, বালিগঞ্জে ভবানীপুরে হলে এমনি একটা বাড়ির ভাড়া হতো দু'শ, না গো? বলে, জান, আমরা থাকতে জানিনে মোটেই। দেখছ, এরা কেমন থাকতে জানে সুন্দর ভাবে। যেন চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে!

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সুমনা। দরজা জানালায় সুন্দর সুন্দর রং বেরংএর পর্দা। ফুলদানীতে ফুল। মাতা মেরী আর যিশুর মূর্তি সবার ঘরে। সে সব মূর্তির সামনে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা অনির্বাণ আলো জ্বলে। ডিনারের পর শিশুকণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত ভেসে আসে। অদ্ভুত একটা করুণ সুর দুলতে থাকে বাইরের অন্ধকারে। সুর চেনে না, শব্দ বোঝে না, তবু কেন জানি মনে হয় সুমনার, কথাগুলো ওর বড় চেনা। 'প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে—' এই কথাগুলোই যেন বলছে সুরটা।

সেও ফুল রাখে। লেসের পর্দা টানায়। মাঝের বড় হল ঘরটাকে এ্যাংলো পরিবারগুলোর মতই বসবার ঘর করে, আবার খাবার ঘরও করে। একদিকে সোফা কৌচ সাজিয়ে, আর একদিকে খাওয়ার জন্যে টেবিল চেয়ার পাতে।

বোনরা বলে, সুমনা তুই একেবারেই ট্যাঁস হয়ে গিয়েছিস। আমাদের মেয়েরা খেতে পারে বসবার ঘরে বসে!

তবু তো তারা জানে না ছেলে মেয়ের জন্য নাইট গাউন তৈরী করিয়ে এনেছে সুমনা। শোবার আগে দিনের পোষাক বদলে তাদের নাইট গাউন পরিয়ে দেয়। হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দুহাত জোড় করে প্রার্থনাও করায়, 'হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি আমাদের সব চাইতে বড় বন্ধু হও। আমাদের সারথী হও। আমরা যেন ভালো ভাবি, ভালো করি, ভালো হই।' এখান থেকে কথা নিয়ে শব্দ নিয়ে প্রার্থনাটা নিজেই তৈরী করে নিয়েছে সুমনা।

হেমন্ত হাসে। বলে, এবার মাসীরা এলে বলতে হবে।

সুমনা গ্রাহ্য করে না। প্রার্থনা ওর ভীষণ ভালো লাগে। বলে, যার যেটা ভালো নেব না কেন! প্রার্থনার মতো কিছু আছে নাকি? রবীন্দ্রনাথ রোজ প্রার্থনা করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ করতেন—

—ওঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন। আমাদের যেমন পূজা ওঁদের তেমনি প্রার্থনা।

—গান্ধিজী? তিনি তো ব্রাহ্ম ছিলেন না। খ্রীষ্টানও নয়, তবে তিনি প্রার্থনা করতেন কেন রোজ?

তুমি কর? মিটিমিটি হাসে হেমন্ত।

করি ই—তো। যেন চটে জবাব দিচ্ছে এমনি ভাবে কথাটা বললেও সত্যি প্রার্থনা সুমনাও করে। অবশ্যি ছেলেমেয়ের মত হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে নয়, শোবার আগে মনে মনে—'হে করুণাময় ঈশ্বর আমি যেন ভালো ভাবি, ভালো করি, ভালো হই।'

হেমন্তর আমোদ উপভোগ করা গণ্যই করল না সুমনা। বলল, তোমারও করা উচিত।

এখানে এসে একটা ব্যাপারেই সুমনা যা মুশকিলে বা বেকায়দায় পড়ে গেল তা ঐ কথা বলা নিয়ে। ওকি ইংরেজী বলতে পারে? না, হিন্দী জানে! মেমগুলো টুকিটাকি কাজ করতে করতে ওর দিকে তাকায়, চোখে চোখ পড়লে হাসে। হাসে সুমনাও। বাস্ ঐ পর্যন্ত। ভাষার অভাবে আর এগোনো যায় না। কিন্তু ছোটদের বন্ধুত্ব গড়তে ভাষা অন্তরায় হয় না। ছেলে মেয়ে দিলীপ মিমি দিব্যি জমিয়ে নিল ফ্ল্যাটগুলোর সমবয়সীদের সঙ্গে। ভাষার অসুবিধা এতটুকু বোধ করলে না ওরা। হিন্দী ইংরেজী বাংলার জগা খিচুড়ি ভাষায়, আলাপ হলো, পরিচয় হলো, ঝগড়া হলো, প্রীতি হলো। তেতলার ম্যাক আর পিটার দুভাই আর দোতলার ওদের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের জেনেভার সাথে ভাব জমে গেল সব চাইতে বেশী।

ওরা এসে সুর করে ডাক দেয়, মি···ই···মী, ডি···ই···লীপ। মিমি দিলীপ বেরিয়ে আসে। চলতে চলতে মিমি বলে, তোমরা আমাদের নাম ঠিক মত বলতে পারো না কেন? অমন সুর করে ডাকো কেন? দাদার নাম কি ডিলীপ? দিলীপ তো। তারপর অমনি সুর করে ডাকা ওদেরও এসে গেল। ম্যাককে ম্যা···এ্যা···ক, পিটারকে পি···ই···টার, জেনেভাকে জে···এ···নেভা বলে মাঝের শব্দটা ভেঙ্গে সুর করে টেনে ডাকতে শিখল ওরাও।

ম্যানসন বাড়ির বিশাল ছাদে বাতে ফোলা পা নিয়ে থপ্‌থপ্ করে বুড়ো মেমগুলো হেলে দুলে হাঁটে—স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে। ছোটরা দড়ি লাফায়। দৌড়োদৌড়ি করে। দিলীপ মিমিদের দলটিরও খেলার জায়গা এটা। কিন্তু আজ ওদের খেলা জমেনি। কথা জমেনি। ছাদ প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। এখনও আলো আছে বটে কিন্তু এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে। ছাদের কোণ ঘেঁষে শুস্ক মুখে বন্ধু ম্যাককে ঘিরে করুণ মুখে বসে আছে ওরা। ম্যাককে ওর বাবা আজ নির্দয় মার মেরেছে। ওর নাকটা ফুলে উঠেছে। পিঠে চাবুকের লম্বা লম্বা দাগ বসে গেছে লাল হয়ে। ম্যাকের ছোট ভাই পিটার বিমর্ষ হয়ে বসে আছে ম্যাকের পিঠ ঘেঁষে। ওর জন্যই তো ম্যাক মার খেল। ও টেবিলে জল ফেলেছিল বলে ডাডি ওকেই তো মারতে এসেছিলেন। ম্যাক ডাডির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলেই না ডাডি—

হঠাৎ ম্যাকের ভীষণ হিংস্র কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল ছোট ছোট মুখগুলো।

ঐ রাস্‌কেলটাকে আমি গুলি করব। ম্যাক একটা ইয়ইয় একবার দূরে ফিকছিল কাছে টানছিল নিবিষ্ট মনে। সেটা পকেটে ভরতে ভরতে ফের দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ওকে আমি গুলী করব।

কাকে?

বাবাকে।

বাবাকে!!

হ্যাঁ, ঐ ধুমসো মোষটাকে।

বাবাকে অমন ভাবে বলতে হয় না ম্যাক। করুণ কণ্ঠ মিমির।

বাবা না হাতী। আমাদের বাবা এটা নয়। বাবা হলে কি এভাবে মারে। ফোলা নাকটা দেখাল ম্যাক। জামা তুলে চামড়া কেটে বসে যাওয়া চাবুকের দাগ দেখাল। বলল, দিয়েছি আমিও মোষটার হাত মুচড়ে। কাল হাত ঝুলিয়ে অফিসে যেতে হবে।

এতক্ষণে কিছুটা আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠল ম্যাকের চোখে মুখে।

বিভ্রান্ত কণ্ঠে মিমি বলল, তবে তোমরা ওকে বাবা ডাকো কেন?

ডাকি মাটা ওকে আবার বিয়ে করেছে যে।

মিমি ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে রইল ম্যাকের দিকে।

দিলীপ কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বাবা তবে কোথায়?

সেটাও একটা হোঁৎকা মেয়েকে বিয়ে করেছে। আর এই শুয়োরটাকে বিয়ে করেছে মাটা। আমাদের নিয়ে রোজ ঝগড়া করে মার সঙ্গে। হাতীটা আমাদের তাড়াতে চায়। ফুঁসতে থাকে ম্যাক।···চলে যেতাম, শুধু পিটারটার জন্য যেতে পারছিনে—

ভেতরটা যেন মোচড়াতে থাকে মিমির। ছাদের চারদিকে তাকায় সে—অন্ধকার হয়ে আসছে। দূর আকাশে সন্ধ্যা তারাটা জ্বলজ্বল করছে···শ্লেট রং আকাশে গোটা কয় মোটা মোটা সোনা গলানো দাগ···জেনেভার দিকে তাকালো—

জেনেভা বলছে, তোমার বাবা লোকটা মোটেই ভালো নয়। আমার বাবা কিন্তু খুব ভালো। আমাকে ভালবাসে। আদর করে। কত কি এনে দেয়···

ফুঃ—জেনেভাকে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল ম্যাক। বললো, ঐ কিছুদিন অমনি মধুর ব্যবহার করবে। সবে তো তোর মাকে সে দিন বিয়ে করে নিয়ে এলো। আমাদের সঙ্গে ও মোষটা প্রথম প্রথম ভালো ব্যবহারই করেছে। থাক না কিছু দিন। তারপর তোরও আমাদের মতই অবস্থা হবে।

ঢোক গিলল দিলীপ ঃ তোমাদের কারু আপন বাবা নয়?

কেঁদে ফেলল মিমি। দিলীপের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চল দাদা নীচে চল।

বিরক্ত মুখে হাত ঝট্‌কা দিল দিলীপ ঃ দাঁড়া না।

না, দাঁড়াব না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে, চোখ কচলাতে কচলাতে নীচে ছুটে চলল মিমি। ঘরে ঢুকে সুমনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল মা, তুমি আর বিয়ে করবে না। কখনো বিয়ে করবে না···আমরা এ বাবার কাছে থাকব।

বলে কি মেয়ে! হতভম্ব হয়ে গেল সুমনা।

হেসে উঠল হেমন্ত হো হো করে। ব্যাপারটা সে আঁচ করতে পেরেছে।

সুমনা মেয়ের মুখটা তুলতে চেষ্টা করতে করতে বলল, ছিঃ ছিঃ এসব কি কথাবার্তা! মার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে হয়—ছিঃ ছিঃ।

কে কার কথা শোনে। মিমির পরিত্রাহি প্রাণ বেরিয়ে আসা চিৎকারে ঘরের দেয়াল ফাটতে লাগল।

হাসতে হাসতে হাতের বই রেখে উঠে এলো হেমন্ত। মেয়েকে কোলের কাছে টেনে এনে মেয়ের ঘামে আর চোখের জলে ভেজা লাল মুখটা আদর করে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, না না, তোমার মা করতে চাইলেই আমরা সহজে রাজী হব কেন। দুষ্টু চোখে তাকাল হেমন্ত সুমনার দিকে।

বাঃ! ছেলেমেয়ের সঙ্গে মাকে নিয়ে কি অপূর্ব ঠাট্টা। মার সম্মান নইলে উথলে উঠবে কি করে। মেয়ের হাত ধরে একটা ক্রুদ্ধ টান দিল সুমনা ঃ এ সব কথা কোথায় শুনে এলে বল—

মার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে আসবার অভিনয় করতে করতে মেয়েকে বুকে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে হাসতে লাগল হেমন্ত।

ক্রুদ্ধভাবে সুমনা বলল, দাঁড়াও তোমাদের ছাদে যাওয়া আমি বন্ধ করছি। মাগো, একি জায়গা গো।···তারপর সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক ছাড়ল ঃ দিলীপ···

ছেলের কাছে সব শুনে গুম্ হয়ে রইল সুমনা। রাত্রে বিছানায় গা দিয়ে প্রথম কথাই বলল সে স্বামীকে, এ বাড়ি ছেড়ে দেবো আমি।

—পাগল আর কাকে বলে!

—পাগল হলাম কিসে শুনি?

—পাগলামো নয়? এমনি বাড়ি এ ভাড়ায় পাব কোথায়?

—এমনি বাড়ি আমি চাইনে। মন্দ বাড়িতেই থাকব আমি।

—আচ্ছা মুশকিল! এজন্য কেউ বাড়ি-বদল করে!

করে। ছেলেমেয়েকে ভালো শিক্ষা দিতে হলে সব থেকে আগে দরকার তাদের ভালো পরিবেশে রাখা।—তুমি এ কথা মান না!

—তা মানি।

—তবে?

—বাড়ি পাওয়া কি কঠিন—এতো তোমার না জানা নয়।

—এর চাইতেও কঠিন কাজ সন্তানের জন্যে আমাদের করতে হয়।

পাশ ফিরল হেমন্ত ; স্ত্রীকে সাদরে হাতের বেড়ে কাছে টেনে এনে বলল, বাইরের পরিবেশ নিয়ে এত ভাবছ কেন? ঘরের পরিবেশ সুন্দর থাকলেই হলো।

—কখনই হলো না। ঘর বার দুটোই সমান সুন্দর হওয়া চাই।

তারপর থেকে লক্ষ্য করে সুমনা, ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য জোরে কথা হতে দেখলেই ছেলে মেয়ের মুখ শুকিয়ে ওঠে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে। আর ঝগড়া হলে তো কথাই নেই। জড়িয়ে ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। আজকাল স্কুল থেকে ঘরে ঢুকেই ওকে খুঁজতে থাকে মিমি। সামনে পেয়ে গেল তো ঠিক আছে। নইলে ব্যাগ ফেলেই গিয়ে শোবার ঘরে উঁকি দেবে। স্নানের ঘরের দরজায় আঘাত করতে করতে মা মা করে পাগলা ডাক আরম্ভ করবে। একটা বিরক্তিকর অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল সুমনা।

সেদিন সুমনা একটু বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, ড্রেসিং টেবিল ধরে এসে দাঁড়ালো মিমি ঃ বেরুচ্ছ মা?

—হ্যাঁ রে একটু বেরুচ্ছি।

—কখন ফিরবে?

—তাড়াতাড়িই ফিরব মা। তবে আমার যদি দেরী হয়, তোমরা খেয়ে নিও কেমন?

—না না—তুমি না এলে খাবো না। তুমি এলে পর খা···বো···

—লক্ষ্মী মেয়ে। হরির মা তোমাদের খেতে দেবে। বাবা সামনে বসবেন। তোমাদের জন্য পায়েস—

—না, পায়েস খেতে চাই না আমি। কেন দেরী হবে তোমার। না—দেরী হবে না। কোথায় যাচ্ছ তুমি—

আয়না থেকে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সুমনা।

মিমিও তাকিয়ে রইল মার দিকে। সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি তার চোখে। যেন মার ভেতরটা দেখতে চাচ্ছে সে। যেন ভেতরে কি একটা মর্মান্তিক কষ্ট হচ্ছে ওর। বড় বড় ড্যাবডেবে চোখ দুটোর একোণ ওকোণ জলটানা।

মেয়ের গালে ঠাস করে হয়ত এক চড়ই কষিয়ে দিত সুমনা যদি তার চোখে জলটানা ভাবটা না থাকত—যদি তার ভেতরের কষ্টটা ফুটে না বেরুত। রেগে গিয়ে প্রবেশ করল সে শোবার ঘরে। হেমন্তর দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলে উঠল, তোমার কি; অপমানটা তো তোমার গায় লাগছে না। লাগছে আমার গায়।

হক্‌চকিয়ে উঠে বসল হেমন্ত ঃ কি হলো?

কতবার বলছি তোমায় বাড়ি ছাড়ার কথা? কানেই তুলছ না। এখানে থাকলে এ সব দেখবে, আর এমনি করবে। ওদের মধ্যে থাকলে ছেলে মেয়ের আতঙ্ক কখনই যাবে না আমি বলে দিচ্ছি।

—ইস—তিক্ততা প্রকাশ করল হেমন্ত। আমার জন্য বাড়ি কি সেজে বসে আছে? চাইলেই কি বাড়ি মেলে? ভালো মেজাজের মানুষ হেমন্তর গলাও রুক্ষ হল।

রাগ চড়ে গেল সুমনারও। এক কথায় দুকথায় উত্তরোত্তর কথা কাটাকাটিটা গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় কলহে। দরজাটা বন্ধ করে দিল হেমন্ত। দিলীপ মিমি কাঁপতে লাগল বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ বাদে এক ঝট্‌কায় দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সুমনা ঃ বেশ ঠিক আছে। তাই যাবো আমি। আমি ওদের নিয়ে বড়দির ওখানেই চলে যাবো—

বিকারের ঘোরে যেন চেঁচিয়ে উঠল মিমি ঃ না—না আমরা যাবো না—দু হাত প্রসারিত করে বেরিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলতে লাগল, না আমরা যাবো না। না তুমি যাবে না। আমরা এখানে থাকব। বাবার কাছে থাকব—এই বাবার কাছে থাকব…

রাগে ক্ষোভে কেঁদে ফেলল সুমনা। বললো, দেখ, বসে বসে দেখ এ সব। শোন, দুকান ভরে শোন এসব কথা।

অগত্যা তারপর সকাল সন্ধ্যা বাড়ি অন্বেষণ পর্ব আবার আরম্ভ করতে হলো হেমন্তকে। বাড়ি ঠিক করে ফের খাট পালঙ্ক খুলতে বসতে হলো। বই পত্তর নামাতে হলো। ঠেলা গাড়িতে বোঝাই করতে হলো। নতুন বাড়ির দরজায় এসে নামাতে হলো। তারপর মালপত্র টানাটানির ভারী কাজগুলো করে দিয়ে হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ে বলল, দশ বছরের ভেতর বাড়ি বদলের কথা বললে নির্ঘাত খুন।

সুমনা মাথা কাৎ করে খুশি মনে সম্মতি জানাল।

যদিও একতলা তবু বাড়িটা সুমনার পছন্দ হয়েছে। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। ওপরে একজন রয়েছেন আর নীচে ওরা। ওপর তলার ভদ্রলোকটিরও ওদেরি মত দুটি ছেলেমেয়ে। সুন্দর ঠাণ্ডা শান্ত পরিবেশ। সামনের ছোট ঘাস জমিটুকুর উপর ওরা খেলা করে। তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে সুমনা।

কিন্তু ওদের মার সঙ্গে সুমনার একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল তবু আলাপ হলো না। একজন স্পষ্টতই যদি পরিচয় করতে না চায়, তবে আর পরিচয় হয় কি করে। ওদের মা বোধহয় কাজ করে। তার সকালের যাওয়াটা প্রায় প্রতিদিনই সে দেখে, ফেরাটা না দেখলেও। ভাবলেশহীন মুখে সোজা টানটান বুকে হেঁটে পার হয়ে যায় ওদের পথটা। কোনদিকে তাকায় না। ডানদিকে মুখটা একটুও ঘোরালে ওর চোখে চোখ পড়তই।…ওরই বয়সী হবে…চেহারা কিন্তু ভালই…মেয়েটি মার মতো হয়েছে। ছেলেটি হয়েছে বাবার মতো। ছেলে মেয়ে অনেক

সময় মার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত যায়। বোধহয় মা সামনের দোকান থেকে লজেন্স টজেন্স কিনে দিয়ে যায়। যা কিনে আনে ডেকে দিলীপ মিমিকে দেয় চিনু মিনু।

সেদিন হেমন্তকে অফিসে আর পুত্র কন্যাকে স্কুলে পাঠিয়ে সবে সেলাইএর কল নামিয়ে সেলাই করতে বসেছে সুমনা—হন্তদন্ত হয়ে ওপর তলার ঝি ছুটে এলো শিগগির একবার আমাদের ওপরে চল মা। আমাদের চিনু খেতে বসেছিল হঠাৎ ফিট্ হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেছে। কেউ নেই বাড়ি···শিগগির এসো।

সেলাই ফেলে ওপরে দৌড়ল সুমনা। গিয়ে দেখল, চিনু মিনুর ডাল ভাত মাখা প্লেট পড়ে রয়েছে টেবিলে। হয়ত এক আধ গ্রাস মুখে দিয়েছিল ওরা—তারপরই চিনু ফিট্ হয়ে পড়ে গেছে খাড়া চেয়ার থেকে। মাথায় চোট লেগেছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা তুলছে আর গোঁ···গোঁ শব্দ করছে সে। মিনু দাদার মুখের উপর পড়ে দাদা···দাদা করে ডাকছে আর কাঁদছে।

জ্ঞান ফেরাবার প্রাথমিক চিকিৎসা যেটুকু জানত—অর্থাৎ নাকে মুখে জলের ঝাপ্টা দেওয়া—সেটুকু করতেই ফল হলো। চোখ মেলল চিনু। ঝিতে আর ওতে মিলে ভেজা জামা কাপড় বদলে চিনুকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে বাইরে এসে সুমনা বলল, এবার তুমি মিনুকে খাইয়ে দাও। আর ওর মাকে তো একটা খবর দেওয়া দরকার। ফোন রয়েছে, কোথায় কাজ করেন জান? আমি ফোন করে দিই।

কাকে খবর দেবে মা? ওদের মাকে! হা, ঈশ্বর! সুমনার আরো কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিসে গলায় বলল, কিন্তু বলি তোর যেমন খুশি চলতিস্। যেমন খুশি ঘরে ফিরতিস্। কোন কম্মটায় বাধা হচ্ছিল তোর। আসতিস্ ছেলে মেয়ে দুটো একটু তোকে পেত—বলি তোর চলে যাবার দরকারটা কি ছিল!

সুমনা গলা দিয়ে কিছুতেই শব্দ বের করে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারলে না ঃ ব্যাপারটা কি?

ঝি বলে চলল, তুমি নতুন এসেছ তাই জাননা। সমস্ত পাড়া জেনে গেছে ওদের মা চলে গেছে। সে নাকি আবার বিয়ে করছে! আজ সকাল থেকে বাবুর অপিস যাওয়ার আগে পর্যন্ত মা, বাবুতে আর মায়েতে ফোনে কি রাগারাগি তোমাদের ঐ ডারভোস না কি করা বলা তা নিয়ে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে বোঝ ত। খেতে বসে ভাত নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করছিল—তারপরই এই শব্দ আর মেয়ের কান্না শুনে ছুটে এসে দেখি—নইলে মা দশ বছর ধরে রয়েছি ছেলের ফিটের ব্যামো দেখিনি। মেয়েটা মা সমস্ত রাত ঘুমোয় না···

সুমনা শুধু তাকিয়ে রইল ঝির মুখের দিকে।

মরীচিকা

কৃষ্ণা দাস

বাড়ীর কাছ বরাবর এসে অনিল অতসীর হাতখানা স্পর্শ করলো—আর একটু এগিয়ে দেব?

—না।

—তাহলে আসছে কাল দেখা হচ্ছে? কেমন? আসছো তো?

—নিশ্চয়ই।

অনিল একটু হেসেই গন্তব্য পথে পা বাড়াল। বাড়ী ফিরে এল অতসী। বন্ধু হিসেবে অনিল মানুষটি সৎ এবং সজ্জন। এত ভাব এত আসা যাওয়া, কিন্তু আজ অবধি অতসীর পারিবারিক কথা বিন্দু বিসর্গ জানতে চায়নি। কিন্তু যদি চাইতো?

একটু আগে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথ-ঘাটের মত বাড়ীর ভিতরেও তার আভাস। সাবধানে শাড়ির কোঁচা তুলে বাড়ী ঢুকলো অতসী।

বাড়ী মানে মেস বাড়ী। পাঁচ ভাড়াটের একত্র মিলিত বাস, এক কল জল পায়খানা চিৎকার চেঁচামেচি।—আর ঘর বলতে সেও অপূর্ব—খোঁড়া বিকলাঙ্গ এক স্বামী। অতসীর কপালে অথৈ সুখ।

জুতোর আওয়াজ কানে যেতেই সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে দাঁড়িয়েছে তপন। উৎকণ্ঠিত চেহারা—এত দেরী হল?

সত্য কথা চেপে যায় অতসী, আজকাল যত দিন যাচ্ছে তত যেন সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে তপন। উনিশ থেকে বিশ হলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্নটি করা চাই। কিন্তু সব প্রশ্নের সরল জবাব দেবার দিন অনেকদিন হল হারিয়ে গিয়েছে। অতসী মুখ ঘুরিয়ে নিল। বললো—দেরী আবার কোথায়, যা জল-ঝড়, থামলে তবে তো আসা।

ঘড়ির কাঁটায় এখন সাতটা। বৃষ্টি নেমেছিল কোন বিকেলে, তপন দ্বিতীয় কথা বললো না, শুধু কাঠের পা-খানা সাবধানে বগলে চেপে সামনে থেকে সরে গেল।

বছর তিনেক আগে ট্রাম অ্যাক্সিডেণ্টে তপনের একখানা হাত একখানা পা কাটা গিয়েছে।

ঘরে চলে এল অতসী। একটু পরে তপন চা তৈরী করে নিজেই কাপটা ঘরে নিয়ে এল। দেখলো অতসী অফিসের কাপড়েই বসে বসে একখানা বইয়ের পাতা উল্টে দেখছে। ক্রাচের খট্‌খটে আওয়াজ পেতেই চোখ তুললো—একি, তুমি?

—তাতে কি হয়েছে? তপন হাসলো—অফিসে তোমার সারাদিন খাটাখাটুনি,—চা-টা হয়ে গেল, নিয়ে এলুম।

তপনের কথায় সারা শরীরে বিতৃষ্ণা ঘনালো। তিক্ত গলায় অতসী বললো—তাই বলে তোমায় দয়া করে এত কাজ না করলেও চলবে। তুমি কাজ করবে আমি বসে খাব, এটা কিছু সম্মানের কথা নয়। কাল ঝিকে বলে দিয়েছি—রাত দিনের লোক একটা নিয়ে আসবে। তুমি একটু দয়া করে বসে শুয়ে থেকো।

সামান্য কথায় আজকাল প্রায়ই এমন ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। কথাটা গায়ে মাখলো না তপন। বললো—আমি থাকতে আবার বাড়তি লোক! টাকা লাগবে না?

লাগুক।

অতসী মুখ ঘুরিয়ে নিল। ট্রাম দুর্ঘটনায় যবে থেকে তাদের এই সর্বনাশ হয়েছে, তখন থেকে ঘরের মধ্যে বসে বন্দী হয়েছে মানুষটা; না পুরুষ মানুষের হালচাল রীতিনীতি কায়দা-কানুন, সব সময়ই শুধু হাতা-বেড়ি, খিটখিট, সন্দেহপ্রবণ মন। অপরদিকে ঘরের অতসীকে বাইরের ধান্দায় বেরোতে হয়েছে। টাকা রোজগার চাই। ঘর ভাড়া আছে। পেটের চিন্তাও।

কিন্তু, ঘরের মানুষ বাইরে বেরোলে তার ফল বোধ হয় কখনই ভাল হয় না। যেমন হয়েছে অতসীর ক্ষেত্রে। সওদাগরী অফিসের বহু বিস্তৃত মানুষের ভীড়ের মাঝে অতসী হারিয়েছে অনিলের মধ্যে।

অনিলের কথা আবার মনে পড়লো। এমনকি ক্ষণকাল আগের ওর স্পর্শ টুকু। অনিল বাড়ীতে যাবার এত অনুরোধ করলো কেন? কি কথা বলতে চায় ও? কোন কথা?

অনিলের সঙ্গে তত দিনের বন্ধুত্ব যতদিন অতসী চাকরী করছে। একই অফিসের একই ঘরের টাইপিস্ট সহকারী। অনিল কিছু বেশিদিনের সিনিয়র, অতসী তার অনেক পরের। কিন্তু বয়েস আর যোগ্যতা দিয়ে মানুষের সঙ্গে বোধহয় মানুষের প্রীতির বন্ধনে কোথাও ঘাটতি পড়ার কারণ দেখা যায় না। অন্তত অতসী সে কথাটা ভাল মতই বুঝতে পারছে।

চায়ের কাপটা হাতে চুপ করে বসে রইলো অতসী। অনিলের ইঙ্গিতটা যে কিসের কিছুতেই যেন ভেবে পাচ্ছে না। কেউ নেই মানুষটির এই কথাটাই মাত্র জানে। আপন বলতে একটিমাত্র শিশুপুত্র। কোন্ বোর্ডিং হাউসে থেকে সে পড়াশুনা করে—ইত্যাদি।—এর বাইরে কোনদিন অনিল জানায়নি। কিন্তু অনিল যেমন সেই সংক্ষিপ্ত কথার বাইরে যায়নি,—অতসীও তেমন গেছে?

অতসীর সামনেই একখানা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে; পারা উঠে যাওয়ায়,—চেহারাটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রায় সিঁদুর বিহীন সিঁথি—অতসীকে কুমারীর পর্যায়ে এনে ফেলেছে। আর সম্ভবত এই জিনিসটাই অনিলকে আকৃষ্ট করে থাকবে বেশী।

আর একদিনও পৌঁছে দিয়েছিল অনিল,—সেদিনও বৃষ্টি ছিল আকাশে, অনিল বলেছিল,—চল তোমাদের বাড়িতে খানিকটা বসে যাই।

সে সম্ভাবনার আগেই বুকের মধ্যে গুড়গুড়িয়ে উঠেছিল অতসীর। খোঁড়া, পঙ্গু স্বামী। এতদিন কিছু না বলার কি জবাব দেবে মানুষকে। তা ছাড়া যা দেখাতে লজ্জাই করে—যে জিনিস নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে লাগোয়া বস্তু—সে কথা খোলাখুলি বলতেও অতসীর আত্মসম্মানে বাধবে। বাড়ীতে আসতে বলতে পারেনি অনিলকে। গুরুজনের দোহাই পেড়েছিল।

বাঁ হাতের কব্জি বাঁ পায়ের হাঁটু অবধি দুটো অংশই শরীর থেকে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। বাঁচার আশা ছিল না,—কোনমতে বেঁচেছে, কিন্তু এ ধরনের বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া অনেক শ্রেয়। না সুখ না শান্তি না প্রসন্নতা। শুধু ভার বোঝা আর

গলগ্রহের অভিশাপ হয়ে আছে তপন।

বাইরের বারান্দায় তোলা উনুনে বোধহয় হাওয়া দিচ্ছে তপন, খচর খচর করে পাখার আওয়াজ হচ্ছে। ঘরের মধ্যে ধোঁয়ায় ধোঁয়া। একটু পর কাঠের পা খটখটিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।—তুমি আজ অফিসের কাপড় পাল্টালে না?

কথাটা বলতে বলতে অতসীর শাড়ির দিকে নজর গিয়েছে—এ হে হে, কাপড়খানা কাদায় কাদা করেছ। কালই না কেচে ইস্ত্রি করে দিলুম! একটু সাবধানে রাস্তা চলতে পার না?

একেবারে মেয়েলী স্বভাব। ঘরে থেকে থেকে এভাব গড়ে উঠেছে। কথার জবাব দিতে বিরক্তির আর সীমা রইলো না অতসীর। বললো—রাস্তায় কাদা থাকলেই শাড়িতে কাদা উঠবেই। পথে কি আমি পা দুটো মাথায় করে চলবো?

—তা কেন, একটু সাবধানে চললেই হয়। এত কষ্ট করে শাড়ীটা সেদিন ইস্ত্রি করে দিলুম,—কাল আবার কি পরে যাবে বল তো?—আচ্ছা দেখি আর কোথায় লাগলো? তপন এবার ঘরের মধ্যে এসে অতসীর পায়ের কাছে বসে শাড়ীর দিকে হাত বাড়াতেই পাখানা সঙ্কোচে আর বিতৃষ্ণায় সরিয়ে নিল অতসী—সরো সরে যাও।

—সরবো না তো কি! কিন্তু তাই বলে—

অতসীর কুঞ্চিত মুখের দিকে চেয়ে শাড়ীর প্রসঙ্গ শেষ করল তপন। বোধ করি আর সাহসে কুলোল না। বললো—থাক, আজ রাতে কি রান্না হবে বল।

সারা শরীরে যেন জলবিছুটি ছড়িয়ে দিল অতসীর। আগুন চোখে বললো—আমার পিণ্ডি রান্না হবে। যাও রাঁধগে।

—সে আবার কি? চৌকির তলা থেকে আলু পটলের ঝুড়ি টেনে বার করেছে তপন।—আলু পোস্ত খাবে? তুমি তো বেশ ভালবাস।

রাগের ঝাঁঝে অনেক সময় চোখ ফেটে জল আসতে চায়। অদৃষ্ট শেষ অবধি এমন মানুষ বোঝার সঙ্গে বেঁধে দিল! এর থেকে কি কিছুতেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না অতসীর। ঘরের মধ্যে অসহ্য গরমের ঝাঁঝ। প্রত্যেক মাসে মনে করে ইনস্টল্‌মেণ্টে একখানা পাখা কিনবে—কিন্তু কোন মাসেই সংসার খরচ চালিয়ে সেটা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

গরমের মধ্যে শুয়ে শুয়েই অনিলের কথা ভাবছিল। বিকেলবেলা অফিস ফেরত অনিলের সঙ্গে রেস্টুরেণ্টে ঢুকছিল অতসী। অনিলই জোর করে ঢুকিয়েছিল। বলেছিল—বাড়ী যেতে ভাল লাগে না।

—কেন?

—দূর। বাড়ী যদি সুখের নীড় না হয়, পথ চেয়ে থাকার যদি সেখানে কেউ না থাকে লাভ কি সেখানে গিয়ে।

এ প্রশ্ন সবাইকার মনে। অনিল বাড়ী ফিরলে ফাঁকা লাগে, অতসী বাড়ী এলে গলগ্রহের বোঝা মনে হয়।

এক ঘরে শুয়েও দুজনের বিছানা আলাদা। ওপাশের বিছানায় শুয়ে তপনও গরমে

এপাশ ওপাশ করছিল,—আর হাত পাখার হাওয়া খাচ্ছিল। এক সময় অতসীকে ডাকলো—কিগো, তুমি ঘুমাওনি?

বিরক্ত হলেও জবাব না দিয়ে উপায় নেই। বললো—যা গরম। কিছুতেই ঘুম আসছে না।—আর বিছানাতে বাপু ছারপোকা হয়েছে বিস্তর। ঘুম না আসার আর দোষ কি। আজই বিছানা মাদুর রোদ্দুরে দেব মনে করেছিলুম, তা যা বিষ্টি—

অতসী কথা বললো না। তপন আপন মনে খানিক বকর বকর করে এক সময় দেয়াল হাতড়ে উঠে আলো জ্বালিয়ে বসলো। উদ্দেশ্য ছারপোকা মারা। তোশোক বালিশের চাদর ওল্টাতে পাল্টাতে বললো—বালিশ বিছানার ওয়াড়গুলোও ময়লা হয়েছে মন্দ না ; কাল এগুলো সাবান সোডা দিয়ে কেচে ফেলতে হবে দেখছি।

ভিতরের অবরুদ্ধ আবেগে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজলো অতসী। পরের দিন সকালে এক রাতদিনের ঝি এসে হাজির। ঠিকে ঝিটাই এনেছে। বললো—এই নাও গো দিদিমণি, লোক লোক করে কদিন ধরে বলছো, তা বাপু মনের মতো মানুষ কি আর সহজে মেলে গো। রান্না বান্না থেকে কুটনো বাটনা ঘর-ঝাঁট সব কাজে এসপার্ট হচ্ছে আমাদের হিমি। খাওয়া-পরা মাইনে কুড়ি।

কুড়ি টাকার মাইনের হিসেব দেখলে হয় না। পুরুষ মানুষ সারাদিন ঘরের মধ্যে এক কাঠের পা লাগিয়ে খটখটিয়ে সংসারের কাজ করে বেড়াবে—এই বিসদৃশ আচরণ সব সময় দেখার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে কুড়ি টাকা খরচ না করে উপায় নেই।

ঝি রাখা হল। বাড়তি মানুষ দেখে তপনের মুখে কালো ছায়া।—মাস গেলে কুড়ি টাকা আবার খাওয়া পরা—টাকা বুঝি তোমার সস্তা হয়েছে?

—টাকা সস্তা হয়নি, কিন্তু তাই বলে তুমি যে সব সময় কাজ করে বেড়াবে, এটাও দেখতে ভাল লাগে না।

—সারাদিন বাড়ি থাকি—তা করবো কি?

পুরুষের যা কাজ তাই করতে চেষ্টা করবে। তপনের হাত পায়ের দিকে না তাকিয়ে সোজা মুখের দিকে চাইলো অতসী।—আর তা যদি না পার দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকগে। তোমার দিদি তো প্রায়ই চিঠি দেন। কিছুদিনের জন্যে সেখানে গিয়ে থাকতে পার না?

দেশের পৈতৃক বাড়ীতে বিধবা যে দিদি থাকেন, অতসী সোজা সেখানে যাবারই ইঙ্গিত করলো। কিন্তু এতটার জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিল না তপন। সমস্ত মুখখানা ওর বেদনায় কালো হয়ে উঠলো। অবাক হয়ে বললো—দেশের বাড়ীতে দিদির কাছে গিয়ে থাকবো?

—এখানে থেকে কি করবে, অনবরত হাতা-বেড়ি আঁকড়ে পড়ে থেকে? পুরুষের কাজ নয় পোস্তর টক আর কুমড়ো ডাঁটার চচ্চড়ি রাঁধা। মুখের সামনে থেকে সরে গেল অতসী। বিরক্তি থেকে বিতৃষ্ণা। এ তর্কের শেষ সমাধান সামনে থাকলে কোনদিন হবে না।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি খেয়ে অফিসে বেরোলো অতসী। বাড়ী থেকে

বেরোনো মানে মুক্তি। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সময়গুলো যেন মুক্ত নীল আকাশে ডানা মেলে ভেসে চলার মতো মনে হয়।

রাস্তায় বেরিয়ে কালকের কথা মনে পড়লো, অর্থাৎ অনিলের। আজ ওর বাড়ীতে যাবার কথা আছে। কি কথা বলবে অনিল, কোন্ কথা। মুখ ফুটে আগে থাকতে কিছুই বলেনি। শুধু একটা কথা জানিয়েছে—কোন একটা দরকারী কথা আছে।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হল, দশটার কাঁটা ঘুরে ঘুরে বহুদূর অবধি এগিয়ে চললো। নির্দিষ্ট সময় অনেক আগে শেষ, কিন্তু অনিলের দেখা নেই।

অনিল না আসা মানে সূক্ষ্ম একটি বেদনা। যে বেদনা সারা বিকেল আর রাতটুকু তিলে তিলে দগ্ধ করে—তার হাত থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাবার পরিণতি। চিন্তিত হল অতসী। ঘড়ির কাঁটা আর ফাইলপত্রের স্তূপের মধ্যে বসে থাকা অতসীর চোখ বার বার শূন্য চেয়ারখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন করার তো কথা ছিল না।

সুতরাং কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার উন্মনা হল অতসী। মানুষটির সাহচর্য আজকাল জীবনের অনেকখানি স্থান পূর্ণ করে রাখে, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অনিলের বাজে কথার অবতারণা। অমুক নম্বরের অমুক চিঠিখানা ভুল ড্রাফ্ট করেছিলেন তো? বকুনি খাওয়া কপালে না থাকলে আমায় দেখিয়ে নিতেন। —কিম্বা কাজের ছুতো ধরে পাশে এসে—আজ আসতে দেরী হল? চিত্রগুপ্তের খাতায় লাল দাগ পড়েছে তো?—ঠিক হয়েছে।

—ইত্যাদি বহুকথা মনে পড়ল। কি হল মানুযটার? কোন অসুখ বিসুখ নয় তো?

পাঁচটা বাজলে ছুটির ঘণ্টা পড়ে, আজ বার বার ঘড়ির দিকে চাইলো অতসী, সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা যেন শম্বুক গতিতে চলছে। অবশেষে এল সেই সময়—পাঁচটার বিদায়ী সংকেত! আজ অনিলের সঙ্গে কথা ছিল ছুটির পর অফিস থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে কোন রেস্টুরেন্টে চা-পর্ব সমাধা করে বাড়ী ফিরলেই হবে।

কিন্তু অনিল না আসায় সমস্ত কিছু গণ্ডগোল পাকাল। কেন এলো না মানুষটা? কি তার প্রয়োজন ছিল! কি দরকারী কথা সে বলবে বলেছিল—ইত্যাদি বহু কথা ভাবলো অতসী। একবার মনে করলো, দরকার নেই, অনিল যখন আসেনি, তখন ওর জন্য এত উদ্বেগ না রাখলেও চলবে, আবার ভাবলো যদি কোন অসুখ-বিসুখ হয়?

এবং খেয়াল নেই অতসীর, মনের এই দ্বিধাদ্বন্দ্বময় অবস্থাতেই কখন নিজের বাড়ী নয়, অনিলের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনিলের বাড়িতে আসা অতসীর এই প্রথম এবং ঠিক এই ভাবে।

একটা আড়ষ্টভাব অতসীকে ভারী বিব্রত করলো। কিন্তু তবু সব কাজের মীমাংসা না করা পর্যন্ত বোধ হয় মানুষ নিরস্ত হতেও পারে না। তাই আবার কখন দরজায় কড়া ধরে নাড়া দিয়েছে। একবার দুবার তিনবারের বার চাকর শ্রেণীর একটা লোক দরজা খুলে দিল,—কাকে চাই?

অতসীর গলা শুকিয়ে উঠেছিল। বললো—বাবু আছেন, মানে অনিলবাবু?

—উপরে আছেন। আপনি দেখা করবেন?

অতসী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে বেসুরো মেয়েলি

গলায় গান ভেসে এল—জটার বাঁধন পড়লো খুলে, প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে।

কর্কশ ও বেসুরো গলা। বাড়ী ঢোকার মুখে দুপা সভয়ে পিছিয়ে এল অতসী—ও কি?

চাকরটা অভয় দিল।—ভয় নেই। বাবুর আত্মীয়, মাথাটা ভাল নয়, তবে আসুন, আপনাকে কিছু বলবে না, বাঁধা আছে।

কি সর্বনাশ। অনিল বাড়ির মধ্যে পাগল পুযছে নাকি? কিন্তু কৈ, এতদিন এত মেলামেশার মধ্যে একবার তো কখনও উল্লেখ করেনি। চাকরটা বললো—আসুন না, চলে আসুন। কোন ভয় নেই। লোকটার পিছন পিছন ঢুকতে গিয়ে অতসী দেখলো সামনেই একখানা ঘর। ঘরখানা অন্ধকার ও বাইরে থেকে তালা বন্ধ, তবে খোলা জানলা দিয়ে একটা স্ত্রীলোক দেখা যাচ্ছে। রুক্ষ চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, পরনে ছেঁড়া ধুতি। তার চারপাশে ছড়ানো মুড়ি, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে আর চিৎকার করে গান গাইছে।

চাকরটা বললো—একেবারে পাগল।

অনিল বারান্দায় ছিল, অতসীকে দেখে সাগ্রহে এগিয়ে এল।

বললো—শরীর ভাল ছিল না বলে আজ অফিস যাইনি, কিন্তু জানতাম তুমি নিশ্চয়ই আসবে।

—এত বিশ্বাস?

—হ্যাঁ, এত বিশ্বাস!

অনিলের বাড়িখানার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল অতসী। ছোট বাড়ীখানা নির্জন নিঃসঙ্গ। অনিল এই পরিবেশের মধ্যে সারা জীবন কাটাবে কি করে?

অনিল জিজ্ঞাসা করলো—কি ভাবছো!

—ভাবছি একলা একলা এখানে থাকো কি করে?

—দেখবে কি করে থাকি? ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল অনিল! দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান একটি শিশুর ফটো ঝুলছিল, সেখানা দেখিয়ে বললো একে নিয়ে থাকি।

কথাটা নিঃসহায় স্ত্রীলোকের মত শোনালো। মুখ ঘুরিয়ে নিল অতসী। বললো—সেই বা থাকে কোথায়!

যেখানে থাক, সুস্থ আছে, এইটুকুই যথেষ্ট। অতসীকে বসতে বলে একখানা চেয়ারে বসলো অনিল—তা ছাড়া হাজার হলেও ছেলেমানুষ। এখানে কার কাছে থাকবে বলো? চাকর-বাকরের কাছে ছেড়ে সব সময় কি রাখা যায়? অতসী কথা বললো না। তাছাড়া অনিলের কথার উত্তরে কি যে বলবে সহসা যেন ভেবে উঠতেও পারছিল না। শুধু আপন মনে অনেক কথা ভেবে চলেছে—রুগ্ন জীর্ণ অস্বস্তিকর পরিবেশ, জীবন তিক্ত হয়ে গেল। সে কথা কি জানাবে অনিলকে? খোলাখুলি বলবে, অনিল, বন্ধুত্বের আবরণে যেকথা চেপে রেখেছিলুম সে কথা সত্যি নয়। আমার বিয়ে হয়েছিল, স্বামী আছে; কিন্তু সে থাকা না থাকার মত। শুধু একটা ভগ্নদম তালগোল পাকান রক্ত মাংসের শরীর। যা কোন কাজে আসে না। তুমি আমাকে বাঁচাও।

চাকর চা দিয়ে যেতে অনিল হাতের গোড়ায় কাপ এগিয়ে দিল—চা খাও। আজ খুব

চুপচাপ দেখছি, কিছু ভাবছো?

—ভাবছি! অতসী একটু হাসলো। —এবং চরম ভাবনা।

—আমার কাছে বলা যায়?

—বলবো বলে তো মনে করেছিলুম, কিন্তু বলবো কি করে তাই ভাবছি।

নিচের থেকে প্রলয় নাচনের সুর দোতলার ঘরে এসে ধাক্কা খেল।—হে নটরাজ জটার বাঁধন—

অতসী হাতের কাপ নামিয়ে রাখলো—আচ্ছা অনিল, ঘরের মধ্যে একজন মহিলাকে দেখলাম, পাগল শুনলাম। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ীতে পাগল কেন?

—না রেখে উপায়-নেই বলে। অনিলের মুখখানা বেদনায় ম্লান হয়ে গেল। বললো—রাঁচীতে পাঠিয়েছিলুম—তা তারা ফেরৎ পাঠিয়েছে ও আর সারবে না।

—খুব দুঃখের বিষয়। কিন্তু মহিলা তোমার কে হন? মানে বাড়ীর মধ্যে এভাবে পাগল রাখা?

মুখ নিচু করে পেয়ালা কাপে ঠোকাঠুকি, এক সময় মুখ খুলে অনিল বললো—তোমায় একটা কথা বলা হয়নি। মানে দরকার হয়নি বলে বলিনি—! আমার স্ত্রী জীবিত আছে।

কথাটা এত সামান্য কিন্তু এত ভারী যে অতসীর মনে হল সবসুদ্ধু ও পাহাড়ের চুড়ো থেকে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেল। সবিস্ময়ে বললো—সেকি তাহলে যে তুমি—

—সত্যি বলিনি, অনিল একটু থামলো—কিন্তু মিথ্যেটা কোন্ দিক দিয়ে মিথ্যে তুমি দেখাও। একটু আগে যাকে তুমি দেখে এসেছ তার থাকার আর না থাকার মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

চোখের সামনে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। কি বলবে অতসী, অনিলের কথার কোন্ জবাব দেবে—এ যেন সহসা ভেবে উঠতে পারে না। শুধু গভীর একটা ধাক্কার ভিতর দিয়ে অনেকদিন আগের ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভুলে যাওয়া ছবি। আঠার বছর বয়সে অতসীর তপনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। সেও আজ আট ন বছর আগের কথা। সু-উন্নত চেহারা। আদব কায়দা ব্যবহারে নিখুঁত মার্জিত, সরকারী অফিসে মাঝের তলার চাকরী এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার বিপুল সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি একটি স্নেহপ্রবণ ও প্রেমিক মানুষ।

কত রাত শুধু না ঘুমিয়ে কেটেছে। নিজেদের মধ্যে কত মিথ্যে অবান্তর কথা, অসার পরিকল্পনা, রঙ্গিন চিন্তাবিলাস। কোথায় সেসব দিন চলে গেল। সেই রাত সেই মোহ সেই বিভ্রান্তিকর পরিবেশ। অথচ আশ্চর্য, দুটো মানুষই তো সমান এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সেই বেঁচে থাকাটাই কি অদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে দুজনের মধ্যে। বিতৃষ্ণা ধরে গলগ্রহ মনে হয়, স্বচ্ছন্দে আজ দিদির বাড়ী থাকার কথা বলে এল।

অতসীকে নীরব দেখে দুটো হাত ধরলো অনিল।—অতসী তুমি কিছু বলছো না কেন?

অতসী হাসলো। বললো—ভাবছি। তবে অন্যভাবে।

অনিল কিছু অবাক হলো। বললো—কেমন?

পিঠের শিরদাঁড়াটা ঝাঁকি দিয়ে সোজা করে নিল অতসী। বললো, ভাবছি, সত্যি কথাটা আমরা কেউই সব সময় বলি না।

—কিন্তু অতসী, যে সত্যি কোঁনো কাজের নয় তার কথা বলেই বা লাভ কি আছে বল? অনিল অতসীর মুখের দিকে সোজা চাইলো।—তাছাড়া আমি তোমার স্বামীর কথাও শুনেছি।

পায়ের তলা থেকে মাটিটা যেন সরে গেল অতসীর, বিবর্ণ মুখে বললো—তুমি কি করে জানলে?

—সত্যি কখনো চাপা থাকে? অনিল হাসলো—অতসী, এ থাকার কারো কোন মানে হয়না। রুগ্নজীর্ণ পঙ্গু পাগল।—কি হবে এদের দিয়ে। বেঁচে থাকা তখনই সার্থক, যখন তা প্রয়োজনে লাগে।—তুমিই বল সত্যি কিনা?

বুকের ভিতরটা একটা গভীর বিক্ষোভে আলোড়িত করতে চাইলো। অস্থির হয়ে উঠলো অতসী। বললো—চুপ করো অনিল, চুপ করো, তোমার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে।

—মাথা আমার খুব ভালো আছে, আজ কদিন আমি সব সময় ভেবেছি এ বিষয় নিয়ে। ভেবেছি একথা তোমায় বলতেই হবে। শুধু আমার জন্যেই নয়, তোমার জন্যেও।

নীচ থেকে নটরাজের নর্তন তারস্বরে ভেসে এল। আর সেই সঙ্গে আর একটা ছবিও! বিশ্রী বিবর্ণ কিন্তু জীবনের সঙ্গে অক্টোপাশের মত জড়িত— যা কখনও ছাড়াবার নয়। বরং একটা বাঁধন ছাড়াতে গেলে আরো কয়েকটা সেই মুহূর্তে আষ্টে পৃষ্ঠে ধরে।

অনিল সাগ্রহে মুখের দিকে চাইলো—অতসী।

এখুনি যদি বাড়ী ফেরে অতসী, দমবন্ধকর সেই পরিস্থিতির মধ্যেই পড়বে। সেই কাঠের একটা ঠকঠকে পা। হাতের কাছে কাটা জায়গায় মাংসপিণ্ড তালগোল পাকিয়ে উঠেছে, পায়ের কাছেও তাই। আর শুধু কি চেহারা—অত সুন্দর চেহারার মানুষ—শরীরের ভেতর এবং বাইরের সবটুকু আজ কিভাবে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমদিকে কতদিন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছে অতসী। আগে ঐ অবস্থাতেই মাঝে মাঝে কাছে আসতে চাইতো। ভয় আর আতঙ্কের ভাব কাটিয়ে উঠে একদিন অতসী বলেছিল,—এ ধরনের ব্যবহার করলে পালিয়ে যাব।

আজকাল কাছে আসেনা। একটা হাত আর একটা পা নিয়েই সংসারের যাবতীয় কিছু করে বেড়াচ্ছে।

অনিল আবার বললো—অতসী তুমি কিছু বল। তোমার ঘর তোমার সংসার তোমার সন্তান—

দুহাতে মুখ ঢেকে এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো অতসী। বুকের বড় কোমল জায়গায় সব জেনেশুনে হাত দিতে চাইছিল অনিল। অনিল বললো—অতসী তুমি বল, আমি কি কিছু খারাপ বলেছি, বা অন্যায় অযৌক্তিক?

—আমায় একটু ভাবতে দাও। মুখ তুললো অতসী। বললো—আমি ঠিক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল অতসী। জানলার গোড়ায় বসে পাগলী তখনও মুড়িগুলো নিয়ে লোফালুফি করছে। তারই মাঝে জটার বাঁধনও চলছে। অতসীকে আসতে দেখেই সব কিছু থামিয়ে দিল পাগলামি।—কে যায়, কে? এই যে ওগো বাছা, শোন তো,—এক আর এক কত হয় বলতে পারো?

এক আর একে—

এক আর একে কত হয় জানা নেই অতসীর।

বাড়ী ঢুকতে অন্যদিনের মত খটখটিয়ে তপন এগিয়ে এল না। কি হল তপনের রাগ, অভিমান?

অভিমান কিনা সেটা পুরোপুরি বোঝা গেল ঘরে ঢুকতে। একটা টিনের সুটকেসের ডালা খুলে নিয়ে সামনে বসে আছে তপন। সুটকেসের মধ্যে কিছু জামাকাপড় টুকিটাকি অনেক কিছু জিনিস। অর্থাৎ কোথাও যাবার ব্যবস্থা।

অন্যদিনের মতো কথা না বলতে অতসী নিজেই বললো কি ব্যাপার, খুব তোড়জোড় দেখছি যেন! কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—দেশে।

—বাবারে, এত বাধ্যতা! অতসী হাসতে চেষ্টা করলো—কিন্তু মশাই তুমি চলে গেলে আমার চলবে কি করে?

তপনের মুখের উপর থেকে কালো ছায়া মিলিয়ে গেল না। বললো—সকালের কথাটা বোধ হয় তোমার মনে নেই।

—আছে, আছে। ভিতরের অবরুদ্ধ আবেগকে চাপতে মুখ নিচু করলো অতসী। বললো—সংসারে থাকতে গেলে দুটো কথা কথান্তর হয়—তাই বলে তুমি সত্যি দেশে চলে যাবে?

—তাহলে?

—তাহলে আবার কি? তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

সুটকেস থেকে জামা-কাপড়গুলো টেনে টেনে বার করে আনলো। বললো—একটা মেয়েছেলে, সে কখনও ঝি চাকর নিয়ে একলা একটা সংসার করতে পারে? কোথাও যাবার নামে ও কথাটা একবার ভাবতে কি দোষ হয়েছিল তোমার?

রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাসকে রোধ করতে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলো অতসী। এত মিথ্যে নিয়ে সারা জীবন চালানো কি সব সময়ই সম্ভবপর হয়!

মহানন্দবাবুর মৃত্যু

ভারতী

অন্ধকারটা দুর হয়ে সবে আলো ফুটি ফুটি করছে; এমন সময়ে মহানন্দবাবুর মেজছেলের রোষদীপ্ত গলার আওয়াজ ফেটে পড়ল, আঃ থামাও না মেয়েটাকে, চীৎকারের চোটে একটু যে ভগবানের নাম করব তার উপায় আছে? অতখানি বেলা হয়েছে, এখনো বিছানাটা ছাড়তে মায়া হচ্ছে বুঝি? ধেত্তেরি সংসার—

বলা বাহুল্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হচ্ছেন মেজ বৌ। দেড় বছরের রোগা আর কাঁদুনে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মেজ বৌ দুপ্ দুপ্ করে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল এবং খানিকবাদেই আবার ফিরে এল। মেয়েটা তখনো কাঁদছেই।

মেয়ের বাবা আবার উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, হয়েছে কি? চেঁচাচ্ছে কেন অত?

মেজ বৌ মুখ খিঁচিয়ে উঠল, চেঁচাবে না, খিদে পেলে সবাই চেঁচায়।

—তা খাওয়াতে বাধাটা কোথায়?

—দুধ কোথায় যে খাওয়াব?

—কেন, বাবা দুধ নিয়ে ফেরেননি?

—না, ঘুমুচ্ছেন।

—সেকি? এত বেলা অব্দি ঘুমুচ্ছেন কি রকম? ডেকে দিতে পারলে না?

ঝনাৎ করে বিছানার দিকের জানালাটা খুলে দিতে দিতে মেজ বৌ বললে, না। রোজ ওঠেন, আজ উঠছেন না যখন, তখন,—বুড়ো মানুষ।—তুমি যাও না, তুলে দিয়ে এসো গে।

খোলা জানালা দিয়ে বাতাসের সঙ্গে ফুলের মিষ্টি গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। শিউলি গাছের তলাটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। আট বছরের মেয়ে রাণুকে ডেকে তুলে সাজি হাতে দিয়ে ফুল তুলতে পাঠিয়ে মেজ বৌ নিজেও মেয়ে কোলে নিয়ে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

মেজ ছেলে ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে নিরুত্তরে সম্ভবতঃ ধ্যানমগ্ন হয়েই বসে রইল।

পাশের ঘরে মহানন্দবাবুর ছোট ছেলে বিছানায় আধখোলা চোখে শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেল দশ মাসের ছেলেটা জেগে উঠে খাটের ধারে প্রায় পড় পড় অবস্থায় পৌঁচেছে। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, খোকনকে বাবার কাছে দিয়ে এসে আরেকটু ঘুমিয়ে নাও। এখুনি উঠো না, তোমার আবার যা শরীর! বাবা দুধ নিয়ে এসে গেছেন এতক্ষণে, যাও, দিয়ে এসো।

ছোট্ট বৌ ঘুরে এসে বলল, বাবার তো দেখছি আজ এখনো ওঠবার সময় হয়নি। ছেলেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিতে দিতে আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, যা দস্যি ছেলে কাছে নিয়ে একটু শোবার উপায় আছে? শরীর খারাপ হবে না? রাত না পোয়াতেই ইনি উঠে বসে থাকবেন। আচ্ছা এক ছেলে হয়েছে বাব্বাঃ—ছেলের

সোহাগেই সবাই গেলেন, আমাকে আবার দেখবে কে?

হাসি খুশি দুরন্ত ছেলেটা এবার কেঁদে উঠল।

ছেলের বাবা বললে, আচ্ছা জ্বালাতন তো। বাবা উঠছেন না কেন আজ? দুধ এনে আবার শুয়েছেন নাকি? যাচ্চলে, আজকের ঘুমটাই মাটি করে দিলে। যাকগে আমিই উঠছি, তুমি শুয়ে থাকো আরেকটু। বলে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ভুলাতে লাগল।

বড় বৌ বারান্দার এক কোণের খুবরীটাতে যেখানে ওর বড় ছেলে সুনীল বসে পড়ছিল, সেখানে এসে বলল, যাও তো, দুধটা নিয়ে এসো।

সুনীল অবাক হয়ে বললে, কেন, দাদু কোথায়?

—দাদুর জ্বর হয়েছে। তাড়াতাড়ি করে যাও, বাচ্চারা কাঁদছে। এই ঘটিটা নিয়ে যাও।

গলায় দড়ি লাগানো বেশ বড় ঘটি। সুনীল বলল, বাব্বাঃ অত বড় ঘটি আমি আনতে পারব না, ছোট কিছু দাও।

—বাঃ রে, ছোট দিলে হবে কেন? তিন ঘরের দুধ। বাবা বুড়োমানুয আনতে পারেন, আর তুমি পনেরো বছরের ছেলে পারবে না? যাও।

—হুঁ, দাদুর সবগুলো কাজই এখন আমাকে করতে হবে তো? পরীক্ষা সামনে, একটু পড়তেও দেবে না—

গজ গজ করতে করতে ঘটি হাতে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে মহানন্দ বাবুর বড় ছেলে বড় বৌকে বলল, বাবার জ্বর হয়েছে দেখে এলাম। জ্বরের উপর আবার ভাত খাইয়ে দিয়ো না যেন—।

বড় বৌ বাজারের থলেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বাজার যেতে হবে। বাবার জন্যে গোটা কয় কমলালেবুও এনো।

—কমলালেবু দিয়ে কি হবে? সোমার জ্বরের সময়ে যে বার্লির কৌটোটা এনেছিলাম, তাই তো রয়েছে। ওর থেকে জাল দিয়ে খাওয়াও।—বুড়ো হয়েছেন তবু লোভ কমে না। কি দরকার ছিল অত পয়সা দিয়ে কাল অতবড় একটা রুইয়ের মুড়ো কিনে আনার! প্রশংসা পাবার লোভে খাওয়াও তো খুব সেধে সেধে, কার পেটে কতটা সয় সে জ্ঞান তো আর নেই। এখন পেটটাও না খারাপ করে দেখ।

—দেখ, বেশী বোকো না। এখন যাও তো, ন'টার ট্রেণ ধরতে হবে সে খেয়াল আছে?

—হুঁ, কতদিন এখন বাজার ছুটতে হবে কে জানে? বেটা অফিসের বড়বাবু নয়ত স্রেফ্ চামার। দুচার মিনিট লেট্ হলেই তেড়ে আসবে।

কাছা সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে থলে হাতে সবেগে বড় ছেলে বেরিয়ে গেল।

দুপুর বেলা খেতে বসে মেজ ছেলে হুংকার দিয়ে উঠল। খাবার জলটাও একটু দেখেশুনে দিতে পারো না। কি রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাক সারাদিন? ঠকাস্ করে গেলাসটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল,—এত নোংরা জল কেউ খেতে পারে?

মেজবৌ বলল, চেঁচাতে তো পারো খুব। বাড়ীর টিউব ওয়েলটার জল ঐ রকমই ঘোলা। বাইরেরটা থেকে বাবা রোজ দুবেলা দুবালতি খাবার জন্যে নিয়ে আসেন। নিজে তো কখনো কিছু করবে না। হুকুম করতো আমিই না হয় গিয়ে নিয়ে আসব।

—বাবা আজ আনেননি?

—বাবার জ্বর হয়েছে। খবর রাখো কিছুর? ডিউটিতে যাবার আগে একবার দেখে যেয়ো।

স্বামী আর দুই ছেলেমেয়েকে আপিস ইস্কুল আর কলেজে পাঠিয়ে বড় বৌ এসে মহানন্দের মাথায় ঠাণ্ডা হাতটা রাখল। পুড়ে যাচ্ছে কপালটা। সকালের দিকে তো অতটা গরম ছিল না। রক্তবর্ণ দুই চোখ মেলে মহানন্দ বলে উঠলেন কে? শিবুর মা এলে? বড় বৌ ভয় পেয়ে গেল। লক্ষণটা তো ভালো নয়। নীচু হয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমি বাবা—।

মহানন্দ বললেন ওঃ, একটু জল দাও তো মা, জিভটা কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছে।

মহানন্দের বড় ছেলের নাম শিবেন্দ্র। তাই শেষের দিকে মহানন্দ তার স্ত্রীকে শিবুর মা বলেই ডাকতেন। দশ বছর আগেই তিনি গত হয়েছেন।

বড় বৌ জল খাইয়ে একটা পাথরের বাটিতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে নেকড়া ভিজিয়ে জলপটি দিতে লাগল।

লম্বা টানা বারান্দার দু'কোণে দরমা দিয়ে ঘিরে দুখানা ছোট কুঠরী করা হয়েছে, তারই একটায় মহানন্দের শয্যা। অন্যটাতে সুনীলের আস্তানা। বারান্দার পরেই পর পর মাঝারি গোছের তিনখানা কামরায় তিন ছেলের বাসগৃহ। ওপাশে লাগাও একটা অতি ছোট কোঠাও আছে। তাতে মেজছেলের পুজোপাঠ চলে। একটা লম্বা রান্নাঘর; তাকেই বেড়া দিয়ে তিন ভাগ করে তিন বৌদের আলাদা আলাদা রন্ধনক্রিয়া হয়। উঠানটা অবশ্য বেশ বড়ই।

পাকিস্থান হবার সূচনাতেই দেশের যথাসর্বস্ব বিক্রী করে সব দিয়ে সহরতলীতে এই বাড়ীটা মহানন্দ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাড়া করিয়েছিলেন। শিবুর মা তখনো বেঁচেছিলেন। বলতেন রোদে পুড়ে এত খাটুনীর কোনো মানে হয়। একটু জিরিয়ে জিরিয়েও তো কাজ দেখা যায়। মহানন্দ বলতেন, হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধিতে চলি আর লোকগুলো সব ফাঁকি দিয়ে টাকাগুলো সব ফুঁকে দিক আর কি! টাকা অবশ্য ছিলও না শেষ পর্যন্ত। আরো একটা ঘর করবার মতলব ছিল মহানন্দের, কিন্তু তখন আর এক কপর্দকও নেই।

মাথাটা বেশ করে ধুইয়ে মুছিয়ে পরে চামচ দিয়ে একটুখানি বার্লির জল খাওয়াল বড় বৌ। মহানন্দ হয়ত বা অনেকদিন আগের মরে যাওয়া মাকে স্মরণ করেই ডাকতে লাগলেন, মা, মাগো। বড় বৌ সস্নেহে মাথায় জলপটি দিতে দিতে বলল, আপনি একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন বাবা।

অনেকক্ষণ পরে একটু তন্দ্রামত এসেছে দেখে বিছানার্টা আস্তে আস্তে এদিক ওদিক সমান করে গায়ের চাদরটা টেনে শ্বশুরকে বেশ ঢাকাঢুকি দিয়ে বড় বৌ স্নান করতে

বেরিয়ে এল। বেলা তখন তিনটে বেজে গেছে।

মহানন্দের ছেলেরা সবাই যথারীতি কাজে বেরিয়ে গেছে। সোমাকে শ্বশুরের শিয়রে বসিয়ে বড় বৌ অস্থির হয়ে ঘর বার করছিল। সন্ধ্যের কিছু আগে ছোট ছেলে এসে বাড়ী ঢুকতেই বলল বাবার জ্বরটা খুব বেড়েছে, দেখতো—

ছোট ছেলে বড় বৌয়ের পেছন পেছন সোজা এসে বাবার ঘরে ঢুকল। সার্টটা খুলে সোমার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বাবার মুখের কাছে মাথা নীচু করে ডাকল, বাবা। মহানন্দ তখন প্রায় অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। শিয়রে বসে আরো বারকয়েক ডাকতে ঘোলা ঘোলা চোখে একবার তাকালেন, তারপর ডান হাতটা আস্তে আস্তে ছেলের দিকে এগিয়ে দিলেন। বাবার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কষ্ট হতে লাগল ওর। কি জানি কেন, হঠাৎ মনে পড়ল, একটা লাল কাঠের ঘোড়া, একবার ওর কি এক অসুখের সময় এনে দিয়েছিলেন বাবা। অনেক বড় বয়স পর্যন্তও ওটাকে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল ও। একবার সাইকেল থেকে আরেকবার গাছ থেকে পড়ে গিয়ে খুব চোট পেয়েছিল। ডাল পেটের চাম্‌ড়া ভেদ করে খানিকটা ঢুকে গিয়েছিল। বাবার তখনকার ব্যস্ততা, দুশ্চিন্তা এমন কি চোখের জলটাও যেন ভেসে উঠল মনের মধ্যে। মা বলতেন নরুকে উনি সব চাইতে বেশি ভালোবাসেন। মনে পড়ল রাধু খোকনের মুখ, সে নিজেও আজ বাবা। ঝাপসা চোখে আবার তাকাল বাবার মুখের দিকে; দেখল বাবার বন্ধ চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বুঝতে পারল না যে নিজেরও দু গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

বড় বৌ বলল, ও কি, ঠাকুর পো, ন যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন তাই কর ভাই।

দেখতে দেখতে বড় ও মেজ ছেলেও এসে গেল। অবস্থা দেখে শুনে তিন ভাইয়ে পরামর্শ করে তখুনি ডাক্তার ডাকবার ব্যবস্থা করল।

ছোট বলল, আমি যাচ্ছি। কোন ডাক্তারকে আনব?

—বড় প্রথমে মেজ'র দিকে তাকাল, তারপর একটু ভেবে বলল, বৈদ্যনাথ ডাক্তারকেই নিয়ে এসো।

ছোট বলল, বড় ডাক্তার একজনকে আনাই ভালো—

মেজ বলল, দেখুক না আগে বৈদ্যনাথই, ওর খুব হাতযশ আছে।

বৈদ্যনাথ ডাক্তার এসে দেখে শুনে ওষুধ লিখে দুটাকা ভিজিট নিয়ে চলে গেল।

ঘরে গিয়ে বড়বৌ স্বামীকে বলল অমর ডাক্তারকে আনলে না কেন? সকাল থেকে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। বৈদ্যনাথ তো শুনেছি কম্পাউণ্ডার ছিল।

ঝাঁঝিয়ে উঠল বড় ছেলে। ভিজিটের বত্রিশটা টাকা তুমি দেবে—না? ওরা তো কেউ এক পয়সাও খরচা করবে না।

পরদিন সকালের দিকে ছোট বৌ এসে ডাকল, মেজদি শোনো—

মেজ বৌ রান্না করছিল, বলল,—কি হল?

—কালও তো রাধুকে ইস্কুলে পাঠাতে পারিনি, রেল লাইন পার করে কে যে নিয়ে যায়,—রাণু মিণ্টুকে তুমি কার সঙ্গে পাঠাচ্ছো?

—আমিও তো তাই ভাবছি। বাবা শুয়ে পড়ে যে কি মুস্কিলটাই হয়েছে—

—আর বোলো না, কাল সারা রাত্তির তো ছোট বাবু ওখানেই। ইদিক দিয়ে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কোনো হুঁসই নেই। আমার হয়েছে মরণ। মাথাটাও যা ধরেছে—

মেজবৌ মুখ টিপে হেসে বললে,—সত্যি কোথায় তোর মাথাটা একটু টিপে দেবে, তা নয়, জ্বরো রোগীর কাছে গিয়ে বসে আছে; বে আক্কেলেপনা আর কি!

ছোট বৌ মুখ লাল করে বলল, দেখ মেজদি, যখন তখন অত ক্যাঁট ক্যাঁট করে কথা শোনাবে না—

—না রে, আমারই বা অত অঢেল সময় কই?

ছোট বৌ যাবার জন্যে পেছন ফিরেছিল, ডেকে বলল, শোন, রাণু আর মিণ্টুকে পলাশদের সঙ্গে ওদের বাড়ীর চাকরকে দিয়েই পাঠিয়ে দেব। রাধুকেও ঐ সঙ্গেই দিয়ে দে।

না, মহানন্দের উন্নতির কোনো লক্ষণই নেই। বরঞ্চ আগে যাও বা দু'একবার চোখ মেলে তাকাতেন ক্রমশঃ তাও বন্ধ হয়ে গেল। খাওয়ানও কঠিন, দুকষ বেয়ে সবই প্রায় গড়িয়ে পড়ে যায়। অবস্থা দেখে ছোট ছেলে কাজ থেকে ক'দিনের ছুটি নিল। বড়'র আপিস না গিয়ে উপায় নেই। মেজও যথারীতিই যাচ্ছে।

তিনদিনের দিন বড়বৌ আর ছোট ছেলে মিলে পরামর্শ করল অমর ডাক্তারকেই এনে ওরা দেখাবে। মাসের শেষ। অবস্থা সকলেরই সমান। বড় বৌ বলল, তুমি যদি অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা দিতে পার তবে আমি যা হোক করে ভিজিটের টাকাটা পুরো করে দিতে পারব। আর দেরী কোরো না।

বেলা একটায় এলেন ডাক্তার। বিখ্যাত চিকিৎসক। লোকে বলে ছুঁলেই নাকি রোগী সেরে ওঠে। বেশ ভালো করেই দেখলেন ভুরু কোঁচকালনে, বললেন—বয়েস হয়েছে, ভেতরে ভেতরে অনেকদিন থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। একটু সেবা যত্ন, ফলটলের রস, এই আর কি! এইতেই যে কয়দিন টেকেন। ঘস্ ঘস্ করে প্রেস্‌কৃপশান লিখে দিয়ে বললেন, ওষুধগুলো দিতে যেন দেরী না হয়। ওতেই খুব সম্ভব জ্বরটা কমে যাবে।

ছোট ছেলে ভিজিটের টাকা নিতে ঘরে এসে দেখল বৌ ঘুমন্ত ছেলের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। দুদিন ধরে স্বামী ওর বেশি খোঁজ নিচ্ছে না। এমন কি আজ সকালবেলাকার চা পর্যন্ত মেজদিই কিনা ডেকে নিয়ে খেতে দিয়েছে।—সেই যে কাল রাত্তিরে একবার এসে দুগ্রাস নাকে মুখে গুঁজে আর ওর কথার উত্তরে দু' একটা হাঁ, হুঁ দিয়েই লোকটা চলে গেল তারপরে এতখানি বেলা পর্যন্ত আর একবার ঘরে আসার প্রয়োজনও বোধ করল না। আর আজকেই বা বাপের জন্যে অত দরদ উথ্‌লে উঠল কোত্থেকে বাবুর! কদ্দিন আগেও তো বুড়োর কিপ্টেমি, একচোখোমী প্রভৃতি নিয়ে কত নিন্দে আর হাসি তামাসা করেছে ছোট বৌ, তখন উনিও তো বেশ সায় দিয়ে গেছেন।—লোকটার তল পাওয়া ভার। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। স্বামীর সাড়া পেতেই চোখ বুঁজে শক্ত হয়ে রইল।

ছোট ছেলে বলল,—শীগগীর যোলটা টাকা বার করে দাও তো—।

ছোট বৌ কি কালা হয়ে গেল, না নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। স্বামী যে এখনো খায়নি সে হুঁস্ও কি ওর নেই? এগিয়ে এসে মাথায় একটু নাড়া দিয়ে বলল,—ডাক্তার বসে আছেন। তাড়াতাড়ি দাও, নয়তো চাবিটাই দাও আমাকে।

পারল না তুলতে, চাবিও পেল না।

উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে বারান্দায় দাঁড়ানো বড় বৌয়ের কাছে দাঁড়াল। মুখ দেখেই বড় বৌ আর কোনো প্রশ্ন করল না। চিন্তিত মুখে শুধু বলল—তাইতো—! মিনিট খানেক কি ভাবল তারপর বলল,—আচ্ছা, তুমি ওদের কাছে যাও, আমি দেখছি।

মেজবৌ উঠোনে দাঁড়িয়ে এক রাশ সাবানকাচা কাপড় রোদে শুকুতে দিচ্ছিল। গতকাল থেকে শ্বশুরের বিছানা বার বার ভিজে যাচ্ছে। তাই বিছানার চাদর কাপড়ও অনেকগুলোই জমেছিল।

বড় বৌ ডাকল, ইলা, শিগ্‌গীর একটু এদিকে আয় তো—। বিস্মিত মেজ বৌ কাছে এসে বলল—কি হয়েছে বড়দি?

—ষোলোটা টাকা, অন্ততঃ চোদ্দটা হলেও হয়, দিতে পারিস্? ডাক্তার বসে আছেন, ভিজিট দিতে পারছি না।

—দিচ্ছি দাঁড়াও। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে বাক্স খুলে দেখল একটা দশ টাকার নোট আর খুচ্‌রো দুটো টাকা মাত্র আছে। ভাবছে—বাকি টাকাটা—

বড় বৌ তাড়া দিল, কিরে, পেলি?

—হ্যাঁ, এই যে আনছি—বলে প্রায় ছুটেই ঠাকুর ঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর আসনের মাটির কৌটোটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলল। সিকি দুয়ানী প্রভৃতি মিলিয়ে গোটা চারেক টাকা পেয়ে খুশি হয়ে সবশুদ্ধ যোলোটা টাকাই বড়দির হাতে তুলে দিল।

ঘণ্টা খানেক পরেই মেজবৌ শ্বশুরের ঘরে এসে বললে,—ছোট দেখলুম ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাকুরপোর আর তোমার ভাত বেড়ে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে এসেছি বড়দি। খেয়ে নিয়ে দুজনেই একটু শুয়ে পড়গে, সারা রাত্তির ঘুমোওনি। আমি থাকছি বাবার কাছে।

রাত্তিরে স্বামীকে বলল,—দুদিন ধরে বড়দি বট্‌ঠাকুর আর ঠাকুরপো রাত জাগছেন। ঠাকুরপো তো কাল থেকে কাজেও যাচ্ছে না, আর তুমি! সেই যে সকালে সকালে একটু চুপি দিয়ে পালাও—কি বলব? একটু মায়া দয়াও কি নেই শরীরে? আজ রাতে তুমি আর সুনীল থাকবে বাবার কাছে—।

মেজ বলল,—মায়া মোহই তো সব দুঃখের মূল। ওতে না জড়ানোই ভালো। তারপর গড়্ গড়্ করে আরো কি সব সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে গেল।

বৌ বললে,—থাক্, ওসব শুনতে চাইনে। আমি রোগা মেয়ে রেখে যেতে পারিনে, তোমাকে আজ বাবার কাছে থাকতেই হবে।

খবর পেয়ে ছ'দিনের দিন সকালবেলা মহানন্দের দুই মেয়ে আর জামাই এল। সঙ্গে এল ঝাঁকা ভর্ত্তি নানারকমের ফল। কিন্তু খাবে কে? যা দুএক ফোঁটা পেটে যেত তাও

বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে আছেন মহানন্দ। মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর যবনিকাটার অন্তরালে কি আছে তা দেখে নেবার ছাড়পত্র পেয়েছেন কিনা কে জানে?

মহানন্দকে অসুখের পরেই বড়ছেলের ঘরে সরিয়ে আনা হয়েছিল। মেয়ে জামাইয়েরা সবাই এসে সেখানে ঘিরে বসল।

বড় মেয়ে বসল মাথার একপাশে। বাপের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলল খানিকক্ষণ। তারপর অসুখের বিবরণ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—বড্ড অব্যবস্থা, তোমরা কেউ দেখছ না এসব? একটু পরেই স্বামীকে ইসারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাবার জন্যে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে, গামলা এবং রোগীর প্রয়োজনীয় আরো টুকিটাকি সব জিনিসের কথা বলে দোকানে পাঠিয়ে দিল।

বড় জামাই বলল, একটু চা খেয়ে গেলে হত না? বড় বৌদি বোধহয়—

হ্যাঁ, জুট্‌ছে কিনা এখুনি! সংসারের যা ছিরি। খেয়ে নিয়ো, বাইরে খাবারও খেয়ো, বুঝলে? আর দেরী কোরোনা যেন, তাড়াতাড়ি ফিরবে।

ঘরে এসে বলল,—ডাক্তারকে এখুনি একবার কল দাও, কি বলেন আমি শুনব। ছোট ভাইকে বলল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে যা,—পাস তো একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবি।

ব্যাগ খুলে নোট বার করে দিল।

ছোট মেয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আরো আগে খবর দিলে না কেন বড়দা?

বড় ভাই নিজের কান্নার বেগটা কোনমতে গলার মধ্যে ঠেলে দিয়ে সস্নেহে বোনের পিঠে হাত রেখে বললে, চিঠি পেতে তোদের দেরী হয়েছে,—আর এত তাড়াতাড়ি যে এতটা খারাপ হবে ভাবতেই পারিনি রে—।

বড় মেয়ে বললে, টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল তোমাদের। ছোট মেয়ে বাবার মুখের কাছে বিছানার উপরে মাথা গুঁজে চোখের জলকে মুক্ত করে দিল।

মেজছেলে বলল,—এখুনি কান্নাকাটি শুরু করলি কেন? শান্ত হয়ে যেটুকু পারিস সেবা যত্ন কর।

পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছিল। মেজদার কথায় আস্তে আস্তে সেটা থেমে এল। মুখ তুলে বাবার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাতেই আবার মাথাটা বাবার বুকে ঘেঁষে এগিয়ে পড়ল।

বড় বৌ রান্নাঘরে বসে নন্দাইদের জন্যে চা জল খাবারের আয়োজন করছিল। বড় ছেলে শুক্‌নো মুখে এসে সেখানে দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, মাইনে পেতে তো সেই সাত তারিখ। মন্মথর কাছে ধার চেয়েছিলাম, তাও তো পেলাম না—

ক্লান্ত অবসন্ন বড় বৌ দু'চোখ তুলে একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েই বুকের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিল। তারপর মুখ নীচু করে—চা-এ চিনি মেশাতে মেশাতে বলল,—চা খাবে এক কাপ?

না, বলে বড় ছেলে সম্ভবতঃ টাকা যোগাড়ের চেষ্টাতেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

স্বামী চলে যেতেই চোখের জল আর বাধা মানল না। ছেলেবেলাতেই বাপ মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুরের স্নেহে সেদিকটা ভরে উঠেছিল, সেটাও ফুরিয়ে যাচ্ছে। অভাব অনটন, স্বামীর শুক্‌নো মুখ, সকলের সব কিছুর ঠিকমত ব্যবস্থা, ভালো লাগছে না। কানের কাছে বারে বারেই বেজে উঠছে, মা মাগো। সারা জীবনের সংগ্রামে ক্লান্ত, রুগ্ন, শীর্ণ, এও তো এক শিশু। দুই হাঁটুর মধ্যে—মুখটাকে চেপে ধরে নিজেকে শক্ত করে নিতে চেষ্টা করল সময় নেই, সময় নেই। আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে অবাধ্য চোখ দুটোকে কিছুটা সাম্‌লেও নিল।

মেজ বৌ এসে ডাকল, বড়দি—

লাল চোখ দুটোকে মেজবৌয়ের মুখের দিকে নিঃশব্দে শুধু তুলে ধরল।

মেজ বৌ একটা ঔষধের খল এগিয়ে দিয়ে বললে,—এই—মকরধ্বজটা বাবাকে একটু খাওয়ান যায় কিনা দেখবে বড়দি। তুমি ছাড়া আর কেউ তো ওকে খাওয়াতে পারে না। শুনেছি এতে নাকি খুব উপকার পাওয়া যায়, আমি বেশ করে মেড়ে এনেছি।

বড় বৌ হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল,—দে, কিন্তু কিছুই তো খাওয়ানো যাচ্ছে না,—তবু দেখি। তুই তাহলে খাবারটা ওদের পাঠিয়ে দিস্। বড় বৌ উঠে দাঁড়াল।

—তুমি বাবার কাছেই থাকো বড়দি—। গলাটা ধরে এল। বললে—যতক্ষণ আছেন। এদিকটা আমি দেখছি। আমার ঘরে—আমি সকলের জন্যেই এক সঙ্গে—রান্না চাপাচ্ছি। অসুখের বাড়ী, দু' এক পদ দিয়েই সেরে নেব,—কি বল?

বড় বললে,—তাই কর ভাই। আমার তো কোনোদিকেই হাত পা আসছে না।

বাইরে এসে মেজবৌ কাউকে ডেকে খাবারগুলো পাঠাতে যাবে, কানে এল ছোটবৌয়ের ঘর থেকে ছোট জামাইয়ের গলা ভেসে আসছে। রাণু এসে বলে গেল বড় পিসেমশাই বেরিয়ে গেছেন। ছোট জামাই-এর খাবার নিয়ে মেজবৌ নিজেও ওদিকে এগিয়ে যেতে শুনতে পেল, ছোটবৌ বলছে—থাকুন না ক'দিন। কথা বলতে না পেয়ে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। যা একখানা বাড়ী আমাদের। আপনারা এলে তবু দুদণ্ড কথা কয়ে বাঁচি। শরীরটাও সব সময়েই খারাপ থাকে সেই হয়েছে আর এক জ্বালা। একটা রাতদিনের লোক রাখবার জন্যে কত যে বলছি—

ছোটবৌয়ের আঁট সাট— সবল চেহারাখানার দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে থেকে প্রচুর হেসে নন্দাই বলছে,—থাকব কি বৌদি, জায়গা কোথায়? বাড়ীটা বাড়ান, তখন না হয় এসে থাকা যাবে। আপনার ঠাকুরঝি অবশ্য থাকছে, আমি তো বিকেলেই পালাচ্ছি। আপনাদের বড় জামাইবাবুও নাকি বিকেলে ওর বোনের বাড়ী যাচ্ছেন। মেয়েটা রয়েছে বাড়ীতে— ট্রেণে যেতে সময়ও তো কম লাগে না—।

নিজের অজানিতেই মেজবৌয়ের বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল! আদর আপ্যায়নের সময় এটা নয়, তবুও একেবোরেই কি আর না করলে চলে?

সাত দিনের দিন ভোর বেলাতেই সব যত্ন আর চিকিৎসাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মহানন্দের প্রাণবায়ু বাতাসে মিলিয়ে গেল। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সবগুলো ধাপকে

একে একে উত্তীর্ণ হয়ে, সমাজ সংসারের বহু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ছেলে, মেয়ে, বৌ, নাতি নাত্নীতে ভরা সংসার থেকে এতদিনে মহানন্দ ছুটি নিতে পারলেন। কিন্তু মন থেকে একেবারে সরলেন কি?

মাস দুই কেটে গেছে। ছোট ছেলে এখনো মাঝে মাঝে বাবার ছোট তক্তপোষটার উপরে মাথা রেখে নিঃশব্দে বসে থাকে। বুকের মধ্যে একটা না বোঝা ব্যথা কেমন যেন পাক দিয়ে দিয়ে ওঠে।

অবুঝ নাতি নাতনীগুলো এখনো যখন তখন দাদুর কাছে যাবার জন্য বায়না ধরে। আকাশের তারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দাদুর বর্ত্তমান অবস্থিতিটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হয়। যারা দেখায় তাদেরও ‘মনটা সম্ভবতঃ প্রশ্নে আকুল হয়ে ওঠে, কোথায়, কোথায়, কোথায়?

সতেরো বছরের মেয়ে সোমা, মহানন্দের প্রথম নাত্নী। যেখান থেকে যা নিয়েই যখন বাড়ী ঢুকছেন মহানন্দ,—ঢোকবার মুখেই ডাক শুনে এগিয়ে গিয়ে দাদুর হাত থেকে সেটা নিয়ে ওকে হাল্কা করে দেবার একটি বিশেষ কাজ ছিল সোমার। দাদু বলতেন, তুই আমার দুঃখহারিণী দিদি। দাদুর বইগুলো, একখানা চৈতন্য চরিতামৃত, কয়েকখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, মহাভারত, ভাগবতের বাংলা অনুবাদ, সবই—তাকের উপর একসঙ্গে জড় করা আছে। ওদিকে তাকালেই ওর দুচোখ ঝাপ্সা হয়ে যায়। ইদানীং পুরণো চশমাটা দিয়ে নিজে আর পড়তে পারতেন না মহানন্দ। তাই রোজ রাত্তিরে সোমাকে এর যে কোনো একটা থেকে কিছু না কিছু—পড়ে শোনাতে হত। কলেজের পড়ার আর এখন ব্যাঘাত করে না কেউ। কেমন একটা নিঃসঙ্গতার ব্যথায় লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে মেয়েটা।

একটু ভালো মাছ তরকারী পাতে পড়লেই বড়ছেলের বাবাকে মনে পড়ে। নেড়ে চেড়ে কখনো বা খায়, কিন্তু বড় বিস্বাদ ঠেকে। কখনো বা বলে, খিদে নেই, সোমা সুনীলের জন্যে তুলে রাখো।

নিজের হাতে লাগানো বহু যত্নের ফুলগাছগুলোতে মহানন্দ কাউকে হাত দিতে দিতেন না। নিজে বেছে বেছে ফুল তুলে সাজি ভরে রেখে যেতেন মেজছেলের ঠাকুর ঘরে। এখন রাণু ফুল তোলে। মাঝে মাঝে ফুলসুদ্ধ ছোট ছোট ডালগুলোকেও ভেঙে আনে। পূজো করতে বসে মেজ ছেলের মনটা কেমন টন্ টন্ করে ওঠে,—বাবা যদি দেখতেন এগুলো—। পরমুহূর্ত্তেই হয়ত বা মনে পড়ে যায়, রাণু মিণ্টুর পরের ছেলেটা যখন খুব ভুগে ভুগে মারা গেল, তখন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাবার কান্নার সেই করুণ দৃশ্যটা।—নারায়ণ, নারায়ণ। এসব মোহ থেকে ত্রাণ কর প্রভু। পূজোয় নিবিষ্ট হতে প্রাণপণ চেষ্টা করে মেজছেলে।

ছোট মেয়ে চিঠি লিখেছে বড়বৌদিকে, কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না, কেবলই বাবাকে মনে পড়ে—

বড় মেয়ে লিখেছে, বাবার আগের তোলা ভালো ফটোখানার থেকে বড় করে ছবি করাও। আমাদের পাঁচ ভাইবোনের জন্যে পাঁচখানাই করবে। বেশ ভালো হয় যেন। টাকা যা লাগবে লিখো, আমি পাঠাব।

মেজবৌ ওর রুগ্ন কাঁদুনে মেয়েটার কান্না যখন কিছুতেই থামাতে পারে না তখনই ওর মনে হয় পেছন থেকে এসে শ্বশুর এখুনি হয়ত বলবেন, দাও তো মা, ওকে আমার কাছে দাও। তোমাদের কাছে থাকলেই ও কেবল কাঁদে।—এসো তো দিদিভাই, আমরা ঘোড়া ঘোড়া খেলি। সত্যিই ওঁর কাছে গেলেই যেন কি এক আশ্চর্য মন্ত্রবলে মেয়েটা শান্ত হয়ে যেত। এক বুড়ো আর দুই শিশুর হাসিতে মুখর হয়ে উঠত বাড়ীটা। মেয়ের কান্না থামাতে থামাতে ওর নিজেরই কান্না পেয়ে যায়। শ্বশুরের সম্পর্কে কখনো কখনো যে ভুল ত্রুটিগুলো ঘটেছে এখন সেগুলো কেন যে অত বেশি করে মনে পড়ে, মনে মনে ক্ষমা চায়—বুঝতে পারিনি বাবা। সমস্ত মনটা কেঁদে কেঁদে অদৃশ্য শ্বশুরের পা দুটোকেই যেন খুঁজে খুঁজে বেড়ায়?

ছোটবৌ দুরন্ত ছেলেটার জন্যে এখন আর আগের মত যখন তখন পাড়ায় বেরিয়ে বড়দি মেজদির নামে নানা মুখরোচক নিন্দাবাদ করার সময় পায় না। ছুটির দিনে স্বামীকে নিয়ে থিয়েটার সিনেমা বা অন্য কোথাও হুট্ করে বেরিয়ে পড়াও আর সম্ভব হয় না। ছেলেটাকে মারে আর মন খারাপ করে ভাবে,—আরো বছর তিন চার অন্ততঃ বুড়ো থেকে গেলেও পারত।

বড়বৌয়ের দিকটাই যেন বড় বেশি শূন্য হয়ে গেছে। ফাঁকা ভরাট হতে সময়ের প্রয়োজন। যখন মনটা বেশি খারাপ লাগে কে জানে কেন শ্বশুরের নিজের হাতে তৈরি বাগানটাতে এসে দাঁড়ায়। হয়ত মনে হয়, নিড়ানি হাতে বসে উনি এখনো আগাছা সাফ করে চলেছেন। নতুন নতুন ফুলের কুঁড়িগুলো দেখে খুশি হয়ে উঠছেন।—চারধারে জঙ্গল গজাচ্ছে। জল দেবার, যত্ন নেবার সময় কারোরই নেই, সবাই নানা ধান্ধায় ব্যস্ত। অনেকগুলো গাছ শুকিয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে সবগুলোই হয়ত একেবারেই শুকিয়ে যাবে। বড়বৌয়ের দু' চোখ দিয়ে দুটি শ্রাবণের ধারা নেমে আসে।

ভঙ্গুর

জয়ন্তী সেন

লোকটিকে হয়তো অনেকবার দেখেছেন কিন্তু কোনদিন লক্ষ্য করেননি রমাপতি। আজকে বারান্দায় বসে যখন ভক্তবৃন্দ ও অনুরাগী বন্ধু বান্ধবদের হাত থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাসূচক ফুলের তোড়া, মালা, মিষ্টি ও উপহারের বাক্স গ্রহণ করার পালা চুকিয়ে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবার কথা ভাবছিলেন, তখন বেলা প্রায় একটা। চড়া রোদ সবুজ ঘাসের উপর হলুদ পাটি বিছিয়ে রেখেছে। গরম হাওয়ায় ঝির ঝির করছে দুটো একটা কৃষ্ণচূড়া ফুল।

রমাপতি ফাঁকা রাস্তার ওপারে ফটকের উল্টো দিকে লোকটিকে একদৃষ্টে এদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য হলেন। অতি সাধারণ একটি মানুষ, নানাভাবে ঘা খাওয়া ক্লান্ত অবসন্ন মুখে জীর্ণতার ছাপ পড়েছে। কপালের দুপাশে চুলগুলো সাদা, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। চোখ কোটরে ঢোকানো, গালের হাড় দুটো অসম্ভব উঁচু। শির ওঠা সরু হাতে ময়লা পাঞ্জাবীর বুকের কাছে রিপু করা অংশটা চেপে ধরে এদিকে একভাবে তাকিয়ে আছে লোকটি।

ভুরু কুঁচকে রমাপতি তন্ন তন্ন করে মনের ভেতরটা খুঁজে দেখলেন—যদি কোথাও কোন পুরোন স্মৃতির টুকরো মিলে যায়। নিশ্চয় কোন দিন কোথাও দেখে থাকবেন, অথচ এখন কিছুই মনে পড়ছে না। লোকটা কি চায়? যারা প্রার্থী, তারা সাধারণতঃ নিজেকে সামনের দিকে ঠেলে না দিতে পারলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এ লোকটি তো সে রকম কোন অধীরতা অথবা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে না।

মনের মধ্যে অস্বস্তির খোঁচাটা গেল না। যদিও স্নানাহারের পর কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে না খোলা টেলিগ্রাম আর চিঠির স্তূপ, বিকালে তাঁর সম্মানে এখানে সভা বক্তৃতা, রাত্রিতে ছেলেদের আয়োজিত গানের আসরে বিশিষ্ট শিল্পীদের সমাবেশ সমস্ত মনটাই প্রায় জুড়ে বসেছিল। এমনকি সুরমার কথাও আজ অনেকবার ভেবেছেন রমাপতি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কঠিন নিয়মের বেড়াজালে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা পড়েছে। সাধারণতঃ বইএর পৃষ্ঠা পিছন দিকে উল্টে দেখার সময় হয় না।

সুরমার ছবিতে নিয়ম মত দোকান থেকে কেনা মালা পরানো হয়। মাদ্রাজ থেকে ওখানকার এক ব্যবসায়ী বন্ধু ধূপ পাঠিয়ে দেন, তার গন্ধে সারা সন্ধ্যা এ ঘর ভরে থাকে। কিন্তু সে সব রুটিন মত লোকজনে করে। রমাপতির কিছু ভাববার অথবা দেখবার সময় কোথায়!

অন্ধকার ঘরে এয়ার কণ্ডিসন মেশিনের একটানা গুমরে ওঠা শব্দে একটু একটু করে তন্দ্রার ঘোরে তলিয়ে গিয়েও রমাপতির বন্ধ করা চোখের সামনে সেই অচেনা লোকটির মুখ কয়েকবার উঁকি মেরে গেল। ঘুম আসছিল না। খাটে বেড সুইচের পাশে অন্য আর একটা সুইচ। এটাতে হাত ছোঁয়ালে বারান্দার একেবারে অন্য দিকে প্রাইভেট সেক্রেটারীর

ঘরে ঝন্ ঝন্ করে ঘণ্টার শব্দ বেজে ওঠে।

ঘণ্টার শব্দে অসময়ে তলব শুনে কমলেশ বলে ছেলেটি প্রায় ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল। নতুন কাজে যোগ দিয়েছে। কাজের ভার ক্রমশঃ এত বেড়ে গেছে যে, প্রাইভেট সেক্রেটারীরও একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নইলে চলে না।

"সুব্রত কোথায়?" দরজা খোলার শব্দে চোখ মেলে রমাপতি একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন কি? ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে কমলেশ জানালো—

"সুব্রতদা খেতে গেছেন।"

"এতক্ষণ কি করছিল?"

"আমরা চিঠিপত্রগুলি খুলে নোট করে রাখছিলাম, কবে কি ভাবে সব জবাব দেওয়া হবে।"

এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে রমাপতি বললেন—

"আচ্ছা সকালের দিকে ফটকের সামনে একটি লোককে লক্ষ্য করেছিলে?"

কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল কমলেশ। আজ সকাল থেকে এত অগুন্তি মানুষের আনাগোনা হয়েছে, কোন একটি মানুষকে বিশেষ করে মনে করার চেষ্টায় ওর মনের ভাবনাগুলো আরও জট পাকিয়ে গেল।

"লোকটা দুপুর পর্যন্ত বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলো ভেতরে ঢোকে নি।" "কোন ভিখিরি হবে হয়তো—" কমলেশ হাল্কাভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। হঠাৎ তারও মনে পড়ে গেল।

"হ্যাঁ স্যার লোকটাকে আমাদের অফিসের সামনেও দু একদিন ঘুরঘুর করতে দেখেছি। একদিন দারোয়ান ধরেছিল। দিনকাল তো ভালো নয়, চুরি-টুরি করার মতলব আছে কিনা কে জানে। আজই বাহাদুরকে বলে দেব অজানা অচেনা কোন লোককে হঠাৎ ফটকের ভেতরে যেন না ঢুকতে দেয়।"

"কটা বেজেছে?" রমাপতি পাশ ফিরে শুয়ে প্রশ্ন করলেন।

"আজ্ঞে দুটো বেজে সাতাশ। আপনার ঘুমের অযুধটা দেব? এখন একটু ঘুমিয়ে না নিলে বিকেলে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন—"

"দরকার নেই।" কথা বাড়তে দিলেন না রমাপতি। এখন মনে পড়েছে লোকটিকে সত্যিই অফিসের সামনে কয়েকদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। তাছাড়া বাড়ীর সামনেও। ঐ একই ভাবে চোখের চাউনীতে কেমন একটা দিশেহারা ভাব ফুটিয়ে। আরও মনে পড়েছে লোকটিকে দেখলেই তাঁর যেন চেনা চেনা লেগেছে। আজীবন চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে চলতে চলতে কখনো যেন এই লোকটি তার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাকি অংশটুকু কিছুতেই জোড়া দিয়ে গল্পটাকে সম্পূর্ণ করতে পারলেন না রমাপতি। বয়স হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি বোধহয় কমে যায়।

বয়স কত হোল তাঁর? আজকে সতেরই মে আজকের জন্মদিনে পুরো সাতষট্টি বছর পার হয়ে গেছে।

কিন্তু শরীরে মনে বার্ধক্যের গ্লানি কোথাও নেই। এখনও নিজেকে যথেষ্ট শক্ত-সামর্থ্য বলে মনে করতে পারেন রমাপতি। স্মরণশক্তিই কেবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বলে অনেক কিছুই মনে পড়ে না আজকাল।

যেমন এই লোকটিকে।

এপাশ ওপাশ করতে করতে উঠে বসলেন রমাপতি। একটা মাছির মত ঘুরে ঘুরে এক চিন্তা বার বার তাঁকে জ্বালাতন করছে। যতবার জোর করে সরিয়ে দিতে চাইছেন, ততবারই যেন ওর মুখটা আরও বেশী করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঘুম কেন, একটু তন্দ্রার ঘোর পর্যন্ত এলো না। বাধ্য হয়েই সিল্কের পাতলা নরম চাদর সরিয়ে উঠে বসলেন রমাপতি।

জানলায় ঘন সবুজ পর্দা টেনে অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। পর্দা সরিয়ে বকুল গাছ তলায় এখনও কি দেখা যাবে লোকটিকে? সাধারণতঃ কোন উত্তেজনা অথবা অনুভূতিকে যুক্তির উপরে স্থান দিতে রমাপতি চান না, কিন্তু এবারে কেমন একটা তাগিদ কিছুক্ষণের জন্যে মনকে বিচলিত করে তুলল। হুকে জড়ানো তারের বাঁধন ঢিলে করে পর্দার বাইরে তাকালেন রমাপতি।

এই জানলা দিয়ে ফটকের বাইরে বকুল গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। দুপুরে ঘূর্ণি হাওয়ায় পাতাগুলো দুলছে। নীচে খুব সরু একটুখানি ছায়াতে জড়ো-সড়ো হয়ে লোকটি বসে বসে ঢুলছে।

"আমাকে ডেকেছেন স্যার।" কমলেশ ঘণ্টার তলব শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল।

"লোকটা এখনও গাছতলায় বসে আছে দেখেছো? ওকে ডেকে নিয়ে এসো। এইখানে, এই ঘরে।"

"আজ্ঞে!" বোকার মত তাকালো কমলেশ।

"কথা বুঝতে দেরী হয় কেন?" ধমকের কড়া সুরে অপ্রসন্ন মেজাজ স্পষ্ট হয়ে উঠল—"বকুল গাছের নিচে যে লোকটা বসে ঝিমোচ্ছে তাকে এখানে ডেকে আনো।"

"আচ্ছা স্যার। এখুনি যাচ্ছি।" খরগোশের মত ভীত মুখে আর দ্রুত পায়ে কমলেশ কার্পেট মোড়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর শুয়ে থাকা চলে না। বিছানা ছেড়ে লম্বা আরাম কেদারায় বসে অসময়ে প্রকাণ্ড একটি চুরুট ধরালেন রমাপতি। আজ দিনটা বড়ই অনিয়মে কেটেছে। বিকেল থেকে আবার নতুন করে উৎসব-আয়োজন শুরু হবে। নিয়ম একবার ভাঙলে আবারও ভাঙ্গা চলে, এই কৈফিয়ত দিয়ে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে একমুখ সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে দরজার দিকে চোখ ফেরালেন।

লোকটি বোধহয় আগেকার চেনা জানা কেউ হবে। অবস্থার ফেরে পড়ে এখন পুরোন আত্মীয়তার কথা তুলে সাহায্য চাইতে এসেছে। সাহায্য ভাণ্ডারের খাতায় আজ নামটা লিখে নিতে বললেই হবে কমলেশকে। ঘরে ডেকে এতখানি কৌতূহল দেখানো হয়তো ভুল হয়ে গেল, এ কথাটা দুই একবার উঁকি মেরে গেলেও রমাপতি উৎসুক হয়ে উঠলেন।

কে জানে তাঁর জীবনের কোন অধ্যায়ের সঙ্গে এই লোকটির অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে।

"আসব স্যার"—দরজার পাল্লা ফাঁক করে কমলেশ তাকাল।

"এসো।"

কমলেশের পিছু পিছু মাথা নিচু করে ছেঁড়া ধুতির কোঁচা হাতের মুঠোয় ধরে খুব সন্তর্পণে ক্যানভাসের জুতোটা বাইরে খুলে খালি পায়ে ঘরে ঢুকল লোকটি। রমাপতি অপ্রসন্ন চোখে লক্ষ্য করলেন তার ধুলোমাখা পায়ের ছাপ ক্রিম রঙ্গের কার্পেটে বেশ স্পষ্ট দাগ ফেলেছে।

"তুমি যেতে পারো কমলেশ।"

"আচ্ছা স্যার।"

আরাম-কেদারার পাশে একটি খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইংগিত করলেন রমাপতি, কিন্তু বিহ্বল চোখে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়েই রইল। এবার বিরক্ত হলেন, শোবার ঘরে ডেকে এনে ভুল হয়ে গেছে, এ কথাও মনে হোল।

"এখানে বসুন।" গলা চড়িয়ে আদেশ করলেন রমাপতি। খুব কুণ্ঠিত ভাব করে জড়োসড়ো হয়ে লোকটি বসল।

"আপনি কে?"

"আমাকে আপনি বলবেন না," ঢোক গিলে ক্লান্ত ভাঙ্গা গলায় লোকটি বলল— "আমার নাম মোহিত হালদার।"

এখনও মনে পড়ল না, অনিশ্চিত চোখে একভাবে তাকিয়ে রইলেন রমাপতি।

"এক সময়ে অভয় গুহ লেনে আপনাদের বাসার উল্টো দিকে হলদে বাড়ীটায় থাকতাম। আমাদের দোতলার বারান্দা থেকে আপনার বৈঠকখানার ঘরটা দেখা যেত।"

রমাপতি নড়ে চড়ে উঠে বসলেন। অভয় গুহ লেনের দিনগুলি এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। স্যাঁত সেঁতে পুরোন বাড়ীর একতলার দুটি ঘরে ঠাসাঠাসি করে একটা গোটা পরিবার থাকতো। অভাব, অভিযোগ, হতাশা, উৎসাহ হারানো সেই দিনগুলোর স্মৃতি এখানে কেউ মনে করে রাখে নি। একমাত্র সুরমা মাঝে মাঝে বন্ধ জানালাটা খুলে সেদিকে তাকাতো। সুরমা দশ বছর আগে চলে গেছে। তারপর জানলা আর খোলেনি।

একটি ষোল সতেরো বয়সের গোল-গাল নিরীহ মুখ তাঁর মনে পড়ে গেল।

"তুমি মোহিত? একি চেহারা হয়েছে? বয়স কত হোল?"

মোহিত রমাপতির সযত্নে লালিত এখনও সুস্থ সুখী চেহারার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল—

"আমার বয়স তিপ্পান্ন। এখনও সেই পাড়াতেই আছি, যদিও বাবা মারা যাওয়ার পরেই বাড়ীটা দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে।"

অর্থাৎ অভাবের ফিরিস্তি দিয়ে গল্প শুরু হবে এখুনি, তবু রমাপতি কৌতূহল না দেখিয়ে পারলেন না।

"তোমার বাবার ব্যবসা তো ভালই চলছিল। দেনা হওয়ার তো কথা নয়।"

"ভুল লোককে পার্টনার করে বাবা ঠকেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর আমরা জানতে

পেরেছিলাম গোড়াতেও নানা গলদ ছিল। সে সব কথা জানতে পেরে মানুষের উপর আমার সব বিশ্বাস হারিয়ে গেছে রমাপতিদা।"

"তুমি আমার কাছে কি চাও?" রমাপতি টেবিলের টানায় ভরে রাখা মানিব্যাগে কত টাকা আছে মনে মনে একটা আন্দাজ করে নিলেন। একটা একশ টাকার নোট, ব্যাগে ভরতে গিয়ে অসাবধানে যার কোণটা ছিঁড়ে গেছে। তাছাড়াও খুচরো দশ টাকার খান ছয়েক নোট বোধহয় আছে। রমাপতির বড় ছেলে যখন তিন মাসের তখন বুকে সর্দি বসে কঠিন রোগ বাধিয়ে ছিল। মোহিতের বাবার কাছে কিছু টাকা ধার করতে গিয়েছিলেন রমাপতি। টাকা পেয়েছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে মেশা ছিল তাচ্ছিল্য আর অপমানের তীব্র জ্বালা। ভিক্ষা করে মানুষ বাঁচে না, এমন একটা রূঢ় মন্তব্য তাঁকে শুনিয়েই যেন ছুঁড়ে মারা হয়েছিল।

সে ধার তিনি অনেক কাল আগে মিটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। নতুন কেনা গাড়ীতে উর্দিপরা ড্রাইভার পুরু দামী এনভেলাপে ভরে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিল। নিজে যাননি তিনি। সুরমাকেও যেতে দেননি। পুরানো জীবনকে যে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াই ভালো সে কথা তাঁর মত আর কে জেনেছে!

"কিছু চাই না রমাপতিদা।" মোহিত শুকনো মুখে হাসল।

শ্বেত পাথরের গেলাসে বরফের টুকরো ভাসা মিছরি ভেজানো ডাবের জল কমলেশ নিজের হাতেই নিয়ে এল। রুপোর রেকাবীতে সযত্নে কাটা আম,তালশাঁস, ঘরে ছানা কাটানো সন্দেশ।

"এক থালা মিষ্টি আর জলখাবার বাইরে একে দিতে বলো—" মোহিতের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে রমাপতি আদেশ করলেন—"আর এক গ্লাস শরবত।"

"আচ্ছা স্যার—" কমলেশ মুখের রেখায় মনের ভাব ফুটতে না দিয়ে আদেশ পালন করতে ছুটল।

"কিচ্ছু চাও না? তবে এখানে এসেছ কেন? আজ নয় বেশ কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি তোমাকে।"

"আপনাকে দেখতে আমার ভালো লাগে। তখনও ভালো লাগত রমাপতিদা। আপনি জানেন না, আমি আপনাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত সময় দেখতাম। ঘরের সামনে ছোট উঠোনে যখন পায়চারী করতেন, জানলার ধারে বসে থাকতেন একা, চুপ করে, অথবা আমাদের বাড়ীর সামনে গলি দিয়ে দু বেলা যাতায়াত করতেন।"

আশ্চর্য হলেন রমাপতি। কিছুটা সন্দেহ হোল লোকটার মাথার ঠিক আছে কিনা। কিছু না বলে ব্যাগ থেকে সেই কোণ ছেঁড়া একশ টাকার নোটখানা ওর হাতে গুঁজে দিলেন। টাকা পেলে হয়তো আবোল তাবোল কথা আর বলবে না। টাকাটা অভিভূতের মত দু হাত দিয়ে চেপে মোহিত বলে উঠল—"রমাপতিদা, আজ এই টাকাটা না পেলে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের না খেয়ে থাকতে হোত।"

ভাঁজ কাটা গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

এবারে মোহিত বিদায় নিতে পারে ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন রমাপতি। কিন্তু মোহিত উঠল না।

"রমাপতিদা, আপনাকে দেখতে আমার কেন ভালো লাগে জানেন? সাফল্য আর বিশ্বাস এই দুটো একসঙ্গে আপনার জীবনে মিলেছে। নিজের চেষ্টায় আপনি বড় হয়েছেন, সম্পূর্ণ সৎপথে থেকে—এই কথাটা মনে করলেই যেন সেই হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস আবার ফিরে পাই।"

চমকে উঠলেন রমাপতি। সুরমার ছবির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন মুখটা যেন হাসছে। ওটা কি সুখের হাসি, না ব্যঙ্গের তির্যক ধারাল ফলা!

"আপনি যে আমার চোখে একজন কতবড় মহৎ পুরুষ, রমাপতিদা সে আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। আমার সব মনে আছে। আপনার হাতের মুঠোর সামনে বার বার অনেক প্রলোভন এসেছে, কিন্তু আদর্শের সেই সরু রাস্তাটা ছেড়ে আপনি কোনদিন এক পাও বিপথে বাড়াননি।" নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মোহিত বলল—

"মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে যাব রমাপতিদা।"

"তুমি আজকাল কি কর?" ধরা গলাকে বেশ পরিষ্কার করে রমাপতি জানতে চাইলেন।

"একটা সামান্য চাকরী করতাম। সেটা মাস তিনেক ছিল না বলে খুবই দুরবস্থায় দিন কেটেছে। তারপর আবার আর একটা পেয়েছি এ মাস থেকে।"

"আজ অফিসে যাওনি?"

"কাগজে দেখেছিলাম আজ আপনার জন্মদিন। তাই ছুটি নিয়ে এখানে এসেছি।"

টাকাটা সযত্নে বুক পকেটে ভরে মোহিত আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছু ডাকলেন রমাপতি।

"তুমি আমাকে এই আজগুবী গল্পটা বিশ্বাস করতে বল মোহিত? আমাকে শুধু দেখবার জন্যে এই গরমের কাঠফাটা রোদে সারাদিন বসে আছ?"

কিছুক্ষণ অপরাধীর মত মাটির দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল মোহিত! তারপর নিচু গলায় বলল—

"আপনি বুঝতে পারবেন না রমাপতিদা। আমার কথা কেউ বুঝতে পারে না। আমার বাবা লোক ঠকিয়ে দু হাতে টাকা উপায় করেছেন, আর সেই পাপের অন্ন খেয়ে আমরা মানুষ। কথাটা ভাবলেই বেঁচে থাকতে আমার ঘেন্না হয়। তখনই আপনার কথা ভাবি।"

"আমার কথা ভাবো?" সুরমার ছবি থেকে চোখ নামিয়ে আচ্ছন্নের ঘোরে রমাপতি বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ আপনার কথা। এক এক সময় মন অস্থির মন অস্থির হয়ে উঠলে আপনাকে দেখতে ছুটে আসি। সলতে ঠেলে দিলে যেমন আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি আমার মনের কোণে সেই নিভে যাওয়া বিশ্বাসও আবার ফিরে আসে দিগুণ হয়ে। আপনি জানেন না রমাপতিদা, আজকে আমার কি সৌভাগ্যের দিন।"

মোহিত একটানা কথা বলে চলেছে, কিন্তু রমাপতির কানে আর কিছু গেল না। অন্যমনস্ক হওয়ার ফলে সিগারে আগুন নিভে গিয়েছিল। সেটা ধরালেন না নতুন করে। সবুজ পর্দার ফাঁকে একটা ছবির মত বাইরের দৃশ্য একটুখানি দেখা যাচ্ছে। গাছের একটা ডাল, পীচ গলা নীল রাস্তা, আকাশের রোদ।

"আমি আজকে চলি রমাপতিদা।"

"দাঁড়াও—" ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠে রমাপতি গম্ভীর মুখে ওকে ফেরালেন। মোহিত বেশ খুশী হয়ে দরজার চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ফিরে এল। কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে বসার জন্যেই হয়তো ওর মুখের ক্লান্ত ভাবটা কেটে গেছে।

"তুমি কতটুকু জান আমার বিষয়ে? কি জানো?"

"আমি সব মুখস্থ করে রেখেছি রমাপতিদা। অভয় গুহ লেন থেকে আপনি কিভাবে চৌরঙ্গী পাড়ায় উঠে এলেন, অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে একটা ভাঙ্গাচোরা ব্যবসাকে দাঁড় করিয়ে তারপরে উন্নতির ধাপে ধাপে নিয়ে গেলেন।"

"দাঁড়াও—" আবার বললেন রমাপতি—"ব্যবসাকে কি করে দাঁড় করিয়েছিলাম সেটা কি তোমার জানা আছে?"

উৎসাহের মুখে মোহিত যেন একটা নদীর স্রোতের মত ভেসে চলেছে। কোন বাধায় ঠেকে সে থামতে চায় না।

"জানি বৈকি রমাপতিদা, আমি সব জানি। বৌদির গয়না বেচে টাকা যোগাড় করেছিলেন, কিন্তু অন্যপক্ষ থেকে যে ঘুষের লোভ আপনাকে দেখিয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করতে এতটুকুও দ্বিধা করেন নি। সমস্ত বাঙ্গালী জাতির আদর্শ আপনি। শুনেছি আপনার একটা জীবনী লেখা হচ্ছে। সে জীবনী পড়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু শিখবে।"

এক মুহূর্তের জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন রমাপতি, কিন্তু সুরমার ছবির দিকে চোখ পড়ামাত্র মনে হল হাসিটার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্নের বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা ঝিলিক মেরে উঠছে। নাকি সবটাই তাঁর মনের কল্পনা। ছবিতে কি মুখের ভাব বদলায়। কখনও মনে হয় অনেক দিন আগেকার মত সুরমা তাঁকে দেখে সুখের হাসি হাসছে। কখনও মনে হয় করুণা। কখনও বা তীব্র পরিহাস তাঁর বুকের শান্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। ছবির দিকে তাই আজকাল ফিরে তাকানোর তাগিদ কমে এসেছে।

"দাঁড়াও"—আবার মোহিতকে ডাকলেন রমাপতি। "আমি সুরমার গহনা বেচে টাকা যোগাড় করেছিলাম, এ কথাটা সত্যি নয়। সুরমার হাতের শাঁখা ছাড়া সেদিন আর কোন গয়না ছিল না। অথচ পনের হাজার টাকা সেই মুহূর্তে আমার দরকার। অভয় গুহ লেনের বাড়ীতে তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে বলে তোমার বাবা অহর্নিশি কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়ে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন। বড় ছেলের নিউমোনিয়া, বিনা ফিতে ডাক্তার আসতে রাজী হন নি। তাছাড়া একটা ইন্‌জেকশনের দামই পনেরো টাকা। মুদি গোয়ালার কাছে দাম বাকি পড়ছে তো পড়ছেই। তারা ছেলেমেয়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে শাপ-শাপান্ত করে চলেছে। তখন আমি কি করতে পারি?'

রমাপতি বলে চলেছেন, আর মন্ত্রমুগ্ধের মত মোহিত আড়ষ্ট হয়ে শুনছে। রমাপতির চোখ সুরমার ছবির দিকে, মোহিতের কথা তিনি যেন ভুলেই গেছেন।

"পনেরো হাজার টাকা! আমি জানতাম আমার ক্ষমতা আছে, আত্মবিশ্বাস আছে, শুধু নেই টাকা। টাকা যে করে হোক যোগাড় করতেই হবে। চেনা-পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে সারাদিন নাখেয়ে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে ফিরে এলাম সন্ধ্যার পর। ছেলেটা জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে।

সুরমার কিছুদিন ধরে শরীর খারাপ, কাশি সারছে না, ওজন কমে যাচ্ছে। ছেলের শিয়রে বসে থাকতে থাকতে সেও ঘুমে ঢুলে পড়েছে। আলো পর্যন্ত জ্বালা হয়নি। দেখে আমার মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠল।"

"কোথায় পেলেন টাকা?" মোহিত অস্পষ্ট অস্ফুটভাবে বলল।

"কোথায় পেলাম? তুমিই বল ঐ অবস্থায় মরিয়া হয়ে মানুষ কিভাবে টাকা যোগাড় করে। আমি চুরি করেছিলাম।" কথাটা নিজের কানেই কান্নার মত শোনালো। কিন্তু তার চেয়েও আরও করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠল মোহিত। ওর মুখের রং ছাই এর মত সাদা।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ও টাকা আমি চুরি করেছিলাম। কখন কিভাবে তা জানতে চেও না। কারণ কাউকে বলতে গেলে সে তোমাকে অবিশ্বাস করবে। এমনকি হয়তো আমিও তাই করবো। কিন্তু সব জেনেশুনে তুমি আর আমার সামনে দাঁড়িও না মোহিত। কোনদিন যেন তোমাকে আর দেখতে না পাই। চলে যাও।"

সুরমার ছবি থেকে চোখ নামিয়ে পাথরের মত নিথর আর একটা মুখের দিকে তাকালেন রমাপতি। আর একটিও কথা বলল না মোহিত। মুখ নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কমলেশ চারটের পর শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের তরফ থেকে পাঠানো প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া হাতে করে যখন ঘরে ঢুকল, অসময়ে রমাপতি আরাম কেদারায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজকে সকাল থেকেই অনিয়ম চলেছে। আরও আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন মনে করে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল কমলেশ। কার্পেটের এক কোণে একশ টাকার নোটখানা তখনই নজরে পড়ল। অসাবধানে রমাপতির পকেট থেকেই কোন রকমে পড়ে গেছে নিশ্চয়। ভাগ্যে সেই বাউণ্ডুলে চেহারার লোকটা দেখে নি। যে অদ্ভুত হাবভাব, নিশ্চয় কোন মতলব এঁটে এখানে এসেছিল। কমলেশ যখন তাকে জলখাবার আর শরবত খেয়ে যাওয়ার কথা বলল, কানে যেন কিছু শুনতেই পায় নি এমনিভাবে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

হেঁট হয়ে কোণছেঁড়া একশ টাকার নোটটা তুলে টেবিলের উপরে রুপোর কাগজ-চাপা দিয়ে চেপে রাখল কমলেশ। ফুলের তোড়াটা তারপরে সুরমার ছবির নিচে নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল খুব সন্তর্পণে, কোন শব্দ না করে।

স্নিগ্ধ গোলাপের গন্ধে চারদিক ভরে উঠল।

নায়িকা

ছবি বসু

বিজন সেন ছোটমাসীর ছেলেবেলার বন্ধু। কিশোরগঞ্জের বালিকা বিদ্যালয়ে একই ক্লাশে দুজনে পড়তেন। দুজনের মধ্যে যাতায়াত ছিল সেই সূত্রে, বড় হয়েও আমার আবছা স্মৃতির একজায়গা জুড়ে তিনি ছিলেন, আর পাঁচটি মেয়ে থেকে তিনি স্বতন্ত্র। কি যেন আকর্ষণ ছিল তাঁর মধ্যে সে কথা আমি বলতে পারব না। ছোটখাট বেঁটে আদুরি আদুরি মত মুখ চোখ ছোটমাসীর, কিন্তু বন্ধুটি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, ঋজু, তলোয়ারের মত ধারাল দেহ-ভঙ্গিমা।

পড়ার কথা নয়, দিন রাত্রি কি যেন চাপাস্বরে আলোচনা করতেন, বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ আরও বিস্ফারিত করে বলতেন আর হাঁ করে চুপচাপ শুনতেন ছোটমাসী। বড়রা ঠিক যে এতটা পছন্দ করতেন তা মোটেই মনে হত না। বলতেন বড় জেদী, একরোখা, বেয়াড়া মেয়ে বাপু। সুরমার মাথা খাবে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করতে পারলে যেন বাঁচতেন প্রাচীনারা।

ছোটমাসীর বিয়ে হয় ক্লাশ নাইনে পড়তে পড়তে। তারপর বিজন সেনকে একবার দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বছর দুই ধরে আবার দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলে। একদল বেপরোয়া ছেলেমেয়ের অবিশ্বাস্য সাহস আর আত্মদানের কাহিনী সকলের মুখে মুখে সংক্রমিত হতে থাকে।

অতর্কিতে বিজন সেনের নাম আবার শুনলাম, বাড়ির সবাই শিউরে উঠল—বিদেশী লাট সাহেবকে মারতে গিয়ে মাল সমেত ধরা পড়েছে বিজন সেন।

ছোটমাসী তখন শ্বশুরবাড়ি, আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটতে থাকে। মনে মনে গর্ব বোধ করি, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে কয়েক রাত্রি ঘুম হয় না। এমন আশ্চর্য মেয়ে একদিন আমাদেরই ঘরে বসে হয়ত এই দুঃসাধ্য কাজের শপথ নিয়েছে কিনা কে জানে!

কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে আর বহুকাল ধরে সেই এক কিশোরী মেয়ের বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি একটি কায়াহীন সঙ্গীর মত আমার পিছু নিয়েছে।

তারপর দীর্ঘ অনেকগুলি বছরের পদচিহ্ন পড়েছে। আবার বিজন সেনের সাক্ষাৎ মেলে ছোটমাসীর একটি চিঠি মারফৎ।

বেশ কয়েকমাস বাড়িতে বেকার হয়ে বসেছিলাম। অম্বিকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ধর্মঘটীদের সাথে হাত মিলিয়েছিলাম সেই অপরাধে ছাঁটাই হয়েছি।

এ-দোর ও-দোরে ঘোরাঘুরি করে হতাশার শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেচি—সে সময় ছোটমাসীই একদিন এসে বলল—

—মুরুব্বি না থাকলে শুধু শুধুই ঘোরাঘুরি করে মরবি। নিরাসক্ত গলায় জবাব দিই—সে তুমিও জান, আমিও জানি।

—তবে খুঁজে পেতে দেখ না কোন কাউন্সিলার নিদেনপক্ষে এম. এল. একে পাকড়াতে পারিস কিনা।

বিরুদ্ধ পক্ষ হলে অবশ্য সুবিধা হবে না।

বিরক্তি চেপে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করি। টের পেলে ছোটমাসী ক্ষুণ্ণ হবেন। আত্মীয়স্বজনের উপেক্ষা, টিটকিরি, হা-হুতাশ এমন কি স্ত্রী শমিতার বিদ্রূপের বাঁকা-বাঁকা কথা সহ্য হয়ে গেছে কিন্তু ছোটমাসীর আন্তরিকতার উচ্ছ্বাসে বিপন্ন বোধ করি। মুখের ওপর কড়া কথা শোনালেও তিনি নিরস্ত হবেন না। নেহাৎ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরণী তিনি। অভাব, অনটন, রোগ-শোক কোন কিছুই তাঁকে কাবু করতে পারেনি। আমার বাড়ির কাছেই থাকেন আর প্রায়ই এসে এসে খোঁজ খবর করেন।

সেদিন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। শমিতা একবার চেয়েও তাঁকে দেখল না, বসতেও বললনা। হঠাৎ যেন কূল পেয়ে বলে বসলেন—ঠিক আছে। বিজনকে একখানা চিঠি দিয়ে দিই।

—কে বিজন? বিজন সেন? আমার গলার রূঢ়তায় বিস্মিত হয়ে ছোটমাসী বলেন—আবার কোন্ বিজন? এককালে একসঙ্গে রাজনীতি করেছি যে?

ছোটমাসীর চোখে সলজ্জ হাসি। আমিও কৌতুক বোধ করি, রাজনীতি কবে করলেন ছোটমাসী? স্বপ্ন দেখেছেন তাও ত শিশুকালে। জীবনের কোনখানে কতটুকুই বা তার পরিচয়? ছোটমাসী কিন্তু বেপরোয়া। শমিতার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই বলেন—বিজনটা যখন ধরা পড়ল তার বছর দুই আগেই ত আমার বিয়ে হয়ে গেছে। ম্যাট্রিক পাশ করে ও যখন কলকাতায় পড়তে গেল তখন আমি এক ছেলের মা।

এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলি—রাজনীতিটা তবে কবে করলে? বিজন সেন তোমার ঘরে বসে ফিসফিস করতেন। তুমি হাঁ করে তার কথা গিলতে। ব্যস এই পর্যন্ত।

তিরিশ বছর—সে তোমায় চিনবে কি করে? আয়নায় মুখটা দেখে নাও না। চিনবার মত এখনও কিছু অবশিষ্ট রয়েছে কিনা।

শমিতা কাছেই ছিল। ছোটমাসী তাকে দোয়াত, কলম, কাগজ, আনতে বললেন।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে শমিতা তা এনে দিল। ছোটমাসী অনেকক্ষণ ধরে চিঠি লিখলেন। তারপর চিঠির কালি শুকিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন—আমার কথা সে ফেলতে পারে না দেখিস। যার তার জন্যে বলিনি, নিজের অপোগণ্ড মুখ্যুটার জন্যও বলিনি। বলেছি তোর জন্যে। আরে জহুরী কি আর হীরে চিনতে না পারবে?

ছোটমাসী চলে যাবার পর শমিতার মুখ যেন চতুর্গুণ খুলে এক একটি স্ফুলিঙ্গ চারপাশে ছড়িয়ে দিল—এক সঙ্গে রাজনীতি করেছি... ইস সেই গর্বেই গেলেন। গর্বেরও মানে থাকে যদি একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারতেন। বখাটে, বোম্বেটে ছেলে তাকে ধরে বেঁধে একটা হিল্লে করতে পারলেন না। এখন এসেছেন পরোপকার করে নাম কিনতে।

শমিতার নিষ্ঠুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়েও থমকে যাই। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আজ ওর মাথায়। মাস্টারি করে ঘরে টাকা আনছে, তাইতে রেশন আসছে। বাড়িভাড়া দিচ্ছি। গলা দিয়ে সেই ভাত দিব্যি তলিয়ে যাচ্ছে। সংসারের জাঁতাকলে চেপ্টে আদর্শ নিয়ে বিলাস করবার মত ওর ফুরসৎই বা থাকে কোথায়?

শমিতাকে তাই না জানিয়ে ছোটমাসীর চিঠিটা সম্বল করে একদিন [illegible] পটলডাঙ্গার বাড়িতে বিজন সেনের সঙ্গে আলাপ করতে এসে পড়লাম।

নিচতলাটায় স্কুল-বাড়ি। মধ্য-কলকাতা শিশু নিকেতন। বিজন সেনের হাতে গড়া বিদ্যায়তন। তাদের পেরিয়ে দোতলার নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম।

বিজন সেনকে চিনে নিতে কষ্ট হয় নি। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত বই-খাতার আড়ালে যে মানুষটির মুখ চাপা পড়েছিল তিনিই বিজন সেন। এককালে শুনেছি গড়ন ছিল তাঁর একহারা ছিপছিপে। এখন কেমন যেন কুঁজো দোমড়ান পাকান দড়ির মত তাঁকে মনে হল। কাঁচা-পাকা ঘন কোঁকড়া চুল অযত্নে ঘাড়ের কাছে পুঁটলির মত বাধা।

মুখ তুলে চোখাচোখি হতে মনে হল কালের সীমানা পেরিয়ে এখনও সেই চোখে স্বপ্ন গেঁথে রয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগের বর্ণনায় হয়ত ছোটমাসীর চিঠি উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে। সেই উচ্ছ্বাসের মাঝে নিজেকে খাড়া করতে কি রকম কিন্তু কিন্তু লাগল।

তার চেয়ে বরং অন্য সূত্রে কথাটা উঠুক না কেন?

তাঁর কথামত আসন গ্রহণ করে নাম করলাম কিশোরগঞ্জের সেই সদর সাবডিভিশনের মুখুজ্যেপাড়ার, আমার দাদু, ছোটমাসী, জোড়াদীঘির পাছে স্কুলবাড়ি, খেলার মাঠ আরও পূব পারে কালীতলা, পূজোমণ্ডপ।

কিশোরীসুলভ স্বপ্ন-ভরা দৃষ্টি যেন টোল খেয়ে গেল। নিষ্প্রভ, ভাবলেশহীন মুখে খুশি, ঝলসে উঠল। আন্তরিকতায় উদ্বেল গলায় বললেন—ওমা তুমি সেই মণীন্দ্র। মনে নেই বই কি! এখনও স্মৃতিশক্তি খোয়া যায়নি। সুরমার মনে রয়েছে ত আমাকে! কতদিন ওর কোন খবর শুদ্ধ পাই নি! ও তোমাকে বড় ভালবাসত।

বলি—এখনও বাসেন।

পকেট হাতড়িয়ে ছোটমাসীর হাতে-লেখা চিঠিটার স্পর্শসুখ অনুভব করি। এখানে আমাকে পাঠাবার জন্য তাঁর আগ্রহে উদ্বেল মুখটা মনে পড়ে। ভেবেছিলেন একটা কোন হিল্লে হয়ে যাবে বিজন সেনের কাছে এসে পড়লে।

ক্ষণেক্ষণেই ছোটমাসীর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কত দীর্ঘকালের ব্যবধান, কোন সম্পর্ক যোগাযোগই নেই আজ দুজনের সঙ্গে। তবু আগ্রহের অন্ত নেই।

বলি—আপনাকে জ্বালাতন করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। শুধু ছোটমাসীর বিশ্বাস ভাঙতে হবে এই শপথ নিয়ে এখানে এসেছি।

বিজন সেন যেন একটু বিস্মিত হয়ে চাইলেন।

—বিশ্বাসভঙ্গ!

—নয়ত কি? উত্তেজিত হয়ে পকেটের চিঠিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলি—বিশ্বাসভঙ্গ ত বটেই। ছোটমাসী হয়ত ভেবেছেন যে একদিন জীবনপণ করে বিদেশী শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন বলেই আজ অবলীলাক্রমে দু'চার লাখ টাকার পারমিটের আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

বিজন সেনের বিবর্ণ মুখ চোখেই পড়ে না। বেপরোয়ার মত বলি—ছোটমাসী

আপনাকে জহুরী বলে ভুল করেছেন। আমার মত হীরে চিনে নিতে নাকি আপনার গলতি হবে না। ও সব লাখ বেলাখের কথা ছেড়ে দিলেও সামান্য একটা চাকরি করেও কি আপনি আমায় দিতে পারবেন না? তাহলে আর ছোটমাসী আর বিজন সেনে তফাৎ কী?

মানসচক্ষে ভেসে উঠল ছোটমাসীর সংসার, কায়ক্লেশে কোনমতে টিকে থাকার জন্য কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। মেসোর মাথা খারাপ হয়ে মার্চেন্ট অপিসের চাকরিটি খোয়াতে হয়েছে। মাসী যান মাইল দুয়েক দূরে কোন এক মহিলা শিল্পাশ্রমে তাঁত বুনতে। আইবুড়ো বড় মেয়েটা সংসারের কাজ সারতে রাস্তার কলে যায় জল আনতে। সেখানে পাড়ার বকাটে ছেলেরা রোজই নোংরা ইংগিত করে।

মেয়েটা রোজই কাঁদে আবার কলে যায়। বড় ছেলেটা মানুষ নয়। ধরে বেঁধে আমিই তাকে একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। নিয়ম মত যায় না বলেই কাজটা তার খোওয়া গেল।

বিজন সেনের কাছে নিজের বিস্মৃত অতীত নিয়ে ছোটমাসী কোনদিনই দাঁড়ান নি, চিঠি দিয়েছেন আমার জন্য। ভেবেছেন বড় কাজের যোগ্য আমি। নিজের সহজাত মূল্যে আপনিই আমি আসন পেয়ে যাব।

চিঠিটা পড়ে বিজন সেন মুখ তুলে চাইলেন। পড়ন্তবেলায় তাঁকে আরও বিপন্ন মনে হচ্ছিল। নমস্কার করে উঠে পড়তেই আমায় আসতে বললেন বিজন সেন, আর কুঁজো নয়, শীর্ণ নয়। মনে হল অতীতের রক্তাক্ত যুগের নেত্রী দৃপ্ত পায়ে আমার সামনে এগিয়ে এসেছেন। বললেন—বোকা ছেলে, মাসীকে বলবে তার বিশ্বাসের জোর অটুট রয়েছে। অতীতের ত্যাগকে মূলধন করেছি বলেই ত ছোট হওয়া সাজে না।

আর কথা নয়, কোন কথা না বলে নিঃশব্দে সেদিন বেরিয়ে এলাম, শমিতাকে বলতে পারি নি মুখ ফুটে একটি কথাও।

শুধু ছোটমাসীকে বলেছি ঘটনাটা।

এরপর আরও কয়েক বছরের ব্যবধান, মোটামুটি একটা ভদ্র-গোছের কাজ নিজেই যোগাড় করে নিয়েছি। শমিতার হাতে মাস গেলে মাইনেটা তুলে দিয়ে নিজের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকি। ছোটমাসীর সঙ্গে যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শমিতা বুঝিয়েছে—ও সংসারের জন্য মাথা-ব্যথা করার অর্থ—মূর্খতা! পরের দারিদ্র্যের ভার গ্রহণ করবার মত আমাদের কাঁধ অত শক্ত নয়।

ছোটমাসীকে তাই সন্তর্পণে এড়িয়ে চলি। তবু বহুকাল বাদে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ও-পাড়ায় যেতে হয়েছিল। গলির মোড়ে ছোটমাসীর ছোটছেলেটা মার্বেল খেলছিল। আমায় দেখতে পেয়ে সার্টের হাতা ধরে টানতে টানতে ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে বলে—মণিদা, সত্যি বলছি একজন নতুন লোককে দেখবে এস আমাদের বাড়ি।

ঘর পুঁছতে পুঁছতে ন্যাতা আর বালতি হাতে ছোটমাসী এসে হেসে বললেন—'মণিই ত এখন নতুন লোক, ওর চেয়ে আর কে নতুন হতে পারে বল দিকি!'

আমার বিস্মিতদৃষ্টি অনুসরণ করে এলেন বিজন সেন, আজ আর চোখে তাঁর নেই সেই স্বপ্নময়দৃষ্টি। নরম গলায় বললেন—তোমার কথাই বলছিলুম 'মণীন্দ্র'। সেদিন রাগ করে চলে এসেছ। আমিও সব কিছু ফেলে চলে এলুম।

আমার সপ্রশ্ন মুখের ছবি ছোটমাসীর চোখে পড়ল। হাত ধুয়ে কাছে এসে তিনি বসলেন। সমবয়সী দুটি প্রৌঢ়া বান্ধবী আমার মুখোমুখি বসলেন।

আজ আমার মনের ক্ষত আর নেই তাই উত্তেজনা প্রকাশ না করেই ছোটমাসীকে তাঁর বন্ধুর সামনাসামনি সেদিনের ঘটনাটির পুনরুক্তি করলাম। বললাম—ভেবেছিলাম ছোটমাসী তোমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তুমি তলিয়ে গেছ। তোমাতে আর তোমার বন্ধু বিজন সেনে অনেক ব্যবধান।

অন্তত তোমার অনুরোধ মনে করে পুরোণো দিনের বন্ধুত্বের মূল্য দিতে আমার জন্যে সামান্য কিছু তিনি করতে পারতেন।

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম বিজন সেন যেন কৌতুক বোধ করছেন। চাপাহাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর অধরে। ছোটমাসীই সহজগলায় বললেন যে ভুলটা তাঁরই হয়েছিল। ত্যাগটা মূলধন করে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারলে আজ হয়ত বিজন সেন বাস্তবিকই আমাদের পাশে থাকতেন না। রাজ্য যাঁরা চালাচ্ছেন, উঁচু উঁচু মিশরের মত দপ্তর আলো করে বিজন সেন তাদেরই একজনের মত আলো করে রইতেন।

শুনলাম বিজন সেন তা পারেননি। নিজের বিবেক, নিজের আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে পারলেন না বলেই বহুদিন ধরে নিজের পরিশ্রমে গড়া শিল্প নিকেতন তাঁকে বন্ধ করতে হল। দলের লোকদের বিরাগভাজন হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে আসতে হয়েছে কৈশোরের মাসীর আশ্রয়ে।

ছোটমাসীর দিকে মুখ তুলে চাই। হতাশায় মর্মাহত হতে তাঁকে কোনদিনই দেখি নি। চাকরি পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করি নি। এ নিয়ে কোন অনুযোগ নিয়ে আমার বাড়িতেও তিনি যান নি।

চোখ মেলে দেখি বিজন সেনের স্বপ্ন ছোটমাসীর চোখে—

বললেন—তোকে ভুল করে বিজনের কাছে পাঠিয়েছিলাম মনী। তাহোক সেই ভুলের জোরেই ওকে কতদিন পর ফিরে পেয়েছি।

তাহলে উনি তোমার আশ্রয়েই এসেছেন? আমার গলায় শ্লেষের পরিচয় পেয়েও মাসী ক্ষুব্ধ হলেন না।

বললেন—দূর পাগলা, কে কাকে আশ্রয় দেয়। দুজনে মিলে এই দুঃখী ছেলেমেয়েদের নিয়েই শিল্প-নিকেতন আবার গড়ে তুলব।

বিকৃত গলায় বলি—মেয়েকে আর রাস্তার কলে জল ভরতে পাঠাও না ত?

মাসী উচ্ছ্বলিত হয়ে হেসে উঠলেন—

—নাও কথা, আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ে কি আর পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবে। হাসিকে বিজন পড়াচ্ছে, ও বলছে খুব বুদ্ধির ধার আছে নাকি মেয়েটার। ভবিষ্যতে একদিন এ স্কুলটার ভার ওই নিতে পারবে।

একটা কিছু রূঢ়ভাবে বলতে গিয়েও বাধবাধ ঠেকল। কিছু না বলে প্রায় পালিয়ে চলে আসি।

মনে মনে ভাবি কে আমার নায়িকা। বিজন সেন না ছোটমাসী?

জন্মান্তর

আশা দেবী

মনের মিল একটি অদ্ভুত বস্তু। সারা জীবনেও হয় তো একজনের সঙ্গে মনের মিল হলো না আবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে একজনের সঙ্গে মনের আশ্চর্য্য মিলের সূত্র পাওয়া গেল। নইলে কুসুম সাত মাসের ছেলে ফেলে কালিকানন্দের সঙ্গে পালিয়ে আসবে কেন?...

কালিকানন্দ ভৈরব হলেও গৃহস্থের সাংসারিক বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো না সে। শ্রীঘরের ভয়ে কুসুমকে ভৈরবী সাজিয়ে সোজা কুম্ভ-স্নানে পাপস্খালনের জন্য চলল। কালিকানন্দ এ সব দিক থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ। কিছুদিন নাগাদের সঙ্গে—কিছুদিন হরিদ্বারে কঙ্কাবাসে ঘুরে কুসুমকে সন্ন্যাস ধর্মে খানিকটা রপ্ত করিয়ে এবং দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে একেবারে কাশীতে এনে ফেললেন। দশাশ্বমেধের ঘাটের শ্মশানের পাশে সে নিজের আস্তানা গেড়ে বসল।

সকাল বেলাতেই সোয়া তিন টাকার গাঁজা কলকেতে পুরে ভৈরব প্রচণ্ড টান দিয়ে বুঁদ হয়ে বসল ; আর নাকে মুখের যাবতীয় রন্ধ্র দিয়ে কুণ্ডলীতে ধোঁয়ার কালো রেখা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগলো। কুসুম শ্মশানের একটু কাছেই বসেছিল। চোখে তার জল টল টল করছে। সামনেই বাঁধানো জায়গাটায় একটি শিশুকে বুকে পাথর বেঁধে গঙ্গার বুকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে—কুসুমের বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠলো এতদিন পরে—মনে হলো অনেক দিন আগে যে খোকাকে সে ফেলে এসেছে কোথায় যেন এর সঙ্গে তার মিল আছে।

'এই কুসমী—ওঠ্। ভৈরব প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো! 'বসে বসে কাব্য করা হচ্ছে। বাজার যা; যা হয় কিছু কেনা-কাটা করে আন।'—

'আমার ভালো লাগছে না। তুমি যাও।'—

'মাইরী আর কী—? তুমি যাও—। আমার বিয়ে করা বৌ-রে বাজার করে খাওয়াব! যা—যা শিগগির।'—

কুসুম উঠলো—বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বাজারে গেল না। সোজা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলো।

কার ছায়া যেন আজ তার চোখের ওপর এসে পড়ে সমস্ত মনটা বিকল করে দিয়েছে। বুকের কাছে যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দুটো মুঠো— ; হঠাৎ চমকে ওঠে কুসুম—না রুদ্রাক্ষের মালা। ...সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম থাকতে নেই।

ভৈরব তাকে সব সময় আজকাল পীড়ন করে। নেশায় কম পড়লে মার-ধোর করতেও ছাড়ে না। মন ভাল থাকলে আদর আব্দার করে বটে তবে তার সংখ্যা আজকাল হাতে গোণা যায়। চরস খেয়ে পড়ে থাকে—পেলে চণ্ডুও খায়, গাঁজা তো নিত্য সাথী। মেজাজ যেমন রুক্ষ কথাগুলোও তেমনি কঠিন। কথার ঘায়ে যেন ভৈরব তাকে আজকাল ফুঁড়ে ফুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে চায়।

ঘর ছেড়ে আসবার সময় কিন্তু এ জীবন সম্পর্কে তার কেমন যেন একটা মোহ ছিল। কেন ছিল সে তার মনকে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু কোন উত্তর পায়নি।

একটা লোক বাজার করে যাচ্ছিল, তাকে যাঁড়ে ধরেছে কপির পাতা খাবার জন্যে।—হ্যাট-যা-যা। চমকে তাকালো কুসুম। কত বেলা হয়ে গেল—এখনও সে বাজার করেনি। হয়তো এতক্ষণ ভৈরব কালভৈরব হয়ে বসে আছে। ও আবার ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না মোটেই। হঠাৎ পা চালিয়ে চললো কুসুম।

বাড়ির কাছে আসতেই এক নারী কণ্ঠের খল খল হাসির শব্দে চমকে উঠলো কুসুম। কার সঙ্গে কথা বলছে ভৈরব?

'আরে ছেড়ে দাও—কুসমীর কথা। ও না কাজের, না কামের—শুধু বসে বসে মুখ গোমরা করে থাকতে পারে। কি ভাবে সারাদিন ওই জানে?'

'তোমার তো ওকেই পছন্দ—

'কে বললে—? আছে সঙ্গে,—আছে। তোর সঙ্গে যে হরদুয়ার থেকে ভাব। তখন বললাম চলে আয়। এলি না। জানি আসতেই হবে। ভৈরবের টান চুম্বকের টান। আসতে হলো কিনা, বল?'

'হলো—। কিন্তু তোর ভৈরবীর কি হবে?'

'চুপ থাক তুই—আমি…'।

আর থাকতে পারলো না কুসুম। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো।—হাতের থলিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে বললেঃ 'কে?'

'নেকি, আমাকে চিনলে না?—নিশি' ভৈরবী হাসলো।

'চিনি বৈকি? তো এখানে কেন? খোঁড়া কোথায়?'

'তাকে ছেড়ে এসেছি। সারা জীবন ধরে কি খোঁড়ার সেবা করবো না কি? তার ওপর তার একশ' বাহানা। প্রাণ যেন ঝালা-পালা করে দিলো! শীতের দিনে এই আগুন জ্বালো, হাত সেকো, পা সেকো, আবার গরম পড়লে খাটিয়া নিয়ে আয় বাইরে—। নইলে চৌপর রাত পাখা চালা। হাতের পাখা পড়লো কি এক পায়ের গুতো দেবে—এমনি। মরুক এবার পচে গলে, কে দেখে দেখবো।—ওর চেলা আবার মারে আমাকে। ভিক্ষেয় যা পাই কেড়ে নেয়। ইয়া তাগড়া গুণ্ডা—ও খোট্টার সঙ্গে পারবো কেন! রাতে শুয়ে ছিলো ত্রিশূল দিয়ে একটা চোখ কানা করে দিয়ে এসেছি। মরুক হেদিয়ে এক-চোখ বজ্জাত এবার।'

কুসুম চমকে উঠলো ঃ 'কি মানুষ তুমি। শুনলেও গা-শিউরে ওঠে।'

'আহা, মরে যাইরে দরদী। ভরা সংসার, অমন শিবের মত স্বামী—কোলের ছেলে—দুধের শিশু, তা রেখে কেমন করে এলে **চাঁদ!** কোন প্রাণে শুনি?—'

কুসুম কথা বলতে পারলো না। খানিকক্ষণ **চুপ** করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেল।

পেছন থেকে একটি পুরুষ এবং নারী কণ্ঠের সমবেত হাসির ধ্বনি যেন বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলো। কুসুম এবার যেন ছুটে পালাতে চাইলো ওখান থেকে।

শ্মশানের কাছে একটু উঁচু জায়গায় বসে রইলো কুসুম গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। কত লোক আসছে—কত যাচ্ছে। স্বামী স্ত্রী হাত ধরে আঁচলে আঁচলে বেঁধে গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে।

তারও তো সংসার ছিল। সুরেশ্বর রায় উকিল। তাঁর প্রাকটিসও ভালো—প্রচুর পসার। কুসুমকে দেখেই বিয়ে করেছিলেন। বাড়িতে চাকর দাসী লোক জন সবই। কুসুমকে সুরেশ্বর ভালো বাসতেন খুবই, কিন্তু গুরুপুত্র কালিকানন্দই মধ্যে থেকে সব গোলমাল বাধালো।

অযাচিত সহানুভূতি, উপদেশ আর ভালবাসার প্রদর্শনী তাকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আনল। তখন মনে হলো সব সুখ বুঝি ওপারে। মুখের কাছে অযাচিত সুধাপাত্র ধরা আছে তাকে প্রত্যাখ্যান করাই বাতুলতা। তারপর অত্যন্ত সংযত এবং ভদ্র সুরেশ্বরের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একদিন ধীরে ধীরে গুরুপুত্র ছুঁচ হয়ে প্রবেশ করে ফাল হয়ে বেরোল।

ভারি ভাবতে ইচ্ছে করে তার স্বামী কি তাকে ক্ষমা করেছেন? লোকের মুখে শুনেছিল সুরেশ্বর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। কুসুমের বিরুদ্ধে কখনও কোনো অভিযোগও করেনি। তবে—?

এখন কোর্ট থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ তার গায়ের কোট খুলে নেয়—পায়ের জুতো খুলে দেয়। আবার এগিয়ে—

...হঠাৎ চমকে উঠলো কুসুম। একটা মর্মান্তিক দৃশ্য সকলের চোখের সামনে তীক্ষ্ণ হয়ে বেজে উঠলো। একটি ষোড়শী...কত আর বয়স...ষোল কি সতেরো চোখের জলে যেন তার গাল দুটো ভেসে যায়...মাথার রুক্ষ্ম চুলগুলো এলোমেলো বাতাসে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে; সমস্ত গালে মুখে কপালে সিঁদুর লেপা—মৃতের পায়ের ওপর পাগলের মত মাথা কুটে কুটে কাঁদছে।

স্ত্রী নিশ্চয়ই—বুড়ো স্বামী। তবু তা সত্ত্বেও তাকেই সে ভালোবেসেছিল। সমস্ত মনটা যেন কুসুমের মোচড় দিয়ে উঠলো বেদনায়। হয়তো নিজের ব্যর্থতার কথা ভেবেই তার এমন লাগছে।

আর বসে থাকা গেল না। উঠে আসতে হলো। কিন্তু তার ঘরের আর এক দৃশ্য। পাক-শাক শেষ করে নিশি আর ভৈরব আহার সমাপন করেছে। আচমন করে বদন প্রক্ষালন করতে গেছে ভৈরব, নিশি তামাক সাজার ব্যবস্থা করছে।

মীমাংসাটা কত সহজে হয়ে গেল তাই ভাবছে। হয়তো বা এ জীবন এমনি সহজ। এদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের মধ্যে বাধ্যবাধকতা খুবই কম। ইচ্ছা হলে থাকাও যত সহজ চলে যাওয়া তার চেয়েও বেশী সোজা। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেই অনর্থের সম্ভাবনা।

নিশি যেন কতদিনের পাতা সংসারে এসে বসেছে এমনি ভাব। যেমন স্ত্রী সংসার ফেলে বাপের বাড়ি যায়, আবার আসে। তামাক হাতে নিয়ে নিশির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে লাগলো ভৈরব। কুসুমকে কেউ একবার একটা কথা জিজ্ঞেসও করল না।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। ওপারের রামনগরের দুই একটি করে আলো জ্বলে ওঠে। গঙ্গার মন্থর জলে জোয়ারের চেতনা লাগে। একটু একটু করে জল বাড়তে থাকে। কাদা-মাখা ঘোলা জল একেবারে এপারের স্নানের ঘাটের ফাটা সিঁড়িটা স্পর্শ করে। হিন্দুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথের মন্দির থেকে আরতির বাজনা শোনা যেতে থাকে।

তারই সঙ্গে মিলিত একটা হরিধ্বনি যেন চারিদিকের সুর কেটে দেয়।

নিশি বললে ঃ 'ওই এলো আর একটা।'

ভৈরব বললে ঃ 'অন্নকূটের সময় বুঝি কলেরায় মরেছে,—মড়ক লেগেছে শুনেছি।'

'দেখিস বাপু সাবধান। তোকে 'ঝোলায়' না ধরে।' নিশির মুখ দিয়ে মাতৃভাষা বেরিয়ে গেল। কলেরাকে সে ভারি ভয় করে। আর তার চেয়েও বেশী রোগীর সেবা। তার ভারি খারাপ লাগে এ কাজ। নমঃশূদ্রের ঘরের মেয়ে নিশি। বরিশালের গ্রামে—বাড়ির পাশের বিশিষ্ট পরিবারের এক ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে দেশত্যাগী হয়। বাড়ির লোকের ভয়ে সে কিছুদিন পালিয়ে থাকে। তারপর একদিন কি জানি কি কারণে সামান্য ঝগড়ার সূত্র ধরে সে ছেলেটির মাথায় চেলা কাঠ দিয়ে আঘাত করে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। তারপর তীর্থে তীর্থে—কখনও এর সঙ্গে—কখনও ওর সঙ্গে।

সেবার ভারি শীত। প্রয়াগে অগস্ত্য-বাস করবার জন্য গিয়েছিলো এক ঊর্দ্ধবাহু সাধুর সঙ্গে। রাতে হঠাৎ ঘরে আগুন লাগে। নিশি পালায় কিন্তু সাধুটি পুড়ে মরে। নিশির অবশ্য তাকে বাঁচাবার কোন তাগিদ ছিল না। এখন মরে গিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করল। এখন সে নিজের ইচ্ছেয় চরে বেড়ায়।

বুড়োর চিতা এতক্ষণে নিভে গেছে। একটা দুর্গন্ধ আর বিশ্রী অনুভূতি ওদের মনের ওপর দিয়ে অন্ধকারের মতো বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে এতো আলো থাকলেও এ দিকটা ছায়াচ্ছন্ন। দুই তিনটে চিতা থেকে পোড়া কাঠ কয়লা এখনো সরানো হয়নি। সামনে ধ্বংসাবশিষ্ট চিতাগুলো যেন কেমন খাপ-ছাড়া দেখাচ্ছে। ওদিকে আরো একটা চিতা প্রায় পুড়ে পুড়ে নিবে আসছে। কাঠ কয়লার রাশি রাশি অঙ্গারের মধ্যে সাদা সাদা হাড় পাঁজরগুলো নিষ্ঠুর ভাবে যেন তাকিয়ে আছে। একটা চিতার আধ পোড়া পা থেকে একটা তীব্র দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। পোড়া মাংসের গন্ধে যেন বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে।

কুসুম বসেই রইলো। কোথায় ফিরবে সে?—এত সহজেই ভৈরব তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারলো। নিশির বয়েস অল্প—স্বাস্থ্য ভালো।—কিন্তু…

হোক, কিন্তু—পুরুষের জান্তব চোখে এর চেয়ে আর কিছুই বেশী করে ধরা পড়েনি? স্নেহ, দয়া, মায়া, সেবা কালিকানন্দের কোন প্রয়োজন নেই?

চিতার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে কখন যেন একটু ঝিমুনি এসেছিল চোখ খুলতেই শুনলো ঃ 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে'—দণ্ডী বাবা স্নানে নামছেন।

উঠে পড়ল কুসুম। আর ভৈরবের কাছে ফিরে যাবে না সে। বেরিয়ে পড়বে যেদিকে দুচোখ যায়।—

কত যাত্রীর ভীড়। কত লোক।—ছত্রের কাছে বসে বসে দেখতে ভালো লাগছে কুসুমের। একটি আধবুড়ো লোক তার বন্ধুর সঙ্গে এসেছেন অন্নকূটে। পুত্র পুত্রবধূ সঙ্গে।

সুরেশ্বর বাবু—এ যে এই দিকে আসুন। একি আপনার বক্তিয়ারপুরের ঘাট পেলেন নাকি?

চমকে উঠলো কুসুম!—মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার, তারপর উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ ঠিক সেই লোক—সেই নাম—সেই গ্রাম। এ তো তারই খোকা...ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে। কিন্তু সাত মাসের ছেলে কি আজ তার মাকে চিনতে পারবে—?

'ও ভৈরবী, শিগগীর যাও। ও দিকে তোমার ভৈরবের উল্টা হয়েছে—দাস্ত হচ্ছে। কাছে কেউ নেই?'

'কেন সেই সখের—ভৈর'...

মুখের কথা তার শেষ হলো না। লোকটা বললে, 'পালিয়েছে তার যথা সর্বস্ব নিয়ে। ভৈরব বোধ হয় বাঁচবে না—অজ্ঞান হয়ে আছে।'

ওরা তখন এগিয়ে যাচ্ছে কুসুমের সমস্ত মন যেন পাগলের মতো ছুটে যেতে চাইলো ওদের পেছনে। যে জীবনকে সে বিশ্বাস করে না মিছিমিছি তার সঙ্গে নাটকীয় আত্মীয়তার অভিনয় আর কতদিন করবে সে?

'কি চাও গো, ভিক্ষে?'—সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলো। 'সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছো কেন?'—

'ধন্যি কাশীর ভিখারী, পকেটে হাত পুরে টাকা তুলে নেয়। দিও না বাবা। একটাকে দিলে হাজারটা এসে ধরবে।—তখন?'...কিন্তু সুরেশ্বর যেন অনেকক্ষণ তাকিয়ে কি দেখলো—চিবুকের তলায় একটা মস্ত জরুল। ঠিক এখনও সেখানেই আছে।

'ওকে একটা টাকা দিয়ে দে খোকা; যাও আর ঝামেলা করো না।'

হাত পাততে গিয়েও পারলো না কুসুম, ছুটে চলে গেল—পাগলের মতো পালাতে চাইলো ওদের চোখের সামনে থেকে। একটু বিভ্রান্তি এসে গিয়েছিল—একটু দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিল মন। ওরা এখন ওর কেউ নয়। ওদের চোখে ও ভিখিরী।—

ফিরে এলো যখন তখন দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদে চারিদিক পুড়ে যাচ্ছে। আর একা পড়ে ভৈরব চিৎকার করছে—জল—একটু জল দে।

ঘর খালি। কলস শূন্য। কুসুম ছুটলো কলস নিয়ে গঙ্গার দিকে। জোয়ারে গঙ্গার কাদা মাখা জল তখন একেবারে স্নানের ঘাটের ফাটা সিঁড়িটা স্পর্শ করেছে।

আত্মজা

মহাশ্বেতা দেবী

রানিখেতের মল-এ এক কুয়াশাঢাকা সকালে বিনু আবার বোনটিকে খুঁজে পেল। ভীষণ দরদস্তুর করে পেঁপে কিনছিল বোনটি, হাতে একটা বেতের ব্যাগ। কালো কোটের কলার একটু তোলা, পায়ে জুতো, মেয়েটিকে ভীষণ চেনাচেনা মনে হচ্ছিল।

'বাঙালি মেয়ে'। ওর বন্ধুরা একটু হাসল। বিনু বাঙালি দেখলে এখনো হেদিয়ে গিয়ে আলাপ করে, কলকাতায় কোথায় থাকে নামঠিকানা বাতলে দিয়ে আসে, বন্ধুরা সেজন্যে ওকে কাঠগুদাম ছাড়বার পর থেকেই ঠাট্টা করছে।

শুধু কট্টর নীতিবাদী রাম যোশী ভুরু কুঁচকে বললে 'মেয়েই যদি দেখতে চাও তা হলে নৈনিতালে থাকলেই পারতে।'

বিনু বললে, 'এক মিনিট ভাই! মেয়েটি আমার চেনা', পাথরে পা দিয়ে ও লাফিয়ে নেমে এল। 'এই বোনটি' বিনু ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শুনতে বোকাবোকা, কিন্তু ফুলপিসিমা ওর একটি ছেলে আর মেজমেয়ের ডাকনাম ভাইটি আর বোনটি রেখেছিলেন। কিংবা উনি রাখেননি ওরা দুজনে দুজনকে যা বলে ডাকত সেটাই ডাকনাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ওর ভাল নাম নীলাঞ্জনা।

'আরে বিনু যে!'

ওরা দুজন প্রায় সমবয়সী। এক বাড়িতে পিসতুতো-মামাতো, অনেকগুলি ভাইবোন গুঁতোগুঁতি করে মানুষ হলে যা হয়, এক সময়ে ওদের খুব ভাবও ছিল। বোনটি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ফুলপিসিমা তো বিনুকেই সন্দেহ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোর সঙ্গে ঘুরত-ফিরত তুই জানিস না কোথায় গেছে? ছি ছি বিনু, তুই যে এতখানি নীচ তা আমি ভাবিনি।'

ফুলপিসিমার দাদা, বিনুর বাবাও চ্যাঁচামেচি করেছিলেন। ওঁদের কী করে ধারণা হল বিনুও জড়িত সেকথা বিনু আগে বোঝেনি। তারপর বুঝেছিল বিনুর সঙ্গে বোনটির ভাব আছে বিনুকে ফুলপিসিমারা সবাই ভাল ছেলে বলে মনে করেন, বোনটি এর দুটোকেই নিজের কাজে লাগিয়েছিল।

ততদিনে বিনুরা আলাদা বাড়িতে উঠে এসেছে। বোনটি যখন-তখন বেরোবার জন্যে বিনুর নাম ব্যবহার করত।

'বিনুর সঙ্গে গিয়েছিলাম, বিনু মোড় অব্দি পৌঁছে দিল', বাড়িতে প্রত্যেক দিনই এসে বলত। কাজেই 'আমার খোঁজ কোরো না, লাভ হবে না', লেখা চিঠিটা আবিষ্কার হবার পর ফুলপিসিমা বিনুর কাছেই ছুটে এসেছিলেন।

মা, বাবা, পিসিমা সবাই ওদের মেলামেশাকে কী চোখে দেখেছে, বিনুকে কতখানি দুর্বলচিত্ত মনে করেছে টের পেয়ে বিনুর মাথাকাটা গিয়েছিল। তারপর বোনটির ওপর রাগ হয়েছিল। মিছিমিছি ওর নামকে নোংরা করবার জন্যে বেজায় চটে গিয়েছিল বিনু।

এখন সেকথা মনে পড়ল। ফুলপিসিমা সেদিন অব্দি বলতেন 'যদি কোথাও দেখতে পাস ওর মুখখানা মাটিতে ঘষে দিস বিনু', কিন্তু ইদানীং আর কিছু বলেন না। বোধহয় ওঁরা ধরেই নিয়েছেন ওঁদের মেয়ে আর নেই। পাঁচ বছর যখন খবর পাওয়া যায়নি তখন মরে গিয়েছে নিশ্চয়।

পিসেমশায় আবার বড্ড বেশি গোঁড়া। উনি তো ছোটোমেয়ের বিয়ের আগে স্পষ্ট বলে দিলেন, 'আমার দুই মেয়ে, অঞ্জনা আর রঞ্জনা। অন্য কারো নাম আমি শুনতে চাই না।'

বিনুর চট করে মনে হল বোনটির সঙ্গে দেখা হবার চমকপ্রদ খবরটা সত্যেন রায় রোডে কাউকে দেওয়াও যাবে না। পিসেমশায় বাঘ। ফুলপিসিমা ছোটোমেয়ের কাছে বেড়াতে গেছেন। ওঁদের একমাত্র ছেলে, বোনের নাম শুনতে পর্যন্ত রাজি নয়।

'বাবার কথার ওপর আমার কথা নেই ভাই—' ওর সাফ জবাব। মাকে পর্যন্ত বলে দিয়েছে 'যদি আমাকে চাও, তা হলে এ বাড়িতে ওর নাম পর্যন্ত কোরো না মা। আমাদের কথা ও যদি তিলমাত্র ভাবত তা হলে বুঝতাম!'

বোনটির হাতে কাচের চুড়ি, গলায় মঙ্গলসূত্র দেখতে দেখতে বিনুর মনে হল মেয়েটা একেবারে পাল্‌টে গিয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওর কথা কাউকে বলা যাবে না ভাবতে ওর খারাপ লাগল।

'তুমি কি বেড়াতে এসেছ?' বোনটি ওর লজ্জা কাটাতে চেষ্টা করছে। এই পাঁচ বছরেই চেহারা ভারী হয়ে গিয়েছে। কে বলবে এই মেয়ে এক সময়ে ভাল নাচত, থিয়েটার করত।

'অফিসের কাজে।'

'কী অফিস?'

বিনু নাম বললে।

'কদিন থাকবে?'

'সাতদিন।'

আসলে চারদিনের মেয়াদ কিন্তু বিনু নিজেই জানে না কেন দুম করে মিছে কথা বলে বসল। এতক্ষণে সম্ভবত যাওয়া-আসার কথা উঠল বলে বন্ধুদের কথা মনে পড়ল।

'কোথায় থাক বোনটি?'

'এই তো, পি ডবলিউ ডি বাংলোর বাঁদিকে একটু এগিয়ে আমাদের বাড়ি। ডাক্তার ঠক্‌কর এখানেই চেম্বার করেছেন। যাবে?' বোনটি হঠাৎ সাহস করে জিগ্যেস করে ফেলল।

'ডাক্তার ঠক্‌কর কোথায়?'

'এখন শহরে। ওষুধের দোকানে একটু বসেন। লাঞ্চে আসবেন। তুমি কোথায় উঠেছ? ও, তোমাদের তো আপিস থেকেই বন্দোবস্ত করে।'

'চলো, বাড়িটা দেখেই আসি।' বিনু ওকে দাঁড়াতে বলে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। বন্ধুরা বেকারি থেকে রুটি কিনছে।

'লাকি চ্যাপ!' রাম যোশী বললে।

'কে বাবা?' মদন পেরো জিগ্যেস করলে। এক বিনু ছাড়া চারজনই অবাঙালি যদিও সবাই বাংলা বলে। বিনুর মনে হল মদন পেরেরার সঙ্গে বরঞ্চ ঠক্‌করদের কোনো-না-কোনো রকম আত্মীয়তা থাকলেও থাকতে পারে, আর যা হোক একই রাজ্যের লোক তো! হয়তো বোনটি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলেও সহজ বোধ করবে কিন্তু বিনুর সঙ্গে কথায়বার্তায় ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা আড়াল এসে গিয়েছে।

'আমার পিসতুত বোন।' বিনু সংক্ষেপে জবাব দিল।

'এখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। তোমরা যাও।'

'আরে, আমরা চৌবাটিয়া যাব।'

'আমি না হয় কাল যাব।' বিনুকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ও বিব্রত, বোধহয় উদ্বিগ্নও খানিকটা। 'অলরাইট' বলে ওরা চলে গেল। অফিস ওদের হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত করেছে। মল-এর ওপরেই ওদের হোটেল।

বোনটির বাড়িতে বিনু বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল। ছোটো বাড়ি, সামনে একটু বাগান। জানলা দিয়ে নিচের চীরবন দেখা যায়। খণ্ড খণ্ড কুয়াশা চীর গাছের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। অনেক নিচে বোধহয় কেউ কাঠ কাটছে তার ঠকাঠক শব্দ ভেসে আসছিল। কোথায় রেডিওতে গানের শব্দ।

বোনটি রান্নাবান্না নিজেই করে। বিনুর জন্যে চা করতে গিয়ে ও উধাও হয়ে গেল। বোধহয় বিনুর সামনাসামনি আসতে এখনো লজ্জা পাচ্ছে।

এই ডাক্তার অমৃতলাল ঠক্‌করের বয়স বাযট্টির কম নয়। কলকাতায় থেকে থেকে উনি একেবারে বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। পিসেমশায়ের বাড়ির সবাই ওঁকে 'কাকা' বলত, বিনুরাও বলত। ছেলেবেলা থেকে ওঁর ওখানে ওরা চিকিৎসা করাচ্ছে। বিনুরা গেলে উনি ওদের লজেন্স দিতেন। ছবির বই, পেনসিল। বিনু রোজ একটা ডাব্বাওয়ালাকে হোটেল থেকে খাবার আনতে দেখত। বাড়িতে রান্নার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। ভাসাভাসা শুনেছিল ওঁর বউ বম্বের এক বড়লোকের মেয়ে, বাপের ওয়ারিসান। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে উনি বম্বেতেই থাকেন। স্বামীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। দুপক্ষই দুপক্ষ সম্পর্কে একেবারে চুপচাপ। ডাক্তার ঠক্‌কর কখনো বম্বে যেতেন না।

পিসেমশায় বলতেন, 'মরে গেলে, লোকটা টাকাকড়ি সব চ্যারিটিতে দিয়ে যাবে জানলে?'

কলকাতার গুজরাটি সমাজে ওঁর খুব একটা যাতায়াত ছিল না। যদিও ডাক্তার হিসেবে সব সমাজেই ওঁর মোটামুটি পসার ছিল।

বয়স আঠারো হতে না হতেই বোনটির মুখে অসম্ভব ব্রণ বেরিয়েছিল। কী রকম চাপা আর গম্ভীর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল ওর, কারো সঙ্গে বেশি কথা বলত না। বিনুর এখন মনে পড়ল দুবার বোনটি ওকে নিদারুণ লজ্জায় ফেলেছিল। ওদের বয়স যখন বছর বারো,

তখন ঘর অন্ধকার করে চোর-চোর খেলছিল ওরা। বাইরে ভীষণ বৃষ্টি। ছাঁট আসবে বলে গোটা বাড়িটাই দরজা-জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা একেবোরে একটা বন্ধ কৌটোর মতো।

সেই সময়ে বোনটি ওকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরেছিল। বিনু প্রথমটা খেলা-খেলা মনে করে, কিন্তু পরে 'এই ছেড়ে দাও, কী হচ্ছে?' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে মণ্টুটা ফট করে বাতি জ্বেলে দিয়েছিল। বিনু তো অপ্রস্তুত, কিন্তু বোনটি বললে 'বিন্‌টা খেলা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি আর খেলব না।'

আরেকবার তখন ওরা নতুন বাড়িতে চলে এসেছে, ওদের বাড়িতেই পোস্টম্যান-পোস্টম্যান খেলা হচ্ছিল। বোনটি ওর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল 'এই পোস্টম্যান, তোমাকে তো কেউ চিঠি দেয় না, আমি একটা চিঠি দিলাম। তুমি পড়ে দেখো।' চিঠিটায় লেখা ছিল 'বিনু স্বাতীকে বিয়ে করবে।'

স্বাতী পাশের বাড়ির মেয়ে। বিনু তাকে কোনোদিন ভাল করে চেয়েও দেখেনি। স্বাতীদের বাড়িতে একটা আইসক্রিম বানাবার কল ছিল, আর পাড়ায় একবার ছোটদের মেলা হল যখন, বিনুরা সেই কলে এন্তার আইসক্রিম বানিয়ে বিক্রি করেছিল। স্বাতীর দাদা ছিল মেলার পাণ্ডা।

সেদিনও বিনু কম অপ্রস্তুত হয়নি। বোনটিকে ওর একটু ভয়-ভয়ই করত অনেকদিন পর্যন্ত। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই, সতেরো বছর বয়সে বোনটি পাড়ার একজন আসল পোস্টম্যানের হাতেই চিঠি গুঁজে দিয়েছিল একটা। লিখেছিল 'আপনার সঙ্গে আমার অনেক গোপন কথা আছে'।

পোস্টম্যান আবার সে-চিঠি এনে পিসেমশায়ের হাতে দেয়। উনি যতই চেঁচান কুরুচি, কুশিক্ষা এইসব বলে, বোনটি একেবারে নির্বিকার। কেন লিখেছিস। ওকে কেন লিখেছিস, একটি প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি। বিনুর পরে মনে হয়েছে মেয়ের ওপর ওঁদের খুব একটা বিশ্বাস ছিল না বলেই বিনুকেও ওঁরা অবিশ্বাস করতে পেরেছিলেন। সে অবিশ্বাসের স্মৃতি এখনো বিনুকে লজ্জা দেয়। শরীর ঘেমে ওঠে ওর, মনে হয় এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে সবাই ওকে দুশ্চরিত্র মনে করবে। বিনুর মা যদিও ফুলপিসিমাকে ঝরঝরিয়ে অনেকগুলো খরখরে কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঘর সামলে পরকে বলতে এস। তোমার ও মেয়ে হাড়ে বজ্জাত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা ঝুলোঝুলি করত!'

বিনুও বিশ্বাস করে মেয়েটি বজ্জাত। নইলে ডাক্তার ঠক্‌করের কাছে গেলি ব্রণর চিকিৎসা করতে, ডাকতিস 'কাকা' বলে। কেমন করে কোন রুচিতে লোকটাকে বিয়ে করে চলে গেলি। ও বাড়িতে কোন্ মেয়েটার বিয়ে উনিশ বছরের মধ্যে হয়নি? তোরও হতো। বিনুর মা ঠিকই বলেন। কিছু কিছু মেয়ে আছে তারা বিশ্বসংসারকে জ্বালাতেই আসে।

ডাক্তার ঠক্‌করের চেহারা চোখে পড়ার মতো। কাটা-কাটা মুখ চোখ, কালো রং, মুখের হাসি মিষ্টি। মাথার চুল অনেকদিন ধরেই ধপধপে সাদা। ওখানে ওঁর পসার এমন

কিছু ফলাও ছিল না। ধর্মতলায় ছোট্ট একটা ঘরে দিনে আলো জ্বেলে পাখা ঘুরিয়ে টেবিলের পেছনে বিরাট একটা গণেশের ছবি ঝুলিয়ে উনি ডাক্তারি করতেন।

এখানে পাখাটা ঘুরছে না বটে, কিন্তু সেই সবুজ রেক্সিনের টেবিল, দেওয়ালে গণেশ, টেবিলে, কাচের নীচে 'গড ইজ গুড', অল্‌জ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্‌জ ওয়েল' লেখা কাগজের টুকরো চাপা দেওয়া। তা ছাড়া কাগজের ফুল। বিবর্ণ, পাঁশুটে কতকগুলো কারনেশান। এই তো ঘরের বাইরে উৎসুক শিশুদের মতো উজ্জ্বল সোনালি ক্যানা, পোর্টিকোতে নীলমণিলতার ফুল, টবে এখনো ডালিয়া। যার বাগানে এত ফুল সে কাগজের ফুলে ঘর সাজায় কেন?

এখন বিনু দেখতে পেল পাশের দেওয়ালে একটি মেয়ের ছবি, ছবি ঘিরে কাগজের ফুলের মালা।

'চা খাও।' বোনটি ঘরে ঢুকেছে।

'ওটা কার ছবি?'

'ওর মেয়ের।'

'মেয়ের?'

'হাঁ বিনু। এ বাড়ির কোনো ঘরে জানো আমার একটাও ছবি নেই। প্রতিটি ঘরে ওর মেয়ের একেকটা ছবি দেখতে পাবে। এমন কি জানো? ওর পকেটে পর্যন্ত মেয়ের ছবি থাকে।'

বোনটি হঠাৎ হাসতে লাগল। ওর হাসি দেখতে দেখতে বিনু বুঝতে পারল হাসিটা হিস্টিরিয়ার। চীনে ধাঁধার একটা টালি যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন বসিয়ে দিতেই ছবিটা পরিষ্কার। আর বুঝতে ভুল হবার কথা নয়। হিস্টিরিয়ার হাসি বিনু আগেও দেখেছে। নিশ্চয় দেখেছে কোথাও নইলে চট করে বুঝে ফেলল কী করে?

হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে বোনটি মুখে আঁচল চাপা দিল। বলল, 'বিকেলে এসো বিনু। বাড়ি তো দেখে গেলে।'

ডাক্তার ঠক্‌কর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিনু ওঁকে আলগোছে একটা নমস্কার সেরে বেরিয়ে এল। বোনটির হাসির শব্দ। একটা প্রচণ্ড চড় মারল কে। হাসি নেই। চীরবনের গভীর থেকে কাঠ কাটবার ঠকাঠক শব্দ। বিনু রাস্তায় পা দিল।

'বাড়ি ফিরে চলো বোনটি।' সন্ধ্যার আকাশের নিচে বসে বিনু বলছিল। এখন বাড়িতে কেউ নেই। ঘরে বাতি। বাতির চারপাশে পোকা উড়ছে। বোনটি চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে।

'বাড়ি ফিরে চলো। ভুল করেছ বলেই ভুলের জের টেনে চলতে হবে তার কোনো মানে নেই।'

'বাবার বাড়িতে?'

'ফুলপিসিমা আছেন।'

'না।' বোনটি মৃদু বিষণ্ণতায় মাথা নাড়ল, 'তুমি তো জানো বাবা কতটা শক্ত হতে পারেন। দাদাও বাবারই মতো। বাবা কতবার মা-কে বলতেন এ বাড়িতে তোমার শুধু খোরপোষের অধিকার, মনে নেই? দাদা বউদি একবার রানিখেতে এসেছিল। ওর সঙ্গে দেখা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল জান?'

'তুমি কেন এমন কাজ করলে বোনটি?'

'কী জন্যে করেছি বলে মনে হয়?'

'জানি না। বুঝতে পারি না।'

'আমি কিন্তু অনুতাপ করি না বিনু। শুধু ও যদি আগে নিজের মন একটু স্পষ্ট করে বুঝত।'

'ও কি তোমায় কষ্ট দেয়?'

'কষ্ট কাকে বলে বিনু?' বোনটির স্বর যেন ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে, কুয়াশার মতো থিতিয়ে যাচ্ছে কোনো অন্ধকারের বুকে। দূরে চীরগাছের মাথার ওপর দিয়ে কোনো উপত্যকার আলো। ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে একটা গাড়োয়ালি বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছে। 'হোম, সুইট হোম' গানের সুর চীরবনের মাথায় ছড়িয়ে গেল।

'মনের কষ্ট'।

'বুঝি না।' বোনটি কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ওর মেয়েকে ও দু বছর বয়সের পর দেখেনি জানো?'

'কী করে জানব বল?'

'মেয়ের মা দেয়নি। কোনো সম্পর্ক ছিল না ওদের মধ্যে। এমনকি ওর মেয়ের বিয়ের খবরও ডাক্তার পায়নি। কাগজে দেখে একটা চেক পাঠিয়েছিল, চেক ফেরত আসে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে জানো? কার ছেলের সঙ্গে?'

একটি বিখ্যাত হোটেল মালিক পরিবারের কর্তার নাম করল বোনটি। ভারতের প্রতি হিলস্টেশনে ওদের বড় বড় হোটেল আছে। সবশুদ্ধ চল্লিশটি।

'আমাকে বিয়ে করবার জন্যে ও যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল বিনু। আমি তো ওকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু ও আমায় ভাল না বেসেই বিয়ে করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছিল কেন বল তো?'

বোনটি কথা বলতে বলতে অস্থির একটা আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিনুর মনে হল অনেকদিন ও কথা বলতে পায়নি।

বিয়ের পর বোনটি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল যখন ডাক্তার ঠক্কর ওকে কিছুতেই স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাননি। 'আমাদের বিয়ে অনেকদিন অব্দি শুধু কাগজকলমের বিয়ে ছিল বিনু!' বোনটি বারকয়েক বলল। ও বোধহয় ভাবছিল বিবাহিতা মেয়েরা যেমন করে বোঝে, বিনুর মতো আনাড়ি ছেলেরা তেমন করে এসব কথার গুরুত্ব বোঝে না। কিন্তু বিনু বললে, 'আমি বুঝেছি।'

ডাক্তার ঠক্কর ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়েছিলেন। বোনটি পরিবারের কারো সহযোগিতা পেল না সেজন্যে উনি অপ্রতিভ হয়েছিলেন। অনেক ফুলটুল এনে ঘর সাজিয়েছিলেন। বিনুদের আর বোনটিদের বাড়ি বাদ দিয়ে অন্য রোগীদের ডেকেছিলেন রিসেপশনে। চীনে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, গুজরাটি, সিন্ধি, বাঙালি, মারাঠি সবাই এসেছিল।

ফুলশয্যার রাতে বোনটি যখন বসে বসে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময়ে ঘরে এলেন ডাক্তার ঠক্কর। ওঁর হাত ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন 'আমি অন্যায় করেছি নীলা।'

অন্যায় কেন হবে? লোকের চোখ না হয় অস্বাভাবিক কিন্তু ওরা দুজনে তো দুজনকে ভালবেসেছে। ভালবাসার মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে কেমন করে?

ডাক্তার ঠক্কর হঠাৎ বলেছিলেন 'আমার একটি মেয়ে আছে নীলা! ও কি আমায় ক্ষমা করবে?'

বোনটি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ঠক্কর তো ওকে সব কথাই বলেছিলেন। ওঁর স্ত্রী-কে একদিন উনিই ত্যাগ করে চলে আসেন। স্ত্রীর অপরাধ ওঁর বাবা স্যার দয়ারাম, ওঁরা ভীষণ বড়লোক। স্ত্রী ভেবেছিলেন হয়তো মেয়ের সঙ্গেও বাপের কিছুটা সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু ডাক্তার ঠক্কর সেকথা শোনেননি। পরে ডাক্তার ঠক্কর চলে আসবার পর বছর বারো কেটে যেতে হঠাৎ ওঁর মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছে হয়। তখন মেয়ের মা ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করে চিঠি লেখেন। মেয়ে জানে না ওর বাবা একজন সামান্য ডাক্তার মাত্র। মেয়ের কাছে একটি কাল্পনিক পিতার কাল্পনিক চেহারা গড়ে তোলা হয়েছে। এখন আর যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়।

ভদ্রমহিলা পরের দিকে খুব ধার্মিক হয়ে গিয়েছিলেন, ধর্ম-ধর্ম বাই, ধর্মশালা করে দেওয়া, এইসব নিয়ে থাকতেন। ডাক্তার ঠক্করকে সান্ত্বনা দিয়ে উনি জানালেন, 'মেয়ে তো দাদুর আদরে নিজের ইচ্ছেমতো জীবন কাটায়। আমি থাকি আমার ঠাকুরদেবতা নিয়ে। ধর্ম একটা ফুলটাইম চাকরি বললেও হয়। তুমিও ঠাকুরদেবতাকে ডাকো, শান্তি পাবে।'

কিন্তু শান্তি তো ডাক্তার ঠক্কর চাননি, চেয়েছিলেন মেয়েকে। যতদিন ইচ্ছে করলেই যেতে পারতেন, মেয়েকে দেখতে পারতেন, ততদিন মেয়ে সম্পর্কে বোধহয় কোনো কথাই ভাবেননি। কিন্তু এখন চেকপোস্ট বসে যাবার পর হঠাৎ ওকে ভালবাসতে শুরু করলেন। মেয়ে যদি এক কাল্পনিক বাবার কাল্পনিক ছবিকে স্বীকার করে নিতে পারে, উনিই বা কেন কাল্পনিক এক আত্মজাকে ভালবাসতে পারবেন না? রক্তমাংসের মেয়ে তো তাঁরই সৃষ্টি, কল্পনার মেয়েকে তিনি আবার সৃষ্টি করলেন। শান্ত, সুন্দর, শ্রীময়ী একটি মেয়ে। বাবার জন্যে যে অস্থির, উদ্বিগ্ন। মেয়ে যে বাবাকে ক্ষমা না-ও করতে পারে তা ডাক্তার ঠক্কর ভাবেননি। স্ত্রী লিখেছিলেন ও এক কাল্পনিক পিতাকে জানে। উনি ভেবেছিলেন স্ত্রী নিশ্চয় ওঁর প্রতি খুব নির্দয় হবেন না। মেয়েকে জানতে দেবেন ওর বাবা খারাপ লোক নয়। ডাক্তার ঠক্কর ভেবেছিলেন বউ অত্যন্ত ধনী এবং জাঁহাবাজ বলে

তাকে ছেড়ে এসেছেন। সেটা আর এমন কী অপরাধ? সেজন্যে কি প্রভাবতী দয়ারাম এতদিন রাগ পুষে রাখতে পারেন? আর, ডাক্তার ঠক্কর ছেড়ে এসেছেন বলেই না ভদ্রমহিলা ঠাকুর-দেবতা, ধর্ম-কর্ম করতে পারছেন?

ডাক্তার ঠক্কর প্রভাবতী দয়ারামের রাগের ও আক্রোশের পরিমাপ বোঝেননি। ছেড়ে যাবার জন্যে স্বামীকে উনি ক্ষমা করেননি, কোনোদিন না। উনি ছেড়ে এলে সেটা অলরাইট হতো, কিন্তু তাঁকে, দয়ারামের মেয়েকে ছেড়ে চলে যায়, লোকটার এতবড় আস্পর্ধা? মেয়েকে বলেছিলেন, 'বাবার কথা তোমার ভাববার দরকার নেই। বেঁচে আছে এইটুকু জেনে রাখো শুধু। তোমার বাপ একটা অপদার্থ।'

মেয়ের কাছে মা যতটা সত্যি ছিল বাপ ততটা নয়। ডাক্তার ঠক্করের কল্পনার মেয়ে দ্বিতীয় আত্মজা, বাবার স্নেহমমতা পাবে বলে কোথায় যেন অপেক্ষা করত। তাঁর রক্তমাংসের মেয়ে দাদুর আদর আর টাকার বন্যায়, পার্টি থেকে পার্টিতে খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াত। বিয়ের পর ওর উচ্ছৃঙ্খলতা আরো বেড়ে যায়। টাকার সঙ্গে টাকার বিয়ে, ফলে এই অতৃপ্তি, অসুখ আর অশান্তির জন্ম।

বোনটি তো সব কথাই জানত। বলত, 'কেন তোমার এ অপরাধবোধ? আর যে মেয়ে-মেয়ে করে তুমি অস্থির হচ্ছ সে কি তোমার কথা ভাবে?'

ডাক্তার ঠক্কর নাকি বলতেন, 'নীলা তুমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলতে চাও? ওআন্ট টু ডেস্ট্রয় হার ইমেজ?'

বোনটির মনে হয়েছিল, তোমার কল্পনায় ও শিশু, নিষ্পাপ বালিকা। তাকেই ভালবেসে যদি সুখ পাও তো তাই পেলে না কেন? আমাকে কেন মাঝখান থেকে আমার সমাজ-সংস্কার থেকে ছিঁড়ে আনলে?

ডাক্তার ঠক্কর বলেছিলেন, আগে উনিও নীলাকে ভালবেসেছেন। এখনো বাসেন। তবু কেন যেন দোষী-দোষী মনে হয় নিজেকে। মনে হয় মেয়েকে মেয়ের প্রাপ্য স্নেহ-মমতা দিইনি সেটা অপরাধ।

শুনে বোনটি খেপে যায়। সেই থেকেই যে মেয়েকে দেখেনি, যাকে জানে না, তার ওপর ওর ভয়ানক হিংসে হয়।

বোনটি বলতে লাগল, 'মেয়ে মেয়ে আর মেয়ে! আমি একদিন বলেছিলাম, তুমি একটা শয়তান, তোমাকে জেলে পোরা উচিত। ও বললে হ্যাঁ নীলা, কেস করলেই তুমি মুক্তি পাও। আমি ওকে মুক্তি দিতে চাইনি। ভালবাসাই একমাত্র বেঁধে রাখবার ক্ষমতা রাখে না বিনু। ঘৃণাও মর্মান্তিক টানে টানতে পারে। তুমি কি ভাব আমি ওকে ছেড়ে গেলেই সমস্যার মুক্তি হবে? কখনো না। দুজন দুজনের মধ্যে এত বেশি জড়িয়ে গেছি বিনু, এখন যেখানে যাব সেখানে আমার মধ্যে ও-ও থাকবে। আমার সাধ্যি কী ওর থেকে মুক্তি পাই, ওর সাধ্য কী আমার থেকে মুক্তি পায়? দুটো সাপের মতো পরস্পরকে গিলতে গিলতে আমরা এখানে এসেছি।'

'শুনতে জঘন্য, কিন্তু ওকে আমি নিদারুণ আঘাত করেছি। মেয়ে আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নাও এ কথাও বলেছি। ও বলেছে ছি ছি নীলা, তুমি কী বলছ? মেয়ের সম্পর্কে আমার তো একটু স্নেহ শুধু···আমি বলেছি তা হলে আমাকে ভালবাসতে পারছ না কেন।'

'ও হতাশ হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকেছে। বলেছে আমি তোমায় ভালবাসি নীলা। বুড়ো হয়ে গেছি তো! কেমন করে বোঝাব বল? আমি তো ওর বুকে আছড়ে পড়েছি বিনু, জড়িয়ে ধরে বলেছি বয়সের কথা বোলো না। আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি ওদের কথা ভুলে যাও। ওরা তোমার জন্যে কেয়ারও করে না। হ্যাঁ বিনু, আমি তোমায় খুব ফ্র্যাঙ্কলি বললাম সব। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। আমরা এক ঘরে, এক বিছানাতেই ঘুমোই। কিন্তু কাছাকাছি আসা এত কঠিন বিনু! যা-হোক, একদিন কাগজে দেখলাম ওর মেয়ে আর জামাই রানিখেতে আসছে। ওদের নতুন কেনা হোটেলে।'

ডাক্তার ঠক্‌কর বললেন, 'আমি যাব।'

বোনটি বলল, 'তুমি যেও না।' ও বুঝতে পেরেছিল এতদিনে একটি মেয়ের মৃত্যু আসন্ন। ডাক্তার ঠক্‌করের 'কল্পনার সেই শান্ত, সুন্দর, শ্রীময়ী আত্মজা এবার মরে যাবে। বহুদিন বেঁচে আছে মেয়েটি, ডাক্তার ঠক্‌করের ক্ষুধিত কল্পনায় একটু একটু করে বড় হয়েছে। এখনও শুধু এক অফুরন্ত ভালবাসা, অসীম করুণা, অপার ক্ষমা। অথচ এমন সুন্দর মেয়েটাকে সরস্বতী গ্রেওয়াল এক মিনিটে মেরে ফেলবে। বোনটি সেই সময়ে ডাক্তার ঠক্‌করের কল্পনার সরস্বতীকে ভালবেসে ফেলেছিল।

কোন গল্প যদি জানা থাকে, সে গল্পের সিনেমা দেখতে দেখতে যখন মনে হয় এমন সুন্দর ছেলেটা বা মেয়েটা এখনি মরে যাবে, তখন যেমন কষ্ট হয়, বোনটিরও তাই হয়েছিল।

কিন্তু ডাক্তার ঠক্‌করও ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বোনটির মতো নিউরোসিস না থাক, ওঁর মেয়ের ওপর ভালবাসা, নিউরোসিসের মতোই তীব্র। বোনটি বলেছিল, 'যেতে চাও যাও, কিন্তু জেনে রেখ, লাথি খাওয়া কুত্তার মতো তুমি আমার কাছেই ফিরে আসবে। আমি বলছি তুমি যেও না।'

সরস্বতী গ্রেওয়াল ডাক্তার অমৃতলাল ঠক্‌করকে দেড় মিনিটের ইন্টারভিউ দিয়েছিল। লাউঞ্জে বসেছিল ও, পরনে লাল স্ল্যাকস, হাতে ড্রিঙ্ক। একটু পরেই ওকে আদর্শ গৃহকর্ত্রী হতে হবে। একজন মন্ত্রী চম্বা থেকে ফিরছেন, রানিখেতে হল্‌ট করবেন। ওদের হোটেলেও কয়েকজন ভি-আই-পি আসবেন। শাড়ি পরতে হবে মনে করেই সরস্বতীর কান্না পাচ্ছিল।

ডাক্তার ঠক্‌করকে দেখে ওর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

'আমি তোমার বাবা···'

'প্লিজ গো অ্যাওয়ে।'

'আমি তোমার বাবা একটু কথা বলেই চলে যাব।'

'রিয়ালি!' সরস্বতী কোনো সদ্য বরখাস্ত অবুঝ চাকরকে বোঝাবার ভঙ্গিতে আঙুল তুলে বলেছিল 'আমি তোমায় চিনি না, চিনতেও চাই না। আমার স্বামী তোমার অস্তিত্বই জানেন না। তুমি চলে যাও।'

মেয়েটির স্বামীও ঘরে ঢুকেছিল। অত্যন্ত বড়লোকের (এক পুরুষের বড়লোকের বলাই ভাল) অভ্যস্ত দুর্বিনয়ে বলেছিল 'লোকটা কে ডার্লিং? কী চায়?'

'আমাকে দেখতে চায়।'

'দেখেছে তো। এখন যেতে বলো।'

'ইয়েস। গো অ্যাওয়ে।'

সরস্বতী শেষের কথাটা চেঁচিয়ে বলেছিল। ডাক্তার ঠক্করের চোখে জল এসেছিল। রক্তমাংসের সরস্বতী ওঁর কল্পনার সরস্বতীকে মেরে ফেলল। এর চেয়ে যদি না আসতেন এখানে নীলা···ঠিকই বলেছিল।

লাথিখাওয়া কুকুরের মতো বোনটির কাছে ছুটে এসেছিলেন ডাক্তার ঠক্কর। বলতে চেয়েছিলেন, 'ও আমায় চিনতে লজ্জা পেল নীলা···তুমি আমায় ক্ষমা করো। এখনি তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

বোনটি বললে, আমি তো জানতাম ও আসবে বিনু। আমি তো জানতাম ওর মেয়ে প্রথমে বাবাকে, তারপর নিম্নবিত্তদের ঘেন্না করতে শিখেছিল। ওর মেয়ের কাছে হয়তো এদেশের সবাই নিম্নবিত্ত। তা, ওদের আন্দাজে ময়লা জামাকাপড়পরা লোক দেখলেই ওর হিস্টিরিয়া হতো। আমি জানতাম ডাক্তার আমার কাছেই আসবে, আর ওর চোখে জল দেখলেই আমি সব ভুলে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আমি চৌবাটিয়া চলে গিয়েছিলাম বিনু, ট্যাক্সি নিয়ে।

'আমি যে জানতাম ওকে দেখলেই সব ভুলে যাব। আমি যে ভুলতে চাইনি। কেন একটা মিথ্যে কল্পনাকে ভালবাসতে গিয়ে ও আমার উপর অবিচার করেছিল? কেন নিজের মন বোঝেনি। এতদিন ও আমায় শাস্তি দিয়েছে, এবার আমি ওকে শাস্তি দিলাম। সেদিন ওর মুখটা কেমন হয়েছিল জানো? দুবার লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো।'

বিনু অস্বস্তিবোধ করছিল। ক্রমেই বোনটি অচেনা মনে হচ্ছিল তার, যেন অপরিচিত।

'তারপর ওর মেয়ে মারা গেল।'

'সে কি?'

'আমেরিকায়। যখন মেয়ে মারা গেল সেদিন ও দরজা বন্ধ করে বসেছিল বিনু, আর আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। এতদিনের দুঃখ আর অভিমান, সব। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে দোর খুলতে অনুনয় করছিলাম বিনু। বুঝতে পারছিলাম কী ভুল করেছি এতদিন ধরে। মিছেমিছি কী নিচে নেমে গিয়েছি আমি। কিন্তু ও বেরিয়ে এসে কী বললে জানো?'

'কী?'

'কে মারা গিয়েছে, কী হয়েছে আমি কিছুই জানি না তো!' আমি বললাম—'সরস্বতী।' ও বললে 'সে কে?'

বোনটি আবার হাসতে লাগল। হাসি আর ডুকরে কান্নার মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগল ওর গলা দিয়ে। ও বলল 'ওইটেই ওর শাস্তি দেওয়া। সরস্বতীর নাম পর্যন্ত করে না বিনু, কখনো ওর কথা বলে না। আমরা যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেলাম। কাছে যাই, সে সাধ্যও নেই, ছেড়ে যেতেও পারি না। কিছুই যেন করে উঠতে পারি না আমরা। আমাকে ও এখনো যত্ন করে, আদরে মুড়ে রাখে। হিস্টিরিয়া বাড়লে চড়চাপড়টা মারে হয়তো, সকালে হয়তো টেরও পেয়েছ।'

'বোনটি, এভাবে সম্পর্ক টেনে রেখে কী লাভ?'

'জানি না। তোমার তো রবীন্দ্রনাথের সে গল্পটা মনে পড়ে বিনু, আমারও মনে হয়, আমাদের দুজনের মাঝখানে সেই মরা মেয়েটা শুয়ে আছে। ওকে আমরা ডিঙোতে পারি না। মাঝে মাঝে হয়তো দুজনে একটু কাছে আসি, মনে মনে শান্তি পাই, কিন্তু তখনই মেয়েটা এসে আড়াল করে দেয় সব। আমার তো লজ্জা, আমিও তো ওকে ঘেন্না করেছি।'

'এরকমভাবে কতদিন চলবে বল?'

'জানি না, জানি না বিনু। ওকে ভাল বেসে বেসে, ওর মেয়েকে হিংসে করে করে আমি যেন ফুরিয়ে গিয়েছি, আর কিছু করবার জোর নেই আমার, আর কিছু ভাববার শক্তি নেই।'

অন্ধকার। রানিখেতের ওপর কুয়াশার ঘেরাটোপ নামছে। নামতে নামতে চীরবনের ওপর সাদা চাদর টেনে দিয়ে কুয়াশা নিচের উপত্যকায় নেমে গেল। ওখানে, অন্ধকার খাদের সবটুকু ওরা ঢেকে রেখে দেবে। খাদের ভেতরটা বড়ো কুশ্রী।

হঠাৎ ভীষণ শীত করল বিনুর। 'চলো ঘরে যাই', বোনটি আস্তে বলল। গেটের শেকল খোলার শব্দ। ডাক্তার ঠক্‌কর ফিরে এলেন।

অনেক অন্ধকার : দুটি নক্ষত্র

মমতা দত্ত

"নীড় আছে! কিন্তু সবাই আমরা নীড়হারা।"

—কথা হচ্ছিল সোমাকে নিয়ে। হঠাৎ তার মাঝে স্বগতোক্তির মতো কথাটা বলে নিল শঙ্কর। পিকলু প্রথমটা বুঝতে পারেনি, তার পরেই হেসে উঠল খুব জোরে।

'শালা বলেছিস ভাল। পাখীর নীড়ের মত বাসা, তাতে আবার ভালবাসা, ধুৎ… ধুৎ…আর যাই বলিস ভাই, সোমা আছে বলেই জীবনে কিছু স্বাদ, মানে ভালবাসা।

সুজয়টা উসখুস করছিল, ভাব যেন—'এই উঠি উঠি'। জিজ্ঞেসই করে ফেলল পিকলু—

'কিরে কোথায় আজ নীড় বাঁধা? গঙ্গার ধারে না পার্কে?' সুজয় আবার শান্ত। 'লাজুকের বাহার দেখ এখন ওর মুখে।'

'সুজাতা অপেক্ষা করে রয়েছে' ভাবছে সুজয়,—উঠেই পড়ল। পিকলু ওর দিকে এমন ভাবে তাকাল,…যেন "বুঝতে পেরেছি সব,…যা…যা জোয়ারে গা ভাসা।"

বেয়ারাটা অনেক দেরী করছে চা আনতে। একটু একটু ভীড় জমে উঠছে, স্যাঙ্গুভিলার বাইরে অন্ধকার বাড়ছে, বৃষ্টি আসবে না তো?

"এই যে কবি…এদিকে এদিকে' নয়নকে ঢুকতে দেখে আনন্দে ডেকে উঠল শঙ্কর। সুজয়ের খালি চেয়ারটা টেনে দিল পিকলু। কবির চেহারাটা শ্রদ্ধা করার মত। সৌম্য পুরুষ পবিত্র যাকে বলে। পবিত্র শব্দটার সংজ্ঞা কি হতে পারে ভাবে শঙ্কর। ধূপ, চন্দন, রজনীগন্ধার গন্ধে যেমন পবিত্র মনে হয়। মন ভরায়। …কবির শরীরে যেন সেই পবিত্রতা মাখানো। পিকলু জিজ্ঞেস করল—

"কবে ছাড়া পেলে কবি?"

উত্তর আর শোনা হল না। কবি দরজার দিকে তাকাল। সোমা ঝড়ের মত ভেতরে ঢুকে চাইলো চারদিক। পিকলু হাত নাড়তেই এগিয়ে এসে বলল—

'আরে তোরা সবাই এখানে, চল…চল…নরেনটা একা একা খেটে মরছে, রুমার যে আজ বিয়ে দিচ্ছি আমরা, আসতেই পারিনি তোদের খবর দিতে…'!

আমরা তো সবাই হতবাক। কবিও! 'নরেনের বোনের বিয়ে,…আর আমি জানিনা সোমা'?

সোমার বেশবাস কেমন অগোছালো, মুখে একরাশ ক্লান্তি, ফরসা শরীরটা যেন রোদে তাঁতা মনে হচ্ছে।

—'আরে কি করে জানবে কবি, নরেনও কি জানে?' পিকলু আর চাপতে না পেরে বলে উঠল—"আজকাল বিয়েটাও কি বাজারের কেনা কাটা হয়ে গেল?"—সবাই বুঝল ওর কথার রহস্য, হাসির তুফান উঠল খুব জোর, স্যাঙ্গুভিলার ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

আজ ভোরে কবি আর নরেন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ১৯৬৮-এর অগ্নিগর্ভ

বাংলার আন্দোলনে বাংলার অনেক ছেলেই ঘরে ছিল না, ঘর হয়েছিল জেলখানায়, কবি ও নরেন ছিল সেইখানে, সোমার মত মেয়েরা অম্লানের মত ছেলেরা সে দিন কবি ও নরেনের মত আরও অনেক সংসারের চিন্তা তুলে নিয়েছিল নিজেদের মাথায়, রুমার মত বিয়ে তো বাংলায় একটা নয়,…অনেক অনেক। নরেন তো কেঁদেই ফেলেছিল সোমাকে জড়িয়ে ধরে।

এখন সবাই চুপচাপ স্যাঙ্গুভিলা কিন্তু জম-জমাট। বাড়তি কেউ ঢুকেছে কি ফালতু। সুজয় তো সুযোগ বুঝেই কেটেছে, ওর আবার ঐ নীড় নীড় বাঁধা খেলা, ওর বিশ্বাস সুজাতা ওকে ভালবাসে না। সুজাতার মত মেয়েরা দুনিয়ার কাউকেই ভালবাসে না। স্যাঙ্গুভিলার বাতাস কেমন ভারি ভারি হয়ে উঠেছে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়…। বৃষ্টি বুঝি আর এল না, বাঁচিয়েছে। রুমার বিয়েটা ভালোয় ভালোয় মিটলে হয়। কবি মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে, সোমা আস্তে করে ওর পাঞ্জাবির বুকের খানিকটা ফাঁক করে তাকিয়ে রইল। আমরা তখন সিগারেট টানছি, সোমার কাণ্ড দেখছি, কবি ঘাবড়ে গিয়ে পাঞ্জাবির বুকে চেপে ধরেছে।

পিকলু বলল,—'কি হচ্ছে সোমা?

সোমা বলল,—"বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কাছে কবির বুকটা খুলে দেখাতে ইচ্ছে করছে, সত্যের প্রতিবাদে শাস্তি…শাস্তি…শাস্তি…! কি প্রচণ্ড নিষ্ঠুর শাস্তি। রুদ্রাক্ষের মালার মত ওর সমস্ত বুকটা সিগারেটের আগুনে চিপে চিপে পুড়িয়ে দিয়েছে।"

"আর নরেনকে কি করেছে জানিস"…!

কবি সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা দিয়ে উঠল,…"আজ থাকনা ও-সব কথা সোমা, চল…রুমার বিয়েটা শেষ করে আসি।'

সোমা ভুলেই গেছিল ও কথা, যেন অনেক দেরী হয়ে গেছে…ওর উঠে যাওয়ার ভঙ্গিতে সেই তাড়াহুড়ো। বাইরে বেরিয়ে এলাম সবাই স্যাঙ্গুভিলা খানিকটা শান্ত হল।

…শঙ্কর যেন সমুদ্র, ওকে ধরবি কি দিয়ে বলত পিকলু?

—"কেন জাল ফেলে।"

অম্লান হেসে উঠল,…'ধুৎ…ধুৎ…এত বড় জাল পাবি কোথা?' পিকলু ভাবল, 'তাইতো।' সমুদ্র…জাল…সে তো বিরাট বিরাট ব্যাপার। আমাদের দৌড় তো ঐ স্যাঙ্গুভিলা পর্যন্ত, কফি কিংবা চা, তারপর শুধু আড্ডাই নয় কবির সঙ্গ,… সোমার অন্তর।

"সোমাকে বড্ড ভাল লাগে মাঝে মাঝে জানিস পিকলু, দারুণ ভাল লাগে। খুব কাছের, ঠিক তত দূরের আবার। সোমা ছাড়া আমাদের সন্ধ্যা আসর যেন বেরস ফাঁকা' এরই মধ্যে সে দিন আবার কবিতা পাঠ হয়ে গেল পূবালি সংঘের। ওরে বাপস…সে কি কবিতা, বলছে—

"ভালবাসা গ্লিসারিনের মত—'ভালবাসা আমি চাক্কু মেরে তিন ফালি করে দেব।' সুজয় তো সেই থেকে রেওয়াজ করছে,…ওর তো আবার নীড় নীড় খেলা। শঙ্করকে তো বোঝাই যায় না, পিকলুটার ভেতরটা আবার ছোঁক ছোঁক। মরীচিকার মত প্রেম-ট্রেম,

আশীষ তো কেটেই পড়েছে। শালা ফাইন্যালটা আর পেরোতে পারছে না'। জীবনে এমনই কাঁটা, হিরো হিরো চেহারাটা ঘরে বসেই মারা গেল।

সুমিতা আবার নাটকে নেমেছে, ভীড় ভীড়,…সুমিতার জৌলুষ এবার হাটে বিকোবে। পিকলু শুনছিল অম্লানের এলো-মেলো কথাগুলো। তাকিয়ে ছিল বেয়ারাটার দিকে। ওকে দেখলেই পিকলুর শরীর কেমন রী রী করে ওঠে! ভেতরের দিকে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে অবসর পেলেই মুচকি হাসবে, সুজয় আর সুজাতার মত জোড়ায় যদি বসেছে।—তবে তো মাত্। সোমাকে কি ভাবে ওরা কে জানে? আধ বয়েসি ম্যানেজারটাও তাকিয়ে থাকে। …পিকলু ভাবে আচ্ছাসে একদিন কষিয়ে দেবে।

দু'বার কফির পেয়ালা নিঃশেষ করে পিকলু অস্থির হয়ে ওঠে, কেমন নিঃসঙ্গতা ওকে পেয়ে বসে। ছাইদানটা এত নোংরা,…বমি আসছে, ইচ্ছে হচ্ছে ভোতকামুখো ম্যানেজারটার মুখের ওপর ছুঁড়ে দেই, স্যাঙ্গুভিলা যেন আমাদের কৃতার্থ করে দিয়েছে। ছাই…পাশ…নোংরা…। ফিল্ম ফেয়ার বইগুলো সেই কবেকার, চলছে…চলবে…। টেবিলে টেবিলে হাতে হাতে ঘুরছে, সময় যদি না কাটে,…সঙ্গ যদি না পাও…তবে ছবি দেখে দেখে সময় কাটিয়ে দাও। কফির ধোঁয়া হয়তো মিলিয়ে গেছে,…হাত দিয়ে দেখ ঠাণ্ডা, ঐ ঠাণ্ডা গেলাতেই আবার কায়দা কত…! আহাঃ…কেউ যেন বোঝে না, আরও ভাল লাগবে কান্না কান্না রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডটা যখন বদলে দেবে ভোঁতকামুখো ম্যানেজার, আর বেজে উঠবে বিদেশী বাজনা, উঃ কি সমঝদার সব।

—শঙ্করের পাত্তা নেই তিনদিন, কি ব্যাপার বলতো?—গালভরা ধোঁয়ার জাল ওপরে ধীরে ছুঁড়ে দিতে দিতে,…পিকলু যেন কতই চিন্তিত। ধ্যাৎ...এ নেশায় কতক্ষণ আর বুঁদ হয়ে থাকা যায়। এই তো সবে সন্ধ্যে ছ'টা, এখনই স্যাঙ্গুভিলা বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। সোমা কাল এসেছিল, ওকে কেমন এলোমেলো দেখাল, বলছিল—

'ছেলে ধরা বেরিয়েচে খুব—।'

সকলে অবাক, 'সে আবার কি'? সবাইকে উত্তেজিত করে খবরটা ও চেপে গেল। বলল,—'বলবো একদিন।'

হঠাৎ পিকলু ধোঁয়ার জাল ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে বলল—"আর ভাল লাগছে না এখানে, চল সবুজ মাঠে গিয়ে একটু গড়া-গড়ি দেওয়া যাবে।" দুজনেই বেরিয়ে এল বাইরে। অম্লানের আবার চুপ-চাপ ভাল লাগে না, একবার সুমিতার রিহার্সাল দেখতে যাবে কিনা ভাবল, কিন্তু কি ভেবে শঙ্করের আস্তানার দিকে এগিয়ে গেল। পিকলুর আবার এক-গোঁ, যা ভাববে একবার…তাই।

মাঠের অন্যপ্রান্ত দিয়ে কবি সোমা আসছিল পিকলু আনন্দে চিৎকার করে উঠল।—এক মুহূর্তে কোথায় উবে-টুবে গেল ওর নিঃসঙ্গতা—বিস্বাদ। সোমা…সোমা…সোম…তুই সত্যিই খুব ভাল।

সন্ধ্যের অন্ধকার অনেকক্ষণ আগেই ছেয়ে গেছে। মাঠের এ দিকটায় নিয়নের আলো এসে পড়ে না। বড় বড় অফিস বাড়িগুলোর ছায়া নেমে আসে। অনেক দিনই পিকলু

স্যাঙ্গুভিলা পেছনে রেখে এখানে এসে গা এলিয়ে দেয়। আজও দিল বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে মুখ ঢাকলো সবুজ ঘাসে। বলল, …'এমন করে আরও সবুজে বুক পেতে শুয়ে থাকতে আমার ভাল লাগে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে' সোমা বলে উঠল 'আমারও তো' কবি দু'জনের দিকে তাকাল শুধু। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ সবাই, এদিকটায় তবু একটু বাতাস আছে, স্যাঙ্গুভিলা অসহ্য।

সোমা আস্তে আস্তে কবিকে জিজ্ঞেস করল,—'ভালবাসা সম্বন্ধে কি ধারণা তোমার কবি,…সুজয় তো সুজাতাকে ভালবাসে। কিন্তু সুজয়ের বিশ্বাস সুজাতা ওকে ভালবাসে না। সুজাতার মত মেয়েরা নাকি দুনিয়ার কাউকেই কোনদিন ভালবাসে না কিন্তু ভালবাসা,… ভালবাসা বলে কি কিছুই নেই?'

—'তা কেন হবে সোমা! এই সুন্দর ভালোবাসা পাবার জন্যেই যে আমাদের লড়াই।'—কবির গলায় গাম্ভীর্যের সুর… শান্ত… সুন্দর…। 'আজকাল আমরা কেউ কাউকে ভালবাসতেই পারি না, ভালবাসিনা, ভালবাসার নামে পরস্পরের সঙ্গে আমরা করি প্রতারণা। স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে। আসলে সমস্ত কিছুই সামাজিক অব্যবস্থার জন্য হয়ে চলেছে। ভালবাসা… প্রতারণা… কেমন যে এলোমেলো কথাগুলো।'

"ভাল কেউ কাউকে বাসেনা সোমা,…বাসে স্বার্থকে… অর্থকে… দেহকে। সত্যিকারের যে ভালবাসে, সে কাঁদে, সে ভ্রমরের মত। ভালবাসার কান্না থেকে যে মুক্তা জন্মাল, তাকে পেতে গিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। সত্যিকারের ভালবাসা এগিয়ে দেবার, পিছিয়ে যাবার নয়। শঙ্করকে দেখলে আমার মনে হয়,… একান্ত যা ওর… সে ভালবাসার কথা প্রকাশ করে ছড়িয়ে দেয় না,… পাছে অসম্মান হয়,… পাছে ছোট হয়ে যায়। ভালবাসা যত দিন হৃদয়ে গোপন করা যায় তত দিনই তা অনুরাগ, দুজনে দু'জনের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে,… মনে মনে সে মিলনের যে মৃত্যু নেই,… সেই ভাল, সেই জন্যেই নিজের মনকে সে নিজের কাছে সযতনে লুকিয়ে রাখে।"

—একদিন শঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওর ঘরে এক সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখে। রাখা ছিল খাটের মাথার কাছে টেবিলে।

বলেছিল,… 'বোনের'!

চিঠি লিখছিল শঙ্কর, লেখা থামিয়ে ও তাকিয়ে ছিল ছবিটার দিকে। স্বদেশ অন্য কথা বলেছিল—'বৌ'-এর, স্বদেশ আবার তখন শঙ্করের সাথেই থাকতো, বাকীটুকু শেষ করল—'নইলে রাত জেগে জেগে এত চিঠি লেখা'…! শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হেসেছিল, স্বদেশ কিন্তু কৌতুহল চাপতে পারেনি। লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সমস্ত চিঠিপত্র একদিন দেখেছে কিন্তু সে সব তো দেশ বিদেশের বন্ধুবান্ধবের শুধু চিঠি, স্বদেশ শেষে বলেছিল—'শঙ্কর বড় চাপা।'

পিকলুর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না, ও বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে। উঠিয়ে দেবে কিনা ভাবল সোমা। ন'টা বাজতে তখনো কিছু বাকী। সোমাকে আবার ওসব কথা

জিজ্ঞেস করা যায় না,…'এই প্রেম ট্রেম'…। ও বলে 'ওসব জ্বালা,… মেঘ… বৃষ্টি,… নতুন কিছু বল'।

পিকলুকে জাগিয়ে দিয়েছে কবি, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে ও। এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে—বাড়ি নামে সেই আস্তানায় ফিরে যেতে হবে।…'আস্তানা'…কথাটা ভেবেই হেসে ওঠে পিকলু, বাসা… ভালবাসা… পাখীর বাসা। শঙ্কর বলে আবার 'নীড়', সুজয় নাকি নীড় নীড় খেলছে, উঃ সে কি ইমারতের নকশা। সুজাতা চালু মেয়ে। অনেক সুজয়ের হাতে হাতেই ঘুরে ফেরে। পিকলু একদিন ভোজাই বলে ছিল, সেই থেকে সুজয়ের রাগ, সুজাতার অবিশ্বাস, ওটাকে অভ্যেস বলব… কিনা জানি না,… সুজাতা ছাড়া সন্ধ্যেগুলো সুজয়ের আবার ভাল লাগে না। স্যাঙ্গুভিলা থেকে কেটে পড়বার ধান্দা খোঁজে। পিকলু ভাবছিল ... 'সত্যি সত্যি কিসে যে ভাল লাগা... ও কেন বুঝতে পারে না, … কেন?

শেষ পর্যন্ত শঙ্কর এল আজ, বলল—চিঠি লেখায় ব্যস্ত ছিল এ ক'দিন, বোঝ এবার, চিঠি লেখা কাকে?—জিজ্ঞেস করোনা, উত্তর পাবে না। আকাশ একেবারে গুমরে আছে, স্যাঙ্গুভিলা তো ফার্ণেস। সবাই ধীরে ধীরে সরে পড়ছে, …আমরাও ময়দানে গিয়ে বসলাম। এদিকটা তবু একটু হালকা। বেশ ঘন সন্ধ্যে। পিকলু বলল,—

'সুজয় আজ মাঝদরিয়ায়'—সবাই পিকলুর দিকে ফিরল। ভঙ্গি যেন—'তারপর'—? বলল,—'কি জানি, অপেক্ষা করতে বলে গেছে। দেখা যাক।'

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ খানিক পর কবি বলল,—"ভালই যদি বাসা তবে হেরে যাওয়া কেন?"

কথায় কথায় রাত হয়ে গেছে বেশ, সবাই উঠি উঠি করছে। পিকলুরই ইচ্ছে নয় উঠে যায়, ও আবার সবুজে এলিয়ে শান্তি পায় বাড়িতেও তো সেই গরম, তারপর বাড়ি তো নয়,… সেই পাখীর বাসা,…মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি… বাবার উপেক্ষা… বোনের খিস্তি,…কেমন সন্দেহ…সন্দেহ চাহনি। যেন উচ্ছন্নে গেছে, চাপা আক্রোশ ফেটে পড়ার অপেক্ষা মাত্র, হয়ত বলেই বসবে একদিন—'অবাধ্য… শয়তান… বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে,… তোমার মত ছেলে'! থাক থাক আর খিস্তি কথা ভাল লাগে না, যা হবার হবে, না হয় ভেঙেই দেব জঞ্জালে তৈরী বাসা, সমস্ত দিন তো বাইরে বাইরেই। সারাটা দিন এমন করে কাটিয়ে দিত না, তখন পিকলুর মত বাধ্য ছেলে দুনিয়াতে নেই। পিকলুরা বাধ্যই থাকে; অবাধ্য হয় অনেক যন্ত্রণায়। আমাদের মায়েরা যদি আমাদের হাত ধরে এই দুর্গত দেশের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়ে বলতেন—'শিক্ষা ধারণাকে এবার সার্থক করে তোল'—তাহলে আনন্দ পেতুম। কিন্তু তাঁরা আমাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করতে চান, তাঁরা প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে আনন্দ পেতে চান, আমি পথের ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে। আমার ভাবনার স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—এ তাঁরা চান না, যা…চান,…আমি যে তা পছন্দ করি না,…'বোঝেন না। তাই বাধ্য ছেলে হয়েছে অবাধ্য, সন্তান হয়েছে শয়তান, মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে,—আমার ঠাকুরদাদার কাছে আমার বাবাও কি তাই

হয়েছিলেন? বাড়ি মানে দুর্বোধ্য অর্থাৎ আমি বাড়ির কাউকেই বুঝি না। অমল বিমল কমলের মত ঘুরছি আর ঘুরছি, কেউ আমরা তার হাত থেকে মুক্তি পাব না, একদিন আমরাও উপেক্ষা করবো আমাদেরই সন্তানকে, আশ্চর্য! আজ কিন্তু ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে বুক···চাপা আক্রোশে।

পিকলু ঘাসে উপুড় হয়ে শুয়ে আরও কত কি ভাবত কে জানে, পার্কের দিক থেকে সুজয় ছুটতে ছুটতে এসে বলল—

'আজ চাক্কু মেরে তিন ফালি করে দিয়েছি'।

এমন ভাবে পিকলুর কানের পর্দায় কথাগুলো এসে ধাক্কা মারল যে, মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে ও উঠে বসল, সবাই সুজয়ের দিকে তাকিয়ে—

শালা আবার কি বিপদ বাধিয়ে এসেছে?

অম্লান তো ভয়েই বলে উঠল—'কাকে?'—সবাই ভাবছে বোধ হয় সুজাতাকেই, সুজয়কে বিশ্বাস নেই ও সব পারে। সবার ভেতর তখন বাজনা বাজছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর পেয়ে গেছে, রক্তাক্ত একটা দেহ,···তিন ফালি করা। কি জানি ভীড় জমতে শুরু করে দিয়েছে কিনা? পালা···পালা···সুজয় সমেত সবাই তাহলে মামাবাড়ি!

কবি তো সদ্য ফিরেছে। সবাই সুজয়ের হাতের দিকে তাকাল···রক্তাক্ত চাকু-টাকু···? ···না, সুজয় যে খুব চালু, ধোওয়া মোছা হাত। কে বলবে জলজ্যান্ত খুনি, সবাই উঠে পড়েছে, কে কোথায় গা ঢাকা দেবে ভাবছে। ভাগ্যিস সোমা আজ আসেনি, ওর আবার আবেগ-টাবেগ বেশী। হঠাৎ বাবা মা ভাই বোনের মুখগুলো মনে পড়ল কেমন মায়া এল, ভয়েতো কাঁপছে সব, সুজয়কে চেপেই ধরেছে—'কি করেছিস সুজয়,···এমন ভালবাসা না বাসলেই কি হোত না,'···একেবারে নীড় নীড় খেলা থেকে,···একে বারে শেষ?··· সুজাতার লাশটাকে নিয়ে এখন ওরা কি করছে কে জানে? তদন্ত টদন্ত শুরু হয়ে যায়নিতো? সি, আই, ডি-গুলো বড্ড তৎপর। চারদিকে তাকিয়ে দেখল শঙ্কর—কি জানি বিশ্বাস করা যায় না,···এতক্ষণে হয়ত এদিকেও এসে পড়েছে। যত্তো···সব। ভয়ে যে জীবন চুপসে গেল, সুজয় তখনও হাঁপাচ্ছে। ওর জামাটা গোজা ছিল, দৌড়তে দৌড়তে খানিকটা বেরিয়ে গেছে। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো নির্ঘাত খুনি। সুজয়ের সেই এক কথা—'চাক্কু মেরে তিন ফালি করে দিয়েছি।'

অম্লান তো এরই মধ্যে কেটে পড়েছে। ওর আবার কিছু গুপ্ত কারবার আছে। তাছাড়া সুমিতার কাছে মান সম্মান! শঙ্কর ভাবছে মান সম্মান নিয়ে পাড়ায় থাকা যাবে তো, ওর পাড়ার মায়েরা আবার ছেলেধরা সব। শঙ্করকে ধরতে চেয়েছিল অর্থ, রূপ প্রতিপত্তি দেখে। অনেক ফন্দি ফিকির এঁটে···পারেনি···অগত্যা ছেলেধরা মায়েতে মায়েতে—তুমুল লড়াই। কবিকেই শুধু বোঝা যায় না, সংসার···বন্ধন···বাসা-টাসা ওর আবার দুনিয়ায় নেই কিছু। একা নির্ঝঞ্ঝাট, মার্ক্স···লেনিন···মাও সে-তুং···এদের কথায় এসো,—বুঝিয়ে দেবে, তুমি আর কবির সঙ্গ ছাড়তে পারবে না। অথচ সবার চেয়ে আলাদা, যা ভাবে তা করে। সুজয়ের মত হাল্কা নয়।

পিকলু তো ভয়েই চিৎকার করে উঠল,—ওকে তো আবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাড়ির বড় ছেলে,··· কর্তব্য-টর্তব্য··· নির্ভরতা··· অনেক কিছু।

'সুজাতাকে না ভালবাসাকে— ?' —পিকলু এবার চেপেই ধরেছে। সুজয়ের খেয়াল হল—সবাই ভয় পাচ্ছে ওকে,—হয়ত ওকে একা ফেলেই পালাবে সব, বলবে—সুজয় নামে আমরা কাউকে চিনি না। 'না···না···পিকলু,··· খুন করার সাহস আমাদের কারও নেই, খুন করেছি আমার ভালবাসাকে, একেবারে ভোকাট্টা,··· সুজাতা পাক খেতে খেতে এখন কোথায় চলে গেছে'—।

'আহঃ··· বাঁচিয়েছিস্ সুজয়, বাঁচিয়েছিস, এতক্ষণ আমরা পুলিসের ভয়ে নেতিয়ে গেছিলাম একেবারে, ভয়ে একেবারে ঘাম ঝরিয়ে দিয়েছে। পিকলু তো রীতিমত রেগেই উঠেছিল, পারে তো মেরেই ফেলে, পূবালি সংঘের কবিতা আওড়ে রীতিমত ঘাবড়েই দিয়েছিল, উঃ কি কবিতা মাইরি,—কফি না গেলা পর্যন্ত দুর্বলতা কাটবে না।' স্যাঙ্গুভিলা আলোয় দেখা গেল··· অম্লান শুধু দলছাড়া।

মাঝে মাঝে এমন হয়, কবির সারা মুখে বিষাদের ছোপ লেগে থাকে। সোমা বলে, 'তুমিত বিষাদের নও কবি, বিষাদজয়ের।'

কবি হাসে। বলে, 'সোমা, ওরা বলে—তুমি আমি দুজন আলাদা। ওদের প্রেরণা। আমরা যুগের অবসাদ কাটিয়ে উঠেছি। আসলে কাটিয়ে ওঠা ভীষণ শক্ত কাজ। রাজনীতির পড়া—আর কাজ, আমাদের অনেক বেশী জীবন্ত করে রেখেছে সত্য কথা—হতাশ আমরা কম হই ঠিকই, কিন্তু আমাদের আশেপাশের মানুষ যারা, যেমন ধর সুজয়, পিকলু অম্লান, শংকর, অমল, বিমল আর কমল এরা নিজেদের ভীষণ বিচ্ছিন্ন মনে করে। দেউলিয়া ভাবে। ওদের সেই ভাবনা আমাদের ভাবায়। তুমি আমি ক্লান্ত হই। এই ভেবে,—ওদের মতন করে, ওদের কাছে আশার কথা তুলে ধরতে পারছি না। এটা আমাদের ত্রুটি। ওরা যতদিন না আমাদের কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াবে ততদিন আমরা সকলে মিলে হেসে উঠতে পারবো না।

প্রেম বিয়ে সংসার বার্দ্ধক্য··· জন্ম-মৃত্যু—এই নিয়মের চাকায় ওরা সবাই ঘুরছে। যতদিন এই জীবন পরিবর্তনের কথা না জানবে ততদিনই জীবনে উৎসাহ-উদ্যম-উজ্জ্বলতার অভাবে অনেক আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতায়, যন্ত্রণায় ছট-ফটিয়ে উঠবে। আর একটু একটু করে হারিয়ে ফেলবে বিশ্বাস—তখন গণ্ডীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে··· স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে,··· আজ ওরা সবাই এসে পৌঁছিয়েছে সেই নৈরাশ্যের শেষ সোপানে। কখনো উদ্‌ভ্রান্ত, কখনো বিভ্রান্ত।

চিমটি কেটেছি তোমার দেহে,··· তাতে আমার কি জ্বালা? সেই বিতৃষ্ণা আর অভিশাপ মাথায় নিয়ে জন্ম নিল যারা, বড় হল, পিকলুর মত বলতে শিখল যন্ত্রণায় ফেটে পড়ে···'বাসা না তো পাখীর বাসা, ধুৎ ধুৎ সেখানে আবার ভালবাসা'। সমাজ বলবে 'ছি···ছি···ছি···ছি'! পিকলুরা আর সমাজে স্থান পেল না।

হয়তো পিকলুর বাবাও একদিন পায়নি কিংবা সমাজের অনেক বাবাই, হয়তো বাসা বদল করেছেন, জীবনও। মুছে গেছে সব দাগ। তারাই একদিন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে গাম্ভীর্য টেনে এনেছেন,—ভুলে গেছেন তারাও একদিন সুজয় পিকলু ছিলেন। সোমা তুমি আমি শঙ্কর সুজয় পিকলু অম্লান কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নয়, শুধু আমাদের রূপগুলো আলাদা আলাদা। কিন্তু ভেতরের সেই অচিন সত্তাটার রূপ বোধ হয় এক!

কবির দৃষ্টি দূরের দিকে কেমন স্থির হয়ে থাকে,…না বলার আড়ালে থাকা তাই হয়ত দেখে। সোমা খুঁজে পায় মিল…। কবিকে সোমার বড় কাছের মনে হয়, হঠাৎ নরেনের কথা মনে হয়ে যায় সোমার, পা দুটো কেমন ঝাঁঝরা করে দিয়েছে জেলে লোহার কাঁটা লাগান বুট দিয়ে মাড়িয়ে। কিন্তু কোন উত্তর বের করতে পারেনি ওদের মুখ দিয়ে। অনেক দিন জোর পেতোনা পায়ে, এখন পায়। যদি জিজ্ঞেস করতে যাও বলবে,…'বাংলায় কবি আমি শুধু দুটি-ই তো নই।'

আকাশের পশ্চিম প্রান্তটা কালো হয়ে উঠছে, হাওয়া উঠছে,…এলোমেলো। যেন বৃষ্টি আসার পুরোদমে পূর্বাভাস, এক এক করে সবাই উঠে যাচ্ছে,…কবিরাও। সোমা সেই নীরবতায় ধীরে ধীরে ফিরে যেতে থাকে অতীতেব দিকে, নরেন, কবি এদের মাঝে কেমন করে সোমা এসে পড়েছিল। কেমন করে সবাই সোমাকে বিশ্বাস করে নিয়েছিল, এমন একদিন এল যখন দলের সমস্ত গোপন পত্র সোমা ছাড়া কারও হাতে তুলে দেওয়া যেত না, বাংলার অবস্থা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠতে লাগল, সোমাকে আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল দূরের এক গ্রামে। সেখান থেকে পেতে থাকলো সমস্ত খবরাখবর, তখনকার কবির দু'টি চিঠি আজও আছে, কখনও কখনও ইচ্ছে হয় ওর পড়তে। লিখেছিল—

"সোমা,

কয়েকমুহূর্ত আগেকার অনায়াস জীবনের খোলসটাকে বাইরে ফেলে এখানে এসেছি। গা ঢাকা দিয়ে। চেনা মানুষের চোখের বাইরে। বাংলা আবার দামাল হয়ে উঠেছে। তুমি ত জান। কারাগারের ঘরে আজ বাংলার যৌবন—শহরের রাজপথে রক্তের হোলি। সংগ্রামী মানুষ অবিচার রোধ করবে বুকের রক্ত ঢেলে। শুরু হয়েছে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আগুনে জ্বলছে এই শহর—জ্বলছে মানুষ।

তোমাকে এখন দূরে থাকতে হবে—অনেক দূরে। আমাদের গোপন চাবিকাঠি এখন তোমার কাছে আছে। তুমি সতর্ক থেকো।

বাইশ তারিখের মিছিলে আমি ছিলাম, একশ চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার অপরাধে পুলিসি শাস্তি নেমে এসেছে আমার বাঁ পায়ে। ব্যথা আছে, তবে যাদের প্রাণ গেল সে তুলনায় এ আর কতটুকু।

তৈরী থেকো, ভয় নেই সংগ্রামের মানে উচ্ছ্বাস নয়, বিনা কারণে গুলি খেয়ে হঠকারিতার নাম বিপ্লব নয়। তা আমরা করব না, তাই যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কোন ভাবনা কোর না।"

দ্বিতীয় চিঠিটা আরও সংক্ষিপ্ত,… ছোট কবিতা দিয়ে যার শুরু—

"প্রিয় ফুল নিয়ে খেলবার দিন নয় অদ্য।
চোখে লেগে নেই স্বপ্নের ঘোর নীল মদ্য।।"

সোমা ভাবতে থাকে সেই তো নরেনের শেষ চিঠি, শেষ রক্ষা আর করতে পারে নি নিজেদের, তার আগেই কারাবরণ, অনেক দিন সোমা কোন খোঁজখবর পায় নি কার-ও। একরাশ চিন্তা ওকে অস্থির করে দিয়েছে সর্বক্ষণ। সেই ওর গ্রাম ছেড়ে চলে আসা কলকাতায়, ভেতরে ভেতরে চালালে কাজ, কেউ জানে না সোমা সেদিন কি অসাধ্য সাধন করেছে,… সোমার নিষেধ 'সে যেন গোপনই থাকে'।

খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না অনেকের, জেলের ভেতরে চলছে অকথ্য নির্যাতন। কার সাধ্য সেখানে যায়, সে খোঁজ নিয়ে আসে সবার। সে দিনই সোমাকে দিতে হয়েছিল কঠিন পরীক্ষা। জেলের বিরাট দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল ওকে, ও আস্তে আস্তে ঢুকে গিয়েছিল ভেতরে। তারপর নিয়ে আসা হয়েছিল কবিকে, সাক্ষাতের ঘরে।

কবি এসেছিল সামনে ওর, দগদগে ফোসকা পড়া বুকটা খুলে দেখিয়েছিল—সিগারেটের আগুন চিপে চিপে জ্বালিয়ে দেওয়া বুকটা। আশ্চর্য তবু কবির চোখে মুখে সেই নির্বিকার শান্ততা। 'একটা চিঠি' চারদিক তাকিয়ে নিয়ে কবির হাতে সোমা তুলে দিয়েছিল। বাইরে এসে বার বার বলেছিল—

"তোমরা নিষ্ঠুর হতে পার… কিন্তু বোকা… বোকা।"

সন্ধ্যে এমনভাবেই গড়িয়ে যাচ্ছিল। উঁচু জায়গা থেকে নুড়ি গড়িয়ে পড়ার মত। গড়িয়ে যদি যেত তো ভালই হত। কিন্তু থেমে গেল। ঠিক থেমে গেল না… ঝিমিয়ে এল। পিকলুর চাকরিটা স্থায়ী হয়ে গেছে। আজকাল ক্লান্তি টান্তি বোধ করছে। ছুটির দিন ছাড়া আড্ডায় আসতেই পারে না, আজ এসেই বলল—

"শালা পাখীর বাসাটা কেমন শান্ত হয়ে গেছে, 'চাকরি—টাকা'—মানে ঐ কিচির মিচির থেমে গেছে সব।"

সবাই পিকলুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, ওর চোখে মুখে কি ভীষণ বিদ্রূপের হাসি,… কাকে?… জিজ্ঞেস কোর না।

অম্লান কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল—

"বিয়ে করলেও পস্তাব, না করলেও পস্তাব। বরং করেই পস্তান ভাল।"

ওর বিয়ে করাটা এমন কিছু অবাক কথা নয়… হঠাৎ ওর বলে ওঠাতেই—যা! ওর ফুলে ফেঁপে ওঠা কারবারের অনেকখানি অংশেই অনেকগুলো পরিবার বেঁচেছিল। …নরেনের মত বাংলার অনেক পরিবার। কখনো পরোক্ষে কখনো প্রত্যক্ষে, শুধু দিয়েই ছিল। আজ যদি সেই অম্লান সুমিতা নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়,… যদিও সুমিতা নাটক করে, কিছু নাম আছে, অবশ্য অভিনয় দেখার খাতিরেই সে নামের শেষ। তারও যে বিয়ে হতে পারে, কিংবা তারও ভেতরে একটা সুন্দর মন, প্রেম-ট্রেম, তবেই

দেখনা কত কেচ্ছা কথা, অবশ্য অম্লান পরোয়াই করে না। অম্লান বলে,—'স্রেফ স্বার্থ, বিষ… বিষ,… রক্তে জ্বালা,… নিঃশ্বাসে জ্বালা, কাউকে যেন অম্লান সহ্যই করতে পারে না। আক্রোশে ফেটে পড়ে ওর ভেতরটা, ইচ্ছে হয় একটা কিছু করে ফেলতে, একটা কিছু। যাতে সেই সব মানুষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে, যাদের ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, পিকলুও পারে না। শুধু চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কবি আর সোমাকে যদি না পেত ওরা তাহলে নীড়ছাড়া উচ্ছন্নে যাওয়া পিকলু কোন দিনই আর পাখীর বাসায় ফিরে যেত না। আচ্ছা কোন কথা মনে হলেই ঐ 'পাখীর বাসা' কথাটা মনে আসে কেন? পিকলু অনেক দিনই ভেবেছে—'অন্য কিছু ভাল-টাল কথা। অথচ কিছুতেই কেন যেন আসে না। ভাল—কিছু,… এই ভালবাসা… স্নেহ টেহো… তখনও ওর মুখ কেমন বিকৃত হয়ে ওঠে, অনেক জ্বালায় ফেটে পড়ে বলে—

—"ধুৎ… ধুৎ… ভালবাসা,—জঞ্জাল… জ্বালা, আসল কথা খোলসা করে জানতে চেয়ো না। শঙ্কর পিকলু অম্লান কারো কাছেই না,… সবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণাগুলো সব এক।

কবি আর সোমা যেন এক শান্ত সৈকত, স্যাঙ্গুভিলাতে শুধু দুটি মানুষ,—যাদের কাছে অনাবিল আনন্দ, প্রাণখোলা কথা, 'ছি… ছি—ছি… ছি… র' সেই বিশ্রী অসহ্য জগৎ থেকে অনেক দূরে, কোন্ এক দ্বীপবাসী ওরা কে জানে? নতুন মানুষের মুখ দেখে আনন্দ পায়। কাছে ডেকে নেয়।… অবহেলা করে না, পিকলুরা হয়ত ভাসতে ভাসতে একদিন কোথায় চলে যেত… কোথায়?… 'নীড়' যাকে বলে "জাহান্নাম।" কবি তাদের নিয়েছে নিজের করে, বলেছে—'বন্ধু' ! সোমা দিয়েছে অন্তর… দিশা—!

সেই সোমার ডাক এসে গেছে অনেক দূর থেকে। আর কলকাতা নয়, মফঃস্বলের গ্রাম। শৈশব কাটেনি এমন এক স্কুলে পড়ানোর কাজ। গরীব মানুষের দরদ দিয়ে গড়া সে স্কুল। বাইরের আকর্ষণ সেখানে কম—অতএব, সমস্ত সময় ধরে কাজ করা যাবে কিছু গড়ে তোলা যাবে।

কী করে ওরা বিদায়ের লগ্নটা জেনে গেছে সোমা নিজেই জানে না। স্যাঙ্গুভিলার আসর নেমে এসেছে আজ শেয়ালদা স্টেশনে, শঙ্কর-পিকলু-অম্লান-সুমিতা সবাই এসেছে… ওদের টুকরো টুকরো কথা সোমাকে আরও শান্ত করে দিচ্ছে। সোমার মনে হচ্ছে—'কত কথাই তো সবাইকে বলে যাওয়ার আছে, কিন্তু কিছু মনে আসছে না তো।' তখনই সুজয় এসে অবাক করে দিয়েছে সবাইকে। সোমাকে জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে, যেন—'যেতে নাহি দিব' এমন গোছের একটা কিছু।

সোমা বললো—'আর কবিতা-টবিতা নতুন কিছু?' মানে 'ঐ চাকু মেরে তিন ফালি করে দেওয়ার মত।' … সেই লজ্জা দেখ আবার সুজয়ের চোখে।

'যে কবিতা নারী সুন্দর… ও ভালবাসাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে রূপ দেওয়া, সে কবিতা না হয়… আর নাইবা লিখলে,… সুকান্ত যে সমাজ বদলাবার স্বপ্ন দেখেছিল… তা আজও স্বপ্ন, সুকান্তের কলম তোমাদের হাতে তুলে নাও।'

আশ্চর্য এমন গম্ভীর হয়ে যে এত বড়-কথা বলতে পারল সেই আবার সহজ হাসিতে দুলে উঠে চুপি চুপি শুধাল সুজয়কে—'নতুন প্রেম-ট্রেম কিছু?'

আর একবার সোমাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল সুজয়—'তোমায় আর কবিকে। সোমা আর বিপ্লবকে, শক্তি আর পথকে।'

সবাই শুনছিল সুজয়ের কথা। শঙ্কর তো রীতিমত মুগ্ধ। সোমার দিকে শঙ্কর তাকিয়ে বলল,—

"নীড় নীড় খেলা ওর শেষ হয়ে গেছে… এবার নীড়ে ফিরে যাওয়া,—ওরা বলেছে আর ও ধরনের কবিতা লিখে প্রেমিক প্রেমিক খেলা খেলবে না। বুকের পাটা যদি থাকে…'লাল সেলাম' বলে হাত তোলার তবে লিখবে এমন কবিতা—যে কবিতা জীবনকে ছুঁয়ে—যে কবিতায় মাটির ঘ্রাণ। এতদিন ধরে কবির কাজ, কথা, ওকে এমন করে বদলে দিয়েছে সোমা

সোমার চোখ দুটো কবিকেই খুঁজে ফিরছিল। নির্লিপ্ত উদাসীনতার আড়ালে সে যেন নিজেকে গোপন করে নিয়েছে। পড়ন্ত আলোর ম্লান রোদে কবির চোখে করুণ উজ্জ্বলতা দেখে সোমা বলে ওঠে 'যেন কোন গহন গভীর থেকে—প্রত্যয়ের দ্যুতিতে ভাস্বতী হয়ে, 'তোমার আমার কাজের গণ্ডী এবার থেকে আলাদা হলো কবি। তবু দেখ একই পথের পথিক আমরা—হয়তো আমাদের দেখা হবে না অনেকদিন—হয়তো ফুরসুৎই পাব না। তোমার কাজ শহরে বুদ্ধিজীবী মহলে—আমার সাধনা গ্রামের মানুষ নিয়ে, পিছিয়ে পড়া মানুষকে নতুন যুগের ভোরে পৌঁছে দেবার বাণী শোনানো—যে বাণী তুমি একদিন আমাকে শুনিয়েছ, এখনো শোনাও।'

পিকলুর গলার কাছে আবেগের বাষ্প—'আমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না সোমা?'

'পাগল, দেখা হবে না কেন? মত আর পথ ত আলাদা নয়। একদিন আবার দেখবে, একই মিছিলে আমরা পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। আরো কত নতুন সাথী। নতুন প্রতিজ্ঞায় সবাই জ্বলছি।'

সবুজ আলো দেখা দিয়েছে—দুলেছে গার্ডের নিশান। ঘণ্টা বাজছে বিদায়ের। 'ওঠ সোমা।' এই বোধ হয় প্রথম কথা কবির।

ফুটবোর্ডে উঠে দাঁড়াল সোমা—না দেখেও এতদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পারলো—ওদের চোখে জল।

সোমা ধীরে ধীরে বলল ঃ

"সংগ্রামী মানুষ কাঁদে না সুজয়"…

পিঞ্জর

মায়া বসু

কুসুমপুর… কুসুম পু-উ-উ-র…

কনডাক্‌টারের বিচিত্র কণ্ঠস্বরের চিৎকার শেষ হতে না হতেই বাসটা ঝকড় ঝকড় করতে করতে গাছের তলায় থামল। এক আঁজলা ধূলোর ঝাপ্‌টা গায়ে-মেখে আরো কয়েকজন মানুষের সঙ্গে ছোট্ট সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লেন দেবতোষবাবু। উস্কোখুস্কো চুল। রাতে ভালভাবে ঘুম না হবার দরুণ ঈষৎ রক্তাভ চোখের কোলে কালির ছাপ। সুদীর্ঘ বাসজার্ণিটা একেবারেই অনভ্যাসের ব্যাপার। তাই পরনের জামা-কাপড় লাট-খাওয়া কোঁচকানো, ময়লাও বটে। ওঁর দিকে ভাল করে তাকালেই মনে হয়, সম্ভ্রান্ত, ধনী অভিজাত সুখী মানুষটি হঠাৎ তাঁর কোন প্রিয়জনের ভয়ানক অসুখের অথবা ওই গোছেরই কোন নিদারুণ দুঃসংবাদ অথবা বিপদসূচক টেলিগ্রাম পেয়ে চোখেমুখে জল না দিয়েই কাকভোরে কোনমতে বাসে উঠে বসেছেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে এই চার ঘণ্টার পথ কোনক্রমে পেরিয়ে এসেছেন।

একমাত্র ব্যতিক্রম উনি ছাড়া বাদবাকী লোকগুলো এই গ্রামেরই। তারা চটপট নেমে যে যার মালপত্র হাতে নিয়ে পরিচিত গ্রামের পথ ধরল।

হতবুদ্ধির মত তাদের চলে যেতে দেখলেন দেবতোষবাবু। তারপর রৌদ্র ছায়াচ্ছন্ন অপরিচিত প্রায় নির্জন পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

পথের দুপাশে জঙ্গল। গাছপালার সার। তার ভেতর দু'চারখানা ভাঙ্গাচোরা দালানকোঠা। কুঁড়েঘর, বাঁশকঞ্চি দরমা দেওয়া মাটির ঘর। মাঝে মাঝে মজা-হাজা ডোবা। টলটলে জলের পুকুর। কর্ কর্ করে ঘুঘু ডাকছে। ঠক্ ঠক্ ঠক্ কাঠঠোক্‌রা। আরো অনেক পাখির অনেক রকম কিচ্‌কিচ্। ঘাসে জঙ্গলে ফুল ফুটে আছে। এপাশে ওপাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শাক তুলছে। বিস্মিত চোখে সব কিছু দেখতে দেখতে দেবতোষবাবু চলতে লাগলেন।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর দু'মুখো দুটো রাস্তার মোড়ে থমকে দাঁড়ালেন। একজন গ্রামের চলতি মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তপনের বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারেন?'

গ্রাম্য লোকটি ওঁর সম্ভ্রান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে সমীহভরে প্রশ্ন করল, 'তপন? কোন তপনের কথা বলছেন?'

দেবতোষবাবু বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'এখানে দুজন তপনবাবু আছেন। একজন ঘোষপাড়ায়, আর একজন ঠাকুর পাড়ায়। আপনি কোথায় যাবেন? কোন পাড়ায়?'

দেবতোষবাবু আরো বিমূঢ় হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

লোকটা ওঁর অবস্থা অনুমান করতে পারছিল। সহুরে ভদ্রলোক। কখনো গ্রামে আসেননি বোঝাই যাচ্ছে। নতুন জায়গায়, তায় একটা অজ পাড়াগাঁয়ে এসে গোলমালে পড়ে গেছেন। বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।

সদয়ভাবে সে আবার বলল, 'একজন তপন দত্ত, একজন তপন রক্ষিত, আপনি কার কাছে যাবেন?'

খুকী কাকে বিয়ে করেছিল? তপন দত্ত না রক্ষিতকে? কিছুই মনে পড়ছে না। পকেট হাতড়ে চিরকুট কাগজটা বার করলেন। কিন্তু নাঃ, কুসুমপুর—তপন ও খুকী—এছাড়া আর কিছুই সেখানে লেখা নেই।

লোকটা ওর বিব্রত বেহুঁশ অবস্থায় মনে মনে বিরক্ত বোধ করেছিল। একটু রেগেই বলল, 'আপনি কি আগে কখনো এখানে আসেন নি?'

'না তো!' সরলভাবে ঘাড় নাড়লেন দেবতোষবাবু।

'তপন আপনার কে হয়?'

তপন তাঁর কে হয়, সেকথা মনে মনে চিন্তা করে তিনি উজ্জ্বল মুখে জবাব দিলেন, 'তপনের বৌ খুকী আমার—আমার মেয়ে হয়।'

হ্যাঁ মেয়েই বললেন। একদিন যার মুখ ইহজীবনে আর দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যে বাপ মা-মরা ভাগ্নিটিকে এতটুকু বেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেও একদিন বলেছিলেন, তুই দূর হয়ে যা— যেখানে ইচ্ছে যার সঙ্গে ইচ্ছে চলে যা, আমি জানব তুই মরে গেছিস। তোর জন্যে আমার মান সম্মান নষ্ট হয়ে গেছে। তুই আমার মুখে চুন কালি দিয়েছিস্। বামুন হয়ে অন্য জাতে বিয়ে করতে যাচ্ছিস।

লোকটা ওঁর চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা বুঝে নিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, বাঁদিকের রাস্তায় চলে যান। বড় একটা পুকুর দেখতে পাবেন। তার পাশেই ঘোষ পাড়ার তপন দত্তের বাড়ি। সেটা যদি আপনার মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি না হয় তাহলে ঠাকুর পাড়ায় চলে যাবেন। তপন রক্ষিতের বাড়ি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, জামাইএর নাম ঠিকানাটাও জানেন না। আশ্চর্য!'

দেবতোষবাবুর গালে যেন একটা চড় কষিয়ে দিয়ে হন হন করে চলে গেল লোকটা।

অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি। সত্যি কি ভাবল লোকটা? খুকীকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন অথচ তার স্বামীর নাম ধাম পরিচয় কিছুই জানেন না তিনি। কিছুই মনে থাকে না তাঁর। মাঝে মাঝে মাথাটা শূন্য মনে হয়। সব কিছু গুলিয়ে যায়। কী যে হয়েছে তাঁর!

মাথাটা কেমন করে উঠল। সভয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। কেউ তাঁকে চিনে ফেলবে না তো? তাহলেই সর্বনাশ। খুকীকে সাবধান করে দিতে হবে। তোকে আমি কোলেপিঠে করে বাপের মতই মানুষ করেছি। আমি তোর বাপ ছাড়া আর কি? কেউ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করে আমি তোর কে, তাহলে তুই বলবি উনি আমার বাবা। মেয়েকে দেখতে এসেছেন।

হাতের সুটকেসটাকে কি ভেবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন দেবতোষবাবু। মুখের ওপর ভয় আর আতঙ্কের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। কেউ যেন তাঁকে তাড়া করেছে এমনভাবে তিনি জোরে জোরে পা ফেলে লোকটার নির্দেশমত পথে চলতে সুরু করলেন। ওই তো একটা মস্ত বড় পুকুর দেখা যাচ্ছে না?

বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হল না।

'মামা তুমি! তুমি এখানে?'

চোখের সামনে যেন একটা অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে, এমন ভাবে চমকে উঠল খুকী অর্থাৎ সুনীলা পুকুর থেকে সদ্যভরা জলের কলসীটা উথলে উঠে ওর কোমরের কাপড় ভিজিয়ে দিল।

'খুকী তুই! আঃ বাঁচলাম। ওইটে তোর বাড়ি বুঝি? বাঃ বেশ চমৎকার বাড়ি। মস্ত দালান কোঠায় সুখ নেইরে খুকী, কোন সুখ নেই। তুই যেটা উনিশ বছরে বুঝেছিলি সেটা ভাল করে বুঝতে আমার পঁয়ষট্টি বছর লেগেছে। কিন্তু তুই এত রোগা এত কালো হয়ে গেলি কেমন করে? অসুখ করেছিল বুঝি?'

তিরিশ বছরের খুকী অভিমান ভরে ছলছল চোখে জবাব দিল, 'মরে গেছি কি বেঁচে আছি এতকাল একটা খবরও তো নাওনি মামা? তা এখন কি করবে? বাড়ির ভেতর ঢুকবে? না বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলে যাবে? বাড়ির ভেতর পা দেবে না।'

'বাইরে থেকে চলে যাব বলে তোর কাছে এতকাল পর আমি আসিনিরে খুকী।' দেবতোষবাবু বিষণ্ণ হলেন। 'সত্যি কথা বলতে কি, আজ আর আমার থাকবার জায়গা বলে কোথাও এতটুকু আশ্রয় নেই। তাই একবস্ত্রে তোর কাছেই পালিয়ে এসেছি। খুকি, আমি তোকে একদিন বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আজ তুই ইচ্ছে করলে আমাকে তাড়াতে পারিস। কিন্তু আমি জানি, তুই তা পারবিনা। তোর তো কোনদিনও টাকা পয়সার লোভ নেই। তুই মানুষের ভালবাসা আর হৃদয়টাকেই চিনেছিলি, তাই আড়াই হাজার টাকা মাইনের যে ছেলেটার সঙ্গে তোর বিয়ে আমি ঠিক করেছিলাম, অনায়াসে তাকে বাদ দিয়ে তুই তপনকে বিয়ে করেছিলি সকলের অমতে। খুকী তোর মনের জোর আছে। বুকের পাটা আছে। সেদিন আমি তোদের ওপর ভয়ানক অন্যায় করেছিলাম। বয়সে ছোট না হলে তোর পায়ের ধুলো নিতাম আমি আজ।'

'ওসব কথা থাক, তুমি আমার সঙ্গে এসো মামা।' সুনীলা ওকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরধারের বাগান পেরিয়ে বাড়িমুখো চলতে লাগল। মামার প্রথম কথাটা শুনে ও এত বেশী হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, যে তাঁর পরের কথাগুলো ভাল করে ওর কানে পৌঁছেছিল কিনা সন্দেহ।

ভরা কলসীর জলকে আরো খানিকটা ছলকে পড়তে দিয়ে ও উদ্বেগ ব্যাকুল গলায় প্রশ্ন করল, 'মামা, তুমি—তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ? কেন? কী হয়েছিল?'

'কী হয়নি তাই বল? তুই আর কী জানবি? আর সত্যিইতো, তোর আর দোষ কি? এগারো বারো বছর না খোঁজখবর, না মুখ দেখাদেখি। তুইও আমার ওপর রাগ করে চলে গেলি, আমিও তোর ওপর অভিমান করে চুপচাপ করে বসে রইলাম। তবু মনে মনে

তোকে তারিফ করেছি খুকী, বলিহারী সাহস তোর। ভালবাসার মর্যাদা দেবার জন্যে কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছিলি তুই। না না—আমি ভুল বললাম। তুই নামিসনি। বরঞ্চ অনেক ওপরে উঠে গেছিস। আমার কাছে এক কানাকড়ি সাহায্য না নিয়ে তুই গরীব তপনকে বিয়ে করেছিলি। অথচ তোকেও তো আমি আমার ভাইপো-ভাইঝিদের মত বড়লোকি চালেই মানুষ করেছিলাম খুকী। তুই একফোঁটা মেয়ে হয়ে যা পেরেছিলি, তোর বাপের বয়সী হয়ে আমি তা পারিনি। পারিনি বলেই আজ আমার এই দুর্দশা। খুকী, দারিদ্র্য মানুষকে মহৎ করে। টাকা পয়সার প্রতি তোর মতন ঘৃণা আর নিস্পৃহতার ষোল আনার এক আনাও যদি আমাদের দেশের কোটিপতি ব্যবসাদার, বড়লোকদের থাকত, তাহলে দেশে এত দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তর হত না। মানুষ না খেয়ে মরত না।'

দেবতোষবাবুর মুখের রেখাগুলো ভাঙ্গচোরা দেখাল। হঠাৎ তিনি চুপ করে কি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন।

সুনীলা আর কোন প্রশ্ন করল না। যখন নিজের থেকেই উনি এত বছর বাদে সুনীলার কাছে এসেছেন, তখন তাঁর সব কথাই, সব খবরই যথাসময়ে জানতে পারবে সুনীলা। কিন্তু তার খবর যাতে মামাবাবু বিন্দুমাত্রও টের না পান, তার ব্যবস্থা তাকে এই মুহূর্তেই করতে হবে। মামাবাবুর চোখে ধুলো দেওয়া সুনীলার পক্ষে কঠিন হবে না।

কিন্তু তপন আর ছেলেমেয়ের কথা মনে হতেই—সুনীলার বুকের মধ্যে শুকিয়ে এলো।

বাড়ি ঢুকে মামাবাবুকে বারান্দায় পাতা চেয়ারটায় বসিয়ে সাড়ে আট বছরের মেয়েটাকে বাক্স থেকে একটা তোলা ফ্রক বার করে দিতেই তার আর্ধেক কাজ সারা হয়ে গেল। দাদু এসেছেন। টুনু যেন সভ্যভব্য হয়ে থাকে। ছোট ভাইটাকে সামলে রাখে। তার সঙ্গে যেন ঝগড়া মারামারি না করে। দাদুর ফাই ফরমাস, ছোটখাট কাজগুলো যেন টুনু লক্ষ্মী মেয়ের মত করে দেয়।

মেয়েকে আর দ্বিতীয় কথা বলতে হল না। তোলা ফ্রকটা পেয়েই সে মহা খুশী। তাকে সঙ্গে নিয়ে সুনীলা চটপট ঘরদোর পরিষ্কার করল। বসবার ঘরটার খাটের বিছানার চাদর পালটালো। বাক্স থেকে সযত্নে তুলে রাখা বেড়কভার টেবিলক্লথ্ বার করে বিছানা ঢাকল। রং-চটা পুরোনো টেবিল চেয়ার ঢাকল। দুটো ফুলদানি পরিষ্কার করে বাগান থেকে চারটি ফুল তুলে এনে রাখতেও ভুলল না। যতদূর সম্ভব মামাবাবুর জন্যে শ্রীহীন ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে সুদৃশ্য করে তুলল সাধ্যমত।

কিন্তু শুধু ঘরখানার শ্রী ফেরালেই তো আর সারা বাড়িখানার চেহারা ফেরানো যাবে না। বারান্দায় বসে কি আর মামাবাবু সুনীলার হাড় পাঁজরা বারকরা বাড়ি ঘরদোরের চেহারা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না? পাঁচীলগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। উঠোনময় শাকসবজি আর গাছপালার জঙ্গল। বাঁশের দরমার বেড়া আর মাটির দাওয়ার রান্নাঘর। সিমেন্ট-ওঠা ঘর বারান্দার মেঝে। যেদিকে তাকাও, অভাব অনটন, দুঃখ দুর্দশার ছবি। কোনদিক সামলাবে সুনীলা?

আর সামলাবেই বা কেন? গরীব জেনেই তো তপনকে ও বিয়ে করেছিল। মনে মনে অবশ্য আশা ছিল, মামাবাবু এ বিয়ে মেনে নেবেন। তাকে একেবারে বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু মামাবাবু একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। তাঁর আড়াই হাজারী মনোনীত পাত্রটিকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায়—বামুনের মেয়ে হয়ে কায়স্থকে—

কিন্তু থাক এখন সেসব চিন্তা। হঠাৎ এতকাল পর মামাবাবু এখানে কেন এসেছেন? তাঁর ভাইপোরা, বৌরা, তাদের ছেলেমেয়েরা সব কোথায়? কদিনের জন্যেই বা এসেছেন? নিজে না হয় উনি বিয়েই করেননি, কিন্তু ভাইয়ের ছেলেদুটিকে তো নিজের ছেলের মতই মানুষ করে নিজের ব্যবসা কাজকর্ম—শিখিয়ে পড়িয়ে লায়েক করে তুলেছেন। তাদের বিয়ে দিয়েছেন। তাদের নিয়েই সংসার করছেন। এই এগারো বছর বাদে হঠাৎ সুনীলাকে মনে পড়ার কারণ কি? কদিন থাকবেন উনি এখানে? যে কদিনই থাকুন না কেন, সুনীলার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে,—শুধু এইটুকু ছাড়া আর কিছু যেন ওঁর নজরে না পড়ে।

সংসারের কাজ করতে করতে বুক ধড়ফড় করে উঠল সুনীলার। তপনের কথা চিন্তা করে। সুনীলার আর কি পরিবর্তন দেখলেন মামাবাবু? তাঁর সমস্ত স্নেহ মমতা ভালবাসা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে, ধন সম্পত্তি বিলাস ঐশ্বর্যের সমস্ত লোভ মোহ ত্যাগ করে, যে তপনের হাত ধরে একদিন মামাবাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল সুনীলা, তাকে যখন দেখবেন, তাদের কুৎসিত কলহ যখন শুনবেন, অভাবের সংসারের সবকিছু অশান্তির খবর যখন জানতে পারবেন তখন কী হবে সুনীলার? সে লজ্জা, সে অপমান কী দিয়ে কেমন করে ঢাকবে সুনীলা?

'তোমায় পাগল বলে—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে রাতদিন তোমাকে বাড়িতে আটকে রাখে?' হতবুদ্ধির মত দেবতোষের মুখের দিকে তাকাল সুনীলা।

'সত্যি রে খুকী। অফিসে কাজ করতে করতে একদিন মাথা ঘুরে অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললেন, হাই প্রেসারের জন্যে। সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক দুটোই নাকি খুব বেড়ে গিয়েছিল সে সময়। তারপরই ভাইপো দুটো আমাকে ঘরবন্দি করল। ভাইপোবৌরা বাইরের লোকেদের কাছে বলে বেড়াতে লাগল আমার নাকি মাথার দোষ হয়েছে। আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি। অবিশ্যি মাঝে মাঝে আমার মাথাটা কেমন করে। সব ভুলে যাই। এই ধর না, যেমন তপনের উপাধিটার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম তোর বাড়িতে আসবার আগে। কিন্তু সত্যি বলছি খুকী, তুই বিশ্বাস কর আমি পাগল নই।' করুণ, কাতর মুখে দেবতোষবাবু সুনীলার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

সুনীলা স্তব্ধ হয়ে দেবতোষের কথা শুনছিল, তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'না-না মামাবাবু, তুমি পাগল হতে যাবে কোন দুঃখে?'

'তুই তো জানিস, বড়দা চিরটাকাল কোন কাজকর্ম করেন নি। আমি ওঁর সংসার প্রতিপালন করেছি। ওঁর ছেলেদের মানুষ করেছি। তুই আমার গরীব বোনের মেয়ে ছিলি,

ওরাও আমার বেকার দাদার ছেলে ছিল। অথচ তফাতটা দেখ। তোর যেমন অর্থের ওপর ঘেন্না, অনাসক্তি, আমার ভাইপোদের আবার তেমনি লোভ আর আসক্তি খুকী, টাকার জন্যে মানুষ মানুষ খুন করে! কী না করতে পারে মানুষ টাকার লোভে? তুই তপনের জন্যে টাকাকড়ি বাড়ি গাড়ি সব ছাড়তে পেরেছিলি, আর ওরা? আমাকে পাগল বানিয়ে আমার কারখানা বিষয় সম্পত্তি সব মুঠোয় পুরেছে। তাতেও ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। এবার আমাকে ওরা সবাই মিলে মেণ্টাল হাসপাতালে পাঠাতে চায়। পাগলা গারদে।'

'মেণ্টাল হাসপাতাল! পাগলা গারদে?' সুনীলা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'হ্যাঁরে খুকী তাই। ওই মতলব করেছে প্রমথ সুমথরা। একবার আমাকে পাগল বলে প্রমাণ করতে পারলে আমার সর্বস্ব ওরা গ্রাস করতে পারবে। ওই যাঃ, আমার সুটকেসটা কোথায় গেল? খুকী, ভাল করে তুলে রেখেছিস তো ওটা! ওর মধ্যে আমার ··· চাবি কই? আঁ্যা, চাবিটা কোথায় ফেললাম? খুকী, শিগ্‌গীর চাবিটা খুঁজে দে, দ্যাখ্ দ্যাখ্ এমন ভুলো মন হয়েছে আমার আজকাল!'

চেয়ার ছেড়ে পাগলের মতই দেবতোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পকেট হাতড়াতে লাগলেন। এদিক ওদিকে দেখতে লাগলেন। 'কই কোথাও নেই তো? কী হবে খুকী? চাবিটা কি বাসের মধ্যে পড়ে আছে, না কি বাড়িতেই ফেলে রেখে এলাম? কী হবে তাহলে এখন?'

সুনীলা তাড়াতাড়ি ওঁকে আশ্বস্ত করল, 'এখনই চাবি তোমার কি হবে মামাবাবু? ওঁর একখানা ধুতি তোমায় বার করে পরতে দেবখন। এটা তো তোমার কলকাতা সহর নয়। অজ পাড়াগাঁ। কোথায় আর বেরুবে? তার চেয়ে বরং তুমি টুনুর আর খোকনের সঙ্গে একটু গল্প-টল্প কর মামা, আমি তোমার স্নান খাবার বন্দোবস্ত করিগে।'

তপন সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরল রাত আটটায়। ক্লান্ত শরীরে তিরিক্ষি মেজাজে।

ছেলেমেয়েদের অনেকদিন পর দু'বেলাই ভালমন্দ খাওয়ানো হয়েছে। সুনীলার দু'চারটে লুকোনো টাকা মামার জন্যে শেষ হয়ে গেছে। তপন ফিরে এলে যে কি হবে সেই ভাবনায় তার মেজাজটাও ভাল নেই। টুনুকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল। বাবাকে দেখেই ও ছুটে গিয়ে সব খবর শুনিয়ে জানিয়ে সাবধান করে দিয়ে এলো। দাদু এসেছেন। মায়ের সেই মামাবাবু। বাবা যেন বাড়ি গিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে, চিৎকার না করে।

সঙ্গে সঙ্গে তপনের মেজাজ আর এক ডিগ্রি চড়ল। বেশ শব্দ করেই দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ি ঢুকল। দেবতোষবাবু তখন সুনীলার ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে নিয়ে সুনীলার সাজানো গোছানো ঘরখানায় শুয়ে তাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। তপনের জুতোর শব্দ তাঁর কানে পৌঁছল না।

সুনীলা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মুখোমুখি হতে তপনই আগে তীর ছুঁড়ল, 'বুড়োটা

এলো কখন?' তপনের হাত ধরে শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চাপা গলায় সুনীলা জবাব দিল, 'এই বেলা দশটায় বাসে।'

'কি করতে এসেছে এখানে? এত বচ্ছর বাদে?'

মামাবাবু কি করতে যে এখানে এসেছেন, সেকথা সঠিক জানা না থাকায় সুনীলা চুপ করে রইল।

'দূর দূর করে একদিন তোমাকে কুকুর বেড়ালের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে বলে। এতদিন আমরা মরে গেছি কি বেঁচে আছি, একখানা পোষ্টকার্ড দিয়েও সে খবর নেয়নি ওই বদমাস বুড়োটা। আজ এগারো বচ্ছর বাদে কি জন্যে এসেছে? আমাদের দুর্দশা দেখতে?

হিংস্রভাবে ঘামে ভেজা শার্টটাকে একটানে খুলে আলনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল তপন।

'আঃ! দয়া করে আজকের মত একটু নীচু গলায় কথা বল।' সুনীলা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ফিসফিস করে উঠল। 'মজা দেখতেই বা আসবেন কেন? হাজার হোক নিজের মায়ের পেটের বোনের মেয়ে। যে বোন ভগ্নিপোত মারা যাবার পর তাদের মেয়েটাকে উনি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন, সেই ভাগ্নী—'

'বোনের মেয়ে! ভাগ্নী!' কুৎসিতভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাকটা যেন সুনীলার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল তপন। 'তুমি তোমার বড়লোক মামাকে দেখে সব অপমান ভুলে যেতে পার, গলে জল হয়ে যেতে পার, কিন্তু আমি সেদিনকার একটা কথাও ভুলিনি। আমি শিক্ষিত সচ্চরিত্র, ভাল বংশের ছেলে, কিন্তু শুধু গরীব বলে সেদিন কী অপমানটাই না উনি আমাকে করেছিলেন। বেকার ছোক্‌রা! পেনিলেস লোফার! ঘর নেই দোর নেই—চাকরি নেই—বড়লোক আত্মীয়-স্বজন নেই, বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়। সেদিন যদি উনি আমাদের সঙ্গে অমন দুর্ব্যবহার না করতেন, তবে আজ আমাদের এমন দুর্দশা হত না। কলকাতা সহর ছেড়ে এসে এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে হত না। ভাগনি! বোনের মেয়ে! দরদ কত! কই, সেদিন তো মা-বাপ-মরা, মেয়ের মত মানুষকরা ভাগ্নীকে অমনভাবে তাড়িয়ে দিতে এতটুকু বাধে নি? শোন সুনীলা, তোমার বড়লোক মামাটিকে আদর যত্ন করে আজকের দিনটা রেখেছ ভালই করেছ, কিন্তু কাল আমি ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাবার পর তুমি ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিও। ওই বুড়োর মুখদর্শন যেন আমাকে করতে না হয় বাড়ি ফিরে এসে।'

সুনীলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কেন রাগ করছো? উনি এখানে থাকবেন বলে তো আসেন নি। কাল পরশুই চলে যাবেন। বড়লোক মানুষ এখানে থাকতেই পারবেন না। আজই না হয় ধারকর্জ করে এটা ওটা খাওয়ালাম, কিন্তু রোজ তো পারব না। বেগতিক বুঝে উনি নিজেই চলে যাবেন, আমাকে আর কষ্ট করে ওকে তাড়াতে হবে না।

সুনীলার কথা কিন্তু ঠিক হলনা।

কাল-পরশু-তরশু এমন করে পর পর সাত আট দিন কেটে গেল। দেবতোষবাবু

নির্বিকার। তাঁর যে এখানে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে একথা একেবারেই মনে হলনা। বরং মহানন্দেই আছেন তিনি। সুনীলার ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে গল্পগুজব করে, খেলাধূলো করে বাগানে পুকুরের ধারে বেড়িয়ে দিব্যি তাঁর সময় কেটে যাচ্ছে। ও যে কেমন করে রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়াচ্ছে, খাবার দাবারের ব্যবস্থা করছে, সে বিষয়ে কোন চিন্তাই ওঁর নেই। বরং ওঁর প্রসন্ন সদা আনন্দিত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এখানেই উনি ওঁর বাদবাকী জীবনটা কাটাবেন বলে স্থির করেছেন।

তপন আড়ালে আড়ালে রেগে আগুন হয়ে ঝাল ঝাড়ছে সুনীলার ওপর। আর সুনীলা নিরুপায় ক্ষোভে দুঃখে জ্বলে পুড়ে মরছে। না পারছে মামাবাবুকে চলে যেতে বলতে। না পারছে তপনকে শান্ত রাখতে।

'পকেটে গোটা পঞ্চাশ টাকা ছাড়া আর কিছুই আনেননি? সুটকেসটাতে যে কিচ্ছু নেই বোঝাই যাচ্ছে। মালকড়ি থাকলে চাবিটাকে কেউ অসাবধানে হারায় না। যেমন কর্ম তেমন ফল হয়েছে। বুড়োটাকে পাগল বানিয়ে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হাতিয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে শালারা।'

দাঁত কিড়মিড় করে তপন প্রত্যেকদিন। অবশ্য দেবতোষবাবুর অসাক্ষাতেই। 'নিজেরা খেতে পাই না, দুবেলা বুড়োটাকে ভাতের থালা ধরে দাও এ কি অশান্তি। দোকানে ধার, বাজারে ধার, ধারের ওপর ধার হচ্ছে বুড়োটার জন্যে। এতটুকু লজ্জাঘেন্না থাকলে দূর করে তাড়িয়ে-দেয়া ভাগ্নির বাড়ি এসে ওঠে? ওর ব্যবহারেই ওর ভাইপো ভাইপোবৌরা ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে একথা বেশ বুঝতে পারছি।'

একদিন দুদিন নয়। পরপর কদিন ধরেই সুনীলার দুটো কান পুড়িয়ে দিচ্ছে তপন। সুনীলাও আর জোড়াতালি দিয়ে কোনমতেই ভদ্রতার সূক্ষ্ম আবরণটুকু রাখতে পারছে না। দুটোদিক—মামা আর স্বামীকে সামলাতে সে প্রাণান্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে ফুটো সংসার।

দেবতোষবাবুর কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। 'তোদের গ্রামটা চমৎকার রে খুকী। আর তোর বাড়িটা কী সুন্দর! যেন তপোবন। রাস্তাঘাট কী শান্ত। গাড়ি ঘোড়া নেই। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। কাপড় জামার দরকার নেই। একখানা কাপড় দুপাট করে লুঙ্গির মতন করে পরেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে। বেশ আছি আমি। মাথার যন্ত্রণাটা আর হয় না। পাগল যদি হয়ে গিয়েও থাকি, তোর বাড়িতে কটাদিন হল আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি। শুধু মাঝে মাঝে সবকথা ভুলে যাই। তবে একটু পরেই আবার মনে পড়ে।'

সুনীলা সুযোগ পেয়ে অবুঝ শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে, 'মামা, এখানে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এবার তুমি বাড়ি যাও। দাদারা সব ভাবছেন হয়তো।'

দুচোখ কপালে তোলেন দেবতোষবাবু, বলিস কি রে? অ্যাঁ? বাড়ি যাবার উপায় আছে? মেণ্টাল হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে না তাহলে? না-না ওকথা তুই বলিসনি খুকী, আমি তোর এখানেই থাকব। এখানে আমি বেশ আছি। বেশ আছি।'

উল্টোপাল্টা কথাবার্তা, মাঝে মাঝে সব ভুলে যাওয়া, সুটকেস, চাবি সম্বন্ধে একেবারে নীরবতা, তপনের একখানা ধুতি পরেই কদিন কাটানো সবকিছু মিলিয়ে ওঁর মস্তিষ্কের

সুস্থতা সম্বন্ধে সুনীলার একটু সন্দেহ হয়েছিল। তপনতো ওকে পুরোপুরি পাগল বলেই ধরে রেখেছে। এভাবে পালিয়ে আসার আর কি মানে হয়? অমন বাড়ি, গাড়ি, অতগুলো ঝি-চাকর, অতবড় কারবার, লোকজনদের হুকুম করাটাই যাঁর চিরদিনের অভ্যেস, তিনি আজ সুনীলার মাটির দাওয়ায় বসে শাকচচ্চড়ি ডাল দিয়ে মোটাচালের ভাত খাচ্ছেন। সুনীলার শাকসব্‌জির ফুলবাগানে জল দিচ্ছেন! ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না আছে পায়ে জুতো, না ভাল পোষাক-আসাক। স্নান করার পর চুল আঁচড়াতেও ভুলে যান। সত্যি সত্যি কি মামাবাবুর মাথার দোষ হয়েছে না কি? এমন তো ছিলেন না?

'খবরদার খুকী, তুই যেন বাড়িতে চিঠি-টিঠি লিখে দিসনি, তপনকেও বারণ করে দিস। না-না তোরা দুজনে তেমন ছোট কাজ কখনো করবি না এ বিশ্বাস আমার আছে। খবর পেলেই ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। কেমন জব্দ করেছি আমি ওদের বল তো? ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, আমি তোর এখানে এসে উঠেছি।'

মাথা খারাপ—সত্যিই মাথা খারাপ! সুনীলা মনে মনে ভাবল। মাথাটা পরিষ্কার হলে সুনীলাদের অবস্থাটা ওঁর নজরে পড়তো, ওঁর জন্যে এটা ওটা সেটা কেনাকাটায়, রান্না বাড়ায় খরচ হচ্ছে এটা চোখে পড়তো। সুনীলার পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়ী, ভাঙ্গাচোরা ঘরদোরের অবস্থা সব মিলিয়ে ওদের এই দারিদ্র্য দশা সম্বন্ধে একেবারে উনি নির্বিকার হয়ে থাকতে পারতেন না। অথচ এই নিদারুণ ভয়টাই প্রথমে করেছিল সুনীলা।

পরদিন সকালে অফিস যাবার সময় খরচ-টাকাকড়ি ইত্যাদির ব্যাপার নিয়ে বেশ খানিকটা চেঁচামেচি করে গেল তপন সুনীলার সঙ্গে। ও বেরিয়ে যেতেই দেবতোষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে খুকী, তপন এত রাগারাগি করছিল কেন রে? তোর সঙ্গে?'

সুনীলা বুঝতে পারল, কানে গেলেও, ঝগড়াটা যে ওঁকে নিয়েই—একথাটা মামাবাবুর মাথায় ভাল করে ঢোকেনি। ম্লান হেসে বলল, 'ও কিছু নয় মামাবাবু, আমাদের ঝগড়ায় তুমি কান দিওনা।'

'তা বেশ বেশ। কথায় বলে দাম্পত্য কলহ। তোরা বেশ সুখেই আছিস খুকী। তোদের সুখেই আমার সুখ।'

দেবতোষবাবু খেয়ালের বশে আপন মনেই বক্‌বক্‌ করতে লাগলেন। সুনীলার মেজাজ চড়েই ছিল হঠাৎ, সে তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুমি কবে এখান থেকে যাবে মামাবাবু?'

'আমি! যাব! কোথায় যাব?' দেবতোষবাবু যেন সুনীলার কথার অর্থটা একেবারে বুঝতে পারেননি, এমন ভাবে উল্টে ওকেই প্রশ্ন করলেন।

'কোথায় আবার যাবে? তোমার বাড়ি। কলকাতায়। মেয়ের বাড়ি লোকে কদিন থাকে?'

'বারে মেয়ে কি পর নাকি? বকুনি দিয়ে দেখছি তোর মাথাটা তপন একেবারে খারাপ করে দিয়ে গেছে।' দেবতোষবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। 'তুই তপনের সঙ্গে ঝগড়া করে, রাগ করে আমাকে চলে যেতে বললেই আমি চলে যাব! আমি কি তোর মত পাগল? না আমার মাথা খারাপ?'

সেই দিনই একেবারে অসময়, ভর দুপুরে তপন চোরের মত বাড়ি ঢুকল। বাইরের ঘরে দেবতোষবাবু ঘুমোচ্ছেন। মেয়ে স্কুলে। ছেলেটা দেবতোষবাবুর কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সুনীলাও সবেমাত্র সংসারের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে বিছানার ওপর। অসময়ে স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। 'কি ব্যাপার? অফিস ছুটি হয়ে গেল বুঝি?'

সন্তর্পণে দরজায় খিল তুলে দিয়ে তপন সুনীলার পাশে বসে পড়ে, ফিসফিস করে বলল, 'ব্যাপার গুরুতর। অফিস ছুটি হয়নি। এই কাগজটা পড়ে দেখ, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।'

হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখা খবরের কাগজখানা সুনীলার চোখের সামনে খুলে ধরল তপন।

এক পলক তাকিয়েই চিনতে পারল সুনীলা। কিছুটা ঝাপ্‌সা হলেও ফোটোটা দেবতোষেরই। মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে মামুলি বিজ্ঞাপন।—"নিখোঁজ, দেবতোষ চক্রবর্তী। বয়স বাষট্টি। বিকৃত মস্তিষ্ক। সঠিক খবর দিতে পারলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

'কী সর্বনাশ! মামাবাবু তাহলে সত্যি সত্যি পাগল? বাড়ি থেকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন?' সুনীলা আঁৎকে উঠল।

'কারুর বা সর্বনাশ কারু বা পোষ মাস!' জ্বলজ্বলে চোখে তপন বলল, 'যাক ভগবান এদ্দিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন! হাজার টাকা পাইয়ে দিলেন! একেই বলে কপাল।'

'তার মানে?' একটা বিশ্রী সন্দেহে সুনীলার মুখ সাদা হয়ে গেল।

অনেকদিন পর ওর গাঁ ঘেঁষে বসে, ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওকে প্রাণভরে আদর করতে করতে তপন গদগদ গলায় বলল, 'বোকাটা। তার মানে ওই হাজার টাকাটায় আমাদের কপাল ফিরে যাবে, বুঝলে খুকুমণি? পাঁচশো টাকা ম্যানেজারবাবুকে দিতে পারলেই সামনের মাস থেকে যতীশ্বরবাবুর খালি পোস্টটায় আমি চলে যেতে পারব। আর শ'খানেক টাকা এদিক ওদিক করতে পারলে আমার প্রমোশন আটকায় কে? মাইনে প্রায় ডবল হয়ে যাবে। এখন যা আছে তার চেয়ে।'

'না—না—ছিঃ?! তুমি কি ভেবেছ…'

সুনীলা ওর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে সরে বসতেই তপন আবার ওকে জোর করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। 'খুকী, তুমি কি ভাবছো, আমি বুঝতে পারছি। তোমার মামাবাবু পাগলের খেয়ালে আজ এখানে পালিয়ে এসেছেন। হঠাৎ ভাল না লাগলে কালই আবার এ বাড়ি ছেড়ে আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে চলে যাবেন। তাতে ওঁর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, আমাদেরই হবে। আর একথাটাও তুমি ভেবে দেখ, সত্যি যদি উনি অসুস্থ হন, ওঁর এখন উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। এমনভাবে বিনা চিকিৎসায় শাক ভাত খাইয়ে ওঁকে এখানে ফেলে রাখা কি আমাদের উচিত হবে?'

সুনীলা নিরুত্তর।

তপন বলতে লাগল, 'তারপরও কথা আছে। এখানে তুমি ওঁকে আট দিনের জায়গায় দশ দিনই না হয় লুকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু তারপর? কাগজে কাগজে ওঁর ছবি বেরিয়েছে। গ্রামের দু'চারজন এর মধ্যেই আমাকে ওঁর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছে। আর খবরের কাগজ সকলেই পড়ে আজকাল। আমাদের বোকামির জন্যে অন্য কেউ মামাবাবুকে ধরিয়ে দিয়ে টাকাটা মেরে দিক, এটা তুমি নিশ্চয় চাও না সুনীলা? বল, চাও কি? ধরা ওঁকে পড়তেই হবে। হয় আজ নয় কাল।'

'তা বলে মামাবাবুকে ধরিয়ে দেবে?' সুনীলার গলার জোরটা, মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা হঠাৎ কমে গেল।

'আমরা না দিলে অন্য কেউ দেবেই। করকরে হাজারটা টাকা মেরে দেবে। তাতে আমাদেরও লাভ হবে না, মামাবাবুরও কোন লাভ হবে না। শোন, আমি এখনি কলকাতা যাচ্ছি। তুমি আজ কোন মতেই মামাবাবুকে বাড়ি থেকে বার হতে দেবে না। দরজা বন্ধ করে ওঁকে চোখে চোখে রেখ। বলা যায় না, যা কপাল আমাদের; ঘাটে এসে নৌকা না জলডুবি হয়।'

টুকিটাকি এটা ওটা জিনিষপত্র নিয়ে তপন সাবধানে বাইরে এলো। সুনীলাও সঙ্গে সঙ্গে এলো। চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'যা বললে সত্যি? ঘুষ-টুষ দিলে প্রমোশন হবে? মাইনে বাড়বে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। যতীশ্বরবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। ওঁর পোস্টটা আমি পাব। তবে— বুঝতেই পারছো কমপিটিশন্ আছে, রেষারেষি আছে। ম্যানেজারকে ভাল করে অয়েলিং করতে পারলে…'

'কখন ফিরে আসবে?'

'আজ রাত্রেই। তুমি মন খারাপ কর না। মামাবাবু কোনদিনও জানতে পারবেন না যে টাকার লোভে আমরাই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছি। আর হাজার টাকা ছাড়াও আরো কিছু বেশী আদায় করব। এই আট দশদিনে কম খরচ হল ওঁর পেছনে? সে টাকাটা অবশ্য পুরো তুমিই পাবে।'

সুনীলার গালটা আরো একবার টিপে ঝড়ের মত বাস স্টপের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল তপন লম্বা লম্বা পা ফেলে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জিপখানাকে একটু দাঁড় করিয়ে, লোক দুটোকে বারান্দায় রেখে দেবতোষের বড় ভাইপো প্রমথ ঘরে ঢুকল। সুনীলা আর তপনের সঙ্গে কথাবার্তা আগেই হয়ে গিয়েছিল।

সুনীলা তক্তপোষের তলা থেকে দেবতোষের সুটকেসটা বার করে তার হাতে দিয়ে বলল, 'শুধু এই সুটকেসটাই হাতে করে এনেছিলেন উনি। তাও আবার চাবিটা আনতে ভুলে গেছেন। না কি কোথাও হারিয়ে ফেলেছেন কে জানে? যা ভুলো মন ওঁর। যেমন অবস্থায় এনেছিলেন, তেমন ভাবেই ওটা পড়ে আছে। খোলা হয়নি। দরকারও হয়নি।'

'চাবিটা আমার কাছেই আছে। কাকাবাবুর ঘরেই পড়ে ছিল। খুকী, তুই আর তপন আমাদের কী উপকারটাই না করলি ভাই! কাকাবাবুর জন্যেই তোদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা খারাপ হয়েছিল। এতদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। সে দোষ আমাদের নয়।'

'মামাবাবুই আবার নিজে থেকে আমার কাছে এসে সব কিছু মিটমাট করে দিলেন।' সুনীলা মৃদুস্বরে জবাব দিল।

'আমি তপনকে বলেছি, কাকাবাবুর কারখানাতেই ওর একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। আর কাকাবাবুর জন্যে তোদের যা খরচ হয়েছে তার জন্যে কিছু ভাবিসনি। আমি থাকতে তোদের কোন ভাবনা নেই। মামাবাবুকে নিয়ে তোরা আয়, আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি।'

সুটকেসটা শক্ত করে ধরে প্রমথ জিপের দিকে চলে গেল।

সেই ময়লা ধুতি, সার্ট প্রথমদিনের সেই পোষাক-পরা দেবতোষবাবু সুনীলাকে কাছে ডেকে বললেন, "কাঁদিসনি, চোখ থেকে আঁচল সরা। তোদের দোষ কি বল? ওরা যে আমার ছবি কাগজে ছেপে আমায় খুঁজে বার করবে, এটা মাথায় আসেনি। শোন, তোর বিয়েতে আমি কিছু দিইনি। আমার নিজস্ব দশ হাজার টাকা তোকে যে সুটকেসটা আমি দিয়েছি তার মধ্যে এনেছি। একশো টাকার একশোখানা নোট। এ কদিন একেবারে মনে ছিল না টাকার কথা। প্রমথকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সবকথা মনে পড়ে গেল। সেটা তুই আর তপন নিস। সুটকেসটার টাকার কথা যেন প্রমথদের কাউকে বলিসনি। টাকায় ওদের ভীষণ লোভ। তোদের মত নয় ওরা। চাবিটা যে কোথায়…

'সুটকেসে টাকা ছিল! দশ হাজার টাকা!' চোখের জল শুকিয়ে গেল। সুনীলার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। 'কী বলচো তুমি মামা?'

'হ্যাঁরে। এখানে আসার আগের দিন ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলাম টের পেয়েই ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে, বুঝলি না? নইলে আমি মরি বাঁচি আর হারিয়ে পালিয়ে যাই বয়েই গেল ওদের'

দেবতোষবাবুর কথা শেষ হবার আগেই, বারান্দায় দাঁড়ানো ষণ্ডামার্কা চেহারার লোকদুটো ওঁর দুপাশে এসে দাঁড়াল। 'এবার চলুন, অন্ধকার হয়ে এসেছে।'

বোকা

নমিতা চক্রবর্ত্তী

ছিটে ছিটে বৃষ্টি মাথায়-মুখে লাগাতে লাগাতে শিখার পাশে পাশে হাঁটছিল মুরলী। দু'টো বাজবার বেশ কিছু পরে অফিস থেকে বেরিয়েছে শিখা। আধঘণ্টার উপর পথে দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা করছিল, ক্ষিধেও পেয়ে গিয়েছে। আরো বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে তবেই মিলবে রেস্টুরেণ্ট, পর্দাটানা এক চিলতে খোপ, গরম খাবার, ধোঁয়া উঠছে চায়ের পেয়ালায়, ভাবতেই তিনটে পর্যন্ত উপবাসী শরীরে একটা উষ্ণতার স্রোত বয়ে গেল মুরলীর। আজকে মাসের মাত্র তিন তারিখ, এখনো শিখার ব্যাগ, বাবাকে টাকা দেবার পরেও যথেষ্ট ভারী আছে। মাইনে পাবার পরই উদার হাতে সবটা বিতরণ করে বসে না সে। ওর আবশ্যিক কেনা কাটা আছে। ও ল্যাক্‌মে কিনবে, কিনবে এঞ্জেলস্ ফেস, এক-আধটা ব্লাউজ পীসও কিনতে পারে। দু-একটা সিনেমা, মাস ভরে টিফিন সুতরাং বাবার অসন্তুষ্ট মুখ, মায়ের করুণ আবেদন—'আর গোটা দশেক টাকা দিতে পারিস না?'—অগ্রাহ্য করে শিখা।

শিখার চাকরিটা ভালো, সরকারী চাকরি। হঠাৎ ক্লোজার, বছর ভরে স্ট্রাইকের ঝামেলা নেই, দেরী করে এলে লাল দাগ পড়ে না খাতায়, প্রচুর ছুটি নিলেও চাকরি যাবার ভয় নেই। অবশ্য চাকরি যাবার ভয় ছিল না মুরলীরও। ওদের ইউনিয়ন খুব স্ট্রং, কারোর চাকরি সহজে খতম করতে পারত না মালিক পক্ষ। চাকরি যায়নি মুরলীর, কারখানাটাই গিয়েছে বন্ধ হয়ে। একদিন সকালে হন্তদন্ত হয়ে ছ'টা দশের ডিউটিতে হাজির হয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল মুরলী গেট বন্ধ, মস্ত বড় বড় অক্ষরে ঝুলছে ক্লোজারের নোটিশ। গত এক বছর ধরে তাই বেকার হয়ে গিয়েছে মুরলী। প্রথম প্রথম তত ঘাবড়ায়নি, হাতে শ'খানেক টাকা ছিল, মা-বাবা-বন্ধু-বান্ধব সবাই বলেছিল—ক্লোজার উঠে যাবে একমাসের, বড় জোর দু'মাসের মধ্যে।

দু'টো প্যাণ্টই টেরীকটের, জামা টেরিনের, এখনো ওরা যুঝবে আরো একবছর কিন্তু হাওয়াই চপ্পল টিকছে না, ব্লেড কিনবার পয়সা শর্ট। মা প্রত্যেকদিন উদাহরণ সহযোগে অন্যের বাড়ীর ছেলেদের রোজগার চাতুর্য এবং মুরলী যে ছোটবেলা থেকেই বোকাটে ধরণের সেই সব বিবরণ দিচ্ছেন অন্য দুই ছেলে-মেয়ের কাছে। শিখার কোনো পরিবর্তন হয়নি। না, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে, সমস্ত বুদ্ধিতে একাগ্র হয়েও শিখার পরিবর্তন ধরতে পারেনি মুরলী। ও তেমনি হাসি মুখে মুরলীর সঙ্গে ঘোরে। মাসের প্রথমে রুটি মাংস, শেষের দিকে চা-টোস্টের দাম বের করে ব্যাগের মধ্যস্থিত ছোট ব্যাগটি খুলে। কিন্তু একটা আয়ের উপায় না থাকলে চলে কি কোনো যুবকের! চলছে না মুরলীর। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাবাও আজকাল বলতে শুরু করেছেন—মুরলী কিছুটা বোকা! ছোট ভাই কানাই নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে মাঝে মাঝেই। একটা ওষুধের দোকানের সেল্‌সম্যান সে। মাইনে পায় দেড়শো টাকা। কেমন করে যেন সেটাকে সে তিনশো তো

বটেই চারশো পাঁচশোতেও ঠেলে নিয়ে যায়। বাড়তি উপার্জনের নানা রকম ফন্দীর গল্প করে কানাই। মা তার থালায় আর একটুকরো মাছ তুলে দিতে দিতে বলে ঃ

—কানু আমার বরাবরই খুব চালাক। বাবা আড়চোখে মুরলীর দিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁ, যে দিনকাল পড়ছে! ভালো মানুষ না বোকা মানুষ। বোকাদের ভাত নেই। বোন চুমকি হাসে—যদি ধরা পড়ে যাস ছোড়দা, তাহলে কি বুদ্ধি করবি?

মা-বাবা দু'জনেই চুমকিকে বকে ওঠে। মা বলে—ওকি মুরলীর মতো বোকা নাকি যে নিজে গিয়ে সেধে ধরা দেবে চোর বলে।

মুরলীর গাল দু'টো হঠাৎ চিন্‌চিন করে ওঠে। শেষ গ্রাসটা মুখে পুরে মুখ ধুতে চলে যায় মুরলী।

দশটা, এখনো বেশ মনে আছে, দু'গালে পাঁচটা পাঁচটা দশটা চড় মেরেছিল মা গুণেগুণে। বাবাও সব শুনে মাথায় চাটি কষিয়েছিলেন—আহাম্মক কোথাকার!

মা বলেছিল—বোকা, বড় হয়ে ও একটা বোকা হবে। এ ছেলে নিয়ে অনেক জ্বলতে হবে।

চড়-কানমলার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও সেই দু' বছর বয়সে প্রথম ভীষণ মার খেয়েছিল মুরলী। সেই মারের স্মৃতি আজো তাকে মাঝে মাঝে দু' বছর বয়সে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ছোট শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটি চড়ের আঘাতে। ভয়ে জোরে কাঁদতে পারেনি, গলা দিয়ে ভীতু কুকুরছানার মতো একটা শব্দ বের হচ্ছিল।

সেই অনেক বছর আগে, সেই দু' বছর বয়সে মা-বাবা আর ছোট ভাইটির সঙ্গে মুরলী পাড়ার এক বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। সুন্দর সাজানো নতুন শাড়ী-গয়নায় মোড়া ঝকঝকে কনের একেবারে কাছে গিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছিল মুরলী। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল রোজকার দেখা বিনুপিসিকে। মা কাছে বসে উবুড় হয়ে উপহারে পাওয়া জিনিষ-পত্র নেড়ে চেড়ে দেখছিল। খানিকটা পরে উঠে দাঁড়াল—ওঠ, ওঠ। মুরলীর হাত ধরে টানল মা।—ওদিকে গিয়ে দাঁড়া। বসে বসে ঝিমুচ্ছিস, এক্ষুণি ঘুমিয়ে ঢলে পড়বি কার গায়ে।

ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালো মুরলী। একটুও ঘুম পায়নি। কত আলো-বাজনা, কলকল কথা, খিল খিল হাসি আর কি সুন্দর গন্ধ, এর মধ্যে কখনো ঘুম আসে! কিন্তু মায়ের কথা শুনতে হয়, না হ'লে কান মলে দেবে মা, তাই মুরলী উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো। অনেক লম্বা বড় বড় মানুষদের আনাগোনায় ঢাকা পড়ে গেল ছোট শরীরটি। মা সেই লুকিয়ে পড়া মুরলীর প্যাণ্টের পকেটে কি একটা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে ঠেলে দিল জানালার পিছনে।

—এখানে দাঁড়িয়ে থাক। খাবার দিলে ডেকে নেব।

সিঁড়ি দিয়ে মা দোতলায় নেমে গেল ভাইটির হাতে ধরে, আর প্রায় তক্ষুনি একটু সোর উঠল—ওমা, বাক্‌সটা, দুলের বাক্‌সটা গেল কোথায়? ছোট বৌদির দেওয়া দুল, লাল রং-এর বাক্স এখানে ছিল ট্রেটার উপর।

বাক্স! ছোট একটা বাক্স! কিছু না বুঝেই মুরলী বেরিয়ে এল জানলার পিছন থেকে, প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে দিলো, বের করে আনলো ছোট হাতটি।

কাছে দাঁড়ানো মেয়ে দুটি চেঁচিয়ে উঠল—এইতো, এই বাচ্চাটার হাতে দুলের বাক্স।

—কাছে বসেছিল, বাচ্চামানুষ, লাল টুকটুকে বাক্স হাতে তুলে নিয়েছে। সবাই বলল একই কথা কিন্তু চমকালো দু'একজনের চোখে। শানানো গলায় তাঁরা বললেন— ছেলেকে শিক্ষে দিতে হয় বউ। শেখাতে হয় যে পরের জিনিসে হাত দিতে নেই।

মা মুরলীর হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ী এসেছিল, তারপর মার।

—কেন, কেন তুই পকেট থেকে বাক্স বের করতে গেলি? মর, মর, একেবারে মরে যা তুই!

দাদার মার দেখে চেঁচিয়ে কেঁদেছিল আজকের খুব চালাক কানু।

—খাচ্ছনা কেন? কি ভাবছ বসে বসে? মুরলীকে মৃদু ঠেলে দিল শিখা।

সামনে ফুল প্লেট মাংস, প্রচুর রুটি, আস্তে আস্তে কাঁটা দিয়ে আলুটাকে বিদ্ধ করল মুরলী। ভাবছে? কিচ্ছু ভাবছে না সে। সে দেখছে শিখার গলা বেষ্টন করে সোনালী হলুদ রং এর সুতো। সুতো নয়, হার, হার পরেছে শিখা। সোনার হার। শিখার গ্রীবা জড়িয়ে নেমে এসেছে বুকের মাঝামাঝি, সোহাগে দুলছে মৃদু মৃদু।

কত দাম হবে হারটার? দু'শো, তিনশো, চারশো, পাঁচশো? পাঁচশো! দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল মুরলীর। শিখার গলায় পাঁচশো টাকা, মণিবন্ধে ছোট মেয়ে-ঘড়ি, তাও দুশোটাকার কম নয়, ব্যাগে কত আছে কে জানে। ওর নিজেরও দাম আছে, আড়াইশো টাকা মাইনে পায় শিখা।

মাংস মুখে তেতো লাগছে, কি যেন একটা উঠে আসতে চাইছে ভেতর থেকে। জোর করে খেতে লাগল মুরলী। খেতেই হবে তাকে, না হলে এতটা পথ অসম্ভব ক্ষিদের দহনে অস্থির হয়ে মায়ের দেওয়া পাঁচটা রুটি আজ আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু কি ভীষণ সুখী লাগছে শিখাকে! চামচে দিয়ে ঝোল মুখে তুলছে, লাল টুকটুকে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিচ্ছে, সাদা শক্ত দাঁতে কেটে নিচ্ছে রুটি। কেন, এত সুখ কিসের শিখার? মুরলী যখন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে তখন পৃথিবীসুদ্ধ সুখের কি ছড়াছড়ি! শিখার চাকরি আছে তাই সুখ। ওর সুখ উথলে উঠেছে গলার চিকচিকে, মণিবন্ধের টিকটিকে।

—জান রেখা কি বলেছে? চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ছোঁয়ালো শিখা।

—কি? মুরলী জিজ্ঞেস করল কিন্তু চোখ সরালো না শিখার বুকের ওপর থেকে, সরাতে পারল না।

মুরলীর দৃষ্টি লক্ষ্য করল শিখা, বিশেষ আমল দিল না। কি হয় তাকালে! বিব্রত হলেই লজ্জা বাড়ে।

বলল—রেখা বলছিল তোমার চেহারা দিনে দিনে বোহেমিয়ান টাইপের হয়ে উঠেছে। ভীষণ স্মার্ট আর দারুণ অ্যাট্রাকটিভ।

রেখার বার্তা শুনে একটুও উত্তাপ ছড়ালো না মুরলীর শরীরে। কেন ছড়াবে! ওকি সোনা যে গলে টাকা হয়ে বেরিয়ে আসবে, স্থান নেবে মুরলীর পকেটে? আচ্ছা মুরলী যদি এখন পাঁচশো টাকা পায়, কি করবে? কি আর করবে! মাকে গিয়ে—অ্যাঁ! চমকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠবার আগে নিজের জিভ কামড়ে ধরলো মুরলী। বোকা, বোকা! কি ভীষণ বোকা সে। মায়ের হাতে তুলে দেবে শিখার হার বিক্রি করা টাকা! কিন্তু শিখার হার কোথায় পেল সে?

—নাঃ কি যেন হয়েছে তোমার! চল উঠি এবার। খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে একটু মশলা মুখে ফেলল শিখা। তন্বী শরীরটিতে কয়েকটা মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

শিখা উঠেছে, তার মানে ও এখন বাড়ী যেতে চাইবে, ওর সঙ্গে যাবে ওর বুকে দোলানো পাঁচশো টাকা! শিখা! শিখা মুরলীকে ভালোবাসে! কি দাম ভালোবাসার? আড়াইশো, দু'শো পঞ্চাশ মাসে মাসে? কিন্তু সে তো বিয়ের পরে। বিয়ে? বিয়ে করতে পারে মুরলীকে শিখা, কিন্তু বেকার স্বামী চাইবে না ও। ওর ডবল, খুব কম হলেও ওর সমান সমান টাকা উপার্জন তো করতেই হবে। বিয়ে! তার মানে একটা গর্ত ছেড়ে আর একটা গভীরতর গর্তে ঢোকা। একটুও স্বাধীনতা থাকবে না, বাকী জীবনটা চলবে অন্য একজনের ইচ্ছাপূরণ করতে করতে। হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো মুরলীর। চমকে চারিদিকে তাকালো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, হলদে আলোয় নেয়ে উঠেছে রাস্তা।

—এখনি বাড়ী যাবে নাকি? মুরলী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

—বাড়ী। হাসি চিকচিকালো শিখার চোখে।—কোন্ বাড়ী যাব?

শিখার ইঙ্গিত না বোঝার ভাণ করলো মুরলী। তার যে কোনো বাড়ী নেই, নেই আত্মজন একথা শিখাকে বলতে ভালো লাগে না মুরলীর। অবশ্য সে জানে যদি মাসিক চাঁদা দিতে পারে বেশ মোটা হাতে তা'হলেই কয়েকটা খুপরীর মধ্যের একটা তার ঘর হবে। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে মা-বাবা, ভাই-বোন সব। কিন্তু কি হবে ঘর আর স্বজন দিয়ে যদি চাকরি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব চলে যায়! শিখার গলার হারটা বুকের উপর দুলছে ওর হাঁটার তালে তালে। ইস্, কি লম্বা হার! বুক ছাড়িয়েও নেমে এসেছে কতটা। পাঁচশো, বিক্রি করলে পাঁচশো না হোক, চারশো টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কে কিনবে! কত স্যাকরার দোকান আছে, একটু সন্দেহের বাঁকা চোখে চাইবে, ন্যায্য দামের চেয়ে দাম দেবে কিছু কম, তা হোক, বেশ একটা মোটা টাকা আসবে মুরলীর পকেটে। সেই দশটাকা পাঁচটাকা নোটের চেহারা দেখতে পেল মুরলী। হাত রাখল শিখার ঘাড়ের উপর আলগোছে, সোনার হারটির ছোঁয়া লাগল, রোমাঞ্চিত হল সমস্ত শরীর। শিখা মুখ তুলে তাকালো মুরলীর দিকে, চোখে চোখে চাইতে চেষ্টা করল।

—সত্যি, এরকম আর ভালো লাগে না। অসহ্য একঘেয়ে জীবন।

—সত্যি অসহ্য। শিখার কথায় সায় দিল মুরলী।—চল একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবে?

—নিরুদ্দেশের দেশে। একটা মাঠের কোনো কোণে নিরিবিলি ঘাসের আসনে এক ঘণ্টা বসে থাকবো দু'জনে।

শিখা হাসল—হঠাৎ ভাবুকতার উদয়? তা চল। আমারো যেতে ইচ্ছে করছে কোথাও। ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তা ধরে এসো উধাও হই দু'জনে। সন্ধ্যার আগেই কিন্তু ফেরার বাসে উঠতে হবে। দিনকাল খারাপ।

বাসে উঠে পড়ল দু'জনে। শিখা বসতে পেল, মুরলী রড ধরে ওর কাছাকাছিই দাঁড়ালো। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে শিখার টিকিট কেনাটা উদাসীন মুখে লক্ষ্য না করার ভাণ করল মুরলী।

আমতলার কাছাকাছি এসে বাস থেকে নেবে পড়লো মুরলী আর শিখা। একটা আমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলো দুজনে। সিগারেটা ধরালো মুরলী।

—খাবে নাকি?

—যাঃ!

—যাঃ কেন? মেয়েরা যে দোক্তা-জর্দা খায় সে তো তামাকই; ধোঁয়া খেতে তবে দোষ কি? একটু খেয়ে দেখনা।

—না না। ওসব আমার ভারী বিশ্রী লাগে। অত আধুনিকত্বে কাজ নেই।

—আচ্ছা, একটু শুধু একবার টেনে দেখ। বাঁ হাতে শিখার পিঠ জড়িয়ে ধরে, ডান হাতের সিগারেটটা শিখার দুই ঠোঁটের মাঝখানে গুঁজে দিল মুরলী।

একটু টেনেই চোখ মুখ লাল করে বেদম কাশতে লাগল শিখা।

—ইস! কি সুখেই যে এগুলো খাও তোমরা। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে।

—জল! এখানে, আচ্ছা দেখি।

—ন না, এখানে কোথায় জল পাবে, বরং বাসটা আসছে, থামাতে চেষ্টা কর। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ফিরে যাই এবার।

বাসটা থামাবার চেষ্টাতেই মনে হলো দৌড়ে গেল মুরলী। বাস থামলো না, চলন্ত বাসের পাদানীতে লাফিয়ে উঠে পড়ল, শিখা ছুটে এসেও বাস ধরতে পারলো না।

হামেশা পিক পকেট হচ্ছে, সুতরাং পার্স হারাবার ব্যাকুলতায় কেউ সন্দেহ করল না মুরলীকে। শিখা? কিছু ভাবনা নেই শিখার জন্য। ওর ব্যাগে টাকা আছে, পনেরো মিনিট পরেই আবার বাস আসবে, তার মধ্যেই কেউ তাকে লুট করে নেবেনা। তাছাড়া মেয়েদের আজকাল আর কেউ লুট করেও না, যা লুট করে সেটা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার অনুভব, করল মুরলী।

রাতে মায়ের বাঁকানো কথা, বাবার কুঁচকানো ভ্রূ, ভাইদের বিদ্রূপের হাসি, কিছু লক্ষ্য করল না মুরলী। ডাল-রুটি তারপর পরিপূর্ণ গ্লাসের জল শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়তে এলো মুরলী। চুমকি দৌড়ে এলো।

—দাঁড়াও, বিছানাটা একটু ঝেড়ে দেই। বিছানা ঝেড়ে কাছে এল চুমকি, ফিস ফিস করে বলল—দাদা, তোমার চাকরি পাবার আশা হয়েছে বুঝি?

অবাক হলো মুরলী।—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—এমনিই, আজ তোমাকে তেমন মনমরা দেখাচ্ছে না কিনা তাই জিজ্ঞেস করলাম। বিছানার ওপর আঁচলের আর একটা বাড়ি দিয়ে চুমকি চলে গেল আর পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ছেড়ে রাখা প্যাণ্টের পকেটে হাত দিল মুরলী। আঃ! আছে, আছে। তার সাতরাজার ধন পকেটের এক কোণে লুকিয়ে আছে।

সমস্ত রাত ভরে ঘুম ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল মুরলীর। একটা গল্প বানাতে হবে, বেশ বিশ্বাসযোগ্য গল্প। না হলে হারটা বিক্রি করতে পারবে না। অনেক ভাঙচুর করে একটা গল্প বেশ পছন্দ হলো। বারবার আওড়ে সেটাকে বেশ সড়গড় করে, ছ'টা বাজবার আগেই উঠে পড়ল মুরলী।

ছোটবেলায় বন্ধু যতীন সাহা থাকে কালীঘাটে। ওখানে বিস্তর স্যাকরার দোকান। যতীন মাঝে মাঝেই এটা ওটা বানায় তার বৌয়ের জন্য। বেশ খানিকটা দূর, কিন্তু কাল ভালোই খাওয়া হয়েছে, ভোর বেলা হাঁটতে খারাপ লাগবে না। যতীন চা-টা খাওয়াবে আর তারপর তো প্রায় মহারাজা। যদি চারশো টাকা পায়, আট মাসের মত নিশ্চিন্ত, তার মধ্যে কি আর একটা কাজকর্ম জুটে যাবে না। কাজ! হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো মুরলীর। চোখের সামনে ভেসে উঠল বিস্মিত দু'টি বড় বড় চোখের একখানা বিশ্বস্ত মুখ। জোর করে মনকে চেপে ধরে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো মুরলী।

সব শুনে যতীন বলল—কই দেখি তোর জিনিস। চারশো টাকা ধার দিলি হার রেখে, অত টাকা কি আর উঠে আসবে!

পকেট থেকে সন্তর্পনে হারটি বের করে যতীনের হাতে দিলো মুরলী। উল্টে-পাল্টে হার দেখল যতীন। তার গম্ভীর মুখে কথা ফুটলো অবশেষে।

—ইস্! কি বোকা তুই, এই রেখে টাকা দিলি? বাচ্চাতেও বলবে এটা ইমিটেশন হার, আর তুই বুঝলি না? চার-চারশো টাকা জলে দিলি এই ঝুটো মাল রেখে! সোনা আর পেতল-দস্তার তফাৎ বুঝিস না এমন বোকা তুই।

বোকা, ভীষণ বোকা চিরদিন মুরলী। যতীন জানে না চারশো টাকা নয়, জীবনটাই জলে ফেলে দিয়েছে, গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাসের চাকায় মুরলী। যতীন না বললেও এখন সে বুঝতে পারছে হারটা সোনার নয়। শিখার গলায় উঠেই সোনার রূপ ধরেছিল। মুরলীর দুটো গাল চিন্‌চিন্ করতে লাগলো, হাসিটা কেমন যেন কান্নার মতো হয়ে তার মুখকে বিকৃত করে দিলো।

মনের অগোচরে

হিরন্ময়ী বসু

"অনেক দিন পর দেখা হল, তাই না?" শিপ্রা নিজেকে সহজ করতে চাইল।

অমিয় খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল শিপ্রাকে। একটু থমকে, একটু হেসে বলল, "অনেক দিন নয় অনেক বছর পর।"

"কোথায় চলেছ এত লাগেজ নিয়ে?"

অমিয় হাসল, বলল, "তুমি কোথায় চলেছ?"

"বারে, আমি তো আগে জানতে চাইলাম।"

"আরও আগে তোমার জানতে চাওয়া উচিত ছিল শিপ্রা।"

ভ্রূ কুঁচকে বলল, "একি? আমার নাম ধরে ডাকছ কেন? তুমি তো এর আগে চিরদিনই শিপুদি বলতে আমাকে।"

অমিয় বেশ জোরেই হেসে বলল, "হ্যাঁ তা প্রায় বছর বারো আগে। তখন আমার বয়েস ছিল বাইশ আর তোমার বছর ছাব্বিশ কি সাতাশ। তাই না? তখন আমি ছিলাম তোমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু। সবে কলেজের পড়া শেষ করেছি আর তুমি ছিলে কোন স্কুলের নামকরা দিদিমণি।"

"তাতে কি হল?"

"না তাই বলছি, দিদিমণি হিসাবে তোমাকে দিদি ডাকতুম না কিন্তু তোমার ভাই প্রদীপের খাতিরে ডাকতুম। কিন্তু এখন আমি সো এণ্ড সো কোম্পানীর প্রোডাকশন ম্যানেজার। পদ-মর্যাদায় আর বয়েসের মর্যাদায় অনেকটা এগিয়ে গেছি, ফরেন ঘুরে এসেছি বার দুই। কাজেই কোন সংকোচের বালাই আজ আমার নেই। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কি পাল্টায় না? দিদি বলব তুমি আশা করলে কি করে?"

শিপ্রার চোখের দৃষ্টি পুরু কাচের ভেতর দিয়ে ম্লান দেখালো। বিষণ্ণ উদাস সে দৃষ্টি।

প্রথম শ্রেণীর সরু টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল দুজনে। অনেক মানুষের ভীড়, অনেকের আনাগোনা। যেন একটা মিছিলের শেষ প্রান্তে ক্লান্ত দুই কমরেড পতাকা নামিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করছে।

শিপ্রা অসহিষ্ণু গলায় বললে, "না এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। তুমি আমার কামরায় এসো পরে। গল্প করা যাবে।"

অমিয় আবার উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ল। বলল "গল্প? দিদিমণি আপনি বুঝি এখনও আঙ্গুর ফল টক গল্পটা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন? না ছাত্রীদের এখন পিটারের ক্রাইষ্টকে তিনবার অস্বীকারের তাৎপর্য বোঝাচ্ছেন?"

"কি ফাজলামি হচ্ছে অমি? যাও তোমার কামরায় ঢুকে পড়, সকালে কথা হবে।"

বম্বে মেল অনেকখানি এগিয়ে গেল। রাতের গাড়ী, ডিনার প্রায় সকলে সেরেই

আসে, তাড়াতাড়ি যে যার কামরায় ছিটকিনি ফেলে শুয়ে পড়ে।

শিপ্রার লোয়ার বার্থ। পাশের বার্থে একজন মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। ছেলেদের দেখতে যাচ্ছেন বম্বের নেভাল হোস্টেলে। উপরের একটা বাঙ্ক খালি। তার উপরটিতে একজন গুজরাটি অল্পবয়স্কা বিবাহিতা মহিলা।

কামরার চারপাশে চেয়ে দেখে খুব আরাম পেল শিপ্রা। আর যাই হোক বেশি কথা বলতে হবে না। নিরিবিলি নিজের মনে থাকতে পারবে।

অনেকগুলো মাসিক পত্রিকা উপন্যাস আর প্রবন্ধের বই ছিল সঙ্গে। তারই একটা খুলে বালিশে ঠেসান দিয়ে শুয়ে পড়ল শিপ্রা।

"মনের অগোচরে পাপ নেই" বইটা চমৎকার লিখেছেন ভদ্রলোক। অনেকটা প্রবন্ধের মত কিন্তু যুক্তিগুলো যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি রসালো।

বইয়ের পৃষ্ঠায় আর এক উপন্যাস কি পড়তে সুরু করল শিপ্রা? সেই জীর্ণ বারো বছর আগের সুন্দরী তন্বী শিপ্রা আর বলিষ্ঠ ঋজু অথচ লাজুক সেই ছেলেটা? কি যেন নাম তার? ছোট ভাই প্রদীপ আলাপ করিয়ে দিল, আমার বন্ধু অমিয় সেন।

সেবার পুরীর সাগর-সৈকতে সেই পরিচয় বড় নিবিড়, বড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। শিপ্রা বাড়ীর বড় মেয়ে, তারপরে আরও দুটি বোন আর ভাই মাত্র একটি। সেই ভাইয়ের বন্ধু, কাজেই তার আব্দারও বড় কম সইতে হল না। কিন্তু মুস্কিল একটা বেধেছিল বইকি!

শিপ্রাকে রূপসী বলা চলে না হয়তো। কিন্তু চেহারা রং অঙ্গসৌষ্ঠব সব মিলিয়ে সে সুন্দরী। আর সব মেয়েদের ওটা থাকে কিনা জানা নেই শিপ্রার, কিন্তু তার ছিল, তার দিকে ছেলেদের আকর্ষণ সব সময় সে অনুভব করত। ছোট বড় মাঝারি আধা বুড়ো সব শ্রেণীর পুরুষই যেন শিপ্রাকে দেখলে একটু চঞ্চল হয়ে উঠত।

শিপ্রা যখন পুরীতে তখন তার বয়েস অনুপাতে তাকে অনেক ছোট দেখাত আর অমিয়কে তার বয়স অনুপাতে অনেক বড় দেখাত—মানে দুজনকে পাশাপাশি সত্যিই সুন্দর মানাতো। কিন্তু ছোট ভাইয়ের বন্ধু, তার উপর শিক্ষয়িত্রী সুলভ মনোভাব আর বোনেদের বড়, মা বাবার মুখ-চাওয়া মেয়ে সংসারের দায়িত্বও ছিল প্রচুর। সব মিলিয়ে শিপ্রা নিজের মনে কোন ছবি আঁকতে ভরসা পায়নি। কিন্তু মনের অগোচরে পাপ নেই। তাই আজ এই কামরায় একাকী বাঙ্কে শুয়ে ওর মনে হচ্ছে হয়তো বা মনের অগোচরে ওর অন্তর্লোকে কোন একটা সুখের আদল ধরা পড়েছিল। হয়তো কোন একজনের সঙ্গিনী হবার বাসনা সুপ্তির ভেতর, সৌন্দর্যলোকের আস্বাদ পেতে চেয়েছিল কিন্তু সঠিক জানা ছিল না।

প্রতিদিন সমুদ্র-স্নান যেন বাতিক হয়ে দাঁড়াল। আর সুইমিং কষ্টিউম পরে যে ছেলেটি সবার আগে হাত বাড়িয়ে শিপ্রাকে বলত "শিপুদি তুমি আমার হাত ধরো, আমি আগে তোমাকে ঢেউ খাইয়ে আনি, তারপর সাঁতার কাটব।"

চিকচিকে ভিজে বালিতে পায়ের দাগ ফেলে দুজনে এগিয়ে যেত। ছোট ছোট ঢেউগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হোত, তারপরে বড় ঢেউ সামনে এলেই অমিয়

বলত,"শিপুদি বসে পড়। না হলে লাফ দাও।"

শিপ্রা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ত, ওর মাথার ওপর দিয়ে ঢেউটা প্রবল বেগে ছুটে যেত, তারপর দ্যাখে জল বড় জোর হাঁটু পর্যন্ত। ওরা আরও এগুতো।

বেশ সাহস বেড়ে গেছিল শিপ্রার, তাই থার্ড ব্রেক পর্যন্ত অমিয়র হাত ধরে ঢেউ খেতো। বেশীর ভাগ বসে পড়ত কিন্তু একদিন আর বসল না। ঢেউয়ের তালে তালে লাফিয়ে উঠল। অন্য দিনের মত পায়ের তলায় বালি পেল না—জল গভীর, টাল সামলাতে পারল না। অমিয়র শক্ত মুঠিতে হাতটা ধরা ছিল তাই রক্ষা। প্রায় ঘুরপাক খেয়ে বেসামাল শাড়ী ব্লাউজ সমেত একেবারে অমিয়র বক্ষলগ্ন হ'য়ে পড়ল। সেই নোনা জলের অফুরন্ত সাদা ফেনার কোমল শয্যায় একটা বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে ওকে বেঁধে ফেলেছিল অমিয়। তা নইলে সেদিন শিপ্রা ভেসেই যেত।

সেই আলিঙ্গন কি শুধু অসহায়কে বিপদের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা? শিপ্রার পরে মনে হয়েছিল সেটা ছিল অমিয় সেনের প্রতিশ্রুতির প্রথম পাঠ।

এত লজ্জা পেয়েছিল শিপ্রা যে তারপর যে কদিন ছিল আর সমুদ্রে স্নান করেনি, বোনেদেরও করতে দেয়নি। কিন্তু বোনেদের আনন্দে বাধ সাধল কেন? একথাও পরে মনে হয়েছিল পাছে ওরা অমিয়র উষ্ণ স্পর্শ পায়,—পাছে ওদের মনেও অমিয় একটা প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে প্লাবন ঘটায়। না, শিপ্রা চায়নি—আর কেউ অমিয়র অত ঘনিষ্ঠ হোক। অথচ নিছক একটা সাধারণ ঘটনা ছাড়া ওটা আর কিছুই ছিল না। শিপ্রা বহুবার নিজের চোখেই দেখেছে কত মেয়ে বউ ঢেউ খেতে গিয়ে নুলিয়াদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। সেটা যদি আলিঙ্গন না হয়, সেটায় যদি দোষ না থাকে তাহলে স্নানার্থীর কাণ্ডারী হিসাবে অমিয়রও কোন দোষ ছিল না—শিপ্রারও নয়।

তবু সূত্রপাত হ'ল বুঝি সেই থেকেই। কিন্তু মনের অগোচরে পাপ নেই, তাই শিপ্রাও বুঝতে চাইল না—আর অমিয় সেনও বোঝাবার চেষ্টা করল না।

কলকাতায় ফিরে আবার স্কুল, সংসারে ভাই বোনদের তদারক, সব ভারই বয়ে চলল শিপ্রা আর সেই সঙ্গে অমিয়কেও বাদ দিতে পারল না।

একবার বলল, "শিপুদি সবাই কেমন বোনা সোয়েটার পরে, তুমি প্রদীপকে বুনে দিলে—কিন্তু আমাকে এত পর ভাবো যে সেই সঙ্গে আমার জন্যে একটা বুনতে পারলে না।"

লজ্জা পেল শিপ্রা, সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ঠিক আছে, বুনে দেবো, কি রং তোমার পছন্দ? হাইনেক না কলার?"

অমিয় বলল, "যা খুশি তোমার। আমাকে যেটা মানাবে। কাল আমি পশমের টাকা দিয়ে দেবো।" শিপ্রা ভ্রূ কুঁচকে বলল, "সোয়েটার চাইতে পারলে—আর পশমের দাম দেবো বলতে মুখে আটকাল না?"

লাজুক ছেলেটা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "না অনেক দামী জিনিস তুমি

দিতে পার—সোয়েটার নিয়ে কি করব? ও আমার চাই না।"

শিপ্রাও নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে রইল, "কি চাই তাহলে বল, আমি তাই দেবো, কিন্তু না বললে কি দামী জিনিস কিনবো বলো? গতবার তোমার জন্মদিনে পেন দিলাম—পছন্দ হ'ল না—এবার তাহলে ক্যামেরা দেবো।"

"গুড গড" হেসে ফেলল অমিয়। "না, না না, ওসব কিছুই তোমার দিতে লাগবে না শিপুদি, যদি কোনদিন সবচেয়ে দামী জিনিসটা দিতে পার সেদিন দিও।"

অনেক দিন পর সোয়েটার বুনে দেওয়ার পর শিপ্রা চিন্তা করেছিল দামী জিনিসটা কি হতে পারে? অমিয়র মতন বাচ্চা ছেলেকে কি দামী জিনিস দেওয়া যায়? পয়সার তো অভাব নেই ওদের। মায়ের এক ছেলে, বিধবা মা বিরাট ধনী, ছেলের মুখের কথা পড়ার আগেই প্রয়োজন মিটে যায়। তাহলে?

আজ আর নিজের কাছে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই শিপ্রার।

অমিয় হয়তো শিপ্রার কাছে একটু অন্তরঙ্গতা, একটু স্নেহমিশেল ভালবাসা চায়। মনে হয়েছিল বটে কিন্তু ভেতরকার দিদিমণি কড়া চোখে চেয়েছিল, নৈতিক অধঃপতন কখনই সম্ভবপর নয়। ছোট ভাইয়ের বন্ধু—ছ' বছরের মত ছোট, তার স্পর্দ্ধা তো কম নয়।

সাবধান হয়ে গেছিল শিপ্রা কিন্তু মনের গভীরে ততদিনে অমিয় স্থান করে নিয়েছে, টের পায়নি শিপ্রা।

স্পোর্টস-এ খুব ভাল ছিল অমিয়—সাঁতারে আরও ভাল। একবার বাহাত্তর ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর নৌকায় ওকে তুলে নিলে—প্রথম ব্র্যাণ্ডি-মেশানো গরম দুধ শিপ্রার হাত থেকে খেয়েছিল অমিয়। ছেলেরা সব হৈহৈ করে উঠেছিল, "ওরে বড়দিকে ডাক, শিপুদিকে ডাক, ওনার হাতে নইলে খাবে না অমিয়।"

বড়দি নামটাই খারাপ। সব সময় সর্বত্র বড়দি আর বড়দি। শিপ্রা যে বড় সেটা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে কানে ঠোক্কর দিয়ে শোনানো হয়। বড়দের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, ইচ্ছা থাক বা নাই থাক—সবাই যাতে সমীহ করে তার একটা ভঙ্গী বজায় রাখতে হবে আর কর্তব্য? তার বালাই নিয়ে শিপ্রার জীবন আজ গোধূলির রক্তিমাভা হারিয়ে সূর্যাস্তের ম্লান ধূসরতায় রাত্রির তপস্যায় মগ্ন।

দিন চলছে, দিন চলবে—কিন্তু কৈ সামনে তো কোনো উজ্জ্বল দিনের আমন্ত্রণ নেই, কোনো উষ্ণ আশ্বাস নেই?

রুটিন বাঁধা কাজ, কাজের শেষে পরিশ্রান্ত দেহটাকে আর যেন সহ্য করতে পারে না শিপ্রা। সংসারে বড়দির সৌভাগ্যে জর্জরিত। শ্রদ্ধা আর সমীহে বীতরাগ মনটা সংসারের দেনা পাওনার হিসাব আজও মিলাতে পারে না। যে সংসারকে নিঃশেষ করে দিয়েছে তার বিনিময়ে সে নিজে কি পেল?

বাবা গত হয়েছেন, গোটা সংসারের দায় অদায় সব হাসিমুখে বহন করেছে শিপ্রা। বোনেদের ভাল বরে ঘরে দিয়েছে, প্রদীপেরও বউ এনেছে।

সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা বধূ কিন্তু শিপ্রার সংসারে একাধিপত্যটা সুনজরে দেখেনি। শিক্ষিতাদের ভেতর উচ্চ রোলে বিবাদের স্থান কম কিন্তু অন্তর্ঘাতী বিষময় বাক্য দুটি

একটি প্রয়োগেই কার্যসিদ্ধ হয়।

দু' একদিন দু' একটা ছোটখাট ব্যাপারে ছোটখাট ইঙ্গিতেই শিপ্রা বুঝল তার অনেক দিনের বড়ত্ব এবার ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে—যদি না সময় থাকতে সরে পড়ে। বাড়ীর মালিকানা-স্বত্ব প্রদীপের কিন্তু শিপ্রার কথা ভেবেই বোধ হয় ওর বাবা একটা পাকা ব্যবস্থা করে গেছিলেন। যতদিন শিপ্রা অবিবাহিত থাকবে ততদিন বাড়ীতে তাকে দুটি কামরা ব্যবহারের জন্য দিতে হবে।

নববধূর প্রথমেই নজর পড়ল—শিপ্রা আর ওর মার দক্ষিণের ঘর দুটোয় সামনে ছাদ, তাতে বড় যত্নে শিপ্রা টবের সাহায্যে ছাদ-বাগান করেছে। রকমারি ফুল। ডালিয়া, রজনীগন্ধা, বেল, লতানো যুঁই আর অজস্র গোলাপ।

নতুন বউ চম্পাকলি দু' এক মাস কাটাবার পরেই সোজাসুজি শিপ্রাকে বলল, "বাড়ীর ভেতর সেরা ঘর আপনাদের আর আপনার ভাইয়ের ঘরটা এত চাপা। বাবা, আমার যেন দমবন্ধ হয়ে যায়। একটা ঘর এপাশে আমাদের থাকলে বেশ হোতো।"

শিপ্রা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি—গলার স্বরটা আটকে গেছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ভাঙ্গা গলায় বলেছিল, "বেশ তো, তোমরা না হয় এ পাশেই চলে এসো, আমরা পূবের ঘরে যাবো।"

বউ তাতেও খুশি হয়নি, বলেছিল, কিন্তু বড়দি ওদিকের বড় ঘরটাই হলঘরের মত ওটা আপনার ভাইয়ের ইচ্ছা ড্রইংরুম করার। ওর বন্ধুরা আসে, আমারও আসে, তাই মাঝের লবিটা বড় ছোট লাগে।

এবার শিপ্রার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। বড় ঘরটা চাওয়া মানে ইঙ্গিতে বলা শিপ্রা ও তার মায়ের একটা ঘরেই কুলিয়ে যাবে আর ওইটুকুনই তাদের প্রাপ্য।

প্রতিবাদ করতে ঘৃণা বোধ করেছিল শিপ্রা। এবার কাঁদেনি হেসে উঠেছিল, বলেছিল, "বাঃ, তোমার আইডিয়াটা খুবই চমৎকার চম্পা। তুমি মানে, তোমরা যেটা পছন্দ তাই করবে, আমার অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই ভাই।"

চম্পাকলি মুহূর্তের জন্য থতিয়ে গেছিল—তারপর আমতা আমতা করে বলেছিল, "না মানে, আপনার ভাই বার বার বলে দিয়েছে এ সংসারে আপনিই বড়, আপনার বিনা অনুমতিতে কিছু করা চলবে না।"

তবু একটু শান্তি পেয়েছিল শিপ্রা, যাই হোক প্রদীপটা তাহলে এখনও একটু সমীহ করে, হয়তো তার বড়দিদির জন্য অন্তরে একটা কোমল স্থান আছে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে শিপ্রা ম্লান হেসে বলেছিল, "ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না, আগামী ছুটীর দিন ঘর বদল করে ফেলব।"

"কিন্তু মানে আপনার ভাই জানতে পারলে বকাবকি করবে।"

"না, না তাকে আমি বুঝিয়ে বলব।"

চম্পাকলি হেরে গেল—পেরে উঠল না বড়দির মনের জোরের সঙ্গে। আর বড়দি

সব হারিয়েও নিজেকে বড় করার লোভে উঁচু করে দেখানোর মায়ায় নিজের স্বত্ব আর আরাম থেকে নিজেকে মূর্খের মত বঞ্চিত করেছিল।

ঘর বদল হ'ল। শিপ্রার মা হতবাক, কিন্তু মায়ের সাহস নেই মেয়ের মুখের ওপর কথা বলার। কোনদিনই ছিল না কারণ আগাগোড়া তাঁর সুখ সুবিধা, কাপড় জামা হাত খরচা সবই শিপ্রা দিয়ে এসেছে। মাকে শাসন করেছে, আবার দুহাতে জড়িয়ে ধরে—শিশুর মত চুমো খেয়ে ভুলিয়েছে। সেই মেয়ের ওপর স্বামীর অবর্তমানে একটি কথাও আর বলেন না মীরাদেবী। নিজের ঠাকুর দেবতা আর সংসার নিয়েই সময় কাটান।

ছেলের অফিসের ভাত আছে, বউয়ের রকমারি জলখাবার আর নিত্য তার বাপের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনের মনোরঞ্জন আছে। ঠাকুরের আর ঝি'র খবরদারী করা আছে, নিজের হবিষ্যি ফুটোনো আছে। তাহলে আর সময় কোথায়?

তা সত্ত্বেও ঘর বদলের পর শিপ্রাকে বলেছিলেন, "হাঁরে শিপু, বউমা কি আমাদের এখানে আর থাকতে দিতে চায় না? কেনো রে? আমি তো সব কাজই করি, ওদের কোন কষ্ট নেই তো।"

শিপ্রা আর সামলাতে পারেনি। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বড় সখের বাগান ওর—বড় সাধের ঘর দুখানা। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে ঘরে সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে নিজেকে যার কোটরে নিরাপদে ছেড়ে রেখেছিল সেই ঘরের ওপর ওর মায়া কি কম ছিল? আজ ঘর গেল, কাল এ বাড়ী থেকেও যেতে হবে।

এমনি এক অশান্ত মানসিক দুর্যোগের ভেতর হঠাৎ একদিন ঝড়ের মত এসে হাজির হ'ল অমিয়। ফরেনে চলে যাচ্ছে, তার আগে শিপ্রার সঙ্গে দেখা করতে এল।

ঘর বদল দেখে সেও স্তম্ভিত। তারপর খুব একচোট হেসে বলল, "ভালই হয়েছে, এই ঘরের মায়া কাটাতে না পারলে তোমার আর বাইরের দিকে নজর যাবে না শিপুদি। সব ফেলে রেখে চলো আমার সঙ্গে বিদেশ ঘুরে আসবে। পুরোণো সেন্টিমেন্টগুলো ঝেড়ে ফেলে নিজেকে এবার একটু স্বাধীনতা দাও, প্লিজ শিপুদি আর এই গণ্ডীর ভেতর নিজেকে আটকে রেখো না।"

শিপ্রা শুধু বলেছিল, "এতদিন ভাইবোনদের দেখলাম, সংসার দেখলাম, এখন মা-কে কোথায় ফেলে দেবো অমিয়? মা যতদিন আছেন ততদিন নিজের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে কোন সাধ আহ্লাদই আমার পূর্ণ করার ইচ্ছা নেই।"

অমিয় উত্তরে বলেছিল, "ভাল কথা, দিদিমণির উপযুক্ত কথা, কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলতে এসেছি যখন বলেই যাবো। তুমি, তুমি কি আমার কথা একবারও চিন্তা করো না? কোনদিন করোনি? সত্যি বলো। তোমার আদর্শের দোহাই দিয়ে বলছি শিপুদি নিজের বিবেকে হাত রেখে বলো আমাকে তুমি তোমার ছোট ভাই ছাড়া আর কিছুই কোনদিন ভাবোনি?"

শিপ্রা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিল, "কি বলছ কি?"

অমিয় উত্তর দিয়েছিল, "যা সত্যি যা স্বাভাবিক যা ন্যায় আর সুন্দর, আমি সেই কথাই বলছি। আমার মা তোমাকে প্রথম দিন দেখে কি বলেছিলেন মনে আছে?"

হ্যাঁ, শিপ্রার মনে আছে, সর্বসময় মনে থাকে। তিনি বলেছিলেন, "আমার ভয় ছিল মা কাকে আবার বন্ধু করে বসেছে। যে পাগল ছেলে আমার—যেটি বলবে করা চাই। যাক আজ আমি শান্তি পেলাম স্বঘরে এমন মেয়ে যে সে পছন্দ করে রেখেছে ভাবতেও আমার আহ্লাদ হচ্ছে।"

শিপ্রা কটমট করে অমিয়র দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিল, "আপনি ভুল করছেন মাসিমা। আমি অমিয়র মেয়ে-বন্ধু নই, আমি ওর দিদি-বন্ধু, অমিয় আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু।

ভদ্রমহিলা যথেষ্ট প্রগতিশীলা। বয়সের তারতম্য নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কোমল আন্তরিক হাসি হেসে বলেছিলেন, "তোমাদের দুটিকে সুন্দর মানায় মা, ও দুচার বছর ছোট-বড়তে কিছু যায় আসে না। অমিয় যখন চায় তখন তুমি রাজী হলেই আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে সম্বন্ধ পাকা করে আসব।"

কিন্তু সে সুযোগ দেয়নি শিপ্রা। অত্যন্ত আহত, অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিল। আর বসেনি, কিছু খায়নি, গটগট করে বার হয়ে এসেছিল।

তারপর মাস ছয়েক অমিয়র মুখদর্শন করেনি।

দর্শন জিনিষটা এমন যে সামনাসামনি না হলেও মনের মুকুরে অতি সঙ্গোপনে প্রায় অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে আর এক দর্শন। এ দর্শন নিভৃতের, এ দর্শন মানস-লোকের। অবচেতনের প্রতিফলন।

সেখানে শিপ্রা মানসিক যুদ্ধে পরাজিত। বার বার একটি সুকুমার মুখ তাকে বিব্রত করেছে। বার বার কানের কাছে ভেসে উঠেছে "তোমাদের দুটিকে বড় সুন্দর মানায় মা।"

তবু আত্মবিশ্বাসে শিথিল হয়নি শিপ্রা। কর্তব্যে কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। নিজের দায়-দায়িত্ব থেকে ছুটিও নেয়নি। এই ঘটনার পর কত দিন, কত মাস পার হয়ে গেছে, তখনও ছোট বোনের বিয়ে বাকি।

ঐ বিয়ে উপলক্ষেই আবার প্রদীপ ধরে এনেছে অমিয়কে। "রমার বিয়ে আর তুই থাকবি না—তাহলে দিদিকে ম্যানেজ করবে কে? সবাইকে বকে ধমকে নাজেহাল করবে।"

অগত্যা অমিয় আবার এসেছে সহজ এবং স্বাভাবিক। আর কোনদিন কোন অবাস্তব প্রশ্ন করেনি, কোন ভাবেই উত্ত্যক্ত করেনি শিপ্রাকে।

তারপর কত মাস কেটে গেছে, বছর ঘুরেছে, শীতের জীর্ণবাস বসন্তের পদতলে খসে পড়েছে। গাছে গাছে জেগেছে নব পল্লব নব মঞ্জরী।

শিপ্রার ফুলবাগানে আর ফুল ফোটেনি। তার ছাদবাগানের লাল টবগুলো শুধু কাঁকর মাটি বুকে নিয়ে রুক্ষ উদাস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। না, ফুলবাগানের সাধ মিটে গেছিল শিপ্রার। ভাই-বউয়ের ঘরের ভেতর দিয়ে ছাদে নেমে গাছের পরিচর্যা করতে মন চায়নি। গাছের ফুল যত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, মনের ফোটা ফুল কি তত শীগগির রং হারায়? কেন হারায় না—এই প্রশ্নই নিজেকে সেদিন অনেকবার করল শিপ্রা যখন অমিয় তার বিদেশ যাত্রার আগে এসে হানা দিল।

কোন আশ্বাস কোন প্রতিশ্রুতি কিছুই দিতে পারেনি শিপ্রা অথচ আগের মত দম্ভের বড়াই তার ছিল না। আদর্শ আদর্শ করে চেঁচালেই কি আদর্শ পালন হয়। ওটা তো একটা মানসিক বিলাস। বিলাস না হলে মানুষ আদর্শের পেছনে ছুটত না। কেউ চায় নাম, কেউ যশ, কেউ অর্থ, কেউ বিদ্যা। আদর্শের দোহাই দিয়ে একটা উচ্চ শিখরে লক্ষ্য স্থির রেখে অবিশ্রান্ত ছোটা—যতক্ষণ না সেই লক্ষ্যে পৌছুনো যায়, যতক্ষণ না লক্ষ্যের বস্তুটির নাগাল পায়।

কিন্তু শিপ্রার লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে সে এত বেশী উদাসীন যে আয়ত্তে আনা দূরের কথা আদর্শের ভঙ্গুর একটা মূর্তিকেই সে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল। আসলে আদর্শ বলে কিছু ছিল না। ছিল অহমিকা আর মিথ্যা সংস্কার।

আশ্চর্য এই যে শিপ্রা ভেবেছে, অনেক ভেবেছে। ফিলজফির মাস্টার ডিগ্রী পাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি। ফ্রয়েড আর রাসেল নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—কিন্তু কূলে ভিড়তে পারেনি। হয়তো পারতো কিন্তু ঐ যে এক রাশ দায়-দায়িত্ব। শিকলের মত পায়ে জড়ান—এপাশ ফেরো ঝম্ ঝম্, ওপাশ ফেরো ঝম্ঝম্। বড়দি নামের মাহাত্ম্য আর সবার উপরে অভিভাবকত্ব দুই মিলিয়ে আষ্টেপৃষ্টে ওকে বেঁধে রেখেছিল। মন মুক্তি চাইলেও পরিবেশ ওকে মুক্তি দেয়নি। শেষ অবলম্বন মাকে আশ্রয় করে শিপ্রা যুক্তি খাড়া করেছিল। অমিয়কে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

অনেকদিন আর কোন খোঁজখবর ছিল না অমিয়র। বিদেশ থেকে কয়েকটা চিঠি অবশ্যই সে দিয়েছিল কিন্তু আশাপ্রদ উত্তর দেয়নি শিপ্রা।

তারপর নিজের স্কুল, গোছা গোছা খাতা দেখা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা আর বাৎসরিক পরীক্ষার ভেতর ডুবে গেছিল। একমাত্র আনন্দ, একমাত্র রিক্রিয়েশান ছিল স্কুলের কমনরুমটা। এমন একটা জায়গা যেখানে "সকলের তরে সকলে আমরা" ভাব। ব্যতিক্রম কি তার ভেতরেও ছিল না? ছিল, কিন্তু সে নগণ্য। শিপ্রা সকলকেই ভালবাসত, তাই ওর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। ও ভাবত প্রত্যেকেই ওকে ভালবাসে কিন্তু সেখানেও কি একেবারেই আঘাত পায়নি? পেয়েছে, নিকটতম ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়তো ওর বিপক্ষে অপর একজনের কাছে রসাল ভাষায় নিন্দা করেছে কিম্বা তুচ্ছ কোন কারণে ওকে সইতে হয়েছে কর্তৃপক্ষের অবিচার। কিন্তু তাতে শিপ্রা আঘাত পেলেও মনের গভীরে সে সব রেখাপাত করেনি। দুচার দিনেই ভুলে গেছে, শুধু ভুলতে পারেনি নিজের অন্তরের অন্তরতম স্থলের দীনতা।

এই দৈন্য অতি গোপন, অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল। জীবনে, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে একটা বলিষ্ঠ আশ্রয়ের লোভ আছে, একটা উষ্ণ বক্ষের নিবিড় আলিঙ্গনের তৃষ্ণা আছে অথচ প্রায় সারাজীবনই শিপ্রাকে তার এই গোপন দৈন্য ঢেকে ভালমানুষ দিদিমণি সেজে আর সংসারের বড়দি সেজে থাকতে হল।

বইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল শিপ্রা এক লাইনও পড়া হয়নি। অমিয় এতক্ষণে তার

কামরার শয্যায় হয়তো অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তার একবারও মনে পড়ছে না—শিপ্রার কথা। আবার এও হতে পারে শিপ্রার মত সেও গত কয়েকটা বছরের স্মৃতি রোমন্থন করছে।

বইয়ের দিকে কিছুতেই মন বসাতে পারল না শিপ্রা, বই বন্ধ করে মাথার কাছে বেড লাইট নিভিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। কম্বলটা টেনে নিল বুক পর্যন্ত।

হঠাৎ ওর মনে হল আজ এই কামরায় ওর একা থাকার কথা নয়। এটা কুপে হওয়া উচিত ছিল আর সেখানে থাকত কেবল দুটি প্রাণী। একজন তো শিপ্রা, অপরজনের নাম আজ উচ্চারণ করতে আর দ্বিধা করল না শিপ্রা। অপরজন নিশ্চয়ই অমিয়। হ্যাঁ, অমিয় ছাড়া আর কেউ নয়, অন্য কোন পুরুষ নয়।

এতদিনে এত বছর পরে শিপ্রার কি মতিভ্রম ঘটল? এতদিনে জীবনের এই আটত্রিশ বছর বয়সে কি কিশোরীর চাপল্য তার ভেতর জেগে উঠল? কিন্তু আর একজন? সেও তো তরুণ নয়, তবে হ্যাঁ তার বিয়ের বয়েস উতরে যায়নি। পুরুষের বিয়ের বয়স পঞ্চাশোর্ধ হলেও ক্ষতি নেই। হামেশাই দেখা যায় পাত্রের বয়েস চৌত্রিশ আর পাত্রী আঠারো কিম্বা কুড়ি। সেটা দোষণীয় কেউ ভাবে না। আর সে জায়গায় দু' চার বছরের বড় পাত্রী হলেই মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড! নিন্দা টিটকিরি আত্মীয় বর্জন অনেক কিছু চলে। কিন্তু উড়িষ্যায় কিম্বা পশ্চিমের কোন কোন জায়গায় পাত্রী বয়েসে বেশ দুচার বছরের বড় হলেও কোন পক্ষের কোনও ক্ষতি হয় না। তাদের বিবাহিত জীবনেও কোন চিড় খায় না। কিন্তু এতদিনে এত যুক্তির অবতারণা কেন করছে শিপ্রা?

হয়তো এতদিনে সংসারের ভারমুক্ত হয়ে নিজের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেয়েছে। মা, যিনি ছিলেন শেষ দায়িত্ব, তিনিও আজ বছর দুই আগে শিপ্রাকে মুক্তি দিয়েছেন। আর সেই মুক্তির আস্বাদ প্রাণভরে গ্রহণ করার জন্যেই শিপ্রা মায়ের মৃত্যুর মাস দুই পরেই মহিলা হোস্টেলে চলে যায়। ঘর ঘর করে যে মায়া সে তো বহু দিনই কেটে গেছিল, ইদানিং চম্পার সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ ছিল। তার কারণ অবশ্য মীরা দেবী। দুবার স্ট্রোকে তাঁকে একেবারে অথর্ব করে দেয়, প্রায় বছর খানেক শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। সে সময় চম্পাও পিত্রালয়ে—শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে সরে পড়েছিল। পাছে এক গ্লাস জল হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হয় কিম্বা কাছে দুদণ্ড বসতে হয়। মাঝে মাঝে এ বাড়ী এলেও মায়ের কাছে এক মিনিটও বসেনি, কোনদিন আর তাঁর বড় আদরের নাতিকে একটিবারও শয্যার কাছে আসতে দেয়নি, পাছে তার কোন রকম দূষিত গ্যাস লাগে।

অবাক হয়ে ভাবত শিপ্রা এরা কি মানুষ? মেয়েমানুষ তো নয়ই কিন্তু এতটুকু মনুষ্যত্বও কি নেই?

মাকে হারিয়ে শিপ্রা একদিকে যেমন সর্বহারার বেদনা অনুভব করল অপরদিকে তেমনি মুক্তির স্বাদও পেল। প্রথমটা বড় খালি খালি ঠেকত, বাড়ীতে ফিরতে ইচ্ছা হত না। কে আছে শিপ্রার? কার কাছে ফিরবে? তখন অবশ্য চম্পা বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাল। সে জানত শিপ্রাকে কাছে রাখতে পারলে এবার তার ষোল আনা লাভ হবে। কিন্তু শিপ্রার আর প্রবৃত্তি হল না সংসারে জড়িয়ে পড়ার। এবার যে মুক্তি-পরোয়ানা দিয়ে

গেছেন মা। তারই সদ্ব্যবহার করল, চলে গেল হোস্টেলে।

আর সেই সময়েই বিশেষ করে মনে পড়ল অমিয়র কথা, অমিয়র মায়ের কথা।

প্রায় চার পাঁচ বছর পর শিপ্রা এবার নিজে থেকে চিঠি দিল অমিয়কে। একটা নয়। উত্তর না পেয়েও পর পর তিনটে।

অমিয় তখন পুনায় মস্তবড় চাকুরে। বছরে একবার বিদেশ ঘুরে আসে। শিপ্রার একটাও চিঠি সে পেল না। কলকাতার বাড়ী সম্পূর্ণ ভাড়া দেওয়া, মাকে সে নিজের কাছেই রেখেছে।

আজকের অমিয়র সঙ্গে সেই লাজুক ছেলেটার কোন মিল নেই।

হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ল শিপ্রার। তখন অমিয় আই-এস-সি পাশ করে থার্ড ইয়ারে পড়ছে। একদিন স্কুলে গিয়ে হাজির টিফিনের সময়। শিপ্রাকে বেয়ারা খবর দিল। একজন ভদ্রলোক ডাকছেন শুনে প্রথমটায় বুক কেঁপে উঠল। কে বাবা ভদ্রলোক? শিপ্রার কাকা না মামা না পাড়ার কোন বদ ছেলে?

আপিস ঘরে ঢুকে অমিয়কে দেখেই শিপ্রার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। কান গরম হয়ে উঠল। বেশ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কি দরকার?"

অমিয় অপূর্ব হেসে ওর হাতে একটা ক্যালেণ্ডার আর একটা ছোট প্যাকেট দিল।

অনিচ্ছায় নিল শিপ্রা, তারপর বলল, "কি আছে, কি মহামূল্য জিনিস? স্কুলে দিতে আসতে হল?"

অমিয় বেশ কাছে সরে এসে বলল, "বড্ড মন খারাপ করছিল শিপুদি আর তাছাড়া এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম কিনা। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।"

এমন মুখ করে বলল অমিয়, যে রাগ করা আর হল না। উপরন্তু দুটো রাজভোগ আনিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়ল।

কমনরুমে সে কি হৈ হৈ! "কে এসেছিল রে শিপ্রা? কে হয় তোমার শিপু? কি সুন্দর দেখতে ছেলেটা! তোমার ভাই বুঝি? না আর কেউ?"

শত প্রশ্নের উত্তর দেবার পর শিপ্রা হাতের প্যাকেটটা খুলে একটা বড় স্ল্যাব ক্যাডবারিস চকলেট সকলকে ভাগ করে দিয়েছিল। আর বার বার বলেছিল "কি যে সব বলছ তোমরা, আমার চেয়ে অনেক ছোট বাচ্চা ছেলে একটা। দেখতে ওই রকম লম্বা চওড়া।"

আজকের অমিয় কি আবার বলবে—শিপ্রা তোমার জন্য মন খারাপ করছিল তাই একবার দেখতে এলাম। এই রাতে এই চলন্ত গাড়ীর দরজার সামনে একবারও কি আসবে না অমিয়?

শিপ্রার এ চাওয়া কি অন্যায়? এ চাওয়া কি লোভাতুর হৃদয়ের কাঙ্গালপনা? না একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কামনা!

আজ ঠিক এই মুহূর্তে শিপ্রার মনে হচ্ছে অমিয়কে। সে অনেক বছর আগে প্রায় বারো বছর আগে সমুদ্র সৈকতে তার প্রথম যৌবনের অর্ঘ নিঃশেষে দান করেছিল। দৈহিক নয়,

মানসিক। দেহসর্বস্ব মনোবিকার কোনদিনই ছিল না শিপ্রার, ছিল না অমিয়র। সেই কারণেই বোধহয় শিপ্রা নিজেকে বুঝেও বোঝেনি আর অমিয় নিজের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ভালবাসা ছিল, প্রেম ছিল, ভাল লাগা ছিল, কিন্তু মজবুত কোন বাঁধন ছিল না। দৈহিক আকর্ষণ বা উন্মাদনাও ছিল না তাদের।

কিন্তু আজ ইচ্ছা করলে অমিয় তার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নিঃশেষে শিপ্রাকে গ্রহণ করতে পারে, শিপ্রার সব বাধা আজ সরে গেছে। এতদূর সরে গেছে যে বম্বেতে এক বান্ধবীর বাড়ী দুমাসের জন্য বেড়াতে যাচ্ছে। শিপ্রার এই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও বিবাহ করে দিব্যি শান্তিতে সংসার করছে। শিক্ষয়িত্রীদের ভেতর কজনের তো বিয়ে হয়ে গেল। প্রতিজনের বিবাহে শিপ্রা উপহার দিয়েছে আর খাওয়া দাওয়ার প্রশংসা করে "চমৎকার বর হয়েছে" বলে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু এমনই ভাগ্য ওর যে মৃণালের বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি। মৃণাল ওর চেয়ে অনেক ছোট, স্কুলে ঢোকার পর থেকেই শিপ্রাকে সে ভীষণ ভালবাসতে সুরু করে। শিপ্রাও ওকে স্নেহ করত। বড় সুন্দর মেয়ে মৃণাল, তেমনি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। মাত্র বছর দুই চাকরি করল মৃণাল। তারপর ওর মাসির কাছে বম্বে গেল এক পূজোর ছুটিতে আর সেই মাসেই বম্বেতেই ওর বিয়ে হয়ে গেল। তবু মৃণাল নিতে চেয়েছিল শিপ্রাকে। কার্ড পাঠায়নি, চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তখনও শিপ্রার শেষ অর্গল মুক্ত হয়নি—মা তখনও বেঁচে এবং অত্যন্ত অসুস্থ।

সেই মৃণালের পীড়াপীড়িতে এবার মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে অনন্ত আকাশে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে শিপ্রা। আরও আনন্দ, গভীর আনন্দ, গভীর তৃপ্তি, সে আজ নিজেকে স্বীকৃতি দিতে পেরেছে, নিজের অবচেতনে যে স্বপ্ন এতদিন লালন করেছে আজ তা রূপ গ্রহণ করেছে। আজ আর শিপ্রার লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা কিছুই নেই। সত্যকে সে স্বীকার করতে পেরেছে আর নিজে যখন পেরেছে তখন অমির কাছে স্বীকার করতেও সে আর কুণ্ঠিত নয়। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

সারাটা রাতই বোধহয় শিপ্রা আবোল-তাবোল চিন্তা করে কাটাল।

ভোরের আলো পূবের বুকে রংয়ের ঢেউ তোলার আগেই উঠে পড়ল শিপ্রা। হয়তো, হয়তো এখুনি অমিয় এসে হাজির হবে, একসঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করতে চাইবে।

তাড়াতাড়ি বাথরুমের কাজ সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে বসল শিপ্রা আর বার বার হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল।

এই বুঝি অমিয় এল, এই বুঝি ডাকল তাকে। কিন্তু অমিয় এলো না আর শিপ্রাকেই তার খোঁজে যেতে হল।

তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। আশ্বিনের রোদের একটা মাদকতা আছে, তার ওপর যার মনে রং ধরেছে তার কাছে আরো মিষ্টি। শিপ্রা নিজেই গেল অমিয়র কামরার দরজায়। আস্তে নয় বেশ জোরে ধাক্কা দিল।

ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে দিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। শিপ্রা বলল, "মিঃ সেন

কি এখনও ঘুমুচ্ছেন?"

না ঘুমায়নি, অমিয় ব্রেকফাস্ট সেরে আধশোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছিল।

শিপ্রাকে দেখে ঠাণ্ডা চোখে চাইল, তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলল, "কি ব্যাপার? এত সকালে? কিছু দরকার আছে না কি?"

কি বলবে শিপ্রা?

প্রৌঢ় লোকটি উপরের বাঙ্কে উঠে আবার শুয়েছেন। তিনি বাঙ্গালী কি মাদ্রাজি কি গুজরাটী কিছুই ধরতে পারে নি শিপ্রা, তবে চেহারায় বাঙ্গালী।

গলাটা ঝেড়ে সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, "না দরকার কিছু নেই, এমনি খবর নিতে এলাম।"

এবার সোজা হয়ে বসল অমিয়। এতক্ষণ শিপ্রা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, ওকে বসতে বা ভেতরে আসতে বলেনি অমিয়। এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, "আরে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন—ভেতরে এসো, বসো।"

নিজের বিছানার একাংশ দেখিয়ে দিল।

ততক্ষণে শিপ্রার উৎসাহ নিভে গেছে ধুসর গলায় বলল, "না থাক তুমি পড়ো।"

আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল শিপ্রা। অমিয় একবারও বলল না, "যেও না। এই শিপু, আমি রেগে যাব কিন্তু।" আবার ভাবল কামরায় অপর একজনের উপস্থিতিতে ওকে অনুরোধ করতে লজ্জা পেয়েছে অমিয়। মন কিন্তু সে প্রবোধ বাক্য মানল না।

সারাদিনে আরও বার দু'তিন দেখা হল অমিয়র সঙ্গে, অমিয় যেন কেমন পাশ কাটাতে চাইল।

শিপ্রা একবার জিজ্ঞেস না করে পারল না, "কি ব্যাপার অমি, মনে হচ্ছে আমাকে দেখলেই তুমি যেন ভূত দেখছো!"

অমিয় হেসে উঠল, বলল, "রাইট ইউ আর, তুমি এখন আমার কাছে আর তুমি নেই শিপ্রা—তোমার কাঠামোটা দেখছি আর ভয় পাচ্ছি।

"কেন ? খুব বুড়িয়ে গেছি?"

"আরে না না, বয়সের বালাই আমার কোনকালে ছিল না সে তো তুমি জানো। কিন্তু তোমার সেই দীর্ঘমেয়াদী ভালমানুষীর জেহাদ ঘোষণা, নির্লিপ্ত, উদাসীন ভাবটা, অবজ্ঞা আর আত্মবঞ্চনার কাঠামোটা যেন বরদাস্ত করতে পারছি না। আজ আমরা একই মিছিলের ভাগিদার হতে পারি কিন্তু স্বতন্ত্র কোন পরিচয়ের বালাই না থাকাই ভাল, তাই না? নাও ইট ইজ টু লেট টু রিক্‌নসাইল।"

শিপ্রার মুখটা বড় বিষণ্ন আর পাণ্ডুর হয়ে উঠল, কেন যে অমির সঙ্গে দেখা হল?

কম মানসিক যন্ত্রণা—কম প্রত্যাখ্যান তো সে পায়নি, আজ তার বলবার দিন এসেছে, বলবে বৈকি। তা বলুক কিন্তু সেই সঙ্গে একটিবার শুধু প্রশ্ন করুক, শিপ্রা তোমার ভুল কি ভেঙ্গেছে?

কিন্তু সে প্রশ্ন একবারও করল না অমিয়। রূঢ় ব্যবহারও করল না বরং রাতের ডিনার

একসঙ্গে খাবার আমন্ত্রণ জানাল, কিন্তু শিপ্রা রাজী হল না।

আবার হাসল অমিয়, বলল, "ঐ তো শিপুদি, আজও তোমার ভয় গেল না?"

শিপ্রার কানে খট্ করে লাগল "শিপুদি"। সেই আদরের ডাক। কিন্তু কেন? কেন অমিয় শুধু শিপু বলছে না, ও কি বুঝতে পারছে না শিপ্রা কতটা এগিয়েছে?

কি করেই বা বুঝবে অমিয়? দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যবধান। কত পরিবর্তন ঘটে মানুষের।

তবু অমিয় বম্বেতে নামার আগে শিপ্রার কামরার কাছে এসে দাঁড়াল। বিছানাপত্তর গুছিয়ে নিতে সাহায্য করল। বলল, "তুমি বম্বেতে ক'দিন থাকবে শিপুদি? আমি অবশ্যই একদিন দেখা করব।"

নিজেকে এখন বেশ সহজ করে নিয়েছে শিপ্রা, পোড়-খাওয়া মন অল্পে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? সংসার, গোটা পরিবার যার সঙ্গে চিরকালটা বিরোধ করল, যার মন বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করল না তার কি এত সহজে বিচলিত হওয়া সাজে!

শিপ্রা তার ডায়েরি খুলে ঠিকানাটা বলল, "সাই-সেকশান, অম্বরনাথ।"

চমকে উঠল অমিয়, বলল, "কৈ দেখি দেখি!"

শিপ্রা বলল, "তুমি চেনো নাকি ভদ্রমহিলাকে? খুব বড় অফিসারের বউ, ওরাও সেন। কিন্তু মৃণাল ওর স্বামীর নাম দেয়নি, লিখেছে ওর নামেই ওখানে সবাই চিনবে।"

তারপর কতকটা নিজের মনেই বলল যেন, "আর চিনবে নাইবা কেন? যা গুণী মেয়ে তেমনি সুন্দরী, চেনবার তো কথাই।"

অমিয়র হাত থেকে ফস করে কামরার মেঝেয় পড়ে গেল ডায়েরিটা।

শিপ্রা আবেগের সঙ্গে বলল, "কি দস্যি ছেলে বাবা—ফেললে তো?"

অমিয়র মুখে কথা নেই, যেন বোবা বনে গেছে। কৈ একবারও তো শিপ্রার নাম কোনদিনও করেনি মৃণাল। সমবয়সীদের নাম করেছে দু একটা কিন্তু শিপ্রা বয়স্কা। তাই তার কথা মুখে আনেনি। বেচারী শিপ্রা! বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, "শিপুদি, তোমাকে আর কিছুই ভাবতে হবে না, ওটা আমার বাড়ীর ঠিকানা!"

"তোমার বাড়ী?" আনন্দে যেন ফেটে পড়ল শিপ্রা, বোকা শিপ্রা—অনভিজ্ঞ শিপ্রার একবারও কি মনে হল না, তাহলে মৃণাল ওখানে কেন? মৃণালের পদবি সেন হল কেন?

তুলির কিছু সময়

কণা বসুমিশ্র

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ও বেরিয়ে গেল। তুলি প্রথমে বুঝতে পারেনি। ও যখন ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল. তুলি ভাবল, ও বোধ হয় বসার ঘরে গেল কাগজটাগজ পড়তে। সাধারণত রাগটাগ হলে ও যা করে থাকে। তাই তুলি যেমন চুল আঁচড়াচ্ছিল তেমনিই আঁচড়াতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ও শুনল গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করার শব্দ। তুলি অবাক হল। ও কান পাতল। ভাবল, যাকগে, যে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভাল। মেজাজ ভাল হলে ঠিকই ফিরে আসবে। এখন ওকে বাধা দেওয়া মানে নিজেকে খেলো করা। তবু গাড়ির স্টার্টটা যখন আরো জোর হল, ও আর পারল না চুপচাপ বসে থাকতে। খাটে ঘুমুচ্ছিল টুনটুন। ওকে ফেলে রেখেই তুলি হন হন করে নেমে গেল নিচে। গাড়িটা তখন বাগানের লাল সুরকির পথটা ধরে এগোচ্ছে। মরিয়া হয়ে তুলি ছুটল। নিলয় গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ও ছুটে গিয়ে চেপে ধরল ওর স্টিয়ারিং। কোন লাভই হল না। জোরে এক্সিলারেটার চেপে বেরিয়ে গেল নিলয়। গেটটা ধরে কাঠের মতন দাঁড়িয়ে থাকল তুলি। ও ভাবছে, নিলয় গেল কোথায়? হয়ত ক্লাবের বারটাতে গিয়েই ঢুকেছে। আজকাল তো আবার নেশার বাতিক হয়েছে সাহেবের। কেন যেন তুলির চোখ দিয়ে একটু জল বেরিয়ে এল। এই রাত্তিরেও ও একেবারে ভিজে স্নান করে উঠেছে। গেটের মাথায় মাধবীলতার ঝাড় থেকে অনবরত জল পড়ছে। টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে ওর এলো চুল বেয়ে। খুব বিশ্রীভাবে ভিজছে ও। ওর কাপড়চোপড় টানটান ভাবে সেঁটে রয়েছে শরীরের সঙ্গে। ঠিক এই অবস্থায় কেউ দেখলে ওকে নিশ্চয় পাগল বলবে। তুলি আড়চোখে একবার দেখে নিল ওপাশের বাড়িটা। না, কেউ দেখছে না তাকে। শুধু ও বাড়ির মালী কালভার্টের এক কোণে বসে ভিজছে তারই মত। তুলির খুব শীত করছিল। ও ভিজে কাপড়ের জল নিংড়োতে নিংড়োতে ঘরে ঢুকল। কাপড়চোপড় ছেড়ে ও ভাবল, ক্লাবে কি একটা ফোন করে দেখবে? অস্থির একটা জেদী মেয়ের মত ও ফোনের ডায়াল ঘুরোতে লাগল। পেয়ে গেল নম্বরটা। ওপাশ থেকে যখন বলল, হ্যালো!—ও তখন ফোন ছেড়ে দিল। ভাল লাগল না কথা বলতে আর। তুলি ভাবল, এখন ও কি করবে? কিছু ভাল লাগছে না, কিস্যু না। খুব ঘুমুচ্ছে টুনটুন। ওর ছোট্ট বুকটায় নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা অনেকক্ষণ ধরে দেখল তুলি। তারপর ও মুখটাকে কাছে এনে টুনটুনের নরম গালে আল্‌তো করে একটা চুমু খেল। বেশ লাগল ওর, টুনটুনের গায়ের বমি মেশানো বেবী পাউডারের গন্ধটা। সারা দিনের চটকানো বিছানাটা চোখে পড়ল হঠাৎ। ও বিছানা ঝাড়লো। ধোপভাঙ্গা একটা চাদর পাতলো। তার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ও সটান শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখে পড়ে গেল টেবিলের ওপরে খোলা একখানা নিষিদ্ধ বই। যার ওপরে নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রোমের এক ব্যভিচারিণী রানী। যিনি এক রাতে চল্লিশজন পুরুষকে সম্ভোগ করেও ক্লান্ত হতেন না। ও আর তাকাতে পারল না ওই কামার্ত, উলঙ্গ ছবিটার দিকে। ছবিটা যেন আজ দুপুরে নিলয়ের সামনে দাঁড়ান তারই

মডেল। তুলির চোখ জ্বালা করে উঠল। ও বিছানার তলায় সরিয়ে রাখল বইটা। ওর মনে হল, দুর্বল মুহূর্তে মানুষ কত সস্তা হতে পারে। দুপুরে তো ওই বইখানার ছবি দেখতে তার খারাপ লাগেনি। অথচ এখন লাগছে। পাগলের মতন চুমু খেতে খেতে নিলয় যখন বলেছিল, আমায় খুশি করে দাও, প্লিজ… তখন ওর কথাগুলো ওর রক্তের মধ্যে যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। স্বামীর বুকের মধ্যে পিষে যেতে যেতে শরীরের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে ও তো ওকে খুশিই করে দিয়েছিল। কিন্তু বড় অল্প সময়ের সেই মুহূর্ত। নইলে নিলয়ের মন এমন করে বদলে গেল কেন? তুলিও তো মরছে অনুশোচনায়। যদিও অনেক রাতে ঘরে এলে নিলয় আবার বদলাবে! ওকে উত্তেজিত করার জন্য আবার কাছে টানবে। আর তুলি যদি তাতে সাড়া না দেয়, তা হলে ও বলবে, তুমি একটা ফ্রিজ। —ওর কাঙাল চোখদুটো তুলিকে সব ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু কেন? তুলি ভাবলো, সে কি দম দেওয়া স্প্রীংয়ের পুতুল যে নিলয় ওকে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে নাচাবে?…খেলার রীলে শুনাতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা। ঘুম ভাঙলে নিলয় বলল, চল, সেনসাহেবের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। সেদিন ওরা ঘুরে গেল। তুলি তখন দুধের বোতল ধরে রয়েছে টুনটুনের মুখে। পাশে টিপয়ের ওপর ঠাণ্ডা হচ্ছে ওর চায়ের কাপ। ও একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, এই বৃষ্টিতে? নিলয় বলল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব বৃষ্টিতে কি আসে যায়?—তুলির বেরোতে তখন একেবারেই ইচ্ছে টিচ্ছে করছিল না। ও বলল, ভাল লাগছে না এখন কারো বাড়িতে যেতে।—নিলয় বলল, কিন্তু রিটার্ন ভিজিটের প্রশ্ন রয়েছে না!—হাসল তুলি। বলল, মেসিনের মতন অতো নিয়মমাফিক চলা আমার ভাল লাগে না। ওরা এসেছে বলেই আমাদের…ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নিলয় বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও।

যদি না হই?—ভুরু বেঁকিয়ে তুলি বলল, ওরা এসেছে বলেই যে…

নিলয় বলল, আহ্, তুমি কি তৈরি হবে? তুলি বলল, না। ওরা এসেছে বলেই যে আমাদের যেতে হবে তার কোন মানে নেই। তার চেয়ে চল ব্যারেজ ঘুরে আসি।—নিলয় গুম হয়ে থাকল। কিছু বলল না।—তুলি বাচ্চাদের মতন আদুরে গলায় বলল, জানাল জানোগো অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে না আমি জলের ডাক শুনতে পাই।—বিরক্তির সঙ্গে নিলয় সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। তেতো গলায় বলল, তোমার শুধু ব্যারেজ আর ব্যারেজ। কি যে মধু আছে সেখানে। যত্তসব একঘেয়ে ব্যাপার।—তুলি মুচকি একটু হাসল। বলল, একঘেয়ে শব্দটা কিন্তু রিলেটিভ, না গো? আমার যেমন একঘেয়ে লাগে তোমার ওই রিটার্ন ভিজিট জাতীয় কথাগুলো শুনলে।—সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে নিলয় বলল, দিলে তো মেজাজটা খারাপ করে?—হাসল তুলি। বলল, তোমার মেজাজ যে কিসে খারাপ হয়, আর কিসে হয় না, তা আমি আজও বুঝলুম না।—চটে গিয়ে নিলয় বলল, এই পাঁচ বছর ধরেও বুঝলে না?—আমি আধ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর মধ্যে তোমায় তৈরি হতে হবে।—জুলুম করছ? বলল তুলি। নিলয় বলল, আলবৎ।

আর তুলি ঠাণ্ডা গলায় তক্ষুনি বলল, আমি যাব না।—হাতের সিগারেটটা নাচাতে নাচাতে নিলয় বলল, যাবে না মানে? আমি দেখতে চাই তোমার ইচ্ছের দাম কতটুকু? —বেরিয়ে গেল নিলয়।

কাচের জানলায় বৃষ্টির জলকণাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুলির কান্না পেয়ে গেল ও ভাবল, নিলয় বড় নিষ্ঠুর। ওর জন্যে কি একটা সন্ধ্যোও খরচ করতে পারত না? রোজই তো থাকে সেই ফ্যাক্টরি। ফ্যাকটরির পরে ক্লাব, নইলে পার্টি অথবা কারো বাড়িতে গিয়ে আড্ডা! আড্ডারও তো সেই মাপাজোপা কথা, সেই র‍্যাঙ্ক, পজিসন, স্ট্যাটাসের প্রশ্ন মেপে চলা। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, নিলয় একদিন ছবি আঁকত, বই পড়তে ভালবাসত। কোথায় গেল ওর সেই শিল্পীর মন? আসলে,—তুলি ভাবল, মানুষের মেলামেশা, চলাফেরার মধ্যে যখনই সীমিত ভাব এসে পড়ে, তখনই সে হারিয়ে যায় তার বড় জগৎ থেকে। তুলি আরও কত কি ভাবতে লাগল হিজিবিজি। তুলি ভাবল, এই শিল্পনগরীর আমরা প্রত্যেকে যেন রবীন্দ্রনাথের যক্ষপুরীর একেকজন মানুষ, যাদের পরিচয় নামে নয়, নম্বরে। এখানে কে ভাল ছবি আঁকে, কে ভাল গান গায় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কে কোন কোয়ার্টারে বাস করে, কার কত মাইনে তা নিয়েই হয় সবার পরিচয়। তুলি অবশ্য আশা করেনি, এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় নিলয় তাকে ঘরে বসে ক্ষ্যাপার মতন কবিতা শোনাবে। তুলি এও আশা করেনি, আজ সন্ধ্যায় সাধারণ শ্রমিকদের পাড়ায় যে গানের জলসা হচ্ছে, সেখানে নিলয় তাকে নিয়ে যাবে। বরং অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই আজ ও পেয়েছিল। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত নিলয় শুধু তারই কাছে কাছে ছিল। সব ছুটির দিন ত আর পাওয়া যায় না তাকে। ঘন ঘন ফোন আসে সকাল থেকে। হয়ত ফ্যাকটরির সবচেয়ে বড় কত্তার পিএ তাকে ডেকে বসেন, গেস্ট হাউসে মিটিং আছে আসুন। নয়ত রোটারী ক্লাবের মিটিং থাকে, নইলে ছুটতে হয় অন্য কেস্ডান বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে। কিন্তু আজ সে ধরনের কোন ব্যাপার ট্যাপার না ঘটায়, নিরিবিলিতে ছিল দুজনে। সকালে খেয়াল খুশি মতন রেকর্ড বাজাল ওরা, নাচলো, গাইল, দুজনের হাসি, ঠাট্টা, কথার টেপ করল দুজনে। তারপর মনের আবেগে টুনটুনকে বুকে চেপে ধরে নিলয় উল্লাসে ফেটে পড়ল। টুনটুন ডাকলো, দা-দা-দা। হা হা করে হাসল নিলয়। বলল, বল, বল, আমি তো এককালে তোর মায়ের দাদাই ছিলুম রে।—তুলি হেসে ফেলল। বলল, আমি এখনও তোমায় মাঝে মাঝে দাদা বলে ফেলি জানলে?—ওকে জাপটে ধরে নিলয় বলেছিল, তোমার দাদাদের মধ্যে আমি ক নম্বর?—বিজ্ঞের মতন হাসল টুনটুন। হেসে ফেলল ওরাও। তারপর লনে চেয়ার পেতে রোদে পিঠ দিয়ে ওরা শুনতে বসেছিল খেলার রীলে। উত্তেজনার মাথায় ট্রানজিস্টর ভেঙে ফেলে আর কি! ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের এই দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিলয় ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে, আর তুলি ভারতের। একজন গ্রীগ, ডেনেস, কট্রামের ভক্ত। অন্যজন চন্দ্রশেখর, বেদী, ওয়াড়েকরদের। রীলে শুনতে শুনতে দুজনের প্রায় হাতাহাতি হবার মতন অবস্থা। পাখির মতন হালকা লাগছিল আজ তুলির সারাটা দিন। সেই নতুন বিয়ের পর যেমন লাগত, যখন নিলয়কে ছোঁয়া যেত সাধারণ মানুষের মতো। ফ্যাকটরির সবচেয়ে উঁচু কত্তার কাছাকাছি যখন সে পৌঁছোয় নি। এই মুহূর্তে তুলি যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। বন্ধ শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের নির্জন রাস্তাটা। কালো সাপের মত ফণা তুলে নাচছে নিচের রাস্তার জলের স্রোত। তুলি ভাবছে, সুখ শব্দটা বড় কঠিন। একজনকে সুখী করতে হলে নিজেকে যে কতখানি ছাড়তে হয়। ছাড়তে ছাড়তে এমন হয় যে, নিজের

আর কিছুই থাকে না। নাইবা থাকলো। কিন্তু বেপরোয়া মনটা যদি হঠাৎ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, সেটা কি দোষের? ওর কথা মতন চলতে চলতে ও যে ওর হাতের তৈরি একটা পুতুল হয়ে গিয়েছে। সেই পুতুল গড়ার আনন্দ নিলয় কতটা পেয়েছে ও জানে না। তুলি শুধু নিজের কথাই বলতে পারে। ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে নিজেকে একটা মমি মনে করেছে। বাইরে এখন ভীষণ অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে, আর কোন এক ভুতুড়ে পাখির ডাক শিরিষ গাছের মাথায়। তুলি ভাবছে সব থেকে ভাল হয় যে যার ইচ্ছে মতন চললে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটা জিপসী মেয়ে। পরণে ঘাগরা, মাথায় ওড়না। কোমর দুলিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ও প্রায়ই যায় এখান দিয়ে। বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলেছে। ওরা যাযাবর। ভাবতে বেশ লাগে তুলির। ওকে ডেকে কি একটু কথা বলবে তুলি? না থাক। নিলয় হয়ত পছন্দ করবে না। কিন্তু কতদিন আর এই বাধা নিষেধের মধ্যে হোঁচট খাবে ও? হাওয়ার দাপট চলছে শালের বনে। বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ছে তার মধ্যে আঁকাবাঁকা সরু পথ। দুপুরে ওখানে কোকিল ডাকে, ডাহুক। আর দোয়েল যা শিস দেয় না? দারুণ। ওকে যেন জ্বালাতন করে রীতিমতন। তখন তুলির ইচ্ছে করে, ওখান দিয়ে একবার হাঁটতে। এ সব ইচ্ছের কথা নিলয়কে বললে, ও খুব হাসে। নিলয় বলে, তুমি একটা পাগল। ও ওকে মনে করিয়ে দেয়, ও সাহেবপাড়ার বউ, ওসব বেয়াড়া ইচ্ছে ওকে মানায় না। বরং তার চেয়ে ক্লাবেটাবে গিয়ে ও যদি নাচে গানটান গায়, সেটা ওকে অনেক বেশী মানায়।

লাইট পোস্টের ভুতুড়ে আলোয় মনে হচ্ছে কে যেন আসছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা লোকটির। মাথায় টুপি গায়ে বর্ষাতি। তার রবারের গামবুটের মধ্যে জল ঢুকে আওয়াজ হচ্ছে ছপ্, ছপ্, ছপ্। তুলি অবাক হয়ে দেখল, ওদেরই গেট খুলল লোকটা। ওর ভয় ভয় করল। অচেনা কোন বাজে লোক নয়ত?—ভাবল তুলি যা এই শহরে হামেশাই ঘটে থাকে। এক সময় বেল বাজল দরজায়। তুলি বলল কে? কোন সাড়া নেই। আবার বাজল বেল। তুলি আবারও বলল, কে? তার উত্তরে বেলটাই বাজল শুধু। তুলি প্রথমে ভাবল, মোহনকে ডাকবে। আবার ভাবল, না থাক। ও দরজার গায়ে লাগানো আই দিয়ে দেখল। ও আশ্চর্য হল বারিদিকে দেখে। ওর ছোটবেলার বন্ধু।

এখানেই কোন একটা ফ্যাকটরীতে কাজ করে, ফোরম্যান না কি যেন। ওকে দেখলে অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যায় তুলির, সেই লেকের জলে সাঁতার কাটা, খেজুর গাছের ডালে বসে পাখির বাসা পাড়া। হাসতে হাসতে দরজা খুলল তুলি। বলল, মারবো এক চাঁটি, অসভ্য কোথাকার।—বারিদ বলল, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম তো। তারপর বলল, দাঁড়া তোর কত্তাকে বলব, যাকে-তাকে তুই দরজা খুলে দিস।—তুলি ঠোঁট উলটে বলল, বলিস। আমার কত্তার মন অত ছোট নয়।—হা হা করে হাসল বারিদ। হঠাৎ-ই যেন ওর চোখে পড়ে গেল টুনটুনের ঘুমন্ত মুখটা। বারিদ বলল, বাহ্, তোর মেয়ে তো ফার্স্ট কেলাস হয়েছে রে।—ঠিক আমার মত তাই না? তুলির ঠোঁটে কৌতুক। বারিদ বলল, তোকে টেক্কা দেবে। ও হিন্দী ছবির হিরোইন হবে।—কৃত্রিম রাগে তুলি বলল ইস্ কি আমার উদাহরণ।—বারিদ টুনটুনের গালে একটা টোকা মেরে বলল, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, তোর মেয়ে ডেসডিমনা, হল তো? ওকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল

তুলি। বর্ষাতির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ওর হাঁটুতে কাদা, মুখেও কোথাও কোথাও লেগে রয়েছে কাদার ছোপ। তুলি বলল, এবার তোর ধরাচুড়ো খোল তো। তোর গায়ে এত কাদা লাগল কি করে?—রবারের গামবুট মাথার টুপি খুলতে খুলতে বারিদ বলল, আজ আমাদের ম্যাচ ছিল, ওই তো কল্পতরুর মাঠে। যা একখানা গোল দিয়েছি না, দারুণ। তুলি বলল, এই বিষ্টিতেও খেলতে বেরিয়েছিস্? তোব শখের বলিহারী। তারপর আবার ফুটবল! আমি তো জানতাম, এই শীতে মানুষ ক্রিকেট খেলে।—বারিদ বলল, দুঃখে খেলছি, ইণ্ডিয়া যেভাবে হারতে চলেছে। তুলি অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র একশো একান্ন রান তুলেই্ সব কটা গেল।—তুলি বলল, তা তুই এ সময় এখানে? আমি তো ভেবেছিলুম, তুই এ সময় কলকাতায় থাকবি খেলার মাঠে।—বারিদ সে কথা কানে না তুলে বলল, ইংল্যাণ্ডের টনি গ্রেগ ফেগের মারের তুলনা নেই, আজ তো চার উইকেটে ওদের একশো পাঁচ হয়ে রয়েছে। ইণ্ডিয়া হারবেই। তুলি বলল, বলা যায় না, ক্রিকেটের ব্যাপার তো। বারিদ হাসল। বলল, যাক, তোর সাহেব কোথায়? তিনি কি কলকাতায় খেলার মাঠে লাইন দিচ্ছেন? তুলি বলল, উঁহু এখানেই। তবে কোথায় গেছে কে জানে?—সে কি, ভুরু কোঁচকাল বারিদ। বলল, বড্ড বেরসিক লোক তো। এই বাদলার রাতে বউ ফেলে কেউ পালায়?—তুলি অ্যাশট্রের ছাই ফেলে এসে বলল, হ্যাঁ ঠিক তোর মত।

বারিদ হেসে বলল, আমার বউ? তিনি এখন কলকাতায় পিত্রালয়ে। রীতিমতন আড্ডা দিচ্ছেন কফি হাউস কিংবা বসন্ত কেবিনে।—বাহ্ চমৎকার। তোর কপাল পুড়েছে তো? —তুলি রসিকতা করল। বারিদ হাসল না। বলল, একটা ভালো চাকরী বাকরী না হলে আর চলছে না। ফ্রিজ, গাড়ি, স্কুটার না হলে বউ ঘরে থাকবে না। নরম চোখে তাকাল তুলি। বলল, কি আমার পুরুষ মানুষ রে! বউকে বাগে আনার ক্ষমতা নেই।—হুঁ, হুঁ, অনেকেরই নেই। যেমন নেই চ্যাটার্জী সাহেবের। মুচকি মুচকি হাসছিল বারিদ। একটু সময় তাকিয়ে থাকল তুলি ওর দিকে। তারপর বলল, থাম, থাম, যে ঘর করে সে বোঝে। বারিদ এবার গম্ভীর হল। ও ঘরময় পায়চারি করছে। ওর এক হাত ঢোকানো প্যাণ্টের পকেটে। ও বলল, মেয়েরা স্রেফ চায় টাকা, বুঝলি?—যা, যা, হয়েছে। কটা মেয়ের সম্বন্ধে তোর অভিজ্ঞতা আছে রে?—তুলি জ্বলে উঠল। বারিদ জ্বলল না। ও হাসতে হাসতে বলল, আপাতত আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কথাই বলতে পারি। তুলি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ওহ্! বারিদ বলল, তোর মনে আছে তো, ছেলেবেলায় তোর পুতুল বিয়ের সময় তুই আমায় কত্তা বানিয়েছিলি আর তারপর আমাদের দুজনের একদিন বিয়ে হল খেলাঘরে।—বারিদের গোঁপের ফাঁকে হাসি, গলার স্বর কৃত্রিম গাঢ়। তুলি হয়ত কিছু বলত। কিন্তু ওর চোখ দুটো ঘুরে গেল দরজায়। ও ঘরে টেলিফোন বাজছে। ও মোহন, মোহন, বলে চেঁচাল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না মোহনের। বারিদ বলল, নিজেই যা না তোর কত্তা বোধ হয় ডাকছে!

তুলি এগিয়ে এল ফোনের কাছে। সারাদিন এমনি অসংখ্য ফোন আসে নিলয়ের। স্বামী ভি আই পি হলে যা হয়। এদিকে স্ত্রীর প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। ও রিসেপসনিস্ট মেয়েদের মত মুখে হাসি টেনে ফোন ধরে বলল, হ্যালো। থ্রী টু ফাইভ সেভেন।

—কে তুলি?

—অজন্তা নাকি?

—হুঁ।

—কি করছো?

—তুলি বলল, এই তো মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে এলুম।

কেন তোমার আয়া?—অজন্তা বলল। তুলি বলল, নেই, চলে গেছে। —সে কি!—অজন্তা বলল, তুমি চালাচ্ছো কি করে? আমি হলে তো হিমসিম খেয়ে মরতুম। এই দ্যাখো না, আমার তো এখন তিনটে লোক তাও আমার চলছে না। অজন্তা বলল, সব থেকে ভাল হয় কি জানো? হ্যালো, হ্যালো, তুলি। তুলি বলল, বল, আমি শুনছি। অজন্তা বলল, আমাদের ফোনের ভেতরে বেশ গণ্ডগোল হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল হয় কি জানো? কলকাতা থেকে একজন আয়া আনিয়ে নাও। দাঁড়িয়ে থাকতে তাকতে বসে পড়ল তুলি। বলল ভাবছি, তাই করবো। তারপর, আর কি খবর বল—অজন্তা বলল। পা দোলাতে দোলাতে তুলি বলল, এই চলে যাচ্ছে এক রকম। অজন্তা বলল, আজকের খেলার রেজাল্ট জানো তো?—তুলি বলল, খুব বাজে খেলছে ইণ্ডিয়া।—অজন্তা বলল, যা বলেছ। আমার কত্তা তো আবার ওখানেই পড়ে রয়েছে। পঁয়তাল্লিশ টাকার টিকিট ব্ল্যাকে কিনেছে তিন শো টাকা দিয়ে।—খুক্ খুক্ করে সামান্য হাসল তুলি। অজন্তা বলল, এই আমরা গাড়ি বিক্রী করছি।—তুলি বলল, কেন?—অজন্তা বলল বড় কিনবো ভাবছি। এই ছোটতে আর চলছে না, এত ছোট। হাসল তুলি। ওদেরও ছোট। বুঝল, অজন্তা খুব ডাঁট নিচ্ছে। তুলি বলল, আমার আবার ছোট গাড়ি দারুণ লাগে।—অজন্তা বলল, আরে দূর, বড়োর কাছে কোন গাড়ি দাঁড়ায়? বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়ল তুলি। এত বকতে পারে অজন্তা। ওর বিরক্তি লাগছে। ও বলল, এই আজ রাখছি, কেমন!—অজন্তা বলল, কেন এত তাড়া কিসের? শোনো, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা রয়েছে।—তুলি বলল, বল? এই সামনের ছুটিতে আমরা কাশ্মীর যাব ভাবছি, বাই কার।—তুলি জোরে হেসে ফেলল। বলল, পূজোর ছুটি? তার তো এখনও এক বছর দেরী। অজন্তা অপ্রস্তুতের হাসি হাসলো। বলল, বাই দি বাই, আচ্ছা, তুলি, রোববার ক্লাবে যাওনি কেন? জোর জমেছিল পার্টি। মানে বোতলের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো টপ হয়েছিল আর কি। আর আমি বা একখানা মাঞ্জা দিয়েছিলুম না? আগুন।—তুলি বলল, ইস্ খুব মিস করেছি তা হলে। আচ্ছা, এখন রাখছি, পরে কথা বলব। টুনটুনকে নিচে একলা রেখে এসেছি।—অজন্তা বলল, ওরে ব্বাস্, একলা রেখে এসেছ? কেন তোমার মোহন কোথায়?—তুলি নির্বিকারভাবে বলল, কে জানে, বোধ হয় ঘুমুচ্ছে।—সে কি! অজন্তা বলল, তুমি এ-সব টলারেট কর?—তুলি বলল, সব সময় করি না।—অজন্তা বলল, তার মানে মাঝে মাঝে কর? যাক্ সেদিন পার্টিতে গেলে না কেন?—হাই তুলল তুলি। বলল, এমনি ভাল্ লাগল না যেতে।—অজন্তা বলল, ভাল না লাগলেও যেতে হয়। হাসব্যাণ্ডকে সব সময় একা ছাড়তে নেই। অনেক সময় গার্ড দিতে হয়। চাপা হাসির আওয়াজ উঠল অজন্তার গলায়। —তুলি সন্দেহজনকভাবে তাকাল ছাদের শিলিংয়ের দিকে। তারপর বলল, কেন, আত্মবিশ্বাস কি আমি হারিয়ে ফেলেছি?—অজন্তা যেন প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, অতটা কনফিডেন্স থাকা ভাল নয়।—অনেকদিন আগে বাগানে একটা সাপ দেখেছিল

তুলি, তার হিস্ হিস্ আওয়াজের কথা ওর মনে পড়ে গেল। তুলি রুক্ষ গলায় বলল, আমাদের ফোনের ভেতর বিশ্রী একটা আওয়াজ হচ্ছে, আমি রাখছি।

—অজন্তা বলল, হ্যালো তুলি, জাস্ট এ মিনিট প্লিজ। তোমার কত্তাকে সেদিন আমরা যা নেশা করিয়েছিলুম না হুইস্কির মধ্যে চিনি মিশিয়ে!—কিছু না জেনেও তুলি বলল, জানি।—অজন্তা চেপে চেপে বলল, তারপর তোমার মিস্টার তো বাড়ি ফিরতেই চান না। আমরা জোর করে......, হা...হা...হা।—তুলির ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছিল। ও বলল, বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ তো? —মানে, অজন্তা বলল, উনি যা কাণ্ড করছিলেন মিসেস রাউতের হাত ধরে হা...হা...উনিও খুব টেনেছিলেন কি না। অজন্তা টেনে টেনে হাসতে লাগল। তুলি অধৈর্যের মতন রিসিভারটা ঝাঁকিয়ে বলল, হাত ধরে নেচেছিল তো? শুধু তাই নয়—অজন্তা তখনও হাসছে। বলল, ওকে জড়িয়ে ধরে...। ওর কথা কেড়ে নিয়ে তুলি বলল, কিস্ করেছিল?—মাই গুডনেস।—অজন্তা বলল, তুমি জানলে কি করে?—যদিও তুলি হাসছে। তবুও বুকের মধ্যে কাটা মাছের ছটফটানি টের পাচ্ছিল তুলি। তুলি স্বাভাবিকভাবেই বলতে চেষ্টা করল, মিস্টার চ্যাটার্জীর এমন কোন সিক্রেট ব্যাপার নেই, যা তার স্ত্রীর অজানা। একটু যেন থমকে গেল অজন্তা। বলল, তুমি কি কিছু মাইণ্ড করলে? —তুলি বলল, আরে না না, বন্ধুর বউদের সঙ্গে ও যদি একটু ঠাট্টা তামাসা করেই থাকে, তা নিয়ে অত মাইণ্ড করার কি আছে? আর এ-সবের তো চলই রয়েছে আজকাল? টুনটুন কাঁদছে, আচ্ছা, আজ রাখছি, কেমন? ওকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তুলি ঝপ্ করে রেখে দিল ফোনটা। কিছুক্ষণ দম মেরে বসে রইল তুলি। তারপর সব ব্যাপারটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল। ও খুব স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনল, বারিদ গাইছে, ও ডিয়ার সাচে সাচ আই লাভ উই ভেরী মাচ, ভেরী মাচ, ভেরী মাচ। ঘরে ঢুকে তুলি দেখল, বারিদ টুনটুনকে পিঠে নিয়ে সারা ঘরে ঘোড়া হয়ে ঘুরছে। দৃশ্যটা খুব উপভোগ্য। কিন্তু তুলি অন্যমনস্ক। অজন্তার কথার ধাক্কা তখনো এসে বাজছে ওর বুকে। মিসেস রাউত, অজন্তা, নিলয়, এরা সবাই তালগোল পাকিয়ে বিশ্রী একটা যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে। তবুও যন্ত্রের মতন হাসল তুলি। বলল, শেষ পর্যন্ত তুই আমারই মেয়ের প্রেমে পড়লি?—ব্যঙ্গের সুরে বারিদ বলল, হ্যাঁ, বিলেতে তো শাশুড়ির প্রেমেও পড়ার রেওয়াজ রয়েছে। তারপর ম্যাডামের কথা শেষ হল? তুই কার সঙ্গে অত কথা বলছিলি রে?—তুলি বলল, তা দিয়ে তোর দরকার?—বারিদ হাসল। বলল, একটু কফি টফি কি চলবে? না শুধুমুখেই কেটে পড়তে হবে?—তুলি মোহনকে ডাকতে যাচ্ছিল, বারিদ বলল, আবার মোহন কেন? বেগম সাহেবার চিনি দুধ সব কোথায় জানলে আমিই করে খাওয়াচ্ছি। ঘরে করি স্ত্রীর পদসেবা, আর এখানে...।—তুলি এমন চাউনি ছুঁড়ল যে বারিদের আর কথা শেষ হল না।

কফি করতে করতে তুলি ভাবছে, ও নিজেকে খেলো করেনি তো অজন্তার কাছে? অজন্তা যদি আবার কখনও আসে ওসব বলতে? বারিদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোকিলের ডাক ডাকল। তুলির ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। বারিদ গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল, ও ডিয়ার সাচে সাচ...। তুলি বলল, বাংলা গান কি ভুলে গেছিস? বারিদ বলল, তবু তো চুল বাবরি করিইনি।—তা ওটাই বা বাকি থাকে কেন?—বলল তুলি। বারিদ বলল, তোর মেয়ে বড় হলে রাখবো। তুলি হাসল। ও তাকাল মেয়ের দিকে। দেখল, বারিদের কাঁধে মাথা রেখে

ঘুমিয়ে পড়েছে টুনটুন। নীচেই ছিল উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা টুনটুনের ছোট্ট খাটটা। ওখানে ওকে শুইয়ে দিল তুলি। বারিদ ছেলেমানুষের মতন বলল, আচ্ছা, তোর মেয়ে বড় হলে আমায় কি বলবে বলত? মামা?—তুলি হাসল। বারিদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, হায়, প্রেয়সীর শিশু মোরে মামা বলে ডাকে। বাবা বলার কথা ছিল যাকে।—যাহ্, ফাজিল! ওর পিঠে একটা চড় মেরে হাসল তুলি। বলল, তুই এখনো ঠিক তেমনি রয়েছিস্? বারিদের তখন আর উত্তর দেবার সময় নেই। ও স্যাণ্ডউইচে কামড় দিচ্ছে তখন। তুলির বেশ লাগছে ওকে। ও যেন বার বার ফিরে যাচ্ছে ওর সেই ছেলেবেলার দিনে। বারিদ এলেই এমন হয়। তুলি যেন একেবারে বদলে যায়। ছেলেমানুষী করার সুযোগ তো আর সবার সঙ্গে হয় না। তুলির মনে হয়, ওর সেই তাজা নরম ঘাসের মতন সবুজ মনটা আজও মরেনি। বারিদ সেই মনটাকেই টেনে এনে খেলনার মতন দোলায়। বারিদ বলল, বেগম সাহেবা হঠাৎ চুপচাপ?—তুলি বলল, তোর বেগম সাহেবা নামটা আমার এত বাজে লাগে। বারিদ বলল, তবে মেমসাহেব বলি? তুলি আবার অন্যমনস্ক। ও ভাবছে, নিলয় এখনও আসছে না কেন? ও কি সত্যি সেদিন অত বাড়াবাড়ি করেছিল? আর মিসেস রাউত? তিনিই বা কেমন মহিলা? আচ্ছা নিলয় সব চেপে গেল কেন? ও তো বললেই পারত সেদিনের ব্যাপারটা। বারিদ বলল, আচ্ছা তোর কি হয়েছে বল তো?—তুলি হাসল। বলল, ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে তাই।—রিয়েলি?—বারিদ প্রায় লাফিয়ে উঠল।—তুলি আরও বেশী করে হাসল। বলল, রিয়েলি। কথাটা ঠিক বারিদকে নকল করে। বারিদ বলল, হুঁ। মেয়েদের আবার মন আছে নাকি?—তুলি শূন্য চোখে তাকাল, বলল, নেই? সব বুঝি আছে শুধু পুরুষের? ওর চোখে চোখ রাখল তুলি। কিন্তু বারিদের উত্তরটা ও খেয়াল করল না। নিলয়কেই ও ভাবছিল। ওর খুব দুর্বোধ্য লাগছিল স্বামীকে। দুপুরের আদর আবেগের সবটুকু স্পর্শ এখনো লেগে আছে ওর ঠোঁটে। নিলয় ওর সঙ্গে হয়ত লুকোচুরি খেলছে, ওর বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।—ছেলেরা কখনো সিনসিয়ার হতে পারে না, না রে?—তুলি বারিদকে বলল। বারিদ বলল, আমায় কি সে সুযোগ তুই দিয়েছিলি?—বারিদের গলায় কৌতুক। তুলি ঠোঁট উলটে বলল, সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না। নিতে হয়।—চোখে একরাশ কৌতূহল ছিটিয়ে বারিদ বলল, তাই নাকি?—তুলির চোখ দুটো কাঁচের জানলায়। ও দেখছিল ধূলোর পুরু সর। তুলির খেয়াল হল মোহনটা ফাঁকি দিচ্ছে কাজে। ওর মনে হল আজকাল বড় বেশী ছাই ওড়ে কোক ওভেনের ফ্যাকটরী থেকে। কাঠের জানলাগুলো বন্ধ। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। তুলি ভাবল, নিলয় বড় ভীতু। ওর সাহস নেই, স্ত্রীকে সত্যি কথা বলার। ওই তো সেবার ও যখন লখনৌ গিয়েছিল নিলয়কে একলা এখানে রেখে, তখন তো ও একজনের সঙ্গে ভাবসাব করেছিল। ওদের এই বাড়িতেই ছিল সে। নিলয়ের এক ডাক্তার বান্ধবী। বারিদ পকেট থেকে একটা চুরুট বার করল। তুলির মনটা এখন এলোমেলো। বলল, এই তুই চুরুট খাস্?—বারিদ বলল, এটা আজেবাজে চুরুট নয়, অ্যালকাজার। দেখবি কি ফাইন গন্ধ? চুরুট টেনে বারিদ আয়েশ করে ধোঁওয়া ছাড়ল। তুলি অন্যমনস্ক সেও যেন গিলে ফেলল ধোঁওয়ার কয়েক টুকরো। তুলির বেশ মনে পড়ছে লখনৌ থেকে ফিরে এসে ও একদিন দেখতে পেয়েছিল নিলয়ের বিছানার তলায়, অপরিচিত একটা নাইটি। ভদ্রমহিলার কথা ও জেনেছিল অনেক পরে। ও কি তা নিয়ে খুব অশান্তি করেছিল? আরে দূর! বরং

স্বামীকে ঠাট্টার হাসি হেসে বলেছিল, কি ব্যাপার? তোমার বন্ধুটি গেস্টরুম ছেড়ে তোমার বেডরুমে আশ্রয় নিয়েছিলেন? নিলয় আমতা আমতা করে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে দিয়ে তুলি বলেছিল বুঝেছি বুঝেছি, তুমি নিজে বোধ হয় গেস্টরুমে থেকে ওঁকে এ-ঘরে পাঠিয়েছিলে। নিলয় যেন বেঁচে গেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বারিদের কফি শেষ। ও বলল নাহ্, শরীরটা আর গরমই হল না। তোর ফ্রিজে মাল-টাল নেই?—মুখ টিপে হাসল তুলি। বলল, নেই।—বারিদ তবু বেপরোয়াভাবে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে বলল, আহ্। গ্র্যাণ্ড। ও টেনে নিয়ে এল ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতলটা। ও বলল, ফাইন। একেবারে বিলিতী।—তুলি বসে বসে দেখছিল ওর সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া জুলুম। ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল, হাফ প্যান্ট পরা ছোট করে চুল ছাঁটা ছেলেবেলার বারিদকে, যে ওর পড়ার ঘরে গিয়ে জোর করে কেড়ে নিত ছবির বই। প্যাচপেচে বৃষ্টিতে ওকে ল্যাঙ্ মেরে ফেলে দিত মাঠের কাদায়। গ্লাসে স্কচ ঢেলে জল মেশাল বারিদ। জলের ভাগটাই বেশী। ও হাসছিল। ও বুঝতে পারছিল, পানাসক্তির চেয়ে ওর পানের কায়দাটাই বড়। নিলয় কি আজ মদ খেয়ে ফিরবে? হয়ত তাই। তুলি ভাবল আবার ও কি শেষ পর্যন্ত মিসেস রাউতের ওখানেই গেল? ও যদি সেখানে গিয়ে থাকে, তবে ওর চোখ দেখলেই টের পাবে তুলি। ও যে ওর ভীষণ চেনা। হা হা করে হেসে উঠল তুলি। বারিদ অবাক, ও জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল। তুলি বলল, নাহ্, হোপলেস। তুই কোন কাজের না। বারিদ বলল, বেশ তো শেয়ার কর।—তুলি বলল, যদি হেরে যাস?—চুরুটের ধোঁওয়া গিলল বারিদ। বলল, এত দূর! ক্রেডিটটা কার? সাহেবের?—বারিদ নিজেকে দেখিয়ে বলল, না, হতে পারত নায়কের?—কথাগুলো বলেই ও পিট পিট করে একটু হাসল। ও যেন প্রস্তুত হল পরবর্তী আক্রমণের জন্য। কিন্তু তুলি কিছুই বলল না। ও দেখছিল, ওর হাতের চুরুটের আগুন। ওর চোখে চোখ রাখল বারিদ। তুলি একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। ও বুঝতে পারছিল বারিদের দুর্বলতা। ওর একটা হাতের ওপর বারিদের হাত। বারিদের হাতটা বেশ কাঁপছে। হাত সরিয়ে নিল তুলি। ভাবল, কি লাভ? দেশলাইয়ের বাক্সটা এলোমেলো নাড়তে নাড়তে হঠাৎ একটা কাঠি বার করল ও। ফস্ করে ও একটা কাঠি জ্বেলে ফেলল। কাঠিটা পুড়ছে। তুলি তাকিয়ে থাকল। তারপর খানিকটা পুড়ে যাবার পর ও ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। বারিদ বলল, ভয় পেলি? তুলি বলল, না।—বারিদ বলল, তবে?—তুলি বলল, দেখতে ভাল লাগছিল না আগুন।—বারিদ বলল, তাই বলে কি আধপোড়া ভাল?—তুলি অনমনস্ক। বারিদের চোখ স্থির, গম্ভীর।

বারিদ চলে গেছে। তুলি দরজা বন্ধ করতে এসে ব্যালকনিতে দাঁড়াল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে তেমনি। বাইরে বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার। শালবনের মধ্যে দিয়ে হুইসেল বাজিয়ে চলে গেল কোন এক এক্সপ্রেস ট্রেন। ফ্যাকটরীর আগুন উঠছে দূরের আকাশে। ফসফরাসের মতন কি যেন জ্বলছে। বাতাসে এখনও ভাসছে ভ্যাট সিক্সটি নাইনের সঙ্গে মেশানো অ্যালকাজার চুরুটের গন্ধ। ধোঁওয়া। তুলির ভাবতে ভাল লাগছে এই মুহূর্তে বারিদের মুখের গন্ধটা। যদিও সে এখন অনেক দূরে। শুধু তার গামবুটের আওয়াজ আসছে ছপ্ ছপ্ ছপ্।

পাখির বাসা

গোপা সেন

চড়ুই পাখি দুটো ক্রমাগত খড়কুটো নিয়ে আসছে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি ; তবু পাশের ঘর থেকে দেখতে পাই। ক'দিন ধরে ওদের কাজের তাড়া যেন বেড়েছে। কখনো দুটো পাখি একসঙ্গে আসছে, কখনো বা এক এক করে। কখনো খড়, কখনো দড়ির টুক্‌রো, কখনো বা শুকনো পাতা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে আসে। আবার হঠাৎ কখনো পাশের ঘর থেকে আমার ঘরে এসে যে কোনো সুবিধাজনক জায়গায় বসে ওরা আলাপ জুড়ে দেয়। ওদের কিচির মিচির ভাষা বুঝিনে, কিন্তু বেশ অনুমান করতে পারি বাসা তৈরি নিয়ে ওরা আলাপ করছে।

কাজের আমার অন্ত নেই। তবু মাঝে মাঝে চোখ তুলে ওদের ব্যস্ততা দেখতে মন্দ লাগে না। কখনো বা কাজ ভুলে ওদের ঘর বাঁধবার এই ব্যস্ততার দিকে চেয়ে থাকি। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে ওরা কিছু স্বপ্ন দিয়ে যায়।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পাখি দুটোর ছুটি নেই। সারাদিন নিজেদের ঘর বাঁধতে আমার ঘর আবর্জনায় ভরে দেয়। রোজ বিকেলে শ্রান্ত হয়ে ফিরে ঘরদোর পরিষ্কার করতে বিরক্তি বোধ হয়। সকালে পাখি দুটো সম্বন্ধে যে কৌতূহল থাকে বিকেলে তার কিছুই অবশেষ থাকে না।

আজ ছুটির দিন। ভাবছি বইয়ের তাকগুলি গোছাব কিন্তু পাখির বাসাটা না সরালে বইপত্র, ঘরদোর কিছুই পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না। একটা টেবিল এনে দেয়ালে গাঁথা তাকের সামনে রাখলাম। নিচে থেকে তিনটে তাক গোছানো হয়ে গেল। বেশ কিছু খড়কুটো ঝেড়ে ফেলতে হলো, কিন্তু বাসা কোথায়?

এবার টেবিলের উপরে উঠে দাঁড়ালাম। সবচেয়ে উপরের তাকটা বাকী আছে। কয়েকটা বই ধরে টানতেই বইয়ের পেছন থেকে একটা পাখি হঠাৎ আমার কানের পাশ দিয়ে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। অন্য পাখিটা যে এতক্ষণ জানালায় বসে প্রাণপণে চীৎকার করছিল খেয়াল করিনি। এবার দুটোতে একসঙ্গে চীৎকার শুরু করে দিল। বিরক্ত হই, হাসিও পায় ;আমার ঘরদোর অপরিষ্কার করবে, অথচ ওদের ঘর ভাঙছি বলে এমন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ! তাড়া দিতে উড়ে পালালো ; তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে এলো। কিচিরমিচির করে প্রতিবাদ করতে লাগলো, যেন ধিক্কার দিতে লাগলো আমাকে।

আস্তে আস্তে হাত টেনে আনছি। কিছু খড়কুটো জড়ো করা কি যেন লাগছে। একটা নরম উত্তাপ হাতে লাগলো। পাখি দুটো তারস্বরে চীৎকার করছে। খড়কুটো দিয়ে তৈরি বাটির মতো বাসাটা। সুন্দর বুনানি। ভিতরে পাতার কোমল আস্তরণ। তারই উপর রয়েছে সঞ্চিত শ্বেত স্নেহ কণিকা। তিনটে ডিম।

পাখি দুটো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। জানালায়, দরজায় কখনো আমার দাঁড়িয়ে থাকা টেবিলের উপরে এসে বসছে।

আর চীৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় মা যেমন কাঁদে, তেমনি। টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছি, হাতে পাখির বাসা, তাতে তিনটে শাদা ডিম। তিনটি প্রাণের জমাট শ্বেত ফসল। এই বাসা বাঁধবার প্রেরণা এবং বাসা ভাঙবার আশঙ্কায় পাখি দুটোর অবিরাম চীৎকার আমার মনের কোন গোপন তারে ঘা দিল কে জানে!

পাখির চীৎকার ছাপিয়ে সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ পায়ের শব্দ কানে এলো। এতক্ষণে খেলা শেষ করে দুষ্টু দুটো উপরে আসছে। বট্টা আবৃত্তি করছে চেঁচিয়ে—'বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে—'

শুনতে পাচ্ছি ছোটু উঁচু গলায় বলছে, 'তোর বলা ঠিক হচ্ছে না, দাদা!"

—'তুই খুব জানিস্! বল্ দেখি সবটা।'

এখান থেকেই বুঝতে পারছি দু'ভাইয়ে একটা মারামারি শুরু হলো বলে। যা ভাবা তাই। কাঁদতে কাঁদতে ছোটু এগিয়ে আসছে ঃ 'মা, ও মা দাদা আমাকে মেরেছে।'

ধমকে উঠলাম, 'একটু কাজ করতে দিবিনে! কেবল দুষ্টুমি আর মারামারি, সৌমিত্র যে ওদের একটু দেখবে ছুটির দিনে তাও নয়।'

ছুটির দিনে তাড়া নেই। পাশের ঘরে বিছানায় বসে নিশ্চিন্ত মনে সৌমিত্র কাগজ পড়ছে। সামনে চায়ের কাপ, হাতে সিগারেট। চা আর সিগারেট দুটোতেই বড় নেশা তার। আজ ছুটির দিন, এই নিয়ে তিন প্রস্থ চা হলো। একটু আগে চা দিতে গিয়ে রাগ করেছি। সৌমিত্র তার জবাবে হাসে, বলে, 'ছুটির দিনে বেশী চা না হলে আমার ছুটিই মনে হয় না।' এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। কত কাজ বাকি, কিন্তু ওকে কে বোঝাবে। এ ঘর থেকেই সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি, আর চায়ের কাপ মাঝে মাঝে পিরিচে রাখার শব্দ শুনতে পাই।

একটা পাখি বেপরোয়া হয়ে হাতে ঠোকর মারল। সম্বিৎ ফিরে এলো! কোথায় সৌমিত্র, বট্টা আর ছোটু? কার সঙ্গে কথা বললাম? সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মাঝের দরজা দিয়ে ও ঘরে তাকিয়ে চোখে পড়ল কুমারীর সংকীর্ণ শয্যার উপর বিবর্ণ আবরণীটা করুণভাবে পড়ে আছে।

বাসাটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলাম। ভারী ইচ্ছে করছিল ডিমগুলোর উপর একটু হাত বুলিয়ে দিই। কিন্তু লোভ সংবরণ করতে হলো। মানুষের ছোঁয়া লাগলে নাকি ডিম ফোটে না। আমি বাধা দেব না, খোলসে বন্দী আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সার্থক হোক।

বইয়ের পেছনে বাসাটা রাখতে গিয়ে হাতে কি যেন ঠেকল। চেনা চেনা মনে হলো। টেনে আনলাম। ধুলোয় বিবর্ণ এক তাড়া চিঠি কালো রবারের তাগা দিয়ে বাঁধা। সৌমিত্রর চিঠি। এই চিঠিগুলি আমাকে সৌমিত্র, বট্টা আর ছোটুর স্বপ্ন দিয়েছে। সেই স্বপ্ন আমি পালন করেছি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় কতবার পড়েছি। বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। চিঠিতে আঁকা ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছি। কয়েক বছর হলো চিঠিগুলি আর খুলি না। সব আশা বিদায় নিয়েছে। এক বাণ্ডিল ডানাভাঙা, রংচটা মৃত স্বপ্নের মতো চিঠিগুলিকে চোখের আড়ালে সরিয়ে রেখেছি।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। আজ এতদিন পরে চিঠিগুলি একে একে খুলতে লাগলাম। এক বিস্মৃতপ্রায় জগৎ আবার যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। আমাদের এমন পয়সা ছিল না যে রেস্তোরাঁ কাফেতে নিরিবিলি এক কোণে বসে কথা বলব। পরিবারের কঠোর সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়েছি। তাই সৌমিত্রকে নিয়ে ময়দানে বা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসবার সাহস ছিল না। তবু কি করে জানি না ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু আলাপের মধ্য দিয়েই দুজনের মন বড় কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

উপায়টা বের করেছিল সৌমিত্রই। চিঠির টুকরো কখনো করিডোর দিয়ে যেতে যেতে হাতে গুঁজে দিত, কখনো বা বই খাতার মধ্যে রেখে দিত। পড়তে ভালো লাগত খুব। কোনো দিন চিঠি না পেলে সব যেন বিস্বাদ ঠেকত। আমিও লিখতাম, তবে ওর তুলনায় অনেক কম।

ক্রমশ চিঠির আকার বাড়তে লাগল, আর সেই সঙ্গে বিষয়ের পরিধি। কলেজের বাইরে ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা। এক চিঠিতে ও জানালো আমাদের বিয়ের কথা। আমি লিখলাম, সে কি করে হয়? তুমি জানো না, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়ো?

উত্তর পেলাম পরদিনই। এই তো সেই চিঠি। তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫। লিখেছে : উর্মিলা, তুমি আমাকে হাসালে! ভালোবাসার সার্থকতার পথে সমাজের বাধা, দারিদ্র্য রোগ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা অন্তরায় হতে পারে মানি। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কবি, কোনো ঔপন্যাসিক বয়সকে ভালোবাসা সফল হবার পথে বাধা বলে দেখেননি। শুনিনি কখনো এমন কথা। নিজের অজান্তে যখন তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম তখন বয়সের হিসেব নেবার কথা তো মনে ওঠেনি। তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে আমার চাই। ভুলে যাও বয়স, ভুলে যাও আর সব।

কী যে ভালো লেগেছিল!

প্রায়ই লিখত সৌমিত্র, তোমাকে কিন্তু আমার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। একটা ভালো চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না আমাদের।

কেন? আমি প্রশ্ন করতাম। আমিও তো স্কুলে ছোটোখাটো একটা কাজ নিতে পারি। দু'জনের আয়ে চলে যবে মোটামুটি।

ওর চিঠি যেন চীৎকার করে উঠত, 'না, না, তা হয় না। উর্মি, তুমি বাইরে চাকরি করলে ঘরে আমার ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাবে, সে আমার সইবে না। আমার ঘরে সারাক্ষণ তোমার হৃদয়ের পূর্ণ উত্তাপ চাই।'

মুগ্ধ হয়েছি আমি। কদম ফুলের মতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি। তখন বয়সের বাধা, আর সব বাধা অবান্তর হয়ে যেত। আর তখন থেকেই সৌমিত্রকে দেখে আসছি গৃহকর্তা হিসেবে ; একে একে কোলে পেয়েছি বড়কে আর ছোটুকে। তারপর তারা কোল থেকে নেমে এঘরে-ওঘরে, রকে-সিঁড়িতে দৌড়ঝাঁপ করেছে। মনের নিভৃত কোণে তাদের আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না।

দু'জনেই বি-এ পাশ করলাম। সৌমিত্র গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে। ওকে বড় হতে হবে। আমার আর পড়া হলো না। বাবা সামান্য বেতন পেতেন। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর আয়ের পথ আরো সংকীর্ণ হলো। সংসার চালানোই কঠিন ; আরও পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সংকট তীব্র হলো কয়েক মাস পরে, বাবা যখন চলে গেলেন সামান্য রোগে ভুগে। অকস্মাৎ মা আর ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব এসে পড়ল আমার উপর। ভালো একটা চাকরি খুঁজে দেখবার সময় ছিল না। প্রথম যেটা পাওয়া গেল তাই নিতে হলো। দূর পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের জুনিয়ার হাইস্কুলে হেড্ মিস্ট্রেসের পদ।

কলকাতা আর সৌমিত্রকে ছেড়ে চলে এলাম অচেনা নির্বান্ধব পরিবেশে। সৌমিত্রর চিঠি আসত মাঝে মাঝে। লিখত একই কথা ঃ কয়েকদিন ধৈর্য ধরে কষ্ট করো। একটা ভালো কাজ জুটিয়েই তোমাকে ঘরে নিয়ে আসব। সেদিনকার অন্ধকার জীবনে এই চিঠিগুলিই ছিল আমার আলোকস্তম্ভ।

চালের আড়তদার রামবিলাস সর্দার স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। একদিন ডাক এলো তাঁর বাড়ী থেকে। একটা চিঠি তুলে ধরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সৌমিত্র কে?

সৌমিত্র আমার কে? পৃথিবীর কোনো মহাকাব্য গীতিকাব্য গল্প-উপন্যাস যে কথা বলতে পারেনি তা আমি এই কুৎসিৎ দর্শন বাঁকা চাউনির লোকটিকে কি করে বোঝাব? শুধু ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, আপনি আমার চিঠি খুলেছেন?

নির্লজ্জ হাসি দিয়ে আমাকে লেহন করে বললেন, আমি স্কুলের কর্তা। ছাত্রীদের নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়।

সৌমিত্রকে লিখলাম, এখানে আর চিঠি দিও না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আছে। স্কুলের কাজে যখন কলকাতা যাব তখন তাদের কাছ থেকে তোমার খবর নেব। সময় থাকলে তোমাদের বাড়ী গিয়ে দেখা করব।

এই অসহ্য পরিবেশ থেকে সরে যাবার একটা সুযোগ এসে গেল। আরও দূর মফঃস্বলে চলে গেলাম নতুন একটা চাকরি পেয়ে। হয়তো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এই আশঙ্কায় সৌমিত্রকে নতুন ঠিকানা জানালাম না। কিন্তু কলকাতা গেলেই দেখা করতাম। অবশ্য বছরে দু'তিনবারের বেশী নয়। একবার গিয়ে শুনলাম, চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে গেছে সৌমিত্র। বড় চাকরি কিছু নয়, কিন্তু কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। আর সেই আশায় সে ফাইলের কবরে নিজেকে সমাহিত করেছে। ছুটি নিয়ে এদিকে আসেও না অনেকদিন।

আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। সৌমিত্রর এই সাধনা তো আমার জন্যই। আমাকে যোগ্য মর্যাদায় ঘরে নেবে বলে।

কোথা দিয়ে যে বারো-তেরো বছর পার হয়ে গেল হিসেব করিনি।

বয়সের হিসেব করতে সৌমিত্রই নিষেধ করেছে। ভালোবাসার যে স্থিরবিন্দু সৌমিত্র রচনা করেছে, তাকে কেন্দ্র করেই দিন আর বছর কেটে গেল। মনে হয়নি বয়স বাড়ছে, যৌবনের শেষ প্রান্তও উত্তীর্ণ হতে চলেছি। সৌমিত্র শিখিয়েছে ভালোবাসার কাছে এসব প্রশ্ন অবান্তর।

এদিকে এতদিনে ভাই পাশ করে একটা চাকরি জুটিয়েছে বাংলার বাইরে। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা বলে মাকে নিয়ে যাবে। হাওড়া স্টেশনে ওদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে কালীঘাটের ট্রামে উঠে বসলাম। শুনেছি সৌমিত্র অল্পদিন হলো, কলকাতার আপিসে বদলি হয়ে এসেছে। আজ যাব তার কাছে। বলব, এবার আমাকে নাও। আর কতকাল!

হাজরা পার্কের স্টপে নামলাম। এখান থেকে এক নম্বর বাস ধরতে হবে। দুপুর গড়াতে শুরু করেছে, কিন্তু তখনো বিকেল হয়নি। তেমন ভীড় নেই। বাস স্টপে এসে দাঁড়াতেই কে ডাকল, উর্মিলাদি না?

ফিরে তাকিয়ে চিনতে কষ্ট হলো না। অনুভা। সৌমিত্রর বোন। বিয়ে হবার পর বেশ ভারিক্কি চেহারা হয়েছে। কপালে বেশ বড় আকারের একটা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ফোঁটা।

অনুভা বলে চলেছে, এক ট্রামেই এলাম ধর্মতলা থেকে। তোমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল বলে ডাকতে সাহস করিনি। কি বিশ্রী চেহারা করেছ। পুকুরের জলে চান করে করে একেবারে কালো হয়ে গেছ। চিনলাম চিবুকের তিল আর মাথার চুল দেখে। তোমার চুল কিন্তু তেমনি আছে।

অনুভার চোখের আয়নায় নিজেকে যেন নতুন করে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে বলে চলেছে ঃ তাহলে বিয়ে আর করলে না। বয়স তো পার হয়ে গেছে, চেহারাটিও যা করেছ! জানো, দাদা তোমার খোঁজ করছিল। পুরনো ঠিকানায় চিঠি দিয়ে নাকি উত্তর পায়নি। চলো না এখনি আমার সঙ্গে। আমি দাদার বাড়ীই যাচ্ছি। একটু পরেই দাদা আপিস থেকে আসবে। জানো, উর্মিলাদি, দিল্লী থেকে দাদার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, রঙ হয়েছে ফর্সা। বয়সের ছাপ পড়েনি।—আর জানো, ঘনিষ্ঠ হয়ে অনুভা বলল, কলকাতা আপিসের কর্তা দাদার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চান। এই তো রবিবার আমরা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। সুন্দরী, ফর্সা—আমাদের তো সবার খুব পছন্দ। দাদা এখনো কিছু বলছে না। আজ আমরা সবাই যাচ্ছি দাদার কাছ থেকে কথা আদায় করব। সুন্দরী বউ আর চাকরিতে উন্নতির আশা একসঙ্গে কোথায় পাবে।

আমার পনেরো বছরের স্বপ্নের প্রাসাদ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। পড়ে যাবো নাকি? বাঁচোয়া, তখনই এসে থামল তেত্রিশ নম্বরের দোতলা বাস। ছুটে উঠে পড়লাম। অনুভা হাঁক দিল। তুমি যাবে না আমার সঙ্গে? ঐ তো এক নম্বর এসে গেছে।

ডেকে বললাম, যাবো একদিন। হয়তো কাল।

না, সৌমিত্র, তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি।

সেদিন যৌবনের মোহ ছিল আমার মধ্যে ;তাই তুমি সহজেই বয়সের হিসেব ভুলতে পেরেছ। কিন্তু আজ তোমার সামনে দাঁড়ালে অনুভার দৃষ্টি দিয়ে যদি আমাকে দেখ, যদি সেদিনের ভালোবাসা করুণায় রূপান্তরিত হয়, তুমি যদি তারপর বয়সের হিসেব করতে বসো, তাহলে আমি তা সইবো কেমন করে? আর সত্যি করে বলতে গেলে আমি কোনো জোর পাচ্ছি না। কি দেব তোমাকে? তোমার পূর্ণ যৌবন ;আমি যৌবন উত্তীর্ণা এক নারী।

তোমার সন্তানের মা হবার সময়ও বোধ হয় আর নেই। তার চেয়ে কলেজ জীবনে তোমার মুগ্ধ চোখে আমার যে ছবি ফুটে উঠতে দেখেছি তা অক্ষয় হয়ে থাক তোমার মনে। এই জীবনের হার-জিতের খেলায় ঐটুকুই শুধু জমা হোক আমার সঞ্চয়ের ঘরে। কি প্রসঙ্গে আজ মনে নেই ; তুমি বলেছিলে, গোলাপ ফুলও একদিন শুকিয়ে যায় ; জুতোর চাপে গুঁড়ো হয়ে যায়। পদদলিত শুকনো গোলাপ হতে চাই না আমি। তার চেয়ে তোমার কল্পনায় যেন সদ্য ফোটা বুনো ফুল হয়ে বেঁচে থাকি চিরদিন।

তোমার চোখে তুচ্ছ হয়ে যাবার আশঙ্কায় তোমার সামনে যেতে পারিনি। তোমাকে অভিযোগ করছি না ; তোমার কোনো দোষ নেই। নিজের দুর্বলতার জন্য পালিয়ে এসেছি বিহারের এই ছোট শহরে। একদিন তুমি যে স্বপ্নাঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিলে চোখে তা এখনো একেবারে মুছে যায়নি। আমার জীবনে সে স্বপ্ন ব্যর্থ হলেও তোমার জীবনে সত্য হয়েছে। ছুটির দিনে নিশ্চয়ই তুমি খবরের কাগজ, চা আর সিগারেট নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাটিয়ে দাও। বারবার চা দিতে এসে আর কেউ হয়তো তিরস্কার করে যায়। বট্টা আর ছোটু তোমার ঘরে দাপাদাপি করছে দেখতে পাই। এই ছবির মধ্যে আমি কোথাও নেই। আছে আর একজন। ফর্সা, সুন্দরী, যৌবনবতী। তাকে যখন আদর করে কাছে টেনে নাও তখন কি হঠাৎ কোনোদিন মনের আকাশে একটি শ্যামলা মেয়ের মুখ ভেসে ওঠে? যে মুখে বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় দুটি চোখ টলমল করত? আর মনে পড়ে কি মুহূর্তের জন্যও আন্‌মনা হয়ে পড়ো না?

সব আশা তো গেছে। শুধু এইটুকু কল্পনা বিলাস নিয়ে দিন কাটে। হয়তো কখনো কখনো তোমার মধ্যে আমি বেঁচে উঠি। এই আশাই আমার বাঁচবার অবলম্বন।

ঝি এসে দু'বার তাগিদ দিয়ে গেছে। উনুন জ্বলে যাচ্ছে, রান্না চড়াতে হবে। চিঠিগুলি ভাঁজ করে আবার কালো তাগা দিয়ে বেঁধে পাখির বাসার পাশে রেখে দিলাম। এবার পাখি দুটো ভয় পেয়ে উড়ে পালালো না। বোধ হয় আশ্বাস পেয়েছে। কিংবা, কে জানে, আমি ঘর বাঁধতে পারিনি বলে ওরা আমাকে করুণা করছে।

ডিম আমি ছুঁইনি। তা পেয়ে পেয়ে একদিন ছানা বেরুবে, তারপর তিন ভাইবোন নীল আকাশে উড়ে যাবে। আমিও তো দীর্ঘ পনেরো বছর তা দিয়েছি আমার স্বপ্নের কোরকে। আমার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া লেগে তা আর ফুটলো না। ফুটবে না কোনদিন।

লালীর যাওয়া হয় না

তৃপ্তি বসু

মুন্সীরামের দোকান থেকে এক ঠোঙা জিলিপী হাতে এসে দাঁড়াল শান্তি। জোর করে গুঁজে দিল একখানা বৌদির মুখে। ভাইঝির হাতেও দিল দু'টো। তারপর লাজুক চোখে একবার লালীর দিকে তাকিয়েই ঠোঙা হাতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। মনে মনে হাসল লালী। ঘরে ওর নন্‌দাই রয়েছে, শান্তির স্বামী। লোকটা গরম গরম জিলিপী খেতে ভালবাসে খুব তাই।

বেশ আছে ওরা, লালী ভাবল। নন্‌দাই অনেক রোজগার করছে লখিমপুর খেরীর রাজবাড়িতে। বাঁধা মাইনে ছাড়াও এদিক ওদিকের ছড়ানো ছিটোনো পয়সা ত আছেই আর আছে রাজাবাবু আর রাণীমাদের কারণে অকারণে বখ্‌শিস্। গতবারে এসেছিল শান্তি হাতের কড়া গড়িয়েছিল, এবার এসেছে সোনার হাঁসুলী গলায় দিয়ে। মানুষের মাথায় বুদ্ধি না থাকলে আর রইল কি? জীবনভর শুধু বোকামি করেই গেল লোকটা···নিজের মরে যাওয়া স্বামীকে স্মরণ করল লালী। রাজবাড়ীর ওই কাজটা লালীর বাবাই ঠিক করেছিল জামাইয়ের জন্যে। কিন্তু গোঁয়ার লোকটা কোনমতেই রাজী হল না বাড়ী ছেড়ে বিদেশে বেরতে। তার সেই এক কথা—

'থালি ফুটী তো আড়িআব্ খাওয়ব্
গোঁড়া ছোড়কে কাঁহী ন যাওয়ব্।।'

থালা ফুটো হয়েছে তা'তে কি? মাটিতে ঢেলে খাব তবু বাপপিতামহর ভিটে এই গোণ্ডা জেলা ছেড়ে এক পা'ও নড়ব না। বোকা না হলে আর এমন হয়?

এক এক করে সব কথাই মনে পড়ছে। এবার শান্তিদের দেখার পর থেকেই যেন থেকে থেকে মনে পড়ছে নতুন করে। ওদের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে তখন। জাতে ওরা 'বারি'। বন থেকে শালপাতা কুড়িয়ে এনে ছোট ছোট বাটির মত 'দোনা' আর এক একখানা পাতা কাঠি দিয়ে জুড়ে জুড়ে বড় বড় গোল থালার মত 'পাত্তল' বিক্রী করাই ওদের জাতব্যবসা। সে ব্যবসায় তখন মন্দা চলছে। এমনিতেই বর্ষার সময়টা মন্দা চলে, কাজ-কারবার বন্ধ থাকে, কিন্তু এ তা নয়। নতুন নিয়মে সরকার বন কেটে সাফ্ করে কোন কোন অঞ্চলে শুরু করেছে আখের চাষ। তাই চট্ করে অন্য কোন রুজি-রোজগারের উপায় না পেয়ে প্রায়দিনই তখন হয় আধপেটা খেতে হচ্ছে নয় উপোসী থাকতে হচ্ছে শান্তিদের। আর তাই ভাই যখন কাজটা নিল না তখন শান্তি অনুরোধ করেছিল লালীকে ওটা যাতে হাতছাড়া না হয়। লালীর বাপের সুপারিশে নন্‌দাইয়ের চাক্‌রি হয়ে গেছল রাজবাড়িতে।···আজ সেই শান্তি গড়াচ্ছে সোনার হাঁসুলী, আর নিজের এবং ছেলেমেয়ে দু'টোর পেটের খোরাক যোগাড় করে চলেছে লালী বাড়ী বাড়ী এঁটো বাসন মেজে! বেঅকুফ্ আর কাকে বলে! আর একবার স্বামীকে স্মরণ করল।

চোখের সামনে ননদ্ আর নন্‌দাইয়ের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা দেখতে দেখতে এক এক সময় ক্ষোভ আর ঈর্ষার অন্ত থাকে না লালীর, ঠিকই, তবু এবার ওরা আসার পর

থেকে সবচেয়ে যা তাকে বিড়ম্বিত করে তুলেছে তা হোল রাতের নিশ্ছিদ্র প্রহরগুলো। শুধু বিড়ম্বিত নয়, আজকাল এ অন্ধকারকে রীতিমত ভয় করতে শুরু করেছে সে। আশ্চর্য, আজও যে এ অনুভূতি বেঁচে আছে ভেতরে ভেতরে তার কোন হদিস পায়নি এতদিন, কিংবা পেলেও গ্রাহ্য করেনি। অথচ আজ, এই শান্তিরা আসার পর থেকেই সে অনুভূতি এমন প্রত্যক্ষভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে গ্রাহ্য না করেও আর যেন উপায় নেই।

পাঁচ ছটা ছেঁড়া, ফুটো বস্তা পর পর জোড়া দিয়ে ওই ছোট্ট কুঠরীতে আড়াল দিয়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়েছে ননদ আর নন্দাইয়ের। কিন্তু ছেঁড়া বস্তা ত আর ইঁট সুরকীর কঠিন আড়াল নয়! ওদিকের ঘনিষ্ঠ দু'টি মানুষের ফিসফিসানি। ছেঁড়া বস্তার এপাশে ছটপট করে, শরীরে আগুন জ্বলে লালীর। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারে না।

বস্তার ওপাশে ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে, মনে পড়ে সেই মানুষটার রাতের আনন্দের মুহূর্তগুলো। কতদিনের কত স্মৃতি। আবার বাস্তব হয়ে ধরা দিতে চায় লালীর দেহে মনে।

এক এক সময় নিজের অসংযমে নিজের ওপর রাগ হয়, কখনো বা ছেলেমেয়ে দু'টোর ওপর। ও দু'টো না থাকলে···না থাকলে···ঠিক, ওদের জন্যেই কোন কিছু করে উঠতে পারেনি লালী। আবার ঘর বসাতে পারেনি অন্য কারও সঙ্গে। নইলে ওদের বাপ মরে যাবার পর ত তিন চারজন একই সঙ্গে ঘুরেছে পেছনে পেছনে। বস্তিতে যে দু'চারজনের সঙ্গে মনের কথা হয়, তারাও পরামর্শ দিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদেরই কাউকে নিয়ে নতুন করে আবার সংসার পাততে। নইলে জোয়ান বয়সের সুস্থ সমর্থ মেয়েছেলের বেশীদিন ঠিক থাকা মুস্কিল। আর ঠিক থাকতে না পারলেই কেলেঙ্কারি। তাছাড়া ব্যাটাছেলের দরকারও ত হয় ঘর-সংসারে। ওই অপোগণ্ড দু'টোর কথা চিন্তা করে লালী সব প্রস্তাব, অনুরোধ, উপরোধ শক্ত মনে নাকচ করে দিয়েছে। আবার বিয়ে করলে ও দু'টোকে দেখবে কে? ওরা যে নিতান্ত নাবালক, নেহাৎই বেঅকুফ্। অবহেলায় অনাদরে হয়ত মরে যাবে। সে চিন্তায় শিউরে ওঠে লালী। যাট্ যাট্, অমন কথা ভাবতে নেই।

প্রত্যাখ্যান আর সবাই মেনে নিলেও সেই লোকটা আজও হাল ছাড়ে নি। শেষবেশ একদিন বলেও ছিল—

মহাবীরজীর কসম, তোর ও বাচ্চা দু'টোর ভার আমিই নেব, তুই আমার ঘরে আয়।

চমকে উঠেছিল লালী। বলে কি এ! মুহূর্তের জন্যে কেমন এক আনন্দের শিহরণও জেগেছিল। পরক্ষণেই বিদ্রূপের হাসিতে বেঁকে গিয়েছিল ঠোঁটের কোণ। হুঁ এসব চালাকি বুঝতে দেরী হয় না লালীর। অনেক দেখেছে, অনেক অনেক শুনেছে এমন গপ্পো। এইসব মিঠে মিঠে বুলি দিয়ে মন ভুলিয়ে লালীর ইজ্জতটুকু নিতেই যা দেরী, তারপর বাচ্চা দু'টোকে দেবে খেদিয়ে। কত ঘটনা ত ঘটল এমন চোখের সামনে। ওদিকে লালীও তখন লোকটার সঙ্গে ঘর করবে নিরুপায় হয়ে। পঞ্চায়েত ঘাড়ে ধরে তারই ঘর করাবে

আবার যতদিন না ছাড় হয়ে যায়। বার বার ছাড় হওয়া মেয়েকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। ও ফাঁদে তাই আর পা দেয়নি লালী।

কিন্তু লোকটা কেমন যেন না-ছোড়বান্দা। কয়েকমাস আগের ব্যাপারটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কাজে যেতে সেদিন বেশ দেরী হয়ে গেছল। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছিল সরু গলিটার ভেতর দিয়ে এমন সময় আচমকা আটকা পড়ল দুই বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিল লালী। এক মুহূর্ত স্থির থেকে জোরে একটা ঝটকা দিয়ে মুক্ত করে নিল নিজেকে। জড়িয়ে যে ধরেছিল সেও ছিটকে গিয়ে সরে দাঁড়াল, তারপর নিঃশব্দে হাসতে লাগল দাঁত বার করে। ততক্ষণে অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তার দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠল লালী··· সেই লোকটা! সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা একখানা আধভাঙা থান ইঁট তুলে সজোরে ছুঁড়ে মারল তার দিকে। নিমেষে মাথা নিচু করে লোকটা বসে না পড়লে সেই দিনই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হতো সেইখানে।

ওই ব্যাপারের পর বেশ কিছুদিন তার দেখা পাওয়া যায়নি। হয়ত ছিল না এ শহরে নয়ত থাকলেও সামনে আসেনি। আবার কয়েকদিন হল চলতে ফিরতে যেন হালকাভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার ছায়া। আবছা ভাবে অনুভব করছে অস্তিত্ব।

আজকাল বস্তির ওধারের ফিস্‌ফিসানি শুনতে শুনতে যখন কান মাথা গরম হয়ে ওঠে লালীর, শরীরটা টান টান তখন, ঠিক তখনই আচমকা মনে পড়ে যায় লোকটাকে। না ঠিক লোকটাকে নয়, লোকটার সেই দৃঢ় দুই বাহুর স্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে। মন বলে ক্ষতি কি? এমন ত কতই হয়, সত্যিই যে তার সঙ্গে এক খাটিয়ায় শোয়ার পরই ছেলেমেয়ে দু'টোর কথা ভাববে না লোকটা এমন ত নাও হতে পারে। কিন্তু··· রাত আর কাটতে চায় না। রাগ ধরে ননদ, ননদাইয়ের ওপর। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে যেন মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছে! দশদিনেও নড়বার নাম নেই।

আক্কেল নেই, বিবেচনা নেই, একটু বুঝ সমুঝও নেই তোদের? দু'বছর হল ভাই মরেছে, বিধবা ভাইবৌয়ের এক চিলতে ঘরের আধখানা জুড়ে রেখে কদ্দিন আর মৌজ করা চলতে পারে সে জ্ঞানগম্যিও নেই? আজও জিলিপীর ঠোঙা হাতে ননদকে সলজ্জভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথমটা হাসি পেলেও তখুনি আবার ওই কথাগুলোই মনে পড়ে গেছল। তাই হাসির পরই মনে মনে বলল, মরণ, এত বয়সেও বরের সঙ্গে ঢলানি করতে সাধ যায়! নির্লজ্জ বেহায়া।

মুখের ভেতর মিষ্টি স্বাদও কেমন তেতো হয়ে ওঠে। থু থু করে জিলিপীর টুক্‌রো সমেত এদিক ওদিক খানিকটা থুতু ছিটিয়ে ফেলল।

মাসখানেক পরের এক সন্ধ্যায় মেয়ে মুন্নী বলল, তুই কি সাবান মেখে চান করেছিস মা? ভারী সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে তোর গা দিয়ে।

খুশী খুশী মুখে এগিয়ে গিয়ে মায়ের কাছ ঘেঁযে নাক কুঁচকে ভাল করে শুঁকতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে চমকে উঠল। চমকে উঠল বাচ্চা ছেলেটাও।

সাবান মেখেছি, বেশ করেছি। তোদের কি? তোদের বাপের পয়সায় ত আর মাখিনি! লালার বৌকে বললাম, শরীরে বড় মাটি পড়েছে, গা ধোয়া সাবানের টুকরো টাক্‌রা পড়ে থাকলে দিও ত, চেয়েচিন্তে এনে আমি যদি মেখেই থাকি একদিন তাও তোদের সয় না? শত্তুর, শত্তুর, দু' দু'টো শত্তুর এসে জুটেছে পেটে। বাপটাও ত কম শত্তুর ছিল না। এই জোয়ান বয়সে পাহাড়ের ভার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে আগেভাগে ভেগে পড়েছে। গজ গজ করতে করতে একসময় ছেলেমেয়ের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। নির্বোধ চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে দুই ভাইবোন।

সেইদিনই গভীর রাতে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসে লালী। দিন পনের হল স্বামীকে নিয়ে চলে গেছে শান্তি। ছেলেমেয়ে দু'টো ঘুমে। সতর্ক হাতে নিঃশব্দে জ্বাললো মাথার কাছে রাখা কুপিটা। কুলুঙ্গী থেকে নামিয়ে নিল দাঁড়াভাঙা চিরুণী, ছোট্ট আর্শী, নারকেল তেলের শিশি। আস্তে আস্তে সারা মাথায় চুপচুপে তেল মাখল ঘষে ঘষে। সেই তেল হাতটা ভাল করে ঘষে নিল মুখের ওপর। এবার চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খুশী খুশী মুখে টেনেটুনে ভাল করে চুল বেঁধে দুই চোখে মোটা করে টানল কাজলের রেখা। তারপর শব্দ না করে খুলে ফেলল বিয়ের সময় পাওয়া বাক্সটা। একেবারে তলা থেকে বের করল আকাশ-নীল জমি আর চওড়া নক্সাপাড়ের সুন্দর একখানা শাড়ী। পরম মমতায় কিছুক্ষণ হাত বুলল সেখানার ওপর, নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকল।

খাটিয়ার তলায় হাত ঢুকিয়ে পান সুপুরীর টিনের কৌটোটা টেনে আনল। চুণ, খয়ের আর জর্দা দিয়ে এক চিলতে পান ফেলল মুখে। খুব বেশী পান খায় বলে আর সুপুরী মেলায় না সব সময়। আর্শী হাতে নিয়ে পরিতৃপ্ত মনে আর একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখ ভাল করে দেখল। নিচু হয়ে ফুঁ দিয়ে কুপীটা নিভাতে যাওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ চোখদুটো চলে গেল অদূরে ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠে টান টান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লালী। আশ্চর্য, কখন যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসে আছে! সাত পেরনো বোনটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে দু'বছরের ছোট ভাইটাকে। জড়াজড়ি করে বসে বসে বোবা বিস্ময়ে দু'জনেই তাকিয়ে আছে তাদের এই অপরিচিত মায়ের দিকে। মায়ের চোখে চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে আর্তনাদ করে উঠল মুন্নী।

বুঝেছে। এতক্ষণে বুঝেছে সে এত সাজগোজের অর্থ। ক'মাস আগের এক রাতের দৃশ্য এই মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই সন্ধ্যায় রাস্তার ধারের সরু চাতালটায় শুয়ে থাকতে থাকতে কখন একসময় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মুন্নী। রাত যখন নিঝঝুম তখন কি একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল আর সেই ঘুমভাঙা চোখ মেলেই দেখতে পেল কে একজন গা মাথা ঢেকে বস্তি থেকে চুপে চুপে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে।

চিনতে পারল। বলল, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিল শকুন্তলা। তারপর ফিরে মুন্নীকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

ওঃ, তুই?

একটু থেমে আবার বলেছিল,

ময়দানে রামলীলা দেখতে যাচ্ছি…কাউকে বলিস না, বুঝলি?

আচ্ছা—পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগেই রাস্তার আলোয় যা দেখার তা দেখে নিয়েছে মুন্নী। মায়ের মত এমনি করেই সেদিন তেল চুপচুপে মাথায় বিনুনী বেঁধেছিল শকুন্তলা। কপালে দিয়েছিল টিপ, এমনি পুরু করেই কাজল টেনেছিল চোখের কোণে। আর পরনে ছিল এমনিই একখানা জমকালো শাড়ী যা শকুন্তলাকে আগে কখনো পরতে দেখেনি মুন্নী।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙেছিল শকুন্তলার মায়ের চীৎকার আর কান্নায়। সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শকুন্তলাকে। সেই সঙ্গে আরও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শকুন্তলার মায়ের গোপনে জমিয়ে রাখা দেড়শটা টাকা। সেই রাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত আর এ বস্তিতে ফিরে আসেনি শকুন্তলা। তাই দেরীতে হলেও এ তেল, এ কাজলের অর্থ বুঝতে ভুল করেনি মুন্নী। বুঝেছে রাতের আঁধারে এমন করে তেল কাজলে সেজে বস্তি ছেড়ে চুপে চুপে যে বেরিয়ে যায় দিনের আলোয় আর তারা কোনদিন ফিরে আসে না। শকুন্তলার মত মাও আর ফিরবে না তাদের কাছে। সে কথা বোঝামাত্র আর্তনাদ করে উঠেছে মুন্নী। আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়েছে ব্যাকুল মিনতি—

আমাদের ফেলে তুই যাস্ নে মা। তুই চলে গেলে আমাদের রুটি দেবে কে? খাব কি? থাকব কার কাছে? খিদেয় মরে যাব যে মা—।

মলে যাব মা—বাচ্চাটাও সুর তুলল—।

কয়েকমিনিট পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে রইল লালবতী। একসময় ছোট্ট একটু নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু হাসল। মাটির ওপর বসে পড়ে ছেলেমেয়ে দু'টোকে দু'হাত দিয়ে টেনে নিয়ে তাদের মাথায় গাল ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল—পাগল, পাগল রে তোরা। তোদের একা ফেলে রেখে আমি কোথায় যাব?

লালবতীর দু'চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল বাচ্চা দু'টোর মাথার ওপর।

লাগোয়া গল্প

কেয়া চট্টোপাধ্যায়

ঠায় বিকেল থেকে ঘরে বসে আছে অঞ্জুমান। পথ চেয়ে আছে কখন ভিখু আসবে। রোদের তরতরে ঝাঁজ একটু পড়তেই ঘরদোর গুছিয়ে ভাল করে গা ধুয়ে কাচানো ছাপা শাড়ীটা পরে, কপালে কুমকুমের টিপ, চোখে সুর্মা, মাথায় বাস-তেল দিয়ে পাঁচগুছির বিরাট খোঁপা করে অঞ্জুমান বারবার আয়নায় মুখ দেখছে, আর বারবার নিজেই মোহিত হয়েছে। তারপর সেই তখন থেকেই ঠায় বসে আছে।

আধঘণ্টা হয়ে গেল এখনও ভিখুর দেখা নেই। বেশ গরম পড়েছে। ঘোমটাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে আলতো হাতে খোঁপা ঠিক করতে লাগল অঞ্জুমান। হঠাৎ শুনল পায়ের শব্দ। চোখ তুলতেই দেখল ভিখু দরজায় দাঁড়িয়ে। অঞ্জুমান একটা মোহিনী কটাক্ষ হানল। কিন্তু পরমুহূর্তেই দপ করে নিভে গেল তার এতক্ষণের আকুল প্রতীক্ষা। সে বুঝতে পারল তার আর কোনও প্রয়োজন নেই। আজও সেই এক অবস্থা—সেই উদাস দৃষ্টি, শুকনো মুখ, পরিপাটী আঁচড়ানো চুল এলোমেলো। এ ভিখু যেন একজন পরপুরুষ, অঞ্জুমান যাকে চেনে না।

পায়ে পায়ে ঘরে এল ভিখু। টিফিন কৌটা রেখে মাথা গলিয়ে জামা খুলল, তারপর অন্যমনস্কভাবে বলল—'দাও এক মগ পানি দাও।' অঞ্জুমানের কবুতরের মত হাল্কা বুক থরথর করছিল বোবা কান্নায়। কোন মতে দাঁতে দাঁত চেপে জল এনে দিল। চাঁপার কলির মতন আঙ্গুল নিটোল মণিবন্ধ। ধপধপে গোলালো হাতে লাল বেলোয়ারী চুড়িগুলো চেপে বসেছিল। অন্যদিনের মত আজ কিন্তু ভিখু এসব কিছুই দেখল না। হাত বাড়িয়ে মগ নিয়ে এক নিঃশ্বাসে জল খেল। অঞ্জুমান আর দাঁড়ায়নি, রান্নাঘরে গিয়ে নাস্তা সাজাতে লাগল কাঁপা হাতে। ওর চোখ ঝাঁপিয়ে এখন আসছে নোনতা জল। ভিখু চুপচাপ কিছু খেল আর কিছু ফেলল। তারপর আনমনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'দরজা বন্ধ করে রাখ আমি আসছি।' অঞ্জুমান আছড়ে উঠল ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত, ওর বাহারী খোঁপা লুটিয়ে পড়েছিল ঘাড়ের উপর। চোখের জলে সুর্মার শেষ রেখাটি পর্যন্ত ধুয়ে গেছে—সন্ সন্ কান্নায় দুলে উঠছিল ওর তন্বী শরীর। 'কোথায়, কোথায় যাচ্ছ তুমি?' ভিখুর নিষ্ঠুর হৃদয় এসব কিছুই লক্ষ্য করল না। বেরিয়ে যেতে যেতে সে বলল—'সদর রাস্তায় কাকুর দোকানে।' অঞ্জুমান শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে চিৎকার করে উঠল—কেন? হাওয়ায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল শব্দটা। ভিখু চলে গেছে। ছুটে এসে ঠাস করে দরজা বন্ধ করল তারপর সাজানো পরিপাটী খাটে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অঞ্জুমান।

হায় আল্লা! তার একি হল? কেমন করে হল। কী এমন পাপ করেছিল সে যে স্বামীর মন এমন করে ঘুরে গেল। কোন জিন এসে ভর করল ওর ঘাড়ে। অঞ্জুমান আর ভাবতে পারল না। ভিখুর এই তিন দিনের উদাসীন ব্যবহার তার কাছে যেন তিনযুগের নীরবতা বহন করে এনেছিল। সে নানাভাবে খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছে—বুঝতে চেয়েছে এর কারণ। কিন্তু কোনও কূল পায়নি। নিজেকে ভাল করে যাচিয়ে দেখেছে—না কোথাও কোন টান

পড়েনি—বরং আরও ছলকে উঠেছে তার ভরা নদীর মতন—তবে? তবে কি কোনও সন্দেহের কালো ছায়া দুলছে ভিখুর মনে। অঞ্জুমান আল্লার কিরা করে বলতে পারে তার মত পতিব্রতা নারী এ তল্লাটে একজনও নেই। তবে কেন এমন হল। অঞ্জুমানের কান্নার বেগ বাড়ল।

আর কেউ না জানুক। ভিখু তো তাকে জানে ছোটবেলা থেকেই, সে কত অভিমানী—কত আদরের ছিল তার আব্বা-আম্মার। পাঁচটি ভাইএর পর অঞ্জু। সংসারে হাজার অভাব-অনটন, কিন্তু অঞ্জুমানকে তারা ছুঁতে পারে নি। কোনও দুঃখ কোন বিযাদই তার হাসিমুখে ছায়া ফেলতে পারেনি। কারণ গরিবের ঘরে জন্মেও তার ছিল সিনেমার মেয়েদের মত পাকা ধানের সোনালি রং। ডালিমের মত টুকটুকে গাল, চোখ ভুরু সব যেন আল্লার নিপুণ তুলির টান। আর তার স্ফুরিত ঠোঁট দেখলে আব্বা-আম্মা ভাইজানদের চোখের পাতা নড়ত না। গাঁশুদ্ধ লোকে বলত—'ও নিশ্চয়ই কোনও হুরী গো মিয়া মানুষ হয়ে এসেছে।' আব্বাও একথা বিশ্বাস করত। অঞ্জুমান সাদীর যুগ্যি হতে কত জায়গা থেকে লোক এসেছিল কিন্তু আব্বার কাউকে পছন্দ হয়নি। অনেক খুঁজে, অনেক মেহনৎ করে ভিখু শেখকে খুঁজে বার করেছিল। খুব বড় নয় একটা মাঝারি কলের ফিটার, মাস গেলে ওপরটাইম মিলিয়ে সাড়ে চারশ টাকা মাইনে। শক্ত, সবল নীরোগ ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুয, সংসারে আর কেউ নেই—শুধু বাড়ীটা বস্তি লাগোয়া। প্রথম অঞ্জুমানের মতন তার আব্বাও হতবাক হয়েছিল—'তুমি এখানে থাকো কেন?' ভিখু দয়ার হাসি হেসেছিল—'পুরোনো হয়ে গেছি—এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে মন লাগেনা—আর তাছাড়া যে ভদ্দর থাকবে তাকে কেউ ছোট লোক করতে পারবে না।' আব্বার বিস্ময় কাটেনি। ভিখুর মতন ছেলে সে তাদের ঘরে দেখেনি। ঠিক যেন ভদ্র আদমী। সে কখনও বিড়ি খেত না সব সময় সিগারেট। পরিষ্কার কাচানো জামা কাপড় পরত, মাথার চুল পরিপাটী করে আঁচড়ানো থাকত—পারতপক্ষে বস্তির লোকেদের সঙ্গে মিশত না। বিয়ের পর অঞ্জুমান দেখেছে আর পাঁচটা বস্তির লোকের মতন সে বউকে তুই তোকারি করে না তাছাড়া কানাঘুযায় তার আব্বা শুনেছিল যে ভিখুর সঙ্গে নাকি মানিজর বাবুর খুব খাতির। দেখেশুনে আর দেরি করেনি আব্বা—শুভদিনে চারহাত এক হয়েছিল। অঞ্জুমান যখন এই বস্তিতে তার আশমানী সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হল—তখন কিন্তু কেউ-ই তেমন অবাক হয়নি শুধু বলেছিল—শেখ তো ভদ্দর আদমী আছে তার বিবিতো এরকম হবেই। দেখিস্ না ভদ্দরলোকের বিবিরা কত খুবসুরৎ হয়।

আর ভিখু অঞ্জুমানকে পেয়ে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। এই দুটো বছরে তার কাছে আসমানেও অঞ্জুমান, ভাতের থালায় অঞ্জুমান—প্রতিটি নিঃশ্বাসই যেন অঞ্জুমান। বাস্তবিক তাদের মত সুখী কেউ ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসার। বস্তির ঘর হলেও এক এক করে বাহারী জিনিয দিয়ে সাজিয়েছিল ভিখু। মাঝে মাঝে বস্তির নোংরা ছেলেমেয়েরা ভিখুর দরজার ভিড় করত, আর চেয়ে থাকত। অঞ্জুমানের ভয় এই বুঝি ঢুকে পড়ে নোংরা করে দেবে সর্বস্ব। ভিখুর মায়া ছিল। বলত, আহা দাঁড়াক না। অঞ্জুমানের ঘর বস্তির বাসিন্দাদের কাছে দামী জিনিসের মত নিষিদ্ধ ছিল। অঞ্জুমান এবং তার স্বাতন্ত্র এরা সহ্য করে

নিয়েছিল। তার হাসি কথা সোহাগ এসব তাদের কাছে ছবির মতই মনে হত। যেন স্থির অথচ কত প্রাণময়। বস্তির আর সব বউ ঝি যখন কেউ ভুট্টা বেচে, জল তুলে, ঘুঁটে দিয়ে কলের অমানুষিক খাটুনি খেটে ক্লান্ত হয়ে বসে বসে ছেলেমেয়েদের মাথা থেকে উকুন বাছত, নয়ত অকথ্য ভাষায় কাউকে খিস্তি করত, অঞ্জুমান তখন ভিখুর সঙ্গে সিনেমা হলে নয়ত ময়দানের ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াত—তাদের দুজোড়া পা যখন একসঙ্গে পড়ত অঞ্জুর বুকটা গর্বে ভরে উঠত। ভিখুও সিনেমা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেত এক একদিন। ছবিতে তখন হয়ত কোটিপতি নায়ক বস্তির মেয়ের হাত ধরে ঘর ছাড়ছে। ওর পলক পড়ত না। লোকের কান বাঁচিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলত, দেখছ বাবুরা কত ভাল হয়।

এক একটা দিন যেন স্বপ্নের মতন কেটে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে তিনমাস আগে অঞ্জুমান হঠাৎ-ই আবিষ্কার করল, সে মা হতে চলছে। সে কি আনন্দ ভিখুর। কী হবে? ছেলে না মেয়ে? কেমন দেখতে হবে, পড়া লিখা শিখবে, তারপর কতবড় বাবু হবে? এইসব কত কি? কিন্তু হঠাৎ-ই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ধেয়ে এল ঘন মেঘ। আজ কদিন হয়ে গেল ভিখু ভাল খায়নি, একটাও সোহাগের কথা বলেনি। যেন তার জীবনে কোন তিয়াসই নেই—কেন? ওর কি মাথাই খারাপ হয়ে গেল। নইলে যে কাকুর দোকানকে ও চিরকাল পরিহার করে এসেছে—সেইখানে যাচ্ছে ভিখু? কি এর রহস্য? অঞ্জুমান আর ভাবতে পারল না। চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে রইল। এদিকে বিশাল সূর্যটা পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন জোর কদমে লাফ দিয়ে টপকে গেল পৃথিবীকে। শুধু সন্ধ্যার ছায়া ছায়া অন্ধকার ঘিরে রইল চারদিক।

কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে—অঞ্জুমানের খেয়াল নেই। দরজায় দুম দুম ধাক্কায় ও উঠে বসল। চোখ রগড়ে উঠে দরজা খুলল। ভিখু মাথা নিচু করে ঢুকল। অঞ্জুমান আন্দাজে বুঝল রাত ভারি হয়ে এসেছে। ও দরজা বন্ধ করে হাঁড়ি ভর্তি ভাতে জল ঢেলে দিল। ভিখু এমন পাষাণ হয়ে গেছে যে একবারও জিগ্যেস করল না ও খেয়েছে কিনা। না, কারুর যখন কপাল পোড়ে, তখন এমনি ভাবেই পোড়ে। পা মুছে ঘরে এসে দেখল ভিখু উদাস দৃষ্টিতে খাটের উপর চুপ করে বসে আছে। অঞ্জুমানের বুকে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠল। ও সব ভুলে গেল। আপ্লুত স্নেহে দুলতে দুলতে ভিখুর কাঁধে হাত রাখল। 'তোমার কী হয়েছে? অমন করছ কেন? আমি কী করেছি?' আর বলতে পারল না, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ভিখু শূন্য গলায় বলল 'তুমি কদিন কি কিছুই শোননি?' অঞ্জুমানের মনে পড়ল এ কদিন যেন বস্তির আবহাওয়াটা কি রকম ঝড়ের আগের আকাশের মত থমথমে। কিন্তু তাতে ভিখুর কি? ভিখু এবার মসমসে গলায় বলে উঠল, 'আমাদের কলে ক্লোজার লুটিশ পড়েছে। চারদিন হল গেট খোলেনি।' অঞ্জুর বুক থেকে পাথরের ভার নেবে গেল। ও তা হলে এই। এক ঝটকায় চোখের জল মুছে ফেলল। মোলাম গলায় বলল—'তাতে তোমার কী? তোমার কাম খাবে কেন? মনিজারবাবু তোমায় কত ভালবাসে? তুমি কি বস্তির আদমী নাকি।' অনেক দুঃখেও ভিখু হাসলো। 'বুদ্ধু—আর কাকে বলে? তুমি এখনও নাদান আছো? ওই মনিজার শালাই তো

আসল হারামী, এতগুলো লোকের জান খেলে।' অঞ্জু উতলা হল 'মনিজারবাবুর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে?' ভিখু ভয় পেল। অঞ্জুমানের দিকে ফিরে রাগত গলায় বলল—'তোমাকে কে বলেছে এসব কথা? খবরদার, বাইরে বলবে না। আরে আমরা হলুম গিয়ে নকর, আমাদের সঙ্গে আবার বাবুদের আশনাই কিসের?'

অঞ্জুমান থমকে গেল তারপর ভাবল—ব্যাটাছেলের মনতো কোনো কারণে ঝাঁজে এসেছে। ওসব ঠিক হয়ে যাবে। ভিখু যতই বলুক, সবাই জানে—ও কত ভদ্দর আদমী। কোনও ছোট কাজ সে করেনি। তার এই হাল আল্লা কি মেনে নেবে? অঞ্জুমান আল্লার কাছে দোয়া মানল।

সেই দুঃসংবাদ শোনার পর ধীরে ধীরে পাঁচ মাস কেটে গেল। কিন্তু অঞ্জুমানের দোয়া আল্লার বুকে কোনও আলোড়নই তুলল না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—তাঁর ভদ্রলোকের লিষ্টিতে ভিখু শেখ আর তার বিবির নামটা জায়গা পায়নি। অতএব যা হবার তাই হল, যথানিয়মে কারখানায় ক্লোজার হল।

এদিকে ভিখু আর অঞ্জুমান—তারাও সব ছেড়ে পথে নামল। প্রথম প্রথম অসহ্য মনে হত ভিখুর। যাদের সঙ্গ সে এতদিন সাধ্যমতন এড়িয়ে চলেছে—আজ তাদের কাছেই বুড়ো ঘোড়ার মতন মাথা নিচু করে যেতে হয়েছে। প্রথম দুদিন দ্বিধার টান ছিল—কিন্তু সমস্ত বস্তির সত্তা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে একা সে কত অসহায়। ভেবেছে—তাকে নিয়ে সবাই মজা করবে, ইল্লুতি করবে—তবু গিয়েছে। অনেকে তাকে দেখে হেসেছে—'আরে, শেখ যে, তুমি আবার ছোটলোকদের সঙ্গে কেন?' বলেছে—'আজ কী হরতাল নাকিরে শ্যামলাল, শেখ বিবি নিয়ে বেড়াতে যায়নি?'

আস্তে আস্তে সব সয়ে যায়। কখন কী করে ভিখু শেখ এই বস্তির তেলে জলে মিশে গেল—সে নিজেও জানে না। সে পাল্টে গেল, ভেঙে চুরে নূতন হল তার কলকব্জা। এক এক করে সব বদভ্যাস সে ছেড়ে দিল। হ্যাঁ, এখন সে এগুলোকে বদভ্যাসই বলে। পরিপাটী চুল, ধোপদুরস্ত কাপড়, বাবুদের মতন সিগারেট খাওয়া—সব ঘুচে গেছে। সে এখন অনেক স্বচ্ছন্দ, অনেক এলোমেলো, যেন দীর্ঘ প্রবাসের পর সে ফিরে এসেছে নিজের মাটির উপর। তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চলতে তার সেই সাধের ঘরেরও দাঁত কুৎসিৎ ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। অঞ্জুমানের ব্যথা ওঠার দিন ভিখু ঘাড়ে করে তার খাটটা পর্যন্ত মাড়োয়ারী মহাজনের গদিতে তুলে দিয়ে এসেছে।

যথাসময়ে অত স্বপ্নের, অত সাধের ছেলেও হয়েছে অঞ্জুমানের। পড়শীরা ধন্যি ধন্যি করেছে। 'কোল আলো করে ছেলে এসেছে গো।' কিন্তু ভিখু বা অঞ্জুমানের আর আগের সেই উৎসাহ নেই। বস্তির আর পাঁচটা বাপ মার মতই নির্বিকার ভাবে বরণ করে নিল নবাগতকে। পাড়ারই একজন বিজ্ঞ মানুষ বলল—'ভিখুরে। ওর নাম রাখ আলমগীর। আমি কিতাবে পড়েছি সে হিন্দুস্তানের বড় বাদ্‌শা ছিল তার কথায় সাহেবদের দেশ শাসন হত।' সেই থেকে ভিখুর ছেলের নাম হয়ে গেল আলমগীর! ভিখু এখন সারা দিন কাজের চেষ্টায় ঘোরে। বাজার বড় মন্দা তাই ঘোরাই সার হয়। ওরই মধ্যে টুকিটাকি কাজ হাতে আসে—পাড়ার লোকেরাই পরস্পর পরস্পরকে খবর দেয়।

এতো গেল ভিখু শেখের কথা। আর অঞ্জুমান। সে যেন দুমড়ে গেছে। পৃথিবীর রঙ যে কত বিবর্ণ—এর বাতাস যে কত বিযাক্ত সে এখন বুঝেছে। তার সোনা অঙ্গ কালিবর্ণ হয়ে গেছে। এমন ডালিম গাল ভেঙে ঢুকে গেছে ভিতরে। স্ফুরিত অধরে আর কোন রঙ নেই। রাস্তা থেকে জল টেনে এনে তার বেতসলতার মত শরীর কঠিন হয়ে গেছে। সারাদিন কাজ করে অঞ্জুমান। আর পাঁচটা বৌ-ঝি-এর মত আলমকে ট্যাঁকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরোয়। বৌ-ঝিরা কিন্তু পুরুষদের মত নয়। তারা কেউ তাকে সোজাসুজি টিটকারি দেয়নি। শুধু আড়ালে আবডালে ঠেস মেরে শুনিয়ে দিয়েছে—এককালে তারাও অমুন রূপসী ছিল—তবে ভদ্দর হওয়ার শখ কোনও ছিল না। অঞ্জুমান চুপ করে থাকে, লজ্জায় নুয়ে আসে তার মন।

সময় গড়িয়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে বয়সের ধাপ। প্রতিটি প্রহর, প্রতিটি পল, প্রতিটি অণুতে সে এগিয়ে চলেছে। অভিজ্ঞতার সোপান আরও বিস্তৃত হয়ে উঠছে। শতাব্দীর প্রতিটি মানুষের মুখ এখন রুক্ষ কঠিন সূর্যের অমিত তেজে ঝলসে উঠছে।

তাই এখন আপনারা কেউ যদি সেই বস্তির ধারে যান, দেখবেন যে কোনও রোমাণ্টিক লেখকের নায়িকা হবার উপযুক্ত একটি সত্যিকারের রূপসী নারী হয় ভুট্টা বেচছে নয়ত ঘুঁটে দিচ্ছে আনমনে। পাঁচ থেকে তিন বছরের মধ্যে তিনটি নোংরা ছেলেমেয়ে ঘিরে আছে তাকে। হ্যাঁ, অঞ্জুমানের, রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চোখগুলো ভাষাহীন—তবু নির্মম, কিন্তু এককালের লজ্জাবতী তরুণী অঞ্জুমানের গলার আওয়াজ আপনারা রাস্তা থেকেই শুনতে পাবেন। কারণ তার বড় ছেলে আলমকে তার খেলুড়ীরা হয়ত ধুলোয় ফেলে দিয়েছে—আর সে কাঁদছে। তখন অন্যান্যরা বলছে—'শালা একদম ভদ্দর আদমী ক্যায়া তুম্' ব্যস তখন অঞ্জুমানের আর মাথার ঠিক থাকে না। সে চিৎকার করে খিস্তি করে বস্তির লোকদের জানায় আজ যদি ভিখুর কল খোলা থাকত তা হ'লে ও দেখিয়ে দিত কী করে ভদ্দর আদ্মী হতে হয়। সবাই চুপ করে থাকে, করুণা করে কিন্তু অঞ্জুমান তখনও চুপ করে না। সে এবার কলের মনিজার সাহেবকে নিয়ে পড়ে। বেইমান, চোট্টা, বাবু হয়েছে। সামনে পেলে সে তার কলজেটাই উপড়ে আনত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ধরে এলে একসময় চুপ করে যায়। পাঁচজন বলে—'তুই চুপ করে যা অঞ্জুমান—আমীর লোকেরা কি আমাদের ভালবাসেরে।' অঞ্জুমান বোঝে।

কিন্তু তার ছেলে আলম মনে রাখে। মার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে শুনে সে বোঝে মনিজার বাবু লোকটা একটা খতরনাক আদমী। তাই প্রত্যহ এই নিয়ে সে একটা মজার খেলা খেলে, তার খেলুড়েদের মধ্যে একটি ছেলে মনিজারবাবু হয়। আর সবাই তাকে ঘিরে গায়ের জোর দেখায়। আর আলম সে তো দলের লীডর। লড়াই শেষ হলে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলে 'মাফি মাঙ্গ, নেহি তো জান সে মার দুঙ্গা।' ছেলেটা ঘাড় হেঁট করে ক্ষমা চায় সবার কাছে। সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। আলম কিন্তু খুশি হয় না। বিজ্ঞের মত হাত নেড়ে বলে, 'আরে ছোড় দো উস্কো। ও শালা মনিজারবাবু একদম চুহা হ্যায়, হামলোগ অউর বড়া আদমীকে সাথ লড়ঙ্গা।

নতুন জলের শব্দ

সেলিনা হোসেন

ঢেউটি এসে পায়ের কাছে গুটিশুটি বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। এবং গড়াতে গড়াতে অনেক দূরে গিয়ে থামে। আর তখুনি জমিলার শরীর দুলকে ওঠে। দুলকে ওঠে নতুন জলের শব্দের আশায় কানকো মেলে রাখা চপল মাছের মতো। ওরা যেমন আবলি ভেঙে এপাশ-ওপাশ ছুটে থমকে দাঁড়ায়। তেমনি এদিকে-ওদিকে ছুটতে চায় মন। কিন্তু শব্দ নেই। আসলে শব্দ থাকে না। জমিলা জানে জলের নিচে কালো মাটির গায়ে লাল কানকোঅলা মাছের শরীর পলাতক হয়ে যায়। তবুও ছাউনিতে ফিরে যাবার নামে কিছুতেই ইচ্ছের লাগাম ধরতে পারে না জমিলা। ইচ্ছেটা গুনটানা নৌকোর রশি হয়ে গভীর থেকে গভীরতর জলের দিকে টানতে থাকে।

জল ছাড়া কিছু ভাল লাগে না জমিলার। চরধূমানীর শেষ সীমানায় এই আছড়ে পড়া নদীর কূল নিশির মত টানে। কোন সাধ্য নেই এক মাথা উঁচু হোগলা পাতার ঐ ছাউনীটার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখার। উল্টো পিঠ নৌকার মত ভুস করে ভেসে ওঠে শুশুক। ফুটকি দিয়ে দিয়ে ওঠে ফকফকে পোমা ভোল। ভাসতে ভাসতে চলে যায় কত কি। জলীয় লম্বা ঘাস ভিরা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা দোলায়। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক মধুচুশকী উড়ে যায়। মধুচুশকীর ছোট ঠোঁটে নিজের মনটা ঝুলিয়ে দেয় জমিলা। জানতে চায় না ওরা কোথায় গিয়ে থামবে। এই সব দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে অনবরত জলের বুকে নিজের ছবি দেখে ও।

মাঝে মাঝে মকবুল পাটারী রাগে বেহুঁশ হয়ে ছুটতে ছুটতে আসে।

—এই জমিলা তোরে নিয়ে আর পারি না।

—না পাললি এই জলের মদ্দি ফালায়ে দাও। আর কনু সময় ফিরা আসব না। জমিলা নির্বিকার উত্তর দেয়।

মকবুল পাটারী সূঁচালো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। জানে মেয়েটা এমন। আস্তে আস্তে বলে পানিই তোরে খাবে। পানির মদ্দি তোর এত কি?

—আমার মা নাই ক্যান?

—আমিও তো কই তোর মা নাই ক্যান? তাইলে তো এত জ্বালায় জ্বলতাম না। চল ঘরে যাই।

—তোমার ঐ পাতার ছাপরা আমার ইটুও ভাল লাগে না বাজান। জমিলা বাবার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

—বাজান তুমি মহাজনের ধান পাহারা দিবার লাগি এই চরে আইলে ক্যান?

মকবুল পাটারী কথা বলতে পারে না। নদীর বুকের ওপর থেকে ইওল বাতাস ভেসে আসে। আথাই পানির কোন দিশপাশ নেই। ইওল বাতাস যেমন শরীর জুড়ায়, আথাই পানি জুড়ায় দৃষ্টি। মকবুল পাটারীর বুকটা ভার হয়ে ওঠে। জমিলা এক পা এগিয়ে জলের

মধ্যে পা ডুবিয়ে দেয়। মধুয়া ঘাগড়ার তলে এসে বসে থাকে বেলে মাছ। স্বচ্ছ জলের তলে তার আঁশঅলা শরীর পরিষ্কার দেখা যায়। আরো দেখা যায় কুচো চিংড়ির ঝাঁক।

—জমিলা?

—কি বাজান?

—মা পান্তা দিবি নে?

বাবার এই দীন কণ্ঠস্বরের পর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। ফিরতে হয় জমিলাকে। ঘরে ফেরার ডাক জমিলার চেতনায় নেই। ঐ একটা পাতার ছাউনী না থাকলে ভাল হোত। সমগ্র চরের যেদিকে তাকায় সেদিকেই মনে হয় একটি করে পাতার ছাউনী দাঁড়িয়ে আছে। নদীর বুকেও পাতার ছাউনী। বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ফেরে জমিলা। ধূপছায়া রোদের আগুন আভা ওকে তখন জ্বালিয়ে মারে। মনে হয় নদীর বুকে দ্বীপের মত গজিয়ে ওঠা চরটা ওর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এর বাইরে জমিলার আর কোন অস্তিত্ব নেই। গাঁয়ে ছিল কেবল শাসন আর পায়ের বেড়ি। এখানে আসার পর ও খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া ময়না হয়ে গেছে। কেবলই উড়ালের সাধ হয়। চরধূমানীর এমন স্বাধীনতা না পেলে ও কোনদিন জলের এত কাছাকাছি আসতে পারত না, জল ওকে মায়ের ভালবাসার সুখ দেয়।

পান্তা ভাতের সানকীটা বাবার সামনে ঠেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হয়ে যায় জমিলার মন। পান্তা ভাতের সপ সপ শব্দ ওর কানে হিস হিস শব্দ তোলে। ক্ষুধার সাপটা ফণা তোলা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। জমিলা ছাউনীর বাইরে এসে চুপচাপ বসে থাকে। যতদূর চোখ যায় কেবল ধানের নতুন চারা মাথা দোলায়। চরধূমানীতে এসে জমিলার নতুন জন্ম হয়েছে। নদীর পাড়ে অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের কেলিবিলাস মায়ের কথা মনে করায়। বাতাসের নিঃশব্দ হামাগুড়ি আর অজস্র পাখী ওর স্বাধীনতার স্বপ্ন। যে পাঁচ-ছশ ঘর বাসিন্দা তারাও অনেক ভাল হয়ে গেছে। জমিলার কোন আচরণে রক্তচক্ষু তুলে শাসন করতে আসে না। বেহায়া বলে গালও দেয় না। গ্রামে থাকতে অনেক গাল শুনতে হয়েছে।

—এ্যাই জমিলা?

—কি বাজান?

—তুই খাবিনে?

ভাতের দলা মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞেস করে মকবুল পাটারী।

—না ভুক নাই।

—ভাত আর আছে নাকি?

জমিলা লজ্জা পায়। হাঁড়ি উপুড় করে আমানীটুকু মকবুলের সানকীতে ঢেলে দেয়।

—ভাত কহানে?

—আর নাই।

হঠাৎ করে শেষ দলাটা মকবুলের বুকে আটকে যেতে চায়। ভুক নাই বলে মেয়েটা ওকে ফাঁকি দিয়েছে। ক্ষুধার যে তীব্রতা এতক্ষণ মাথায় আগুন জ্বালিয়েছে তা দপ্ করে

নিভে যায়। মনে হয় মেয়ের সামনে থেকে এখন পালিয়ে যেতে পারলেই বুঝি বাপ হওয়ার লজ্জাটা এড়ানো যায়। কোন মতে হাতটা ধুয়ে ঘরের কোণ থেকে বিনযাটা উঠিয়ে নেয় মকবুল পাটারী।

—এই রোদ্দির মদ্দি ক'হানে যাও বাজান?

—যাই কাম করিগে। ক্ষ্যাত না নিড়াইলে আমন ধান ভাল অবিনে। এই ভাদাইগুলাই আমার দুশমন।

মকবুল পাটারী অপরাধীর হাসি হেসে বেরিয়ে যায়।

সারা বেলা কোন কাজ নেই জমিলার। সকাল বেলা চাট্টি ভাত রাঁধে আর একমুঠো সুটকীর ভর্তা বাটে। মাঝে মাঝে জোয়ারের জলে ভেসে আসা মাছ ধরে রান্না করে। কুচো চিংড়ি বেটে বড়া বানায়। বাবা মেয়ে মিলে তিন বেলা তাই খায়। মাঝে মাঝে পাশের ঘরের নসুর মা যখন প্রশ্ন করে, কিরে কি রান্দলি?

উত্তর যেন জমিলার সূক্ষ্ম অনুভূতির দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। মনটা কেমন হাঁসফাঁস করে। ভাল কিছু রাঁধতে না পারাটা অপরাধ মনে হয়। ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, কি আর রান্দব সুটকীর ভার্তা করছি।

—আমারে কয়ডা সুটকী দিবি? ঘরে রান্দবার কিছু নাই।

জমিলা নিঃশব্দে এক মুঠি সুটকী এনে দেয়। জানে ঐ চাওয়াটুকুর জন্যে এত ভণিতা।

সারা দিন কিছু করার নেই বলে বুকটা খা খা করে। মৃত মার কথা মনে হলে মনটা বাউরা হয়ে যায়। তখন ওর জলের কাছে যেতে ইচ্ছে করে। গাঁয়ে থাকলে এ ঘরে ও ঘরে সারাদিন গালগপ্প করে সময় কাটাত। মাকে তেমন মনে পড়ত না। কিন্তু এই চর ওর উনিশ বছরের জীবনটাকে একদম ওলট-পালট করে দিয়েছে। নদীর তীরের বালুর মত মিটমিটিয়ে জেগে থাকে স্মৃতি। তখন কষ্ট হয়। কাঁদতে ইচ্ছে করে। বেশী খারাপ লাগলে উঠে হাঁটতে থাকে। তখন ও সারাক্ষণ মনে মনে নতুন জলের শব্দের প্রার্থনা করে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায় জমিলা।

বাশকা ঘাসে পা ডুবিয়ে রাখতে আরাম লাগে। পাশ দিয়ে ছুট করে পালিয়ে যায় মউপ্পা। বোয়াইলা ফড়িং কানের কাছে বোঁ করে উড়ে আসে। আবার ডিগবাজী খেয়ে অনেক দূরে চলে যায়। জমিলার মনে হয় গাঁয়ের কথা। চরধূমানীর মত কেউ ওকে এমন করে কাছে টানেনি। এখানে সবাই ওকে ভালবাসে। আসলে চরধূমানী ওর একলার। আর কারো না। দূরের মাঠে কর্মরত বাবা এবং অন্যান্য লোকের মাথা কালো বিন্দুর মতো দেখায়। তখন মনটা আড়মাল ষাঁড়ের মত রুখে উঠে। না এই চর আর কারো নয়। শুধু ওর। এখানে কারো দাবী নাই। জোর দখলি নেই। চরধূমানীর কাছে ওরা চায় ফসল। মুঠো মুঠো ধান। ওদের প্রার্থনা কেবল দাও। জমিলা চরধূমানীর রসনিংড়ানো কিছু চায় না। জমিলা একে ভালবাসে। যৌবনের মত ভালবাসে। নীড়ের স্বপ্নের মত ভালবাসে।

অথচ নীলাক্ষীর বুকে সম্প্রতি জেগে ওঠা চরধূমানীকে নিয়ে দুই দলের মধ্যে বিবাদ দানা পাকিয়ে উঠেছে। চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর সবটুকু স্বত্ব দখল করেছে

আলীমুদ্দীন। জমিলার বুড়ো বাপ আর ছয় ঘর লোক এসেছে তারই প্রতিনিধি হয়ে চরের জমি আর ধান পাহারা দেবার জন্য। ইতিমধ্যে এ চরের স্বত্ব নিয়ে বিভিন্ন লোকের মধ্যে একটা অধিকারের দাবী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাহের আলী বলে গত বর্ষার আগে তার জমি ছিল। বর্ষার ঢলে সেসব জমি ভেসে গেছে। এখন এ চর তার। কিন্তু আলীমুদ্দীন অতো কাঁচা লোক নয়। সামান্য মুখের কথায় সরে দাঁড়াবে না। বাহুতে অতো কম জোর নিয়ে সে মাঠে নামেনি। চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দখল করেছে। সুতরাং তার দাবী আগে। তাছাড়া কবে কোন যুগ আগে কোথায় কার জমি ছিল সেসব শুনতে আলীমুদ্দীন রাজী নয়। এসব করে করেই তার সম্পত্তি বেড়েছে, ধানের জমি বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বয়স বেড়েছে আর মাথার চুলে পাক ধরেছে। ফলে দুই প্রতিপক্ষ দল পরস্পরের প্রতি মারমুখী হয়ে আছে। কেউ কাউকে ছাড়বে না। মকবুল ওকে প্রায়ই বলে, একদিন দেখবিনে ঘাড়ের পরে মাথাডা নাই।

—এমন কামে আমগার কাম নাই বাজান। তারচে' বাড়ী চইল্যা যাই।

—ফিরে যায়া খাব কি? খালি তো সেই খিদার জ্বালা। এই পোড়া কপাল নিয়াই আমরা আইছিরে জমিলা। আমগার ডাঙ্গায়ও মরণ পানিতেও মরণ।

জমিলা বাবার কথার উত্তর দিতে পারে না। কেবল ঝোপের ভিতর বাবুই পাখীর মত লাফায় মনটা। জানে মা মারা যাবার পর বাবা একদম বদলে গেছে। বেশী কিছু একসঙ্গে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

—এই দেহনা মা গেছে—জষ্টির পর থি তোরে আর কাপড় দিবার পারি নেই।

—তোমার কাছে কি কাপড় চাইছি বাজান?

—তুই না চাইলে কি? আমার কি আর কিনার সাধ অয়না রে?

বাবার ছলছল মুখের দিকে তাকিয়ে জমিলার মার কথা মনে হয়। একজন মানুষের জীবন থেকে একজন প্রিয় মানুষ সরে যাওয়ার অর্থ ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। এ নিষ্ঠুরতা ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তির মত নয়। বেদনায় আচ্ছন্ন করে রাখে। জীবন নিয়ে কোন বাযিবুযি চলে না। ফাঁকে পা পড়লেই মরণ। পা টেনে উঠায় কার সাধ্যি। বাবা সে ফাঁকে পড়েছে। আর উঠতে পারছে না। ওঠার মত মনের জোরও নেই।

জমিলা ঘাসের ভেতর পা ডুবিয়ে আবার হাঁটতে থাকে। নদীর কাছাকাছি এসে যায়। চরের পুব দিকটায় সাধারণত কেউ আসে না। রাঁশযমা ঘাস আর উলু ঝাড় বুক সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। হেলেঞ্চা ভরা নদীর কিনার সবুজের বিনুনি হয়ে শুয়ে থাকে। জমিলার কেবলই মনে হয় এসবই তার। এদিকে মানুষের চলাচল নেই বলে জমিলার আকর্ষণ এখানে। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণের বিরিং লাল আকাশ দেখতে দেখতে উনিশ বছরের যৌবনটা নিষ্ফল মনে হয়। মনে হয় আকাশের মত টুকটুকে লাল হতে হতে এক সময় ওটা টুপ করে নদীর বুকে ডুবে যাবে। আর কি! বুকটা মোচড়ায়। ভশ্‌শালিকের কিচির মিচির তখন যৌবনের শেষ সঙ্গীতের মত কানে বাজে। এই চরের ভালবাসা সান্দ্র হয়ে ওঠে। জমিলা ঘাসের ডগা দাঁতের তলে চিবুতে চিবুতে সেই চিরাচরিত ছাউনীতে ফিরে আসে। যেখানে ওর জন্যে কোন আনন্দ নেই।

জমিলার মনে হয় ওর চারিদিকে একটা নিরানন্দের স্রোত বইছে। জীবন যাপনের সঙ্গে এই চর এবং তার সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সে এই মাটিকে যত ভালই বাসুক ওর বাবা এখানে প্রতিনিধি। অন্যের সম্পদের পাহারাদার মাত্র। এই চরকে কেন্দ্র করে ওর আবেগের কোন মূল্য নেই। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুভূতি পানসে হয়ে যায়। এ দুয়ের সম্মিলনের সঞ্চিত চেতনা ওকে বিদ্রূপ করে তোলে।

চরধূমানী প্রসব করেছে কেমন নিটোল আর পুষ্ট ধানের ছড়া। যৌবন যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে খান খান হয়ে যেতে চায়। জমিলা দেখে স্বর্ণ প্রসবিনী উর্বরা চরে ফসলের প্রাচুর্যময় সমারোহ—সোনালী ধানের শীষে আশ্চর্য জীবন্ত এ চর। অথচ এর একটা ধানও তাদের নয়। এ চিন্তা জমিলাকে পাগল করে তোলে। বুকে আগলে এগুলো পাহারা দিচ্ছে ওর বুড়ো বাপ। অথচ পুরুষ্ট ধানের কণা আলীমুদ্দীনের গোলাই ভর্তি করবে মাত্র।

চরের বুকে জমিলা এখন একটা আলাদা মৌ মৌ গন্ধ পায়। তাতল হয়ে উঠে শরীর। সমুচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়ে ও সমীহ করে ধানের ক্ষেতে পা রাখে। নির্বর্ষ আকাশটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে চায় যে বৃষ্টি নামুক। একমাত্র বৃষ্টি ওর তাতল ভাব কাটাতে পারে। আর কেউ না। ধানের ছড়া বুকে জড়িয়ে গন্ধ শুঁকলে মনে হয় এ যেন ওর রক্তের একটা অংশ। তাই কিছুতেই ভাবতে ইচ্ছে করে না যে এ ধানের মালিক শুধু আলিমুদ্দিন। এ জমি চাষ করেছে ওর বুড়ো বাপ, ধান লাগিয়েছে—আগাছা সাফ করেছে—বুকের মমতা দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অথচ সে যখন এ ধানের অধিকারী নয়—তখন ওর কাছে আলীমুদ্দিনও যা তাহের আলীও তা। এ ধান তাহের আলীর গোলায় গেলেই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি ? একদিন বাবাকে একথা বলেছিল। মকবুল কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, সে আমগার পালক। যার নুন খাই তার গীযত গাইতে নাই জমিলা।

জমিলা অনুভব করেছে মকবুল পাটারী খুব সুস্থভাবে কথাগুলো বলতে পারেনি। গলাটা কেমন ভারী মনে হয়েছিল। মকবুল পাটারীর নির্বোধ অনুভূতি বুঝি চিড় খেয়ে গিয়েছিল সেদিন।

একদিন হেলেঞ্চার গা উল্টিয়ে মলাংগি মাছ খুঁজতে খুঁজতে ও দেখেছিল সে ডিঙ্গিটা। ভয়ে থমকে গিয়েছিল। মেঘলা ছিল আকাশ। হয়তো বৃষ্টি নামতে পারে। এক ঝাঁক মপুক উড়ছে ওর মাথার ওপর। আঁচলে বাঁধা আটদশটা মলাংগি মাছ তখন নিথর হয়ে এসেছে। লোকটা প্রথমে ওকে দেখতে পায়নি। জমিলা হেলেঞ্চার গা ঘেঁষে চুপচাপ বসে থাকে। উঠে যাবার শক্তিটুকুও নেই। মনে হয় উলোঝাড় যদি ওর চারদিকে নিবিড় বেষ্টনী রচনা করে দিত, তাহলে এ যাত্রা বেঁচে যেত ও। লোকটা খুব কায়দা করে হেলেঞ্চার গা-ঘঁষড়ে কূলে এনে ঠেকালো ডিঙিটা। তখুনি জমিলার সঙ্গে চোখাচোখি হোল ওর। একটু ঘাবড়ালেও নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। তারপর লাফ দিয়ে পাড়ে নেমে লগি পুঁতে বেঁধে ফেলল ডিঙ্গি। কাছে ধারে কেউ নেই। যে নির্জনতা জমিলার নিত্যসঙ্গী, তা ওকে পাষাণের মতো জাপটে ধরলো। কানকো মেলে রাখা মাছের কথা বেমালুম ভুলে গেল

ও। জলের শব্দও কানে আসছে না। কাদামাখা পা জোড়া কোনমতে ধুয়ে উঠে এলো। নদীর বুকে তখন উথালপাথাল ঢেউ। কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে উড়ে গেলো বোয়াইলা ফড়িং। জমিলা দ্রুত হাঁটতে থাকে।

লোকটা তখন এক দৌড়ে ওর সামনে এসে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়ায়—।

—যাও ক্যান?

জমিলা কথা বলতে পারে না। লোকটার ঠোঁটে চিকন হাসি। ছোটখাটো ঝোপের মত একজোড়া গোঁফ। জমিলার দৃষ্টি গোঁফের ওপর থেকে বুকে নেমে আসে। তারপর সরাসরি পায়ের কাছে গিয়ে থমকে যায়। সে দৃষ্টি আর ওপর দিকে ওঠে না।

—চল, ঐ জাগায় বসি।

লোকটা ওর হাত ধরে টানে। জমিলা ওর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। মনে দ্বিধা, সংকোচ ইত্যাদি ঢেউয়ের মত গড়াতে গড়াতে থাকলেও, উনিশ বছরের উথালপাথাল যৌবন লোকটাকে সরাসরি অস্বীকার করতে পারে না। লোকটা একটা জোরে টানতেই ও প্রবল আপত্তি না জানিয়ে পিছু পিছু আসে।

ঘাসের ওপর বসেই লোকটা ওকে জিজ্ঞেস করে তুমার বাপ কিডা?

—মকবুল পাটারী।

জমিলার ভীতু কণ্ঠ কেঁপে যায়।

—হুঁ।

লোকটা ট্যাক থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। আকাশে মেঘের ঘটা গাঢ় হয়ে ওঠে। এক ঝলক ইওল বাতাস বয়ে যায়। জমিলা আস্তে করে বলে, তুমি কিডা?

—আমি কালাম। তাহের আলী আমার বাজান অয়।

—অ্যাঁ।

জমিলার মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসে।

—ভয় পাইলা মনে অয়?

কালাম হো হো করে হাসে। তাগড়া জোয়ান লোকটার মুখে হাসি ভরা গাঙের মত। কূল ছাপিয়ে ছপছপ করে ওঠে। জমিলার উনিশ বছরের যৌবনে এখন একটা কথাই মনে হয়, এ ধান তাহের আলীর, গোলায় গেলেই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

কালাম হাত নেড়ে গড়গড় করে যা বললো তার অর্থ এই, ও দেখতে এসেছে। ধানের এখন কি অবস্থা। এ ধানের এক কণাও ওরা ছাড়বে না। একদিন রাতে এসে সব কেটে নিয়ে যাবে। আলীমুদ্দিনকে ওরা থোড়াই পরোয়া করে। কারো সাধ্যি নেই তাহের আলী আর তার ছেলেদের বাধা দেবার।

কালাম বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে ওকে একটু কাছে টানে। জমিলা আড়ষ্ট হয়ে সরে যায়। জোর বাতাস বয়। হয়তো এখুনি বৃষ্টি নামবে। কালাম ফিসফিসিয়ে বলে, কাইল আবার এহানে আইসো?

জমিলা ফিক করে হেসে ঘাড় নাড়ে।

—আচ্ছা।

কালাম লগিটা টেনে নিয়ে লাফ দিয়ে ডিঙিতে উঠে যায়। ডিঙি যখন দুলতে দুলতে অনেক দূরে চলে যায় তখনো জমিলা দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে চুল ওড়ে। তখনো ভাবনা কি হবে তাহের আলী এ ধান নিয়ে গেলে? কিছু না—কিছু না। জমিলার লাভ লোকসানে তা কোন আঁচড় কাটবে না। তার চেয়ে কালামের উপস্থিতি অনেক ভাল।

অর্ধেক পথ আসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে। জমিলা একটুক্ষণ দাঁড়ায়। মওসুমের প্রথম বৃষ্টি। তার মানে নতুন জলের শব্দ। জলের শব্দ ওকে মাতাল করে তোলে। ও তখন ধরে নেয় জলের শব্দ মানেই জীবন। নতুন জীবন। জলের শব্দ ভালবাসার মত। ও আমোদ করে ভিজতে থাকে। ভিজতে ভাল লাগে। ভিজে থিতুবিতু হয়ে যখন ছাউনীতে ফিরে মকবুল পাটারীর উদ্বিগ্ন মুখে রাগের আগুন আভা।

—কহানে ছিলি এতবেলা?

—মাছ ধরলাম বাজান।

জমিলা আঁচল মেলে মাছ দেখায়। ওর খুব হাসি পায়।

—আইজ আমি মাছ মারলাম বাজান।

জমিলা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—যদি অসুক অয়?

—না বাজান অসুক অবে না।

—না, অসুখ অবে না।

মকবুল পাটারী ভেংচি দিয়ে উঠে।

—তোর জ্বালায় জ্বালায় জ্বলে মলাম। আমি যার চিন্তায় চিন্তায় মরি, সে বেড়ায় ফূর্তি কইরা। যা কাপড় বদলা গে। জ্বর না আইলেই অয়। মওসুমের পয়লা দ্যাওয়া। তোরে নিয়া যে কি করি।

—গাইলাও ক্যান বাজান। মার সুয়াগতো আর পালাম না। তা পাওয়ার আগেই তো মা মইল। আমি দ্যাওয়ায় ভেজব। মাছ মারব, যা চাই তাই করব। তুমি গাইলাবার পারবা না। যার সুয়াগ তুমি আমারে দিলা না।

জমিলার চোখে জল। মকবুল কথা বলতে পারে না।

বাইরে চরধূমানী বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যায়। স্রোত বয় ধান ক্ষেতে, বাশষমা ঘাসের ফাঁকে হেলেঞ্চার চিকন পাতায়, হোগলার ছাউনীর ওপর। স্রোত বয় জমিলার মনেও।

পরদিন ঘাসের গায়ে গা মিশিয়ে জমিলার অস্থিরতা একদম চুপ করে যায়। কান পেতে অনুভব করে একটা নিষিদ্ধ শব্দ কেমন কেঁপে কেঁপে বাশষমার বুকের ওপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। বাশযমার সবুজ নরম শরীরের গন্ধে জমিলার উষ্ণ আমেজ অভিভূত হয়ে থাকে। গড়িয়ে পড়া রোদের বিচূর্ণ কণা জমিলার শরীরের বিষুব রেখা স্পষ্ট করে তোলে। কালামের চওড়া বুকের ঘন লোমে অদ্ভুত ইচ্ছের দপদপানী। সে দপদপানী সম্বল করে শুধু একগাদা ইচ্ছের নিখুঁত রূপায়ণ হয়ে যায় স্যাঁতসেতে মাটির গায়ে। নীলাক্ষীর খোলা জলে তখন ভাল লাগার আঁকিবুঁকি।

এক সময় জমিলা হাসতে হাসতে বলে, তোমার এই মোচের ঝাড়ে মদুর মাছি ঘর বানতে পারে?

কামাল ওর গাল টেনে বলে, পারেই তো, এই মদুর মাছি তো পারে।

—ইস আমার অতো সাধ নাই?

—সাধ নাই? আচ্ছা দাঁড়াও দেহাই।

কালাম ওকে জোর করে ডিঙির উপর উঠিয়ে নেয়।

—সাধ না থাকলে ঐ মদ্দি গাঙে চুবাইয়া ধরব।

—আচ্ছা মানলাম এবার ছাড়।

—ঠিক সোজা হয়্যা চলবা।

জমিলা ওকে ভেংচি কাটে। কাছেই উলোঝাড়ের ফাঁকে একটা মউপপা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এ জমিলাকে ও কোথাও দেখেছে কিনা সে কথা মনে করতে পারে না। মাথার ওপর দিয়ে মধুচুশকী উড়ে যায়।

ছাউনীতে ফিরতে ফিরতে মধুচুশকীর ছায়া আনকোরা মনে হয় জমিলার। এ মাটিকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়ানো পায়ের তলা চিনচিন করে। জ্বালা করে সমস্ত দেহ। হঠাৎ করেই কান্না পায় জমিলার। কিন্তু না, কান্না আসে না। বাবার মুখটা মনে পড়ে। রোদের কণা আগুন হয়েছে। তারই উত্তাপে চোখ দুটো জ্বালা করে। বাড়ি ফিরে ধপাস করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ও। বাবা এখনো ফেরেনি। সেই ভাল। জমিলা এখন একলা থাকতে চায়, একদম একলা। সেই মউপপাটার স্থির চাউনী কালামের চকচকে চোখের মত থমকে আছে। ওর মনে হয় তীরে বাঁধা কালামের ডিঙিটা বুঝি চপল বাতাসে এপাশ ওপাশ করছে।

ধান পাকার সময় হয়ে গেছে। মকবুল পাটারীর বৃদ্ধ দেহে জওয়ানী শক্তি প্রবল হয়ে উঠতে চায়। বয়সের ভারে ক্ষয়ে যাওয়া চোখের মণি দুটো সর্বদা শকুনীর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চকমক করে। জমিলা বাবার সামনে সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। কালামের উপস্থিতির কথা কিছুতেই বলতে পারে না। কখনো মুখ ফুটে বলতে গেলে হারাই হারাই ভাবটা ব্যাকুল করে। আর কিছু বলা হয়ে ওঠে না। অথচ প্রতিদিন যখন দেখে কাজে যাবার সময় বাবা দা সড়কি নিয়ে বের হয় তখন জমিলা অস্থির হয়ে ওঠে। সারাদিনের অস্বস্তি ওকে বিধ্বস্ত করে রাখে।

মাঝে মাঝে মকবুল পাটারী অবাক হয়ে তাকায়, তোর কি অইছেরে জমিলা? চোখ-মুখ লাল ক্যান?

—কিছু না বাজান।

জমিলা সামনে থেকে সরে যায়।

একদিন কাজ থেকে ফিরে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে মকবুল পাটারী বলে, শুনলাম তাহের আলী আর ছাওয়ালরা ধান কাটবার পাঁয়তারা করতাছে। আউস কত? নেড়ী কুত্তার বনের বাঘ অবার হাউস আর কি। আইলে এক একটারে ধইরে খুন করব। এহনও মকবুল পাটারীর পাঁজরে অনেক ত্যাজ।

জমিলা কথার পিঠে কথা বলতে পারে না। বুকের ভেতর ঢেঁকির উঠানামার ধপাস ধপাস শব্দ হয়। শুকনো মুখে বাবাকে ভাত বেড়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মনের মধ্যে এখনো যে দ্বন্দ্ব। ওর কাছে আলীমুদ্দিনও যা, তাহের আলীও তা। তবে ও কেন আলীমুদ্দিনের পক্ষ নিয়ে কালামকে হারাবে? ধান কাটা শেষ হলে এখানকার ছাউনী ভাঙতে হবে। আলীমুদ্দিন ভালবেসে ওর বাবাকে চরের মালিকানা দেবে না। তবে কিসের আশা? অথচ চরধূমানীতে এসে যৌবনের যে প্রাপ্তি যোগ ঘটলো তাকে কি করে অস্বীকার করবে জমিলা? বরং কালামকে হারাবার চিন্তায় শূন্য চরের মত খাঁ খাঁ করে ওঠে জমিলার মন।

ধান পেকেছে মাঠে মাঠে। চরের ছয় ঘরের ছয়জন পুরুষ সবাই ব্যস্ত। আরো সাত-আটজন লোক পাঠিয়েছে আলীমুদ্দিন। মকবুল পাটারীর চোখে ঘুম নেই। কেবল কচাকচ কাঁচি চালায়। সারাদিন মাঠে কাজ হয়। এখন আর জমিলার বেরুনোর উপায় নেই। খাঁচায় বন্দী পাখী হয়ে যায় ও। কালামের আসাও সম্ভব নয়। হয়তো মাঝ নদীতে ডিঙি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কেবল। অস্থিরতা ওকে ব্যাপ্ত করে রাখে। কালামরা এখনো ধান কাটতে আসেনি। ওরা কোন সুযোগের অপেক্ষায় আছে কে জানে। নসুর মার ঘরে গিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে ও।

—কিরে কি অইছে?

—ভাল্লাগে না চাচী।

—ক্যান? মন পোড়ে বুঝি?

—কি জানি কবার পারি না।

—ও বুঝছি। আচ্ছা ঠিক আছে তোর বাজানেরে কবো এ্যাটা ব্যবস্থা করবার।

—যাঃ আমি কি তাই কইছি নাকি?

তখুনি জমিলার মনে হয় কাঁদতে পারলে ভাল হোত।

দুদিন যাবত মকবুল পাটারীর শরীর ভাল নেই। রাতে জ্বর আর কাশির চোটে ঘুমুতে পারে না। রাত জেগে জমিলা বাপের বুকে তেল মালিশ করে। মনটা কঠিন হয়ে ওঠে। আলীমুদ্দিনের গোলার জন্য বাবার এত খাটুনী। এক ফোঁটা ওষুধ নেই। বুড়ো মানুষটা কথা বলতেও হাঁফিয়ে ওঠে। তার উপর ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকে। তাহের আলীর চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়ে। জমিলার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়, আঃ বাবা যে ধান তোমার না, তার জন্যে তোমার এতো দরদ কেন? তার চেয়ে চল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে চরধূমানীর ধান ওর বুকেই রেখে যাই। দুজনের জন্য একমুঠো ভাত কি কোথাও থেকে জোগাড় করতে পারব না?

সব ধান কেটে চরের বুকে বোঝাই করে ফেলেছে ওরা। যেদিকে চোখ যায় সে দিকটাই ধূ-ধূ করে। জমিলার মনে হয় একটা শূন্য বাতাস ছুটতে ছুটতে এসে হোগলার ছাউনীর মাথায় আছড়ে পড়ে। তখুনি বুকটা চেপে আসে। জানে কালাম কাণ্ডজ্ঞানহীন সাহসী। রোখের সামনে কোন কিছুই ও পরোয়া করে না। কিছুটা বেরুক্কা স্বভাবের লোক ও। বাবার বুকে তেল মালিশ করতে করতে বাবা ঘুমিয়ে গেলে জমিলা বাইরে এসে বসে।

মাকড় জোনাক চরধূমানীকে প্লাবিত করে রাখে। জমিলা জানে মাকড় জোনাক রাতে গরম বেশী। তবু মনে হয় শুধু আবহাওয়ার জন্য বিলিসিলিও ওকে সারাক্ষণ, উত্তপ্ত করে রাখে। ভেতরটা যেন ফুটছে। তখন ওর কালামের কাছে যেতে ইচ্ছে হয়। মাকড় জোনাক রাতটা বুকের ভিতর নিয়ে চলে যেতে সাধ হয় অনেক দূরে। দূরের জমিতে চাষীদের অস্থায়ী ভাওলঘর হয়ে জমিলা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন কখনো মেঘ। কখনো জ্যোৎস্না।

পরদিন মকবুল পাটারী সারাদিন বাড়ি ফিরল না। ধানের গোছা আঁটি বেঁধে তৈরী করে নিচ্ছে ওরা। সন্ধ্যায় নৌকা বোঝাই হয়ে চলে যাবে আলীমুদ্দিনের বাড়ি। বুকে প্রচণ্ড কাশি আর জ্বর নিয়ে সারাদিন একটানা কাজ করেছে মকবুল পাটারী। জমিলা নসুকে দিয়ে ভাত পাঠিয়েছিল। খায়নি। জমিলার এক একবার ইচ্ছে করে নীলাক্ষীর পাড়ে ছুটে গিয়ে বাবাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসতে। পরক্ষণে দমে যায়। বাবা আসবে না উল্টো রাগারাগি করবে। মকবুল পাটারী প্রভুকে অস্বীকার করার ভাষা জানে না।

সন্ধ্যা নেমেছে। চরের ছয় ঘরে কুপি জ্বলছে। সবাই উদ্বিগ্ন। কখন কাজ শেষ হবে। কত রাতে ঘরের লোকেরা ফিরে আসবে কেউ জানে না। চাঁদটা মেঘের আড়ালে, আঁধার ঘন হয়েছে। কাছের বৌগাছগুলোও আর পরিষ্কার দেখতে পায় না জমিলা। তখন ওর মনে হয় নদীর দিক থেকে যেন একটা কোলাহলের শব্দ আসছে। ও বাতাসে কান পেতে দাঁড়ায়। ইপাকে-উপাকে তাকায়। কিছু দেখা যায় না। এলোমেলো বাতাসে কখনো শব্দটা হঠাৎ করে জোরে আসে। কখনো একদমই না। জমিলা আর দাঁড়াতে পারে না। কুপিটা হাতে নিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে।

দূর থেকে দেখতে পায় লাঠালাঠির অভিনব দৃশ্যটা! জমিলা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মেঘ সরে গেছে। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় মানুষগুলোকে প্রেতের মত দেখায়। এর মধ্যেও কালামকে চিনতে কষ্ট হয় না ওর। বাবার ছোটখাটো অসুস্থ দেহের তুলনায় সড়কিটা বেমানানভাবে বড়। কেমন বিভ্রান্ত দেখায় মকবুল পাটারীকে। হতবুদ্ধি জমিলা। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে সে দৃশ্যের দিকে। এবং পরক্ষণে আশ্চর্যভাবে দেখে কালামের তেল চকচকে লাঠির আঘাতে মকবুল পাটারীর দেহটা টলে পড়ে নীলাক্ষীর কোল ঘেঁষে।

কান্না নয় জমিলার দু চোখে আগুন জ্বলে উঠে। ছুটে যায় ধানের স্তূপের কাছে। হাতের কুপি দিয়ে আগুন ধরায় শুকনো খড়ে। মুহূর্তে দাউ দাউ জ্বলে উঠে পালা করে রাখা ধানের আঁটি। দুই প্রতিপক্ষ দল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মকবুল পাটারীর মাথাটা নদীর পানি বার বার ছুঁয়ে দেখে। লাল রক্ত জলের সঙ্গে লাল হয়ে ভেসে যায়। জমিলা হাঁটু গেড়ে বসে।

—বা—বা—জা—ন—গো—

নিশ্চুপ দর্শকের মত সবাই দাঁড়িয়ে।

বাবার মাথাটা কোলের উপর উঠিয়ে নিতে নিতে জমিলার মনে হয় বাবার রক্ত নতুন জলের মত তাজা হিমেল, আর কি চমৎকার সুবাসিত।

এমন ঘ্রাণ ও আর কোনদিন পায়নি।

পেয়ালায় তুফান

লীলা মজুমদার

পঞ্চাশ বছর আগেও কলকাতার দক্ষিণদিকে ভবানীপুরে অনেক জায়গা ছিল। সেসব জায়গায় বট অশ্বত্থের সঙ্গে আম জাম তেঁতুল নারকেল জামরুল আর কৃষ্ণচূড়োর গাছের ডালে রাজ্যের পাখি এসে গান জুড়ে দিত। গাছতলায় দিনের বেলায় পশ্চিমা ব্যাপারী রামসেবকের ছাতুর দোকানে ভিড় হত। পাড়ার ছেলেরা ডাংগুলি খেলত। রাতে শেয়াল ডাকত, হুতুম প্যাঁচা ডাকত। বৃষ্টি হলে জল জমত, কোলা ব্যাঙ গ্যাঙর গ্যাঙ করত।

সেই রকম একটা জায়গা, তার এক বড় রাস্তা দিয়ে ট্রামগাড়ি যেত আর বাকি তিন দিকে কুড়ি ফুট পথের ওপর গোটা বারো ভালো ভালো বাড়ি ছিল। বাড়িগুলো বেশ পুরনো। এ পাড়ার সবাই সবাইকে চিনত, প্রায় বাড়িতে এক-ই ধোপা, দরজি কাজ করত ; কাজেই সব বাড়ির সব খবর বাকিরা সবাই জানত। সব খবর জানলেও, সকলের সঙ্গে সবাই মিশত না। বিশেষ করে ট্রাম-লাইনের ঠিক উল্টো দিকের পাশাপাশি ৬ নং আর ৭ নং দুই বাড়ির বাসিন্দারা। তাদের বাড়ির মধ্যিখানের পঞ্চাশ বছরের পুরণো পাঁচিলটা ছিল দোতলার সমান উঁচু। সেকালে রায়েরা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম আর চৌধুরীরা গোঁড়া হিন্দু। অন্ততঃ সবাই তাই জানত। পাড়ার সবাই তাই নিয়ে হাসাহাসি করত। নাকি ৬০ বছর আগে দুই বন্ধু ছিলেন হরিহরাত্মা। জলের দরে জমি কিনে—অনেকে এত দূরও বলে যে সেকালে এ অঞ্চলে ঠ্যাঙ্গাড়েদের উপদ্রব ছিল, তাই পয়সা দিয়ে জমি কিনতে হত না। বরং কেউ জমি নিয়ে বাড়ি করে বাস করলে তাকে নগদ কিছু দেওয়া হত,—নিশ্চয় সব আজগুবি গুজব, তাই হয় কখনো?—বাড়ি করে গুছিয়ে বসতে না বসতে অর্ণব রায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন। কানু চৌধুরী রেগে চতুর্ভুজ হয়ে অর্ণবের বাড়ির দিকের ঘর দুটো ঠাকুর-ঘর বানিয়ে রোজ দুই সন্ধ্যে পূজা-পাঠ শঙ্খ-ঘণ্টা লাগিয়ে দিলেন। এই সমস্ত পৌত্তলিক অনাচার সইতে না পেরে, অর্ণবও দো-তলার সমান পাঁচিল তুললেন। আবার কেউ কেউ বলে অর্ণবের বাবুর্চির অসাবধানতার জন্যে রোজ রোজ দু-তিনটে মুরগি কানুর বাড়ি চরতে যেত, তাই কানুই পাঁচিল তুলেছিলেন। কে না জানে কথায় কথা বাড়ে।

আদি কারণটা যাই হক, সেই ইস্তক দুই-বাড়িতে যাওয়া-আসা নেই। অন্তত প্রকাশ্যে নেই। অবিশ্যি সামাজিক অনুষ্ঠানে, পাড়ার আর সকলের যেমন নেমন্তন্ন হত, এঁরাও পরস্পরকে নেমন্তন্ন করতেন, পুরুষরা গিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করেও আসতেন কিন্তু মেয়েদের মধ্যে নাকি আসা-যাওয়া ছিল না। তবে পাড়ার লোকের যেমন অভ্যেস, তারা কানাঘুযো করত বুড়োরা যা খুশি করতে পারেন, তরুণরা বংশপরম্পরায়—যাকগে, পাড়ার লোকের কথার কতটুকুই বা মূল্য।

সে-দিন ছিল শনিবার, ৫টা বেজে গেছিল, ৬ নম্বরের এক তলার খাবার ঘরের চায়ের টেবিলে কাঁধে সোনার পিন দিয়ে আঁটা ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে ক্রেপের শাড়ি পরা, আধা-বয়সী

দুই মহিলা-ই থেকে থেকে রূপোর চা-দানির দিকে তাকাচ্ছিলেন। যদিও চা-দানির ওপর মস্ত রেশমি ঘাগরা-পরা মেম-পুতুল চাপা দেওয়া থাকাতে, চট করে চা ঠাণ্ডা হবার সম্ভাবনা কম ছিল। টেবিলে লেসের ঢাকনি দেওয়া দুটি ছোট পাত্র-ও ছিল। দরজার ওপরকার ঘড়িতে ৫।১০ বাজতেই, পাশের দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে রুমা বলল, 'সরি পিসিমা, সরি হেমন্তপিসি আজ আপিসে—'

পিসিমা শুকনো গলায় বললেন, 'চায়ের টেবিল ব্যবসার গল্পের জায়গা নয়, রুমা। মিঃ সরকারের ল্যাণ্ডো বোধ হয় তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল?'

রুমা হাসল, 'কি যে বল পিসিমা! উনি সেই সাত সকালে সরে পড়েছেন। মাঘোৎসব কমিটির মিটিং আছে। কাসব—' বলেই রুমা থেমে গিয়ে, লেসের ঢাকনি খুলে এক সঙ্গে মুড়ে তিনটে তিনকোণা শশার স্যাণ্ডউইচ তুলে নিল।

পিসিমা বিরক্ত হলেন, 'রুমা রিয়েলি!! বৌদিদি তোমাকে কিচ্ছু শেখায়নি, দাদার জন্য দুঃখ হয়!' রেগে পিসিমা টুক করে হাতের ভারি টিপটটা তার খুরো দেওয়া ছোট ট্রে-র ওপর নামালেন। হেমন্তপিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তুমি অত উদ্বেল হলে চলবে কেন, টিনা, ওতে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হবে। কারো কথা তো শুনল না, অবনীদা মনে নেই, বায়না ধরেছিল কানু চৌধুরীর সেই ফ্যাকাশে মেয়েটাকে বিয়ে করবে?—একেবারে আকাট মুখ্যু, তার মেয়েগুলো আমাদের স্কুলে পড়ত, মা-টি এক-গাল পান খেয়ে, এক-গা গয়না পরে, আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে আর বিশ্বাস কর, খালি পায়ের আঙুলে রূপোর রিং পরে প্রাইজের দিন আসত। এই মোটা, ফ্যাক্‌ফ্যাকে ফরসা, আর কি জোরে জোরে হাসত।'

পিসিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'রুমার সামনে ও কি সব কথা, হেমন্তদি, তোমার যদি কোনো আক্কেল থাকে।' রুমা আরো তিনটে স্যাণ্ডউইচ এই অবসরে তুলে নেবার তালে ছিল, হতাশ হয়ে বলল, 'বাঃ, থামলে কেন হেমন্ত পিসি, তারপর কি হল?'

পিসিমা বললেন, "হবে আবার কি বাবা দাদাকে বিলেত পাঠালেন। সেখান থেকে লিখে পাঠাল 'ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে বিয়ে করব, বয়সে একটু বড় হলেও, খাসা রাঁধা"। বাবা পত্রপাঠ ছেলে ফিরিয়ে এনে ওষুধের ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিলং গিয়ে দাদা একজন গরীব প্রচারকের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এল। তোর দাদামশাই গরীব প্রচারক, তা জানতিস? গলাবন্ধ কোট আর ধুতি পরে বেড়াতেন। ব্যাস বাবাও দাদাকে ত্যাজ্য পুত্র করে দিলেন। আচ্ছা, রুমা, বিলেতে দেখে এসেছি, এই আফটারনুন টি একটা চমৎকার আর্টিস্টিক ব্যাপার, একটা সামাজিক শিল্পের মতো! তুই এত গিলছিস কেন?"

রুমা বলল, 'কি করি পিসিমা? তোমার বাড়ি স্যাণ্ডউইচ এত বেশি আর্টিস্টিক যে দাঁতে কাটল কি না টের পাই না। বড্ড খিদে পায় যে। সেই দশটার আগে খেয়ে বেরিয়েছি।'

হেমন্তপিসি শক্‌ড। 'খিদে পায়? আমাদের সময় কোনো ভালোঘরের ইয়ং লেডি খিদে স্বীকার করত না। অবিশ্যি তোমাদের কথা আলাদা। আমাদের সময় কোনো

ভদ্রলোকের মেয়ে টিচার কিম্বা দু-একজন লেডি-ডাক্তার ছাড়া কিছু হওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। এম-এ, বি-এল হয়ে একটা ল-অপিসে ঢুকে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে যে চাকরি করতে পারে, এ আমি জানতাম না।'

রুমা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'বাসব বলে কোনো মেয়ে-টিচারের বিয়ে হয় না, কিন্তু সব লেডি-ডাক্তারের বিয়ে হয়ে যায়, তা তাদের যেরকম চেহারাই হক না কেন। অবিশ্যি উকিল মেয়েদের-ও বোধ হয় বিয়ে হয় না, কর্ণিলিয়া সোরাবাজি-কে দেখ না। কিন্তু দেদার টাকা কামায়। বাসব বলছিল আমার ডাক্তারি পড়া উচিত ছিল'।

হেমন্তপিসি বললেন, 'বাসব? তুমি অবিবাহিত মেয়ে হয়ে পুরুষ মানুষদের সঙ্গে বিয়ের গল্প কর নাকি? ছি ছি! কে এই বাসব?'

পিসিমা রূপোর চামচ দিয়ে নিজের চা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'পাশের বাড়ির ছেলে। বিলেত ফেরত। ডাক্তার। খুব নাম করছে।' হেমন্ত পিসির বেজায় কৌতূহল, 'তাহলে সুপাত্র বল। নাকি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমাদের পাড়ার তো সবাই হিন্দু মেয়েদের তেরোয়, ছেলেদের একুশে বিয়ে হয়। ডিসগাস্টিং। কানুর নাতি বোধ হয়?'

বাসবের বিষয়ে পিসিমা কোনো সময়ই কোনো মন্তব্য করেন না। মুখ তুলে বেয়ারাকে বললেন, 'কিছু দরকার আছে' নকুড় বলল, 'দিদিমণিরা আজ রাতে এসে পড়বেন, কিন্তু আয়া সকাল থেকে আসেনি। তার শরীর খারাপ।'

আয়া আসেনি? কি সর্বনাশ। রেলের ধকলের পর বাড়ি পৌঁছে কিটি বেচারি যে আকুলপাথারে পড়বে। হেমন্তপিসি ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। পিসির ঘর গেরস্থালি দেখার তাঁর কাজ। একটু দূর সম্পর্কের বোন ;বয়সে বছর দশেকের বড় ;কুড়ি বছর বয়স থেকে শিক্ষকতা করেছেন, বিয়ে-থা হয়নি—বাসব বলে 'হবে না-ই তো। ডাক্তারি পড়লেই পারতেন, যেমনি চেহারা হক না কেন, বর জুটে যেত।'—বছর দুই হল অবসর নিয়ে পিসির ঘরকন্নার ভার নিয়েছেন, পিসি সমাজ সেবা করেন, সেজেগুজে মিটিং-এ যান ; এ বাড়িতেও মিটিং ডাকেন ;টাকা তোলেন, লাট-সাহেবের মেমের সঙ্গে পর্যন্ত চা খান। হেমন্তপিসির সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেন।

হেমন্তপিসি উঠে গেলে রুমার দিকে চেয়ে পিসি বললেন, 'তোমার ঘরের কথা দাদা কি লিখেছে?'

'লিখেছেন পুরো একতলাটার জন্য তুমি যখন একশো টাকা ভাড়া দাও, আমি একখানা ঘর জুড়ে থাকলে আশীর বেশী নেওয়া উচিত নয়। তোমার ক্ষতি করা ঠিক নয়।'

কাষ্ঠ হেসে পিসিমা বললেন, 'দাদার যেমন কথা কুড়ি টাকায় কি আমাকে বড়লোক করে দেবে? নাকি আমি আমার ভাইঝিকে তার নিজের বাড়ির একটা ঘর দিতে পারব না? এর পর কিটির বাবাও তাঁর ঘরের জন্য আমাকে বোধ হয় কুড়ি টাকা ভাড়া দেবেন।'

রুমা উঠে গিয়ে পিসিমার কাঁধের ওপর হাত রাখল। পিসিমা হাতটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাসবের সঙ্গে না তোদের মেলা-মেশা করা বারণ?' রুমা বলল, 'যাদের ২৩ বছর বয়স, তারা সাবালিকা, পিসিমা, কারো বারণ শোনে না। তাছাড়া বাসব তো মিঃ দে সরকারের বাড়িতে ডিনার খায়।'

পিসিমা রুমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, রুমা, কিটি কি বাসবকে ভালোবাসে।' রুমা হাসল। 'যেমনি আষ্টেপৃষ্ঠে ওকে বেঁধে রাখ তোমরা পিসিমা। কাউকে ভালোবাসার সুযোগ পাবে কোথায়? তোমাদের ঐ গোষ্ঠীর বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশতেও দেবে না ; ঠিক করা বিয়েকে সেকেলে হিন্দু প্যাটার্ণের বলবে। তা তোমার অমন সুন্দরী মেয়ে প্রেমে পড়বে কার সঙ্গে? ঐ যে-সব সম্বন্ধ আসে তার একটার সঙ্গে লাগিয়ে দাও না কেন? নিজে মেলামেশা করতে গিয়ে তো এমন দশা হল যে পিসেমশাই কাজকর্ম ছেড়ে শিমলে দৌড়লেন।'

'ও রাজী হয় না। নিশ্চয় বাসবকে ভালোবাসে। তাই ওকে ভুলবার আশায় ঐ মদন বাঁদরটার সঙ্গে ভাব করল। বাসব থাকতে ওকে কেউ ভালোবাসতে পারে, তুই বল না? তুই বাসবের খোলা মটরে কি বলে এলি? ওর পাশে বসেছিলি নিশ্চয়।'

রুমা খুব হাসল, 'কি বলব পিসিমা। আপিস থেকে বেরিয়ে দেখি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, কি বলল জান—ট্রামে ওঠবার সময় নাকি আমার পায়ের কব্জি দেখা যায় ; ও নিজে দেখেছে। এ রকম অসভ্যতা পাড়ার লোক হয়ে ও কি করে সহ্য করে, তাই নিতে এসেছে।'

'কি বেয়াদব ছেলে। ওর বাবা জানে।'

'জানলে বোধ হয় গঙ্গাস্নান করাতেন।'

'না। তাহলে ওকে বিলেত পাঠাত না। সোমনাথের বাবা ওকে বিলেত পাঠায়নি, জাত যাবার ভয়ে। ভারি গোঁড়া ওরা। পিঁড়িতে খায়। মেয়েরা মাংস খায় না। এঁটো মানে। গায়ে একটা ভাত পড়লে কাপড় ছাড়ে। আরো কত—হ্যাঁ, আরেকটা কথা, রুমা। যাদের বাড়ির মেয়েরা আমাদের বাড়ির ছেলে, মেয়েদের সামনে বেরোয় না, তাদের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের মেলামেশা করা উচিত নয়।'

রুমা না হেসে পারল না, 'নেই-ই কোনো ছেলে আমাদের বাড়িতে তা মিশবে কার সঙ্গে? এক যদি মেশোমশায়ের সঙ্গে—তা ওঁর আবার সময় কোথায়—এই শেষের প্যাস্ট্রিটা খেয়ে ফেলব? আমাদের আপিসের মিসেস গুডেনফ বলেন শেষেরটা খেলে বিয়ে হয় না। তা আমার তো বিয়ের বয়স চলেই গেছে, হেমন্তপিসির মতে। আমার কিন্তু এখনো বিয়ের শখ আছে, পিসিমা, এই বলে রাখলাম।'

অন্যমনস্কভাবে পিসিমা বললেন, 'সব কুসংস্কার। জানিস, সমাজের রেজিস্ট্রার বরদাবাবু সস্ত্রীক ব্রাহ্ম হলে পর ওঁর স্ত্রী বললেন, 'ছোটবেলা থেকে যা শিখে এসেছি সবই যদি কুসংস্কার হয়, তাহলে এগুলোও নিশ্চয় কুসংস্কার।' এই বলে থান পরলেন, হাত খালি করলেন, কদম ছাঁট করে চুল কাটলেন—এই সব করে সত্যি প্রমাণ করে দিলেন ও সবই কুসংস্কার। এখন পর্যন্ত ওঁর স্বামী বহাল তবিয়তে আছেন।'

রুমা বলল, 'কিন্তু বিশ্রী দেখায়। পুরুষমানুষের মতো।'

'তা তুই-ই বা ঐসব বিশ্রী মোটা কাপড় পরা ধরেছিস কেন?'

রুমা তো অবাক। 'বিশ্রী কি বল, পিসিমা! এগুলো মাঝারি মিহি খদ্দর। চমৎকার দেখতে, তবে কাচতে প্রাণ বেরোয় আর শুকোতেও চায় না, টেকেও না বেশি দিন। কিন্তু হাতে সুতো কেটে ঘরে তাঁতে বোনা কি চমৎকার জিনিস বল তো?'

এই সময় হেমন্তপিসি দুদ্দাড় করে ছুটে এসে, একটা চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর মুখের বিভ্রান্ত ভাব দেখে ব্যস্ত হয়ে রুমা উঠে পড়ল, 'কি হল, হেমন্তপিসি, আইস-বকস থেকে একটু ঠাণ্ডা জল এনে দেব?'

হেমন্তপিসি কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও দিকিনি। আয়া আসেনি, কিটির ঘরের জানলা-টানলা খুলে দাওগে যাও।'

বাধ্য মেয়ের মতো ২৩ বছরের রুমা ঘর থেকে চলে গেলে, হেমন্তপিসি হাউহাউ করে কেঁদে, দু হাতে মুখ ঢেকে বললেন, 'এত দেখে শুনে যাকে রাখলাম, টিনা, তার কি না—তার কিনা—চরিত্র খারাপ।'

পিসিমা অবাক হলেন। 'চরিত্র খারাপ? চরিত্র অমনি খারাপ হলেই হল? গেছিলে ওর ঘরে?'

হেমন্তপিসি চোখ মুছে বললেন, 'যাবার দরকার হয়নি। বাইরে থেকেই দেখলাম ও শুয়ে আছে আর একজন পুরুষমানুষ—কি বলব তোমাকে!—একজন পুরুষমানুষ কাঁদছে আর ওর পায়ে হাত বুলোচ্ছে। আমি ও-সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে নেই, টিনা, গরীব হতে পারি—কিন্তু আমার মা-বাবা—'

পিসিমা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন, 'কি বাজে বকছ, হেমন্তদি। তুমি ওকে আনলে কোত্থেকে? এনেছে তো নকুড়, ওর চেনা-জানা কার যেন বোন না কি হয়, চল তো একবার বাসন ধোবার ঘরে—।'

রুমা কিটির ঘর ঝাড়-পোঁছ করছিল আর বাবার কথা ভাবছিল। বাবার জন্য রুমার বড্ড দুঃখ হত। বাবার বিষয়ে কেউ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বললে বড্ড কষ্ট হয়। পিসেমশাই এত ভালো, অথচ বাবার বিষয়ে উল্লেখ করলেই বলতেন 'দ্যাট ক্যারাক্টার'। বাবার ক্লিষ্ট ফরসা মুখটা মনে পড়ে। মা যা বলেন বাবা তাতেই রাজি। ভাগ্যিস গরীব প্রচারকের মেয়ে, বড়মানুষি কাকে বলে জানেন না। মাঘোৎসবের সময় দাদামশায়ের সঙ্গে দু-তিনবার এসে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মন্দিরের পেছনে অন্য প্রচারকদের পরিবারের সঙ্গে 'শেলটার' বলে একটা জায়গায় থেকেছিলেন। কখনো থিয়েটার দেখেননি। কার্সিয়ং-এর বাড়িতে আসবার আগে চলচ্চিত্রও দেখেননি। এখনো উপভোগ করতে পারেন না। দেখতেও সুন্দরী নন, কিন্তু খুব ফরসা। তাঁদের মেয়ের রং কেন শ্যামলা হবে ভেবে রুমার ছোটবেলায় ভগবানের ওপর কি রাগ। রুমা দেখতে খারাপও না, ভালোও না। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ একেক দিন ওকে বড্ড সুন্দর মনে হত। অনেকে সেটা লক্ষ্যও করত।

দোতলায় কিটির শোবার ঘরের জানলা খুললেই নিচে বাড়ির পেছনের বাগান দেখা যেত। সেকালের যাদের অবস্থা একটু ভালো ছিল, তাদের বাড়িতে বাগান থাকত। দু-পাশে পিসিমার বড় শখের দু-সারি সুইট-পী গাছে ছড়া ছড়া ফুল ফুটেছিল; তার মিহি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। নিচের খোলা বারান্দার রেলিংএর থামের ওপর চীনে-মাটির গামলায় ফিকে হলুদের সঙ্গে গাঢ় বেগনি রংয়ের প্যানজি ফুল, দেখে মনে হত ছোট ছোট সুন্দর মেয়ের মুখ। মধ্যিখানে ঘাস-জমি। তার পেছনে উঁচু মেদীর বেড়া, তার পেছনে

চাকর-বাকরদের গুদোম ঘর। তারি একটাতে আয়া থাকে। সেখানে যাবার পথটিও মেদী গাছ দিয়ে আড়াল করা। তবে এখান থেকে সবই দেখা যায়। আয়ার ঘরে তেলের বাতি জ্বলছিল।

কির্টির ঘর গুছোতে গুছোতে রুমা ভাবছিল, মা এখন কি করছেন? যতক্ষণ না বাবা ডিস্পেনসারি ঘরের দরজায় তালা দিয়ে, বাড়ির ভিতরে না আসছেন, মাও ততক্ষণ কাঁচে মোড়া বারান্দায় বেতের ঝুড়ির মতো চেয়ারে, তুলোর কুশনে ঠেস দিয়ে, নিশ্চয় বুড়ি মিসেস পিন্টোর সঙ্গে বসে ক্রুশের লেস বুনছেন আর গোটা কার্সিয়াং-এর হাঁড়ির খবর নিচ্ছেন। একবারো কেউ সন্ধ্যের আলো লাগা বরফের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছেন না।

একটা ক্লাব ছিল ওখানে। সেখানে সন্ধ্যেবেলায় বুড়ো-বুড়িরা তাস খেলত। ফিরিঙ্গিরা আর কিছু কিছু সাহেব-ভাবাপন্ন দিশী ছেলেমেয়েরা নাচগান করত। রুমার মতে নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদ হত ; খুব ভালো খাবার-দাবার পাওয়া যেত। পাহাড়ি ঝি-চাকররা উল্টো দিকের পাহাড়ের গায়ে সারি সারি বসে মজা দেখত। কিন্তু মা-বাবা কখনো যেতেন না। মা বলতেন পয়সা দিয়ে তাস খেললে সেটাকে জুয়োখেলা বলে। আর নাচ মানেই তেষ্টা, তেষ্টা মানেই বোতল থেকে তেষ্টা মেটানো। তার থেকে ঢলাঢলি হতে কতক্ষণ? নভেল পড়তেন না মা ; বিশ্রী সব প্রেমের গল্প।

তাহলে করবেনটা কি? হেঁটে বেড়াতে পারেন না ; কুড়ি বছর আগে একবার পড়ে গিয়ে পায়ের সরু একটা হাড় সরে গিয়েছিল, এখনো হাঁটলে ব্যথা করে। কোনো দিনই হেঁটে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করত না ; বাবাই জোর করে সঙ্গে নিয়ে হাঁটাতেন। তার ফলে চিরদিনের মতো পা-টা পঙ্গু হয়ে গেল। বেড়াবেন কি করে? যেমন কপাল করে এসেছিলেন, রিকশো রাখার খরচ কুলোয় না।

মিসেস পিন্টো আলোর দিকে ফিরে ক্রুশের টেবল স্টিচের ফাঁশ টেনে হয়ত বললেন, 'সত্যি বড্ড একসপেনসিভ, ডিয়ার, ডক্টর রয় পারবেন কেন? আমরা তো পাহাড়ে এসে ইস্তক রিকশ চড়িনি।' শুনে মা-র নিশ্চয় একটু রাগ হল। কিসে আর কিসে। বুড়ো পিন্টোর গরম মোজা-গেঞ্জির ব্যবসা। দোকানদার। তার সঙ্গে অর্ণব রায়ের ছেলের তুলনা।

রুমার মনে পড়ল ঐ পাহাড়েরি গায়ে ধাপে ধাপে ফুল-ফলের বাগান করেছিল মিসেস পিন্টোর ছেলের বৌ আর খৃশ্চান বুড়ি মিসেস বাণ্ট। তারা জ্যাম, জেলি, চাটনি করে, বাহারে বোতলে ভরে, লোক পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি বেচত। মা বলতেন, 'দোকানদারি, আমার আসে না। কি করব, এসব তো আর শিখিনি। অথচ তোর ঠাকুরদার ঐ এক ছেলে!' 'ত্যাজ্য পুত্র, মা, ছেলে নয়।' 'দিতে চেয়েছিল তোর পিসিমা অর্ধেক টাকা। নিলেন না। আত্মসম্মানে বাধল। স্ত্রী খুঁড়িয়ে চললে কিন্তু বাধে না।' এত কথা রুমা আগে জানত না। আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, 'তাহলে বাড়িটার অর্ধেক বাবা নিলেন কেন?' কাষ্ঠ হেসে মা বললেন, 'বাড়ির অর্ধেক তো উইল করে তোর ঠাকুমা তোকে দিয়ে গেছেন। বাবা না বলবার কে?' সেই অর্ধেকটা পিসেমশাই ১০০ টাকায় ভাড়া নিয়েছেন। রুমা আবার তার একটুখানি বলা যেতে পারে ২০ টাকায় ভাড়া নিয়েছে। ভাবলেও রুমার হাসি

পেত। নিজেই নিজের সাবটেনান্ট্। কিন্তু হাসবে কার সঙ্গে, এ-বাড়িতে ডিনার পার্টির সময় কেউ মজার কথা বললে সবাই হাসে, অন্য সময় হাসে না। পিসেমশায়ের শার্টের উঁচু শক্ত কলারে যখন কানে সুড়সুড়ি লেগেছিল বলে রেগে গেছিলেন, তখনো কেউ হাসেনি। বাসব বলে ব্রাহ্মদের হাসতে নেই। রাগে গা জ্বলে যায়।

কেশবদের বাড়িতে এসব কথা হয়। সেখানেই তিনপুরুষ ধরে সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ। এক সময় কেশবের ঠাকুরদার মারফত অর্ণব আর কানু তর্কাতর্কি করতেন; নিজেদের মধ্যে তো কথা বন্ধ। পিসিমার কাছে শোনা, একবার নাকি কানু দশ-সেরি এক কাৎলা ধরে, অর্ণবের ভাগটা কেশবের ঠাকুরমার কাছে দিয়ে এসেছিলেন, পাঠিয়ে দেবার জন্য। তিনিও মাছটা রেঁধেবেঁধে নিজে এসে অর্ণবের স্ত্রীর কাছে দিয়ে গেছিলেন। কে ধরেছে কার মাছ পরে বলেছিলেন। কানু মলে অর্ণব পেট-ব্যথা হয়েছে বলে সারাদিন নিজের পড়ার ঘরের কৌচে শুয়েছিলেন। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে। এসব হাসির কথা না কি কান্নার কথা রুমা ভেবে পেত না।

কিটির আলমারি লণ্ডভণ্ড। যাবার সময় এখান থেকে ওখান থেকে জিনিস টেনে কুমীরের চামড়ার স্যুটকেসে ভরেছিল। কেমন রাগ রাগ ভাব। রাগ, না অনুরাগ রুমা বুঝতে পারত না। দুটোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য মনে হত। ভালোবাসা। ভালোবাসাই হল দুনিয়ার যত নষ্টের গোড়া। এই তো রুমা বেশ আছে। ভালোবাসাটাসাকে ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না। আর কে-ই বা কালো মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসায় পড়বে। বেশ আছে রুমা। বাবাকে দেখতে হয়। ভালোবাসার জন্যে আর মেয়ে পেলেন না; কি? না, বাসবের বড় পিসিকে পছন্দ। তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না! সবাই হাঁ। ফরসা একটা মুখ্যু মেয়ে। অবনী তার জানেই বা কি, আর দেখেছেই বা কতটুকু? দু-বাড়িতে তো কোনো সম্বন্ধ ছিল না।

ছোট্ট একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল রুমার ঠোঁটের কোণে। শূন্য ঘরে রুমা সুন্দরী হয়ে উঠল। কেউ দেখতে পেল না। দেখাশুনো হয় বই কি। কেশবের ঠাকুরদার বাড়িতে। যেমন বংশপরম্পরায় দু-বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা দেখা-শুনো করে এসেছে। এবং এখনো করে। ঠাকুরদারা সবাই গত হয়েছেন তবু নিয়মগুলো চলেছে। মহা মুখফোঁড় ঐ কেশবটি। বেজায় ফূর্তিবাজ। নিজের বাবার মুখের ওপর হক কথা বলে দেয়, কাউকে ভয় পায় না। হাসে আর বলে। সবাই ওকে ভালোবাসে। যেখানে বিপদ-আপদ সেখানেই কেশব। রুমার চেয়েও একটু ছোট। কিটির সমান। এক সময় আমগাছের ডাল বেয়ে এ-বাড়িতে এসে, ওদের সঙ্গে কম মারপিট করেনি। অথচ সদর দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা করতে ওর কোনো বাধা ছিল না। সে দিক দিয়েও আসত। ভালোমানুষ সেজে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। আবার চোখাচোখি হলেই চোখ মটকাত। ভীষণ চালাক। পড়ায় বেজায় ভালো। বছর দুই আর আসেটাসে না। বিলেত পাঠাবার টাকা নেই বাপের, তবে এবার দিল্লী থেকে ছেলেরা আই-সি-এস-এর জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। বোধ হয় সেখানেই গেছে কেশব, অনেকদিন তো দেখা নেই। ও থাকলে পাড়াটা দিব্যি সরগরম হয়ে ওঠে।

বাবাও নাকি আগে ঐ রকম ছিলেন। চালাক ফূর্তিবাজ। বাসবের বড় পিসির সঙ্গে বিয়ে হল না। তারপর থেকেই অন্য রকম হয়ে গেলেন। খুব ফূর্তিবাজ ছিলেন। নিন্দুকরা বলত বড্ড বেশি ফূর্তিবাজ। আর এখন দেখতে হয়। ক্লাবে যান না, কেন না ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েগুলো ফূর্তি করে। ফূর্তি কি খারাপ জিনিস? কেশবেরো ফূর্তি এদানীং কমে গেছিল। এই কথা মনে আসবামাত্র কিটির একটা রেশমী কাপড়ে টান দিতেই ঠুক্‌, করে একটা জিনিস মাটিতে পড়ল। সিল্কের কাপড় জড়ানো রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো কেশবের একটো ছোট্ট ফোটো।

তার কোণায় লেখা 'তোমার কেশব'। অমনি কিটি রহস্যের সব পরিষ্কার হয়ে গেল। 'তোমার কেশব'। ফোটোটি আবার জড়িয়ে তুলে রাখল রুমা। মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল।

কেশব কিচ্ছু রূপবান ছিল না, কিন্তু তবু বড্ড ভালো দেখতে। তার মানে দেখতে ভালো লাগত। কিটি কিন্তু ভারি সুন্দরী। ছোটবেলা থেকে সব্বাই ওকে ভালোবাসত। এখনো বাসে। বাসব বলত, 'কিটি হল সুন্দরী আর রুমা হল ছু ছুন্দরী!' ওকে বলত, 'এই তুই কিটির পাশে দাঁড়াস না, তাহলে তোকে বাঁদরের মতো দেখায়। বাঁদরের মতো স্বভাব সে তো সবাই জানে, আবার দেখাবার কি দরকার?' বলা বাহুল্য রুমা তখন ওকে ভেংচি কেটে, খিমচে আঁচড়ে একাকার করে দিত। আর কিটি বড় বড় চোখ করে বলত, 'ছি, রুমাদি, ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েরা সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।' কেশব হি-হি করে হেসে বলত, 'বাঁদরের আবার কদ্দুর হবে?'

এই বাড়ির ছাদে আমগাছের ডাল বেয়ে উঠে আসত ওরা। সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেত। কালীপূজোর রাতে এরা ছাদে উঠে ফুলঝুরি জ্বালাত। কেশবটা হাসত আর বলত 'তবে না ব্রাহ্মরা হিন্দুদের পূজোয় যোগ দেয় না? এই তো এরা দিব্যি ফুলঝুরি পোড়াচ্ছে। ফুলঝুরি আর পৌত্তলিকতায় তফাৎটা কি হল শুনি?' মহা পাজি ছিল কেশবটা।

আমগাছটা গত বছর পড়ে গেছে। আজকাল কেউ যাওয়া-আসাও করত না। তবু দুঃখ হত। এই বাড়িতেই রুমার ছোটবেলার অনেকখানি কেটেছিল। ঠাকুরদা মারা যাবার পর, ঐ কেশবের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুমা কার্সিয়াং গিয়ে রুমাকে ফিরিঙ্গি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। পিসেমশাইরা তখন রেঙ্গুনে ছিলেন। এসেও পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। কিটিকে লোরেটোতে দিলেন। রুমা গেল নতুন প্রতিষ্ঠিত গোখেল মেমোরিয়েলে। সে কি আজকের কথা।

কি সুন্দর কিটির এই ঘরটি। এটা নাকি বাবার ঘর ছিল, পিসিমা বলেছেন। এই রকম সুন্দর করেই সাজানো ছিল, শীতের শেষে বসন্তের বাতাসে এই রকম নিমফুল উড়ে এসে ঘর ভরে রাখত। এমন ঘরে মানুষ হয়ে বাবা কি করে কার্সিয়াং-এর ঐ ঘুপসি বাড়িতে সুখী হয়? সুখী কি? হয়তো সুখী নন, সন্তুষ্ট। ভালবাসলে কেউ কখনো সুখী হয়? বাবা সুখী হতেই পারেন না। শীতের ভয়ে মা জানলা খুলতে দেন না। শীত নাকি ঘরে ঢুকে বাসা বাঁধে। দিনে গোলাপী লেসের পরদা, রাতে সবুজ কম্বলের পরদা। কাঠের মেঝের ওপর নারকেল ছোবড়ার ম্যাটিং পাতা। তার থেকে গুমো-গুমো গন্ধ বেরোয়।

রবিবার সকালে বাবা মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করেন। মা ক্ষীণ সুরে ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে গান করেন। জনা পাঁচেক লোক উপাসনা শুনতে আসেন। তাঁরা কেউ নাকি ব্রাহ্ম নন। রবিবার বাড়িতে নিরামিষ খেতেন। মজা করে বানিয়ে গল্প বললেও মা রাগ করেন। মাকে তাঁর পাওনা ভালোবাসা দিতে পারেননি বলে, মা যা বলেন বাবা তাতেই রাজি হন।

নিজের চিন্তায় নিজেরি হাসি পায়। পাওনা ভালোবাসা আবার কি? ভালোবাসা কারো পাওনা নাকি? বহু ভাগ্য করে এলে না চাইতেই পাওয়া যায়। যায়-ও না। এই দু-বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বংশ পরম্পরায় এ-ওকে ভালোবেসে এসেছে। তাতে কে কি পেয়েছে? অন্যকে বিয়ে করে জীবন কাটিয়েছে। হয়তো সুখেই কাটিয়েছে। ছেলে-মেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়েছেন। ভালোবাসা পায়নি বলে কিচ্ছু এসে যায়নি। খালি বাবার মনের ফূর্তি চলে গেছে। পিসিমার বিরস-বদন। কিটির রোজ জ্বর আসে, খিদে হয় না, স্বভাব উড়নচণ্ডী হয়ে ওঠে।

আর রুমা? দুম্ করে আলমারির দরজা বন্ধ করে রুমা ভাবে রুমা মা-বাবার অভাবের সংসারে ১০০ টাকা পাঠায়। ও-বাড়ির কার মনে কি হয়, রুমার জানবার কথা নয়। ছোট্টো একটা ফোটোয় লেখা 'তোমার কেশব'। রেশমী কাপড়ে জড়ানো ছোট্টো একটা ছবি। যার ছবি, সে ছেলে কেবলি ব্রাহ্মদের টিটকিরি দেয়। দুগ্গো পুজোয় পিসিমা চাঁদা দিতেন না। কোনো পুজোতেই দিতেন না। অর্ণবের সময় থেকে এরা সবাই জানে পৌত্তলিকতা খুব খারাপ। পুতুল-পুজো করলে ইয়ে—ঠিক কি হয় তা না-জানলেও খুব খারাপ তাতে সন্দেহ নেই। বড্ড ঢাক-ঢোল পেটায়। পড়ার ক্ষতি করে। ঘুমোতে দেয় না। ঢাক ঢোল থেমে গেলেও চোখে ঘুম আসে না। এই তো পাঁচ বছর আগেও কেশব বলেছিল, আশুবাবুর পাঁঠাবলির মাংস খাওয়া খুব অন্যায় বুঝি? ভগবানের নামে প্রাণী হত্যা। আর নকুড় যে শেখের দোকান থেকে মাংস আনল, সে তো হালাস্ করা মাংস। ঝপ করে বলি দেওয়ার চেয়ে বুঝি গলার খানিকটা কেটে ছেড়ে দেওয়া ভালো? কেমন ছটফট করে মরে বল? কিটি-রুমা কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়েছিল। বাড়িতেও কিছু বলতে পারেনি। কি জানি পিসিমা যদি বলে বসেন 'ও বাড়িতে যেও না।'

সুখ? প্রেমের সঙ্গে সুখের কি সম্পর্ক? পিসিমা বলেন, 'কিটির একটা ভালো বিয়ে হয়ে গেলেই আমি সুখী হই।' মা বলেন, 'মাসে আমার হাতে নগদ পাঁচশোটা টাকা এলেই আমি সুখী হই। আর কিছু চাই না।' আর ওঁদের চাইবার কি আছে? কিটির একটা ভালো ছেলে হলেই হল। অর্থাৎ ফ্যাশানেবল ও সচ্চরিত্র। ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করলে, হিন্দু হলেও ক্ষতি নেই। খুব বড়লোক হবারো দরকার নেই। কিটি তার মা-বাপের সর্বস্ব পাবে। অমন ছেলে পাওয়াও যায় হয়তো। তা কিটি কিছুতেই রাজি হয় না। এই হল মুশকিল।

পিসিমাদের বাড়িতে যাঁরা ডিনার খেতেন তাঁদের অর্ধেক হিন্দু। মুরগিও খেতেন। বাসব পর্যন্ত বিলেত থেকে ফিরে, পিসেমশায়ের কোন বন্ধুর স্ত্রীর চিকিচ্ছে করে অবধি ডিনারে নেমন্তন্ন পেয়েছে। কিন্তু আসেনি। নাকি বড্ড কাজ। তাই না আরো কিছু। ঐ সব ফ্যাশানেবল অতিথিরা নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কথা বলতেন। মহিলারাও। অনেকেই

পিসিমার মতো স্বামীদের সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছেন। কিটিও এসেছে। যারা ভয়ংকর বেপরোয়া, তারা গালে একটু রুজ, ঠোঁটে একটু গোলাপী রং লাগায়। আধ-বুড়িরাও। তাতে কিছু চরিত্র খারাপ হয়ে যায় না। ভুরুতে পেনসিল দাগ টানে।

পিসিমা শুধু গোলাপী ফেস পাউডার মাখতেন। কিন্তু কিটি যদি তার বন্ধুরা যা করে তাই না করে, তারা তো ওকে টিটকিরি দেবে। বলবে ডাওডি। রুমা শুধু মুখে একটু পাউডার ঘষে। তাও গায়ে মাখবার ট্যালকাম পাউডার। নইলে নাকটা বিশ্রী রকম চকচক করে। রুমার কথা বাদ দেওয়া যাক।

এর মধ্যে কিটির এক বন্ধু জুটেছিল। মদন মল্লিক। কি চমৎকার দেখতে। কি ভালো ঘোড়া হাঁকায়। পোলো খেলে। বাপের মস্ত ব্যবসা। বাড়িসুদ্ধ বিলেত ফেরত। হিন্দু। তাতে আর কি। পিসেমশাইও তো হিন্দু ছিলেন। গোঁড়া হিন্দু। এখন দেখতে হয়। সবাই বলতে লাগল মাণিক-জোড়। তা ঐ মদন এই শেষবার বিলেত গিয়ে, মেম বিয়ে করে, ব্যবসার লণ্ডন আপিসের ভার নিয়ে থেকে গেল।

সবাই বলতে লাগল, ঐ দেখ কিটি রোগা হয়ে গেছে, ভালো করে খায়-দায় না, চোখ অস্বাভাবিক চকচকে, খালি পার্টি, পিকনিক, বাপের গাড়ি না পেলে বন্ধুদের গাড়ি, এক দিন অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাকো বাসবকে। বাসবের বাবা সোমনাথ বললেন, যাও শীগগির। টিনির মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাসব কালো ব্যাগ নিয়ে এসে ওষুধপত্র দিল, জ্ঞান হল। পিসিমাকে আশ্বাস দিয়ে বাসব বলল, 'ও কিছু না। স্রেফ বাড়াবাড়ির ফল। খায় না, বিশ্রাম করে না। ছোটবেলায় কি লক্ষ্মী মেয়েই না ছিল। যত দুষ্টু ঐ রুমা। কিটিকে শিমলা নিয়ে যান পিসেমশাই, এখন তো সীজন। আপনারো একটা চেঞ্জ দরকার—।'

তাই গেল ওরা। বাড়ি অন্ধকার। আজ ওদের ফেরার কথা। কোথায় যেন এক রাত থাকবে। আজ রাতে পৌঁছবে। এখন আয়া নিয়ে এই হ্যাপা।

সোমনাথ কাকা বাবার সঙ্গে পড়তেন। বেজায় ভাব ছিল। তখন দুই বাড়িতে মুখ-দেখাদেখি ছিল না। তবে আম-গেছো পথটি ছিল। সোমনাথের বড় মেয়ে শান্তিলতা মহা দুরন্ত ছিল। ফরসা ধবধবে, খ্যাঁদা-বোঁচা, এই বড় বড় চোখ, দিন-রাত হাসত আর গড়-গড় করে গাছের ডাল বেয়ে এ-বাড়িতে চলে আসত। তার যখন ষোল বছর বয়স, তখন তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কানু চৌধুরী বিয়ে দিয়ে দিলেন। খবর পেয়েই বাবা বাড়ি থেকে পালিয়ে পাটনায় আংকল জাম্বোর বাড়িতে চলে গেছিলেন। তাঁরা খৃষ্টান। কেশব বলে, 'খৃষ্টানে মুসলমানে, ব্রাহ্মে তফাৎটা কি শুনি? যার উপাসনা করে তাকে দেখতে পায় না পর্যন্ত। বিরক্ত হয়ে সে উঠে গেল কি না তাও টের পায় না।'

যা তা বলে কেশব। নাকি রামমোহন রায়ের এক বংশধর নেশাটেশা করত। তাকে কেউ বলেছিল, 'ছিঃ লজ্জা করে না? রামমোহনের বংশধর হয়ে নেশা কর?' সে নাকি হেসে বলেছিল, 'আমার ঠাকুরদা তেত্রিশ কোটি দেবতা কেটে এক ব্যাটাকে রেখেছিল, আমি তাকেও বিদেয় করে দিয়েছি।' কিটি রুমার হাত ধরে টেনে বাড়ি চলে এসেছিল। ভারি অসভ্য ঐ কেশব। 'তোমার কেশব।' রুমার গলার কাছটা ব্যথা করে।

ততক্ষণে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কিটির ঘর সাফ-সুফ হয়ে গেছে। পরাণ ধোপা দরজার বাইরে থেকে ডেকে বলে, 'মাসিমা তো কাপড়টা নিচ্ছেন না। এদিকে ভাটি চড়িয়েছি, বসতে-ও পাচ্ছি না।' পরাণের বাড়ি পাশের গলিতে। মধ্যিখানের উপবনের এক ধারে সে কাপড় শুকোয়। তারা তিন পুরুষ ধরে এ-পাড়ার তিন পুরুষের কাপড় কেচেছে, কোনো বাড়ির কোনো গোপন কথা তার অজানা নেই।

রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কি হয়েছেটা কি? অন্য কাপড়ের সঙ্গে ওটা দাওনি কেন।' 'ওমা! দেব না কেন। নেয়নি।' 'নেননি কেন?' ওনার ইচ্ছে। কোল-আঁচলে সিকি পরিমাণ হলুদ লেগিছিল। দেখাও যাচ্ছিল না। তা বলেন কি না 'চার নম্বরের গায়ে-হলুদ যাবার জন্য এ কাপড় তুই ভাড়া দিয়েছিলি। ও আমি নেব না।' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তা আবার ধোয়া-পাকলা করে এনেছি। এখন কাঁদা-কাটা লেগেছে, ডাকছি, শুনছে না। সোমনাথবাবু বললেন, 'দিদিকে দে না যা।'

রুমা অন্যমনস্কভাবে কাপড়টা নিয়ে বলল, 'কাঁদাকাটি কিসের পরাণ?' পরাণের মুখ হাঁড়ি হল। 'কি জানি, আমাদের তাতে কি দরকার। ঐ আয়ার কি হয়েছে। তুমি আবার ওদিকে ছুটো না।' যা দুরন্ত স্বভাব তোমার, একবার আমার নীলের গামলায় পড়েছিলে না।' এই বলে পরাণ দুদ্দুড় করে নেমে গেল। রুমা বর্তমানে ফিরে এল। আয়াকে নিয়ে কাঁদাকাটি কিসের ভেবে পেল না রুমা। বড্ড রান্নার শখ ছিল রুমার, সেলাইয়ের শখ ছিল। যাকে পেত তাকে ধরে কত রকম যে শিখে নিয়েছিল তার ঠিক নেই। এ-বাড়িতে তার কিছুই কাজে লাগত না। মাইনে করা সাহেব-বাড়ির দরজি ছিল। রান্নাঘরে বেয়ারা বাবুর্চির সঙ্গে মেলা-মেশা পিসিমা পছন্দ করতেন না। তা হলে নাকি ওরা খাতির করে না। কে জানে। বেয়ারার নাম যে নকুড়, সে তো রুমার আবিষ্কার। আয়ার নাম ফুলমণি। সবাই ডাকে বেয়ারা, আয়া। জনকে বলে বোর্চি। সাহেবরা বাবুর্চি বলতে পারে না, তাই বলে বোর্চি। কিন্তু মেডিটারেনিয়ন সী বলতে পারে, এমনি অদ্ভুত। রুমা পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটু একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, কিন্তু পিয়ানো বাজাতে শেখেনি। অত দাম দিয়ে কে পিয়ানো কিনবে যে অভ্যাস করবে? বর্মায় কিটির জন্য পিয়ানো কেনা হয়েছিল। সেই এক অভ্যাস হল। এখানে এসে মেয়ের কি কান্নাকাটি। শেষটা এখানেও একটা কেনা হল। কিটি তাতে মাঝে মাঝে টুং-টাং ঢং-ঢং করে। নিচের তলায় নিজের ঘরে বসে রুমা আপিসের কাগজপত্র দেখতে দেখতে শুনতে পায়। ভালোই লাগে। কিটি কারো সঙ্গে ঝগড়াও করে না, নিজের গোঁ-ও ছাড়ে না। বড্ড ভালো কিটি। রুমা রেগে-মেগে মনের কথা সব ঝেড়ে ফেলে, অন্য লোককে খুসি করবার জন্য কি না করে? যার যেমন স্বভাব। কিটিকে বড্ড ভালোবাসে রুমা। নাঃ, নিচে বড্ড গোলমাল হচছে। এ-বাড়িতে কেউ গলা তুলে কথা কয় না। আজ আবার হল কি?

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখে রুমা। মানুষ কেমন নিজের পরিবেশে নিজের ছায়া রেখে যায়। ঘরময় বসন্তের নিমফুলের স্মৃতির সঙ্গে আরো গভীর এক সুগন্ধ। সে কি কিটির বিলিতী সাবান, এসেন্সের? নাকি ওর অঙ্গ-সৌরভ? ওর সব সুন্দর। ওকে নতুন চোখে

দেখল রুমা। কিন্তু বাসব? ছোটবেলায় বাসব, ইন্দু, রতন, সতু, নীলু, সবাই কিটিকে ভালোবাসত। ও পড়ে গেলে সবার কি উদ্বেগ। ও কাঁদলে সবাই উদ্‌ভ্রান্ত। ওকে খুসি করতে সবাই তৎপর। বাসব ছিল সবার বড় ; নিজেকে সক্কলের নেতা মনে করত ; কিন্তু কিটির কথার ওপর একটি কথা বলত না। হাত-পাগুলো পদ্মফুলের মতো। একবার ফ্যাশান করে এই বড় বড় নখ রেখেছিল। তাতে পালিশ লাগাত। তারপর এক কাণ্ড। ওদের স্কুলের পিয়ানো টিচার একদিন রেগেমেগে বললেন, 'পিয়ানোর ওপর আঁচড়-কাটা বের কচ্ছি!' বলে এই বড় এই কাঁচি দিয়ে সব নখগুলো মুড়িয়ে কেটে দিলেন। বিকেলে সে কথা শুনে ঠাকুমা থেকে ছোকরা মশালচি পর্যন্ত—মশালচি হল বোর্চির অ্যাসিস্টেন্ট—সবাই হেসে লুটোপাটি। কিটি প্রথমে রাগে দুঃখে ফোঁশ-ফোঁশ করছিল, তার পর হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলেছিল। সুন্দর কিটি। কিন্তু, কেশবের কি হবে তাহলে? ফুর্তিবাজ কেশব-ও কি বাবার মতো হয়ে যাবে? আর মজার কথা বলবে না? কি হবে? এ দুটো বাড়ি হল ব্যর্থ প্রেমের বাড়ি। কেশব-ও বাসবদের নিকট আত্মীয়। এত ভালো-ও লাগে এই দু-বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পরস্পরকে। একে অপরকে না হলে চলে না। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্য জায়গায় বিয়ে হয়। আলাদা সংসার হয়। সেই পুরনো প্রেমের অংকুর নিয়ে আরেক পুরুষ জন্ম নেয়, বড় হয়।

কিন্তু, ঠিক এই সময় সমস্ত বাড়িটা হঠাৎ থমথমে চুপচাপ হয়ে গেল কেন? তার পরেই নীরবতা ভেঙে ঝাঁঝালো কর্কশ সব গলার স্বর শোনা গেল। রুমা কিটির ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সিঁড়ির নিচে হল্‌ঘর, তার ডানদিকে বসবার ঘর, বাঁ দিকে খাবার ঘর। তার পর প্যান্ট্রি, সেখানে তৈরি খাবার-দাবার, বাসনপত্র থাকে। তার পেছনে স্কালারি, সেখানে বাসন ধোয়া হয়, চাকররা গল্প করে, তারপর আলাদা করে রান্নাঘর অর্থাৎ বোর্চিখানা। যাতে উনুনের ধোঁয়া ঘরে না আসে।

প্যান্ট্রিতে নিরপেক্ষ জায়গায় দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেমন্তপিসি বলছিলেন, 'সবাই যদি একজোট হয়ে এভাবে মুনিবকে ঠকাও, তাহলে আমার বলার কিছু থাকে না। সবাইকে এক মাসের নোটিস দিলাম। অন্য কাজ দেখ।'

জং পঁচিশ বছর ওদের রান্না করেছে, সেই বর্মা থেকে, সে সহজে মুখ খুলতে জানে না। বাংলা জানে কি না? তা-ও বোঝা যেত না। আজ হঠাৎ উদ্ধত স্বরে বলল, 'আমরা যাব কেন? আমরা গেলে সবার কষ্ট হবে।' হেমন্তপিসি চেঁচিয়ে বললেন, 'সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না! সব মুসলমান কিম্বা খৃশ্চান চাকর রাখব। তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো তারা, এত জোচ্চুরি করবে না?'

জং বেপরোয়াভাবে বলল,—'যা মুখে আসে বলবেন না, মাসিমা। মেম-সাহেব জানেন আমরা কেমন লোক। বোনঝিটাকে কোথায় ফেলে দেব? ছোট বোনটাও মরে বেঁচেছে মেয়েটা জাত ভেঙে বিয়ে করল। কারো মানা শুনল না ; জামাইয়ের চাকরি গেল। কেউ একটু দাঁড়াবার জায়গা দিল না। আমি একা মানুষ, বাসায় থাকি। মাসিমা বললেন আয়ার কাজ জানা চাই, পেছন পেছন ব্যাটা ছেলে ঘুরবে না, ত তাকে স্বামী বল,

ভাই বল, বন্ধু বল, যা-খুশি বল ঘর পাবে, শুকনো রসদ পাবে, বিশ টাকা মাইনে পাবে। জামাইটাকে বললাম তুমি এদিকে এসো না, পল্টনে নাম লেখাও। তা শুনল কই।'

পিসিমা হঠাৎ রেগে গেলেন, 'দূর করে দাও বাড়ি থেকে। অসভ্যতা করার জায়গা পেল না।'

তখন নরম-সরম নকুড় পর্যন্ত বদলে গেল ; 'বলুন মেম-সায়েব, এ বাড়িতে ছেলে হলে, ওকে রাখতেন আপনি? তাই ওযুধ খেয়েছিল। এখন প্রাণ যায়।'

চোখের কোণা দিয়ে রুমা দেখতে পেল, চাকরদের খিড়কি-দোর দিয়ে ঢুকে কারা যেন ঝোপের পেছনে পথ দিয়ে গুদামের দিকে যাচ্ছে, আসছে। একটু পরই রান্নাঘরে পেছনের দরজা থেকে বাসব ডাকল, 'তুমি একটু এসো, রুমা। সাহায্য করার কেউ নেই।' রুমা অমনি রওনা। পিসিমা, হেমন্তপিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যেও না বলছি, রুমা। মানা করছি! বাসব কি পাগল হল?'

রুমার কানে কথা গেল না, সে গুদোম-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এর পরের দেড় ঘণ্টার কথা ভাবা যায় না। বিজলিবাতি ছিল না গুদোমে। রুমা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল পাশের বাড়ি থেকে মস্ত এক পেট্রোম্যাক্স বাতি উঁচু করে ধরে, সোমনাথ এসে ঘরে ঢুকলেন। বাসব তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে পড়ল। এমন সময় পিসিমা, হেমন্তপিসিমা কিসব কাপড়-চোপড় নিয়ে এসে উপস্থিত। হোঁৎকা লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছিল। পিসিমা বিরক্ত হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি এখানে কি করছ, বাপু? এ কি ব্যাটাছেলের জায়গা। যাও রান্নাঘরে, নকুড় চা দেবে।' লোকটা ছুটে পালাল।

পাঁচ মাসের ছেলে বাঁচে না। ফুলমণির ছেলেও বাঁচল না। কিন্তু ফুলমণি যমের দুয়োর থেকে ফিরে এল বাসব তাকে টেনে নিয়ে এল। আরো অনেক পরে, রুমা তার নিজের বিছানা থেকে পরিষ্কার চাদর এনে দিল। নিজের পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরিয়ে দিল। ততক্ষণে বাসব রুমার স্নানের ঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে একতলার পেছনের বারান্দায় দাঁড়াল। সোমনাথের নতুন দারোয়ান হল জংএর দেশ-ভাই। তার বৌ এসে ফুলমণির ভার নিল। ঘরদোর সাফ হল। ফুলমণি কান্না থামিয়ে ঘুমোল। রুমা ছুটি পেল।

পেছনের বারান্দার চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে, ওপরে উঠেই বাসবের সঙ্গে মুখোমুখি। নীল নবঘন মেঘের মতো শ্যামসুন্দর বাসব। রুমার চোখে কালি, রুক্ষচুল, শুকনো মুখ, চকচকে নাক, ময়লা কাপড়-চোপড়। এর আগে সে কখনো পাঁচ মাসের মরা ছেলে দেখেনি। বাসব ওকে দেখে ভাবল এত খারাপ ওকে কখনো দেখায়নি। প্রবল স্নেহের জোয়ারে গলাটা বুজে এল। বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। তিন পুরুষের গোপন ব্যথা দু' ফোঁটা চোখের জল হয়ে রুমার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, বাসব তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই সময় বারান্দার উজ্জ্বল বিজলি বাতিটা জ্বলে উঠল। বাসব সঙ্গে সঙ্গে রুমাকে ছেড়ে দিয়ে, তার আঁচলের কোণাটি ধরে রাখল। যাতে পালাতে না পারে। গোলাপী ডুরে শাড়ি পরে, ভোমরার মতো কালো কোঁকড়া চুল কাঁধ অবধি ঝুলিয়ে, কিটি

খিলখিল করে হেসে বলল, 'ড্যাডি! কাণ্ড দেখ। মনে হচ্ছে ডবল-ওয়েডিং ইণ্ডিকেটেড্।'

এ কিটিকে চেনা যায় না। আনন্দ তার সর্বাঙ্গ থেকে উছ্‌লে পড়ছে। রূপের ছটায় বারান্দা আলো। সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই ঢুকে একবার বাসবের দিকে, একবার রুমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আই সী। পেছিয়ে কেন কেশব? এই নাকি তোমার সাহস! বাসব, এসো বাবা। কেশব আই-সি-এসের বদলে রেলের কি সব পরীক্ষা, ইণ্টারভিউ দিয়ে ভালো চাকরি পেয়ে গেছে।'

বারান্দায় বড্ড ভিড়। পিসিমা, হেমন্তপিসিমা শক্‌ড মুখ করে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় অনাবশ্যকভাবে প্রজ্জ্বলিত পেট্রোম্যাক্সটা হাতে নিয়ে বারান্দায় উঠে এসে সোমনাথ বললেন, 'টিনি, ওদের আশীর্বাদ কর। অর্ণব আর কানু তাদের বংশধরদের যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছে। আর নয়।'

তারপর পিসেমশায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্রাদার, আর দেরি নয়, কাল থেকে পাঁচিল ভাঙা হবে।'

পিসেমশাই মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বললেন, 'রাইট। আর গৌর অ্যাক্টে ডবল বিয়ে।'

আনন্দের চোটে পিসিমার মুখ লাল হয়ে উঠল, তিনি চারজনকে একসঙ্গে কোলে নেবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। হেমন্তপিসিমারো হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল ; হেসে বললেন, 'যাই কার্সিয়ং-এ অবনীদাদের টেলিগ্রাফ করি।'

শোভার চলে যাওয়া

কবিতা সিংহ

নতুন বাড়িতে সবে তিনদিন হল এসেছে শোভারা। এবারে আর ফ্ল্যাট নয় আস্ত একটা বাড়ি। এমন কি, সঙ্গে খানিকটা বাগানও আছে।

দেবব্রত নিচে তার নিজস্ব একটা অফিস ঘর করছে এবার। আগের ফ্ল্যাটে স্টাডিঘরের জন্যে যে সেক্রেটারিয়েট্ টেবলটা সেল্ থেকে কিনেছিল, সেটা এবার অফিস ঘরে নেমেছে। আজই সকালে দেবব্রত তাড়াহুড়ো করে বাতিল অ-দরকারী কাগজপত্র সব ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে জড়ো করেছে।

শোভা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানের হাস্নুহানা ঝোপের দিকে যাচ্ছিল। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা বাগানের পাশের ইঁট-বাঁধানো চাতালে উপুড় করে ফেলে, নতুন কাজে লাগা বালকভৃত্য রাখাল, ছেলেমানুষী কৌতূহলে রঙিন লেবেল, ডাকটিকিট এইসব বেছে আলাদা করছিল,—হঠাৎ শোভাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে বলল, দেখুন মা, কি সুন্দর একটা ছবি!

শোভা থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলল,—দেখি?

রাখাল একটা খাম থেকে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফটো বের করেছিল। সেটা শোভার হাতে তুলে দিল।

শোভা ছবিটার দিকে তাকাল। তারপর তার পায়ের পাতা থেকে চলে বেড়ানো লিক্‌লিকে বিদ্যুৎ ক্রমাগত ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে ওপরে চলে বেড়াতে লাগল—বারবার এবং তা কতক্ষণ তা আর শোভার খেয়াল নেই।

বছর ষোল বয়সের এক নরম গড়নের সুকুমারী। মাথায় যে প্রচুর চুল আছে তা দেখানোর জন্যে একটি মোটা গোছা সামনে ফেলা। ছবির মধ্যে দিয়েও বড় বড় চোখে কাজল টেনে তা আরো বড় দেখাবার চেষ্টা ফুটে রয়েছে। পরণে ঝলমলে রঙিন সিল্কের শাড়ি। অবশ্য শাদা-কালোয় কি কি রঙ্ তা ঠাহর করা যায় না। আর দেখবার মত তার গা ভরা গয়না। হাতে ওপর-হাতে কানে গলায় সিঁথিতে। ছবিতে মেয়েটির কোমর পর্যন্ত রয়েছে তাই পায়ের গয়না বাদ। মেয়েটি হাসছে। ছাদের ওপর রোদে তোলা ফটোগ্রাফ। একটু তেরছা চোখে তাকিয়ে মেয়েটি হাসছে।

ছবিটা হাতে ধরেই শোভার মনে পড়ল সেই মাঠকোঠার কথা। সেই অঝোর বৃষ্টির বিকেল।

দেবব্রতর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলা, 'শোভা, ট্যাক্‌সি এসে গেছে সব বাঁধা ছাঁদা রেডিতো?—দীপু, টুনা, সব তৈরি?'

শোভা একবার চারিদিকে তাকিয়েছিল। টিন আর কেরোসিন কাঠ দিয়ে তৈরি তাদের সেই চেতলা বস্তির মাঠকোঠা ঘর। ছোট একটি সুটকেস ট্রাঙ্ক আর রেডিও। ছাদ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। দীপু তখন সাত বছরের আর টুনা তিন বছরের। দেবব্রত নতুন ছাতা খুলে দীপু আর টুনাকে নিয়ে কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নেমে গেল।

শোভা তখনো কুলি আসার অপেক্ষায় একলা দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ তার এই আট বছরের আশ্রয়টার দিকে তাকিয়ে শোভার ভিতর থেকে অবোলা একটা গোঙানি উঠে আসতে লাগল। এই ঘর, এই ভাঙাচোরা শ্রীহীন বস্তিপাড়ার ছোট্ট আশ্রয়টি। যখন সমস্ত সমাজ, আত্মীয় পরিজন এমন কি বন্ধু-বান্ধবও তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তখন শেষ গহনাটি বেচে তারই টাকায় শোভা এই ঘর ভাড়া করেছিল। এখানেই দীপু আর টুনাকে পেটে ধরেছে সে। এখানেই তাদের এত বড়টা করেছে। শোভার কোনো বাঁধা লোকজন ছিল না। বস্তির রূপোর মায়ের কাছে দীপুকে রেখে সে দুপুরের স্কুলে যেত। টুনা হবার পর, টুনাকে রেখে যেত সুবলা মাসীর কাছে। দীপুকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেত।

কর্পোরেশন স্কুল।

কষ্ট হত শোভার। দেবব্রত বেরিয়ে যেত সকাল নটায়। ফিরত রাত দশটা সাড়ে দশটায়।

বস্তির গোলমাল, মাতলামি, শাপ শাপান্ত, গালিগালাজ। একা কাঁচাবয়সী বৌ মানুষ। কিন্তু কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুল থেকে যখন ফিরত সে, বাজারের থলে হাতে বাজার করে, কিংবা কেরোসিন তেলের লাইনে বা রেশনের দোকানে লাইনে দাঁড়াত—টিউবওয়েলের পাশে বালতি হাতে দাঁড়িয়ে হেসে গল্প করত ঝি বেশ্যা কিংবা মুচি বৌদের সঙ্গে, তখন কেউ তার সঙ্গে কোনো প্রগল্‌ভতা করেনি। বেহেড়্‌রাও পথ ছেড়ে দূরে সরে গেছে।

সেই অভাব কষ্ট আর অনিশ্চয়তার দিনগুলোয় শোভা দেবব্রতকে যেভাবে নিজের করে পেয়েছিল সে পাওয়া আজও তার ভিতরের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে।

প্রথম যখন ওই মাঠকোঠায় এসে ওঠে তারা তখন শোভার পেটে দীপু এল। তাদের তখনো কোনো বাঁধা চাকরি নেই। বিক্রি করার মত কোনো গয়নাও নেই। মাঠকোঠার চালে ছাওয়া বাড়িউলির কুমড়ো শাকের গোছা কতদিন শোভারা ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ করে নুন মেখে খেয়েছে। হয়তো জ্বলন্ত খিদে থাকত বলেই,—অমন অমৃত আর শোভা কোনোদিন খায়নি। কেরোসিনের অভাবে কতদিন রাতে হারিকেন জ্বালতে পারেনি শোভারা। ঘোর বৃষ্টিতে ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে বসে বসে গল্প করেই রাত কাটিয়ে দিয়েছে। দীপু আর টুনাকে সারারাত পালা করে হাওয়া করেছে দুজনে। বৃষ্টি পড়লে ছোট্ট শয্যার ওপর ছাতা ধরেছে তারা।

ঘরের কোণে হারিকেনটা পড়েছিল। মরচেপড়া হারিকেনটা দেবব্রত নিতে চায়নি। দেবব্রত বিছানাটাও ফেলে যেতে চেয়েছিল। কিই বা বিছানা? একটা শতরঞ্জি, শতচ্ছিন্ন ড্যাম্পের রেখা আঁকা একটা তোষক আর শাড়ি সেলাই কাঁথার চাদর পাতা। বালিশ বলতে দুটো তুলোর পুঁটলি।

কিন্তু সেই বিছানায় ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে শুয়ে যে তৃপ্তি—তার মূল্য দেবে কে? কাঠের সিঁড়িতে মচ্‌মচ্‌ শব্দ। কুলি উঠে আসছে। শোভা আড়মোড়া ভেঙে নিচে নামার জন্য তৈরি হল।

সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যেবেলা আলো অন্ধকার ট্যাক্সিতে দীপুকে কোলে নিয়ে বসে দেবব্রত শোভার একটি হাত চেপে ধরে ভারি গলায় বলেছিল,—শোভা, উঃ এই মাঠকোঠার নরক থেকে যে তোমাদের নিয়ে আবার ইঁটকাঠের রাজ্যে ফিরে যেতে পারব কোনোদিন, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

শোভার মুখে একটা উত্তর এসেছিল। কিন্তু সে কোনো উত্তর দেয়নি। শোভা বলতে চেয়েছিল, 'কেন ভাবতে পারোনি? টাকা ফেললে ইঁট কাঠ কেন? স্টিল কংক্রিটও পায়ের কাছে এলিয়ে পড়বে—

টুনাকে বুকের কাছে চেপে ধরে চেতলা ব্রিজে ওঠার ঝাঁকানি খেয়েছিল শোভা।

খুব উঁচু উঁচু দুটো বাড়ি থেকে একদিন তারা দু'জনে বেরিয়ে এসেছিল। পচাগলা কতকগুলো গলিত মানুষের বিকৃত জীবনের আওতা থেকে পালিয়ে এসেছিল তারা। প্রথমে একটা পাকাবাড়ির চিলেকোঠায় তারপর একটা টিনের বাড়ির ছোটঘরে—তারও পর রেস্ত আরো কমে গেলে চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে এপারে একটা বস্তিতে চলে এসেছিল তারা।

আবার ফিরছে।

যে ব্রিজ পেরিয়ে এসেছিল, সে ব্রিজ পেরিয়েই ফিরছে—

—কোথায়? কোনখানে?

শোভার মুখ চেপে ধরেছিল দীপু আর টুনার উচ্ছ্বাস। পদ্মপুকুরের একটি ছিমছাম বাড়ির দোতলায় দু'খানা নতুন ঘর আর খোলামেলা বারান্দা। ছাদের ওপর বড়সড় রান্নাঘর। বাল্ব পরিয়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মত দেবব্রত বিদ্যুতের স্যুইচ্ টিপে আলো জ্বালিয়ে বলেছিল—আঃ, দ্যাখো শোভা যেন ঘরটা হাসছে—

শোভা বাড়িওলার দেওয়া তক্তপোশে বসেছিল—আমার স্কুল থেকে কিন্তু দূরে হয়ে গেল।

দেবব্রত বলেছিল,—'স্কুলে তোমায় আর যেতে দিচ্ছে কে?'

এ পাড়ায় রূপোর মা-টা মিলবে না। যদি বা মেলে ছেলেমেয়ে রাখতে একশো টাকার কম নেবে না। ওর চেয়ে না হয় কিছু বেশি তোমার মাইনে। না হয় ভাবো লোক রেখেছ। নাঃ একটা পাখা ভাড়া করতেই হবে। সকালে দেখো বাজার কত কাছে। চমৎকার একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলও আছে কাছাকাছি। দীপু টুনাকে ভর্তি করে দেব। হ্যাঁ, আর শোন, তোমার ওই মড়ার চ্যাংড়া বিছানা যেন সকলের সামনে ছাদে রোদে দিও না। সামনের মাসেই দেখছি বিছানা করাতে হবে!'

শোভার ভিতরটা যেন সাত হাত বসে গেল। আবার সে মধ্যবিত্ত পাড়ায় ফিরে এসেছে। সেই ভয়ঙ্কর মধ্যবিত্ত পাড়া। তার মনে পড়ল চিলেকোঠার ঘরে যখন ভাড়াটে ছিল তখন কি পরিমাণ ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যে বলত সে। বাপের বাড়িব বড়মানুষীর গল্প একবার করে ফেলার পর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল শোভা। কিছুতেই প্রাণে ধরে বলতে পারেনি হার চুড়ি বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে তাকে। এমন কি টিনের বাড়ি গিয়েও

রোল্ডগোল্ডের গহনার সঙ্গে খামোকা শেষ সম্বল সোনা বাঁধানো চিরুনি দিয়ে খোঁপা করে সবাইকে দেখিয়ে বেরিয়েছে। আবার মিথ্যে কথা। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হবে তাকে। ভয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হবে। গয়না নেই। আসবাব নেই। ভালো শাড়ি নেই। ছেলে-মেয়ের ভালো জামা নেই। দীপু টুনা বস্তি অঞ্চলের অনেক মোক্ষম গালাগাল অবলীলায় শিখে ফেলেছে। কত কৈফিয়ৎ কত প্রশ্ন কত জিজ্ঞাসা।

আরো পাঁচ বছর বাদে শোভা নিজেকে আবিষ্কার করেছিল বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে। কমন বাথরুম নয়। প্যানট্রি আছে। গ্যাসের উনোন। একজন চাকর একজন রাঁধুনি। একজন ঠিকে ঝি। ছেলেমেয়েরা আলাদা ঘরে থাকে। ইংরেজী মিডিয়ম স্কুলে পড়ে। নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে কথা বলে ঝগড়া করে। বস্তির গালাগাল তারা ভুলে গেছে কিনা শোভা জানে না, তবে মনে থাকলেও জেনে গেছে যে বলতে নেই। শোভা যন্ত্রের মত সংসারের মধ্যে ঘোরে। কাজকর্ম করে—তার স্বামীকে দেখে তার ছেলেমেয়েদের দেখে। বিস্ফারিত চোখে কেবল দেখেই। আর যতই দেখে ততই কেমন অচেনা অচেনা মনে হয় শোভার। কেবল চালচলন পোশাক-আসাকই নয়। ধরন-ধারন মনের নতুন গড়ন পেটনও।

দেবব্রত আগের চেয়েও অনেক বেশি খাটে। যেন নেশার মত খাটে। চাকরি ছাড়াও তার নিজের একটা ফার্ম হয়েছে। দুদিক থেকে টাকা।

শোভা দেখে।

আজকাল তাদের দু'পক্ষেরই আত্মীয় স্বজনরা অবলীলায় আসা যাওয়া করে। বন্ধুবান্ধবরাও আসে। নাকি এখন তাদের বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটটা এমনই সেনট্রাল পোজিশন যে সকলেরই খুব আসা যাওয়া করতে সুবিধা হয়।

শোভা কেমন যেন দূর থেকে দেখে। ওই ভদ্রমহিলা দেবব্রতর মেজদি না? বিয়ের আগে শোভাকে শোভার কলেজে গিয়ে অপমান করে এসেছিল। এখন কিরকম হেসে হেসে সস্নেহে দীপু আর টুনাকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—ডে-স্পেণ্ড করাবে বলে।—ওই ভদ্রলোক শোভার সেজকাকু না? সাইকেলের চেন জোগাড় করেছিল দেবব্রতকে পেটাবে বলে। এখন চায়ের কাপে আর এক চামচ চিনি নিয়ে হেসে হেসে দেবব্রতর সঙ্গে কথা বলছে। শোভা কেবল ভাবলেশহীন বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখে সুকুমার হালদার, যে তাদের বিয়েতে সাক্ষী পর্যন্ত দিয়েছিল—দেবব্রতর টাইফয়েড জ্বরের সময় শোভাকে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল। 'আমি টাকা পাবো কোথায় গায়ে গয়না তো আছে, বেচে ফেলুন না।' তারপর অশ্লীল হেসে বলেছিল, 'এভাবে যখন তখন আমার কাছে আসবেন না। বাড়িতে যা-তা কথা হয়।' সেই সুকুমার, সে এখন দেবব্রতর ফার্মের অংশীদার হয়েছে অথচ ওই দেবব্রত একদিন ··· হঠাৎ শোভার কানে এল যেন অনেক দূরে থেকে কেউ বলছে, 'কার ছবি, বলুন না মা কার ছবি?'

শোভা ছবির মেয়েটির চেহারার ওপর আবার ফিরে এলো। একটা সাজসজ্জা করা পাত্রপক্ষের কাছে হাজিরা দেবার যড়যন্ত্র নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো ষোল বছরের সুশ্রী মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই তার সমস্ত শরীর পুলকিত হয়ে উঠল।

সৌন্দর্য দেখলে মানুষ বোধহয় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এমনি পুলকিত হয়ে ওঠে। একবার তার লোভ হল বলেই ফেলে, ওরে বোকা, চিনতে পারছিস না?—এ'ত আমার ছবি! কিন্তু না। তাই কী? এই শোভার ছবি? না। না। তার টুনার বয়সও এখন ষোল। সে শাড়ি পরে না। পরলে হয়তো এমনিই দেখাতো টুনাকে। হ্যাঁ, অনেক সাদৃশ্য আছে। শোভার মনে পড়ল ওই চুল ওই দীর্ঘ কালো চুলের গোছায় কি যত্নেই না মা মহাভৃঙ্গরাজ তেল ঘযে ঘযে দিত। রাতে উঁচুতে গোড়া বেঁধে লম্বা বিনুনি করে তাতে পাকিয়ে পাকিয়ে দিত কালো সাটিনের ফিতে। বলত, 'বাপু, চুল বড় সুখী জাত। বালিশে ঘষা লাগলে ডগা ফেটে যাবে।' শোভার মনে পড়ল ওই মুখে, হাতে গায়ে মসুর ডাল বাটা কাঁচা হলুদ আর সরের রূপটান ঘষতে হত তাকে নিত্যদিন। ড্রেসিং টেবিলের সামনে কত রকম প্রসাধন থাকত, শোভা সানন্দে তাই দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে তুলত। আর ওই গয়না। ওসব শোভার। শোভার জন্মানর সময় থেকেই পর পর পরিকল্পনা করে গড়ানো হচ্ছিল—বিয়ের জন্য। বাড়ি ছেড়ে আসার সময় হার, চুড়ি বালা আর মাথার সোনা বাঁধানো চিরুণি ছাড়া শোভা আর কিছু আনেনি।

হ্যাঁ কি যেন ভাবছিল শোভা? —দেবব্রত! দেবব্রত সেদিন, সেই মাঠকোঠা থেকে চলে আসার পথে সেই আলো-অন্ধকার ট্যাক্সিতে আর একটি কথা বলেছিল শোভাকে। তখন ট্যাক্সিটা শোভার বাপের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'আর একটা কথা মনে রেখো শোভা ;এই বাড়ি, এই বাড়ির মানুষগুলোকে যদি পায়ের তলায় না এনে ফেলি তাহলে আমার নাম বদলে রাখব। আর এই ছবিটা দেখে রাখ শোভা। তোমার ষোল বছর বয়সের ছবি। এর গায়ে যত গয়না আছে, সেই সব কটা গয়না যদি না আমি তোমাকে গড়িয়ে দিতে পারি—

শোভার সারা গা রি-রি করে উঠেছিল সেদিন।

কতটুকু প্রার্থনা দেবব্রতর। কতটুকু সঙ্কল্প। কতকগুলো গয়না কেনা—কতকগুলো নষ্ট পচা মানুষকে পদদলিত করা। এই—এইটুকু?

কিন্তু না। বাস্তবে তা পারেনি দেবব্রত।

কাল রাতেই খাবার টেবিলে, দীপু হঠাৎ জ্বালাভরা গলায় বলে উঠেছিল আমার পৈতে না হয় নাই দিলে তোমরা, টুনার জন্মদিনটা অন্তত করো! বন্ধুবান্ধবের জন্মদিনে খেয়ে খেয়ে আসে, ওরও ত একটা প্রেসটিজ বলে আছে। কদিন আগে দেবব্রতর মেজদির মুখের ওপর শোভা বলেছিল—জাত টাত আমি মানিনে, আমি কায়স্থ, ও ব্রাহ্মণ, পৈতে টৈতে কিসের? সব ছেলে খেলা—

দীপু তখন জ্বলন্ত চোখে চেয়েছিল শোভার দিকে। কোনো উত্তর দেয়নি। আজ কথাটা শুনিয়ে দিল। সত্যিই কি দীপু পৈতে টৈতে মানে? ধর্ম কর্মত কোনোদিন করতে দেখেনি তাকে শোভা।

দেবব্রত বলল—হবে হবে সব হবে। নতুন বাড়িতে এসেছি। প্রচুর স্পেস—এবার সব হবে, ডোন্‌ট গেট ইরিটেটেড মাই সন—

শোভা মৃদু গলায় বলেছিল—জন্মদিন একটা ব্যক্তিগত উৎসব—সেখানে বাইরের লোকের ··· শোভার কথা শেষ করতে দেয়নি দেবব্রত। সে বলেছিল 'আহ মেয়ের ষোল বছর পূর্ণ হচ্ছে, ওরও ত একটা ইচ্ছে টিচ্ছে বলে জিনিস আছে! না-কি?'

শোভার মনে পড়ল মাঠকোঠার সেই বাড়িতে দীপুকে কোলে বসিয়ে জন্মদিনে জলদুধের পায়স খাওয়ানো। গলায় বেলফুলের মালাপরা ছোট্ট ছেলেটি। কি শান্ত কি সুখী।

দীপু খেয়ে ওঠবার সময় শব্দ করে চেয়ার ঠেলে সরিয়ে বলেছিল,—'মা একটু—ভালো শাড়িটাড়ি পরে থেকো, আমার বন্ধু সীতু—তোমাকে সেদিন—মানে—ঝি ভেবেছিল।'

শোভা অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর মেয়ের মুখের দিকে—দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সে মাথানিচু করে ভাত খেয়ে যাচ্ছে।

তাই দেবব্রত তার ষোল বছরের ছবিটা অ-দরকারী কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল শেষ পর্যন্ত। তার সেই ছোট ছোট সঙ্কল্প সমেতই। শোভা লক্ষ্য করেছিল দেবব্রতর চুল তত পাকেনি। চেহারা তত ভাঙেনি।

দেবব্রতকে এখনো সুন্দর আর বেশ সৌম্য দেখায়। দেবব্রতকে নিয়ে তার ছেলেমেয়ের কোনো লজ্জা নেই। দেবব্রতকে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া যায়। শোভা খেয়াল করল—সত্যিই ত, দীপু বা টুনার কোনো বন্ধুকেই ত সে চেনে না। শোভার মনে হচ্ছিল আসলে দীপু টুনা দেবব্রত এরা সব অনেক অনেক দূরের মানুষ। সে টেলিফটো লেন্সের মত কোনো একটা লেন্স-এর চাতুরিতে তাদের খুব কাছে দেখছে।

উঠে গিয়ে অনেকদিন পরে আয়নায় নিজেকে দেখেছিল শোভা। রগের দু'পাশের সাদা তারের মত চুল, রেখাময় মুখ। শুক্‌নো। বেরঙা। তবু সেই মুখখানি তার অদ্ভুত আপন মনে হয়েছিল। এক একটি রেখা কত দুঃখে যন্ত্রণায় কত অভিজ্ঞতার মূল্যে কেনা।

নিজের ষোল বছর বয়সের ছবিটি দেখতে দেখতে শোভা বুঝতে পারল ছেলেমেয়ে স্বামীর ছোট ছোট নিছক সুখ চেয়ে, পরম দুর্বলতায় তাদের মুখ চেয়ে সে আগাগোড়া চালে ভুল করে এসেছে। এভাবে একটা আলোকলতার মত পরভোজী হয়ে যাওয়া উচিত হয়নি তার। উচিত হয়নি একটু একটু করে সরে গিয়ে দূরে গিয়ে মুছে গিয়ে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাওয়া। তার উচিত ছিল ভয়ঙ্কর একটা প্রতিবাদের মত করে, আঘাত দিয়ে, এদের সবাইকে গোড়া থেকে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার।

অনেকগুলো বছর শোভা বৃথা নষ্ট করেছে। তবু সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি।

মাঝের সমস্ত বছরগুলোকে মুছে ফেলে সে যদি আজ আবার চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে ফিরে যায়। আবার নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করে সেই মাঠকোঠার ঘর থেকে? যদি সে ঘর না থাকে সেই বস্তি থেকে?—এবারে একলা—কিন্তু একেবারে নির্ভয়ে।

শোভা একটু হেসে পাঁচ মিনিট ধরে হাতে রাখা ছবিটা রাখালের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—কার ছবি আমি চিনি না রে রাখাল। নিজের মুখের রেখাগুলির অস্তিত্বের আনন্দে শোভা ফিরে দাঁড়িয়ে সদর দরজার দিকে পা বাড়াল।

জোবান সুজিকি

নবনীতা দেব সেন

"বাপ্‌রে বাপ্! আবার প্রেজেন্ট? নিজেকে ফিরিয়ে এনেছি এই যথেষ্ট"—দাদামণি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে চুরুটে-দেশলাইতে মন দেন। বৌদি ছাড়বার পাত্রী?

"ছি ছি ছি। লোকে বলবে কি? জাপানে ঘুরে এলে বারোদিন—একটা মাত্তর জাপানী পুতুল ছাড়া কিছু আনলে না? নাইলন শাড়ী ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটার, ক্যাসেট রেকর্ডার, ক্যামেরা টি ভি—লোকে কত কি আনে, নিদেনপক্ষে মুক্তোটুক্তো—কিছু না?"

"সব টাকা যে জোবানে চলে গেল।"

"তার মানে? জুয়ো খেলেছিলে নাকি?'

"দূর। জুয়ো খেলব কেন? ট্রাডিশন—বুঝলে? ট্রাডিশন! ট্রাডিশনের জন্যে মূল্য দিতে হবে না? ট্রাডিশনের মূল্য দিতে গিয়ে কেবল কি ধনেই মরেছি? প্রাণেও মরছিলুম আরেকটু হলে।" চুরুট থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বৌদির মুখখানা আবছা করে দেবার চেষ্টা করেন দাদামণি কিন্তু বৌদির মুখ অত সহজে আবছা হবার নয়।

"প্রাণসংশয় হওয়া অতই সোজা? বললেই হলো? ধনসংশয়টাই সহজ, আর তোমার সেটা চব্বিশঘণ্টাই হচ্ছে।" গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে কথায় যোগ দিয়ে ফেললুম।—"সত্যি? বল, দাদামণি, বল না, কী হয়েছিল?"

"তোরাও যেমন! তোদের দাদামণি বলুক, আর তোরাই শোন। আমার ওসব ঢের শোনা আছে। যত গুল্‌তাপ্পি বাজাবে—"

—"না গো না, গুল নয়। তানাবেকে তো মনে আছে? সেই যে এসেছিল সেবারে, খৈতানের সঙ্গে?"

"সেই নাকচ্যাপ্টা জাপানীটা? যে আমাকে অত সুন্দর পাখাটা দিয়ে গেল?"

"হ্যাঁ সেই তানাবে। অত সুন্দর পাখা দিল, তবু তাকে নাকচ্যাপ্টা বলছ?"

"না তো কি শুকনাস বলতে হবে?"

"সেই তানাবে ছিল সঙ্গে। গুল্ কিনা, তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। আবার আসছে সে, জানুয়ারিতে।'

বৌদি এবারে একটু নরম হন।

"কী হয়েছিল কী শুনি?" তাচ্ছিল্যভরে বললেও বোঝা যায় ভেতরে উদ্বেগ রয়েছে।

"কী হয়নি, তাই বরং জিজ্ঞেস করো। জোবান, আর সুজিকি। জোবান আর সুজিকি আমাকে ধনেপ্রাণে শেষ করে দিচ্ছিল। আরেকটু হলেই। বড্ড বেঁচে গেছি। তোমারই ঠাকুরের দয়ায়। রোজ অত ফল-বাতাসা খাওয়ানোর একটা প্রতিদান তো আছে?"

বৌদি এবার বেশ নরম খাটের একপাশে বসে পড়েন। আমরা তো আগেই খাটে গুছিয়ে বসেছি। দাদামণি শুরু করেন।

"তোরা তো জানিস্ তোদের বৌদি কী কিপ্টে ! ওর ছেলেবেলার সেই ক্যামেরাটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, ছবি তুলে আনতে। কেননা ওটা দিয়ে ছবি তোলা খুব সোজা। প্রথমেই হল কি, সেইটে গেল হারিয়ে।"

"অ্যাঁ", বৌদি চেঁচিয়ে ওঠেন—"সেটা হারিয়ে এসেছো? আমার বাবা দিয়েছিলেন চোদ্দবছরের জন্মদিনে"—কান্নায় গলা বুজে আসে বৌদির। আঁচল চোখে উঠে যায়।—দাদামণি ব্যাকুল—"আহা, শোনোই না, এসে গেছে ক্যামেরা তোমার। হারিয়েছিল—পাওয়া গেছে। হয়েছে?—"

"তাই বল? এবার বল কী করে হারাল?" বৌদির চোখে জল মুখে হাসি।

"তানাবেকে তো চেনো। কিন্তু তোশিওকে চেনো না। তোশিও-নো বিখ্যাত পণ্ডিত, সেও আসবে জানুয়ারির সেমিনারে। তখন দেখবে। তাদের দুজনের সঙ্গে যাচ্ছিলুম ইউয়াকি শহরে। পথে পড়ে কাজিওয়াতা। তোশিও-নোর ছেলেবেলার বাসা। সেখানে প্রচুর সামুরাই পরিবার বাস করে। মধ্যযুগীয় শহর। জাপানী ট্রাডিশনের খনি। তোশিও ভয়ানক ট্রাডিশন পাগ্‌লা লোক, সেই আমার প্রধান গার্জেন ছিল ওখানে। সে আর তানাবে। ভাল ইংরিজি বলে, আমার দেখাশুনোর ভার তাদের ওপরেই ছিল। আমাদের সেমিনার চার দিনেই শেষ। তারপর টোকিও ছেড়ে চললুম উত্তর-পূর্ব জাপানের এই শহর ইউয়াকিতে। সেখানে একহপ্তার নেমন্তন্ন। কিন্তু তাদের কলেজ তখন বন্ধ। তাই তোশিও আর তানাবে ঠিক করেছিল আমাকে ক'দিন কেবল জাপান দেখাবে। জাপানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাবে।"—দাদামণি ধোঁয়া ছাড়লেন।

"প্রথমটা। কাজিওয়াতা। নেমে দেখি হাতে ক্যামেরা নেই। সীটে রেখে এসেছি। এদিকে ট্রেন তো সুপারসনিক গতিতে উধাও। স্টেশনমাস্টারের ঘরে গেলুম। তানাবের সঙ্গে। সে বিশাল এক খাতা বের করে লিখতে লাগল—"নাম? ঠিকানা? বয়স? পাসপোর্ট নম্বর?" —"আমি তো হারাইনি, আমার ডিটেলে কী হবে?" —"নিয়ম। ক্যামেরার নাম? বয়স? নম্বর? ক'টা ফিল্ম এক্সপোজ্‌ড হয়েছে।"

সর্বনাশ। কুড়িটা, না উনিশটা ; কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু ওটা জরুরী। ক্যামেরার বর্ণনা শুনে তানাবে বললে—"ওটা বরং ফেলে দাও। ও দিয়ে কী হবে? কত ভাল ভাল ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিনে দেব তোমায়।"

"ও বাবা! আমার বউয়ের ক্যামেরা।"

"বউকে তুমি ভয় পাও?" অবাক চোখে তাকিয়ে তানাবে বলল।

"তুমি পাও না?"—তানাবে উত্তর না দিয়ে বলে—"একথাটা তোশিও-নোর সামনে খবর্দার যেন বোলো না। তুমি কি জানো, ও কেন গাড়ি চালায় না?"

"কেন? লাইসেন্স নেই বলে?"

"ডানহাত নাড়তে হবে বলে।"

"ডানহাত নাড়তে ওর অসুবিধা আছে?"

"নেই? ওরা খাস সামুরাই যে! ওর ঠাকুর্দা ঠাকুমা দাদামশাই দিদিমা চারজনেই সামুরাই বংশীয়। তাই।"

"তাই মানে?"

"সামুরাইদের ডানহাত চালানো মানেই তো তরওয়াল চালানো! এও জানো না?"

"তাই তো। তা তুমি তো গাড়ি চালাও।"

"আমি চালাবোনা কেন? আমার তো কেবল দিদিমা সামুরাই বংশীয়া। বাকী সবাই চাষী। আমি দুহাত নাড়তে পারব না কেন?"

সত্যিই তো। চমৎকার লজিক।—"দুজনে তো একসঙ্গেই পড়াশুনো করেছ, একসঙ্গেই চাকরি করছ, অথচ তোমাদের মধ্যে এত তফাৎ?"

"তফাৎ থাকবে না? এটা তো ট্রাডিশনের কথা। ও সামুরাই। আমি কৃষক। এখন যদিও বেতন একই পাচ্ছি—তাতে ট্রাডিশন তো বদলায় না। ওটা হাজার বছরের ব্যাপার।" একটু থেমে তানাবে বলল—"তোশিওর বউ টোকিওয় কেন থাকে, জানো?"

"টোকিওতে থাকেন বুঝি? কেন?"

"কেননা তোশিও যখন ইউয়াকিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করল, ওর বউ বলেছিল—"তার মানে, টোকিও ছেড়ে চলে যেতে হবে?" ব্যাস। সেই থেকে তোশিওর বউ টোকিওতে, আর তোশিও ইউয়াকিতে। বউ পায়ে ধরেছিল, তবুও তোশিও ওকে সঙ্গে নেয়নি। এত স্পর্ধা, স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইচ্ছে প্রকাশ করে? সেই শেষ। দশবছর তোশিও ইউয়াকিতে একা থাকে। বউ অনেকবার আসতে চেয়েছে—কিন্তু স্বামীর সেই এক কথা। "থাকো তুমি তোমার টোকিওয়।" ওকে যেন তুমি বোলো না তোমার বউয়ের ক্যামেরার জন্যে তুমি এমন করছ।"

তোশিওর পাণ্ডিত্যের প্রতি আগেই আমার সম্ভ্রম ছিল, এখন তো আরো বেড়ে গেল। সত্যি, পুরুষসিংহ একেই বলে। এমন না হলে স্বামী? শৌর্য বীর্য আছে, হ্যাঁ! সামুরাইয়ের রক্তই বটে। ঝাড়া ৪৫ মিনিট ধরে ক্যামেরার আইডেনটিফিকেশনের ব্যবস্থা হল। ইউয়াকি স্টেশনে খবর দেওয়া হবে। সেখানে প্রমাণ দাখিল করলে ক্যামেরা মিলতে পারে।

কাজিওয়াতা শহরের লোকেরা খুবই দুঃখিত, সেখানে মার্কিনরা বোমা ফেলতে ভুলে গেছে বলে। বোমা না-পড়ার দরুন ওদের দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। মহামুশকিলে পড়েছে তারা—অন্য সব শহরের দিব্যি উন্নতি হচ্ছে ওদের বেলায় কচু। না রিমডেলিং, না রেনোভেশন, না রিকনসট্রাকশন নট্ কিছু। কোনো রকমের ডিভেলপমেণ্ট প্ল্যানিং নেই, মডার্নাইজেশন নেই। ফলে সামুরাই ঐতিহ্য ঘুণপোকার মত কাজিওয়াতার ইঁটে-কাঠে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যের হাত থেকে রেহাই নেই শহরবাসীর।— তোশিও অবশ্য এতে খুবই খুশি, তাকে তো আর এখানে থাকতে হয় না।—

তানাবের কথা থেকে যা বুঝলুম, তার সারমর্ম এই।

মুরাসাকি একবর্ণ ইংরিজি জানে না। সে হচ্ছে তোশিওর সম্পর্কে ভাই, তারাও ভগ্নাংশ-সামুরাই। কাজিওয়াতা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে-ই, তার গাড়ীতে। দিনের শেষে, মুরাসাকি জাপানীতে কিছু একটা বললো। যা শুনে তোশিও-তানাবে দ্বৈত কোরাসে গেয়ে উঠলো—"জোবান?" এবং দুজনেরই মুখ স্বর্গীয় উল্লাসে আলোকিত হয়ে উঠল। তোশিও

বললে—"চলো, চলো, চাকলাবাকলাতি, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। মুরাসাকি আজ আমাদের একটা অসামান্য জিনিয দেখাবে। দারুণ ট্রাডিশনাল। জোবান!"

"সেটা আবার কী"?

"স্পা!"

শহর থেকে বেশ দূরে। পাহাড়ের ঢালুতে, ছোটো শাদা দোতলা বাড়ি। গাড়ি থামতেই, এক রুক্ষমূর্তি জাপানী কোত্থেকে উদয় হয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। "ওকি? ওকি? গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে কেন?"

"ও ঠিক আছে। পার্কিং করছে।" তানাবে সান্ত্বনা দেয়। এটা একটা বড় হোটেল। "চলো ভিতরে যাই।"

দোতলা বাড়ীতে ঢুকতেই দুটি সিল্কের কিমোনো পরা সুন্দরী মেয়ে এসে একশোবার কোমর ভাঁজ করে নত, নম্র, বিনয়ী ভাবে, বিনা অনুমতিতে আমাদের পা থেকে জুতো মোজাগুলোই কেড়ে নিয়ে অন্য একরকম মোজা আর ঘাসের চটি পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাক—গাড়ি গেছে, এবার জুতোগুলোও গেল। কোথায় যে পার্কিং হতে চলে গেল কে জানে? এরা দেখছি একবার এলে আর ফেরবার পথ রাখে না। একশোকুড়ি টাকা দামের জুতোটি খুইয়ে, এই ঘাসের চটি পরে কলকাতায় ফিরলে, তোমাদের বৌদি আমাকে আর আস্ত রাখবে না। একেই তো ক্যামেরা গেছে! মনটা ভারী হয়ে রইল।

মেয়েদের সঙ্গে মুরাসাকির কথাবার্তা সব জাপানীতেই হচ্ছে। তোশিও-তানাবে এসে বললে—"চল সব ঠিক হয়ে গেছে।" সঙ্গে একটি জাপানী মেয়ে এল পথ দেখাতে। আমরা গিয়ে লিফ্‌টে চড়লুম। লিফ্‌ট উঠছে তো উঠছে। স্পষ্ট দেখেছি ছোটমতন শাদামতন দোতলা বাড়ীটায় ঢুকলুম পাহাড়ের গায়ে—আর এই লিফ্‌ট তো উঠল সোজা পাঁচতলা। আশ্চর্য কাণ্ড। নেমে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলুম আমরা, আগে আগে কিমোনোপরা মেয়েটি তুর্ তুর্ করে খরগোসের মত পায়ে হাঁটছে। টানেলে বিজলীবাতি ফিট্ করা। টানেল দিয়ে বেরিয়ে আরেকটা লাউঞ্জ। আরেকটা লিফট। এবার এটাতে ঢুকলুম। এটা উঠল চোদ্দতলা। আমি প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছি। তানাবে নিজে নিজেই বললে—"উনিশতলায় আমাদের ঘর। এটা একটা হোটেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এদিকে ওদিকে বিল্‌ডিংগুলো টানেল দিয়ে দিয়ে জোড়া। এক একটা বিল্‌ডিংয়ের এক একরকম হাইট। কোনোটা দুতলা, কোনোটা সাত, কোনোটা চোদ্দ। বুঝেছ তো এবার?"

—"তা বুঝেছি। জাপানী ব্যাপার, সবই জলের মত সোজা।" ঘরে পৌঁছুলুম। জাপানী স্টাইল ঘর। একদিকটা পুরো মেঝে মাদুরে মোড়া। জানলায় ভর্তি দেওয়াল, কাচের বদলে কাগজের সার্সি। অন্যদিকটা পাইনকাঠের প্যানেলিং। ঘরের মধ্যিখানে দারুণ একটা গালার কাজ করা ড্রাগন-ডাইনোসর-সাপ আঁকা অপূর্ব জলচৌকির মতন টেবিল। চমৎকার কাগজের লণ্ঠন জ্বলছে।

"এইটেই তোমাদের ঘর।" দেখিয়ে দিয়ে, কোমর ভাঁজ করতে করতে পেছু হেঁটে সেই সুন্দরী বেয়ারা বেরিয়ে গেল। মুরাসাকি-তোশিও-তানাবে গিয়ে ঝটপট ক'খানা

রংচঙে কিমোনো চড়িয়ে এল কোত্থেকে। এবার তারা বসে পড়ল টেবিল ঘিরে। আমিও কোটটি খুলে রেখে যেই বসেছি গিয়ে, তোশিও বললে—"এভাবে বসা মানেই কিন্তু ট্রাডিশনের অপমান। যাও, আগে কিমোনো পরে এস।" আমি যেই শার্ট প্যান্টের ওপরে কোটের মত কিমোনোটি পরে এসেছি, ঘরে যেন বোমা পড়ল। তানাবে বলল—"শোনো, চাকলাবাকলাতি (ওরা চক্রবর্তী ওইভাবেই বলে) কিমোনোটা ওভারকোট নয়। অন্যান্য জামাকাপড় খুলে ওটাকে পরতে হয়।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে শার্টপ্যান্ট খুলে রেখে কিমোনো পরে এলুম। তোশিও-তানাবে চোখাচোখি করলে। দুজনেই মাথা নাড়লে। ভুরু কুচকে সরু চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে—"কিমোনোর নিচে কেবল ভগবানের তৈরি চামড়াটুকুই থাকবার কথা, তোমার কিমোনোর নিচে ওসব কী?" —"কিছুই না। গেঞ্জি ইজের" বলতেই তানাবে বলে উঠল—"ছি ছি ছি। কিমোনোর নিচে গেঞ্জি ইজের? এ যে ব্লাসফেমি! না না, শিগগির যাও, খুলে এস। তোশিও ভীষণ আপসেট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ওদের আবার সামুরাই-রক্ত, কথায় কথায় গরম হয়ে যায়। আমাদের মত চাষাভুষো তো নয়। মুরাসাকিও দুয়ের তিন ভাগ সামুরাই।"—

কী আর করা, ভগবানের চামড়ার ওপর কিমোনো পরে, ওই জলচৌকির পাশে নতুন বৌয়ের মত আড়ষ্ট হয়ে গুটিসুটি কোনোরকমে এসে বসলুম। দেখি দরজা খুলে গেছে। একের পরে এক খাঁদা বোঁচা পরমা সুন্দরী মেয়ে স্বপ্নের মত কিমোনো পরে, অতিসুন্দর সব পাত্র বয়ে বয়ে ঘরে ঢুকছে। চারজন মেয়ে এসে বসল। টেবিল ভরে গেল খাদ্যে। সঙ্গে বেঁটে কুঁজোতে ভর্তি গরম গরম সাকে-মদ। খাবারদাবারগুলো বেশির ভাগই কাঁচা। টেবিলে একটা উনুন মতনও রাখা হল। তাতে কাঁচা মাংস নেড়ে চেড়ে পাতে দেয়। আর কাঁচা ডিম সদ্য ভেঙে বাটিতে ঢেলে দিয়েছে, তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে হয়। সেটা সস। মেয়েগুলো মিষ্টি মিষ্টি হাসে। আর কিচিরমিচির করে। আর মাথাটি হেলিয়ে দুলিয়ে কেবলই কুচো-গেলাসে সাকে-মদ ঢেলে ঢেলে হাতে তুলে দেয়। আপত্তি করা ট্রাডিশন বিরুদ্ধে। হাঁটু মুড়ে বসে বসে দোজো-দোমো কীসব বলতে বলতে ওই মেয়েরা খুদে পেয়ালা কেবল ভরেই যাচ্ছে। আমরাও পেয়ালা খালি করেই যাচ্ছি। 'সাকে' খাবার আবার নিয়মকানুন আছে। কাপে ঢেলে তো দিব্যি আমার হাতে তুলে দিল। আমি যেই একচুমুকে খেলুম, অমনি দেখি মেয়েটা আমার হাত থেকে খপ্ করে গেলাসটি কেড়ে নিয়েছে। নিয়ে নিজেই তাতে চুমুক দিচ্ছে। একি রে বাবা। কিছু বুঝবার আগেই আবার কাপটি আমার হাতে ফেরৎ চলে এসেছে। আমি একচুমুক দি, আর সেই মেয়ে একচুমুক দেয়। তারপর কাপটি ভরে দেয়। এরা হচ্ছে সাকে খাওয়ানোর সাকী, পেয়ালা ভরে দেয়াই এদের কাজ। খাচ্ছি তো খাচ্ছি, সাকে খেতে খেতে শরীর গরম, বেশ নেশা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। আর কাঁচা আনাজ কাঁচা মাছ খেতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছে না। এমন সময়ে দেখি তোশিও-নো তার ডানহাতটা উপর দিকে তুলে ফেলেছে। কি সর্বনাশ। কেলেঙ্কারি কিছু ঘটবে নিশ্চয় এবারে। আর বাঁহাতটাকে বুক-পেটের মাঝামাঝি আড়াআড়ি ভাবে রেখেছে। বীরত্ব ফুটে বেরুচ্ছে ভঙ্গিতে। নিশ্বাস বন্ধ করে আছি।

দেখলুম কিছুই হল না। বেঁটে বেঁটে মিঠে মিঠে মেয়েগুলো থালাবাটি তুলে নিয়ে পেছু হেঁটে হেঁটে গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তোশিও-নো হাতটি নামিয়ে নিয়েই, আবার ঝাঁকুনি দিয়ে আলো তুলে ধরল। আমি ভাবলুম এবার বোধহয় আমাদেরই গুটি গুটি পেছু হটে বেরিয়ে যেতে বলছে। কিন্তু না। দেখি দরজা খুলে গেল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে মেয়েগুলি খুর্ খুর্ তুর্ তুর্ করে আবার ঘরে ঢুকছে। চায়ের নিয়মকানুন আলাদা। অত দোজো-দোমো করে সেধে সেধে চেপেচুপে খাওয়ানো নেই, পেয়ালা কেড়ে নিয়ে তেড়ে এসে চুমুক দিয়ে দেওয়াও নেই। সাকের বেলায় যেমন ছিল। নির্ভয়েই চা-পান-পর্ব শেষ হল। তবে চা-টা জলপাই-সবুজ রঙের। আর বুনো কষা স্বাদের। খেয়ে ভুলেও মনে হয় না চা খেলুম। তায় দুধ চিনি কিছু নেই। চীনে চার মত যুঁইফুল পর্যন্ত না। উপরন্তু সর্বক্ষণ উঁচু হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে নীলডাউন ভঙ্গিতে বসে থাকা। জাপানের সামুরাই ট্রাডিশন রাখতে কি আর বাঙালী কেরানী আমরা পারি? চা খাওয়া শেষ হতেই তোশিও-নো এক্কেবারে সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলেন—দুই পা ফাঁক করে দুই হাত আকাশে তুলে ইংরিজি 'এক্স' অক্ষরের মত চেহারা করে তিড়িক্ তিড়িক্ করে দুবার লাফালেন মেঝের ওপরে—ঘরে বেশ ভাইব্রেশন জাগলো। মুখে ইংরিজিতে মিলিটারি সুরে অর্ডার করলেন—"নাউ টু দ্য বাথ!" অমনি তানাবে এবং সেই শহরের নীরব অধ্যাপক মুরাসাকিও একবার ঠিক ঐভাবে নেচে উঠল—

"টু দ্য বাথ। টু দ্য বাথ!" যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। আমিও দেখাদেখি লাফাব বলে যেই উঠতে গেছি, উঠব কি, মুখ থুবড়ে পড়লুম মেঝের ওপর। অতক্ষণ উপুড় হয়ে হাঁটু মুড়ে নীলডাউন হয়ে বসে থাকা।—দুটি পা জন্মের শোধ ঐ ভঙ্গিতেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। ভাঁজ খোলে কার সাধ্যি! তা তিনবারের বার যেই পা সোজা হল, অমনি তোশিও-র মত করে দুবার ধুপ্ ধাপ্ লাফিয়ে নিলুম। লাফটা অত্যাবশ্যক। বোঝাই গেল। পাগুলো সোজা করবার জন্যে। মেয়েরা সব দোর ঠেলে বেরিয়ে খুর্ খুর্ তুর্ তুর্ করে হেঁটে আগে আগে যেতে লাগলো, পিছু পিছু মার্চ করে চলছি আমরা। প্রথমে তোশিও-নো, তার পিছনে তানাবে, তার পিছনে আমি। আমার পিছনে মুরাসাকি। রহস্যময় কাঠের তৈরি টানেল, আধো-আলো থেকে আধো-অন্ধকারে। এঁকে বেঁকে চলেছে তো চলেইছে পাহাড়ের বুকের মধ্যে। আমরাও মার্চ করতে করতে যাচ্ছি। একটা লিফটের কাছে এসে রাস্তাটা বৈঠকখানা হয়ে গিয়ে শেষ হল। লিফটে উঠে স্পষ্ট দেখলুম বাইশ তলার নিচে জি-ফ্লোর তারও নিচে ও-ফ্লোর সেই বোতাম টেপা হল। অথচ আসার সময় সাদাচোখে স্পষ্ট দেখেছি, চোদ্দতলা উঠলুম। নামছি চব্বিশ তলা। এটা কেমন করে হচ্ছে?

সাকে-টা বড্ড বেশি হয়ে গেছে নাকি? খুদে খুদে পেয়ালা বলে টের পাওয়া যায় না তেজটা কী প্রচণ্ড। ও-ফ্লোরে নেমে দেখি সামনেই এক সুবিশাল জলকুণ্ড। উহুঁ সুইমিং পুল না, কুণ্ড! কুণ্ডটা ভাগ ভাগ করা আছে, জলের নিচে চৌকো চৌকো দেওয়াল, তার ওপর দিয়ে জল চলাচল করছে। ওখানে পৌঁছে গিয়ে মেয়েরা বিদায় নিয়ে গেল। তোশিও-নো, তানাবে, মুরাসাকি খপাখপ তাদের কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাং ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরণে ভাগবতী চামড়া।

আমি আর কী করি? "যা থাকে কপালে" বলে আমিও চোখ বন্ধ করে কিমোনো খুলে সামনের কুণ্ডটায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বার্ড স্যাংচুয়ারির মত কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল— তোশিও-নো ওদিক থেকে হেঁকে উঠলেন, "ওখানে নয়, এদিকে এস। ওটা হল লেডিস কুণ্ড।" আমি তো পালাতে পথ পাই না—তাড়াতাড়ি উঠে পাশের কুণ্ডে ঢুকে পড়ি। শিগগিরই দেখলুম লেডিসরাও এসে কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কুণ্ডে। এত স্ত্রী পুং কুণ্ড ভাগাভাগির উদ্দেশ্য আর যাই হোক, স্নাতকদের লজ্জা নিবারণ নয়। কেননা মাটির ওপরে যা কিছু, লিঙ্গভেদের বন্দোবস্ত তা কেবল মেঝের ওপরে লাইন টেনে। শুধুই তাত্ত্বিক ভেদ, থিওরেটিকাল ডিসটিংশন। পর্দা বা দেয়ালের মত জাগতিক আড়াল আবডালের বালাই নেই। দেয়াল যা কিছু জলের নিচে। আর জল তো নয় অগ্নিকুণ্ড। গন্ধকের হলদে ধোঁয়ায় বাতাস আবছা হয়ে যায়। চতুর্দিকে হলদে হলদে গন্ধক চূর্ণ জমে আছে পাথরের ওপরে। আর গন্ধকবাষ্পের কড়াগন্ধে নাক ভরপুর। অথচ এতটুকু শ্বাসকষ্ট নেই। জল এত গরম, যে মনে হল একদম ঝলসে গেছি—এক লহমার মধ্যেই সাকে খাওয়ার যা কিছু নেশা সব ছুটে গিয়ে হাড়ে মজ্জায় ঝনঝনে জ্ঞানগম্যি এসে গেল।

যখন তোশিও-নো জল ছেড়ে উঠলো পেছু পেছু আমরাও উঠলুম ডাঙায়। কেউ কারুর দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছি না, আড়ে আড়ে। প্রত্যেকেই দেখছি প্রত্যেকের চেহারা ঠিক তেলে-ভাজা চিংড়ি মাছের মতন। লাল টকটক করছে। ভগবানের চামড়া। গন্ধকের ধোঁয়ায় অবশ্য সবাই কিছুটা আচ্ছন্ন। কিমোনো নিতে গিয়ে দেখি কিমোনো কখন হাওয়া হয়ে গেছে অ্যাঁ এবারে কি তবে বিনা কিমোনোতেই ফিরে যেতে হবে? আমি তো বসে পড়েছি প্রায় মাটিতে—এমন সময়ে দেখি মস্ত সাদা একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ অন্তরীক্ষ থেকে। প্রত্যেককে একটা। তোয়ালে লুফে নিয়ে গা মুছে তোয়ালে জড়িয়ে গুটিগুটি এগোচ্ছি, তোশিও বলল—"ওকি! ওকি! তোয়ালে রেখে যাও।"

তোয়ালে রেখে? তানাবে, মুরাসাকি ঝড়াঝড় তোয়ালে মাটিতে ফেলে দিলে। অন্তরীক্ষ থেকে ফর্সা কাচা কিমোনো এসে গেল তাদের হাতে। বেঁটেখাটো একরঙা কিমোনো—গতবারের মতন রংচঙে বড়সড় নয়। দেখা দেখি আমিও। তবু ভাল, যাহোক একটা জামা পরে যাওয়া হবে ঘরে, অন্তত। গেঞ্জি-ইজের প্রভৃতি তো অনেকক্ষণই হলো বিস্মৃতদিনের উপকথায় পরিণত হয়েছে। তবু স্বীকার করতেই হবে, শরীর বেশ চনমনে হয়েছে এই গন্ধকুণ্ডের জলস্পর্শে। পাতালের আগুন থেকে উঠে-আসা-জল—সেকি সোজা ব্যাপার?

আমরা পুনরায় মার্চ করতে করতে গিয়ে লিফটে চড়লুম। এবার উঠলুম উনিশতলা। নাঃ—মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে যাবে এবারে। আমার অবস্থা দেখে তানাবের মায়া হল। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিলো। এদের আসলে অনেকগুলো লিফট আছে, একেকটা একেক রকম লেভেলে যাতায়াত করে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন লিফটে চড়ছি বলে ভিন্ন ভিন্ন তলার হিসেব পাচ্ছি। পাহাড় কেটে কেটে ঘর বাড়ি তো, এক এক হাইটে এক এক তলা।

ঘরে এসে পৌঁছেই দেখি মাটিতে পাতা হয়ে গেছে চমৎকার বিছানা। ঠিক যেমন দেশের বাড়িতে বিছানা হয়। মেঝেয় একটি তোষক, তাতে সাদা ধবধবে চাদর মোড়া, দুটি বালিশ, তাতে সাদা ধপধপে ওয়াড় পরানো, একটি লেপ—তাতেও দুগ্ধ ধবল ওয়াড়। বালিশের নিচে ফর্সা কিমোনো ভাঁজ করা। দেখেই আরাম হল। পর পর চার খানা মাদুরে চার খানা বিছানা। শুয়ে পড়ব ভাবছি। কথাটা বলতেই তোসিও 'শোবে মানে? স্নান করতে হবে না?"

—"আবার স্নান? এতক্ষণ তবে কী করলুম?"

"ওটাকে ধুতে হবে না? গা-ময় গন্ধকচূর্ণ বসে গেলে ঘা হয়ে যাবে যে!" বলেই লেফট-রাইট করে তোসিও বাথরুমে চলল। তানাবে আমাকে বললে—"যাও যাও, তুমিও যাও, টু অ্যাট এ টাইম।"—এ আবার কিরকম নিয়ম রে বাবা? একা একা কি বাথরুমে যাওয়াও বারণ? বাথরুমে ঢুকে দেখি আশ্চর্য ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটি বিশাল স্টীলের বালতি। অর্থাৎ বালতির মত আকৃতির টব। খালি। তার পাশে দুটি টেলিফোন। ঘরে ঢুকেই কিমোনো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোশিও-নো ফোন তুলে কিছু কথাবার্তা বলল। দেখলুম এ ঘরে থরে থরে পরিষ্কার তোয়ালে সাজানো আছে। বাঃ! এবং কিছু কিমোনোও। তোশিও দেখি টবের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসেছে। টবের কিনারা দিয়ে মাথাটি উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্য টবে আমিও বসলুম। হঠাৎ দেখি বালতি আপনা আপনি গরম জলে ভরে উঠছে। তলা থেকে জল উঠে গলা পর্যন্ত ভরেই থেমে গেল। আমাকে কোনো কল খুলতে হল না, মগ-টগের তো বালাই নেই। জলে কেমন কেমন গন্ধ?

—"এটা যে ওই স্পা থেকে। কুণ্ডের জল কিনা।" তোশিও বলল। আমি তো থ!

—ঘরেই আসে? তবে কেন অত কষ্ট করে চব্বিশ তলা ঠেঙিয়ে পাতাল প্রবেশ, এবং সর্বসমক্ষে কিমোনো ত্যাগ? দিব্যি বন্ধ দরজার ভেতরে বালতি করে চলে আসছে যখন, প্রথমেই তো এখানে নেয়ে নিলে হত?

—"দূর, তা কখনো হয়? ট্রাডিশন বলে একটা ব্যাপার আছে না? তোমার কিছু খেয়াল থাকে না, কুণ্ডস্নান একটা ট্রাডিশনাল কাস্টম। এখানে ওই জল পাইপে করে আনা হচ্ছে, তার কারণ ওই জল না হলে গা থেকে গন্ধকের গুঁড়ো উঠবে না।"—এক সময়ে ঐ জল আবার আপনা-আপনি নেমে গেল, বালতি খালি হয়ে গেল। যেন ম্যাজিক। কোথা দিয়ে যে আসছে, কোথা দিয়ে যে যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছি না। জলটা যেন জ্যান্ত।

—"এবার ফ্রেশ ওয়াটার।"

—"সাবান? সাবান আছে?"

—"সাবান ব্যবহার করা ট্রাডিশনে নেই।"

—"আই সী।" ফ্রেশ ওয়াটার এলেন। ফ্রেশ ওয়াটার গেলেন। দিব্যি ঝরঝরে লাগছে। লাফিয়ে উঠে পড়ছি, তোশিও-নো ডান হাত নেড়ে ফেললেন। আমার বাঁ হাতটি

ডানহাতে বজ্র মুষ্টিতে ধরে এক ঝাঁকুনিতে ফের বসিয়ে দিলেন বালতিতে। "এইবারে আসল স্নান। এলিকসির অফ বাথ। এইবারে যে জলটা আসবে সেটা হচ্ছে পিওর কপার মিশ্রিত। বিশুদ্ধ তাম্র-লিপ্ত জলে স্নান করলে তবেই তো গন্ধক কুণ্ডে স্নানের পূর্ণ উপকারটা পাবে।"

—জল আসতে সুরু করেছে। আপাদমস্তক কথাটার মানে বোঝা যাচ্ছে, পা থেকে থেকে জল উঠছে। আপাদস্কন্ধ উঠবে।—"গাউথামা বুদার নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই রিচুয়াল বাথটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ তো তোমাদের দেশেরই, "অ্যাব্যা-গ্যায়ানা" বাথ। তোমাদের মন্দিরে এসব ব্যবস্থা নেই?" মনের আনন্দে ডুবতে ডুবতে তোশিও বলল। ও হরি! এর নাম অবগাহন? গৌতম বুদ্ধের প্রণালী?

"আমাদের দেশে এসব যন্ত্রপাতি এখনো পৌঁছয়নি! ডিভেলপিং কান্ট্রি। এখনও বানাতে শিখিনি।"

—"আড়াই হাজার বছরেও বানাতে শেখেনি? তাজ্জব কথা!" থুপে থুপে সারা গা মুছতে মুছতে তোশিও বলল। লজ্জায় চুপ করে যাই।

ঘরে ফিরেই চমৎকৃত। দেখি তানাবে মুরাসাকি দুজনেই ঝাঁ চকচকে উলঙ্গ। তারাও পাশের বাথরুমে গিয়ে দ্বৈত স্নান সেরে এসেছে। জোড়ায় জোড়ায় নাইতে হয় এখানে। আপাতত তারা গম্ভীর মুখে কিমোনো ভাঁজ করছে। বালিশের নিচে যত্ন করে কিমোনোটি রেখে তারা মিষ্টি হেসে শুভরাত্রি বলে শুয়ে পড়ল। আমার আর লজ্জা করবে কি।

—"এ জন্মের মত আর হয়ে গেছে যা হবার। এমন কি লেডিস কুণ্ডে পর্যন্ত নেমে পড়েছি। আমি ফিসফিসিয়ে তোশিওকে বললুম,—"এবার গেঞ্জি-টেঞ্জি ইজের-টিজেরগুলো পরে নিলে কি ট্রাডিশনের অবমাননা করা হবে?"

—"পরতে পারো কিন্তু কেন পরবে?" তারপর তানাবের দিকে লক্ষ্য করে বলল—"ওরা চাষাভুষো মানুষ। লজ্জা শরমের বালাই নেই, কিমোনো খুলে ফেলেছে। ছি ছি ছি !"

"তুমি বুঝি কিমানো পরেই ঘুমোও?"

"দূর কিমোনো পরে কেউ ঘুমোয়? আমি লেপের নিচে ঢুকে খুলে রাখব। সেটাই সভ্যতা।"

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সবাই প্রস্তুত। জলচৌকিতে জাপানী ব্রেকফাস্ট চলে এল। কাঁচা মাছ, কাঁচা ডিম, গরম সুপ, গরম ভাত, পাঁপড় ভাজার মতন কুড়মুড় সবুজ শ্যাওলা ভাজা, শশার আচার খেয়ে দেয়ে রওনা দিলুম। জুতো জামা রাখা ছিল যেখানে, সেখানে যেতেই, ট্রেতে করে তত্ত্বের মতো সযত্নে সাজিয়ে বিল এলো। তোশিও তানাবে আমি এবং মুরাসাকি সকলে মিলে বিল নিয়ে কিঞ্চিৎ কাড়াকাড়ি চলল—শেষটা মুরাসাকিই দিয়ে দিলে। কেননা সেইটেই নাকি ট্রাডিশন। ওটা ওরই শহর, আমরা তার অতিথি। জাপানী ভাষায় বিলটা করা ছিল তাই কাড়াকাড়ি করলেও বিলটা যে কত তার

বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি। ছবির মত সুন্দর বিল, হ্যাণ্ডমেড পেপারে, তুলি দিয়ে আঁকা। যেন বাঁশের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্য।

জোবান থেকে কাজিওয়াতা। সেখানে মোরাসাকিকে বিদায় দিয়ে আমরা ট্রেনে উঠলুম, ইউয়াকি। ইউয়াকি স্টেশনে নেমে তানাবে মনে করিয়ে দিল—"হারানো ক্যামেরা পুনরুদ্ধার করবে না? বের কর তোমার কাগজপত্তর পাসপোর্ট কমপ্লেনের কপি।" এসব সময়ে তোশিও-নো অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। এবম্বিধ তুচ্ছ ব্যাপারে মন দেওয়া সামুরাইদের যোগ্য নয়। তানাবে বলল,—"তুমি কাগজপত্র বের কর, আমি একটু মেনস রুম থেকে ঘুরে আসছি।"

—আমি স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে "গুড ইভনিং" বলতেই সে বলে উঠল,

—"কামেলা?" এবং ড্রয়ার খুলে তোদের বৌদির বক্স ক্যামেরাটি বের করে দিয়ে এক গাল হেসে বললে—"তু ওলদ। নিউ বাই।" আমি তাড়াতাড়ি বললুম—"আইডেন্টিফিকেশন? পাসপোর্ট নম্বর? এক্সপোজার নম্বর? পেপার্স?" স্টেশন মাস্টার হেসেই কুল পায় না। গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে।—"হোয়াত আইদেনতিফিকেশন? ইউ ইনদিয়ান। আই নো ইনদিয়ান লস্ত ওলদ কামেলা।" সত্যিই তো? আমার চামড়াই তো আমার আইডেনটিটি। এই সুদূর উত্তর-পূর্ব জাপানী মফঃস্বল শহরে আর কজন ভারতীয় এসে বক্স ক্যামেরা হারাচ্ছে? আর এর জন্যে কি না এতে ঝামেলা কাজিওয়াতাতে—ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট গেছে ফর্ম ভরতে। বেরিয়ে দেখি তোশিও আর তানাবে কী সব পরামর্শ করছে। আমাকে বললে, "ক্যামেরা পেয়েছ তো? চলো, বাড়িতে গিয়ে সব কথা হবে।" কিসের পরামর্শ? গাড়িতে যেতে যেতেই প্রশ্ন করি। ব্যাপার কি? তানাবে বললে "মুরাসাকি যদিও বিলটা দিয়েছে, কিন্তু বিল হয়েছে বিরাট। ওটা কোনো একজনের স্কন্ধে ফেলে দেওয়া যায় না। এখন ওকে কী ভাবে আমরা আমাদের অংশটা শোধ করতে পারি, ট্রাডিশন অনুযায়ী, তোশিওকে তাই জিজ্ঞেস করছি। আমরা চাষাভুষো লোক—আমরা অত আদব কায়দা জানি না তো? তিনজনে মিলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ইয়েন পাঠালেই হিসেবটা ঠিক হবে, এইটুকু বলতে পারি আর কি। "(অর্থাৎ চার হাজার টাকা।) তোশিও-নো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—"চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে—তোমার যত্ন-আত্তিতে এবং অতিথি সৎকারে আমরা তৃপ্ত। যারপরনাই খুশি হয়ে এই টাকাটা সেই বিমল আনন্দের প্রকাশস্বরূপ তোমাকে পাঠাচ্ছি।—ওনলি অ্যাজ এ টোকেন অব আওয়ার জেনুইন অ্যাপ্রিসিয়েশন"—অর্থাৎ বখশিস্? বন্ধুর আতিথ্যের শেয়ার দেওয়া মানে ট্রাডিশনের অবমাননা। কিন্তু বখশিস্? সামুরাইদের বার্থরাইট ওটা।

আবার চমৎকার হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছবির মত অক্ষরে তুলির মত কলমে লেখা হল সেই কিম্ভুত চিঠি। এবার সই করার পালা। বলা বাহুল্য, প্রথমেই তোশিও। তারপরে আমি যেহেতু আমি চক্রবর্তী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, পরন্তু এমন ব্রাহ্মণ, যারা রাজ্যশাসনও করত—সেহেতু সামুরাইয়ের পরেই জাতিগত ভাবে আমার স্থান উচ্চে। সবার শেষে তানাবে। (ব্যাটা চাষা)—"আমি কি বাংলাতেই সই করব?" তোশিও বললে— "না!

বাংলা কেন, কোনো ভাষাতেই তুমি এ চিঠি সই করতে পার না। কেন না এটা জাপানী ভাষায় লেখা। এবং তুমি জাপানী পড়তে পার না। যে ভাষা তুমি পড়তে পার না, সে ভাষায় লেখা কোনো ডকুমেণ্টেই আমরা তোমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে পারি না। সেটা বে-আইনী।"—তবে? এইমাত্র আমার অংশটা আমি শুধে দিয়েছি—যা কিছু বক্তৃতার দক্ষিণাস্বরূপ জুটেছিল, সবটা গেছে ট্রাডিশনের দয়ায়, জোবানের গন্ধকের বাষ্পে! এখন সইও করতে পারব না?—"তাহলে আমি কি ওকে আলাদা ইংরেজিতে চিঠি দেব?" এবারে তানাবে হাসল—"ও কি ইংরিজি জানে?" —"তাই তো! তবে?"

—"তবে আর কি? তোমার নামটা আমিই সই করে দিচ্ছি জাপানী ভাষাতে। তাহলে আর কোন গণ্ডগোল হবে না।" গুরুগম্ভীর রায় দিলেন সামুরাই তোশিও। —"নো। আমার বদলে—তিনি সই করলে সেটা যদি বে-আইনী না হয় তাতে আমার আর বলবার কিছুই থাকে না।"

হাসিমুখে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেবল আমার মুখের হাসিটি উবে গেল। —"এত বেশি খরচ হলে আর কোনো ভালো জিনিসকেই কি ভালো লাগে?"—আশ্চর্য কথা—তানাবে-তোশিও দুজনেই আমার এ দুঃখটা কিন্তু দিব্যি বুঝতে পারলে। কি চাষা, কি সামুরাই বেশি খরচের দুঃখটা সবাই বোঝে—"আমার গাড়িটার মতন হল আর কি।" তোশিও বলে।

—"গাড়ি? তোশিও-নো, তুমি গাড়ি চালাও না শুনেছিলুম যে?"

—"গাড়ি চালায় না ঠিকই। তা বলে গাড়ি থাকবে না কেন? কোনো ইউনিভার্সিটি প্রফেসারের গাড়ি নেই, এটা লজ্জার কথা!" তোশিওর হয়ে তানাবেই উত্তর দেয়। —"যেমন তেমন গাড়িও নয় তোশিও-নোর। স্পেশাল অর্ডার দেয়া গাড়ি। দেখতে যাবে একদিন?"

—"বেশ তো। আজই চল না। গাড়িও দেখবে, চাও খাবে।" তোশিও নেমন্তন্ন করলে।

বিকেলে গেলুম। সত্যিই দারুণ গাড়ি। গ্যারাজ আলো করে আছে।

ভেতরে ছোট রেফ্রিজারেটর ফিট করা। তাতে বরফের ট্রেতে গোলগোল আঙুরের মত বরফ জমেছে। ছোট্ট কাবার্ডে দামী স্কচ, গেলাশ সাজানো। গদির মত কার্পেট মোড়া গাড়ীর ভেতরটা। সামনে ড্যাশবোর্ডে ছোট্ট টেলিভিশনে রঙিন জাপানী নাটক হচ্ছে। পাশে একটা কুলুঙ্গিতে কার্পেটের সঙ্গে রংমেলানো টেলিফোন। ঠিক খেলনার মতন। ছোট্ট।

"ফোনটা কি সত্যিকারের?"

—"এখান থেকে বাড়িতে ফোন করতে পারো। করবে? কলকাতা, নিউইয়র্ক অস্‌লো—সব পাওয়া যায়।"

আমি তো হাঁ। এমন গাড়িখানা, অথচ তোশিও অফিসে আসে ট্রেনে, বাসে? ব্যাপার কি? ওই ব্যাপার। গাড়ি চালানোর মত নীচকর্ম সামুরাই করে না। কিন্তু শোফার রাখার

মত বেতনও বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। তার ওপর গাড়ির মেইনটেনেন্স খরচ আছে না? দু' দুবার পুরো কার্পেট, আপহোলস্ট্রি, ফ্রিজ, টিভি, বদলাতে হয়েছে না?

—"কেন? আউট অব ডেট হয়ে যায় বুঝি?" আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

—"তা নয়। মানে বাড়িটা তো সমুদ্রের ধারে। দু' দুবারই টাইফুনে সমুদ্রে বান ডেকে, গ্যারাজসুদ্ধ গাড়ি জলের নিচে ডুবে গেছিল। তাই বদলাতে হয়েছে।"

—"এঞ্জিন আছে?" হঠাৎ কি মনে করে বলি।

—"নেই? বাঃ! তবে আর গাড়ি কেন? বাড়ি হয়ে যাবে তো। তানাবে দেখিয়ে দাও তো স্টার্ট দিয়ে—"তোশিওর স্বরে আহত সম্মানের ছোঁয়া।

—"থাক, থাক। আর দেখাতে হবে না। এই গাড়িটা ব্যবহারে লাগে না এটা বড়ই দুঃখ কিন্তু।"

—"কে বললে কাজে লাগে না? এই তো কাজে লাগছে।" হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে তোশিও বলে।—"দিব্যি ভালো জায়গা এয়ারকন্ডিশন করলেই চলে যায়—বেশ 'কোজি', এণ্টারটেইন করার পক্ষে মন্দ কি?"

—অর্থাৎ এটা ওর গাড়ি নয়, বাড়িই। ওর বৈঠকখানা আসলে। ভালো।

তানাবে বললে—"জোবানে বড্ডই খরচ হয়ে গেছে। চাকলাবাকলাতির জন্যে আমাদের একবার সুজিকিতে যেতেই হবে। চল কালই সুজিকি যাই।" আমি হাঁ হাঁ করে বাধা দিই—"আর ভাই কোথাও যাব না। খুব ভাল লাগছে জাপানে। কিন্তু হাতে টাকা নেই। আরও তো তিনচার দিন থাকতে হবে।"

—"টাকা লাগবে না। সুজিকি তো জাপানের মহারাজার অতিথিশালা। ৯০০ অব্দ থেকে এখানে মাত্র এক টাকা করে নামমাত্র সেলামী লাগে। খেতেও একটাকা। শুতেও এক টাকা। চল, চল খুব সুন্দর জায়গা। ট্রাডিশনাল অতিথিশালা কাকে বলে দেখে আসবে।" শুনে খুব উৎসাহ পেলুম। শহরে থাকলেই বরং খেতে-শুতে ঢের বেশি খরচ। তার চেয়ে ওখানেই দু-তিনদিন কাটিয়ে আসা ভাল। তানাবে বললে—"কাল লাঞ্চের পরই বেরিয়ে পড়ব।"

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে একটি ছোট টিলার ওপারে বনের মধ্যে কাঠের বাড়ী। চমৎকার প্যাগোডার থাম। দরজা। খিলেন। ঘরে বিরাট প্রদীপ জ্বলছে। লালেতে-কালোতে-সোনাতে কাঠের ওপর গালার কারুকার্য করা বারান্দা। অপরূপ বারান্দা। পুরোনো বলে পুরোনো? বলে দিতে হয় না, যে ৯০০ অব্দের। বিদ্যুৎ নেই। সবকিছু সেই পুরোনো দিনের মতই। খুব সম্ভ্রান্ত ঘরদোর। খুব ট্রাডিশনাল। তোশিও মহা তৃপ্ত—"এখানকার খাদ্যও আধুনিক নয়। ৯০০ অব্দের মেনু অনুযায়ী রান্না হয় এখানে।" বাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে এক থুত্থুরে বুড়ো আর তার থুত্থুরী বুড়ি পাহারা দেয় বাড়িটার। বেলা চারটেয় পৌঁছেছি। বুড়ি রাগ করে বললে—"এত বেলায় এলে, ডিনার দিতে দিতে রাত ৯টা হয়ে যাবে। তা যাক, এখন চা খাও।"

—"এরাও কি ৯০০ অব্দ থেকে আছে?"

"তা বলতে পারো। এরা আছে নব্বুই বছর। কিন্তু এই কাঠুরের পরিবারই এই জায়গার ট্রাডিশনাল খবরদারি করে আসছে সেই ৯০০ অব্দ থেকে। পূর্বপুরুষের অধিকারক্রমে এরা চাকরি করে যাচ্ছে।"

—"বুড়ো মারা গেলে কী হবে? ছেলেপুলে আছে?"

—"আছে। শহরে চাকরি করে। বুড়ো মরলে তাকে এই বনে এসে এই কাজ নিতে হবে। কিন্তু সে নিতে চায় না। তার বউও।" হঠাৎ তানাবে থেমে গেল। তোশিও সূত্রটা তুলে নেয়—

"তার বউও ঠিক আমার বউয়ের মত। খুব শহর ভালবাসে। কিন্তু ছেলেটা আমার মত নয়। তাই সেও শহরে থেকে গেছে বউয়ের কিমোনোর পিঠে ওবি হয়ে। যত মেনিমুখো ছেলে। হুঁঃ" —নাক দিয়ে বিশ্রী শব্দ করে অবজ্ঞা প্রকাশ করা তোশিওর মুদ্রাদোষ।

"মেয়েদের কথায় চলেছো কি প্রলয় অনিবার্য। মেয়েরা থাকবে মেয়েদের মত। এই যে তানাবে, বৌকে চাবী দিয়ে রাখে,—ঠিক করে। ওরা চাষা,—ওদের সব ব্যাপার সোজাসুজি। এটা কিন্তু খুব প্রশংসার।"

—"এই কাঠের বাড়িটার কড়িবরগাগুলো দেখেছো? এই যে দামী কাগজের লণ্ঠন? এই যে মাদুর?—" নির্বিকার গলায় ঠিক এই সময়ে তানাবে আমাকে রাজঅতিথিশালার ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে থাকে। কড়িবরগা দেখব কি? তোশিওর কথা শুনে তো আমি হাঁ! শিষ্ট, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ঐ তানাবে, সে কিনা বৌকে চাবী দিয়ে রখে? অথচ বেশ তো সুস্থ স্বাভাবিক দেখায় ওকে। বেচারী বউয়ের অপরাধ সে পরমা সুন্দরী!

আশ্চর্য দেশ বটে জাপান! ছোট শহর ইউয়াকিতে এই চলছে, অথচ টোকিওতে দেখে এলুম একটা রেস্তরাঁ হয়েছে গিনজাতে। টোকিওর চৌরঙ্গী, যেখানে স্বাধীন মেয়েরা এসে নিয়মিত সন্ধ্যাবেলা তাদের পুরুষসঙ্গী ভাড়া করে নিয়ে যায়। ওটাও যে-দেশে চলছে, তোশিও-তানাবের বউশাসনের চাষী-সামুরাই ডিরেক্ট মেথডও সেখানেই চলছে। সত্যি, কী ভুলই যে করেছি জাপানী মেয়ে বিয়ে না-করে। তোদের বউদি তো পারলে আমাকেই চাবি দিয়ে রাখে, নেহাৎ আপিস যেতেই হয় তাই!"

—"তা, আনলে না কেন একটা জাপানী বউ ধরে? তবু তো লোকে দেখত একটা কিছু আনলো। চাবী দেব না আরো কিছু—যা গুণবান দাদামণিটি তোমাদের এক্ষুনি আমি দাতব্য করে দিচ্ছি, দেখবি কেউ ওকে ভুলেও নেবে না! ঈঈশ্‌শ্‌—বৌদি ফোঁস্ করে উঠতেই দাদা বেগতিক বুঝে আবার গল্প ফেঁদে ফেলেন—

—"আমি স্তম্ভিত, ওদিকে তানাবে দিব্যি শান্ত মুখে বলে যাচ্ছে—'এই যে কাঠের জলচৌকিটা দেখছ এটা তৈরি হয়েছে হিরোসাকিতে। বিখ্যাত মধ্যযুগীয় শিক্ষাকেন্দ্র। অবশ্য আপাতত আপেল চাষের জন্যই বিখ্যাত।'—'সামুরাইদের আড্ডা বলেও প্রসিদ্ধ

ছিল ওটা' —তোশিও যোগ করে দেয়, কী স্বাভাবিক ভাবেই না ওরা বউ ত্যাগ, বউবন্দীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে!

বিচ্ছিরি সবুজ চা খেয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। চারিদিকে জাপানী জঙ্গল, তাতে চমৎকার সব জাপানী পোকামাকড় ডাকছে, পটে আঁকা ধানক্ষেত, গ্রাম, আরো দূরে প্রশান্ত মহাসমুদ্র দেখা যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। ক্রমশ রাত হল। ৯টার সময়ে খাবার এসে পড়ল। খাবার মানে একটা ভাতের ফ্যানের মতন সুপ্, ওরা বলল বাক্‌হুইটের ফ্যান—বাক্‌হুইট হচ্ছে খুব শক্ত দানার এক রকম শস্য, গমেরই জাতভাই, তবে মানুষে আজকাল ওটা বড় একটা খায় না।—"মধ্যযুগের জাপানে খুব খেত। আজকাল কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়।"—তোশিও জানালেন সগর্বে। "সেদ্ধ হতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"—

—"প্রেসারকুকার নেই?"

—চাবুক মারলে যেমন কুঁকড়ে ওঠে মানুষে, তেমনি কুঁকড়ে গিয়ে তোশিও-নো বললেন "চাকলাবাকলাতি। মাদার ইনডিয়ারও তো গ্রেট ট্রাডিশন আছে? তবে তুমি কী করে বারবার ট্রাডিশনকে অবমাননা করছ? শুনছ এরা কত কষ্ট করে বাকহুইট যোগাড় করে··· সেটা কি প্রেসারকুকারে রাঁধবে বলে? ওটা কি মধ্যযুগের ট্রাডিশনাল বাসন? এখানে রান্নাবান্না সব হয় ৯০০ অব্দের নিয়মে। মেনু, রেসিপি, সব কিছু ৯০০ অব্দের। তুমি সম্রাট হিরোহিতোর অতিথি!"

—ঐ সুপ বোলের পাশে দুটি ছোটো ছোটো নীলরঙের ডিম। আমাদের বাড়ীতে সেই যে কাকে একবার বাসা বেঁধেছিল নীল নীল ডিম পেড়েছিল, মনে আছে? দেখতে অনেকটা সেইরকম।" দাদামণি থামলেন।

—"কিসের ডিম ছিল ঐগুলো? কাগের? এঃ ছিছি!"—বৌদি মুখ বিকৃত করেন।

—"কোয়েলের। কোয়েলের ডিম, নিদেনপক্ষে পঁচাত্তর বছরের পুরোনো। ওখানে পঁচাত্তর কেন, দেড়শ বছর পর্যন্ত পুরনো ডিম পাওয়া যায়।'

—সেই ডিম ভেঙে গরম সুপে ফেলে গুলে দিতে হয়। মানে যার নাম চীনে রেস্তরাঁয় এগড্রপ সুপ। সেই সুপই প্রধান খাদ্য। এছাড়া ওই বাক্‌হুইটের তৈরি একরকমের কেক, অখাদ্য, (না-নোন্তা, না মিষ্টি) আর সবশেষে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টিভাতের ডেলা, জলজ উদ্ভিদের সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। এই খাদ্য, সঙ্গে সাকে আছে অবশ্য। বুড়ি এসে হাঁটু মুড়ে বসে দোজো-দোমো করে সাকে খাওয়ালো, জোবানের সেই মেয়েদের মতন কায়দা করেই। যত্নের অভাব নেই।

খেয়ে দেয়ে পরিষ্কার করে পাতা বিছানায় শুতে যাচ্ছি—(এখানে বিছানা অন্য রকমের, বালিশ আর দুখানা কম্বল, একটাকা ভাড়া)। বুড়ো এসে হাঁ হাঁ করে আটকালে, হাতে একটা মস্ত তোয়ালে ধরিয়ে দিলে। কী ব্যাপার? তোয়ালে পেতে শোবো?

—"শোবে না—আগে স্নান করতে হবে"—তানাবে হাসতে হাসতে বলে—"সম্রাট হিরোহিতোর নিয়ম। ৯০০ অব্দে উনি আইন করে গেছেন এখানে যে-পথিকরা আসবে, আগে স্নান, তবে তাদের শোওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই নিয়ম।"

"বেশ।" স্নানের ঘরে চললাম। মস্ত বড় ঘর। তাতে পাশাপাশি চারটে ডেকচি মাটিতে বসানো, জল ফুটছে। পাশে ঠাণ্ডা জলের বালতি, মগ সব আছে। একসঙ্গেই তিনজনের স্নান সুরু হল। স্নান করতে করতে মনে হল—জলটা কিসে ফুটছে? নিচে তো কৈ কোনো উনুন দেখছি না? তোশিওকে জিজ্ঞেস করতে তিনি মৃদু হেসে বললেন—"এখানে উনুন লাগে না।" আরেকটু হেসে তানাবে বললো—"উনুন নেই বলেই তো রান্না হতে অত দেরি হল"—

—"আর সব রান্নাই কেবল সেদ্ধ? দেখলে না? এটাই ট্রাডিশান।"

এরা কি ধাঁধা বলছে? এদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? উনুন নেই অথচ সেদ্ধ হচ্ছে জল ফুটছে ব্যাপারটা কী?

নাঃ জাপানী ঐতিহ্য আমার বাঙাল ব্রেনের পক্ষে বেশী সূক্ষ্ম।

—"উনুন নেই তবে জল ফুটছে কেমন করে?' তোশিও তানাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাস্য বিনিময় করে—

—"ওই তো মজা! ৯০০ বছরের ঐতিহ্য!"

গা মুছতে মুছতে আমি চতুর্দিকে তাকাতে থাকি, কোনো পাইপ?

নাঃ। ব্যাপার কী? গরম জলের রহস্য কিনারা হল না। ঘরে এসে শুয়ে পড়ে, তোশিও রয়ে সয়ে বললো "আসলে এটা একটা আগ্নেয়গিরির গায়ে কিনা। ওই জলের পাত্রগুলো যে-ফাটলের ওপর বসানো, তাতেই জল আপনি ফোটে। রান্নাও হয় ফাটলের ওপর পাত্র বসিয়ে। ওপাশে বড় মুখটা আছে কাল সকালে যাব দেখতে। সেটা এখন একটা হ্রদ। কত রকমের পাখী আসে। অস্ট্রেলিয়ান পাখী, মাঙ্গোলিয়ান পাখী, কোরিয়ান, প্যাসিফিক্ থাইল্যাণ্ডের পাখী বিউটিফুল দৃশ্য।

আর পাখী! আর বিউটি! আমার প্রাণপাখী তো উড়ে গেছে। ভলক্যানোর ওপরে শুয়ে শুয়ে চোখে ঘুম আসে? কিন্তু আমার বন্ধুদের ভয়ডর নেই। তারা নিশ্চিন্ত। তোশিও-তানাবের প্রচণ্ড নাক ডাকছে। তোশিওর সামুরাই স্টাইলে "ঢ্যারারাম ঢ্যারারাম ঢ্যাম"—তানাবের চাষাড়ে স্টাইলে—"সাঁই গুড় গুড় সুঁই।" কেবল আমারই চোখে ঘুমের বদলে সর্ষে ফুল!

পরদিন সকলে ওরা লেক দেখতে গেল। আমিও গেলুম। শান্ত নীল জল ভরা চমৎকার হ্রদ। কিন্তু হ্রদে একটিও পাখী নেই। পাখী কেন নেই? তোশিও ভুরু কুঁচকে খুব ভাবিত হয়ে পড়ল। "ছেলেবেলা থেকে এখানে আসছি—জীবনে কখনো এই হ্রদের পাখী-হীন চেহারা দেখিনি। আশ্চর্য ব্যাপার!"

"আজকাল ইকোলজিক্যাল চেঞ্জের ফলে নানারকম অদল বদল হচ্ছে"—

আমার সায়েন্টিফিক সান্ত্বনাবাক্য থামিয়ে দিয়ে তোশিও বলে ওঠে—"ট্রাডিশন ওসব আধুনিক ইকোলজির ধার ধারে না। বুঝলে?"

এবার সবিনয়ে তানাবে বলতে গেল—"কিন্তু পাখীরা কি সেটা জানে?"—

—"অবশ্যই জানে। তারা শত শত বছর ধরে আসছে এখানে। এটা তাদেরও ট্রাডিশন। আশ্চর্য! এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগছে না।" আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে তোশিও। ইতিমধ্যে আমাকে কেউ একলক্ষ ইয়েন ঘুষ দিলেও আমি যে আর আগ্নেয়গিরির মাথায় বিশ্রামশালার আতিথ্য উপভোগ করতে পারবো না—তাতে ট্রাডিশন থাকুক আর চুলোয় যাক—এ ব্যাপারটা আমি তানাবেকে বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। ফলত লাঞ্চের আগেই আমরা—প্রাকৃতিক শোভা ছেড়ে, ঘিঞ্জি শহরে নেমে এসে যেন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সুজিকি রইল দুশো মাইল দূরে।

সেই রাত্রে আমাদের ইউয়াকি শহরে পরপর দুবার ভূমিকম্প হল। কেউই অবশ্য প্রাণে মরেনি, তবে এবার বুঝলুম কেন জাপানে কাগজের জানলা হয়, কাঠের বাড়ি হয়। কিছু তেমন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না।

ইউয়াকি ছেড়ে যাবার পালা এবার। তোশিও তানাবে সজলচক্ষে স্টেশনে এল বিদায় দিতে। বার দু-তিন কোমর ভাঁজ করে, সামুরাইয়ের পবিত্র ডানহাত এবং বাঁ হাত বাড়িয়ে তোশিও আমার দুই হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল—হাত আমার অবশ হয়ে গেল। ওদিকে চাষী তানাবের বিনয়নম্র কোমর ভাঁজ করা আর থামে না। "কলকাতায় দেখা হবে", ট্রেন ছেড়ে দিলো।

টোকিওতে এসে পরদিনই রেডিওতে বড় খবর—

"হাজার বছর পরে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সুজিকি জেগে উঠেছে, আগুন, পাথর, লাভা, উদ্গীরণ করছে, লাভাস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিলার নিচেকার গ্রামের মানুষেরা সব প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ইউয়াকি শহর উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে—

খুবই দুঃখের কথা সম্রাট হিরোহিতোর প্রতিষ্ঠিত নশো বছরের প্রাচীন রাজকীয় ধর্মশালাটি ও তার বৃদ্ধ সংরক্ষকদম্পতি এই অগ্ন্যুদ্গারে ধ্বংস হয়ে গেছে।"

দাদামণি দম নিতে থামলেন। চুরুটের লম্বা শাদা ছাইটা ঝেড়ে নিয়ে, বৌদির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে বললেন—"এর পরেও কি তুমি বলবে, প্রেজেণ্ট কেন আনিনি? নিজেকে যে ফেরত এনেছি এটাই একটা উপহারস্বরূপ হল না? তোরাই বল?"

আমরা আর বলব কী, আমরা ভয়ে চুপ। এরকম একটা খবর যেন কাগজে পড়েছি বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, পড়েছি। নির্ঘাৎ।

বৌদির পিঠের চাবিটা ঝনাৎ করে উঠল। বৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"পারোও বটে! যতো বাজে কথা। আসুক তোশিও-তানাবে। আমি ওদের জিজ্ঞেস করবো জোবানটা বেশি ভয়ের জায়গা, না সুজিকি। আর বউশাসন? তার ব্যবস্থাও ঠিক করবো। আসুক না তোমার সামুরাইরা একবার কলকাতাতে!"

বিজয়া

দীপালি দত্তরায়

এই সময়টাতে ওদেরও খিদে পায়। কৃষ্ণা দুই হাতে দু-প্লেট আলু চাট নিয়ে বীরের ঘরে ঢুকলেন। বীরের পড়ার টেবিলের সামনের চেয়ারটাতে কোয়েল পা তুলে বসে একটা বই পড়ছে, বীর পাশের চেয়ারটাতে টেবিলের ওপর দু-কনুই রেখে, হাতের পাতার মধ্যে মুখ রেখে কোয়েলের দিকে চেয়ে আছে। চারটে থেকে নাকি লোডশেডিং চলছে। টেবিলের ওপর কেরোসিন ল্যাম্প। ল্যাম্পটা কোয়েলের কাছাকাছি হলেও বীরের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

উনি নিঃশব্দে ঢুকেছেন ওদের একটু খুশির চমক দেবার জন্য। কোয়েলের মুখের দিকে বীরের পলক-হীন মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে নিজেই চমকে গেলেন। বীরের তাঁকে এতক্ষণ দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে এতই তন্ময় এখনও বুঝতে পারছে না, কৃষ্ণা এসে ঘরের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছেন! কোয়েল কিছু জোরে জোরেও পড়ে শোনাচ্ছে না বই থেকে।

'কি হচ্ছে তোমাদের? বীর তোমার পড়াশোনা নেই?'

ওরা দুজনেই চমকে ওঁর দিকে তাকালো।

'কোয়েল তোমাকে কতবার বলেছি, ওর সামনেই পরীক্ষা, কেন ওকে এভাবে ডিস্টার্ব করো? নাও আলু চাট এনেছি, দু-জনে মিলে খাও, তারপর বাড়ি যাও। তোমারও তো পড়াশোনা আছে। বাবাও বাড়িতে আছেন না?'

কোয়েল চেয়ার ছেড়ে উঠল।

'কি বই পড়ছিলে!" কৃষ্ণা এগিয়ে এসে দেখলেন। লিণ্ডা গড্‌ম্যানের লাভ সাইনস! কৃষ্ণার ভুরু একটু কুঁচকে গেল।

'দাও বইটা আমায় দাও। এসব আজে-বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করেছি না!'

কোয়েল মাথা ঝাঁকিয়ে বইটা আঁকড়ে ধরল। 'বাজে আবার কি? আমাদের ক্লাসের সবাই পড়ছে। আমার হয়ে গেলে তোমায় দেবো।'

বীর চুপচাপ চেয়ার বদলে পড়ার বই সামনে নিয়েছে। ঘরে সামান্য সিগারেটের গন্ধ। কে খেয়েছে কে জানে! হয়তো দুজনেই। কি যে করা যায় এদের নিয়ে।

'শিঞ্জি কোথায়? এই অন্ধকারে একাই বাড়ি চলে যায়নি তো? তুমিও আলু-চাট খেয়ে শিগগিরই বাড়ি যাও।'

'যাচ্ছিই তো, অতবার রিপিট করছ কেন? শিঞ্জি তানির ঘরে আছে। দেখলেই খালি বাড়ি যাও, বাড়ি যাও। বীর যদি নিজেই না পড়ে, তো আমি কি করব?' কোয়েল মুখ কালো করে জবাব দিলো।

বীর পিঠ শক্ত করে বসে পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ দেখাচ্ছে। কৃষ্ণা এবার ওকে নিয়ে পড়বেন কিনা কে জানে?

আর কথা না বাড়িয়ে কৃষ্ণা অন্য প্লেটটা তানি আর শিঞ্জির জন্যে নিয়ে ওদের ঘরের দিকে গেলেন। চারদিক অন্ধকার। এদিক-ওদিক দুচারটে ল্যাম্প বসানো আছে জায়গা মতন। কেরোসিনের গন্ধে একটা ভ্যাপসা ভাপ উঠছে। ওঁর বুকটা কেমন ধড় ফড় করছে। বীরের মুগ্ধ দৃষ্টিটা চোখের ওপর ভাসছে। এসব কি?

কৃষ্ণা রান্না শেষ করার আগেই শিঞ্জি ও কোয়েল বাড়ি চলে গেল। রাজুকে টর্চ নিয়ে ওদের একেবারে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসবার কথা বলে দিলেন। শিঞ্জি এসে রোজের মতন চুমু খেয়ে চুমু নিয়ে গেছে। কোয়েল রান্নাঘরের দরজাতেই 'যাচ্ছি' বলে বিদায় নিয়েছে।

কৃষ্ণা রীতিমত বিপন্ন বোধ করছেন। কাছাকাছি এক পাড়াতেই থাকে বলে অনেক সুবিধে তাঁর। মেয়েদের ওপর সব সময়ই নজর রাখা সম্ভব হয়। থাকে ত বেশির ভাগ সময়ই একা—ঐ বুড়ি আয়ার ভরসায়, রুদ্রাংশুর আর সময় কোথায় কারো কথা ভাববার? প্রায়ই থাকেও না এখানে। হিল্লি-দিল্লি নয় শুধু বিদেশেও প্রায়ই যাতায়াত। এখানে থাকলেও মেয়েদের খোঁজখবর নেবার সময় নেই তাঁর।

কোয়েল, শিঞ্জি দু-জনেই তাই দিনের অনেকখানি সময় এখানেই কাটিয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণা এ যোগাযোগটা নিয়মিত রেখে গেছেন। অসুখ-বিসুখে, কাজের লোকের অসুবিধায়। ওদের পড়াশুনো, খেলাধুলায়, জামা-কাপড়, বাড়তি জিনিস সব কিছুতেই সামনে থেকেছেন ও রেখেছেন। যাতে ওরা না ভাবে কৃষ্ণা ওদেরকেও ছেড়ে এসেছেন।

এতে রুদ্রাংশুর সুবিধে বই অসুবিধে হয়নি কিছু জানেন সবাই। নিজের সুবিধে বজায় রাখতে আপত্তি-টাপত্তির কথাও তোলেননি। মান-সম্মান বজায় রাখতে স্বীকারের যোগাযোগটাও রাখেননি। বিয়ে করেননি আবার সেও তাঁর অত উদ্যোগ করার সময় নেই বলে। কর্পোরেট বিজনেসের চক্রব্যূহের ভেতরে অনেকদিন আগেই মনকে অভিমন্যু করে ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রী-সন্তান মায়ার বন্ধন ছাড়া আর কি?

খাবার-টাবার সব ঠিকঠাক করে কৃষ্ণা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিজয়েন্দ্র দেরিতে বাড়িতে ফেরেন। বেশি কাজের চাপ না থাকলে খুব সকালে বেরোন না। কৃষ্ণা অবশ্য খুব সকাল-সকালই অফিসে চলে যান। তাই সকালের দিকে রান্নার বেশি সময় পেয়ে ওঠেন না। সন্ধ্যাবেলাতেই দু-বেলার রান্নার বেশির ভাগ সেরে নেন। ভাতটা রুটিটা রাজুই পারে।

কৃষ্ণা এবার স্নানটান সেরে নিতে গেলেন। বীর পড়ছে। মন দিয়েই মনে হলো। একবার উঁকি মেরে দেখে নিলেন নিঃশব্দে। তানিও পড়ছে। শিঞ্জি তানিকে নিয়ে ভাবনা নেই কৃষ্ণার। ওরা শান্ত আর লক্ষ্মী মেয়ে। ভাবনা ধরায় কোয়েলই। যত বড় হচ্ছে, ততই খেয়ালী হয়ে উঠছে, বীর দুরন্ত ছিল এখন অনেক বেশী শান্ত, তবে কোয়েলের সঙ্গেই ভাব এবং ঝগড়া! দুষ্টু রয়ে গেছে এখনও। তাতে কোন আপত্তি নেই। বীর তানি দুজনেই তাঁর খুব বাধ্য।

বিজয়েন্দ্র অফিস থেকে ফিরেই রাতের খাওয়া খেয়ে নেন। সবাই মিলে বসে একসঙ্গে খাওয়া হয়। এই এতক্ষণে কারেন্ট এলো। আলোটা বেশি জোরালো লাগছে। শীত আর নেই। এর মধ্যেই ভ্যাপসা লাগতে শুরু করেছে। অন্ধকার থাকলে যেন আরো। তানি বক্ বক্ করে যাচ্ছে। বীর একটু চুপচাপ। তানি ওর ওয়ার্ক এডুকেশনের ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ উৎসাহিত ভাবে কথা বলছে। আজ নাকি বুক বাইণ্ডিং পুরো শিখে এসেছে। 'নারী সেবা সংঘের সেই কাটারটা কেমন করে 'গিলোটিনের' মতন নেমে এসে বইটাকে ঠিক সাইজ মতন কেটে দিয়েছে—এই সব। তারপর বুক প্রিন্টিং-এর জন্যে সাদা কাপড় চাই ওর আর শিঞ্জির দু-জনেরই—জানালো।

ওর আবেদন মঞ্জুর করে বীরের দিকে তাকালেন বিজয়েন্দ্র।

'তো বীরবাহু, পড়াই লিখাই ক্যায়সী চল্ রহী?'

বীর চকিতে একবার কৃষ্ণার মুখ দেখে নিয়ে মোটা গলায় বলল, 'ভালো'। ড্যাডি, এবার আমার আর একটা ব্যাটারির পাখা চাই দেবে?"

'আগেরটা কি হলো?' বিজয়েন্দ্র জানতে চাইলেন। 'ব্যাটারি পুরে নাও নতুন। বাড়িতে না থাকলে কাল এনে দেবো।'

'ব্যাটারি তো আমি এনেই রাখি।' কৃষ্ণা বলে উঠলেন 'আগে বলোনি কেন? দিয়ে দেবো লাগিয়ে নিও।'

'না, ওটা নেই। কোয়েল নিয়ে গেছে।'

কৃষ্ণা বিরক্ত হলেন! 'কেন? ওকেও দেয়া হয়েছিল। তোমারটা নিলো কেন ও?'

'ওরটা ভেঙে গেছে', বীর সাফাই গাইল।

তানি উদারতা দেখাল ঃ আমারটা নিয়ে পড় আজ।

'এখন কে চায়? এখন তো কারেন্ট আছে'

তানি একটু দুষ্টুমির হাসি হাসল।'

'আচ্ছা এবার খাওয়া শেষ হয়ে থাকলে উঠে পড়ো। কাল আর একটা আনা যাবে। এবার আর কোয়েলকে দেবে না। দিলে তুমি আর পাবে না।' কৃষ্ণা বীরকে শাসন করে উঠে দাঁড়ালেন, হাত, মুখ ধুয়ে এসে খাবার দাবার যা ওঠাবার উঠিয়ে, রাজুর খাবার দিয়ে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

বিজয়েন্দ্র এখুনি শুয়ে পড়বেন না। সারাদিনের পরে এখনই দুজনের একটু নিভৃতি, ঘরের লাগোয়া ছোট্ট বারান্দায়। কাছাকাছি চেয়ারে বসে একটু গল্প সল্প, আলোচনা, সাড়ে নটা-দশটা নাগাদ শুতে যাওয়া, কৃষ্ণা তাঁর সন্ধেবেলার চমকের কথাটা বিজয়েন্দ্রকে জানালেন। কি করা যায়, অথবা যায় কিনা জানতে চাইলেন।

তাঁর মনটা কেবলই ছট্-ফট্ করছে। ওদের বয়সটা ভাল নয়। তাছাড়া কোয়েল আজকাল বেশ চালু হয়ে উঠছে। বড় বেশি ফ্যাশন কনসাস বড় বেশি সাবালিকা সাবালিকা ভাব এসে গেছে ওর মধ্যে। বীর ওর চেয়ে এক বছরের ছোট। আঠারো আর সতেরো। বীর হায়ার সেকেণ্ডারীর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কোয়েল পার্ট ওয়ান। কোয়েল একটু এগিয়ে আছে।

ছোট্টবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা চারজনে মিলে। বীর ওদের উত্যক্ত করে মারতো। কোয়েলের এক বছরের বড় হওয়াটা গ্রাহ্যই করতো না। চারজনের মধ্যে ও-ই একমাত্র ছেলে। সেটা প্রমাণ করার জন্যে বীরত্বেরও সীমা থাকতো না। তবু ভাই-বোনের মতনই বড় হয়েছে। ঠিক একই বাড়িতে না হলেও একই মায়ের তত্ত্বাবধানে।

বিজয়েন্দ্রও কোয়েল শিঞ্জিকে নিজের সন্তানদের মতনই ভেবে এসেছেন। রুদ্রাংশুর জীবন ও জীবিকা একীভূত। তা তিনি জানেন। তাই তাদের বাবা থাকতেও বাবার আদর আহ্লাদে তিনিই মুক্তহস্ত সব সময়। আঙ্কলকে ওরাও খুব মানে। কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে অন্তত কোয়েল তাঁরই দ্বারস্থ হয়েছে এতকাল। আজকাল বড় হয়ে যাওয়ার দরুন হয়তো একটু দূরে দূরে।

তানি আর শিঞ্জি একই বয়সী। চৌদ্দ আর পনেরোর মাঝামাঝি। দুটিতে খুব ভাব। পড়েও একই ক্লাসে। হাসি-খুশি সাধাসিধে। অন্তত এখনও। শিঞ্জি একটু গিন্নি গিন্নি ভাবও দেখায়। বাবার সংসারে তারই প্রতিপত্তি। মনোযোগও বেশি। কোয়েল একটু বেশি আদুরে ছিল। ছোট্টবেলা থেকেই ওদের কাছে কাছে দেখেছেন বিজয়েন্দ্র। কোনদিন মনে হয়নি বড় রকমের সমস্যা ওদের ভেতরে জন্ম নিতে পারে।

আজও উড়িয়ে দিতে চাইলেন কৃষ্ণার দুর্ভাবনাকে। 'ওসব নিয়ে ভেবোই না, এ বয়সে একটু ইন্‌ফ্যাচুয়েশান আসেই। কোয়েলটা বড্ড সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাই বীর সাহেব একটু মুগ্ধ হচ্ছে। ও কিছু না।'

কৃষ্ণা তবু নির্ভাবনা হতে পারছেন না। বললেন 'প্রবলেমটা কি জানো? আজ হঠাৎ করে ওদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আসা সম্ভব নয়। অথচ ভাই-বোনের মতন একসঙ্গে বড় হয়েও এরকম ভাব আসবে কেন?"

'তুমি এত ভাবছ কেন এটাকে নিয়ে? ও দুদিনের ব্যাপার। একটু বড় হলে নিজেরাই বুঝতে পারবে।' কৃষ্ণা আশ্বাস পান না, 'না জোর করে কিছু বলা যায় না। কোয়েল বড্ড ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ওর ফিজিকাল চার্ম সম্বন্ধে ভীষণ কনশাস! চোখের সামনে রোজ রোজ ওর উপস্থিতিটা বীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।'

'এখন ওদের সেপারেট করার কথা ভেবোই না। সিচুয়েশন সম্বন্ধে আরো বেশি কনশাস হয়ে যাবে। একটু চোখ রাখতে পারো। কিন্তু কোনো কথা-টথা ঘুরিয়ে ফিরিয়েও তুলো না।'

বিজয়েন্দ্র সিগারেট ধরালেন একটা। 'তা তো তুলবোই না। কিন্তু···কৃষ্ণা তাঁর কথা অসমাপ্ত রাখলেন।

'কিন্তু টিন্তু নিয়ে বেশি ভেবো না। বরং ওরা যে এক ধরনের ভাইবোন—একথাটা ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দাও। কোয়েলকে একটু বুঝতে দাও। তুমি ওর বড় হয়ে ওঠাকে বেশ অ্যাপ্রিসিয়েট করছ। ওর ওপর তোমার কনফিডেন্সও বাড়ছে। বীরটাও তো ওকে কোনদিন সিনিয়ারিটির সম্মান দিলো না। সেটাও বীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। ব্যস···'। বিজয়েন্দ্র ইতি টানতে চাইলেন আলোচনার।

'অত সহজেই ব্যস হয়? ওর চোখের দৃষ্টি আমি দেখেছি। আর সেই থেকে কি ভয় যে করছে! তুমি বুঝতেই চাইছ না।'

কৃষ্ণার অনুযোগ শুনে বিজয়েন্দ্র অন্ধকারেই হাসলেন। একটু হাল্‌কা হাওয়া আমদানী করলেন কৃষ্ণার মনের মেঘটাকে উড়িয়ে দিতে।

'তোমার ভাবনাটা কি নিয়ে বল তো? তোমার মেয়ের শ্বশুর হয়ে যেতে পারি আমি, এই ভয়? আমার কিন্তু তোমাকে ছেলের শাশুড়ী হিসাবে ভাবতে মন্দ লাগছে না।'

'বিজয়!' ধমক লাগালেন কৃষ্ণা, 'বী সিরিয়াস! এসব কথা এভাবে বলছ শুনতে খুব খারাপ লাগছে। রসিকতা করার বিষয় মোটেই নয় এটা। দে মাষ্ট বী ষ্টপ্‌ড। নইলে আমাদের ভীষণ কেমন একটা ইন্‌সেসচুয়াস ব্যাপার এসে যাবে। ভারি বিচ্ছিরি হবে।'

'কি করতে চাও তবে?' বিজয়েন্দ্র জোর করে গাম্ভীর্য আনলেন গলায়। 'জানি না তুমি ভাবো, দুজনে মিলে একটা পথ বের করতেই হবে। বীর, তানি আমার ছেলে মেয়ে না হতে পারে। কিন্তু আজ তো আমি ওদের মা! এ ধরনের চিন্তা ওদের মধ্যে করবে কেন?'

'আঃ হা এ বয়সের এসব ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে? ওরা তো আর সত্যি ভাই-বোন নয়! কাজিন-লাভ বলেও তো একটা কথা আছে। প্লীজ কৃষ্ণা, ওটাকে ওরকম ভাবেই সাবধানে ট্যাকল করো। ওদের ভয় পাইয়ে দিও না, কিম্বা অপরাধবোধেরও আমদানী কোরো না। বাঙালী মেয়ে, আর রাজপুত ছেলে। মনের মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাবে।

কৃষ্ণা চুপ করে ভাবতে লাগলেন। সন্ধেবেলায় ব্যাপারটা চোখে পড়ার পর থেকে কেমন অসহায় ভাবছেন নিজেকে। তাঁর মনেও অপরাধবোধ খেলা করে তলায় তলায়। বিজয়েন্দ্রের মত অত সহজে সব কিছুতে নিশ্চিন্ত ও মুক্তমনও হতে পারেন না। একদিকে নিজের সন্তান অন্যদিকে স্বামীর সন্তান। ওরা ভাই-বোন ছাড়া আর কি?

অথচ ওরা ঠিকই জানে ওদের মধ্যে কোন রক্তের বাঁধন নেই। শুধু সম্পর্কের বাঁধন। এখনও ছোটই আছে। দুদিন বাদেই বড় হবে। যদি পাকাপাকি ভাবে দু-জনেরই মনের মধ্যে দুজনের প্রতি আকর্ষণ গভীর ভাবে বাসা বাঁধে? কেমন করে আটকাবেন তিনি? কিম্বা বিজয়েন্দ্র?

কোয়েলের হাব-ভাবে আজকাল প্রায়ই বিরূপতার ভাব ধরা পড়ে। শাসনের সময়ে অথবা উপদেশের সময়ে এমন ভাবে চুপ করে থাকে ও আর ওর সারা শরীর যেন চীৎকার করে বলতে থাকে, 'তুমি শাসন করছ আমাকে কিসের জন্যে? তোমার উপদেশ আর কাজ কি এক? দোষ, অন্যায়, তুমি ভুল করোনি? তাহলে কোন মুখে তুমি উপদেশ দাও?'

মুখে যদি কোন প্রশ্ন করতো তাহলে হয়তো ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে কৃষ্ণা কোয়েলের মনের ভাবনার ঘোলা জলকে স্বচ্ছ করে তুলতে পারতেন। কিন্তু তার চোখে যে অবিশ্বাস দেখেন তিনি। সেটাকে ঘাঁটাতে তাঁর ভয় করে। তাই চুপ করে থাকতে হয়। কোয়েল বড় হয়ে ওঠার পর থেকেই একটা টেনসন সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর মনে। রুদ্রাংশু যদি ঠিকমতো

বাবার ব্যবহার করতো ওর সঙ্গে, যদি রুদ্রাংশুর আদর সহানুভূতি পেতো, হয়তো হোতো না এটা। তো রুদ্রাংশুর জীবনে চাকরি ছাড়া আর কি আছে মূল্যবান?

তাইতো কোয়েল শিঞ্জি এভাবে এসে বিজয়েন্দ্রের আদর কাড়ে। আর কৃষ্ণার মনে হয় বিজয়েন্দ্র যদি এতটাই স্নেহকোমল না হতেন, এতটাই সুবিবেচক, তাহলে হয়তো কোয়েলের মনে তাঁর প্রতি এতখানি বিরুদ্ধতা বাসা বাঁধত না। কৃষ্ণা যে কত সুখে আছেন, বীর-তানি যে কত সুখী, একথাটাই কোয়েলকে ঘা দেয়—কৃষ্ণার মনে হয়।

অথচ উনি এখন আর এ নিয়ে কি করতে পারেন। বিজয়েন্দ্র ওদের যতই কাছে টানার চেষ্টা করেন, কোয়েল সরে সরেই থাকে। যেন বলতে চায় এসব ওদের প্রাপ্য নয়—ওদের প্রাপ্য অবহেলাই শুধু। যেন কৃষ্ণাও আজকাল ওদের কথা ছেড়ে বীর আর তানির কথা নিয়েই মাথা ঘামান শুধু।

একি অন্যায় কথা? উনিতো সকলের কথাই একভাবে ভাবেন। কৃষ্ণা যেমন ওদের রেখে এসেও ছাড়েননি, বীর, তানির মা তেমন করেননি। তাই ওদেরকেও তাঁর দেখতে হয়। ওদের কথা ভাবতে হয়। শুধু কি এই জন্যই? আজ এতদিনে বিজয়েন্দ্রের সন্তানকে নিজের সন্তান ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। কর্তব্য—কৃতজ্ঞতা—মাতৃত্ব এবং নিজের সুখও কি মিলে মিশে যায়নি?

আজ মনের ভয়ে বার কয়েক বলে ফেলেছেন 'বাড়ি যাও বাড়ি যাও।' কোয়েলের মনে গিয়ে সেটা লেগেছে। তাই বলল দেখলেই খালি বাড়ি যাও, বাড়ি যাও করো,' ভাবনা কি শুধু বীরের জন্যেই? কোয়েলও যদি এই সিং পরিবারে জড়িয়ে যায় রুদ্রাংশু কি শোনাতে ছাড়বে মেয়েকে নষ্ট করেছেন কৃষ্ণা? ওর জন্যে আর কিছুই রইলো না? কৃষ্ণার মতন মায়ের মেয়ে আর কি হবে?

এত বয়েস হলো, আরো কত উন্নতি উন্নতি করেই নিজেকে উধাও করে রাখবে রুদ্রাংশু? উন্নতি করতে করতেও কি মেয়েদের একটু নজর রাখা যায় না? কাছে টানা যায় না? কতদিন আর চাকরী করবে? একদিন তো রিটায়ার করতেই-হবে? তখন কি আর বাবার সময় হলো বলেই মেয়েদেরও সময় হবে? একা লাগবে না তখন? মনে হবে না পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই? টাকা আর প্রতিপত্তি দিয়ে তখন কী সুখ তিনি কিনবেন? এসব বিষয়ে জীবনে যে লোকটা কেন মাথা ঘামালো না, ভেবে পান না কৃষ্ণা।

অবশ্য শিঞ্জিটা এই বয়সেই বেশ সেবা-যত্ন করতে শিখেছে। ওয়ার্ক এডুকেশনের ক্লাস করে করে রান্নার দিকেও ঝোঁক হয়েছে। রুদ্রাংশুর দাবী দাওয়া, প্রয়োজন সব দিকেই সমান নজর। কৃষ্ণার ভালো লাগে। রুদ্রাংশুরও বোধ হয় আজকাল একটু বিশেষ মায়া-টায়া হচ্ছে ওর ওপর। প্রায়ই এটা-সেটা এনে দেওয়া।

'সী মা, বাবা এটা এনে দিয়েছে আমাকে। কোয়েলকেও দিয়েছে, তো কোয়েলের পছন্দ নয়। পুওর বাবা। এসব তো ভালো কোরে বোঝে না। তবু নিয়ে নিলেই হয়। ও শুধু আমাকে দিয়ে দেয়। আর বাবা বলে, 'ওর জন্য আর কিছু আনবো না। 'হী ফিল্স্ হার্ট। তুমি একটু কোয়েলকে বলো না মা।'

হাতে করে কিছু জিনিস কিনে আনা, নতুন রুদ্রাংশুর পক্ষে। আনেন যে এই ঢের। তার আবার পছন্দ অপছন্দ। কোয়েলকে বলেছেন : 'যা এনে দিচ্ছেন নিচ্ছো না কেন? কোয়েল? বাবাকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? শিঞ্জিতো খুশি মনে নিচ্ছে?'

কোয়েল মুখ বেঁকায়। 'শিঞ্জি খুশি হবার মতন জিনিস পায়। আমার জন্যে এসব আজেবাজে জিনিস আনতেই বা যায় কেন বাবা? আমি লিস্ট দিয়ে দিই বাবা প্রত্যেকবার হারিয়ে ফেলে।'

কৃষ্ণা রুদ্রাংশুর হয়ে ওকালতি করেন। 'অত কাজের মধ্যে হয়তো ঠিক তাল রাখতে পারেন না। এ নিয়ে এত ফার্স করার কি আছে? তুমি বড্ড হার্ট টু প্লীজ হয়ে যাচ্ছ। খুশি হতে শেখো। যা পাও তাই নিয়ে থ্যাংকফুল হতে শেখো!'

কোয়েল এমন ভাবে তাকায়, অথবা অন্যমনস্কতা দেখিয়ে চুপ করে থাকে, কৃষ্ণা ওর নীরব অথচ সোচ্চার অভিযোগ শুনতে পান। "তাই কি তুমি চলে এসেছিলে মা?"

কিম্বা কেউ যদি প্লীজ করতে চাইতো ঠিকই পারতো। আমার কথা নিয়ে কে আর ভাবে? এই সব কথার জবাব দিতে গিয়ে থৈ হারিয়ে ফেলেন কৃষ্ণা। এই বয়সে একটু আত্মসর্বস্ব অভিমান বাড়ে জানেন। তবু শাসন করা উচিত জেনেও পারেন না। বিজয়েন্দ্র যখন কোথাও যান, অথবা কিছু কিনে আনেন ঠিক একভাবে চারজনের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন এবং রুচি মিলিয়ে। এসব কথা তোলা ভুল। কোয়েল যেন তাঁর বিজয়েন্দ্রকে নিয়ে সুখী হবার ব্যাপারটাতে প্রতিবাদে দোষারোপের আঙুল তুলছে।

বার দুই হাই তুললেন বিজয়েন্দ্র। কৃষ্ণাকে বড় বেশি চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে তাঁর।

'চলো শুয়ে পড়া যাক।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কৃষ্ণা বসেই রইলেন ভালো করে শুনলেনই না বিজয়েন্দ্রের কথা। বিজয়েন্দ্র লক্ষ্য করলেন, চেয়ারের পেছন দিক থেকে ওঁকে দু-হাতে টেনে তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন।

'অনেক সময় নষ্ট করেছ তুমি একটা সামান্য ব্যাপাবে অহেতুক মাথা ঘামিয়ে! আন্‌নেসেসারিলি পানিশিং ইওর সেলফ! ওঠোতো! স্লীপ অন্ ইট্। একটা কিছু উপায় বেরিয়ে যাবে।'

কৃষ্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। 'তোমায় দেখে আমার হিংসা হয় জানো? কেমন দিব্যি নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিতে পারো?'

'ভাবনা নেই একেবারে তা কি করে বলি? তবে তুমি যেন তিল দেখলেই তাল ভেবে বসে থাকো সেটা হয়তো নেই।' বিজয়েন্দ্র হাসির গলায় বললেন।

'নিজের জায়গায় নিজে ঠিক থাকো, দেখবে সবই ঠিকঠাক আছে।'

'আর নিজের জায়গায়! চেষ্টাতো করেই চলেছি এতদিন ধরে। কোয়েলটা বড় হতে না হতেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ও যে কেন এত প্রব্লেম সৃষ্টি করে, ভেবে পাই না, কৃষ্ণার স্বরে ভয়ের আভাস চাপা রইল না।

'তোমার বড্ড ওয়ান ট্র্যাক মাইণ্ড হয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণা অত ভাববার কি আছে? দে'ল গ্রো আউট অভ ইট। এ বয়সে এরকম কতবার হয়। এসব প্রব্লেমও নয় সলভ করারও কোনো দরকার নেই। চলো, শোবে চলো।' বিজয়েন্দ্র একটু ধমক লাগালেন।

দু-জনেই এসে শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করলেন। বিজয়েন্দ্র কৃষ্ণার ভাবনাধরা মনটাকে একটু অন্যভাবে হাল্কা করার চেষ্টা করলেন। একেবারে কাছে টেনে আনলেন বালিশ। বাতি নিবিয়ে শুতে এসে কৃষ্ণা বালিশ খুঁজছেন।

'এখানে এসো', আদরের গলায় বিজয়েন্দ্র ডাকলেন।

কৃষ্ণার আজ এ ঘেঁষা-ঘেঁষি ভালো লাগছে না, 'প্লীজ বিজয়, আমার কিছু ভালো লাগছে না আজ। বীর, আর কোয়েল আমার মনে বড় বেশী ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে আজ। কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ওদের মনের মধ্যে অন্য ধরনের চিন্তা খেলা করছে। হোক ছেলেমানুষ, তবু…।

'বীর আমার ছেলে বলেই, আমাকে শাস্তি দিতে চাইছো তুমি?' 'না—কোয়েল! কোয়েলের জন্য নিজেকে কেমন ছোট ছোট লাগছে। আফটার অল ও বয়সে বড়। ও কেন এসব বুঝবে না? বীরকে এনকারেজ করবে?'

'তুমি ভুলবে কি না এসব কথা?' বিজয়েন্দ্র এবার একটু রেগে গেলেন।

'পারছি না, বিজয় পারছি না' কাতর ভাবে বললেন কৃষ্ণা,

'কেন এত খারাপ লাগছে জানি না।'

'তবে, আমি তোমার কাছে শুধু বীরের বাবা? আর কেউ নই?'

'এই মুহূর্তে তাই তুমি বিজয়। এত ব্রেটেন্ট হওয়ার জন্য ক্ষমা কোরো। কোয়েলকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না। ও আমার সব শান্তি কেড়ে নিচ্ছে।'

'তুমি আর তোমার কমপ্লেকস,' বিজয়েন্দ্র অন্য পাশ ফিরে শুলেন এবার।

কৃষ্ণা নিজের বালিশ সরিয়ে আবার নিজের জায়গায় এনে শুলেন। কি যে তিনি করেন ভেবে পাচ্ছেন না। অহেতুক কিনা জানেন না—ভয় দুর্ভাবনা এবং যন্ত্রণাও সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর মনে। তাঁর সুখের সংসার কি আবার ভাঙবে? বিজয়েন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কও গুলিয়ে উঠবে? কি করেছেন তিনি? কোন অপরাধ? রুদ্রাংশুর সঙ্গে বনিবনা হলো না বলে ওকে ছেড়ে চলে আসাটাই কি এতবড় অপরাধ? কোয়েলকে তো তিনি ছাড়েননি?

আজ তাঁর সুখের দিনগুলিই শুধু কোয়েল দেখতে পাচ্ছে। তাঁর দুঃখ ও যন্ত্রণার দিনগুলির কথা ও কতটুকু জানে? কেন এভাবে তাঁকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ও? বুঝতে পারেন না কৃষ্ণা। আর ভাবতেও পারেন না। শুধু একটা না-জানা আশঙ্কা তাঁকে ঘিরে ধরে। ভাবলেন, পরীক্ষার কথাটা বলেই ওদের আড্ডাটা একটু কমাতে হবে। পরীক্ষার পর বীরকে পাঠিয়ে দেবেন দিল্লীতে, তার জ্যাঠার কাছে। মাস দু মাস সময়—এই বয়সে যথেষ্ট হবে। নিজেকে জোর করে আশ্বাস দিলেন তিনি।

মন খারাপ নিয়ে ঘুমোলেন। উঠলেন শরীর খারাপ নিয়ে। মাথাটা কেন আবার এত ঘুরছে কে জানে? দাঁত মাজার সময় হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বেসিনের ধারটা

ধরে ফেলে সামলালেন নিজেকে। বিজয় ঠিকই বলে বড্ড বেশি ভাবা অভ্যাস তাঁর। ওয়ান ট্র্যাক্ মাইণ্ড।

শরীরের আলস্য যাচ্ছে না। আরও অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারলে ভালো হতো। হাই উঠছে সারা শরীর ভেঙে ভেঙে। দ্রুতহাতে রান্নার বাকীটুকু সারলেন ওদের ব্রেকফাষ্ট টেবিলে রেখে স্নান সারতে গেলেন। তাঁর আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। ব্লাড সুগার কাউণ্ট করাবেন? তাঁর কি ডায়াবেটিস হলো? নাকি প্রেসার? দেখিয়ে নিতে হবে।

বিজয়েন্দ্রকে এ নিয়ে আর কিছু বললেন না। বললেই শুনতে হবে 'এত ইনটেন্‌স্ হলে চলে না। এতেই টেনশনের সৃষ্টি হয়। ফিজিক্যাল ওভার ওয়ার্কিং এর চেয়ে মেণ্টাল ওভার ওয়ার্কিং হার্মফুল বেশি।' বিজয়েন্দ্রের ধারণা—কৃষ্ণা রিল্যাক্স করতে জানেন না। যোগ ব্যায়াম শুরু করেও ছেড়ে দিয়েছেন, সময়ই নাকি পান না।

ছেলেমেয়েরা আগের নিয়মেই চলা-ফেরা করে। বীরের পরীক্ষা নাকের ডগায়, কোয়েল একটু হয়তো আড্ডা কমিয়েছে। এ নিয়ে আর বেশি ভাবতেও পারেন না কৃষ্ণা ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তা তবু নিশ্চয়ই খেলা করে। নইলে আজকাল এত দুর্বল লাগে কেন আজকাল? প্রেশার-ট্রেসার কিছুই দেখানো হয়নি আজও। অফিস থেকে ফেরার পথে আবার ডাক্তারের চেম্বার হয়ে আসার কথা ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। কোনোমতে বাড়ি ফিরতে পারলেই বাঁচেন।

মনের সঙ্গে শরীরের যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাই ভাবেন। একটা খারাপ হলেই আরেকটা খারাপ। ভালো লাগে না তাঁর। কোনোটাই যেন ঠিক হতে চায় না। কিছুদিন ধরে অন্য দুশ্চিন্তাও দেখা দিচ্ছে, শারীরিক অঘটন কিছু। এই বিয়াল্লিশেই যা আসা উচিত নয়। বীরের পরীক্ষা শেষ হোক যা করার করা যাবে।

দেখতে দেখতে দিন যাচ্ছে। অন্য ভয়ও মনে উঁকি মারছে। কে জানে বাবা আজকাল কোথা দিয়ে কি এসে বাধা বাঁধে অগোচরে শরীরের ভেতরে। বীরের পরীক্ষা শেষ হবার আর অপেক্ষা করলেন না। গাইনির কাছে চলেই গেলেন একদিন। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দুপুরের দিকেই গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

ছেলেমেয়েদের বিকেলে নিজেদেরই চা-টা করে খেয়ে নিতে বললেন। শিঞ্জি, কোয়েলও আছে। তানিতে আর ওরা সকলে মিলে অনেক কিছু করল। রাত্রের খাবারও রাঁধল। উনি ঘুমিয়েই রইলেন। কখন কোয়েল, শিঞ্জি চলে গেল টেরই পেলেন না। অনেক দিনের ক্লান্তির ঘুম যেন একদিনেই ঘুমোবেন।

বিজয়েন্দ্র আসেন সাতটারও পরে। এসে কৃষ্ণাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখলেন। এই অসময়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। আলগোছে কপাল ও গাল পরীক্ষা করে দেখলেন জ্বর-টর নয়। চোখে মুখে কালি পড়েছিল. অতএব অত্যধিক মানসিক চাপ ও ক্লান্তিই হবে ধরে নিলেন। বলে কিছুতো লাভ নেই? তাই বলা বৃথা!

চুপচাপ আওয়াজ না করে ছেলেমেয়েদের খেয়ে নিতে বললেন। তিনি নিজে স্নান সেরে একগ্লাস ঘোলের সরবত খেয়ে বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে লাগলেন। মনের

মধ্যে হাজারো চিন্তা সবায়েরই থাকে। ব্যবসার চিন্তা তো আছেই। আজ প্রমীলার চিঠি এসেছে। অফিসের ঠিকানায়। নৈর্ব্যক্তিক চিঠি। বীরের হায়ার সেকেণ্ডারী হয়ে গেলে আর তানির গরমের ছুটি হলে, যেন তাদের একবার পাঠানো হয় আজমীড়ে। ওদের দেখতে প্রমীলার মন খুব ব্যাকুল হয়েছে।

কথাটা আজই তুলবেন ভেবেছিলেন। থাক্, কালই তুলবেন। বড় হওয়ার পরে এদেরকে দেখার জন্যে ও তরফে ব্যাকুলতা খুব বেশি দেখা যায়নি। পাঠাবার অনুরোধও আসেনি অনেককাল। এতদিন পরে একথা শুনে কৃষ্ণা আবার কিছুটা উদ্বিগ্ন হবেনই। প্রমীলার এতকালের ব্যাকুলতার অভাব, কৃষ্ণা নিজের আকুলতা দিয়ে পূরণ করেছিলেন, ওরাও মিশে গেছে। মিলে গেছে। এখন আবার আজমীড় থেকে ঘুরে এলে পরে ওদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসতে পারে কিনা, এই নিয়েই কৃষ্ণা ভাবতে বসে যাবেন ঠিক।

কৃষ্ণা বড় অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। যদিও দেখাতে চান না। একদিন জীবনটা ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়ায়, কৃষ্ণা প্রায় ভেঙেই পড়েছিলেন। সে সময়েই বিজয়েন্দ্র তাঁকে দেখেন। তিনি নিজেও বিপন্ন ছিলেন তখন। কোথা থেকে কি হয়ে গেল, হয়ে গেল যোগাযোগ। দু-জনেরই ভাঙা মন আবার জুড়লো। বিজয়েন্দ্রর ভাঙা সংসার আবার গড়ে উঠলো নতুন ভাবে। কৃষ্ণার ভাঙা সংসারের খানিকটা এনে জুড়ে দিলেন এরই মধ্যে। একটা নতুন অবয়ব নিলো তাঁর পরিবার। চারদিক দিয়ে সব কিছু ভরে উঠল।

কৃষ্ণা তাঁর জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। কোয়েল, শিঞ্জি সহায়তা না করলে—বীর আর তানির পক্ষেও হয়তো এত সহজেই ওঁকে মেনে নেওয়া সহজ হতো না। সকলের প্রতিই তাই বিজয়েন্দ্র ঋণী বোধ করেন। কৃষ্ণার বেশি ভাবার অভ্যেস। সংস্কারও আছে কিছু। বাঙালী মেয়েদের এত কাছে থেকে দেখেননি বিজয়েন্দ্র। তবু মনে হয় এটা কৃষ্ণার ব্যক্তিগত স্বভাব।

নতুনভাবে বাঁচতে গেলেও পুরোনকে অত সহজে ভুলতে পারে না ঠিকই। তেমনি জীবনের আকর্ষণে জীবনকে যাঁরা আঁকড়ে ধরে, অতীতকে অতখানিই স্বীকৃতি দেওয়া তাদের উচিত নয়। এই উপলব্ধিতে কৃষ্ণা আজও পৌঁছতে পারেননি। তাই রুদ্রাংশু তাঁকে এখনও মনের মধ্যে জ্বালান, একটা অপরাধবোধ সৃষ্টি করেন। মনের মধ্যে অনবরত সওয়াল জবাব চালিয়ে যান কৃষ্ণা। ছেলেমেয়ে নিয়েও ভাবনার অন্ত নেই, আজকের ছেলেমেয়েরা কি অত সংক্রামক-জীবাণু বর্জিত দুনিয়াতে এসেছে না, বাড়ছে? ওদের ত এরই মধ্য থেকে আক্রমণ প্রতিরোধক শক্তি গড়ে নিতে হবে। কৃষ্ণা বড় বেশি চান সকলের জন্যে।

'আমায় ডাকলে না?' কৃষ্ণা কখন উঠে বারান্দায় সিগারেটের গন্ধ পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘুমে ভারী গলার আওয়াজ। 'ওরা খেয়েছে? তুমি? আজ যে কি হয়ে গেল আমি আর কিছুতেই নিজেকে জাগিয়ে রাখতে পারলাম না।' নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে এসে বসলেন।

'তোমার ওটা দরকার ছিল। কথা তো শোনো না, কেবলই ওভার ওয়ার্ক করো। সকলের বেলায় শাসন। নিজে কার কথা শোনো?' বিজয়েন্দ্র অনুযোগ করলেন।

কৃষ্ণা চুপ করে রইলেন।

'ক্লান্তি গেল?'

আবার প্রশ্ন করলেন বিজয়েন্দ্র।

'রিপ-ভ্যানের মত কয়েক বছর ঘুমোতে পারতাম বোধহয়, কিন্তু তুমি এসে বসে আছ, একা একা চুপচাপ, কে যেন ঘুমের ভেতর থেকেও ঠেলতে লাগলো', একটা উদ্‌গত হাইকে চাপা দিতে দিতে কৃষ্ণা বললেন।

'ঘুমোলে না কেন আরো? একদিন একা থাকলে কেঁদে ভাসাবো এমন ভাবার কারণ কি?'

'আজ ঝগড়া করবো।'

'কিসের ঝগড়া? রেষ্ট নেওয়া ছেড়ে ঝগড়া কেন?'

'রেষ্টের কারণের জন্যই ঝগড়া, ইউ হ্যাভ বীন ভেরি নটি বিজয়।'

বিজয়েন্দ্র অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, কৃষ্ণা আবার বললেন, 'ইটস সো সিলি! এর চেয়ে অনেক বেশি বিবেচনা আশা করেছিলাম তোমার কাছে। এই বুড়ো বয়সে এসব কি?'

'কি হল কি?' 'তুমি ঘুমিয়ে না জেগে?' বিজয়েন্দ্র ভীষণ বেশি অবাক হচ্ছেন।

'এত বড় বড় ছেলেমেয়ে, ওদের কাছে মুখ দেখাই কি করে? আমাদের মধ্যে একটা ট্যাসিট আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিল না পঞ্চম কেউ আসবে না? এতদিন চলে গেল··· আজ এই বয়সে, ডক্টর ব্যানার্জির চেম্বারে আজ আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।'

বিজয়েন্দ্র চমকে উঠলেন : 'কি বলছো? ডক্টর ব্যানার্জির চেম্বারে তুমি গেলে কেন? আমায় তো কিছু বলোনি?'

'বলবো আবার কি? আমি কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছি? এদিকে কত কত মাথামুণ্ডু টিউমার ফিউমার ভেবে চলেছি, আসল খবরটা জেনে এখন আরো বেশি ভয় পাচ্ছি।'

আনন্দ না অবসাদ? সুখ না অনুশোচনা? যাতেই হোক্ কৃষ্ণার গলার আওয়াজ কেমন মাতাল মাতাল লাগছে বিজয়েন্দ্রের। আস্তে আস্তে তাঁর মনের মধ্যেও খবরটা একটা নতুন অনুভতি ছড়াচ্ছে। মন্দ কি? পঁয়তাল্লিশ আর বিয়াল্লিশ এমন কি বুড়ো? অবশ্য এ বয়সে, আর এই দুর্দিনে ঝক্কিটা অনেক বেশি হবে। তা হোক্। কৃষ্ণার একটু বিশ্রামও হবে। হওয়া উচিত। আনন্দের আবেগে হঠাৎ ডাকলেন : 'কৃষ্ণা; কংগ্রা···।'

'না—আমার খুব খারাপ লাগছে,'

'কেন?' চাপা গলায় জানতে চাইলেন বিজয়েন্দ্র।

'বারে বলছি না, ছেলেমেয়েদের সামনে মুখ দেখাবো কি করে?' কৃষ্ণা একটু অধীর গলায় বললেন।

'একদিন আমরা ওদের কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কথাও ভাবতে পেরেছিলাম, আজ কি গণ্ডগোল হলো?'

'তখনো তো ওদের কথা ভেবেই আর কাউকে আসতে দেবার দরকার বোধ করিনি। আজও ত সেই একই কারণ, খালি ধরনটা অন্যরকম হয়ে গেছে।'

বিজয়েন্দ্র চুপ করে রইলেন

কৃষ্ণা বললেন, 'একটা বিশ্রী ব্যাপার দাঁড়াবে, তাড়াতাড়ি কিছু করিয়ে নিতে হবে।'

বিজয়েন্দ্র তবুও চুপ করেই রইলেন।

কৃষ্ণা অন্ধকারে ভুরু কুঁচকে ওঁর দিকে তাকালেন : 'কিছু বলছো না যে? ব্যাপারটা কি তোমার?'

'ব্যাপার কিছুই না। ভাবছিলাম মন্দ কি? কি এমন বুড়ো হয়েছি আমরা?' বিজয়েন্দ্র সন্তর্পণে কথাগুলি বললেন।

কৃষ্ণা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'তুমি জানো তুমি যদি মন্দ নয় বলো, আমার কাছে সেটা ভালো লাগতে বাধ্য।'

'কোথায় আর লাগছে?' বিজয়েন্দ্র একটু অভিমান ফোটালেন।

'কি আশ্চর্য! তুমি কি পাগল হলে? সত্যি করে বলো। আমার মাথা টাথা খারাপ হবার জোগাড়। কাল থেকে কারো মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবো না। ডক্টর ব্যানার্জিকে প্রায় বলেই এসেছি একরকম। শুধু তোমার মতামতের অপেক্ষা।'

'খালি লজ্জার দিকটাই ভাবছ! আনন্দ একটুও নেই? আমার যে বেশ ভালো লাগছে?'

কৃষ্ণা বলতে যাচ্ছিলেন ; 'অফিসে আমি মুখ দেখাই কি করে? সময় মতন ছুটির দরখাস্তই বা দিই কি করে? ভাল লাগে না,' মনের মধ্যেই কাঁদো কাঁদো স্বর চাপা রইল, ঈশ কি বিশ্রী, কোয়েল, বীর ওদের সামনে বেরোবেন কি করে? কোয়েল যা চীজ,—কিছু ঠারে ঠোরে বলেই যে বসবে না তার কিছু ঠিক নেই। বাইরের লোকের উপহাস তো আছেই।

বিজয়েন্দ্র এবার আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো? ঠিক করে ফেলেছ একেবারে? ভেবে দেখো এতে হয়তো বীর, আর কোয়েল একটু এক হয়ে যাবে তোমার কাছে। ওদের কাছেও। তাছাড়া ওদের কথাই বা সবসময় ভাববে কেন।'

'বুঝেছি, কৃষ্ণা হতাশ সুরে বললেন, 'ওদের এসব জানতে বয়েই গেছে। তাছাড়া ওরা হয়তো আর আগের মতন নেইও,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'এই এতকাল পরে এইসব ঝামেলা কেন আবার?' আফশোষ করলেন কিন্তু খুব জোরের সঙ্গে নয়, লজ্জা যা পাবার তা পেতেই হবে। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলো। থাক। কৃষ্ণা এখনই আর কিছু ভাবতে পারছেন না।

জুনিয়ার চ্যাটার্জি আর সিং মহলে কনফারেন্স বসলো দুটো আলাদা আলাদা। শিঞ্জি আর তানি কিছুতেই একজন একজনের দিকে তাকায় না, তারপর হাসিতে ভেঙে পড়ল। মুখ লাল এবং একটু পরেই জামা কাপড় সেলাই-ফোঁড়াই কে কি করবে, সেই নিয়ে জল্পনা শুরু হলো। স্কুলে শেখা এমব্রয়ডারি, ক্রোশে নিটিং সোয়িং-এ হাত পাকানো যাবে।

আপার হাউসের অবস্থা একটু অন্যরকম। কটা মুগ্ধ এবং আত্মম্ভরি দিন এখন ওদের জীবনে প্রায় ইতিহাস। তাছাড়া কোয়েল বেচারার দোষও ছিল না, সে বীরের মুগ্ধতা একটু উপভোগ করছিল মাত্র। অবশ্য বিনা খেঁকানিতে নয়। তারই যে শাস্তি এটা, এ বিষয়ে ওঁদের অন্তত কোয়েলের মনে কোনো সন্দেহ নেই। অবস্থাটা তাই ওরই বেশি খারাপ।

'আ—ওয়েল,' বলে বীরের বিছানায় দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে এদিকে পা লম্বা করে সে এলিয়ে পড়লো। বীর একটু দূরে চেয়ারে। কোয়েল আবার বলল, 'সাচ ইমমেচিওর পেরেণ্টস! ওয়ান ডাজ্‌ন্‌ট্ নো হাও টু ফেস ফ্রেণ্ডস এণ্ড সোসাইটি', 'ইয়া! ক্রাশিং বোরস্।' বীরও হতাশ ভাবে জানালো 'গিভ মি এ ফ্যাগ'। কোয়েল অলস ভাবে হাত বাড়ালো। বীর তাড়াতাড়ি দুটো সিগারেট বের করে ধরিয়ে একটা ওকে দিলো, একটা নিজে নিলো। ওরা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। রাজু, শুধু! স্বাধীন!

'সাচ লুনেসি, উঃ' কোয়েল কাঁদো কাঁদো সুরে বলল। তোমার মতন ম্যাথস সর্ব্বস্ব মোরোন একটা এখন আমার হাফ না কোয়ার্টার ভাই হবে। যাকে আত্মীয় ভাবতেই আমার মাথা কাটা যায়, উঃ ভাবা যায় না।' পা নাড়তে লাগলো সে অস্থির ভাবে।

'ভাই-ই যে হবে, আর হলেও ম্যাথসে ষ্ট্রং হবে তাইই বা ধরে নিচ্ছো কেন?' বীর সান্ত্বনা জোগাতে চাইলো।

'ওর কথা হচ্ছে না, তোমার কথাই হচ্ছে,' কোয়েল বীরের দিকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে চেয়ে বললো।

'ও ইয়া আই ওঅজন্‌ট্ ক্রেভিং ফর এ ডাম্ব সিসটার লাইক ইউ ঈদার, অ্যাজ ইট ইজ অ্যায়াম মিজারেবল এনাফ,' বীর সমান ঘৃণার সঙ্গে জবাব দিল।

কি নিয়ে মিটিং বসেছিল ভুলে গেছে, এখন ওরা ইউ. এন. ও.-তে এ্যারাব আর ইজ্রেইল। কোয়েল কায়দা করে—তর্জনীর টোকায় সিগারেটের ছাই ঝাড়লো বীরের ঘরের মেঝেতে। 'এই আমার মা'। মার জন্যই ছোটবেলা থেকে একটা মেন্টালি হ্যাণ্ডিক্যাপড্ ড্রুলিং মোরোনের সঙ্গে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠতে হয়েছে, হোয়াই কুড্‌ন্‌ট শী ফাইণ্ড্ হাজব্যাণ্ড উইথ এ নরম্যাল চাইল্ড? ডিসগাসটিং। ভাবতে পারছি না আর।

'আমিও না।' বীরও বিগত নবছরের অসহায়তা বোঝাবার চেষ্টা করলো। 'সেই জন্যই ভাবছি দিল্লীতে গিয়ে পড়বো। বাড়িতে যখনই থাকো কতগুলি ষ্টুপিড মেয়ে বসে আছে। ইন্‌সাফারেবল্।'

কোয়েল মিষ্টি সুরে বললো, 'প্লীজ ডু—কোনও লোক সুইসাইড করবে না হার্ট ব্রোকেন্ হয়ে। বরং কলকাতা একটা ড়ারমিনের কণ্টামিনেশনের হাত থেকে বাঁচবে। ডিউটি বাউণ্ড হয়ে থাকতে হবে না আমায়। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ইচ্ছা মতন দিন কাটাতে পারবো। মাইনাস—এ হ্যাগার অন্।'

'বীরবাহু সিং-এর দৌলতে ইনটারেষ্টিং ব্রেইনী বন্ধু জুটছিল, এখন মনোজিত সিং-এর মতন অ্যালকোহলিকস জুটবে। হু উইল লুক এ্যাট ইউ? আগলি ডাকলিং?'

কোয়েল ভীষণ অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করলো 'ও ইয়া?' তারপর প্রতিবাদের সুরে বললো, 'হি ইজ্‌নট অ্যালকোহলিক্। বীয়ারে অ্যালকোহল থাকেই না।'

'হ্যাঁ থাকে। তুমি কিছু জানো? ডাম্ব সিসি।' বীর জবাব দিল, তারপর বললো, 'একসময় পৃথিবীকে মনোজিৎ শূন্য করার জন্য পকেটে আর্সেনিক নিয়ে ঘুরতাম। ওর বীয়ারে ঢালার ইচ্ছে ছিল। তারপরে ভাবলাম হোয়াট দ্য হেল? হোয়াই শুড্ আই বী

বদারড্? ইউ ডিজার্ব হিম', জীনসের পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করলো বীর।

'ওটা কি বস্তু?' কোয়েল জানতে চাইলো। ওর মুখে বা গলায় কোনো উদ্বেগের ছাপ নেই। 'আসের্নিক'। 'দেখি' 'উঁহু'—মেয়েদের এসব ডেঞ্জারাস জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।' বীর আবার ওটা পকেটে ঢোকালো। আমিও রাখতাম এক সময়ে?' কোয়েল উদাসীন ভাবে বললো। 'ভাবতে ভালো লাগতো আমার কাছে পয়জন আছে। ইচ্ছে করলেই মারতেও পারি মরতেও পারি।' পনের বছরের রোম্যান্টিক চেহারাটা উঁকি দিল ওর চোখে মুখে।

'কোডিমিয়া, ক্লিওপ্যাট্রা! হুঁ' বীর মুখ বেকিয়ে হাসলো।

'আমি তো রাখতাম পনের বছর বয়সে, তুমি কি? সতেরো বছরের ছেলে হয়েও রাখছ?'

'তিন বছর আগে যোগাড় করেছিলাম ষ্টুপিড মেয়েদের মারবার জন্যে'।

'তোমার এই জীনসটা যে তিন বছর ধরে ধোওয়া হয় না—সেটা না বললেও বোঝা যায়।'

'ইউ ষ্টিংক!' নাক কুচকালো কোয়েল। 'হা হা। কাচতে দেবার আগে যেন পকেটের জিনিসগুলি অন্যটাতে ঢোকানো হয় না! তুমি গেলে পরে রোজ আমার ঘর ফিউমিগেট করতে হয়।' বীর জবাব দিল।

কোয়েল খাট থেকে নামলো। আস্তে, বীরের ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় বলে গেলো—'হোপ দ্যাটস রিয়েল আর্সেনিক। বাই কার্বোনেট অভ সোডা নয়। যাই হোক খেয়ে ফেল। আইদার ড্রপ ডেড্ নয়তো নিজের ভেতরটাকেও ফিউমিগেট করে ফেল, পোলিউশন অনেক কমবে।'

'ইয়া টেক ইট্। বীর মোড়কটা আবার বের করে ওর পিঠে ছুঁড়ে মারলো।

কি কারণে জানে না কোয়েল বুক ঠেলে ওর কান্না এল হঠাৎ। কাউকে না বলেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলো। মনে মনে বললো—'এ বাড়ির সবাই আর্সেনিক খেয়ে মরে না কেন?' প্রায় ছুটে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছাল সে। মা কেন নিজেকে এতবার টুকরো করছে? যতসব বাজে ছুতো?

বীর তানি দিল্লী যাবে। সেখান থেকে আজমীড়। কদিন ওদের গোছগাছ এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কোয়েল যে আর আসছে না বুঝতে পারেননি কৃষ্ণা। বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ বুঝতে পারলেন শিঞ্জি যদি বা রোজ একবার করে ওর সঙ্গে দেখা করে যায়--কোয়েল আর আসেই না। প্রথম ভাবলেন বীর নেই এখানে, ওর সঙ্গেই তো ওর ভাব আর ঝগড়া—তাই আসছে না।

শিঞ্জিকে জিজ্ঞেস করলেন, শিঞ্জি বললো কোয়েল আজকাল বাবার সঙ্গে আড্ডা মারে সন্ধেবেলা। বাবা বাড়িতে না থাকলে বাড়িতেই থাকে না। 'কোথায় যায়?' কৃষ্ণা জানতে

চাইলেন, 'কি জানি', শিঞ্জি ঠোঁট উল্টোলো, 'বন্ধু টন্ধু ক্লাব। বাবা তো ওকে এবার একটা খুব সুন্দর সুইমসুট্ এনে দিয়েছে, ক্লাবের পুলে খালি সুইম করে বন্ধুদের সঙ্গে।'

'আসতে বোলো তো? অনেকদিন দেখি না ওকে,' বাবার সঙ্গে আড্ডা মারে আজকাল কোয়েল। মনে মনে ভাবলেন। যাক্ তবু সুমতি হয়েছে দুজনেরই। ওরা সকলে নিজেদের কাছাকাছি থাকলে, তাঁরও মনে শান্তি। একটু অভিমান হোলো না তা নয়। তবে কোয়েল বড্ড মুডি, কখন ওর মাথায় খেয়াল চাপে আর কখন নামে কেউ বলতে পারে না। বড় হচ্ছে বাবার কাছাকাছি তো আসাই উচিত।

খবর পেয়েও কোয়েল আসে না। মাঝে মাঝে বড্ড ছটফট করেন কৃষ্ণা, বিজয়েন্দ্রও লক্ষ্য করেন। 'কোয়েলকে আর দেখি না? আসে না ও?' কৃষ্ণা চুপ করে থাকেন। 'বীরবাহু নেই বলে?' বিজয়েন্দ্র একটু সন্ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞেস করেন। 'কি জানি!' উদাস জবাব দেন কৃষ্ণা। 'শুনছি বাবার সঙ্গে আড্ডা মারে আজকাল। ওর বাবার ভাগ্য খুললো না ওর বুঝতে পারছি না।'

'সেতো ভালো কথা! এ্যাডাল্ট হচ্ছে এ্যাডাল্ট কম্পেনীই তো ভালো লাগা উচিত।' বিজয়েন্দ্র একটু আজমীড়ের চিত্রটাও মনে মনে দেখে নেবার চেষ্টা করলেন, বীরবাহু আবার কি রকম হয়ে ফেরে কে জানে? কৃষ্ণা না জেনেই এই একই কথা মুখ দিয়ে বার করলেন—'বীর আবার কতখানি বদলে আসবে কে জানে! তানিটাও।' কথার সুরে যথেষ্ট অভিমান মিশলো তাঁর। বিজয়েন্দ্র মিথ্যে আশ্বাস না জেনে শুনে আর দেওয়ার প্রয়োজন মনে না করে চুপ করে রইলেন।

'তুমি এত অবুঝ হলে! আমার মনে হচ্ছে এই জন্যই ওরা এভাবে দূর হয়ে যাচ্ছে,' কৃষ্ণা উদ্বেগ প্রকাশ করে ফেললেন। 'এ নিয়ে বীরের মাথাব্যথা হবে বলে মনে করি না, কোয়েলের কথা বলতে পারি না। তাছাড়া ওরা বড় হচ্ছে কতদিন আর তোমার আমার কাছাকাছি থাকবে?' বিজয়েন্দ্র সামান্য সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'কি জানি ওরা কেমন হয়ে ফিরবে। আর কোয়েলকে ডেকে পাঠাচ্ছি আসার নাম নেই। এই এত কাছে কাছে রেখে বড় করলাম, এখন বড় হতেই মা পর হয়ে গেল। ওকে নিয়ে আর পারি না আমি।'

কলেজ ছুটির এতগুলি দিন, কোয়েল একবারও মার কথা মনে করলো না? কৃষ্ণার অভিমান বাড়ছে। কি এমন অন্যায় করেছেন তিনি? এটুকু বোঝবারও কি বয়স হয়নি কোয়েলের? ওর মুখ চেয়ে চেয়ে কত আর দিন কাটান তিনি? মুখই বা দেখেন কোথায়? এত কাছে তবু একবার এসে মার খবর নেবার সময় হয় না তার? বিজয়েন্দ্রের ওপর রাগ হয় তাঁর এখন। কি দরকার ছিল এসবের?

বাড়িতে কোয়েল খুব সুন্দর ভাবে নাকি রুদ্রাংশুর পার্টির বন্দোবস্ত করছে, রুদ্রাংশুও ওর অসংখ্য বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়ান দাওয়ানর অনুমতি খুশীর সঙ্গেই দিচ্ছেন, এসব খবর শিঞ্জির কাছে পান। ভাবেন কোথায় ছিলেন এতদিন রুদ্রাংশু? কতটুকু খোঁজ-খবর রেখেছিলেন মেয়েদের? আর আজ যেই বড় হল অমনি উনি পর। কোয়েলের একবারও মনে পড়ে না মার কথা।

এ সময় মন প্রফুল্ল রাখতে হয়, আর প্রফুল্ল! ছেলেমেয়েরা চারিদিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে, তিনি চেয়ে চেয়ে দেখছেন। বৃথাই তিনি এতকাল এত চেষ্টা করেছেন—ওদের মন বোঝবার জন্যে। এই পঞ্চম ওদের আরও ছোটবেলায় এলে নিশ্চয়ই ওরা এরকম ব্যবহার করতো না। কৃষ্ণা আফশোষ আর অনুশোচনায় জ্বলছেন পুড়ছেন খালি। এখন তো বড্ড দেরী হয়ে গেছে, অথচ ভাবতেও ভয় করছে আবার নতুন করে আরেকটি মুখ আসবে, যার মুখের দিকে চেয়েই হয়তো বাকী জীবন কাটাতে হবে। কেন উনি বিজয়েন্দ্রর কথা মেনে নিলেন এভাবে?

বীর তানি ফিরে এলো, আবার কটা আড়ষ্ট দিন। আস্তে আস্তে ওরা নিজেদের জায়গায় ঠিক হয়ে এঁটে গেল। কিন্তু গেল কি? বীর বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে, বড়ও হয়েছে। বাড়িতে বেশি থাকেই না। কলেজে ভর্তি হবে। সেই ভাবেই নিজেকে তৈরী করছে। কোয়েলের দেখা এখনও নেই, বীরও নাকি ওর পাত্তা পায় না আজকাল। কৃষ্ণা আর ভাবতে চান না ওর কথা, থাকুক কোয়েল এখন রুদ্রাংশুরই মেয়ে হয়ে, দেখা হলে উনি এসব কথা তুলবেনই না।

যথাসময়ে নার্সিং হোম। শিঞ্জি তানি গিয়ে দেখে এসেছে। কোয়েল আর বীর একই সন্ধ্যায় গেল। নার্সারির দিকেই সোজা এগিয়ে গেল জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করে।

নার্সারির কাঁচের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা আরো কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখছেন বেবি। মুখে অনির্বচনীয় ভাব, কি করে যে চেনে ওরা! কোয়েল আর বীর ভাবলো, ওরা তো বুঝতেই পারছে না এই দশ এগারোটি কটে শোয়া বেবির কোনটা ওদের। নার্সকে ডেকে বলায় জানতে পারলো। কোয়েল খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলো। তারপর অদ্ভুত চেহারা করে, যেন নিজেকেই বললো—'ইজনট হি কিউট্? এই এ্যাণ্ডোটুকু বে—চারা। সো ডিফেন্সলেস্!"

বীর একটু এগিয়ে এল ওর কাছে। ভাইকে দেখতে দেখতে ওর মুখে চিন্তার ছায়া পড়ছে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'এ রকম বাঁদরের মতন দেখতে কেন ও?' কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে আগের মতন আক্রমণ করলো। 'উঃ বীর ফর ওয়ান্স্ ষ্টপ জ্যামপ্যারিং ইওর ইগো, লুক এ্যাট দ্যা বেবি, নট এ্যাট দ গ্লাস!'

'ও—ও! বুঝতে পারছি।' ও ঠিক তোমার মতন দেখতে হয়েছে। তাই কিউট! একশো বছরের বুড়োর মতন কোঁচকানো মুখ। লাল টকটকে, বড় হয়ে এ্যালকোহলিক না হয়ে যায় না।' কোয়েল চাপা ঘৃণায় স্বর শান্ত করে বলল—'বেচারা! সব দেখে শুনে লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে।' বলেই চলে এলো ওখান থেকে। তারপর বাইরে এবং পরে নিজেদের বাড়িতে।

পরের দিন সকাল এগারোটায় এলো আবার। এসময়ে অন্য কারো থাকার সম্ভাবনা নেই জেনে। বেবিকে দেখতে পেলো না। সন্ধেবেলা ছাড়া নাকি দেখানো হয় না। মন খারাপ হয়ে গেলো। কেউ ওর দিকটা একটু ভাবে না। কৃষ্ণাকেই একটু দেখে যাবে কিনা ভাবলো চুপ করে। তারপর ভাবলো একটু দেখা করাই যাক।

কৃষ্ণা উঠে বসেছিলেন চেয়ারে একাই। টুক-টুক করে নক করে কোয়েল ঢুকলো ঘরে। ঢুকতেই চোখাচোখি কৃষ্ণা আকস্মিকতায় জড়সড়। 'কেমন আছ?' বলে কোয়েল তাঁর বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে পাশের টেবিলের জিনিস দেখতে লাগলো। কৃষ্ণা বললেন—'ভালো, তোমার কি খবর? দেখা টেখা নেই?'

'অনেক কাজ এখন! তারপর সিলেক্‌শনস্‌, অবশ্য পড়ার সময় বিশেষ নেই।' কৃষ্ণা ওর মুখ লক্ষ্য করছেন। রীতিমত শান্ত এবং আত্মস্থ, 'কি এত কাজ তোমার? আমি তো ভাবছিলাম বৃজকে তোমার হাতেই দেব। তুমিই ওকে দেখবে, আমার তো অফিস।' কৃষ্ণা জলপাইয়ের ডাল বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন। কোয়েল একবার তাকালো তাঁর দিকে। 'না আমার সময় হবে না। আমি এখন বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজও করছি।'

কৃষ্ণা চুপ। কোয়েলও চুপ করে আছে। খানিকক্ষণ এভাবে থাকার পর একটু ছটফট করে উঠলো ও। 'আমি এখন যাই? তুমি ভালো থেকো।' দরজার দিকে গিয়েও একটুক্ষণ দাঁড়ালো ও। 'অ্যায়াম রিয়েলি সরি মা। বাট্‌ বাবা নীড্‌স্‌ মাই হেল্প মোর। 'চলে গেল কোয়েল কৃষ্ণার ঘর ছেড়ে। কৃষ্ণা সম্মোহিতের মতন বসে রইলেন।

এবারে প্রায় নার্সদের হাতে পায়ে ধরে মুখে গজ কাপড়ের পট্টি বেঁধে, কোয়েল ভাইকে একটু দেখবার অনুমতি পেলো। কোলে তুলে নিল। আঃ কি মিষ্টি গন্ধ। অনবদ্য অনুভূতি এবং তার সঙ্গে অদম্য কান্না। কোনো মতে কান্না চেপে, বৃজের গালে গাল ঠেকালো। 'হাই বৃজি বয়? সরি বৃজি বয়! তোমার আমার পুরো ভাই হয়ে জন্মানো উচিত ছিল। আর্ধেকটা নয়।' নামিয়ে দিল আবার ওকে সাবধানে। 'বা-ই—বৃজি বয়। বী গুড।' আর থাকতে পারলো না। চলে গেল তাড়াতাড়ি নার্সারি ছেড়ে। তারপর গাড়ি এবং নিজেদের বাড়ি।

পুতলির তক্তি

এষা দে

"তোমার নাম কী খুকুমণি?"

"আমাকে খুকুমণি বলছ কেন? আমার নাম তো পুতলি। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম নেই।"

"তবে কী বলে তোমায় আমি ডাকব?"

"বেশ তো তুমিই না হয় একটা নাম দাও।"

"আচ্ছা। তুমি...তুমি...তুমি হলে নামনেইদা।"

"হাঃ হাঃ হাঃ"

এ বাড়ির জানালার আলসেতে বসে পুতলি দেখে ওদিকের বাড়ির জানালার ধারে একটি বিছানা। খানদুই বালিশ উঁচু করে হেলান দেওয়া ফর্সা এক মুখ, লম্বা ধাঁচের, চোখা নাক চিবুক, পাতলা ঠোঁট—অনেকটা পুতলির মামু আর দাদুর মত। তবে এর কপাল অনেক চওড়া। আর বড় বড় চোখের দুধারে ঘন কালি। যেন মায়ের বাক্সবন্দি না-মাজা তামার পুজোর বাসন।

"তা পুতলি, তুমি দুপুর বেলা একলাটি জানলায় বসে কেন? ইস্কুল ছুটি বুঝি?"

"আমি তো স্কুলেই যাই না।"

"সে কি! কেন?"

"একটা ইস্কুলে মা ভর্তি করে দিয়েছিল। সকাল সাড়ে সাতটায় বাস নিয়ে যেত আর ফিরতাম বিকেল পাঁচটায়। আমার খুব জ্বর হল। বাবা বলল এরকম রাক্ষুসে ইস্কুল করে দরকার নেই। আমি তো ফুলের মতো কোমল।"

"ও বাবা, ফুলের মতো কোমল! তুমি তো খুব কথা বলতে পার।"

"বাঃ পারবই তো। আমি যে অনেকদিন ধরে কথা বলছি। পুরো সাত বছর ধরে।"

"তুমি কার কাছ থেকে এত কথা শেখ?"

"কেন, নিজে নিজেই। জান, আমার যখন তিন বছর বয়স তখন ফড়িয়াপুকুরের নীতু কাকারা একদিন খুব ধরেছিল আমাকে ওদের বাড়িতে থাকতে। আমি বলেছিলাম, না, মোটেই থাকব না। তোমাদের বাড়িতে যে দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়া নেই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ। দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়া! তা তোমার নীতুকাকারা কি বলল?"

"ওরা সবাই বললো, এতো হবেই। আমগাছে তো আমড়া ফলে না। সাহিত্যিকের মেয়ের তো দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়াই চাই।"

"ও, তোমার বাবা সাহিত্যিক বুঝি?

"হ্যাঁ। বাবা লেখে আর পড়ে। আমাদের বাড়িতে অনেক অনেক বই আছে। তাই তো বাবা ইস্কুল বন্ধ করে দিয়ে বলল বাড়িতে যে সব বই আছে তা পড়লেই আমার যথেষ্ট পড়াশুনা হবে। তাছাড়া, আমার তো মাস্টারমশাই আসেন। রোজ সকালে আমি তার কাছে পড়ি। আর তুমি কী পড়?"

"আমি তো অনেক বড়। আমার পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি তোমার মতো বাড়িতে থাকি।"

"তুমি সব সময় শুয়ে থাক কেন?"

"আমার যে কাশির অসুখ।"

"আচ্ছা নামনেইদা, তুমি তোমার জানালা থেকে পাখির বাসা দেখতে পাও? এই যে পেয়ারা গাছটা তাতে দুটো কাক বাসা বেঁধেছে।"

"আমার জানালার দিকে তো পেয়ারা গাছ নেই, শিউলি গাছ আছে, খালি ফুল ফোটায়।"

পুতলির খেয়াল হয়, তাই তো, ওটা শিউলি গাছ, ফল ধরে না কোনো। কতদিন ভোরে তলায় বিছিয়ে থাকা শিউলি ফুল সেই তো কোঁচড়ে করে তুলে আনে। পুতলিদের আর নামনেইদাদের দু বাড়ির দুটো খিড়কি গলির মধ্যে একটা সরু শান বাঁধানো রাস্তা ভেতরের দিকে চলে গেছে নরেশদের বাড়ি পর্যন্ত, তাদেরই পথ। সামনে বড়ো গেট, সব সময় খোলাই থাকে। সব তলায় ভাড়াটে, কে বন্ধ করবে? ভেতরে দু'ধারে পাতাবাহার আর দু'চারটে সাদা লিলি ফুলের ঝোপ। দুটো মোটে বড়ো গাছ, একটা শিউলি, যার বেশির ভাগ ফুল ঝরে নামনেইদার বাড়ির গলিতেই। অন্যটা পেয়ারা, একেবারে পুতলিদের গলি ঘেঁসে তার একটা ডাল প্রায় মাথা গলিয়ে দিয়েছে দোতলার ঘরের জানালায়। এটা আসলে বাবার পড়ার ঘরের জানালা। পুতলিই অবশ্য এখানে বেশির ভাগ সময় বসে থাকে। এ ঘরে চারিদিকে আলমারিতে ঠাসা বই আর বই। বাংলা, ইংরিজি। মাঝখানে একটা বড়ো সড়ো টেবিল আর হাতলওয়ালা চেয়ার। চেয়ারে একটা গদি আছে, মা সেদিন তার জন্য খয়েরি রঙের ঢাকনা সেলাই করছিল। বাবা এখানে বসে লেখে আর পড়ে। বাবা অনেক লেখে, খালি লেখে। তখন পুতলি বাবার পায়ের কাছে টেবিলের তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়ে। যে বই ইচ্ছে পুতলি আলমারি থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে পড়ে। মা তাই রাগ করে। এতটুকু মেয়ে সমানে বড়োদের বই পড়ছে। বাবা বলে "পড়ুক না, বই পড়ে কেউ কখনো খারাপ হয় না।" "হ্যাঁ, তা বলে ন'বছর হতে না হতে যত রাজ্যের উপন্যাস পড়ে ফেলুক। কিছু বলতে গেলে আমারই দোষ। বেম্মো ছুঁচিবাই।" সত্যি কথা বলতে কি পুতলি যে বই সবচেয়ে বেশি পড়ে তা হল বাবার টেবিলে রাখা চলন্তিকা। তার চারদিকে সব শক্ত শক্ত শব্দ, কি বইতে, কি বড়োদের মুখে। এই যেমন বেম্মো ছুঁচিবাই। পুতলি বুঝতেই পারে না। চলন্তিকাতে তো 'বেম্মো' পেলই না, আর ছুঁচিবাই হচ্ছে শুচিবাই—শুচিতারক্ষার বাতিক, মনোরোগ বিশেষ।

রোগ মানে পুতলি বেশ জানে। জ্বর, সর্দি, কাশি, পেটখারাপ, বার্লি, সাবু পথ্য করা, সিং মাছের লংকা ছাড়া পাতলা ঝোল। কিন্তু তার সঙ্গে বই পড়ার সম্পর্ক কি? এই জন্যই পুতলি বড়োদের সঙ্গে কথাবার্তায় থাকে না, বই পড়ে। মা মাঝে মাঝে রেগে বলে বইয়ের পোকা। আসলে পুতলি অনেক সময়ই বই হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মা তো আর জানে না। অথবা দেখে পেয়ারা গাছে কেমন সাদা সাদা লোম লোম ফুল ঝরে

ছোটো ছোটো খেলার মার্বেলের মত পেয়ারা ধরল। রোজ দেখে ; তবুও আশ্চর্য যে কখন বেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বুঝতেই পারে না। তারপর মাস্টার মশাইয়ের হোম ওয়ার্ক করে। ফাউন্টেন পেন দিয়ে। মা বলে তাই পুতলির হাতের লেখা কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং।

"পই পই করে বললাম, অতটুকু বাচ্চাকে ফাউন্টেন পেন ধরিও না। প্রথমে কিছুদিন দোয়াত কলমে হাতের লেখা মক্শ করুক। তারপর তোমার আদরের মেয়েকে উজাড় করে ফাউন্টেন পেন কিনে দিও। তা আমার কথা তো কানে যায় না, এখন নাও, দেখ লেখার কি ছিরি।"—"দোয়াত কলমে লিখবে? তুমি কোন যুগে বাস কর বলতো? অত ছিরি ছাঁদ দিয়ে হবেটাই বা কি? আমার মেয়ে কি কাছারির সামনে বসে মনিঅর্ডার আর চিঠি লিখবে?

"বাঃ, তা না লিখলেই বা। লেখার একটা শ্রী দরকার নেই?"—"এই আমার হাতের লেখাই তো বিশ্রী, তা বলে বাংলাদেশের কোনো প্রকাশক আমার পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেয়? নাকি হাতের লেখার জন্য আমার খ্যাতি কিছু কম কারো থেকে?"

পুতলি জানে এ ধরনের তর্ক বহুক্ষণ ধরে চলবে। সবটা সে শোনে না বড়ো একটা। তাকে অনেক ফাউন্টেন পেন বাবা কিনে দেয়। সেগুলোর বেশির ভাগই অবশ্য এখন অচল, কারণ পুতলি প্রত্যেকটাই খুলে খুলে দেখে কী ভাবে তৈরী, ভেতরে কী কী আছে। দেখাটেকা হয়ে গেলে আবার ঠিকঠাক লাগিয়েও রাখে। তবুও কেন জানি আর সেগুলোতে ভাল করে লেখা পড়ে না। মা ভাগ্যি জানতে পারে না, জানলে নির্ঘাত কষে বকুনি দিত। পুতলি তো অনেক কথাই বাবা মাকে বলে না। বাবা ব্যস্ত লেখাপড়া নিয়ে। আর মায়ের তো ঢের ঢের কাজ। রান্নাবান্না, পুতলির জামা-ইজের সেলাই, টেবলক্লথে এমব্রয়ডারি, শীতকালে পুতলির, বাবার, দাদুর সোয়েটার বোনা। তাছাড়া ফড়িয়াপুকুরের কাছে বঙ্গীয় কলালয় ইস্কুল আছে। সেখানে মা সেতার শেখে। সপ্তাহে দুদিন। পুতলি তো রোজ সন্ধ্যায় সামনে বসে শোনে, মা বাজায়। ঠিক যেন সরস্বতী ঠাকরুনটি! সেতারের খাতাটায় ঝুঁকে দেখে, কী ভীষণ শক্ত শক্ত কথা, রাগিণী নট মল্লার, তাল তেতালা বা রাগিণী পিলু তেতালা দুই রে গা মা ধা নি। পাতার পর পাতা সা গা রে গা, ডা ডি রি ডি রি ডা রা ডা রা। এ ছাড়া আছে পুতলির অঙ্কের খাতার মত ০, ১, ৩ —কোনোই মাথামুণ্ডু পায় না পুতলি। মা অবশ্য বুঝিয়েছে, এক একটা চিহ্নের সঙ্গে সেতারের এক একটা আওয়াজ জড়িয়ে আছে। যদিও চিহ্নের সঙ্গে আওয়াজটার আসলে কিন্তু কোনোই সম্পর্ক নেই। সকলে ভাবে সম্পর্ক আছে। যেমন, পু ত লি। এই তিনটে অক্ষরের সঙ্গে আট বছরের মেয়েটার যোগ, খালি লোকের বিশ্বাসে। পুতলির মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে পুতলি যে পুতলি তা খালি অন্য সবার বিশ্বাসের জন্যই, সে আলাদা করে কিছুই নয়। নামনেইদা ঠিকই বলেছিল, নাম আসলে কারো নেই। যে নামে অন্যের ডাকার ইচ্ছে, সেটাই নাম হয়ে যায়।

সন্ধ্যা বেলায় এসব ভাবনা চিন্তা মনে আসবার আগে পুতলি খেলতে যায়। যেখানে শিউলি গাছ পেয়ারা গাছ সেই গলিতে খেলে, জলকুমীর, কানামাছি, ক্রিকেট। সব খেলাই শুধু নরেশের সঙ্গে তাই খেলাগুলোকে অনেক ছাটকাট করে নিতে হয়। নরেশ পুতলির

চেয়ে দুবছরের ছোটো ওকে ডাকে পুত্‌লিদি বলে। নরেশটা একেবারে গোবর গণেশ। পুতলি ওকে কত শেখায়, গাছে চড়া, পাঁচিলে ওঠা, তবু ও খালি ভয় পায়। পুতলির মত কাকডাকা ভোরে চেয়ার টেনে নিয়ে ছিটকিনি খুলে খিড়কির পাঁচিল টপকে দেশবন্ধু পার্কে ফুল তুলতে যেতে পারে না। অনেক সময় পুতলি পার্কে যাওয়ার পথে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতালে ঢুকে পড়ে। ওখানে না একটা গাছ আছে তার পাতা অনেকটা রক্ত-করবীর মতো, কিন্তু ফুলগুলো ছোটো ছোটো থোকা থোকা মেটে লাল, যেন হিন্দুস্থানী জমাদারনীর সিঁথির সিঁদুর। ওরকম ফুল পুতলি কোথাও আর দেখেনি। যদি দেখে দারোয়ানটা সামনে নেই তো ঝটপট একটা থোকা তুলেই দে দৌড়। পার্কে অবশ্য ফুল তুললে কেউ কিছু পুতলিকে বলে টলে না, এত বড়ো পার্ক কত গাছ কে অত খেয়াল রাখছে। কৃষ্ণচূড়া না হয় খুব বড়ো গাছ, পুতলির নাগালের বাইরে, কিন্তু টগর আর কাঠচাঁপাতো আছে। কাঠচাঁপা গাছেই তো পুতলি বেশি চড়ে। পার্কের পেছনের দিকে, খালধারে পুতলি একবার একটা কাঠচাঁপা গাছে উঠে বসেছিল। হঠাৎ দেখে পাতার ফাঁক দিয়ে মালার পুঁতির মত ছোট্ট ছোট্ট এক জোড়া লাল চোখ জ্বলছে সূর্যের আলোয়। ও মা, কী অদ্ভুত ঘন কচি কলাপাতা একটা দড়ির মাথায় চোখ দুটো! দেখ্ না দেখ্ সরু লিকলিকে একটা জিভ বেরিয়ে এল, মাঝখান দিয়ে সটান চেরা। পুতলি তো তখুনি ওপর থেকে এক লাফ। ভাগ্যি আগের দিন এক ঝাঁক বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তলায় সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটিটা এমন নরম-নরম ছিল যে পুতলির ওরকম ধপাস করে পড়ে গিয়েও বিশেষ লাগেটাগেনি। মুস্কিল হল পরদিন যখন পুতলি টেবিলের তলায় শুয়ে শুয়ে ঘটনাটা বাবাকে বলছিল। বাবা অবিশ্যি প্রথমে বিশেষ কানে নিচ্ছিল না, প্রতিদিনের মত লিখে যাচ্ছিল আর পুতলির কথার ফাঁকে ফাঁকে দু'চার বার "হুঁ হুঁ তারপর, আচ্ছা" বলছিল। যখন কচি কলাপাতা রঙের দড়িটার কথা উঠল অমনি বাবা হঠাৎ বলে উঠল "আরে ওটা যে লাউডগা সাপ।"

ব্যাস, আর যাবে কোথায়, হুলস্থুল পড়ে গেল।

"নীলিমা, নীলিমা, কী কর বলতো সারাদিন। পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটা মাত্র মেয়ে, তাও দেখে শুনে রাখতে পার না। এই তো দেখ, পার্কে গাছে উঠে বসেছিল। আর একটু হলে সাপের কামড়ে প্রাণ যেত।"

"তোমার মেয়েকে সামলানো শিবের অসাধ্যি। খালি ছেলেদের মত টো টো, এই গাছে চড়ছে, নয় তো পাঁচিলে উঠছে। একটা কথাও কি শোনে? এত পুতুল আছে, আর পাঁচটা মেয়ের মতো পুতুল খেলবে, রান্নাবাটি, সাজসরঞ্জাম নিয়ে থাকবে। তা নয়। এ সবে মনই নেই তার। ঐ তো ঐ জাপানী পুতুলটা কেমন সুন্দর চোখ খুলত বন্ধ করত, ট্যা ট্যা করে কাঁদত, তাকে তো আনতে না আনতেই চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে এমন চানই করালে যে তার দফারফা। ছেলেদের মতো, উড়নচণ্ডী।"

"দেখ, তুমি কী যেন বল না, আমার রাগ ধরে যায়। এত লক্ষ্মী মেয়ে, মুখের ওপর কথা কখনো বলতে শুনেছ? সারাদিন পড়ে। আর আমি আপিস গেলে একটু বেরোয়, তাও তুমি সামলাতে পার না?"

বাবা পুতলির জন্য একটা মেকানো সেট কিনে আনে। পুতলি যাতে বাড়িতে থাকে। মা বলে ওটাও নাকি ছেলেদের খেলা, স্ক্রু ড্রাইভার, রেঞ্চ সব দিয়ে, নানা সাইজের রঙিন টিনের টুকরো জুড়ে জুড়ে মডেল তৈরি করা। বাবা খুব বিরক্ত। ছেলে আর মেয়েতে কি এতই তফাৎ যে আট বছরেই আলাদা আলাদা খেলনা চাই। খেলুক না ছেলেদের খেলনা দিয়ে ক্ষতি কি? পুতলি জানে, বাবা বলে সব মানুষ সমান, ছেলেমেয়ে গরিব বড়োলোক। তাই বোধ হয় মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার ছেলেদের মতো মেকানোতে খুব ঝোঁক। পর পর সব নম্বরের মেকানো কেনা হ'ল পুতলির জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুতলি ছবি দেখে দেখে মডেল বানায় আর খোলে, বানায় আর খোলে, বানায় আর খোলে। কখনো কখনো নিজের মন থেকেও কত কী তৈরি করে। কিন্তু পুতলির বাইরে টো টো বন্ধ হয় না। পুতলি বাড়ি থেকে রোজ দুবার অন্তত বেরোবেই। সকালে তার ফুল চাই-ই চাই। তাই তো পুতলি রোজ পার্কে যায়। লেডিজ পার্কে না একটা মস্ত শিব ফুলের গাছ আছে, সেটাতে পুতলি মোটেই চড়তে পারে না। তবে মালি অনেক সময়ই একটা করে শিবফুল তাকে দেয়। প্রতি বার ফুলটা হাতে নিয়ে পুতলি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মাঝখানে ঠিক যেন সাপের ফণা, বাবার হাতির দাঁতের কাগজকাটা ছুরির মত ম্যাটমেটে সাদা, চারপাশে মোটা মোটা পুরুষ্টু কালচে লাল পাপড়ি। অন্য সব ফুল কত হাল্কা, কত নরম নরম তাদের পাপড়ি। এ ফুল কিন্তু হাওয়ায় ভাসা নয়। মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পুতলির শরীরের মতো, রক্ত মাংসের। সবচেয়ে তাজ্জব লাগে ফণাটাকে যখন সাবধানে একটু একটু তোলে, ভিতরে অবিকল শিবের মাথার জটা! যেদিন শিবফুল পায় সেদিন আর তাকে ঠাকুর খুঁজতে হয় না। যে ফুল দেবে আর যাকে দেবে দুইই এক হয়ে যায়। অন্য ফুল পেলে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা রকমের হয়। নিত্য নতুন দেবতা আছে কিনা তার। পুতলিদের বাড়িতে কোনো পুজোর ঘর নেই। নরেশদের বাড়িতে আছে, পুতলিদের মামা বাড়িতে আছে। অনেক দিন দেখেছে রোজ পুজো হয়! মা বছরে দুদিন পুজো করে, লক্ষ্মী পুজো আর সরস্বতী পুজো। বাবা বলে যত সব হিন্দু ভণ্ডামি। চালকলা দিয়ে বোকা ভোলান! লোকের বাড়িতে যেরকম ঠাকুরের ছবি থাকে, বাবার ঘরেও সেরকম ছবি টাঙানো আছে। এরা সব অন্য দেবতা। এদেরই এক একটা ছবি পুতলি নামায়, মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়। সামনে মার পুরী থেকে আনা পেতলের রেকাবিতে সাজিয়ে দেয় ফুল আর ঠাকুমা পুতলিকে যে একটা সূর্য আঁকা ঘটি দিয়েছিল, তাতে করে কলের জল ছিটিয়ে দেয়। এই ঘটিটা পুতলির নিজস্ব সম্পত্তি, ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাশী থেকে এলে তাকে শেখায়—প্রণতোঅস্মি দিবাকরম্। বাবার ঘরের ছবি পুজো করার সময় কিন্তু পুতলি কিছু বলে টলে না। কারণ যাদের ছবি তারা বেশির ভাগই সাহেব। সবাই ইংরিজিতে কবিতা লিখেছে। পুতলি বড় হয়ে পড়বে। বাবা বলে বায়রন খুব সুপুরুষ, কিন্তু পুতলির কাছে শেলীর চেহারাই বেশি সুন্দর লাগে। আরেকটা ছবি আছে। সেটাকে কিন্তু পুতলির মোটেই ভালো লাগে না। শুধু একখানা মুখ, পেছনে ভয়ানক অন্ধকার গর্ত। এ কবির নাম কীটস। চোখের কোলে কী কালি, যেন নামনেইদার মত। পুতলির গা ছমছম

করে। তবে সব চেয়ে বড়ো ছবিটা পুতলির খুব চেনা, লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো, নাম রবিঠাকুর। বাবার ঘরের কবিদের মধ্যে একা রবিঠাকুরই বাংলায় কবিতা লিখেছে। পুতলি তার অনেক কবিতা পড়েছে, বাবা-মা দাদু সকলেই তার কবিতা অনেক অনেক পড়েছে। তাই বড় ছবিটা নামিয়ে পুজো করতে পুতলির কিচ্ছু অসুবিধা হয় না। যেন শিব বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতীর মতোই বরাবরের চেনা নিজেদেরই ঠাকুর। বড়োদের মুখে শুনে পুতলির অনেক বাংলা কবিতার লাইনই মুখস্থ। যেমন ধর, মা, মোটা একটা বই খুলে প্রায়ই পড়ে—"তোমা-'পরে/এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে / মোরে কর অবহেলা সে বিদ্যা তোমার / সম্পূর্ণ হবে না বশ ; তুমি শুধু তার / ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ ; শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।" পুতলি খালি বুঝতে পারে না এসব লাইন পড়তে পড়তে কেন মায়ের চোখ ছলছল করে, গলা ধরে আসে, নাকের ডগা হয়ে ওঠে লাল। ঠিক যেমনটি পুতলি দেখেছে কতবার নিজের মনে গান করতে করতে মা আলনা গুছিয়ে রাখছে। হয়তো বা সামনের পায়ে শাড়ির খুঁটটা চেপে ধরে কাপড় কুচোচ্ছে, "এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে—এ" বা "চিরদিন যারে তুমি করেছ হেলা / হৃদয় লয়ে শুধু করেছ খেলা।" সারাদিনই মা কাজ করে ভুরু কুঁচকে, যেন কী একটা যন্ত্রণা কোথায় সব সময় বিঁধে আছে। পুতলির পায়ে একবার কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। প্রথমে সে তো গ্রাহ্যই করেনি। ছোট্ট এইটুকুতো কাঁটাটা। ওমা, তা থেকে কতদিন ব্যথা চলল তো চললই। তারপর মা একদিন সেফ্‌টিপিন আগুনে পুড়িয়ে খুঁচিয়ে তাকে বের করে দিল। ব্যস ব্যথা সেরে গেল। পুতলি ভেবে পায় না মায়ের কাঁটাটা কোন্ সেফ্‌টিপিন দিয়ে তুলে ফেলা যায়। বিকেলে বাবা পাবলিশারের আড্ডায় যায়, তখন মা টেলিফোনে গল্প করে। বড়ো খাটটার ধারে গোল শ্বেতপাথরের টেবিলে টেলিফোন, সামনে পুবদিকের মেঝে ছোঁওয়া লম্বা জানালা। খাটের মাথার দিকে হেলান দিয়ে বসে মা সমানে কথা বলে আর শোনে। কখনো কখনো জানালা দিয়ে দেখে আকাশ। পুতলির মতো মাও আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। তখন কিন্তু মাকে আর চেনাই যায় না। কত সুন্দর লাগে দেখতে, মা কত হাসে। যেন অন্য মানুষ, পুতলির মা-ই নয়। যদি পুতলি বাড়ি থাকার সময় টেলিফোন আসে, মায়ের আগে দৌড়ে গিয়ে পুতলি টেলিফোন ধরে : "হ্যালো, কাকে চাই?" "পুতলি? টুনিকে দাও।" সবাইতো মাকে নীলিমা বলে ডাকে, বাবাও! খালি দাদু আর বড়ো মাসি মাকে টুনি বলে।

"মা, কার সঙ্গে কথা বলছ?"

"ও আমার এক বন্ধু।"

"তোমাকে টুনি বলে ডাকে কেন?"

"আমাকে অনেক ছোটোবেলা থেকে চেনে কিনা।"

"এখানে কোনো দিন আসে না কেন মা? নরেশ তো আমার বন্ধু, ও তো রোজ আসে।"

"আমার বন্ধু আসতে পারে না, অনেক দূরে থাকে কিনা।"

"কত দূরে?"

"সে বহুদূর।"

দূরের কথা ভাবতে পুতলির খুব ভালো লাগে। অনেক দূর ;আরও অনেক দূরের কথা ভেবে ভেবে তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, যেন কনকনে শীতে ঠাণ্ডা জল পড়ল। তাই তো তার দোলনায় চড়া চাই-ই। রোজ বিকেলে নরেশকে নিয়ে পুতলি আর একবার যায় দেশবন্ধু পার্কে। দোলনা দুলতে। রোজ যখন মালির ঘর থেকে দোলনার পাটাগুলো বের করা হয়, কী ভীষণ ভিড় আর হুড়োহুড়ি। বেশির ভাগই বড়ো বড়ো ছেলে থাকে এখানে, চিলড্রেনস পার্কে। পুতলির মত ছোট মেয়েরাতো এখানে আসে না। তারা পাউডার মেখে, বিনুনিতে রঙিন রিবনের ফুল বেঁধে, ইস্ত্রি করা জামা আর জুতো মোজা পরে ঝি-এর হাত ধরে লেডিজ পার্কে যায়। পুতলির অবিশ্যি এসবের বালাই নেই। মা তো জানতেই পারে না কখন টুক করে সে বাড়ি থেকে উধাও। তার ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো। একগোছা চোখের ওপর এসে এসে পড়ে। এক ঝটকায় সরিয়ে দেয় পুতলি। জুতো মোজা পরলে দৌড়তে অসুবিধা, তাই ওসব সে পরে না। জামা সেই সকালে স্নান করে যা পরে, তাই গায়েই বেরিয়ে যায়। সাজাগোজার ঝামেলার মধ্যে পুতলি যায়ই না। তার মন পড়ে থাকে দোলনায়। ছেলেদের ভিড় ঠেলে ঠেলে কনুইয়ের গুঁতো মেরে সাঁ করে এক্কেবারে ভিতরে ঢুকে যায়, দোলনা ধরতে। যে প্রথমে ধরবে তারই দখল হবে। পুতলির হাতে একবার দোলনা এলে, ব্যস হয়ে গেল, কেউ আর পাচ্ছে না। ছেলেরা তাই মোটেই পুতলিকে দোলনা দিতে চায় না। একদিন তো মারামারিও হয়ে গেল। একটা বেশ ঢ্যাঙা মতো ছেলেকে পুতলিই প্রথমে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা, "এই খুকী, ভারি বাড় বেড়েছো না," বলে যেই না তার চুলের মুঠি ধরেছে অমনি মালিটালি সব ছেলেটাকে এই মারে তো সেই মারে। পুতলি এত ছোট্ট, এত রোগা, তার পাতলা মুখ আর বড় বড় শান্ত চোখ দেখলে কারো বিশ্বাসই হয় না যে সে নিজে থেকে হাত তুলতে পারে। তবে সবাই জানে যে দোলনায় দুলতে পুতলির মতো আর কেউ পারে না। দাঁড়িয়ে বল, কি বসে, এমন কি ডবল। কত সময় পুতলি নিজে দাঁড়িয়ে নরেশকে দুপায়ের মধ্যে বসিয়ে দোলে। নরেশটা অবশ্য ভীতুর ডিম, খালি চেঁচায়, "ও পুতলিদি আর ওপরে উঠো না, পড়ে যাব, পড়ে যাব।" এই জন্য পুতলির মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লাগে নরেশের ওপর। বেশির ভাগ সময় পুতলি তাই একলাই দোলে। একা, একেবারে একা সে উঠে যায় উঁচুতে, আরও উঁচুতে। যেন এই আকাশ ছুঁয়ে ফেলল বলে। চারিদিকে আর কেউ নেই, খালি পুতলি আর আকাশ। আর কিছু নেই, একা সে, স্বাধীন, মাটির সব কিছুর ওপরে। যেন বাবার গল্পের পক্ষীরাজ ঘোড়া।

যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র যায় সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙিয়ে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সেই দূরে, বহু দূরে যেখানে রাক্ষসেরা বন্দী করে রেখেছে রাজকন্যাকে, আর দীঘির সেই তলা থেকে এক ডুব দিয়ে রাজপুত্র কৌটো তুলে নিয়ে আসে। যেই না

রাক্ষসেরা বলে হালুম লো ঝালুম লো মানুষের গন্ধ পালুমলো—পুতলি তো দু চোখ বন্ধ করে বাবার ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বুকে মুখ লুকোয়। ব্যস আর কোনো ভয় নেই। জবাকুসুম তেল আর মহীশূরের চন্দন সাবানের গন্ধ তাকে ঘিরে রাখে। অতঃপর রাজপুত্র কৌটো খুলে প্রাণভোমরাটা পটাস্ করে টিপে মেরে ফেলে, আর সব রাক্ষস খতম। খাওয়ার পর দুপুরে পুতলি বাবার কাছে শুয়ে রোজ রাজপুত্র রাজকন্যা রাক্ষসের গল্প শোনে। প্রত্যেক দিনই তার রাক্ষসদের মারা চাই। বাবা মাঝে মাঝে বলে, এই একটা গল্পে তোর কী যে নেশা। গল্প শুনে পুতলি কিন্তু মোটেই ঘুমোয় না, বরং গল্প বলে ঘুমিয়ে পড়ে বাবা। আর পুতলি পা টিপে টিপে খাট থেকে নেমে বাবার পড়ার ঘরের জানালায় গিয়ে বসে। গরাদের ফাঁকে ফাঁকে দেখে আকাশ। পক্ষীরাজ ঘোড়া বুঝি রাজপুত্রকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মাটির দিকে চোখ নামাতে গিয়ে দেখে পেয়ারা গাছে কাকের বাসা। এই বাসাটায় পুতলির খুব আগ্রহ। গোড়া থেকেই সে লক্ষ করে আসছে কেমন একটু একটু করে কুটোকাটা নিয়ে এসে দুটো কাক বাসা বাঁধলো। একদিন কয়েকটা ডিম দেখা গেল, ছোট্ট ছোট্ট, পুতলি যে রকম ডিম পোচ বা সেদ্ধ খায় তত বড়ো নয় মোটেই। জানালা থেকে ডিমগুলো ভালো করে দেখা যায় না, বাসার মধ্যে রাখা তো। পুতলি ছাদ থেকে দেখতে চেষ্টা করে। না ওপর থেকেও ভালো দেখা যায় না। এমন তিনটে ডালের জোড়ার জায়গায় কাকেরা বাসা বেঁধেছে যে চট করে কোনোখান থেকেই দেখা যায় না। পুতলির অবাক লাগে, কাকেরা কী সাবধানি! তারপর খেয়াল করে দেখে একটা কাক সব সময় বাসার ওপর পেট চেপে বেশ বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মা বলে তা দিচ্ছে। যখন ছোটো ছোটো ছানা ডিম ফুটে বেরুল সবচেয়ে মজা পুতলির, আকাশ দেখা প্রায় বন্ধ করে দেখে ছানাগুলোর রকম সকম। কী রকম রোগা রোগা ঠ্যাং ঠ্যাং-এ চেহারা, মা বাবা তো দিব্যি নাদুসনুদুস। ঠিক যেন পুতলির মতো হাড় জিরজিরে, মা তো কত সুন্দর। বাবার চোখে অবশ্য পুতলি রোগাটোগা কিছুই নয়। বাবা হয়তো বলল, "অরুণটার কী কপাল। একটা মাত্র মেয়ে, তাও আবার যেমন কালো রঙ, তেমনি অখাদ্য গড়ন। যেন প্যাঁকাটি।"

"অন্যের মেয়ে সম্বন্ধে এ রকম বলতে নেই ; তোমার নিজের মেয়ের কী এমন ফিট গৌরবর্ণ, হাড় পাঁজরা তো সব একেবারে চেয়ে চেয়ে আছে।"

"নীলিমা তুমি আমাকে অবাক করলে। ত:মার পুতলির সঙ্গে তুলনা হয়। এরকম মুখ আর দেখেছো, এমন চোখ, নাক, ঠোঁট, আর কী স্নিগ্ধ রং, কেমন ছিপছিপে গড়ন, যেন রজনীগন্ধা।

"হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক হয়েছে। অন্যের মেয়ে হলে কালো প্যাঁকাটি, নিজের মেয়ে রজনীগন্ধা। ব'ল না ব'ল না, লোকে হাসবে।"

কাকছানাদের চেহারা টেহারা নিয়ে কাক বাবা মার তেমন মাথাব্যথা দেখা যায় না। তাদের সারাদিনের কাজ খালি বারে বারে ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে আসা। পুতলির বড়ো বড়ো চোখ আরও বড়ো হয় যখন দেখে বাবা মার সাড়া পেলেই ছানাগুলো কেমন এত লাল হাঁ করে, একটু কিছু মুখে পড়তে না পড়তেই গরগর করে গিলে ফেলছে। কাক বাবা

মা ছানাপোনা দেখলে পুতলির কখনো কখনো নরেশ আর নরেশের বাবা মার কথা মনে হয়। সকালে পার্ক থেকে ফুল তুলে ফিরে যদি দেখে তখনও বাড়িতে কেউ ওঠেটোঠেনি, তাহলে পুতলি মাঝে মাঝে নরেশদের ওখানে চলে যায়। দেখে অত সকালেই নরেশের মা চান টান সেরে ঠাকুরের ছবি পুজো করছেন, ঠিক যেমন পুতলি করে ফুলটুলি দিয়ে শেলি বায়রন রবিঠাকুরকে। কাকিমা—নরেশের মা—বাড়তি দেন শুধু বাতাসা। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে মোটা মোটা পাঁউরুটির স্লাইসে মাখন মাখাতে মাখাতে ডাকেন নরেশকে, কাকাবাবুকে, মানে নরেশের বাবাকে। খেয়ে দেয়ে কাকাবাবু যান হাসপাতালে, নরেশ যায় নার্সারি স্কুলে, ব্যাগ ঝুলিয়ে। পুতলি গেলে কাকিমা পুরু মাখন মাখানো রুটিতে বেশ করে চিনি ছড়িয়ে তার হাতে দেন। কখনো বা বলেন, "আহা এতটুকু মেয়ে, এত বেলা অব্দি খালি পেটে!" পুতলিদের বাড়িতে সব অন্যরকম। এখানে সবাই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, পুতলি ছাড়া। অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন বাবা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, সেদিন বাজারে যায়। যেমন পুতলির জন্মদিনে। এ বছরই তো বাবা মুটের মাথায় চাপিয়ে রাশি রাশি মাছ তরকারি কিনে এনেছিল। তারপর খেয়াল হ'ল, তাই তো কাউকে নেমন্তন্ন করা হয়নি যে! টেলিফোন করে বাবার বন্ধুদের বলতে বলতে দুপুর। তখন বড় মাসিকে খবর দেওয়া হ'ল রান্নার দিকটা সামলাতে। বড় মাসির মতো ভাজার মুলো তো আর কেউ কাটতে পারে না। তা ছাড়া মাংসের পুর দিয়ে টমাটোর কলসি। পুতলির এতে খুব উৎসাহ, অনেকক্ষণ ধরে দেখে, কী বিরাট ব্যাপার, দুখানা উনোনই ধরতে ধরতে বেলা হয়ে গেল। তারপর এত রকমের মাছ রান্না। সন্ধে হতে না হতেই পুতলি তো যথারীতি ঘুমিয়ে কাদা। প্রায়ই অবশ্য সে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। মা সেতার বাজানো, টেলিফোনে গল্প সব সেরে তাকে তুলে দুধভাত খাইয়ে দেয়। বিরক্ত হয়ে বলে, এত বড়ো মেয়ে, আট বছরের ওপরে বয়স হ'ল, রাতের পর রাত দুধ ভাত খেয়ে থাকে। নরেশদের বাড়ি ছাড়া পুতলি পাড়াতে আর কারো বাড়ি যায় না। একবার মিনুদের বাড়ি গিয়েছিল। ওদের বাড়ি খুব বড়ো, গাড়িবারান্দা আছে, আর তার ছাদে কত ফুল গাছের টব। নরেশ একদিন বলল কি না মিনুদের বাড়িতে একটা গাছ আছে, তার পাতায় ঠিক পায়েসের গন্ধ। তাই তো পুতলি নরেশের সঙ্গে গেল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নক্‌শাকাটা জ্বালি ঘেরা এক বারান্দা। মেঝেটা কেমন সুন্দর কালো সাদা বরফি। সেখানে খুব মোটা এক মহিলা মস্ত চওড়া পাড় শাড়ি পরে, ঝন্‌ঝন্ হাতভর্তি চুড়িবালার আওয়াজ করে পান সাজছিলেন। মিনুর সঙ্গে পুতলিকে দেখে বললেন, "তুমি কার মেয়ে গা?" পুতলি বাবার নাম বলতেই ফুলো ফুলো গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, "ও মা, সে তো পাঁড় মাতাল, পদ্যটদ্য লেখে, চাল নেই চুলো নেই ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। তার বৌটা তো শুনি বায়স্কোপের মেয়েছেলের মত খাটে শুয়ে চুল এলিয়ে নবেল পড়ে, আবার নাকি বীণে বাজায়। ও বৌমা, বলি তোমাদের কি আক্কেল বলে কিছুই নেই? আমরা ছাপোষা গেরস্ত, বাড়ির মেয়েকে যার তার সঙ্গে মিশতে দিতে আছে?" মিনুর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, "মা, এ তো শিশু, এর কী দোষ?" পুতলি জানে না তার কী দোষ। তবে মিনুদের বাড়িতে আর

কখনো সে যায় না। নরেশদের বাড়ি ছাড়া আর কারো বাড়িতেই পুতলি যায় না। এ পাড়ায় আর কোনো বাবাই গদ্য পদ্য কিছুই লেখে না। বাবার মতো এত বইও পড়ে না। অন্য মায়েরাও কেউ সেতার বাজায় না, কবিতা পড়ে না। একা একা পুতলি ঘুরে বেড়ায় দেশবন্ধু পার্কে। মনে হয় পাড়া থেকে, বাড়ি থেকে, বাবা-মা থেকে দূরে বহুদূরে চলে এসেছে।

"আচ্ছা, পুতলি তুমি তো এত শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার এই অদ্ভুত বাতিক কেন? খালি একলা একলা দূর দূর ঘুরে বেড়ানো?"

"আমার যে খুব ভাল লাগে, নামনেইদা।"

যেমন সেবার পার্কে সারাদিন বসেছিল পুতলি। শেষে পার্কের পুবদিকে রাস্তার ওপারের তিনতলা বাড়ি থেকে শংকরদা তাকে দেখতে পেল। শংকরদা খদ্দর পরে আর খুব আস্তে আস্তে কথা বলে, প্রায়ই দাড়ি কামায় না। বাবা বলে শংকরদা গান্ধীজির চেলা। পুতলিকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে সটান নেমে এল পার্কে।

"পুতলি এই অসময়ে এখানে কী করছ? বাড়ি যাবে না?"

"না।"

"কেন? মা বকেছে?"

"না।"

"তবে?"

"এমনিই। আমার এখানে কিচ্ছু ভালো লাগে না। অন্য কোথাও যেতে চাই।"

"অন্য কোথাও যেতে চাও? তা বেশ তো, একলা না গিয়ে চল না আমাদের সঙ্গে। আমরা আজই একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি, তুমি কখনো সেরকম জায়গা দেখনি। চল, আমাদের সঙ্গে। বাড়ি ফেরার দরকারই নেই।"

শংকরদা হাত ধরে পুতলিকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে গেল। শংকরদা, তার বোন ঝণ্টিদি পুতলির বাড়ি গিয়ে তার জামাকাপড় সব নিয়ে এল। ওদের সঙ্গে সোজা চলে গেল ঘাটাল। সেখানে খুব মজা হল। হৈ হৈ। বাড়িভর্তি লোক, কত হাসি গল্প খেলা, সব সময় জমজমাট। কিন্তু কদিনের জন্য! আবার ফিরে এল সব কলকাতায়, পুতলিকে বাড়ি পৌঁছে দিল শংকরদা। পুতলি দেখে বাবা-মা দুজনেরই কেমন যেন মুখ ভার ভার। যাকগে, পুতলির ভারি বয়ে গেল। পুতলিতো প্রত্যেকদিনই গম্ভীর মুখে থাকে, তাতে কারো কিছু এসে যায় কি? দুপুর হতে না হতেই জানালায় গিয়ে বসে, সামনের জানালায় নামনেইদা আধশোওয়া।

"পুতলি, কোথায় গিয়েছিলে? কদিন তোমাকে তো দেখিনি।"

"আমি তো বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলাম।"

"চলে গিয়েছিলে? সে কি, কোথায় চলে গিয়েছিলে?"

"ওই যে শংকরদা আছে না, খদ্দর পরে, বাবাকে কাকাবাবু বলে ডাকে আর বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তর্ক করে, আমি ওদের সঙ্গে একটা নতুন জায়গায় গিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি, কী রকম জায়গা?"

"খুব মজার। নাম ঘাটাল। ওখানে না অনেক বাঁদর আছে। একদিন হয়েছে কি ছাদে সব জামাকাপড় শুকোচ্ছে, আর আমি সিঁড়ির মাথায় বসে কুল খাচ্ছি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাঁদর এসে পটাপট কাপড়গুলো তুলতে শুরু করল। আমি চেঁচিয়ে যেই সবাইকে ডাকাডাকি করছি অমনি বাঁদরটা না কাপড়টাপড় সব ধপ্ করে ফেলে দিয়ে আমার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে লাফ দিয়ে পাশের মস্ত কাঁঠালগাছটার ডালে উঠে পালিয়ে গেল।"

"হাঃ হাঃ হাঃ। আর তুমি কী করলে?"

"আমি? আমি তো ভ্যা করে কেঁদে ফেললাম, জান আমার গালে না লাল লাল দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাই জন্য শংকরদা, বুলুদা, টুলুদা সবাই মিলে ঝণ্টিদিকে কী বকুনিই না দিল। 'মেয়ের গালে দাগ দেখলে কাকাবাবু আমাদের কারো আর মুখ দেখবেন না।' ওরা সব বাবাকে কাকাবাবু বলে।"

"আচ্ছা, পুতলি, তুমি এরকম বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলে কেন?"

"এমনিই।"

"এমনিই মানে কি? তোমার বাবা-মা তোমাকে কত ভালোবাসে। তুমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। তুমি যদি এরকম শুধু এমনি এমনি সব ছেড়ে চলে যেতে চাও তাহলে ওঁদের মনে কত কষ্ট হয়? তুমিও তো ওঁদের ভালোবাসো, তাই না?"

"হুঁ।"

"তাহলে?"

পুতলি চুপ। খানিকক্ষণ বাদে বলে :

"আমার যে অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে, তাই।"

"কেন তোর এত দূরে যেতে ইচ্ছে করে বল্‌তো?"

"বাঃ তুমিই তো রোজ বল, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্র যাচ্ছে দূরে, বহুদূরে।"

"সে তো গল্প। আর এ তো প্রত্যেক দিনের সত্যি, আমরা যাকে বলি বাস্তব, যা আমাদের জীবনে দু-বেলা ঘটছে। তাছাড়া গল্পেও তো রাজপুত্র যায় বহুদূরে রাজকন্যার খোঁজে, রাজকন্যা কি কোথাও যায়?"

"আচ্ছা বাবা, এমন গল্প হতে পারে না যেখানে রাজকন্যা যায় রাজপুত্রের খোঁজে?

"দূর বোকা, তা কি করে হবে। গল্প একটাই। রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে যায় রাজকন্যার খোঁজে আর রাক্ষসের হাতে বন্দিনী রাজকন্যা অপেক্ষা করে থাকে কবে রাজপুত্র আসবে, রাক্ষসকে মেরে তার হাতের কড়া পায়ের শেকল খুলে দিয়ে নিয়ে যাবে নিজের রাজ্যে।"

"কেন?"

"কেন আবার কি, রাজকন্যা মেয়ে, রাজপুত্র ছেলে, তাই।"

"বাঃ, এই তো নরেশ ছেলে আর আমি মেয়ে। ও তো একটা এক নম্বরের ভীতু। তুমি কি ভাব ও কখনো কিছু করতে পারবে? কক্ষনো না। আর আমি তো মেয়ে, কিন্তু

দেখ আমি সব পারি। পাঁচিল টপকানো, গাছে চড়া, দোলনা নিয়ে মারামারি করা। ও পারে আমার মতো দোলনা নিয়ে ওই অত ওপরে উঠতে?"

"দূর পাগলি কোথাকার। এই সব পাঁচিলে ওঠা, গাছে চড়া, দোলনায় দোলা নিয়ে কি গল্প হয়?"

"কেন এগুলো তো সত্যি। সেই যে তুমি যাকে বললে বাস্তব, তাই। ঠিক না?

"নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধু বাস্তব দিয়ে তো গল্প হয় না।"

"তবে কী করে গল্প হয়?"

"আচ্ছা, তোর মা বিজয়ার সময় যখন নারকোলের তক্তি বানায় তুই খেয়াল করে দেখেছিস?"

"বারে, দেখব না কেন। এইবার তো আমি মায়ের সঙ্গে কত তক্তি বানালাম?"

"তাহলে বল্ দেখি কী করে তক্তি হয়।"

"সে তো আমি খুব জানি। নারকোল কুরিয়ে বাটা হয়। বড়ো কড়াইয়ে এত চিনি ঢেলে এই এতটুকু জল দিতে হয়। চিনি যখন গলে রসগোল্লার রসের মতো তখন তাতে নারকোল বাটা দিয়ে খুব করে নাড়তে হয়। যেই কড়াইয়ে লেগে লেগে আসে, অমনি নামিয়ে বড় থালায় ঢেলে ফেলতে হয়। ট্রাঙ্কে ঠাকুমার সেই যে কালো কালো মাটির সব ছাঁচ আছে না—কোনোটা পদ্ম, কোনোটা শাঁখ, কোনোটা মাছ—সেগুলোতে আগে থেকে তেল হাত বুলোনো থাকে। এবার গরম গরম চিনি-জ্বাল দেওয়া নারকোল বাটা বেশ করে চেপে ছাঁচগুলোতে ভর্তি কর, একটু বাদে সাবধানে খুলে নাও। ব্যস হয়ে গেল। মা বলে, যত পরিপাটি করে, মোলায়েম করে ছাঁচ ভরাট করবে তত চমৎকার হবে শাঁখ পদ্ম মাছ।"

"গল্পও ঠিক এরকম, বুঝলি। রাজপুত্র রাজকন্যার খোঁজ করে—একটা ছাঁচ, যেমন তোর শাঁখ ;রাজকন্যা রাক্ষসের হাতে বন্দিনী—ধর তোর মাছ ;আবার রাজপুত্র রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে—একটা পদ্ম। পর পর ছাঁচে ফেলতে হবে, তবেই না সুন্দর হবে। আর প্রত্যেক দিনের সত্যি যাকে আমরা বাস্তব বলি, তা হচ্ছে একেবারে গোটা গোটা নারকোল। তা থেকে গল্প বানানো অনেক পরিশ্রম। তাকে মিহি করে পিষে যখন নরম করে ছাঁচে ফেলা হয়, তখন আর তার নারকোলের চেহারা থাকে না। দেখিস তো, যেরকম ছাঁচ, ঠিক সেইরকমই তক্তি। গল্পে বাস্তব তার বেশি নয়, বুঝলি এবারে?"

পুতলি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। তার মনে সবসময় কেমন একটা সন্দেহ, ছাঁচের সঙ্গে সত্যির সম্পর্কটা বুঝি একেবারে গোলমেলে।

"আচ্ছা বাবা, রাজকন্যার যদি রাজপুত্রকে পছন্দ না হয়?"

"সে কি কথা, এত কাণ্ড করে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, কোন দীঘির তলায় ডুব দিয়ে প্রাণভোমরা তুলে এনে রাক্ষসদের মেরে ফেলে রাজপুত্র! কত কষ্ট করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে আর রাজকন্যার কিনা এমন বীর রাজপুত্রকে পছন্দ হবে না?"

"হতেই হবে এমন কোনো মানে আছে? ওই যে সামনের বাড়ির পল্টুদা, কী জোয়ান তাগড়া, বাপরে! কত স্পোর্টসে জেতে, বিরাট বিরাট ঝকঝকে কাপ হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ও যদি রাজপুত্র হয় তো নির্ঘাত রাক্ষস খোক্কস সব মেরেই পাট করে দেবে। কিন্তু আমি যদি রাজকন্যা হতাম, আমার কিন্তু ওই পল্টুদার মতো রাজপুত্র মোটেই ভাল লাগত না।"

"তোর কী রকম রাজপুত্র চাই একবার শুনি।"

"কেন, নামনেইদার মতো। কিন্তু বাবা, নামনেইদা তো কোনো খেলাতেই কাপ পায় না। সে তো খেলতেই পারে না। তাহলে কী হবে?"

"এই তো, তুই আবার মুস্কিলে ফেললি। গল্পে যে রাজপুত্রকে বীর হতেই হয়। আর তোর বাস্তবের রাজপুত্র বিছানায় শুয়ে কেশে কেশে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরকম সত্যিকারের রাজপুত্র বীর হবে কী করে?"

কী করে তা পুতলিও ভেবে পায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় গল্পের সঙ্গে বাস্তবের কোনোই সম্পর্ক নেই ; দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। গল্পে রাজপুত্র রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যাকে বিয়ে করে। তারা চিরকাল সুখে ঘরকন্না করে। মায়েরও তো বিয়ে হয়েছে। মা তো রাজকন্যার মতোই রূপসী। আর কারো মা এত সুন্দর নয়। সবাই বলে মেজজ্যাঠাইমা কেমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মত। আর নীতুকাকিমা কি ঢলঢলে শ্রী। পুতলি একদম বিশ্বাস করে না। মেজজ্যাঠাইমা তো খালি মোটাসোটা ফর্সা, আর নীতুকাকিমা? হুঁ, সে তো একেবারে কালোকুচ্ছিৎ। বড়োরা তো কিছুই বোঝে না তাই হাসে, যখন পুতলি গম্ভীর মুখে বলে, 'আমার মা পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। ঘরে বন্দী। মোটা মোটা লোহার গরাদে জানালায়, তার ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র আসবে।

হয়তো বা মাঝে মাঝে গুনগুন করে "এই কি গো শেষ দান" বা "জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা" বা ছলছল চোখে রবিঠাকুর পড়ে, "তোমা 'পরে এই মোর অভিশাপ।" কিন্তু মা যদি রাজকন্যা, তাহলে রাক্ষস কে? রাজকন্যার বিয়ে হয়, বাবার সঙ্গে তো মায়ের বিয়ে হয়েছে, আবার রাজকন্যা চোখের জল ফেলে যখন সে রাক্ষসের হাতে বন্দী থাকে। কত সময় মায়ের চোখেও তো জল দেখে পুতলি' তাহলে রাজপুত্র কে?

"আচ্ছা বাবা, তোমার কি মনে হয় রাজপুত্র সবসময় রাজপুত্রই থাকে? বিয়ের পর সে যদি রাক্ষস হয়ে যায় আর রাজকন্যাকে ঘরে বন্দী করে রাখে?" "তোর মাথায় কোথা থেকে যে উদ্ভট প্রশ্ন আসে। রাজপুত্র সবসময় রাজপুত্র, রাক্ষস সবসময় রাক্ষস, রাজকন্যা সবসময় রাজকন্যা। তক্তির ছাঁচ, মনে রাখবি। পদ্মফুলের ছাঁচে শুধুই পদ্ম, শাঁখের ছাঁচে শাঁখ, মাছের ছাঁচে মাছ। ব্যস, কোনো এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই। পদ্ম কী করে শাঁখ বা মাছ হবে?"

"জান, গতবার পুজোর পরে মায়ের সঙ্গে দুটো থিয়েটার দেখেছিলাম। প্রথমদিনে যে ভালো লোক হল, ওমা পরের দিনে দেখি স্টেজে সেই আবার খারাপ লোক হয়ে গেছে। যেন একদিন যে রাজপুত্র অন্যদিন সেই রাক্ষস। আমি ঠিক জানি তুমি বলবে গল্পে যা হয় সত্যি করে, তোমার সেই যে কি বলে বাস্তবে, সেরকম হয় না।"

কিন্তু পুতলি জানে বাস্তবে হামেশাই রাজপুত্র রাক্ষস বদলা-বদলি হয়ে যায়। যেমন বাবা। দিনের বেলা কত ভাল, শান্ত সুন্দর। রাত্রে অন্য চেহারা। একটা ছাঁচে মোটেই

মানুষকে আঁটে না। রাতের বাবা কখনও বন্দিনী রাজকন্যার মত চোখের জল ফেলে, কখনও বা হয়ে যায় রাক্ষস—হালুম লো ঝালুম লো—কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর! আবার কখনও তাকে এমনই গোলমেলে দেখায়, পুতলি রাজপুত্র না রাক্ষস কিছুই ঠিক করতে পারে না। বাবার সঙ্গে মায়ের কিন্তু বদল হয় না। মা সেই একই রকম থাকে, ভুরু কুঁচকে পাতলা ঠোঁট শক্ত করে চেপে রাখা পুতলির স্কেলে টানা লাইনের মতো। প্রতিদিন সন্ধে হতে না হতেই পুতলি ঘুমিয়ে পড়ে, মাঝরাত নাগাদ তার দিব্যি এক ঘুম হয়ে যায়। তখন বিছানায় শুয়ে জেগে থাকে। কত রাত শুনে শুনে রাতের বাবা সম্পর্কে পুতলির মনে গুটিকতক ছক হয়ে গেছে। যেন তার নিজস্ব তত্ত্বির ছাঁচ।

পুতলির তত্ত্বি : ছাঁচ নং ১ : বন্দিনী রাজকন্যা

মা : আচ্ছা, তোমার রোজই এত মদ খেতে হয়? একটা রাতও কি তুমি সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পার না?

বাবা : আঃ নীলিমা। তুমি কেন বোঝ না কী যে ভীষণ কষ্ট। আমার দোষের মধ্যে ছাদে টবে দুটো ফুলগাছ লাগাই। যে আমি দেশে কত সুন্দর বাগান করেছিলাম, এখন দুটো টব নিয়ে থাকি। বরাবর আমার গাছের শখ। মাইনর স্কুলে পড়বার সময় অঙ্ক ভুল করলেই যামিনী পণ্ডিত কান ধরে বলতেন, 'খালি বাগিচা করস! খালি বাগিচা করস, হারামজাদা!

মা : তোমার দেশের বাগানের সঙ্গে আজকের এই আচরণের সম্পর্ক কী?

বাবা : আঃ এই তোমাকে নিয়ে মুস্কিল। খুব সম্পর্ক আছে খুব সম্পর্ক আছে। অতীত থেকেই তো বর্তমান আবার বর্তমানের গহ্বরে ভবিষ্যৎ। সেই যে সেবার হাতিবাগানে বোমা পড়ল, মনে পড়ে? পুতলি তখন তোমার কোলে। তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দিলাম। আচ্ছা তখন তো তুমি নিজের চোখে দেখেছ আমার হাতের সেই কামিনী গাছ? কী তার ফুল, কেমন তার সুবাস। আর আজ সে ফুল চোখে দেখার অধিকার পর্যন্ত আমার নেই। এইজন্যই কি ক্লাস ছেড়ে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম? এমনই স্বাধীনতা পেলাম যে সাতপুরুষের ভিটেয় পা পর্যন্ত দিতে পারি না। এই জন্যই মদ খাই। মদ খেলে আমার সেই কামিনী ফুলের গন্ধ পাই। কোথায় সে গাছ, কোথায় সে মাটি! 'হে পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা শতশতবার/একদিন জনহীন তোমার পুলিনে / গোধূলির সন্ধ্যালগ্নে হেমন্তের দিনে/সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান/তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।"

ম্যাপ খুলে পুতলি দেখেছে পদ্মা একটা নদীর নাম। পদ্মাকে কেন কীর্তিনাশা বলা হইয়া থাকে? মাষ্টারমশাই-এর কাছে পুতলিকে লিখতে হবে। পুতলি তো অনেক পড়ে ফেলেছে কিনা। বাবা অনেক সময়ই কবিতা মুখস্থ বলে। এটা নাকি আবৃত্তি করা। খুব ভালো লাগে বাবার গলায় কবিতা, যদিও অনেক শক্ত শক্ত কথা থাকে— পুলিনে, লগ্নে, অস্তমান, সঁপিয়াছিনু। তবে মানে পুরোপুরি না বুঝলেও খুব একটা এসে যায় না। পুতলির ধারণা কবিতা শুধু কবিতাই, তার কোনো মানে টানে থাকার বিশেষ দরকার নেই।

পুতলির তক্তি : ছাঁচ নং ২ : রাক্ষস

মা : এই যে এতক্ষণে মনে পড়ল, সংসার বলে কিছু আছে? আর ফিরলে কেন, যেখানে ফূর্তি করছিলে বাকি রাতটুকু সেখানেই কাটিয়ে এলে পারতে?

বাবা : আমার যখন ইচ্ছে তখন ফিরব। এটা কলকাতা শহর, আমি পুরুষমানুষ। ফূর্তি করার ইচ্ছে হলে করব, ইচ্ছে ফুরিয়ে গেলে করব না ব্যস। আমাদের দেশে চিরকাল তাই হয়ে এসেছে, চিরকাল হবে। তুমি নারী, তোমার একমাত্র পরিচয় আমার স্ত্রী হিসাবে। আমি ছাড়া তোমার গতি নেই। হিন্দু স্ত্রীর যেভাবে থাকার কথা সেভাবে থাক, ওরকম চোখ রাঙাতে এস না।

মা : কেন রাঙাব না? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমি কি মানুষ নই?

পুরুষ আর মেয়েমানুষে কি এতই তফাৎ যে সারা জীবন তোমরা স্বামীরা স্ত্রীদের একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে আর আমাদের তা মুখ বুজে সইতে হবে?

বাবা : আহা, কত তুমি মুখ বুজে সহ্য করছ! যাও যাও, অত নাকে কেঁদো না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের আদর্শ সর্বংসহা ধরিত্রী, আর তুমি কি? আমার যেন আর জানতে বাকি নেই তোমার লীলাখেলা কাকে নিয়ে। তুমি আবার হিন্দু স্ত্রী, না? তোমার মতো স্ত্রী যার সে পুরুষ বাইরে যাবে না তো কী করবে? ঘরে বসে পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর লীলাখেলা দেখবে?"

মা : কী, কী বললে? লীলাখেলা? কোথায়, কবে আমাকে দেখেছো লীলাখেলা খেলতে? কে দেখেছে? আন, সাক্ষী আন। যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছ, না?

বাবা : বেশ করছি! সাক্ষী আনতে হবে আমাকে, না? আমি তোমার স্বামী, আমার মুখের কথাই যথেষ্ট, বুঝেছ। বেশি মেজাজ দেখিও না। আহা, রাধিকার কলঙ্ক প্রমাণের জন্য বৃন্দাবনে এজলাস বসবে।

মা : বটে? আমি রাধিকা! বেশ তো তাই যদি হয়ে থাকি তাহলেই বা তুমি কোন মুখে রা কাড়ছ? বলি, এই না কত বড়ো বড়ো বুলি, সতীত্ব বুর্জোয়া সংস্কার মাত্র! ওই তো কদিন আগে তোমার বিপ্লবী সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন তাড়াখাওয়া ঘেয়ো কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, ওই যে তোমাদের সাধের কমরেড দিলীপ গুপ্ত যখন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে, তখন তার কমরেডানি বৌ বিজয়ার পেট খসানোর জন্য আমার গলার দেড় ভরির সরু চেনটা খুলে নিয়ে যাওনি? আমার কাছে স্বামীগিরি ফলাতে এসেছ, না? আহা, হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ। নিজের স্ত্রীর বেলায় ষোল আনা তো নয় একেবারে আঠেরো আনা হিন্দু, আর পরস্ত্রীর বেলায় বিপ্লবী! আমি তো মুখ্যুসুখ্যু মেয়েমানুষ কিন্তু তোমাদের এই ধাপ্পাবাজি"...

ঝনঝন ঝনঝন ঝনঝন। পুতলি জানে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা খাবারদাবার, বাসনপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার শব্দ। পাশের ঘর থেকে পুতলি দেখতে পায় না, বাবা না মা। নির্ঘাৎ মা। চটে গেলে মায়ের ফর্সা মুখ লাল হয়ে যায়, সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, কী যে করে আর না করে কোনো কাণ্ডজ্ঞানই থাকে না। যেসব কথা মা তরতর করে বলে যায় অনেক

সময়ই সে তার মানে কোথাও খুঁজে পায় না। যেমন, পেট খসানো। চলন্তিকা খুলে পেট আর খসানো দুটোই বের করেছে পুতলি। পেট—উদর জঠর। খসা—বিচ্যুত হওয়া, ভাঙিয়া পড়া, ধসা। কিন্তু পেট আর খসা দুটো মিলে কোনো মাথামুণ্ডুই হয় না। পুতলি সত্যি বুঝতে পারে না মা কেন এমন বিদঘুটে বাংলা বলে! বাবার বাংলাও শক্ত, কিন্তু শুনতে কত সুন্দর, অনেকটা কবিতারই মত। তাছাড়া একটু চলন্তিকা ঘাঁটাঘাঁটি করলে একটা কোনো রকম মানে দাঁড় করানো যায়। এই তো বাবার সর্বংসহা, ধরিত্রী, দুটোই সে দিব্যি চলন্তিকায় পেয়ে গেল। দিনের বাবা আর রাতের বাবা একটা জিনিসে এক, চলন্তিকার বাংলায়। সেইজন্যই বোধ হয় বাবা এত বড় মুখ করে নিজেকে পুরুষ বলে। আর মা তো মেয়েমানুষ তাই কথাও বাবার মতো এত ভাল করে বলতে পারে না। আচ্ছা, পুতলিও তো মায়েরই মতো মেয়ে ; তাহলে তার মুখেও কি কখনও বাবার মতো সুন্দর বাংলা আসবে না? এটা ভাবলেই পুতলির মনটা খারাপ হয়। তাই রোজ সে চেয়ার টেনে টেনে বাবার আলমারির উঁচু উঁচু তাক থেকে কত শক্ত শক্ত বই নামিয়ে পড়তে চেষ্টা করে। কোলে তার সবসময় চলন্তিকা।

পুতলির তক্তি : ছাঁচ নং ৩ : রাজপুত্র-রাক্ষস-রাজ…

মা : দেখ, তোমাকে আমি শেষ বারের মত বলছি, আমি কিছুতেই তোমার এই বেলেল্লাপনা সইব না। কী পেয়েছ কি আমাকে? কাঠ না পাথর?

বাবা : আঃ নীলিমা, রোজ রাতে কেন অনর্থক ঝামেলা কর বলতো? আমি লেখক, আমি বুদ্ধিজীবী, বুঝেছ? আমাকে কঠোর সাধনা করতে হয়, তার জন্য রসদ চাই। টলস্টয়ের জীবন পড়েছ, ভিক্টর হুগোর, বায়রনের?

মা : না। আমি কোনো টলস্টয়, কোনো ভিক্টর হুগো, কোনো বায়রন কিচ্ছু পড়িনি। আমি নেহাৎ সাদামাটা মেয়েমানুষ। আমি চাই ঘর-সংসার, একটু শান্তি, একটু মাথা তুলে থাকা। এটা কি এমনই বেশি কিছু, একেবারে আকাশের চাঁদ চাওয়া?

বাবা : সংসার চাও। সাধারণ মেয়ে, সাদামাটা! তা হলে সাধারণ সাদামাটা পুরুষের কাছে যাও না কেন। আমি কি সরকারি অফিসের কেরানী কোনো হরিদাস পাল, যে ১০টা—৫টা ফাইল চষব, ঝাড়নে করে বৌয়ের হাতের রুটি তরকারি টিফিন কৌটোয় বেঁধে অফিস-কাছারি করব, বিকেলে তোমার মতো সাধারণ মেয়ের পাখার বাতাস খেতে খেতে যত খেঁদি-পেঁচি-হাবু-গাবুর বায়না শুনব? ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার একটা মিশন আছে, সমস্ত জীবন ধরে তার জন্য আমার সাধনা, বুঝলে?

মা : না, বুঝিনি। কিসের মিশন, কিসের সাধনা, এমন কোন্ আহা-মরি শেষের সন্ধান?

বাবা : কেন, আমি লিখি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনের সত্যকে তুলে ধরাই আমার লক্ষ্য। এই যে মানুষের এত দুঃখ, এত বঞ্চনা, লাঞ্ছনার যন্ত্রণা—

মা : থাক থাক, হয়েছে। ওসব বস্তাপচা বুলি তোমার পাঠকদের শুনিও। মানুষের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে, এই তো? তাই আমার সংসারে টানাটানি থাক বা না থাক, সেই পার্টিশানের পর দেশ থেকে যত লোক এ বাড়িতে এসে ছিঁচকাঁদুনে আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছে,

কেউ আজ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যায়নি। পাশের বাড়ির ঐ যে ছোকরা কেশে কেশে মরছে তার জন্য তো দুবেলা তোমার চোখের জল ঝরে।

বাবা : হ্যাঁ ঝরবেই তো, একশো বার ঝরবে। আমার মনুষ্যত্ব আছে, মানবিক মূল্যবোধ আছে। চোখের সামনে এরকম অন্যায় দেখে নির্বিকার রয়ে যাব? সমস্ত সভ্যদেশে আজকাল যক্ষ্মা সারিয়ে ফেলা যায়। আর ছেলেটার বাবা-মা নেই বলে কাকা-জ্যাঠারা বিনা চিকিৎসায় ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে দেবে! সব সম্পত্তির লোভ! এই সব মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়ারা জেলের আসামীদের চেয়েও নিকৃষ্ট। একটা জ্বলজ্যান্ত টাটকা যুবককে তিলে তিলে মেরে ফেলছে। এই তো সমাজ, ন্যায়নীতির লেশ মাত্র নেই।

মা : আর আমার বেলাতেই বুঝি খুব নীতিফীতির বালাই আছে? আমার বাবা গরিব, আমাদের স্কুল কলেজে পড়াতে পারেননি, বাড়িতে খালি বাংলাটুকু শিখিয়ে কোনো গতিকে মেয়ে পার করেছেন। ঝি গিরি ছাড়া আমার রোজগারের কোনো রাস্তা নেই। তোমার সংসারে আমিও কি ওই ক্ষয়া ছেলেটার মতো ঘরে-বন্ধ নই? ওর মতো আমারও কি ভেতরটা ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে না?

বাবা : এই তো তোমাকে নিয়ে মুস্কিল, নীলিমা। সব প্রশ্নই তুমি ব্যক্তিগত করে ফেল। আদর্শর সঙ্গে সবসময় জীবনকে মিশিয়ে দাও কেন? সেই জন্যই অযথা অধীর হয়ে পড়। তোমার কষ্টের কী হয়েছেটা কী? খেতে পাচ্ছ, পরতে পাচ্ছ, সমাজে স্ত্রী হিসাবে পরিচয় পাচ্ছ, আবার কী চাই?

মা : ভারি আমার খাওয়া পরা পরিচয়! কিসের পরিচয়? ও তো একখানা লেবেল, অমুকের বৌ। একটা জেলখানার কয়েদিও এসব পায়—খাওয়া পরা লেবেল।

বাবা : আচ্ছা নীলিমা, তোমার কি এত উত্তেজিত হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে? পৃথিবীতে তুমিই তো একমাত্র স্ত্রী নও যাকে স্বামীর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয়? পুরুষের, বিশেষ করে শিল্পীপুরুষের স্বভাবইতো সৃষ্টিছাড়া। আমাদের মধ্যে প্রতিভার যে প্রচণ্ড চাপ তা তোমাদের ঐ ছোটো ছোটো একনিষ্ঠ গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকতে পারে না, সব সীমা ভেঙেচুরে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

মা : তাহলে ঐ ছোটো ছোটো গণ্ডিটণ্ডির মধ্যে আদৌ আস কেন? যাও না, সব কিছুর বাইরে গিয়ে থাকগে যাও। বিয়ে কর কেন?

বাবা : এইটাই তো তোমার ভুল। কী যে মারাত্মক ভুল! চিরকাল তো বাইরে ঘুরে বেরিয়ে থাকা যায় না, ক্লান্তি আসে, ঘরে তখন ফিরতেই হয়। আচ্ছা নীলিমা, তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কর না কেন বলতো? আমাদের মতো পুরুষের জীবনে স্ত্রী হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু, এই স্থির কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করেই তো চারিদিকে নিজেদের বিস্তার করে দিতে পারি। একেবারে যে হারিয়ে যাই না, নষ্ট হয়ে যাই না, সে তো তোমাদের মতো শক্ত খুঁটির জোরেই। তোমার কাছেই যে আমার নির্বিচার আশ্রয়। জান, এইজন্যই আমরা পুরুষরা সাহিত্যে তোমাদের কল্যাণীমূর্তির কত স্তুতি করি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি মেয়েদের ত্যাগ অপরিসীম। সত্যিই তোমরা দেবী।

মা : দেবী? কে দেবী? দেবী তো মাটির পাথরের মূর্তিমাত্র। না, আমি দেবী নই, আমার রক্তমাংসের শরীর। ক্ষিদে তেষ্টা চাহিদা সব আমার আছে। এমন কি মনও আছে। বুঝেছ? মন বলে একটা জিনিস আছে যেটা কোনো জন্মে কোনোদিন কোনো কিছুই ত্যাগ করতে চায়নি, চায় না, না না। ত্যাগ! কল্যাণী মূর্তি! তোমরা মেয়েদের কষ্ট না দিয়ে, যন্ত্রণা না দিয়ে সৃষ্টি করতে পার না কেন? কেন, কেন, কেন....?

ঠক্ঠক্ ঠক্ঠক্ ঠক্ঠক্ ঠক্···। জোড়া আলমারি দুটোর মাঝখানে যে ফাঁকা দেওয়ালটুকু আছে, পুতলি জানে, মা এখন সেইখানটায় মাথা ঠুকছে। আর তো জায়গাই নেই ও ঘরে, বাকি দেওয়াল সব বইয়ের আলমারি-র‍্যাকে ঠাসা। এই রকম মাথা ঠুকে ঠুকেই কবে কখন মাথা ফেটে লাল রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। মায়ের সিঁথির সিঁদুর দেখলেই পুতলির মনে হয় যেন কত কত বছরের বন্ধ দেওয়ালে মাথা ঠোকার চিহ্ন। আর মায়ের এই কেন-কেন-কেন অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে সবখানে। পুতলিকেও বেশ দিব্যি কেন-রোগে পেয়ে বসেছে। সরকারি অফিসের কেরানীকে হরিদাস পাল বলে কেন? কেন? এ বাড়িতে যারা যাতায়াত করে তারা হয় বাবার মতো, লেখে, কেউ বা ছবি আঁকে, নয় তো খদ্দর পরে। অন্য কোনো রকম মানুষ পুতলি দেখে না। কেন? বাবা বলে যারা খদ্দর পরে, যারা দেশের কাজ করে, লিখিয়ে-আঁকিয়েদের মতো তাদেরও আদর্শ আছে, তাদেরও নাকি সাধনা আছে। মা কিন্তু মুখ বেঁকায়। "ঘোড়ার ডিমের আদর্শ। ঐ তো ছবি আঁকিয়ে পঙ্কজ সেন, ও তো নিজে মুখেই বলত, 'পার্টিতে ঢুকেছিলাম গৌরীর জন্য, আহা কী অপরূপ রূপ! তখন কি আর জানি সে নাচছে মোহনের কপালে। মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে এখন তো প্যারিসে, ফরাসী বৌ নিয়ে ফিরল বলে। ভারি আমার আদর্শ! বালিগঞ্জের বিপ্লবীদের মতো আদর্শ হল তোমাদের একটা ফ্যাশান। আর শুধু ফ্যাশানই নয়, যা ইচ্ছে তাই করার চাবিকাঠি। শিল্প, সাহিত্য, দেশোদ্ধার—হুঁ! নাম করলেই চিচিংফাঁক।"

পুতলি কিন্তু বাবার কথাই বিশ্বাস করে। সে জানে আদর্শ জিনিসটা মোটেই ফেলনা নয়। বাবার মুখে অনেকবার শুনে শুনে সে শিখে গেছে পৃথিবীতে দুরকমের মানুষ হয়— একদল বাবা আর বাবার বন্ধুদের মতো লেখক, শিল্পী, দেশপ্রেমিক—বাবা যাদের বলে আদর্শবাদী। আর অন্যদল হল বুর্জোয়া, হরিদাস পাল। এরা খায়দায় ঘুমায়, টাকা রোজগার করে, ব্যস। অর্থাৎ বাবার চলন্তিকার ভাষায় মানব সভ্যতার বিবর্তনে এদের কোনো অবদান নেই। এই অবদান কথাটা একেবারে আণ্ডার লাইন করা, যেন মাস্টারমশাই শক্ত বানানের তলায় লাল পেনসিলে বেশ করে ধরে ধরে লাইন কাটছেন, পুতলিকে আবার মুখস্থ করতে হবে তো। সবাই বলে বাবার অনেক অবদান আছে ; সেইজন্যই বোধ হয় সকলে সবসময় পুতলিকে বলে অমুকের মেয়ে। এইটা পুতলির খুব আশ্চর্য লাগে। কই রাজকন্যাকে তো কেউ কক্ষনো অমুকের মেয়ে বলে না। রাজকন্যা শুধুই রাজকন্যা। পরমাসুন্দরী, দুধে আলতা গায়ের রঙ, পটলচেরা চোখ, বাঁশির মত নাক, মেঘের মত চুল। নাঃ, পুতলির এসব কিছুই নেই, সে তো অনেকটা বাবার মতই দেখতে। কিন্তু রাজকন্যা

তো রাক্ষসের হাতে বন্দী থাকে বলেই রাজকন্যা। নইলে তো তাকে রাজপুত্র চিনতই না। পুতলি জানালার আল্‌সেতে বসে গরাদের ফাঁকে ফাঁকে দেখে আকাশ। কবে কখন এই আকাশ দিয়েই উড়ে আসবে পক্ষীরাজ ঘোড়া।

"আচ্ছা নামনেইদা, তুমি কখনো পক্ষীরাজ ঘোড়া দেখেছ?"

"কেন? হঠাৎ পক্ষীরাজ ঘোড়া দিয়ে কী হবে?"

"বাবা বলে কিনা আমার এই ঘুরে বেড়ানো, বাড়ি থেকে চলে যাওয়া—এসব বাতিক একদম ভাল নয়। রাজকন্যা কি কোথাও যায়? রাজপুত্রই পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে তার কাছে আসে। তাই ভাবছিলাম কি তুমি যদি একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া পেতে তাহলে তাতে আমাকে চাপিয়ে এক্ষুনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারতে।"

"কোথায় নিয়ে যেতাম তোমাকে?"

"ঐ অনেক অনেক দূরে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে অন্য কোনো দেশে, যেখানে কেউ আমাকে চেনে না, আমার নামই জানে না।"

"নাম না জানলে কী লাভ হবে তোমার? তুমি যে পুতলি তাই তো কেউ বুঝবে না।"

"বাঃ সেই তো চাই। আমি যখন দোলনায় দুলতে দুলতে অনেক অনেক ওপরে উঠি সামনে দেখি খালি আকাশ আর আকাশ, তখন মনে হয় আমি খালি আমি, আর কিচ্ছু নই, কেউ আমাকে কোনো নামে তখন ডাকে না। কী যে ভীষণ ভীষণ আনন্দ হয় আমার। জান, আমার এত ভাল লাগে।"

"কিন্তু আমার যে অসুখ বেড়েছে পুতলি, গায়ে মোটে জোরই নেই। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় যে আমি নিজেই চড়তে পারব না, তোমাকে নিয়ে যাব কী করে?"

"তাহলে কী হবে?"

"কোনো চিন্তা নেই। অনেক সময় আছে। গল্পে কি রাজকন্যা তোমার মতো মোটে আট বছরের? তুমি বড়ো হও, ঠিক দেখবে রাজপুত্র এসে যাবে। তার থাকবে কি সুন্দর সাদা ধবধবে পক্ষীরাজ ঘোড়া ; তাতে তোমাকে বসিয়ে নিয়ে যাবে নতুন দেশে, যেখানে তুমি হবে শুধু তুমি, কোনো নাম থাকবে না, ঠিক যেমনটি তুমি চাও।"

"তুমি ঠিক জান রাজপুত্র আসবে?"

"নিশ্চয়ই আসবে।"

"তিন সত্যি কর।"

"সত্যি সত্যি সত্যি।"

এমন এক একদিন আসে যখন বাস্তবের সঙ্গে পুতলির তক্তির কোনো ছাঁচই মেলে না। একদিন যায় দুদিন যায় বাবা ফেরে না। তিন দিনের দিন কত রাতে অন্য লোকেরা বাবাকে নিয়ে আসে, ধরাধরি করে শোবার ঘরে পৌঁছে দেয়। তখন আর কোনো কথাই হয় না, চলন্তিকা হার মানে। এ কদিন মায়ের খাওয়া নেই ঘুম নেই। পরমাসুন্দরী রাজকন্যার চোখের কোলে ঘন অন্ধকার। নামনেইদার মতো, ঘর থেকে বেরুবার কোনো আশাই নেই। আসলে তখন গল্পটল্প, রাজকন্যা রাজপুত্র কোনো কিছুই মনে পড়ে না

পুতলির। চারিদিকে খালি কষ্ট। সকাল হয়। পার্কে না গিয়ে আজ পুতলি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে। মা এসে হাত ধরে টেনে তোলে, বাবার সামনে নিয়ে হাজির করে। পুতলি দেখে তার এতকালের চেনা বাবা কোথায় হারিয়ে গেছে। তালপাকানো চিনিজ্বাল দেওয়া নারকোল বাটার স্তূপ পড়ে, কেনো ছাঁচেই পরিচয় মেলে না। না পদ্ম, না শাঁখ, না মাছ। সেবার পার্কের পুকুরে পুবদিকের কোনায় শান্তির মার সঙ্গে সরস্বতী ঠাকুর ভাসান দিয়ে এসেছিল পুতলি। পরে একদিন ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে তো অবাক ; কোথায় প্রতিমা, কোথায় মুক্তাহার, শ্বেত পদ্মাসন, কোথায়ই বা বাহন রাজহাঁস! যা ছিল বীণা পুস্তক হস্তে কমল লোচনা-ভগবতী ভারতী, তা হয়ে গেছে এক তাল কাদা। না আছে রূপ, না আছে রঙ, না আছে অর্থ। এই এক তাল কাদার কাছেই তো সেদিন মা বলেছিল সে তো লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু ঠাকুর তার মেয়ে যেন শেখে। পুতলিকে কত যত্নে বসিয়ে বেলপাতায় গঙ্গাজল-দুধে খাগের কলম ডুবিয়ে ধরে ধরে লিখিয়েছিল শ্রীশ্রীসরস্বতৈ নমঃ, শ্রীশ্রীসরস্বতৈ নমঃ, শ্রীশ্রীসরস্বতৈ নমঃ। আজকে বাবার নিচু মাথা বন্ধ মুখ দেখে কেন জানি পুতলির মনে পড়ে বাগ্‌দেবী বিসর্জন। এদিকে তার সামনে এক অজানা নাটকের অভিনয় চলেছে। "নিজের মেয়ের মাথায় হাত রেখে তুমি বল···"। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে মায়ের জেরাগুলো যন্ত্রণা। রান্না খাওয়া সব মাথায় ওঠে। শেষে কতক্ষণ পরে নস্যিরঙের ঢাকনা দেওয়া ছোট স্যুটকেসটা আলমারির মাথা থেকে নামিয়ে এনে মা হাতের কাছে যা পায়, এলোমেলো কতগুলো জামাকাপড় ভর্তি করে পুতলির হাত ধরে চলে যায় দাদুর বাড়ি। সেখানে মোটে দুটো ঘর, একতলা স্যাঁতসেঁতে। তবুও পুতলির খুব আরাম লাগে। বাইরের ঘরে সে একটা জানালার আলসেতে বসে পড়ে 'নীল পাখী'। আর তার দু বছরের বড় মামু অন্য জানালায় বসে একমনে সেফটিপিন চোষে। পুতলির আর মামুর খুব ভাব। বড়োদের সম্পর্কে সব শলাপরামর্শ তারা একসঙ্গে করে। তখন অন্য ঘরে বেঞ্চিতে সারি করে রাখা ট্রাঙ্কের ওপর থাক থাক রাখা তোষক বিছানার মাথায় দুজনে চড়ে বসে থাকে। দাদু পুতলিদের বাড়ি গেলে প্রায়ই পুতলি দাদুর হাত ধরে এ বাড়িতে চলে আসে। একদিন আধদিন কাটিয়ে দেয় মামুর সার্ট আর হাফপ্যাণ্ট পরে। বাবা কিন্তু পুতলির এ বাড়িতে থেকে যাওয়াটা বেশি পছন্দ করে না। এবারে তিনদিন যেতে বাবা এসে হাজির। চিরকালের চেনা বাবা। "খুব মামাবাড়ির আদর খাওয়া হচ্ছে ; মামার বিয়ে হলে বুঝবি। মামাবাড়ি ভারি মজা কিলচড় নাই/ মামী আইল ঠ্যাংগা লইয়া পরাণ লইয়া ধাই।" হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। সবাই খুব হাসে। তারপর দাদুর সঙ্গে বাবার নিচু গলায় কী যেন কথা হয়। ও ঘরে মা চুপটি করে বসে। দাদু এসে মাকে আস্তে আস্তে কত কী বলে। মা অনেকবার মাথা নাড়ে। মাঝে মাঝে জোরে বলে ওঠে "খালি অমুকের স্ত্রী অমুকের স্ত্রী।" দাদু মায়ের মাথায় পিঠে হাত বোলায়, বারান্দা থেকে পুতলিকে ডেকে এনে মায়ের হাতে তার ছোটো হাতখানা ধরিয়ে দেয়। ট্যাক্সি ডাকা হয়। বাবা-মার সঙ্গে বাড়ি ফেরে পুতলি। দরজায় পা দিতে না দিতেই শান্তির মা বলে, "ওমা পুতলিদিদি তুমি তো দুদিন ছিলে না, এদিকে তোমার নামনেইদার কি হয়েছে জানো? আহা, অমন সোন্দর চাঁদের মত ছেলেটা!

পরশু রাতে কী রক্তবমি, ঘর বিছানা একেবারে ভেসে গিয়েছিল গো। আমার ঠাকুরঝি তো ও বাড়িতে কাজ করে, বলে "বৌদি, কী রক্ত কী রক্ত, সে চোখে দেখা যায় না…"

"হয়েছে হয়েছে, আর এতটুকু বাচ্চাকে এসব অসুখবিসুখের কথা সাতখানা করে বলতে হবে না।"

বাবার ধমকে শান্তির মা চুপ। এক ঝটকায় মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে সোজা পড়ার ঘরে চলে যায় পুতলি, সামনে নামনেইদার জানালা খোলা, ঘন কালির ভেতর ডুবে থাকা চোখ জোড়া নেই, বালিসে হেলান দেওয়া নেই কোনো পাতলা ফর্সা মুখ— বিছানাটাই নেই। সব ফাঁকা। যেন কোনো দিনই কিছু ছিল না। আর এক দৌড়ে ফিরে আসে পুতলি।

"বাবা, বাবা, নামনেইদা কোথায়?"

"ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, অসুখটা একটু বেড়েছে কিনা। তুই এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি। নরেশ দেখ গিয়ে তোর জন্য কত মন কেমন করছে। প্রত্যেকদিন জিজ্ঞাসা করত শান্তির মাকে, পুতলিদি কবে আসবে। যা, আজ বিকেলে নরেশকে নিয়ে পার্কে দোলনায় দুলে আয়।"

পুতলি কিছু বলে না, চুপ করে শোনে। দুপুরে খেতে বসে পুতলি আর বাবা। এক হাতা বিটের ডালনা দেয় মা পুতলির থালায়। সোনার মতো ঝকঝকে কাঁসার থালায় ছড়িয়ে পড়ে লাল টুকটুকে রঙ। নামনেইদার চারিদিকে কি এমনই লাল রক্ত। হাত গুটিয়ে নেয় পুতলি। না, সে খাবে, না। মা বিরক্ত হয়। এই অবুঝ জেদী মেয়ে নিয়ে তার হয়েছে এক যন্ত্রণা। কিছুতেই খাবে না। "আহা, থাকই না। একদিন বিটের তরকারি না খেলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে না। সবসময় ওকে তাড়না কর কেন? শিশুদের মন কোমল বাবার বক্তৃতা।…" পুতলি খাওয়া ফেলে উঠে যায়। আজকে আর রাজকন্যা-রাজপুত্রের গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না। পড়ার ঘরে জানালায় গিয়ে বসে পুতলি। কাক ছানা পোনারা কী করছে দেখা যাক। ও মা, বাসাটা যে একেবারে খালি। কোথায় গেল সব? পুতলির মনে পড়ে ক'দিন ধরেই দেখছিল ছানাগুলো একটু একটু উড়তে চেষ্টা করছে। তখনো অবশ্য বাবা-মার মত হৃষ্টপুষ্ট হয়নি, তবু কাক বলে অন্তত চেনা যায়, একটু ছোটখাট রোগা-রোগা এই যা। তাহলে সব উড়েচলে গেছে। ঐ আকাশে। গরাদের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখে পুতলি। যত জোরেই পুতলি দোলনা ওপরে তুলুক না কেন, সে খালি এক মুহূর্তের জন্য আকাশ ছুঁতে পারে। আর কাকছানারা কেমন দিব্যি আকাশের কোলের মধ্যে উড়ে চলে যায় কোথায়, হয়তো বা নতুন কোনো দেশে।

আজ চারটে বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে পড়ে পুতলি। না, দোলনায় দুলতে নয়। দোলনায় চড়ে কী হবে, শুধু তো নিমেষের জন্য আকাশ ছোঁওয়া, পরক্ষণেই তো নিচে, মাটির দিকে নেমে আসতে হয়। না, ফুলও তুলবে না, বিকেলবেলা তো ফুল তোলার সময় নয়। পুজো তো সব সকালে হয়। সে সময় চলে গেছে বহুক্ষণ। ছোটো ছোটো পা ফেলে পুতলি চলে।

রাস্তা পার হতে হবে, ও পারে পার্কের গেট। মোড়ের মাথায় ভুবন দোকানের ঝাঁপ খুলেছে। এখান থেকে পুতলি সবসময় বিস্কুট লজেন্স কেনে। পয়সা না দিয়েও কেনা যায়। মাসের শেষে ভুবন বাড়িতে এসে মায়ের কাছ থেকে সব পয়সা নিয়ে যায়। যেদিন বিকেলে গান্ধীজি মারা গেলেন, তারপর দিন তো পুতলিদের বাড়িতে উনোন জ্বলেনি, বাবা বলেছিল, "নিদারুণ বিপর্যয়, খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছা হয় কারো ; আজ শোকের দিন।" পুতলির কিন্তু খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। পার্কে যাবার সময় দেখে ভুবনের দোকান বন্ধ, পাশে খুপরি জানালা খুলে ভুবন দাঁড়িয়ে, ওখানেই ও থাকে কি না। পুতলি ডেকে বলল, "ও ভুবনদা খুব খিদে পেয়েছে। আমাদের বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। আমাকে বিস্কুট দাও।" ভুবন তাড়াতাড়ি চোখ পাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল চেপে মাথা নাড়ল। কিন্তু আস্তে আস্তে এদিক ওদিক তাকিয়ে চট্ করে ঝাঁপ খুলে সামনের বোয়মটা থেকে চারটে ক্রিম বিস্কুট বের করে পুতলির হাতে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল "কাউকে ব'লো না যেন।" একবার পুতলি ভাবল আজকেই সেদিনের মতো ভুবনদার কাছ থেকে ক্রিম বিস্কুট নিয়ে গেলে হয়। কিন্তু তার যে খিদে নেই মোটেই। তাহলে আজকে কি বাবা সেদিন যা বলেছিল তাই, শোকের দিন? চলন্তিকা খুলে পুতলি দেখেছে, শোক—ইষ্ট বিয়োগজনিত দুঃখ। আবার ইষ্ট বিয়োগ মানে আত্মীয় বিয়োগ। বিয়োগ, অর্থাৎ কিনা বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, অভাব। পরিষ্কার মনে আছে পুতলির বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, অভাব। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে পুতলি। পার্কে ঢুকে সোজা চলতে থাকে উত্তর-পুব দিকে। রেলিং টপকে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ে সীমানার বাইরে। সামনে খাল। দুদিকে মাঝে মাঝে কাঠের গুদাম। এখানে কুলিকামিন দিনমজুর ছাড়া বিশেষ কেউ আসে না। আস্তে আস্তে পুতলি উত্তর দিকে খাল বরাবর এগিয়ে চলে। জল থেকে জমি অনেক ওপরে। এবড়ো খেবড়ো পাড়, বেশি খাড়াই নয়। একটু দূরে দেখে একটা ছোটো নৌকো। ঠিক যেমনটি গল্পের বইতে থাকে। নৌকো আঁকতে হলে পুতলি সবসময় এই রকম নৌকোই আঁকে। এমন কি মাঝখানে ছোটো এতটুকু ছইও আছে। মানুষজন কেউ কোথাও নেই। যেন নৌকোটা আপনি আপনিই ভেসে এসেছে, আবার নিজে নিজেই ভেসে চলে যাবে কোথায় কে জানে। চটি জোড়া পুতলি খুলে রাখে পাড়ে। তারপর বসে প'ড়ে দুহাতে মাটিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে লাফিয়ে পড়ে। ও মা, নৌকোটা যে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করছে। আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল বলে। গলুইটা চেপে ধরে সামলে নেয় পুতলি। ছইয়ের মধ্যে ঢুকে উঠে বসে, দুদিকে আবার কাপড় দিয়ে পর্দার মতো ঢাকা। বেশ ভালই হ'ল, বাইরে থেকে পুতলিকে কেউ আর দেখতে পাবে না। তবে কী ভীষণ নোংরা কাপড়টা, কী বিচ্ছিরি মেছো মেছো গন্ধ! ঝট করে ফ্রকের একটা কোণ তুলে নাকে চেপে বসে থাকে, এখানে কেউ তো আর তাকে দেখছে না। একটু বাদে নৌকোটা খুব দুলে উঠল, বেশ ভারি পায়ে কে যেন এসে উঠল। খুটখাট আওয়াজ, দড়ি খোলার শব্দ। জলে ছপ্ ছপ্ করে যেন কী পড়তে লাগল। আরে নৌকোটা চলতে শুরু করেছে যে! এতদিনে সত্যি সত্যি পুতলি চলে যাচ্ছে। এই নৌকোয় করে পুতলি চলে যাবে কোথায়, সেই বড়ো

নদীতে, সেখান থেকে সমুদ্রে আর সমুদ্রে, যেমন সাত সমুদ্র তেরো নদী—নাঃ বড্ড গন্ধ। পুতলির কী রকম বমি-বমি লাগছে। কিন্তু বেরুলেই যে লোকটা দেখতে পাবে আর নির্ঘাৎ জিজ্ঞাসা করবে, কার মেয়ে, কী নাম। তাহলে কী করে হবে। কী করা যায়। হঠাৎ পুতলির মাথায় একটা বুদ্ধি এল। যে দিকে বসে লোকটা নৌকো বাইছে, ছইয়ের কাপড় তুলে আস্তে আস্তে তার উল্টো দিকে বেরিয়ে এসে বসে পুতলি। বাবাঃ। এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচে। এখন বেশ ভালো লাগছে। তবে নৌকোটা যাচ্ছে খুব আস্তে আস্তে। এ তো অনেক অনেক দেরি হবে সমুদ্রে পৌঁছাতে। সামনে কাঠের গোলা ছাড়িয়ে যায় একটা, এই আর একটা। হঠাৎ কে যেন এ পাড় থেকে বলে ওঠে, "আরে এযে পুতলি দিদি। ও পুতলি দিদি তুমি ও নৌকোয় চড়ে বসে আছ কেন?"

"ভজুদা আমি নৌকোয় করে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। বাড়িতে থাকব না। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।" পুতলির কথা শেষ হতে না হতেই ভজু তো প্রচণ্ড হৈ চৈ রৈ রৈ লাগিয়ে দিয়েছে। "নৌকো থামা, নৌকো থামা। ওরে কে কোথায় আছিস শিগগিরি আয়। বাবুদের বাড়ির মেয়েকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ধর ধর ধর…"

দেখতে না দেখতে পিল্‌পিল্‌ করে কত লোক বেরিয়ে এল। চারিদিক থেকে লোক নেমে এসে নৌকো আটকায়। পুতলিকে কোলে তুলে পাড়ে নিয়ে আসে ভজু। এদিকে মুখ তার সমানে চলছে, "অমুকবাবুর মেয়ে। আমি সে বাড়িতে কত বছর কাজ করেছি, ওকে তো আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। কী-কাণ্ড, কী কাণ্ড। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল, ভগবান রক্ষে করেছেন।" তখন মাঝিকে নিয়ে এক মহা ঝঞ্ঝাট। সে বেচারা যত বলে—সে এসবের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না, পুতলিকে সে কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখেইনি, নৌকোতে কোনো বাবুদের বাড়ির বাচ্চাকে তোলবার কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। সে গরীব মানুষ, নৌকোতে মাল আনানেওয়া করে বৌ-বাচ্চার মুখের ভাত জোগায়—কিন্তু কে শোনে কার কথা। "বেটা বদমাশ, ন্যাকামি হচ্ছে, ছেলেধরা কোথাকার।" দমাদম মার পড়তে থাকে। তখন বুদ্ধি করে পুতলি বলে ওঠে, "ওকে মেরো না, মেরো না। ও সত্যি কিছু জানে না। আমি খালি নৌকোতে উঠে ছইয়ের মধ্যে বসেছিলাম। ও যখন নৌকোতে এল, আমাকে দেখতেই পায়নি। পরে আমি বাইরে এসে বসলাম, তখন ভজুদা আমাকে দেখল।' যাই হোক মাঝিটা তো মানে মানে ছাড়া পেল। ভজু, কাঠগোলার আরও কয়েকজন লোক মিলে পুতলিকে বাড়ি নিয়ে এল। বাবাকে টেলিফোন করল মা। তাড়াতাড়ি আড্ডা থেকে চলে এল বাবা।

"দেখ, মেয়ের কীর্তি দেখ একবার। খালে নৌকোয় চেপে সমুদ্রে যাচ্ছিল। চিরকাল জেনেছি ছেলেরা সন্ন্যাসী হয়, সংসার ত্যাগট্যাগ করে। কোনো মেয়ের স্বভাব যে এরকম বাউণ্ডুলে হতে পারে তা তো বাপের জন্মে শুনিনি। কতবার বলেছি, ওকে ইস্কুলে দাও ইস্কুলে দাও। তাতো শুনবে না। আহ্লাদ করে বাড়িতে রেখে দেবে। মেয়ে একা একা টৈ টৈ করে বেড়াক আর যত রাজ্যের বড়োদের বই পড়ুক। নাও, এখন ঠেলা সামলাও।"

"না, তুমি ঠিকই বলেছ। এখন দেখছি ওকে স্কুলে দেওয়া নেহাৎই দরকার। একা বাড়িতে ওর মন টেঁকে না, নিঃসঙ্গ তো। আর পাঁচটা মেয়ের মতো সংসার করতে হবে

একদিন, এত উদাসীন হলে চলবে কী করে। নাঃ এই বছরই ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে। সবে তো মাস তিনেক হয়েছে নতুন বছরের। চেনাশোনা কত আছে, দেখি বলেটলে।”

পরের দিন দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে কথা হয় পুতলির আর বাবার। “তুই তো ভারি বোকা মেয়ে, মারাঠা ডিচ দিয়ে সমুদ্রে যাচ্ছিলি। একেবোরে হাঁদারাম! এত বই পড়িস, ঘটে তবু কিছু বুদ্ধি নেই। আরে ও খাল তো মানুষ হাতে কেটে করেছে, বাইরে থেকে যাতে ডাকাত বদমাস দস্যু না ঢুকতে পারে, তাদের আটকাবার জন্য। ভেতরের লোককে পালাতে দেবার জন্য নয়। দেখেছিস তো, কেমন নোংরা ঘোলা জল, কোনো ঢেউ নেই, যেন একটা ময়লা নালা।” সত্যিই তাই। এবারে বুঝতে পারে পুতলি। এখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তাই নেই। হয় শঙ্করদা হাত ধরে নিয়ে আসে, নয় ভজুদা কোলে করে বাড়ি পৌঁছায়। সবাই ওকে চেনে, ওর নাম জানে। পুতলি, অমুকের মেয়ে। যেমন মা, অমুকের স্ত্রী। আকাশের দিকে চেয়ে টেলিফোনে গল্প করে, কখনও বা দুদিনের জন্য বাপের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সবই খালের নৌকো, কোনোটাই সমুদ্রে যায় না।

নোনা সাগরের কান্নায়

মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত

পুরীর সমুদ্রবেলা। সূর্য ক্রমশ পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ছে। সাগরে জোয়ার এসেছে। জল এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। তটভূমিতে নানাশ্রেণীর পর্যটক, নানা মানুষের ভীড়। নানা বয়স, নানা আকৃতি, নানা বেশভূষা। অক্টোবর মাস। শরতের আকাশ জুড়ে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। সাদা মেঘের গায়ে পড়ন্ত বেলায় রাঙা আভা নানা ছটায় ব্যাপ্ত।

সঞ্জয় আজ হোটেল থেকে বেরিয়েছিল বেলা দু'টোর সময়। হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল চক্রতীর্থে। সেখানে সোনার গৌরাঙ্গ দেখে ঝাউবনের ছায়ামাখা পথ ধরে অনেকক্ষণ হেঁটেছে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে জেলেপাড়ায়। নুলিয়াদের আস্তানায়। শত সহস্র দারিদ্রলাঞ্ছিত পরিবেশ দেখে সঞ্জয়ের নিসর্গ প্রকৃতিকে বড় স্বার্থপর মনে হয়। এতটুকু সবুজের ছোঁয়া নেই কেন জেলে বস্তিতে?

ভাবনায় আছড়ে পড়ে গর্জন! না, সাগরের নয়, শমিতের চিৎকার। "জানো না? কে স্বার্থপর? কারা স্বার্থপর?"

ঝাউ গাছের শাখায় পাতায় ওঠে প্রতিধ্বনির কোরাস 'কারা? কারা? কারা'? সঞ্জয়ের বুকটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে জেলে বস্তী ছাড়িয়ে এবার দক্ষিণ দিক বরাবর চলতে থাকে। এক সময় স্বর্গদ্বারে পৌঁছায়। সামনেই শ্মশান। বালুর ওপর একটা চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। জ্বলন্ত চিতার থেকে মাত্র তের চৌদ্দ গজ দূরে সেই যুবকটি দুই হাঁটু ভাঁজ করে কেমন এক হতাশ ভঙ্গীতে বসে আছে। যুবকটির বয়স আঠাশ হবে। দামী পোশাক, ধবধবে ফর্সা রং, দোহারা লম্বা গড়ন, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ মাথাভর্তি কালো মিশমিশে চুল! এক কথায় অতি সুদর্শন যুবক বলা যায়। গত দু দিন ধরেই যুবকটিকে সঞ্জয় দেখছে। সঞ্জয়ের মতই যুবকটি একা একা ঘোরে, বহু রাত পর্যন্ত সমুদ্রের পাড়ে থাকে। সঞ্জয় কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। যুবকটি কি কোনও নিদারুণ আঘাতে জর্জরিত হয়ে এ স্থানে এসেছে? সে কি সঞ্জয়ের মত কোনও প্রিয়জনকে হারিয়েছে?

যুবকটি এক সময় উঠে দাঁড়াল। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে পা ফেলতে ফেলতে এগোয়। সঞ্জয়ও চলতে থাকে যুবকটির সমান্তরাল পথ ধরে। তবে কিছুটা ব্যবধান রেখে। এক সময় ওরা হরনাথ আশ্রমের কাছে পৌঁছয়। সেখানে পুরনো আমলের কিছু ঘরবাড়ি। গাছপালা খুবই কম। মানুষের ভীড়ও নেই। শুধু বালু আর বালু। আর সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত উথাল পাথাল সাগর।

সন্ধ্যা নামছে। যুবকটি তটভূমির ঢাল ধরে নামতে থাকে। প্রায় জলের কাছাকাছি চলে যায়। হঠাৎ বিরাট একটা ঢেউ উন্মত্তের মত ছুটে আসতে যুবকটি দ্রুত পায়ে পিছু হটতে গেলে সঞ্জয়ের সঙ্গে লাগে ধাক্কা।

এই হল পরিচয়ের প্রথম সূত্রপাত। সেই সূত্র ধরে দুজনে পাশাপাশি চলতে শুরু করে। কথা বলতে বলতে উল্টো দিকে এগোয়। স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে আরও কিছুটা উত্তরে

এগিয়ে ওরা সাউথ ইস্টার্ণ হোটেলের সামনে উপস্থিত হয়। জায়গাটা ভারী চমৎকার। ঝাউবনকে পেছনে রেখে ওরা দুজনে বালিয়াড়ির উপর বসে। কাছাকাছিই বসে। চারদিক ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। আকাশে শুক্ল পক্ষের বাঁকা চাঁদ। একটি দুটি করে অনেক তারা ফুটে উঠলো। এতক্ষণে যুবকটি তার পরিচয় দিল, আমার নাম রবীন রায়। চব্বিশ পরগণার কুসুমপুরে আমাদের আদি বাড়ি। বর্তমান নিবাস বারাসাত—কি করেন? চাকরি?

—না না চাকরি বাকরি করি না। বাবার হোটেলেই আছি। দিব্যি খাই দাই, আড্ডা দেই, সিনেমা থিয়েটার দেখি। আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ি দেশভ্রমণে। বেকার? অথচ দিব্যি আছেন?

ছোটোখাটো একটা বিজনেস শুরু করেছি অবশ্য! তাতে এখনও বিশেষ আয় নেই।

লেখাপড়া?

এম. কম পাশ করেছি।

সঞ্জয় বুঝে নিল যুবকটি অতি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং সংসারের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

দু দিনেই সঞ্জয় ও রবীন সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। সঞ্জয় চেয়েছিল নিঃসঙ্গতা। ভেবেছিল নিঃসঙ্গতা তাকে শান্ত করবে, শান্তি দেবে, প্রতি মুহূর্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই তো মানুষ। মানুষ যেখানে সেখানে একাকীত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। সঞ্জয় কিন্তু মনে মনে অখুশী নয়। তার একাকীত্ব তাকে বিন্দুমাত্র স্বস্তি দেয়নি। শান্তি দেয়নি। মানুষের সংস্পর্শে আসার তাগাদাও অনুভব করেছে! তাই যদি না অনুভব করবে তো রবীনের পিছু পিছু হরনাথ আশ্রম পর্যন্ত যাবেই বা কেন?

ওরা দুজন উঠেছে দুই হোটেলে। এক জন বীচ হোটেলে। অন্যজন রেণুকা হোটেলে। কাছাকাছি দুটি হোটেল। সাগরের কাছেই। রবীন এর আগে একবার পুরী এসেছিল। সঞ্জয় আসেনি। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্জয়ের চেয়ে রবীনের বেশী। সে দিল্লী, আগ্রা, রাজস্থান, মুসৌরি, বেনারস, দার্জিলিং, দীঘা—এসব স্থান দেখেছে। সঞ্জয় কলকাতা ছেড়ে এর আগে একবার মাত্র গেছে। তাও বেশী দূর নয়। বীরভূমের শান্তিনিকেতনে। রবীনের মুখে ওর ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনতে সঞ্জয়ের খুব ভাল লাগছে। রবীন সুন্দর করে বলতেও পারে। ওরা প্ল্যান করল দুজনে একসঙ্গে ভুবনেশ্বর যাবে এবং সেই সঙ্গে খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখে আসবে।

পর দিন। বাসে ওরা উঠলো। তখন সকাল সাতটা। সঙ্গে নিল থার্মোফ্লাস্কে চা, কেরিয়ারে পাউরুটি, জেলি, কলা, ডিম সেদ্ধ এবং বিস্কুট, সন্দেশ। বাস চলেছে পুরী শহর অতিক্রম করে। ঘণ্টা দেড়েক পর পৌঁছলো ভুবনেশ্বর! ভুবনেশ্বরকে মন্দির শহর বলা যায়। বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখা হল। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের গায়ে অতুলনীয় স্থাপত্য শিল্প কাজ দেখলো, কিছুক্ষণ সেখানে বসল। বাজারটা ঘুরে দেখলো। দু'বার চা টা সহযোগে খেয়ে ওরা যখন বাসে উঠলো তখন বেলা দেড়টা।

আবার বাস। বাস এবার খণ্ডগিরি উদয়গিরির দিকে। ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র পাঁচ ছয় মাইল দূরত্বে এই দুটি পাহাড় ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খণ্ডগিরি উদয়গিরি পাশাপাশি কাছাকাছি দুই পাহাড়। দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পীচ ঢালা সড়ক। দুই পাহাড় যেন দুই যমজ বোন। ইতিহাসের অসংখ্য অক্ষর অস্তিত্বে নিয়ে বর্তমানকে হাতছানি দিচ্ছে। উড়িষ্যার রাজা খারবেল। তার রাণী, অমাত্যদের নিয়ে কতবার এই পাহাড়ি স্থানের সোপানগুলি ধরে উঠে গেছে শিখরের মন্দিরে। মহাবীরের মূর্তির সামনে অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে সমৃদ্ধির, নিরাপত্তার ও শান্তির।

রবীন ও সঞ্জয় ইতিহাসের ভাবনা নিয়েই বুঝি মৌন হয়ে যায়। তারা শিলাময় সোপান ধরে এগোয়। খণ্ডগিরির গুহা চৈত্যের ভাঙাচোরা ক্ষুদ্র কুঠুরিগুলির দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে। কোন সুদূর অতীতে ঐ কুঠুরিগুলিতে জৈন শ্রমণেরা ভিক্ষুরা কঠোর সাধনায় রত থাকতো। আজ তার কোন চিহ্ন নেই। রবীন বলে "কুঠুরীগুলির ছাদ কি নীচু। স্তব্ধ অতীত যদি কথা কয়ে ওঠে তো শোনা যাবে কত যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস।"

সঞ্জয় প্রশ্ন করে, যন্ত্রণা বলছেন কেন? সাধনা কি যন্ত্রণা? অবশ্যই আত্মপীড়নের নামান্তর। আজ থেকে দু হাজারের বছরেরও বেশী আগে এ স্থান ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। হিংস্র জন্তুরা থাকতো, চলে বেড়াতো বিষাক্ত ভয়ংকর সব সাপ। এই পাহাড় ছিল দুর্ভেদ্য, দুর্গম, বসতির থেকে বিচ্ছিন্ন। কত তাজা তরুণ ঘর সংসার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এইখানে আত্মপীড়নের যন্ত্রণাকে মেনে নিয়েছে। কত তরুণ হিংস্র জন্তুর হাতে মরেছে। সাপের ছোবলে শেষ হয়েছে কে জানে? ওরা সুন্দর হ'য়ে ফুটতে পারতো। কিন্তু ধ্যানের জাঁতাকলে অকালে বুড়িয়ে যেতে হয়েছে।

—আপনি কি নাস্তিক? ধর্ম হ'ল জীবনের পাথেয়। সাধনার পথ হ'ল শ্রেষ্ঠতম পথ। ধ্যান জাঁতাকল হবে কেন?

একটি কুঁড়িকে যদি বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কোনও পাথরের ফোঁকরে ঢুকিয়ে দাও, কুঁড়িটি কয়েক ঘণ্টা ধ্যানস্থ থাকলে সেখানে দেখবে সে আর পাপড়ি মেলবে না শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

কুঁড়ি মানুষ নয়।

—কুঁড়ি নিষ্প্রাণও ছিল না। কুঁড়ি প্রাণসত্তা পাপড়ি মেলে শতশত কুঁড়ির সান্নিধ্যেই, বনবীথির পরিবেশেই, উদ্যানের পরিমণ্ডলেই।

ওরা দুজন উদয়গিরির মাথায় উঠতে থাকে। দুটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড গায়ে গা লাগিয়ে রয়েছে। চমৎকার বসার জায়গা। দু'জনে দুটি পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো। সঞ্জয় বলে, আর আপনি নয়, তুমি। কি বল?

—নিশ্চয়ই। আমরা সমাজের জীব। আমরা বন্ধু চাই, জন চাই, মানুষ চাই, 'ধ্যান'-এর প্রতি আকর্ষণ আমাদের নেই। কি বল?

সঞ্জয় কিছু বলে না। উভয়েই কিছুক্ষণ চারদিকের শোভা অনুভব করতে মৌন থাকে। দূরের দিগন্তবলয় ইতস্তত পাহাড় সারির ভঙ্গীতে লীন। ঝোপ, ঝাড়, গাছ, গাছালি, মাঠ

সড়ক, মন্দির। ঠাণ্ডা বাতাস, আকাশ ভরা সাদা মেঘ। রবীন হঠাৎ বলে ওঠে, এখানে বসে কিন্তু মৃত্যুর কথা ভাবতে মন চায় না। জীবনের গান গাইতে ইচ্ছে হয়।

মৃত্যু? এ শব্দ কেন? সঞ্জয়ের হৃৎপিণ্ডে যেন শব্দটা বিঁধে গেল তীক্ষ্ণ ফলার মত। সে তবু সহজ হতে চায়। বলে, আলালের ঘরের দুলাল তুমি, তোমার জন্যই তো জীবন।

হা হা করে গলা ফাটিয়ে হাসে রবীন। সঞ্জয় সেই মুহূর্তে ভাবছে রবীন বড় অদ্ভুত। সে একবারও সঞ্জয়ের জীবিকা শিক্ষাগত পরিচয় ঘরবাড়ির কথা জানতে চায়নি। সে কি সঞ্জয়ের শীর্ণ আকৃতি, সাধারণ মানের বেশভূষা দেখে মনে মনে সঞ্জয়কে করুণা করছে? সঞ্জয় একটু ক্ষোভের ফলেই বলে, হেসো না। তুমি তো আর আমার কথা জানো না!

না জানার কি আছে। নিশ্চয়ই শ ছয়েক বেতনের একটি চাকরি কর। সংসারে দায়দায়িত্ব আছে। মাইনেতে কুলোয় না। ধার দেনা মাঝে মাঝে করতে হয়। বাসে ট্রামে বাদুড়ঝোলা হয়ে রোজ কর্মস্থলে যাও সেখান থেকে ঘরে ফেরো। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবার আশঙ্কায় প্রাণপণে হাতল ধরে থাকো। প্রাণে যে বেঁচে আছ এটাই তোমার কাছে আশ্চর্যের, তাই না?

সঞ্জয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রবীনের দিকে। রবীন বলে, কি হল? অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? আমি স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে হতে পারি। তাও কিন্তু অভাব, অনটনের যন্ত্রণা বুঝি!

না রবীন, তুমি আমার যন্ত্রণার কথা জানো না।

তাও আন্দাজ করতে পারি।

মানে? সত্যি বলছ? বল তো কি আমার যন্ত্রণা?

হয় প্রেমে আঘাত পেয়েছে বা প্রিয়জন হারানোর বেদনায় অস্থির আছ।

হ্যাঁ রবীন। আমি আমার ছোট ভাই শমিতকে হারিয়েছি। সে আমার চেয়ে মাত্র দু বছরের ছোটো ছিল। একই কারখানায় আমরা কাজ করি। দুজনই ওয়ার্কার। আমার বাড়িতে আছেন বিধবা মা দুটি অবিবাহিত বোন ও একটি নাবালক ছোট ভাই।

তোমার ভাই শমিতের কি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে?

এ প্রশ্ন কেন করছ?

একজন ইয়ং কর্মরত ছেলে সাধারণত চট করে মারা যায় না। হয় অ্যাক্সিডেণ্ট নয়তো অস্বাভাবিক কোনও কারণে।

হ্যাঁ রবীন। স্বাভাবিক মৃত্যু তার হয়নি। তাকে খুন করা হয়। রাতের অন্ধকারে একটা গলিতে তার বুকে ছোরা বসিয়ে খুনী গা ঢাকা দেয়।

শুনে রবীনের মুখের প্রসন্নতা মুহূর্তে উবে যায়। সে বোবা দৃষ্টিতে দূরের পানে তাকিয়ে থাকে। সঞ্জয় তা লক্ষ্য করে না। সে বলে, চলে শমিত কথাবার্তায় ভারী চৌখস ছিল, বুদ্ধিমান স্মার্ট ছেলে। সদাই মুখে হাসিটি লেগে থাকতো। শত কষ্টেও ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যেতে দেখিনি। কারখানার ওয়ার্কাররা ওকে খুব ভালবাসতো। শমিত ছিল শ্রমিকদের নেতা, ইউনিয়নের সেক্রেটারি। যদিও কারখানার ম্যানেজার আর

মালিকের সে ছিল চক্ষুশূল। দুবার তাকে ছাঁটাই করা হয়। দুবারই প্রচণ্ড আন্দোলনে প্রতিবাদ জানায় ওয়ার্কাররা। মালিক পক্ষ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। শমিত যথারীতি কাজে যোগ দিয়েছিল।

রবীন যেন আচমকাই প্রশ্ন হানে, তুমি কখনও ছাঁটাই হওনি? মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে যায় সঞ্জয়ের। সে বিমর্ষ দৃষ্টিতে বলে যায়, না রবীন। হইনি। আমি আর শমিত একই মায়ের গর্ভে জন্মেছি। অথচ স্বভাবে ছিলাম দু রকম। আমি চাই নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটাতে। মিছিল, শ্লোগান, সভা, ধর্মঘট আমি এড়িয়ে চলি : চলতে চাই। মালিক চটবে এমন কাজ করা থেকে আমি বিরত থাকি। শমিত ছিল অতি দুঃসাহসী, ওয়ার্কারদের দাবি দাওয়া নিয়ে সে মালিকের সঙ্গে বার বার সংঘাতে এসেছে, অনেক ক্ষেত্রেই মালিককে নতি স্বীকার করতে বাধ্যও করেছে যদিও মালিকের দালাল বাবুলাল যে কতটা জঘন্য শমিত তা বুঝতে পারেনি। বুঝলে মরত না।

বাবুলাল কে? সে কি কারখানায় কাজ করে?

হ্যাঁ, সেও একজন ওয়ার্কার। তবে কোনও কাজ করে না। তার কাজ হ'ল কারখানার ম্যানেজারকে খোসামোদ করা তার কাছে সব কিছু লাগানো আর শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা। সোজা কথায় সে একটা অত্যন্ত সাংঘাতিক লোক। হেন কাজ নেই সে করতে পারে না।

রবীন বলে বুঝেছি, বাবুলালই তোমার ভাইকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়েছে।

কি জানি। শুনেছি শমিত যেদিন খুন হয় তার আগের দিন বাবুলাল নাকি তার দেশ মুঙ্গেরে চলে গিয়েছিল। এ কথা বলেছে বাবুলালের জ্ঞাতিভাই মগনলাল। মগনলালও আমাদের কারখানায় কাজ করে।

মগনলাল হয়তো মিথ্যে কথা বলেছে।

না, সে মিথ্যে কথা বলার লোক নয়। বাবুলালকে সে দু চোখে দেখতে পারে না। শমিতকে সে খুব ভালোবাসতো। তবে!

তবে কি?

মগনলাল একথাও বলছে এ খুন বাবুলাল নিজের হাতে করে নি। তবে খুনের পেছনে বাবুলালের হাত সম্ভবত আছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একেবারে নীরব, নিষ্ক্রিয়।

বলে সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রবীন তা লক্ষ্য করে বলে, এ দেশে চাষামজুরের প্রাণের কোনও দাম নেই। এমনি খুন জখম তো রোজই হচ্ছে। কিন্তু এমন হত্যাকাণ্ডও হয় যা ভাবতে পারবে না।

কি রকম? ব্যাকুল হ'য়ে জানতে চায় সঞ্জয়।

আমারই বয়সী এক ছেলে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু। নাম তার সুনন্দ সে তার মাকে খুন করেছে।

মাকে? নিজের মাকে?

হ্যাঁ সঞ্জয়। নিজের গর্ভধারিণী মাকে। সে তার মার কফির কাপে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করেছে।

তারপর?

তারপর?

তারপর আবার কি? সে এখন ফেরার।

নিশ্চয়ই মাথাখারাপ হয়েছিল। না হলে কেউ নিজের মাকে খুন করে?

না সঞ্জয়। এ পৃথিবীর বেশীর ভাগ খুনীই মাথা ঠাণ্ডা করে খুন করে। ভাই ভাইকে খুন করে, ছেলে বাবাকে খুন করে, স্বামী স্ত্রীকে খুন করে। এসব যদি ঘটতে পারে তো মাকে ছেলে খুন করবে এতে তেমন অবাক হবার কিছু নেই।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে। রবীনের কথাগুলি তার ঠিক যেন পছন্দ হয়নি।

রবীন সিগারেট কেস খুলে সিগারেট বের করে। একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয় সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয় নেয়। আর একটি সিগারেট বের করে রবীন লাইটারের পলতে জ্বালায়। তারপর সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রবীন তার কবজির ঘড়িতে তাকিয়ে বলে, পৌনে তিনটা বাজে। ঢের সময় হাতে আছে। শুনবে সুনন্দের কথা?

নিস্পৃহ ভঙ্গীতে সঞ্জয় বলে, বল। রবীন বলতে শুরু করে।

…দু ভাই বোন ওরা। সুনন্দ, সুস্মিতা। সুনন্দ সুস্মিতার চেয়ে নয় বছরের বড়। ওদের বাবার নাম দীনবন্ধু সান্যাল, মার নাম ধীরা সান্যাল। বারাসাতের চাঁপাডালি বাজারের কাছে ওদের বাড়ি ছিল। দোতলা সুন্দর পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান লোহার গেট। সুনন্দের বাবা তার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে যখন ঐ বাড়িটা কেনেন তখন সুনন্দের বয়স মাত্র পাঁচ বছর আর সুস্মিতা জন্মায়ই নি। কাছেই আমাদের বাড়ি। সুনন্দ ও আমি একই বয়সী। একই স্কুলে একই ক্লাশে পড়ি। আমার মার সঙ্গে ধীরা মাসীর খুব বন্ধুত্ব ছিল। প্রায় দু'জনে একসঙ্গে সিনেমা যেতেন। মার্কেটিং করতেন। ধীরা মাসীমা দেখতে ছিল যেন দুর্গাপ্রতিমা।

সুস্মিতার জন্ম হল কলকাতার এক নামকরা নার্সিংহোমে। যেদিন সুস্মিতাকে নিয়ে সুনন্দের মা নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরলেন সেদিন ওদের বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসেছিল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবে ঘর ভর্তি। কত খাবার, কত মিষ্টি আর কাপে কাপে কেবল চা। নবজাত শিশুকে দেখতে ঢুকলাম মার সঙ্গে। শিশুতো নয় যেন আধফোঁটা পদ্মের কুঁড়ি। মোমের মত মসৃণ শরীর, আপেলের মত লালচে গাল, ধবধবে ফর্সা রং।

সুস্মিতার বয়স তিন, আমার বয়স বারো। সুস্মিতা হবার পর থেকেই ধীরা মাসী ক্রমে কেন যেন বদলে যান। আমার মার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বে ধরল ফাটল। একদিন সুনন্দ আমায় স্কুলে বলে, হ্যাঁরে, কেন মাসীমা কেন আগের মত আর আমাদের বাড়ি আসেন না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ধীরা মাসীও তো আমাদের বাড়ি যান না। কেন বলতো?

সুনন্দ গম্ভীর হ'য়ে বলে, কি জানি কেন? মা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে কেবলই ঝগড়া করেন।

এই কথাবার্তার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সুনন্দ আমাকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে বলে, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি রবীন।

—কোথায়?

—শিলিগুড়িতে। বাবার প্রমোশন হয়েছে। মাইনে অনেক বেশী পাবেন।

সুনন্দের বাবা দীনবন্ধু সান্যাল ছিলেন আপার ডিভিশন ক্লার্ক। পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়ায় তাদের দিন স্বচ্ছলতার মধ্যেই কাটছিল। তিনি প্রমোশন পেয়ে এক্সাইড ডিপার্টমেন্টের অফিসার হলেন। খবরটা শুনে মা, বাবা গেলেন ওদের বাড়ি সঙ্গে আমিও গেলাম। ধীরা মাসী মাকে দেখে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছলতা নিয়ে বললেন, কত দিন পর তুমি এলে আরতি। একদম সময় পাই না, যেতে পারি না ভাই।

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, রবীনকে ছেড়ে থাকতে সোনার খুব কষ্ট হবে। আমারও তোমাদের ছেড়ে যেতে একদম মন চাইছে না।

আমার মা বলেন এ বাড়ি নিজেদের বাড়ি। চিরদিনের জন্য তো যাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় নিশ্চয়ই আসছেন। দেখা সাক্ষাৎ হবেই। চাকরিতে প্রমোশন হল। একি কম আনন্দের!

ধীরা মাসীর চোখ খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে, হ্যাঁ তা যা বলেছ। সোনার বাবার মাইনে শুধু বাড়লো না, চাকরিতে মান মর্যাদাও বাড়লো। সংসারে অর্থ, সম্মান দুয়েরই প্রয়োজন। সুস্মিতা বড় হবে। তাকে বিয়ে দিতে হবে, সোনাকে ভাল করে মানুষ করতে হবে। কত স্বপ্ন আমার।

রবীন থামে। সঞ্জয় বলে, থামলে যে। দাঁড়াও। কিছু খেয়ে নিই। চা বের কর, জেলি মাখা পাউরুটি থাকলে দাও। খেয়ে শুরু করা যাবে। চা খাবার বের হ'ল। খাওয়া পর্ব সমাধা হ'ল। এবার সঞ্জয় সিগারেট দেয় রবীনকে। রবীন লাইটার জ্বালিয়ে দুজনের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলে 'থ্যাঙ্কয়ু'।

···ওরা চলে গেল শিলিগুড়ি। চার বছর কোনও যোগাযোগ ছিল না। ওদের বাড়ির নীচতলায় একটি ঘরে, এক দূরাত্মীয়কে থাকতে দিয়েছিল বাড়িটা দেখাশোনার জন্য। সে দুরাত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ওঁরা রাখতেন পত্রের মাধ্যমে।

তখন আমার যোল বছর বয়েস। সুনন্দরা শিলিগুড়ি থেকে এলো। আমি সেবার হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়েছি। সুনন্দও শুনলাম পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। আমরা ওদের বাড়ি গেলাম। দেখলাম সুনন্দ আরও সুন্দর হয়েছে, স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। আর সুস্মিতা যেন এক ছোট্ট পরী। মাথাভর্তি কালো চুলের ঢেউ। ভাসা ভাসা গভীর নীল চোখ, বাঁশির মত পাতলা নাক, ধনুকের মত বাঁকা ভুরু, মুক্তার মত দাঁত। হাসলে মনে হয় ভুঁইয়ে পড়া মুঠো মুঠো শিউলী যেন।

আমাদের দেখে ধীরা মাসী আর দীনবন্ধু মেসো খুশীর ভাব দেখালেন না। দুজনই কেমন গম্ভীর। আমার বাবা প্রশ্ন করেন, "আবার বদলী হলেন নাকি?" সুনন্দের বাবা কয়েক সেকেণ্ড শূন্য দৃষ্টিতে শিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললেন,

বদলী কবে হব জানি না। এখন ছুটিতে আছি। তবে বদলীর অর্ডার আসবেই।" ধীরা মাসী এক সময় সহজ হলেন আর মাকে অনেক কথা বলেও ফেললেন, বেশ কেটেছে আমাদের শিলিগুড়িতে। অঢেল জিনিস। খাবার দাবার দুধ ঘি, আনাজপাতি—কোনও কিছুর অভাব বোধ করিনি। ভালবেসে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেছে সেসব। মানুষদের দেয়ার মন খুব। জিনিসপত্র বাসনকোসনও কম করিনি। সব আনতে পারিনি। শিলিগুড়িতে এক ভদ্রলোকের বাড়ি অনেক কিছুই রেখে এসেছি। গয়নাও গড়িয়েছি। সুস্মির কথা ভেবে। এখন ভাবনা ; কোথায় আবার পাঠায়।

সেদিন ছিল বারই নভেম্বর। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। একটা সোরগোলে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি মা বাবা পায়ে চটি গলিয়ে বেরুচ্ছেন। কি হল? বাবা মার পেছন পেছন আমিও গেলাম। গিয়ে দেখলাম সুনন্দের বাবার ডেডবডি ওদের বাড়ির একতলার বারান্দায় একটা তক্তাপোষের ওপর শোয়ানো। শুনলাম গলায় দড়ি দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষ ভীড় করেছে। সুনন্দের বাবার চোখদুটি বোজা। যেন ঘুমোচ্ছেন। এতটুকু বিকৃতি নেই মুখে। সুনন্দ কাকে যেন বলছিল। তখন রাত তিনটে বাজে। মা আমার ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে বললো। সোনা তোর বাপীকে দেখছি না। শুনে ধড়মড় করে উঠে বেরিয়ে এলাম। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করেও যখন বাপীকে দেখা গেল না তখন একতলার বারান্দায় আমি এসে দেখি বারান্দার সিলিংয়ের হুকে বাপীর দেহ ঝুলছে। গলায় মার একখানা শাড়ি ফাঁস দেওয়া।"

পোষ্টমর্টেমে পাঠানোর আগে আমার মা ধীরামাসীর ঘরে গেল। ধীরামাসী তখন খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন। আমার মা বললেন, চল ধীরা, নীচে চল! শেষ দেখা দেখবে না একবার! শেষ বারের মত বিদায় জানাবে না!

ধীরা মাসী চীৎকার করে উঠেন, না না, কিছুতেই যাব না। ও অমানুষ, ও শয়তান। ওর কাছে কিছুতেই যাব না।

আমার মা বললেন, ছিঃ স্বামীকে ওভাবে গাল দিতে নেই। নিশ্চয়ই সুস্থ মস্তিষ্কে এ কাজ তিনি করেননি।

ধীরামাসী ক্ষেপে যায়, না, মাথার ঠিক ছিল না! সব ঠিক ছিল জানেন না ও কত বড় পাজী। শিলিগুড়ি থাকতেও মরতে গিয়েছিল। বিষ খেয়েছিল। তিনদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি। সে যাত্রায় বাঁচলো ভাবিনি আবার শয়তানী মাথায় চাপবে।

পাড়ার এক বয়স্কা বিধবা বললেন, একথা আগে কেন জানালে না তাহলে পাঁচজন ওকে বোঝাতো! মাথা খারাপ না হ'লে কি এমন ফুলের মত ছেলেমেয়ে থাকতে বার বার মরতে যায়। সে তো ভাল চাকরি করত ; ভাল উপার্জন করত। তাহলে?

ধীরা মাসী শুকনো গলায় বললে, আমায় জেরা করছেন কেন? ওর মনের কথা আমি কি করে জানবো? কোনওদিন মানুষটা আমায় সুখ দিয়েছে? সবাই ভাবে এমন সাহেবের মত চেহারা, এমন শিক্ষাদীক্ষা, এমন ভাল চাকরি, তার বৌয়ের কপালে বুঝি সুখ ঝরে পড়ছে। কিন্তু সব মিথ্যা! বিয়ের পর থেকেই আমি জ্বলছি। ও আমাকে কম অশান্তি

দিয়েছে! শেষ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ করে যাবে কে ভেবেছিল? আমি ওকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। কোনও দিন না!

রবীন থামে। বেলা পড়ে আসছে। সূর্য এখন পশ্চিমে হেলছে। আকাশে শরতের মেঘ কেমন যেন ঘনীভূত হয়ে আসছে। সঞ্জয় স্তব্ধ। রবীন জানতে চায়, ফ্লাক্সে চা আছে?

—আছে। সামান্য! এক কাপের মত।

—বের কর। ভাগ করে খাবো। আর চানাচুর।

—বেশ।

কাপে চা ঢালতে সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে, সুনন্দের মার তার স্বামীর প্রতি এত রোষ কেন?

—কারণ নিশ্চয়ই আছে! সবটা না শোনা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকো। ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হবে।

আবার রবীন বলতে শুরু করে।

দিন কাটে, রাত কাটে। সুনন্দ কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমিও হ'য়েছি। একই কলেজে একই সাবজেক্টে অর্থাৎ কমার্সে। একদিন কলেজ থেকে ফিরছি। সুনন্দ বলে, রবীন চল চল কোথাও গিয়ে একটু গল্প করি। গেলাম ট্রামে চেপে গড়ের মাঠে। বসলাম আউটরাম ঘাটের পাশে গঙ্গার পাড়ে।

সুনন্দ বলল, জানিস, আমরা বারাসাত ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করি, সে কি? নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি কেন?

সুনন্দ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে, মার বাড়িতে মন টিকছে না। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাইছেন, বাপীর বন্ধু ভূদেব গড়াই ভবানীপুরে একটি ফ্ল্যাটের সন্ধান ও দিয়েছেন।

আমি না বলে পারি না, এ বাড়িটার কি হবে? ফাঁকা পড়ে থাকবে? সুনন্দ খুব নিচু গলায় বলে, কাউকে যেন বলিস্ না রবীন শুধু তোকেই বলছি। এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টে প্রমোশন পাবার পর থেকে বাপীর আয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মাইনের একশ গুন হ'ত উপরি আয়। এদেশে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার লোকের সংখ্যা তো বড় কম নয়। তার ওপর নর্থ বেঙ্গল হ'ল চোরাই চালানের নামকরা ঘাঁটি। বাপী দুহাতে টাকা আয় করতে থাকেন, শুধু কি টাকা? দামি দামি সার্টের প্যাণ্টের পীস্, ঘি, মাখন, মাছ, কেক, মিষ্টি, ফল এসবও আসতো কত বিনাপয়সাতে। মাতো খুসীতে সদাই উচ্ছল। বাপীকে প্রায়ই বলতেন, "এতদিনে আমার সংসারে লক্ষ্মীর কৃপা পাচ্ছি।' বাপী কিন্তু মার কথায় গম্ভীর হয়ে যেতেন। কখনও কখনও কিন্তু বলতেন, মা লক্ষ্মীর কৃপা কি করে পাচ্ছি তা আমিই জানি। তোমার মুখে আমি হাসি ফোটাতেই এসব মেনে নিয়েছি ধীরা। মাঝে মাঝে, মনে হয় যখন কেরানী ছিলাম তখনই ভাল ছিলাম। শান্তিতে ছিলাম।"

"বাপীর এ ধরনের কথায় মা চটে যেতেন। বলতেন বোকার মত কথা ব'ল না। এ পৃথিবীতে প্রত্যেকেই বেশি টাকা আয় করার চেষ্টা করে তুমিই বা করবে না কেন!

তুমিতো আর টাকার জন্য লোকের বাড়ি সিঁধ কাটছ না চুরি ডাকাতি করছ না কাউকে খুনজখম করেও টাকা নিচ্ছ না। যারা তোমার হাত ভরে দিচ্ছে তাদেরও স্বার্থরক্ষা হচ্ছে। এই প্রমোশন হল বলেই না পঞ্চাশ হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্স পলিসি করতে পেরেছো।" মায়ের প্রখর দাপটের কাছে বাপী যেন কেমন চুপসে যান। মার মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা ও লোভ আমাকে যন্ত্রণা দিত। বাপীকে দেখে কষ্ট হ'ত! মনে হ'ত শিলিগুড়িতে এসে বাবা যেন বুড়িয়ে যাচ্ছেন। সেই প্রাণখোলা হাসি নেই, গলা ছেড়ে হাঁকডাক নেই, মজার কথা বলা নেই!

সুনন্দ আরও অনেক কথা বলে। ওর কথা থেকে বুঝলাম শিলিগুড়িতে মোটারকম টাকা ঘুষ নেবার অভিযোগে সুনন্দর বাবা অভিযুক্ত হন। আই বি ডিপার্টমেণ্টের নজরে পড়ে যাওয়ায় এবং ঐ ব্যাপারে থানাপুলিশ হবার আশঙ্কায় সুনন্দের বাবা মনের ভারসাম্য না রাখতে পেরে সেখানে একবার অত্যধিক পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সে অভিযোগ থেকে তিনি একে ওকে ঘুষ দিয়ে রক্ষা পান। কিন্তু শিলিগুড়িতে আর থাকা নিরাপদ না মনে করে তিন মাসের মেডিক্যাল লিভ নিয়ে বারাসাত চলে আসেন। তারপরের কথা তো তোমাকে বলেছিই।

সুনন্দ ওর বাবার আলমারি থেকে একটা ডায়রী পায়। ডায়রীটিতে ওর বাবা অনেক কথা লিখেছেন। ডায়রীর কথা ধীরা মাসী জানেন না। ডায়রীর এক স্থানে নাকি লিখেছেন, ধীরাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি। কিন্তু সে বিয়ের পর থেকেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। আমার অপরাধ আমি একটু বেশী রকম সুদর্শন। কোনও অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলেই ও রেগে যায়। ছেলে মেয়ে হয়েও ওর সন্দেহ ঘোচেনি।

আর এক জায়গায় লিখেছেন, ধীরা বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। কিছুতেই ওর সন্তুষ্টি নেই। ভালো শাড়ি, ভালো আসবাব, ভালো খাদ্য, ভালো বাসন-কোসন, ভালো বাড়ি—ভালোর তৃষ্ণা ওর মিটবে না কোন দিনই। ধীরাকে খুশী রাখতে গিয়ে আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। আমি ওর বিরোধিতা করতেও পারছি না। কেমন বশ হয়ে গেছি। অথচ ভেতরে ভেতরে বিবেকের দংশন চলছে দিবারাত্র। মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথাও মনে হয়।

আমি সুনন্দকে বলি, যিনি চলে গেছেন, তাঁকে তো আর ফিরে পাবে না। মার কথা ভাবতেই হবে তোমাকে। তিনি যা করতে চান করুন, ছেলেমেয়ের মঙ্গল নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন।

এর দু দিন পরই সকালে ঘুম থেকে উঠে খবর পেলাম ধীরা মাসী সুস্মিতা দুজনই বিষের ক্রিয়ায় অচৈতন্য হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। একটুও কালবিলম্ব না করে দুজনকেই হাসপাতালে পাঠানো হল। ঘটনা সম্পর্কে সুনন্দ বললো "মা টলছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন নেশা করেছেন জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে তোমার? মা জড়ানো জড়ানো কণ্ঠে বললেন "ইঁদুরের বিষ খেয়েছি। সুস্মির দুধের গ্লাসে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়েছিলাম। সুস্মি যদি মরে যায়। সোনা আমাদের বাঁচা!" বলেই মা পড়ে যান, পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হন"।

সুস্মি খুব তাড়াতাড়িই সুস্থ হল। ধীরামাসী চার দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সুস্মিতার ব্যাপারটা পুলিশের অগোচরে রাখা গেলে ও ধীরা মাসী যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বিষয়টি পুলিশের খাতায় উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুনন্দের এক প্রভাবশালী আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে ঘটনাটি চাপা দেওয়া গেল। হাসপাতাল থেকে ধীরা মাসী সুস্থ হয়ে ফিরে এলে আমার মা জিজ্ঞাসা করেন, অমন ফুলের মত মেয়েটাকে বিষ খাইয়েছিলে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে ধীরা মাসী চিৎকার করে ওঠেন, আমি? আমি বিষ খাইয়েছি সুস্মিকে। এত বড় মিথ্যে কথা কে বলেছে শুনি?

আমার মা শান্ত কণ্ঠে বলেন পুলিশকে বলা হয়নি ঠিকই। কিন্তু সুস্মিকে বিষ না দিলে সে অজ্ঞান হবে কেন? হাসপাতালেই বা তাকে ভর্তি করতে হ'ল কেন? তোমার ছেলে সোনা তো মিথ্যে কথা বলেনি।

সুনন্দ সামনেই ছিল। তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরামাসী বলেন, শয়তান। ওই বাবারই তো ছেলে। শয়তানই তো হবি। মাকে বিপদে ফেলতে খুব শিখেছিস্ না? আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যা।

সুনন্দের চোখ দুটি বাথায় ভরে ওঠে। সে তার মার পিঠে হাত রেখে বলে, শান্ত হও মা। চল এ বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরের ভাড়া বাড়িতেই চল। বাড়িতে অভিশাপ লেগেছে। আর এক দিনও এ বাড়ি নয়।

সুনন্দরা বারাসতের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মাস খানেকের মধ্যে। বারাসতের বাড়িটা ভাড়াও দিয়ে দিল। তারপরও বছর খানেক কলেজে এসেছে। কিন্তু সে আসাও ছিল অনিয়মিত। ও আমাকে বলত, না রবীন, আমার আর পড়াশুনা ভাল লাগছে না। চাকরির চেষ্টা করছি বাইরে। কলকাতায় থাকব না।

কলেজে আসা বন্ধ হল ওর। যোগাযোগও শেষ হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। ওদের কোনও খবরই আমরা জানতাম না। হঠাৎ একদিন অদ্ভুতভাবে বৌবাজারে সুনন্দের সঙ্গে আমার দেখা। মুখ ভর্তি দাড়ি, কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। আমাকে দেখে ও জড়িয়ে ধরল রবীন তুই! কতদিন পর দেখা। কি খবর তোর।

বললাম, এম্ কম পাশ করে ছোটখাট ব্যবসা শুরু করেছি। তুই? ও বলে, পড়াশুনা তো আর করলাম না। রাণীগঞ্জের কাছে এক কয়লার খনিতে কাজ পেয়েছিলাম। মাটির তলে নামতে হত। যদিও কয়লা কাটার কাজ ছিল না আমার। কত কয়লা উঠছে তার হিসেব রাখতাম। ভালই দিন কাটছিল। কিন্তু সুস্মির কথা ভেবে সে চাকরিটা ছেড়ে কলকাতায় এক রংয়ের কারখানায় কাজে নিলাম। তাও কেরাণীগিরির কাজ। শ ছয়েক পাই। কিন্তু জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে।

জিজ্ঞাসা করি, তোর মা? সুস্মিতা? তাদের খবর কি? "সুস্মি? সে তো নেই। মাসখানেক আগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।" আমি আঁতকে উঠি, কি বলছিস। ীর মত সুস্মি আত্মহত্যা করেছে! কত বয়স হয়েছিল? সতের? আঠার?

সুনন্দের চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়তে থাকে। সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে এক সময় বলে চল রবীন, পার্কে গিয়ে বসি।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসলাম। সুনন্দ বলতে শুরু করে, রবীন, কখনও শুনেছিস্ মা মেয়েকে হিংসে করে! হ্যাঁ ভাই, আমার মা সুস্মিকে হিংসে করতো। সুস্মি যত বড় হ'তে থাকে তত তার রূপ বাড়তে দেখে মা যেন জ্বলতেন। কোথাও সুস্মিকে বেরুতে দিতেন না। সুস্মিকে একটু সাজতে গুজতে দেখলে বকতেন। বলতেন, মেয়েছেলের বেশি সাজ ভাল নয়, মন্দ হয়ে যায়। মার কথায় সুস্মি কষ্ট পেতো কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করত না। বড় শান্ত ছিল সুস্মি। এমন শান্ত মেয়ে ভালবেসে ফেলল ওর বান্ধবী সবিতা মিত্রের দাদা অঞ্জন মিত্রকে! অঞ্জন দেখতে ভালো কথাবার্তায় অতি স্মার্ট বি.এস, সি পাশ ব্যাঙ্কে কাজ করে। দোষের মধ্যে একটু বয়স বেশি, আমাদের চেয়েও বছর দুই তিন বড় হবে। চেহারা দেখে কিন্তু বয়স বোঝার উপায় নেই। ব্যাপারটা জানার পর মা সুস্মিকে বললেন, বেশতো ছেলেটিকে এবাড়িতে একদিন আসতে বল্। আলাপ করি।

এর কদিন পরই সুস্মির সঙ্গে এল অঞ্জন। দামী পোযাকে নিজেকে আবৃত করে। কথাবার্তায় তুখোড়। আমার কেন যেন মনে হ'য়েছিল এত কথা বলে যে, তার সঙ্গে সুস্মির মত শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েকে কি মানাবে?

মা এরপর ঘন ঘন অঞ্জনকে নিমন্ত্রণ জানাতে থাকে। অঞ্জনকে মা-ই চা খাবার সাজিয়ে আপ্যায়ন করেন। ড্রইংরুমে বসে বসে গল্প করেন। সুস্মিকে কখনও অঞ্জনের সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে কথা বলার সুযোগ মা দেন না। সুস্মি যদিও বসে থাকে। কিন্তু সে প্রায় নির্বাক! অঞ্জন কিন্তু এই ব্যবস্থাটা মেনে নিল। সে মার ভক্ত হয়ে উঠলো। মা প্রায়ই এটা সেটা উপহার অঞ্জনকে দিতে শুরু করেন আর অঞ্জন সেসব পেয়ে মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে!

মার বয়স বোঝা যেত না। দেখতে বরাবরই সুন্দরী। বৈধব্যের সাজপোষাক নিয়ে মার আদৌ কোনও সংস্কার ছিল না। লাল রং বাদে সব রংয়েরই শাড়ি পড়তেন। অঞ্জন আসার পর থেকে মার সাজের ঘটা বেড়ে গেল। অথচ অঞ্জনের সঙ্গে কথা বলার সময় ভগবান রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সংসারে বৈরাগ্য এসব বিষয়ে খুব উৎসাহী হয়ে উঠতেন!

একদিন সুস্মি আমাকে বলে, দাদা আমাকে ও বিয়ে করবে না বলেছে।

আমি বলি, মানে? মা জানে?

সুস্মি বলে, আমার বিয়ে নিয়ে মার মাথাব্যথা নেই। অঞ্জনকে নিয়ে মাইতো কবার হাওড়ায় এক সাধুর আশ্রমে গিয়েছিল। অঞ্জন বলে, ও নাকি দীক্ষা নেবে। সংসার টংসার অসার মনে হয়! মাও নাকি দীক্ষা নেবে!

আমি সুস্মির কথাকে তেমন গুরুত্ব দিই না। যদিও কিছু একটা করা দরকার মনে মনে ভাবছিলাম বৈকি। দুদিন পরই সে আত্মহত্যা করবে কে ভেবেছিল? আমার মিষ্টি বোনটিকে দেখলাম হুকে ঝুলতে। গলায় শাড়ির ফাঁস! সে লিখে রেখেছে, তোমরা ভালো থেকো, আমি চললাম। আমার মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু, কেউ দায়ী নয়!

বলতে বলতে সুনন্দের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। চোখ ভর্তি জল। আমি সুনন্দকে বলি, তোমার মা সুস্মিকে তার শিশু বয়সে বিষ খাইয়েছিল কেন? তাও কি ঈর্ষায়?

সুনন্দ অসহায় কণ্ঠে বলে, সেদিনের আসল কথাটাও তো বলা হয়নি। শোনো সে কথা। বাবা মারা যাবার পর বেশ কমাস কেটেছে, হঠাৎ একটা খবর এলো পুলিশ আসবে আমাদের বাড়ি সার্চ করতে এবং মার নামে নাকি পুলিশী ওয়ারেণ্ট আছে। খবরটা শুনে মা হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচাতে থাকেন, "শয়তান সব শয়তান পুলিশকে খবর দিয়েছে? নিশ্চয়ই সোনা, তুই!" মার এই কথায় আমি বলি, 'কি বলছ তুমি? আমি কেন খবর দেবো। আমি তো টাকা পয়সার কিছুই জানি না!" মা শান্ত হন না। বলেই চলেন, "লোকটার পাপ আমায় লাগবে কেন শুনি? আমার নামে যদি কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমেও থাকে তো সে টাকার জন্য আমি কেন দায়ী হব? আমি কি চাকরি করেছি? ঐ টাকা আমার স্বামী দিয়েছে আমাকে। এখন এ টাকা আমার।" মার কথাগুলি সহ্য করতে না পেরে আমি বলি, "যদি মনে কর বাবার দেওয়া টাকাগুলি সৎ পথে আসেনি, দিয়ে দাও ফিরিয়ে। পুলিশকে সব বল!" মা ফুঁসে ওঠেন কক্ষনো দেব না! কিছুতেই না"। আমি বললাম, "দেখি তুমি কিভাবে আটকাও। কালই আমি থানায় গিয়ে সব বলব।" মা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন, "সোনা আমরা যে ভিখিরি হ'য়ে যাব। সুস্মির কি হবে?"

আমি বলেছিলাম, সুস্মির জন্য খাটব মা। আমি আছি, তুমি আছ ভয় কেন পাচ্ছ মা।

সুনন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এই কথাবার্তার পরদিনই মা আত্মহত্যা করার জন্য বিষ খান আর তার আগে দুধে ঘুমের বড়ি ফেলে সেই দুধ সুস্মিকে খাওয়ান।

সন্ধে নামছে। ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ সামান্য বেড়েছে। বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝাঁক বাধা পাখিরা আকাশের গা বেয়ে নেমে আসছে ধরণীর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। লালে লাল পশ্চিম দিগন্ত। রবীন বলে, এবার চল নামি। বাসে উঠতে হবে।

খণ্ডগিরির ঢাল বেয়ে ওরা নামতে থাকে। সঞ্জয় ভাবে, সুনন্দের কাহিনী কি শেষ হ'য়ে গেল। রবীন যেন সঞ্জয়ের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে, না সঞ্জয়, এখানেই শেষ নয়। সুনন্দকে দেখলাম আবারও। কোথায় জানো? পুরীতেই। সমুদ্রে পাড়ে। কবে? হ্যাঁ মনে পড়েছে। গতকাল। ভোরে। সানরাইজ দেখতে হোটেল থেকে বেরিয়েছি। বীচ ধরে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি ওকে! কামানো দাড়ি, সুন্দর পোষাক, বেশ ভালই লাগছিল! আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। কি খবর? সে ফিসফিসিয়ে বলে, "আমার মাকে আমি খুন করেছি। তার কফির কাপে বিষ মিশিয়েছি। আমি এখন পলাতক।" কথাটা বলেই রবীন বলে, সুনন্দের কাহিনীর এখানেই যবনিকাপাত।

পুরীর সমুদ্রতট। ঘড়িতে সাতটা। রাত নামছে। ঠাণ্ডা বালুর ওপর সঞ্জয় একা বসে আছে। রবীন এখনও আসেনি। সঞ্জয়ের নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ মনে হয়। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগছে গায়ে। সমুদ্রে বুঝি জোয়ার এসেছে। ঢেউগুলি পাহাড়ের উচ্চতা নিয়ে উন্মাদের মত ছুটে আসছে। হঠাৎ মনে হল সঞ্জয়ের, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কান্নার রোল উঠেছে। আর সব কান্না মিশে আক্রোশের গর্জন হয়ে সঞ্জয়কে আক্রমণ করতে আসছে।

তবে কি সেই মেয়ে উন্মত্ত সাগরের সত্তা হয়ে ছুটে আসছে প্রতিশোধ নিতে। যে মেয়ের নাম কল্পনা। ফেনিল যন্ত্রণায় সে যেন বলছে, তুমি সব জানতে। বাবুলালরা যে শমিতকে হত্যা করবে তা তুমি আগেই কারখানার জমাদার ভৈরবের কাছে শুনেছিলে। অথচ শমিতকে সাবধান করনি। ইউনিয়নকে জানাওনি, কেন? মালিক তো তোমাকে ঘুষ দেয় নি। তাহলে? আমি জানি তুমি বাবুলালের মত চেয়েছিলে শমিতের মৃত্যু। বাবুলাল চেনে টাকা। আর তুমি চেয়েছিলে আমাকে। ভেবেছিলে শমিতের যদি মৃত্যু এভাবে হয় হোক। আমাকে পাবার পথ তোমার নিষ্কণ্টক হবে। তাই না! কিন্তু আমায় তুমি কখনই পাবে না। ভৈরব না বললেও পেতে না? কারণ আমি তোমাকে কোনদিনই পছন্দ করতাম না! আর আজ? আদালতের কাঠগড়ায় তোমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে না জানি, কিন্তু আমার কাছে তুমিও বাবুলালের মত খুনী। বাবুলালের চেয়েও তুমি হিংস্র, পিশাচ। নিজের ছোট ভাইকে খুন হ'তে দিয়েছ তুমি।

একি এসব সে কি ভাবছে। কল্পনাকে ভৈরব তো কিছু বলেনি। কিন্তু শমিতের মৃত্যুর পর কল্পনা তাকে শুধু বলেছিল, জনমে মরণে, আমি শমিতের, আর কারুরই নই। তোমার তো নইই। কারণ তুমি ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর।

··· সঞ্জয় জলের দিকে এগোয়। একটা প্রচণ্ড উঁচু ঢেউ ছুটে আসছে। সঞ্জয় কি করবে? ভেসে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। অতলান্তিক সাগরের জলে?

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা হ্যাঁচকা টান।

—কি করছ। মরবে নাকি।

রবীনকে দেখে সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে "সহজে কেউ মরে আর যদি মরেই যাই, মন্দ কি।"

বিস্ময় ভরা দৃষ্টি মেলে রবীন বলে ভাইয়ের শোকে মরবে? কি বোকা তুমি। তুমি তো আর তাকে খুন করনি।

সঞ্জয় আহত কণ্ঠে বলে, কে বলল করিনি। বাবুলালরা যে শমিতকে খুন করার চক্রান্ত করছে আমি জানতাম। কারখানার জমাদার ভৈরব আমাকে বলেছিল 'ভাইকে সাবধানে থাকতে বলবেন।' কথাটার আমি গুরুত্ব দিইনি শমিতকে বলিনি, ইউনিয়নকেও জানাইনি।

—কেন গুরুত্ব দাওনি? কেন বলনি? মালিক তোমায় মোটা টাকা ঘুষ দিয়েছিল?

—না রবীন, তা নয়। আমি বাবুলালের দলের লোক নই। বিশ্বাস কর।

—তবে জানাওনি কেন?

—আমি হিংসায় বলিনি। কল্পনা নামে একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি কিন্তু সে ভালবাসে আমাকে নয়, শমিতকে। শমিত কল্পনাকে খুব ভালবাসতো। ওদের ভালবাসা দেখে আমি ঈর্ষায় অস্থির হতাম। রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারতাম না। ঈর্ষা থেকেই তো অধঃপতন হ'ল আমার। শমিতকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করলাম না। আমি তো খুনীই রবীন। সাগরের পাড়ে ভেবেছিলাম শান্তি পাব শান্ত হব। কিন্তু ভেতরটা যে ক্ষয়ে যাচ্ছে বিরাট ধস নেমেছে। সাগরের বুক জুড়ে শুনছি কান্না আর আক্রোশ।

রবীন হাঁটতে থাকে। সঞ্জয়ও পাশাপাশি হাঁটে। রবীন কোনও ভূমিকা না করেই এক সময় বলে একটা কথা বলছি, বলেই বিদায় নেব।

—কি কথা?

—আমি সুনন্দ। রবীন আমার বন্ধুর নাম। আমি চলি।

—কোথায় যাবে?

—সারেণ্ডার করতে। থানায়।

—আমি কোথায় যাব? কি করব? সঞ্জয় জানতে চায়।

—সারেণ্ডার কর! স্বীকারোক্তি ছাড়া বাঁচার পথ জানা নেই আমার বলেই সুনন্দ আর একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়।

'মা'কে

বীণা মজুমদার

শ্যামলা রং, সুন্দর মুখশ্রী, একমাথা ঘন কালো চুল, পদ্মাকে দেখতে বেশ ভালোই লাগে। ধনীঘরের সন্তান হলে ভালো খাওয়া-দাওয়া, পরিচ্ছন্ন সুন্দর সাজসজ্জায় সে সুন্দরীই হয়ে যেত কিন্তু আধময়লা জীর্ণ কাপড়জামায় রূপ তার ফোটে না।

তবুও সুরেশ দত্ত জানে মেয়ে তার সুশ্রী, একমাত্র গৌরবর্ণ না চাইলে মেয়ের তার রূপের অভাব নেই। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে আর অনাদর করতে পারবে না। মেয়েটির উপর সুরেশ দত্ত যে অনেক আশা রাখে।

পদ্মার কথা থাক, আগে সুরেশ দত্তর কথাই বলতে হয় ; পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে এখন ভাঙাচোরা জীবনের চেহারাটা তাকে ভাবায় ; একটা প্রাইমারী স্কুলে সেকেণ্ড মাস্টারের চাকরী, মনে হতো আর কি চাইবার আছে, প্রতিদিন কোন না কোন রকমে ঠিকই কেটে যায়। কোন ঢেউ নেই কোন ওঠাপড়া নেই, শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন তার বৃদ্ধতার দিকে সুরেশ দত্ত ফিরে তাকায় না। কোন ছোটবেলায় পিতৃহীন হয়ে আর থার্ডডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে আর কিইবা করা যায়! কোনকালে তার বাবার একটা বেশ বড় পৈতৃক বাড়ীর ছবিটা ছায়া ছায়া মনে পড়ে, কোথায় যেন একটা বেশ ভাল চাকরীও করতেন। ছেলেবেলার সেই সুন্দর কোয়ার্টারটির কথাও স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। সে স্বপ্নই, তার বেশী কিছু নয় ; নিতান্তই অকালে তাকে যেতে হয়েছিল বলে আর কিছু করার ছিল না, একটি অকাল মৃত্যুর পরিণতি আজকের এই সুরেশ দত্তর জীবন। দেশ ভাগ না হলে হয়ত অন্যরকম হতে পারত, অন্তত কিছু জমি, একটা বাড়ি, খুঁটে খাওয়ার একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা।

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে মার হাত ধরে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। গন্তব্য হয়ত তখনই স্থির হয়ে গিয়েছিল। তারপর কয়েকটা বছরের ইতিহাসে অনেক উঁচু নিচু পথ হাঁটা, অবজ্ঞা উপেক্ষায় বিবর্ণ জীবনের করুণ আর্তনাদ। সুরেশ দত্ত এখন আর সেসব কথা মনে করতে চায় না।

অবশেষে গাঁয়ের স্কুলে এই মাস্টারী। কিছু আত্মীয়স্বজন অন্তত এ সাহায্যটুকু করেছিলেন, শিক্ষাবিভাগে বাবারই এক জ্ঞাতি ভাই বড় পদে ছিলেন তারই আনুকুল্যে পায়ের তলার এই মাটি, সকলেই চাইছিলেন কোনরকমে সে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। এ ভিড়ের কলকাতায় এই মা আর তার অতি সাধারণ প্রতিভাহীন পুত্রকে কে স্থান দেবে? অনেকে অবশ্য মাকে রাখতে চেয়েছিলেন। মার হাতে অনেক কারিকুরী ছিল, সংসারের কাজে এমন নির্ঝঞ্ঝাট একটি মহিলা অনেকেরই কাম্য, কিন্তু বিনে মাইনের এই ছদ্মবেশ মার পছন্দ হয়নি একথা সুরেশ দত্ত পরে বুঝতে পেরেছে।

মামার দৌলতে পাঁচকাঠা এই জমি। তখন এমন জমি বনবাদাড়ে অনেকের পড়ে থাকত, মামারও ছিল। তার ভূসম্পত্তি নানাজায়গায় ছড়িয়ে আছে তার মধ্য থেকে এই

একটি টুকরো মাকে দিয়েছিলেন। সেদিন আর নেই এখন এ জমির অনেক মূল্য। আশেপাশে সমস্ত জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে, বড় বড় বাড়ি উঠেছে, সেদিনের সেই শেয়াল ডাকা গ্রামের চিহ্নও আজ আর নেই। মা তার শেষ সম্বল কখানা গয়না বিক্রি করে এই আশ্রয়টুকু তৈরি করেছিলেন করোগেটের চালা দেওয়া দুখানি ঘর। একসময় আশেপাশের প্রায় সকলের সঙ্গে মার পরিচয় ছিল, আসা যাওয়া সুখ দুঃখের দিনে এক হয়ে থাকা। আজ আশপাশের লোকজনের সে চরিত্র বদল হয়ে গিয়েছে। অনেক নতুনবাড়ি নতুনমুখ, সেসময়ের অনেকেই আজ বিদায় নিয়েছে, মামা জেঠারাও আর কেউ বেঁচে নেই। সুরেশ দত্ত একলা হয়ে গিয়ে ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছে। জাতকর্মে বিবাহে এক আধটা নিমন্ত্রণপত্র আসে ব্যস্ এ পর্যন্ত। স্ত্রী অলকা ততোধিক দরিদ্রের কন্যা নইলে তার কাছে আর মেয়ে দিত কে?

অন্যরকম অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, উদ্যোগী পুরুষ নানাভাবে নিজের অবস্থার উন্নতি করে, দরিদ্রের মেধাবী পুত্রকন্যা মেধার দৌলতে উচ্চতর সামাজিক অবস্থায় পৌছে যায়, এক্ষেত্রে সেই অসম্ভবের দরজা উন্মুক্ত হয়নি ; সুরেশ দত্ত যেখানে ছিল তার থেকে আর একপাও এগোতে পারেনি।

সুরেশ দত্তর অভিমান আছে, তার ভদ্রলোকের অহঙ্কার আছে কিন্তু ওই পুঁজিতে অর্থাগম হয় না, বরং অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়। বড়লোক অথবা এমনকি মাঝারি অবস্থার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে হয়ে এখন একেবারে মুছে গেছে। মা যতদিন বেঁচেছিলেন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখতেন, শ্যামবাজারে ভাই-এর বাড়ি যেতেন, ভবানীপুরে সুরেশ দত্তর জেঠার বাড়ি সেখানে নানা দায় সামলাবার জন্য মাঝে মাঝেই মায়ের ডাক পড়তো, গড়িয়াহাটে পিসীমার বাড়ি সেখানেও মা মাঝে মাঝে যেতেন, পিসীমাও দুই একবার এবাড়িতে এসেছেন।

গড়িয়াহাট খুব দূরে নয়, কিন্তু পিসেমশায় চলে গেছেন, বিধবা পিসীমা এখন ছেলেদের উপর নির্ভর করে আছেন, ওরা সবাই বড় হয়েছে।

পিসেমশায়কেও দেশভাগের পর অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা সবাই দাঁড়িয়ে গেছে, কেউই সুরেশ দত্তর অবস্থায় নেই।

দেশভাগের পর তের বছরের সুরেশ দত্ত এই কলকাতায় এসে অনেক দেখেছে, কিন্তু তার সামনে কোন পথ খোলা ছিল না, ভাল করে লেখাপড়া করে কি করে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হয় এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না, আজ বুঝতে পারে ভাল করে লেখাপড়া করলে হয়ত আর একটু ভাল অবস্থায় থাকা যেত, কিন্তু তাও যে কি করে করতে হয় এ চেতনাও তার ছিল না। আর একটু ভাল মাইনের একটা চাকরী, সুরেশ দত্তর কল্পনা এর চাইতে বেশী আর এগোয় না, তখন আশেপাশে সকলের মুখে কেবল একটা কথা শোনা গেছে, 'ছেলেকে একটা কিছুতে লাগিয়ে দাও' আর এই একটা কিছুতে লেগে গিয়ে সুরেশ দত্ত একে ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারলো না। সে একটা সময় গিয়েছে কতদিন কর্মহীন দিন যেন কাটে না, একটা একটা করে গয়না বিক্রী হয়েছে, আর এই বাড়িকেই

আঁকড়ে ধরে মা ছেলে বাঁচতে চেয়েছে, সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের দিন আর তাতে যা হয় কোন স্বপ্ন দেখা আর শেখা হয় নি ; এ চাকরীটা পাওয়ার পর এইটুকু স্বল্প আয়েই যেভাবে দিন চলে চলেছে, আজও চলছে।

মাথা গোঁজার এটুকু আশ্রয়, চারপাশে অপরিচিত নিঃসম্পর্কিত লোকের ভিড়, মার হাত ধরে একটি খোলার ঘরে বসতি, বেকার জীবন, তারপরে এই স্কুলে চাকরী হতেই, মা বাকী গয়নাটুকু বিক্রি করে ঘর দুখানা করলেন। এখন ভাবলে অবাক হতে হয় এটুকু টাকা থেকে মা কি করে বাঁচাতেন কি করেই বা সংসারের আয়দায় চালিয়ে যেতেন, অবশ্যই শুধু মা ছেলের সংসার ছিল আর মা যা করতেন সুরেশ দত্ত তাতেই খুসী ছিল।

তারপর এই অলকা, সুরেশ দত্তর মতই সেও, মার উপর কোনদিন কোন দ্বিরুক্তি করেনি, জীবনে তার কোন চাহিদাও নেই, তারপর সাধারণ নিয়মে এই কন্যা আর দুই পুত্র এসেছে।

সুরেশ দত্ত এখনো বোঝে না, সবকিছু মেনে নেওয়ার এই যে অদ্ভুত মানসিকতা তার থেকেই এরা সবাই এক অবোধ্য জড়তার শিকার। জীবনের উত্থানপতন ভাঙাগড়া এর কোনটার সঙ্গেই পরিচিত না হতে হতে শুধুই দিন যাপন করে করে এরা এক আঁধির মধ্যে বাস করছে এর থেকে মুক্তি নেই, এ অন্ধকার গতানুগতিকতার অন্ধকার, হয় বিদ্রোহ বিপথ, আর নয় এই মেনে নেওয়া স্বপ্নহীন বিবর্ণ পথ, তার দুই মেরুর কোনটাই আয়ত্তে নয়, আয়ত্তে আনার সব প্রয়োজনও এদের জীবনে কোনদিন অনুভূত হয় নি।

এই বিবর্ণ জীবনে অহরহ বাস করে এর অসহনীয়তার কথাও আর কোনদিন মনে হয় না আর তাতেই সমাজের অন্যদিক অনায়াসে আপনাকে স্থূল করে এদেরই গ্রাস করে নেয়। সুরেশ দত্ত এসব কথা চিন্তাও করতে পারে না।

তার স্বপ্নও এই তার প্রত্যেকদিনের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয় যেন বদ্ধ জলার বুড়বুড়ি তাতে কোন আলোড়ন নেই, এই পুত্রকন্যাকে ঘিরে সুরেশ দত্ত মাঝে মাঝে আজকাল স্বপ্ন দেখছিল এরা হয়ত একদিন বড় হবে এমনভাবে তৈরি হবে যে তার ভাঙাঘরে একদিন চাঁদের হাট ভেঙে পড়বে। মার মুখে ব্রতকথা শোনার একটা লাইনই মনে পড়ে যায়। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠছে, এখন আর স্বপ্ন দেখার কোনই সুযোগ নেই সুরেশ দত্ত জানে তার অবস্থার আর কোন পরিবর্তন হবে না।

মেয়ে পদ্মা, কি করে যে সংসারের জোয়ালে দশবছর না পেরোতেই জুটে গেল তার আরম্ভটা আর মনেই পড়ে না, মা চলে যাবার পরই আস্তে আস্তে সমস্ত কিছুতে ওই মেয়েটাই প্রধান সহায় হয়ে উঠেছে, বাড়িতে একটা গরু আছে, একটা বাছুর মাঝে মাঝে দুটো বাছুরও হয়ে যায়, ওই গরুটি না থাকলে পাঁচটি প্রাণীর মুখের খাদ্য জোগাবার সমস্যা এই স্কুল থেকে কোন মতেই মিটতে পারতো না। গরুর পেছনে খাটা খাটনি থেকে শুরু করে সব কাজেই অলকার প্রধান নির্ভর হয়ে উঠেছে পদ্মা, মা বেঁচে থাকতে অলকা যেমন মায়ের হাতের নির্ভর ছিল। প্রথমদিকে গরুটা আড়াই সের তিন সের দুধ দিতে থাকে তখন সকালের দুধটা আশেপাশের লোকেরা নিয়ে যায় আর বিকেলের দুধটা বাড়িতে খরচ হয়। বাড়িতে অল্প স্বল্প তরিতরকারী ফলাতে হয় কারণ বাজার থেকে তরকারী কিনতে গেলে আর চাল কেনার টাকা থাকবে না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কাজে পদ্মা আর অলকা চরকির মতো ঘুরতে থাকে, আর সন্ধে থেকে ঠোঙা বানানো, তাতে অবশ্য ছেলে দুটোও হাত লাগায় কিন্তু তা আর কতটুকু।

পদ্মার প্রথমবার টেস্ট পরীক্ষার আগে নানা অসুখ বিসুখে প্রায় ছয়টা মাস অলকা প্রায় শুয়েই থাকল, আর রাঁধা খাওয়ানো এসব করতে করতে আর পরীক্ষা দিতেই পারলো না মেয়েটা, তারপরের বছরও হল না, তৃতীয়বারে ওই থার্ডডিভিশন, সুরেশ দত্ত বুঝতে পারল আর কিছু হবে না। ছেলে দুটির একজন এবার পরীক্ষা দেবে আর একজন পরের বছর, কিন্তু সেক্ষেত্রেও এমন কিছু আশার আলো নেই পাশ করবে কলেজে পড়বে এপর্যন্ত, তারপরের কথা এখন আর ভাবার সুযোগ নেই ; এত সুরেশ দত্ত যদি ভাবতে পারত, সব কিছুই হয়ত অন্যরকম হত। পদ্মারও একবার কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা উঠেছিল, পদ্মাও যে একটু স্বপ্ন দেখেনি তা নয়, কিন্তু কি হবে কলেজে পড়ে ; পড়াশোনা করে পদ্মা বেশী কিছু করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না, তাতে আর টাকা খরচ করার কথা ভাবা যায় না। সুরেশ দত্ত এবার মনে মনে পাত্র খুঁজতে সুরু করেছে, এই একমাত্র সমাধান, অলকাও বলে 'এবার মেয়েকে বিয়ে দাও।'

কথাটা যথার্থ! কিন্তু বিয়ে দাও বললেই তো আর বিয়ে হয়ে যায় না, এই বাড়ি, এই ঘর এই তারা মা আর বাবা এমনি একটা অনুজ্জ্বল পরিবার প্রতিদিনের খাদ্য জোগাতে হাক্লান্ত এর মধ্যে আলোর ইশারা কোথায়? ছেলে দুটি খায় দায় স্কুলে যায় সরস্বতী পুজো দুর্গাপুজোয় মাতে জীবনে হৈ হুল্লোড় আনন্দ ঐ পর্যন্ত মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার মাঠে বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফেরা, অন্যকিছু অন্যরকম করা, স্বপ্ন দেখতে শেখা কোনটাই এদের হয়ে উঠেনি, চারিদিকে চলমান থৈ থৈ জীবনে এদের কোন ভূমিকা নেই, দূরে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শক এরা, জীবনের সক্রিয়তায় এদের কোন যোগ নেই।

জীবনে যে উচ্ছলতা আসে যে প্রাণশক্তিতে মানুষ দুর্বার হয় যৌবন আছড়ে পড়তে চায় বন্ধুর পথের চলমানতায়, সে প্রাণশক্তির জাগরণ কোথায়? প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবন যেন এদের মৌন করে রেখেছে, আর কিছু করার আছে সে বোধেরই বা উৎস কোথায়?

সুরেশ দত্ত যথার্থই নির্বিরোধ মানুষ কিন্তু এই মধ্যবিত্ত নির্বিরোধিতা তাকে যেন জড় করে রেখেছে, তার পরিবারের লোকগুলিরও তার কাছে কোন দাবী নেই, অলকা প্রাণপণে ছেলেমেয়েদের তাই শিখিয়েছে, আর তারই ফলে দুবেলা পেট পুরে খেতে পেলেই এরা খুসী, আর যাবতীয় উদ্যোগ এই খাবার যোগাড় করার পেছনেই ব্যয় হয়ে যায়।

সুতরাং পদ্মার একমাত্র লক্ষ্য বিয়ে। এছাড়া আর কি ভাববার আছে? মা বাবাও এই একটাই স্বপ্ন দেখতে থাকে, এখন একমাত্র কর্তব্য পদ্মার বিয়ে দেওয়া। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখার মতই অলকাও স্বপ্ন দেখতে থাকে। একটা জমজমাট সংসারে মেয়ে গৃহিণী হয়েছে, কত আত্মীয় পরিজন কত দায়-দায়িত্ব। এই রোগা রোগা কচি কচি মেয়েটা কতলোকের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, সেবায় যত্নে একটা

পরিবারে অপরূপ মহিমায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে এ মেয়ে। সেই ব্রতকথার বরপ্রাপ্ত ভিখারিণীর মত পদ্মা হঠাৎ রাজরাণী হয়, সর্বাঙ্গে ঝলমল করে গয়না বাহারী শাড়ী আর কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। আহা কি ভাগ্যবতী মেয়ে সত্যি ভাগ্যে কি না হয়, মেয়ের ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে!

দীন দুঃখীর ঘরে দুবেলা অন্ন জোগানোই যেখানে বিলাসিতা, তা থেকে মুক্তি পেয়ে এই মেয়েই হয়ে উঠেছে তারিণী। বহুদিন পর হঠাৎই যেন একটা সুখসুখ অনুভূতি তাকে রোমাঞ্চিত করে।

গরিবের ঘরের মেয়ে সে গরিবের ঘরণী, দিনরাত কড়ির ধন সামলাতে সামলাতে মন, হৃদয়, ভাবনা চিন্তা বোধ বুদ্ধি কোন কিছুই কি তার পরিণতি পেয়েছে, আর এই চিন্তা ভাবনার বালাই ছিল না বলেই কোনটা দুঃখ কোনটা সুখ তার পার্থক্যও যেন তার কাছে পরিষ্কার নয় বুঝিবা সুখ দুঃখের অনুভূতিটাই গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজকাল ওই একটা ভাবনা পেয়ে বসেছে পদ্মার বিয়ে।—কিন্তু কবে, কখন কি উপায়ে?

সুরেশ দত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভদ্রলোকের মোটামুটি একটি শিক্ষিত ছেলে, একটা সাধারণ চাকরী করুক না কিছু আসে যায় না মেয়েকে তারা সেভাবেই তৈরি করেছে। একটি বুদ্ধিমান উদ্যোগী ছেলে যদি পদ্মার বর হয় তাহলে সুরেশ দত্তও একটি সহায় পান। এই নিঃস্ব নিঃসহায় জীবনে একটি অন্তত এমন লোক যদি পাওয়া যায় যে বড় কাছের মানুষ হয়ে থাকতে পারে। এই আত্মীয় বন্ধু বিরহিত জীবনে বুঝি একটু রং লাগে। সুরেশ দত্ত বেশী আশা করে না, সে জানে তার মত অবস্থায় পদ্মার জন্য একটি সাধারণ ভাল ছেলে জোগাড় করতে কত কষ্ট। কিন্তু তবু! মেয়েটি তো সুশ্রী! প্রথমেই সুরেশ দত্ত একটা হোঁচট খেল, সবছেলেই আগে একটি বি.এ. পাশ মেয়ে চায়। যে সৌন্দর্য মেয়েদের পুঁজি, যে সৌন্দর্যকে এই সমাজ ঘরের সম্পদ বলে মনে করে, যারা ঘরের বৌএর সৌন্দর্যও অন্য আর পাঁচটা মূল্যবান সম্পদের মতই পরিবারের গৌরব বাড়াবার জন্য চায় সে সৌন্দর্য এ সৌন্দর্য নয়, সে সৌন্দর্যে পালিশ লাগাতে হয় অর্থকৌলিন্যে তার চমকানো পালিশ ঝলমল করে, অনাদর অবহেলায় অমার্জিত এই সৌন্দর্য্য সংসারের কোন কাজে লাগে না। সুরেশ দত্তর কোন পুঁজি নেই, মেয়ের সৌন্দর্যও বিয়ের বাজারে মূল্যহীন, সুরেশ দত্ত অনেক দুঃখে এ সত্যকে জানতে পারল। পছন্দসই কোন সম্বন্ধই এলো না। মেয়ে গ্র্যাজুয়েট নয় তার চাইতেও বড় কথা টিনের দুখানা ছোট ঘর আর একচিলতে জমি নিয়ে তার এ বাড়ি, আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এ বাড়িতে কে আসবে? সমাজের একপাশে নিতান্ত অবজ্ঞায় অবহেলায় পড়ে আছে তারা, তাদের যে আর্থিক অবস্থা, আর যে সমাজের সঙ্গে তাদের নিত্য ওঠা বসা, তাদের মধ্য থেকে সুরেশ দত্তর পছন্দমত একটি ছেলে যোগাড় করা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। আজ সুরেশ দত্ত বুঝতে পারে ভদ্রভাবে চলার যাদের সংস্থান নেই তারা কোনরকম আশাই করতে পারে না। মেয়েকে যেমন পরিবারে যেরকম ছেলের কাছে তারা দিতে চায় তাও এখন স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

অথচ এ পরিবারে ভদ্ররুচি আছে, পদ্মা আশেপাশের বাড়িতে বিশেষ আসা যাওয়া করে না, ওইসব বাড়ির সমবয়স্কা মেয়েদের জীবনযাপনের সঙ্গে পদ্মার জীবনযাপনের কোনই মিল নেই, তারা কলেজে যায় বেড়ায় আমোদপ্রমোদ করে সিনেমা দেখে একটি দুটি ছেলে বন্ধুর সঙ্গে গোপনে মেশে।

তাদের সমশ্রেণী পরিবারে যেসব মেয়েরা লেখাপড়া করে না, তারাও নানা সস্তা আমোদ প্রমোদে নিত্য মেতে আছে।

সুরেশ দত্ত এই সস্তা আমোদ প্রমোদের জীবন থেকে দূরে থাকতে মেয়েকে শিখিয়েছে। মেয়ে চিরকালই বাধ্য—কাজেই সে ও ভাবেই মানুষ হয়েছে। আবাল্য যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে পদ্মাকে, পদ্মাও একদিন মোটামুটি একটি মাঝারি বাড়িতে বধূ হয়ে চলে যাবে এ আঁশাই করেছে। আজ দেখা যাচ্ছে তারও কোন সম্ভাবনা নেই। এমনিতে পদ্মা বিয়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছে তা নয়, বিয়ে না হলে তার নিজের দিক থেকে কোনই ক্ষতি আছে বলে সে বুঝতে পারে না। এখানে মায়ের পায়ে পায়ে হেঁটে হাজার রকম গরিবের গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত থেকে তার সময় ভালোই কাটে, কখনও বাড়িঘর পরিষ্কার, কখনও জামাকাপড় পরিষ্কার, এর ওর তার জন্য নানারকম আরামের ব্যবস্থা, সবই ওরা নিজেরাই করে, তারই মাঝখানে ভায়েদের সঙ্গে এখন তখন খুনসুটি খুঁটে দেওয়া, ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করা, কাজের তো আর অন্ত নেই।

কিন্তু মা আর বাবার বিষণ্ণ মুখ হতাশা অন্তর্বেদনায় সেও কেমন মুষড়ে পড়ে, মনে হয় তার একটা বিয়ে হয়ে গেলেই মা আর বাবার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

স্বপ্ন কি একেবোরেই পদ্মার নেই? কৃপণের ধনের মত সে স্বপ্ন বড় গোপনে লালিত হয় বাইরে তার কোন আভাস নেই, গরিবের মেয়ের সে স্বপ্ন মনের কোন অতলে অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে, তাকে বাইরে নিয়ে আসা সে যে বড় লজ্জার কথা। এ স্বপ্ন গোপনেই ফোটে, গোপনেই ঝরে সুতরাং ···

সুরেশ দত্ত সম্ভব অসম্ভব কত কথাই বলে, মাঝে মাঝে এক একটি সন্ধান নিয়ে আসে, অলকাকে বলে, 'জান একটি পাত্রের সন্ধান আজ পেলাম—আমাদেরই সমান ঘরের ছেলে ওরা দস্তিদার ; সরকারী অফিসে স্থায়ী কেরাণীর চাকরী আজকাল সরকারী চাকরীর মতো আর কোন চাকরী আছে বল, চাকরী হলেই হাজার টাকা মাইনে,—

অলকার মুখ উজ্জল হয়—"দেখোনা আবার বি. এ পাশ না চেয়ে বসে, যোগাযোগ কর,' কিন্তু সুরেশ দত্তর মুখে আলো ফোটে না,—ভদ্রঘরে বিয়ে দিতে হলে ভদ্ররকম সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হয়—সকলেরই একটা মান মর্যাদা আছে তো—কত টাকা খরচ হবে বুঝতে পার? আজকালকার যুগ,—ভট্‌চায্যি মশায় বলেন এখন আর বরপণ বলে বোধহয় কিছু চাইতে পারবে না ওখানেই ধর—সাত আট হাজার, আবার এদিগের খরচ আমার তো এতো কিছু মাথায় নেই ভট্‌চায্যি মশাই হিসাব করে দেখালেন, তাতে কিছু না করেও হাতে গলায় কানে গয়নার খরচই কম করে আরও আট হাজার টাকা, বরকে আংটি আর বোতামতো দিতেই হয়। তারপর পূজাপার্বণ খাওয়া দাওয়া—।"

অলকার বাক্‌রোধ হয়ে যায়—এত টাকার হিসাব তার মাথাতেই আসে না, এ যে কত হাজার টাকার দরকার! আর কিছু বলার নেই স্বামী স্ত্রী দুজনেই চুপ করে থাকে।

তারপর সুরেশ দত্ত ক্ষোভ জানায়—তোমার যে একটু সোনা বলতে কিছু নেই, একটু আধটু থাকলে সোনার কাজ ওতেই চলে যেত।

অলকা চুপ করে থাকলেও তার দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলে, ভেতরটা খান খান হয়ে যায়। তার বাবা সত্যই খুবই গরিব ছিলেন কিন্তু তা হলেও তারও মারই গয়না থেকে হাতে গলায় কানে একটু সোনা দিয়েছিলেন। ক্রমে তার সবই গেছে, কিছু মা হতে গিয়ে ;আর পাতলা পাতের মতো গলার হারটা শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে। কথা না বললেও একটা শ্বাসরোধকারী কষ্ট তার কণ্ঠরোধ করে দেয়, অলকা মনে মনে অস্থির হয়ে উঠে, সুরেশ দত্ত চুপ করে, এবার তারও মনে পড়ে—একটু সোনা অলঙ্কার ছিল।

সে নিজে যে বড় অক্ষম এই অক্ষমতার বোঝায় সুরেশ দত্ত হঠাৎ যেন বড় অস্থির হয়ে পড়ে—চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা দুলতে থাকে, কিছুতেই কি এ পর্দাটাকে সরানো যায় না, কিছুতেই না?

মেয়েকে আর বুঝি বিয়ে দেওয়া হয়ে ওঠে না। কোন দিকে আর কোন উপায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পদ্মা সব কথাই কিছু কিছু শোনে, যেটুকু শোনে না সেটুকু বুঝে নেয়, মা বাবার অন্ধকার মুখ নীরস কথাবার্তা তাকে হিম করে, মুখের সবটুকু হাসি শুষে নিয়ে তাকে বিরক্ত করে দেয়।

মনে হয় যে কোন একটি ছেলের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে বুঝি মা বাবাকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু যেসব ছেলেদের সঙ্গে তার পরিচয়, হঠাৎ হঠাৎ আসে যায়, তাদের সঙ্গে পদ্মা কোনরকমেই ঘনিষ্ঠ হতে পারে না, অসম্ভব ;বন্ধুদের মধ্যে পরিচিতদের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটছে, কিন্তু পরে তাদেরও দেখেছে পদ্মা অসহায় সম্বলহীন জীবন তাদের শুধু লাঞ্ছনা আর অপমানই দেয়, তাদের চোখে কি এক দুর্বোধ্য হতাশা খেলা করে, সুখের আলো নেই।

একই হতাশার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তাদের মধ্যে ডানা ঝাপটে পড়ে আছে, তাতে মুক্তি নেই।

কত অসম্ভব কল্পনা মনে আসে, কোথাও কি চিরদিনের মত হারিয়ে যাওয়া যায় না, অথবা কোন উপায়ে কিছু টাকা রোজগার? কিন্তু পদ্মার যে কোন রাস্তাই জানা নেই, কোন কিছুই তার শেখা হয়নি, আজ হিসেব করে দেখে পদ্মা, যেসব কাজ সে শিখেছে, সারাদিন যেসব কাজে সে ব্যস্ত থাকে তার এক কড়িরও মূল্য নেই একমাত্র অন্যের বাড়ি দাসীবৃত্তি করা ছাড়া, এসব কাজের কোনই দাম নেই, কিন্তু তাতো হতে পারে না।

এই ভাবনা চিন্তার জগতে পদ্মা একেবারেই একা, হঠাৎ সে মা বাবার জগৎ থেকেও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মা বাবার সমস্ত দুশ্চিন্তার কেন্দ্রে সেই আছে, একথা ভেবেই সে অস্থির হয়ে পড়ে, একটা অলৌকিক কোন উপায় থাকত সে হয়ত এই যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারত, কিন্তু সেসব চাবিকাঠিও তার আয়ত্তে নেই। এতদিন একরকম

ছিল, আলোও ছিল না আবার অন্ধকারটাও নেপথ্যবাসী হয়েছিল, আজ ঝপ করে পরিবারটায় এই অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই অন্ধকারকে দেখতে পেয়েছে পদ্মা, এ অন্ধকারের চেহারা বড় ভয়ঙ্কর, অলকা আর সুরেশ দত্ত যে অন্ধকারের শিকার পদ্মা তার হাত থেকে বাঁচতে পারে না।

সেদিন বাড়িতে রসময় এলো, এককাপ চা খেয়ে ঘুরে ফিরে সারা বাড়িটা সে ভাল করে দেখতে লাগল, সুরেশ দত্তও সঙ্গে আছে। পদ্মা আশ্চর্য হয়ে যায় হঠাৎ এই রসময় বাড়ি দেখতে এসেছে কেন? কি উদ্দেশ্য?

পদ্মা অলকার কাছে জানতে চায়। রসময় বাড়ির দালাল। অলকা আস্তে আস্তে বলে বাড়িটার শুধু ঘর দুখানি রেখে বাকী জায়গাটা তোমার বাবা বিক্রি করে দেবেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, পদ্মার বিয়ের জন্যে টাকা জোগাড় করতে এই একটিমাত্র উপায় আছে। পদ্মার মুখে কোন ভাষা জোগাল না, কথাটা পাথরের মত ভারী হয়ে তার মাথায় চেপে রইল।

অনেক চিন্তা করেছে সে, এবাড়ি বিক্রী করে বাবা রাজপুত্র আনতে চাইছে, তাতে তাদের ভবিষ্যতে এমন কি সুখের উদয় হবে, যে এই শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে ফেলতে হবে? অলকা চিরাচরিত উত্তর দেয়—'মেয়েকে পাত্রস্থ করা মা বাবা'র কর্তব্য মা, কিন্তু তোমাকে তো আমরা হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারি না, কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে? তুমি সুখে থাকলে আমাদেরও সুখ।' পদ্মা এবার মরিয়া হয় "আমি সুখে থাকলে তোমাদেরও কি সুখ সেজন্য তোমাদের শেষ সম্বলটুকু শেষ করে দেবে! আমি সুখে থাকলে তোমাদের কি সুখ? আমি ভাল খাব থাকব, ভাল জামাকাপড় পরব তাতে তোমাদের কি হবে? আর এত টাকা খরচ করে আমাকে ভাল ছেলের কাছে বিয়ে দেবে, সে কিরকম ভাল হবে তোমরা কি করে জানবে? মুখরক্ষার জন্য মেয়ে যাতে কথা না শুনে সেজন্য অনবরত তোমাদের এভাবে সেভাবে দিয়েই যেতে হবে, সেতো তোমরা আমার থেকে ভাল জান।

আমি কদিন তোমাদের কাছে এসে থাকব, তোমাদের অভাবে অভিযোগে আমি কি দশটাকাও সাহায্য করতে পারব? তোমরা দিন দিন আরও গরিব হয়ে যাবে, সকাল হলে এই যে তরীতরকারীটা তুলে নিয়ে এসে ভাত খাবার ব্যবস্থা কর তাও যাবে, গরুটা কোথায় বাঁধবে! তোমাদের কাছেই শুনেছি জমির দাম ক্রমশ বাড়ছে, তোমরা এ জমি বিক্রী করে বাড়ি ঘর করে ভাড়া দিতে পারবে ; তোমাদের একটা ব্যবস্থা হবে, আমার সুখ হবে জানলে কি করে? 'সত্যি সুখ হবে কিনা কেউ জানে না, অলকার মা বাবাও হয়ত ভেবেছিলেন অলকার সুখ হবে কিন্তু সুখ হয়েছে কি? সুখ কি জিনিস তার কেমন চেহারা অলকা জানে না, তার সঙ্গে কখনও অলকার পরিচয় হয়েছে কি? আবার দুঃখেরই কোন চেহারা অলকা কি করে বলবে? সুখ দুঃখকে আলাদা করে চেনার সুযোগ কোথায়? পদ্মা বড় কঠিন প্রশ্ন করেছে, সুখ হবে কিনা কে বলতে পারে?

পদ্মা আবার বলে 'সুখের কথা বলো না মা সুখ কি তোমরাও জাননা আমিও বলতে পারবো না। বলো আমার একটা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে চাও—তাও হবে কি? কেউ

জানে না মা কেউ জানেনা।' সত্যিইতো পদ্মার বিয়ের সঙ্গে এই খাওয়াপরার প্রশ্নটা বড় কঠোর হয়ে যুক্ত হয়ে আছে, অবশ্য আরও হয়ত অনেক কিছু আছে অলকা ভাল করে ভাবতে পারে না।

"আমি খেয়ে পরে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো সেজন্য তোমরা ভিখিরী হয়ে যাবে? আমি তোমাদের ভিখিরী করে দিয়ে যাব? তা হয় না মা"—পদ্মার চোখ দুটো জলে ভরে উঠে।

অলকা অবাক হয় মেয়ের মুখে এত কথা ফুটেছে দেখে, সত্যি পদ্মা এবার বড় হয়ে গেছে আর সে ছোট মেয়েটি নেই। "বিয়েতো আর ঠিক হয়ে যায়নি, তোমার বাবার ভাল বংশ, ওরা কালীকচ্ছের দত্ত তাই একজন একটু আগ্রহ দেখিয়েছে। যারা সম্বন্ধ করবেন তারা বরিশালের গুহ, ছেলে বি. এ. পাশ মেয়েই চায়, স্কুলের হেডমাস্টারমশাই আমাদের জানেন, তোমাকেও ছোট থেকে দেখেছেন তাই সম্বন্ধটা এসেছে।" "তাতে তোমরা এত টাকা খরচ করে বিয়ে দিতে রাজী হয়ে যাবে? এত টাকা তোমরা খরচ করবে?"

"মেয়ের বিয়ে বলে কথা, সত্যিই অনেক টাকার দরকার একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে, আদর আপ্যায়ন, আসা যাওয়া আনা নেওয়া অনেক টাকার দরকার হয়। ওরা পণ চাইবে না, কিন্তু সম্মান রেখে প্রণামীটুকুর ব্যবস্থা করা চাই—হিসাব শুনলে মাথা ঘুরে যায়।"

পদ্মা ছোট করে হাসে, তোমার এত হিসেব দিতে হবে না, বাড়ি বিক্রী যেদিন ঠিক হবে আমি পালিয়ে যাব। কোথায় যাব তোমরা আমায় জিজ্ঞেস করো না— মোট কথা আমায় আর দেখতে পাবে না। ওরা বংশ জাত গোত্র সব দেখে বিয়ে ঠিক করবে মেয়ে পছন্দ করবে, আর তোমরা শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে আমার সুখ দেখবে আমি ওদের বাড়ী গিয়ে সকলের সুবিধা অসুবিধা দেখব, সেবা-শুশ্রূষা দায় দায়িত্ব। যদি না পারি ক্ষমতা না থাকে তাহলেই আমাকে অপমান করবে তোমাদেরও অপমান করবে তারপর আবার কত মন জোগানো তোমরা সবসময় দেওয়া আনা নেওয়া সব করতে থাকবে তবে তো—এর কি আর শেষ আছে! আমার বিয়ের দরকার নেই যেমন আছি, তেমনি তোমাদের সঙ্গে থেকে যাব।"

এবার অলকা সত্যি সত্যি রেগে যায়, "আমরা কি সারাজীবন বেঁচে থাকবো, আর বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে নাকি? মেয়ে দেখতে ভালো শুনে রাজী হয়েছে, আগে মেয়ে দেখবে তবে তো তাও মেয়ে দেখতে এসে, এই বাড়ী ঘর এই নাড়া নেংটা চালচলন ওদের পছন্দ হবে কিনা কে জানে!"

পদ্মার মত 'পছন্দ হবার দরকার নেই এ বিয়ের কথা তোমরা মুখেও আনবে না।' পদ্মাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না, সুরেশ দত্ত অবাক। খেলতে খেলতে মেয়েটা কখন এমন বড় হয়ে গেল, কখন এমন শক্ত হয়ে গেল পোড় খাওয়া মানুষের মত। কিন্তু একবার ওরা আসুক মেয়ে দেখে যাক। কিন্তু পদ্মা তার 'না' থেকে আর নড়লো না। এত দিয়ে থুয়ে বি. এ পাশ চাকুরে জামাই কোন প্রয়োজন নেই, হাজার দিয়ে থুয়েও গরিবের

খোঁটা মুছতে পারবে না হাঘরের মেয়ে বলে আমার কেবলই কথা শুনতে হবে, আর তোমরা এ বাড়ি বিক্রী করে আমার খাট পালঙ্কে ঘুমাবার ব্যবস্থা করে দেবে এ হতে পারে না।

হেডমাস্টারমশায়ের কাছে সুরেশ দত্ত কিছু গোপন করে না তিনি সবই শুনলেন বললেন 'এ মেয়ের বিয়ে তোমরা দিতে পারবে না।' একদিক দিয়ে আবার সুরেশ দত্ত খুসী হয়ে উঠেছে সত্যি এ বাড়ি যে তার পাঁজরের চেয়েও বেশী। ভবিষ্যতে এ জায়গাটুকু নেড়েচেড়েই একটা যাহোক ব্যবস্থা করতে হবে এখনই বিক্রী করে দিলে একটা পয়সাও থাকবে না। হয়ত এরই টাকা দিয়ে অন্য অংশে বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিতে পারবে একটা ব্যবস্থা হবে জমির দাম হু হু করে বাড়ছে দেখেই এসব পরিকল্পনা মাথায় আসে। ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দিলেও মাসে দু'শ চারশ টাকার ব্যবস্থা হতে পারে।

পদ্মা তাই বলে। তবে? আমি কি কখনও তোমাদের তিনশ চারশ টাকা করে দিতে পারব, আর টাকা থাকলে তো বাবা আমারও থাকল। এই তোমাদের বুড়ো বয়সের সম্বল বাবা, এ কখনও হাতছাড়া করবে না।

কিন্তু হেডমাস্টারমশাই সত্যি সুরেশ দত্তর মঙ্গলকামী, আর পদ্মাকেও বড় ভালবাসেন। তিনি আর একটি ছেলের খোঁজ আনলেন, এই লক্ষ্মী লক্ষ্মী মেয়েটি তাকে বশ করেছে।

পাত্র ব্রজেনের তিনকুলে কেউ নেই। একটা সরকারী রেকর্ড অফিসে সে চাকরী করে, তার বন্ধুরা একটি মেয়ে খুঁজছে ; হেডমাস্টারমশাই ছেলেটির সন্ধান পেয়েছেন, কোনই দাবী দাওয়া নেই, তার নিজেরও বাড়িঘর কিছু নেই, এই চাকরীই সম্বল। সাহায্য করবার জন্য আত্মীয় স্বজন যেমন নেই তারও কাউকে কিছু করতে হয় না। এবার নিশ্চয় পদ্মা অমত করবে না কেননা প্রায় বিনা খরচেই বিয়ে হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েকে একদিন দেখাতে হবে। অবশ্য ব্রজেন এবিষয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু তার বন্ধুরা একবার মেয়েটিকে দেখতে চায়, সুরেশ দত্তও ছেলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন, তারা স্বাস্থ্য ভাল সুশ্রী মেয়েই শুধু চায়, রং নিয়ে কোন বায়নাক্কা নেই।

পদ্মা কিন্তু ছেলের বন্ধুদের কাছে রূপের পরীক্ষা দিতেও রাজী হয় না। এবার অলকা মেয়েকে তিরস্কার করে। একবারও মেয়ে না দেখে কি করে বিয়ে হয়।

কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের কথা যদি ওরা বিশ্বাস করে তাহলে আর মেয়ে দেখার কি আছে? ওরাতো সুন্দরী মেয়ে চায়ও না। তবু হেডমাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা মতো বন্ধুর সঙ্গে একদিন সকালে ব্রজেন বাড়িতে এলো। ছেলেটিকে দেখে অলকার খুবই পছন্দ, সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে, বন্ধুরাই বলল মেয়েকে একটু ডাকুন দুজনে একটু কথা বলুক। ওদের আলাপ করিয়ে দিই। কিন্তু পদ্মা বলে আলাপ করার কি আছে? হেডমাস্টারমশায় বুদ্ধি করে পদ্মার কাছে একটু জল চাইলেন, এবার পদ্মা আর দ্বিধা করলো না। একগ্লাস জল এনে দিয়ে গেলো। ওরা পলকের জন্য মেয়ে দেখলো মাত্র, কোন কথা বলার সুযোগ হল না।

অলকা ভাবছে বাড়ির চেহারাটা বড়ো দীন, তিনজনকে বসতে দেওয়ার মতো চেয়ারও নেই। একটা হাতল ভাঙা চেয়ারে মাস্টারমশাই বসেছেন আর সবাই-এর জন্য মোড়া

আর জলচৌকী। অলকা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বসার কোন ব্যবস্থা নেই। ওদেরকে এক কাপ করে চা বিস্কিট আর সন্দেশ দেওয়া হল।

দুটি প্রশ্ন আছে, ছেলেটি ভদ্রলোক ত? বড় কঠিন প্রশ্ন, কেবল পূর্বপুরুষদের নাম গোত্র খোঁজ করেই ভদ্রলোক কিনা জানতে হবে, আর ছেলেটি অফিসে কি চাকরী করে? অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে হবে। বন্ধুরা পরিষ্কার কিছু বললো না, বললো "অফিসে খোঁজ নেবেন।" হেডমাস্টারমশায় তার আদি নিবাস ইত্যাদি খোঁজ করবেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধানে ছেলেটি ভদ্রলোকই জানা গেল। কিন্তু সুরেশ দত্ত মাথায় হাত দিয়ে বসলো। অফিসে খোঁজ নিয়ে আসা হয়েছে ব্রজেন অফিসে পিয়নের চাকরী করে, সরকারী অফিসে সে পিয়ন!

আর কোন চাকরী সে জোটাতে পারেনি। মাষ্টারমশায়ও থমকে গেলেন। পিওন? আর বাড়িঘর? কলকাতাতেই থাকে সে, রাস্তার উপরেই বেশ বড় একখানা ঘর। বাথরুমের ব্যবস্থা আলাদা নেই, অন্য সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এমন বড় রাস্তার উপরে সে ঘর জোগাড় করলো কি করে? ঘরখানা পাওয়ার ইতিহাস আছে, নইলে এমন জায়গায় দেড়শ টাকায় এমন ঘর মেলে না। মা বাবা মারা গিয়েছে অনেকদিন, ছেলেটি পিসিমার কাছে মানুষ। পিসেমশায় দেশভাগের পর এ ঘরখানা ভাড়া নিয়েছিলেন। ভাই মারা যাওয়ার পর ব্রজেনের মা আর ব্রজেনকে পিসিমা নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তারপর একে একে সকলেই গেছে।

এ ঘর যখন নেওয়া হয় তখন এজায়গা এমন ছিল না। রাস্তায় এত দোকানপাটের ভীড়ও ছিল না। ক্রমে শহর বেড়ে এ অঞ্চলের চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে। এখন চারপাশে বহু বাড়ি ঘর দোকানপাট, রাস্তার পাশে দোকানঘর বেড়েই চলেছে। একটু ভেতরে এগিয়ে গেলেই শ্যামল শান্ত স্নিগ্ধ মাঠ ঘাট এখনও চোখে পড়ে কিন্তু শহর যেভাবে দৌড়াচ্ছে তাও আর বেশীদিন নয়। ব্রজেনের ঘরের সামনে রাস্তা, সরকারী বেসরকারী বাস ধূলা উড়িয়ে চলে মুহুর্মুহু ; দুপাশে ঘিঞ্জি দোকান, তার ঘরটির উপর অনেকের লোভ, কিন্তু ব্রজেন এ ঘর ছাড়বে না। সে যাবে কোথায়? ব্রজেন ভাবে সে নিজেই এখানে দোকান করবে। কিন্তু ব্যবসা কি করে করতে হয় তাইতো আগে শিখতে হবে, অন্য সকলকে সে একথাই বলে। আমি নিজেই এখানে দোকান করব।

ছেলেটি অবশ্য স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে, কিন্তু পিওন! সুরেশ দত্ত ভাবে এই অভাবের সংসারে তার মেয়ে বড় হলো, সারাজীবনে আর একটু ভাল থাকা কাকে বলে সে জানবে না। আর তার নিজের জীবনে ধিক্কার এলো, এতই অলস পিতা সে, সন্তানদের কোন রকম সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারেনি, এই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি।

হায়! সুরেশ দত্ত জানে না, এই যে একটা ফ্রেমের মধ্যে সে আটকে আছে, এর থেকে বেরিয়ে আসা, কোনক্রমেই সহজ নয়। আপ্রাণ চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে চাইলেও নিয়তি কঠিন হাতে নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে ঠেলে দেবে।

একটা অবস্থা আছে তার থেকে বেরিয়ে আসা যায় না, অতি বাল্যকালে যে দুর্ভাগ্য তার হাত ধরে এতদূরে নিয়ে এসেছে এখান থেকে আর তার ফেরার উপায় নেই। জীবনে

সকল বাধা ঠেলে এগিয়ে যাবার মর্মান্তিক শিক্ষা তার হয়নি। তার পুত্রকন্যাও একই অবস্থায় বড় হয়ে, তারই মত ধুঁকে ধুঁকে একদিন এ জীবনলীলা শেষ করবে। আজ বহুদিন পর আর্ত ধিক্কারে সুরেশ দত্ত জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়—"এই সমস্ত অবস্থার জন্য আমিই দায়ী।"

ছেলেটিকে কথাবার্তায়-চালচলনে ওদের বড়ো পছন্দ হয়েছে, কিন্তু আত্মীয় পরিজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই জানবে পদ্মাকে শেষ পর্যন্ত সুরেশ দত্ত একটা পিওনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

আর পদ্মা? তার কৌতুক হয়, মন্দ কি,—এর চেয়ে ভালো মা বাবা কেন আশা করে—সে বুঝতে পারে না ; মা বাবার গায়ে আঁচ লাগবে না তাইতে সে কিন্তু খুশী!

অলকাও তাই বলে, 'কে কি ভাববে আমাদের ভাবলে চলবে না ; আত্মীয়স্বজন-কে আমাদের খোঁজ রাখে বলত? বিয়ের একটা নিমন্ত্রণ চিঠি যাবে ওই পর্যন্ত। আমরা কাউকে বাড়িতে আহ্বান করে আনতে পারবো না, আমাদের সে সামর্থ্য নেই, আর আমরা এর চেয়ে ভাল কি করে আশা করবো?'

অলকা সুরেশ দত্ত মেয়ের কাছে কিছুই গোপন করে না, এ মেয়ে একদিনে তাদের বন্ধু হয়ে উঠেছে, মা বাবাকে এমন করে কটা মেয়ে জানে? পদ্মার মতটা আগে প্রয়োজন, পদ্মা কি বলে? সে কি বলবে, পদ্মাতো বিয়েই করতে চায় না আর একেবারে সহজে কোন ঝামেলায় না গিয়ে এর চাইতে ভালো ছেলে আর কোথায় মিলবে? "কাজেই বিয়ে তোমরা যখন দেবেই আর বাছাবাছি করো না এখানেই দাও।" অতএব পদ্মার বিয়ে হয়ে গেল। অলকা দেখল উৎসব বেশ আনন্দজনকই হলো, আনন্দ সৃষ্টিতে অর্থটাই যে প্রধান নয়, প্রমাণিত হলো। আলো, রোশনাই, চব্য চোষ্য নাইবা রইল, হাসি ঠাট্টা, রসিকতা, চারপাশের সমান অবস্থার লোকের আনাগোনা, লোকাচারের ছোট ছোট শুভ কর্মে পাঁচ এয়োর মঙ্গলধ্বনি, শাঁখ আর উলুর সমারোহ পদ্মার বিয়ে জমিয়ে দিল। কেবল পাঁচজন নয় সাত সতেরো এয়োরা নিজেরাই মাতামাতি করলো ; ছেলেদের বন্ধুরা মেয়ের বন্ধু তাদের ভাইবোন, বাড়ি মাতিয়ে রাখলো। পানসুপারী চা মুড়ি মুড়কিতে ওরা কোন কার্পণ্য করলো না, যখনই যে এলো মুঠো ভরে জলখাবার পেলো, হাতে হাতে নিজেরাই সব জোগাড় যন্ত্র করে অলকার সমস্ত দায়দায়িত্ব হালকা করে দিল।

আশেপাশে মেয়েরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে, যার যা মনে এলো, নির্দ্বিধায়—তাই করতে লাগলো, অলকার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই, কাজেই সকলের হাসি আর খুশী ফোয়ারার মতো অনায়াসে ঝরে পড়লো, সবারই যেন নিজের বাড়ি ;এই একটা উৎসবের মধ্য দিয়ে অলকা আর সুরেশ দত্ত অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তবু কিছু নয়—কিছু নয় করে দুই তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। এ টাকাটা অবশ্য স্কুল থেকেই ধার পাওয়া গিয়েছে।

একটা সাধারণ ঝকমকে সিল্কের শাড়ী আর সুন্দর রুপোর গয়নায়—পদ্মা যেন রাজরানী। বন্ধু একটা ইমিটেশন সিঁথিও পরিয়ে দিয়েছে, পদ্মা একচিলতে সোনাও নেয় নি, ব্রজেনকে কেবল একটি আংটি দেওয়া হয়েছে।

আঁচলে চাল বেঁধে দিতে দিতে অলকার মনে হল ঘরের সবটুকু আলো মুছে নিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অলকা কতবার যে পদ্মা, পদ্মা করে ডেকেছে, এই একটা নামই সারাক্ষণ শোনা যেত, আর মা বাবার দুঃখই বা এমন করে কে বুঝত। 'তুই আমার ঘরের শ্রী ছিলি পদ্মা,—তোকে ছেড়ে আমি এবার কি করে থাকব।' অলকার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু দুটি জলভরা চোখই শুধু জেগে রইল কোন কথাই সে উচ্চারণ করতে পারলো না। এ বেদনা কথায় ফুরায় না, এতো শুধুই নিজের কেবল আজকের নয় চিরদিনের।

গোধূলির আলোয় রওয়ানা হয়ে একটু গভীর সন্ধ্যায় ব্রজেন বৌ নিয়ে ঘরে পৌছাল, সঙ্গে দু'তিনজন বন্ধু আর একজন বন্ধুর স্ত্রী। বাড়িতে তাদেরই আত্মীয়স্বজন, এদেরই একজন একটু বয়স্কা বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন। তারপর অল্পস্বল্প হৈ চৈ একটু খাওয়া দাওয়া, রাত এগারোটার মধ্যে সবাই যে যার বাড়ি চলে গেল।

এবার ব্রজেন আর পদ্মা নিভৃতে মুখোমুখি।

সারাদিন বড় হৈ চৈ গেছে এবার আর কোন কথা নয়, স্নানের ঘর এতরাত্রে আর কেউ ব্যবহার করছে না, পদ্মা অনায়াসে হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে পারে। ঘরের মধ্যেই একটা দিকে একটা কাঠের পার্টিশন, নতুন করা হয়েছে, তার মধ্যে রান্নার টুকিটাকি, আর প্রয়োজন হলে যাতে পদ্মা ওখানেই জামাকাপড় ছাড়তে পারে, ব্রজেন ব্যবস্থা করে রেখেছে।

পদ্মা খুশী হল, রাতের অন্ধকারে ভাল করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, সত্যিই সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই এখন সে কেবল শুয়ে ঘুমুতে চায়। ব্রজেন একটু রসিকতা করছে, তোমার হাঁটার জায়গাটা বড় কম হয়ে গেল পদ্মা, আর দৌড়াতে তো পারবেই না আর দৌড়াতে হলে একদৌড়ে বাপের বাড়ি পৌছে যাবে।

পদ্মা চোখ তুলে তাকায়—চোখে আলো আছে কি? ব্রজেন সেই আলোটুকু খোঁজে আবছা আলোয়—বোঝা যায় না কিন্তু বিরক্তি নেই। এ মেয়ে বোধ হয় বিরক্ত হতে জানে না—আ! তাই যেন হয় একটু খুশী, একটু আলো, একটুকরো হাসি বন্ধুর মতো পাশে হাঁটবার একজন ব্রজেন আর কিছু চায় না।

পদ্মা ছোট একটু উত্তর দেয় "এই বেশ!" এরপর ব্রজেন আর পদ্মা দ্বিরাগমন করে এলো, দুটিতে মানিয়েছে বেশ, অলকা খুশী হল। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে 'পদ্মা তুই ভাল আছিস্ তো' পদ্মাও সপ্রতিভ জবাব দেয় "আমি ভালই আছি মা, আমার জন্য চিন্তা করো না আমি ভালই থাকবো।' ভাইয়েদের সঙ্গেও ব্রজেন গল্পে আড্ডায় জমিয়ে দিল।

না চাওয়ার যে শিক্ষা পদ্মা মার কাছে পেয়েছে জীবনে তাই তার অমোঘ অস্ত্র।

ব্রজেন বলে—'বেশী আমরা চাইব না পদ্মা, তবে আমরা নিজেদের মতো তৈরী হবো,—তাই তোমার মতো মেয়ে,আমি চেয়েছিলাম এমন একটি মানুষ যার সুখ দুঃখের বোধ আমার সঙ্গে মিশে থাকবে, ভালবেসে আমরা দুজনে দুজনকে জানবো।'

ব্রজেন ভয় পেয়েছিল তার দীনতা স্ত্রীকে আঘাত না করে, আর তার স্ত্রী এই দীনতাকে দিয়ে ব্রজেনকে না আঘাত করে। যে মেয়েটি তার স্ত্রী হয়ে আসবে, প্রতিদিনের চাহিদা

মেটাতে গিয়ে তার দাবী কি হবে কে বলতে পারে? যদি দাবী বেশী হয়, যদি তার অক্ষমতা পদে পদে ধিকৃত হতে থাকে, তাহলে সেই ধিকি ধিকি আগুন থেকে রক্ষা পেতে তাকে অন্য উপায় ভাবতে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রজেনের শঙ্কা কেটে গেল। ছোট জায়গায় নড়াচড়া, একই বাথরুম সকলের সঙ্গে ব্যবহার করা, কোন কিছু নিয়েই সমস্যা হল না, আশ্চর্য কৌশলে পদ্মা সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে।

ব্রজেনের আর্থিক সমস্যাটা উপেক্ষার নয় পদ্মাকে সে কোন কিছুই গোপন করেনি, 'একটু এদিক ওদিক করার উপায় নেই এরই মধ্যে টেনে টুনে আমাদের চলতে হবে' পদ্মার আপত্তির কিছু নেই ক্ষমতার বাইরে সেও যেতে চায় না, কিন্তু এরই মধ্যে অন্তত কুড়িটি টাকা তুলে রাখতে হবে আপদে বিপদে কাজে লাগবে। ব্রজেন খুশী হয়ে বলল— 'লক্ষ্মী বৌ আমার।'

শুধু মাথার উপর একটা খোলা আকাশ নেই এই পদ্মার বড় কষ্টের, মার কাছে আর যাই থাক না থাক একখানা আকাশ ছিল, ঘরের সামনে একটু খোলা উঠোন, সেখানে সকাল সন্ধ্যা নানা রং-এর খেলা, প্রতিদিনের রংবদলে যে মাধুরী ছিল তার মূল্য পদ্মা জানতো না, কিন্তু আজ একটি ঘরে বন্ধ হয়ে মনে হয় তার যেন একটা বিপুল সম্পদ চুরি হয়ে গিয়েছে, হাজার চেষ্টায় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, তারই একটুকরো কষ্ট পদ্মার বুকের মধ্যে বিঁধে থাকে, পদ্মা জানে এ বেদনাটুকু তার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল।

ব্রজেন বোঝে সেজন্যই সে ছুটির দিনে সিনেমা নয় বন্ধু বান্ধব নয়, একটি পুকুরের পাড়ে একটা খোলা জায়গা সে আবিষ্কার করে, হাঁটতে হাঁটতে পদ্মাকে নিয়ে সেখানে চলে যায়, একটু সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থেকে বিকেলের মরা আলোর মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে পৌঁছে তারপর হাঁটতে হাঁটতে ঘরে ফেরে, একটি দুটি তারা ফোটে, পদ্মা বড় খুশী হয়, এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ব্রজেনের।

একদিন পদ্মা বলে 'তুমি কি করে জানলে এই বিকেল এই সন্ধ্যায় এই পুকুর এই গাছপালা মাথার উপর এই আকাশ দেখতে আমার বড় ভাল লাগে?"

ব্রজেন রহস্যময় উত্তর দেয় "জানতে হয় জানতে হয়।" ব্রজেন যেদিন মেয়ে দেখতে গিয়েছিল সেদিন সকালের আলোয় সেখানকার মাঠঘাটের শ্যামল স্নিগ্ধতায় তার চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, ব্রজেন জানে কোন বন্ধন থেকে ছিন্ন করে সে একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে এসেছে।

"সেদিনই ভেবেছিলাম পদ্মা তুমি আমার ঘরে এলে ও অভাবটুকু তোমার থেকেই যাবে।"

কথাটা সত্যি সিনেমা দেখার সুযোগ বেশী নেই তবুও এ কয়মাসে পনরদিনে একটা সিনেমা ওরা দেখেছে। থিয়েটারও দেখেছে, কিন্তু এই বেড়িয়ে বেড়ানোয় যে অহেতুক আনন্দ তাতো সিনেমা থিয়েটারে পাওয়া যায় না। পদ্মার কথা ভেবে ব্রজেন শুরু করেছিল কিন্তু এখন যেন নেশা লেগে গেছে। ব্রজেন পদ্মার কাছে ঋণী হয়ে রইল।

গোনাগুনতি মাইনে দিয়ে বড় কঠিন হিসাব করে সারাটা মাস চালাতে হয়। পদ্মা বাড়ির কথা ভাবে। বাড়ীতে ওরা ছিল পাঁচজন কিন্তু নিত্য বাজারের বিলাসিতা তাদের ছিল না। মাছ তারা মাঝে মাঝেই খেত, দৈনন্দিন কোন ব্যাপার ছিল না, আর প্রতিদিনের প্রয়োজনটা বাড়িতে ফলানো তরীতরকারীতেই মিটতো, তাছাড়া গরু ছিল ও মুরগী ছিল, তাদের পেছনে অলকা আর পদ্মা খুবই খাটাখাটনী করতো, বদলে তারাও অনেক দিত।

এখানে প্রতিটি জিনিষ কিনে আনতে হয়, একটামাত্র ঘরে ওরা কয়লা জ্বালায় না, ঘরের সব জিনিষ এমনকি কাপড়চোপড়ও নোংরা হয়ে যায়, ব্রজেনও কোনদিন কয়লা জ্বালায়নি, পদ্মা জ্বালালো না। অবশ্য পরিশ্রম অনেক বাঁচে কিন্তু তাদের টাকাটা যে বড়ই কম।

ন'টার মধ্যে ব্রজেন বেরিয়ে যায় ফিরতে ফিরতে সন্ধে, অনেকদিন রাতও হয়। পদ্মা দরজা বন্ধ করে বেশীর ভাগ সময় ঘরে বসে থাকে, সামনে বেরোলেই রাস্তা, অনেক দোকান, ঘরেরই পেছনে পরিবার আছে, পদ্মা তাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে একটু আধটু গল্পসল্প করে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয় না। পদ্মা বড় অন্যরকম। তবু যখনই তারা কেউ আসে পদ্মা যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করে তারাও খুশী হয়। ঘরে একখানাই তক্তপোষ সেখানেই ওরা বসে একটু গল্প করে চলে যায়। এই বৌটি সম্পর্কে তাদের বড় কৌতূহল পদ্মা বুঝতে পারে, এই লাজুক লাজুক পুতুল পুতুল বৌটি মায়া জাগায়, সবকিছুর মধ্যে থেকেও মনটি যেন তার অন্য কোথাও পড়ে আছে।

একটু একটু করে পদ্মা পরিণত হতে থাকে, একটি ঘরে সে শুধু বধূ নয়, ঘরণী গৃহিণী, সবই। সংকটের সঙ্গে যখন তার প্রথম পরিচয় হতে সুরু হয়েছে, তখন থেকেই সে ভাবতে শিখেছে সে ভাবনা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, পদ্মা চিন্তা করতে শিখছে, চিন্তা করতে করতে ব্রজেনের সঙ্গে নানা রঙ্গিন পরিকল্পনার কথা বলতে বলতে পদ্মার মনটাও ধারালো হয়ে উঠছে, মা বাবার ঘরের সেই আবরণ থেকে পদ্মা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে সুরু করেছে। সারাদিন একটা কর্মহীনতা আছে, এই অখণ্ড অবসর তাকে খুশী করে না পীড়া দেয়, সব সময় কি করি কি করি তার মাথায় ঘোরে। ব্রজেন যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে তার কোন কাজ করার থাকে না এই সময়টাই তার কাটে না।

ব্রজেনের এক বন্ধু দু'দিন এখানে ন'টায় খেয়ে অফিস গেল, পদ্মা খুশী হয় তার কাজ একটু বেড়েছে, একজন নয় দুজনের জন্য সে রাঁধে একটু যত্ন বেশী প্রয়োজন হয় একটু বেশী ভাবতে হয়, বাইরের একজন লোক খাবে একটু রকমফেরও করতে হয়। অনেক সময় কি করবে সে ভেবে পায় না। সামান্য উপকরণকে হাতের গুণে অসামান্য করে তোলার নিপুণতা এখনও তার আয়ত্ত হয়নি, অনেক সময় পদ্মা তার নিজের মায়ের কথা মনে করে।

পদ্মা ঠিক পেরে উঠবে কিনা ব্রজেন ভাবছিল, কিন্তু তার এই খুশী খুশী ভাব ব্রজেনকে আশ্বস্ত করলো।

একটা পরিকল্পনা তার আছে সেটাই সে পরীক্ষা করে দেখছিল, সুরুটুকু ভালই। বন্ধুও খুব খুশী! এই খাওয়াটা তাকে হোটেলে সারতে হচ্ছিল, বাড়ির খাবার পেয়ে সে বেঁচে গেল;তারপর রাত্রেও খেলো, বললো, এখন থেকে এখানেই আমি খাবো,—পদ্মা ভাবলো রসিকতা করছে, কথাটায় অবশ্য রসিকতার রং মেশানোই ছিল, কিন্তু সত্যি সত্যি সে এখানেই খেতে লাগলো। ব্রজেন বলে রমেন তো খুব খুস্তী পদ্মা সলাজ হয় বলে রান্না ঠিকমত হচ্ছে?

মাসের শেষে ব্রজেন একশটাকা পদ্মার হাতে তুলে দিল 'রমেনের জন্য নিশ্চয় এর বেশী খরচ হয়নি হিসেব করে দেখ',—পদ্মা ঠিক হিসেব করে উঠতে পারে না, সারা মাসের খরচের হিসেব তার মাথায় নেই। ব্রজেন হাসি হাসি মুখে বলে 'এর মধ্যে তুমি চল্লিশ টাকা পাবে পদ্মা, আমি দেখেছি হিসেব করে ষাট টাকার বেশী খরচ হয়নি।' পদ্মা লজ্জা পায়—'আমি কি করে রোজগার করলাম, তুমি বুদ্ধি করে বাজার করেছ, কি করে কি করব বলে দিয়েছ—।'

"তুমি পরিশ্রম করেছ, আমি যেমন যেমন বলেছি ঠিক তা করেছ কাজেই এ চল্লিশ টাকা তোমার। কেরোসিন আর রান্নার তেলে একটু প্ল্যান করে চালালে আরও কম পড়বে। তুমি রাজী হলে রমেন এখানেই খাবে, হোটেল থেকে তার কম খরচ পড়ছে, আর তোমারও কিছু বাড়তি টাকা হবে।" পদ্মার সময়ের সমস্যা মিটে যায়, আর একটু হাসি গল্প ঠাট্টা, প্রতিদিন একটু রঙ্গের ছটা।

একজনই শুধু নয় পাঁচটি বন্ধু এখানে খেতে চাইল, নটায় ভাত, বিকেলে ফিরে চা মুড়ি আর রাত্রে রুটি। একখানা মাত্র ঘর। বন্ধুরা নিজের থেকেই বলে, তারা ঘর আটকে রাখবে না, দশটার মধ্যে তারা খেয়ে অফিস চলে যাবে তারপর ফিরেই চাটুকু খেয়ে আর আসবে রাত নটায়, খেয়ে দেয়ে দশটার মধ্যেই যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। এই সময়টা থাকল ব্রজেন আর পদ্মার, একটু চা করে দিয়েই বিকেলটা বা সন্ধেটা তারা নিজের মতো কাটাবে।

পদ্মা অবাক হয়ে যায় টাকা রোজগারের কত অসম্ভব পরিকল্পনা সে কতবার করেছে কিন্তু এতো অনায়াসে হয়ে গেল, সত্যি সে নিজে উপার্জন করছে। আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে পদ্মা ভাবলো এবার সে কেবল অন্যের মুখ চেয়ে বাঁচবে না, তার নিজেরও হাতে বল এসেছে, সে আর অন্যের প্রয়োজন মেটাবার যন্ত্র নয়, স্বাধীন চিন্তায় বাঁচার একটা পথ তার খুলে গেছে।

আজ দুপুরের পর বসে মাকে চিঠি লিখছে, তার জীবনে একটা রূপান্তর এসেছে, একটা আবরণ থেকে সে যেন বেরিয়ে এসেছে, এই চেতনার উদ্ভাসেই তার মুক্তি। নিজেকে অকৃতার্থ অকর্মণ্য মনে হচ্ছে না, জীবনটার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস তার এসেছে। সে লিখছে—

মা, অনেকদিন তোমাদের চিঠি পাইনি। পনরদিন আগে একবার ভাই এসেছিল আমাদের যেতে বলেছিল যাওয়া হয়ে উঠেনি।

মাগো, তুমিতো আমাকে একবারে পরই করে দিতে চেয়েছিলে, আর এখন ভেবে যা দেখছি আমাদের সংসারের নিয়মে মেয়েদের পরই হয়ে যেতে হয়,—কিন্তু কেন? এ নিয়ম আমরা মেনেই বা নেব কেন? এর কি কোন প্রতিকার করা যায় না মা, আমাকে আমার সব কিছু মুছে সবরকমে অন্য একটা পরিবারের মানুষ হয়ে যেতে হবে এ নিয়ম কারা বানিয়েছিল? আমার ঘর সংসারে থেকেও আমি তোমার মেয়ে হয়েও থাকতে পারি, তাতে আমার অন্য পরিচয়ে বাঁধা হবে কেন? একই মেয়ে একসঙ্গে বধূ, স্ত্রী, জননী সবই হতে পারে শুধু তার কন্যা পরিচয়টিই মুছে ফেলতে হবে?

আমি স্থানান্তরে থাকতে পারি সেতো ছেলেরাও থাকে, তারা কিছু আর সবসময় মা-বাবার সঙ্গে থাকতে পারে না। তাদেরও নিজেদের সংসার হয় বৃহত্তর ক্ষেত্রে, মা-বাবারও সেখানে একটা ভূমিকা থাকে, শুধু মেয়ের বেলায়ই অন্য রকম?

আমি যেখানেই থাকি, আগে আমি তোমাদের মেয়ে আমার এ পরিচয় মুছে ফেলা যাবে না। আমাদের আলাদা সংসার থাকতে পারে, তাতে সমস্যার কি আছে?

ভবিষ্যত দেখাবে আমি কি করবো, তোমার পদ্মা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, তোমার সে ছোট মেয়েটি আর নেই। শুনে অবাক হবে আমি এখন টাকা রোজগার করছি, কিভাবে করছি পরে জানতে পারবে, এটা খুবই ভাল হয়েছে যে নামহীন খ্যাতিহীন মর্যাদাহীন অবিরাম কর্মে আমাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয় এমন বাড়িতে আমার বিয়ে হয়নি অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির একটা হোটেলও আমাকে চালাতে হয় না আর বড় চাকুরে স্বামীর হাজার বায়নাক্কাও আমাকে পোয়াতে হয় না। পাশের বড়ির মিত্রার কথা মনে পড়ে? বড় ঘরে বড় চাকুরে স্বামী, তবুও প্রত্যেকবার অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি সুস্থ হয়ে যাবার জন্য আসত? তোমরা তো আমাকে এমনভাবে রাখতেই পারতে না।

টাকা রোজগারের মধ্য দিয়ে আমি টাকার চেয়েও একটা বড় জিনিস পেয়েছি স্বাধীনতা। এজন্য তোমার জামাইকেও সাধুবাদ দিও, আমি স্বাধীন হলে সে ভয় পায় না খুশী হয়, সে বলে 'তুমি স্বাধীনভাবে ভাবতে পারলেই আমি তোমাকে বন্ধু আর সঙ্গী হিসাবে পেতে পারি নইলে তো কেবল বোঝা। আমি স্ত্রীকে আমার বোঝা করে রাখতে চাই না।' তোমার জামাই আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছে মনে হয় এটা কলকাতার গুণ।

মা, আমরা অনেক পরিকল্পনা করি তাতে একদিন হয়ত তোমার জামাই এ চাকরী ছেড়েও দিতে পারে, তখন আর পিওন বলে তার সঙ্গে একটা অবজ্ঞা মিশিয়ে থাকবে না।

আর চাকরী না ছাড়লেই কি, আমাদের পা যদি শক্ত হয়, পায়ের নিচে মাটি যদি কঠিন হয়, আমরা সামনেই হাঁটবো পিছিয়ে থাকবো না।

সামনের মাস থেকে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাবো, আমার উপার্জনের টাকা। তোমরা আমার প্রণাম নিও। এই রবিবারে আমরা যাবো।

প্রণাম অন্তে—পদ্মা।

সুখ

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

—এখনো ভেবে দ্যাখ নিমাই। তোর ওপর শ্রমিকদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। তোর সহযোগিতা না পেলে আমরা ধর্মঘট চালাতে পারবো না। তোর স্বার্থও তো এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তুইওতো আমাদেরই একজন! তুই আমাদের সঙ্গে হাত মেলালে আমরা বাকী লোকগুলোকে সঙ্গে পাবো। মালিক নরম হোতে বাধ্য হবে।

অস্বস্তি বোধ করে নিমাই—তোমরা আমায় ভুল বুঝো না মধুদা। তোমরা মনে করছো ধর্মঘট করেনি যারা তাদের আমি পরিচালনা করছি, আমার কথামতো ওরা ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছে না, কিন্তু তা নয় মধুদা।

—তোর কথামতো ওরা ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছে না তা আমি বলিনি। আমি শুধু বলতে চাই, তুই কারখানায় না গেলে ওরাও যাবে না। তুই একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবি না নিমাই, আমাদের চেয়ে ওদের ওপর তোর প্রভাব অনেক বেশী। এটা তো আমরা সবাই জানি যে আগের ধর্মঘটে আমাদের সাফল্যের ব্যাপারে তোর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের একটা বড় অংশ তোর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল।

—সে আজ পাঁচবছর আগের কথা। তখন পেরেছিলাম বলে এখনো পারবো, এমন ভাবলে কি করে?

জ্বলন্ত বিড়ি মুখ থেকে ফেলে দ্যায় হারাণ—আলবৎ পারবি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তোকে পাওয়া মানে আরও পঞ্চাশ জন শ্রমিককে পাওয়া। তখন কি করবে মালিকপক্ষ ওই তিন-চার জন কর্মীকে নিয়ে? তাছাড়া তুইতো এটা ভালো বুঝিস যে আমাদের মধ্যে যদি ঐক্যের অভাব ঘটে তাহলে আমাদের আন্দোলনের ইমেজটাই নষ্ট হোয়ে যাবে।

—আমাকে দোষী সাব্যস্ত না করে তোমরাই ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলো হারাণদা।

নিমাইয়ের হাতে হাত রাখে মধু—কথা আমরা যথেষ্ট বলেছি নিমাই। ওরা তোর মুখ চেয়েই বসে আছে। তুই একবার ডাক দিলেই ওরা আসবে।

চুপ করে থাকে নিমাই। তার কাঁধে হাত রাখে বংশী, এর আগের ধর্মঘটে তুই আন্তরিকভাবে লড়াই করেছিলি। সেই আন্দোলনে তোর ছিল এক বিরাট ভূমিকা। কিন্তু এবারে কেন যে তুই নিজেকে সরিয়ে রাখছিস, কিছু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা নিমাই, তোর কি মনে হয় আমাদের এই ধর্মঘট অন্যায়? মালিকের কাছে আমাদের দাবীগুলো কি অমূলক?

—না না বংশীদা। সে প্রশ্ন ওঠেই না, এ দাবী আমাদের সকলের। এ দাবী ন্যায্য। এ আমাদের বাঁচার লড়াই।

মধু এসে হাত চেপে ধরে নিমাইয়ের—তাহলে বল, কেন তুই এখনো মালিকের সেবা করছিস? ধর্মঘটের দু'মাস পূর্ণ হোতে চলল, তবু আমরা তোকে পেলাম না। আমরা

জানি, মালিক পক্ষ তোকে ভয় পায়। তুই ধর্মঘটে যোগ দিলে ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। ওবা আমাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে। পিঠে হাত বুলোয় হারাণ—জানি নিমাই, নোতুন বিয়ে করেছিস। সংসাব পেতেছিস। দোটানায় পড়ে তাই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিস না। কিন্তু সংসার তো আমাদের সকলেরই আছে ভাই। সংসারের মানুষদের সুখী করবার জন্যেই তো আমাদের এ লড়াই। বাবা-মা-বৌ-ছেলেমেয়ের মঙ্গলের জন্যেই তো আমাদের ধর্মঘট।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে নিমাই। তারপর বিড়ি ধরায়।

—কথা দে নিমাই, তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি।

—আমায় একটু সময় দাও হারাণদা। আমায় একটু ভাবতে দাও।

বিড়ি ধরায় মধু—বেশ তো! নিমাইকে আজ এখন ছেড়ে দাও, রাত হোয়েছে। ও বাড়ি যাক। পরে আবার কথা হবে ওর সঙ্গে।

বুকের মধ্যে অস্থিরতার ঝড় নিয়ে হেঁটে চলেছে নিমাই। আকাশে ঘন মেঘ। আকাশটা যেন নেমে এসেছে তার মাথার ওপর। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাস্তার আলো নিভে গেছে অনেক আগেই। বৃষ্টি বোধ হয় এখনই শুরু হবে, চলার গতি বাড়ায় নিমাই। বাড়িতে গৌরী একা আছে। নিশ্চয়ই পথ চেয়ে বসে আছে নিমাইয়ের জন্যে। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে নিমাইয়ের—হারাণদার ধারণাই ঠিক। ধর্মঘটে ষোলআনা সমর্থন থাকতেও সে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মঘটে যোগ দিতে পারেনি। নিজেকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হয় ঠিকই। কিন্তু গৌবীর কাছে এলে ওসব কথা তার বেশীক্ষণ মনেই থাকে না। গৌরীকে কষ্ট দিয়ে ধর্মঘটে যোগ দেবার কথা সে ভাবতেও পারে না। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাশ করা মেয়ে গৌরী। সে এই ছন্নছাড়া, ভিটেছাড়া নিমাইকে ভালবেসে পালিয়ে এসেছিল তার সব ছেড়ে। নিমাইকে ভালবেসেই সে গড়ে তুলেছে তার ছোট্ট সুখের সংসার।

গৌরীকে সে কথা দিয়েছে, তাকে সুখী কববেই। তাই বিয়ের পর বস্তির বাস উঠিয়ে দিয়ে বস্তির এলাকা থেকে অনেক দূরেই ছোট্ট একটা বাসা নিযেছে নিমাই। সেই ছোট্ট বাসাটুকু সস্তা সামগ্রীতে সুন্দর করে সাজিয়েছে গৌবী। ছ'মাস না যেতেই কেমন করে সেই সুখের বাসাটুকু ভেঙে দেবে নিমাই? সে যে তাকে সুখী কববে বলে কথা দিয়েছিল। সে কথা ফিরিয়ে কেমন করে সে ধর্মঘটীদের কথা দ্যায়! হাতে মাত্র তিন রাত্রি সময়। আবার দেখা করবে হারাণদারা। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে। সে কি গৌরীকে জানাবে সব কথা? গৌরী যদি আঘাত পায়? নিমাইকে যদি সে ভুল বোঝে? না না, এসব চিন্তার বোঝা গৌরীর মাথায় সে কিছুতেই চাপাতে পারবে না, তার দেওয়া সামান্য সুখেই সন্তুষ্ট গৌরী। সে সুখটুকু কেড়ে নেওয়া নিমাইয়ের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

—মধুদা তো ঠিকই বলেছে গুরু। মালিক পক্ষের এতো অত্যাচার সহ্য করে আমরা বাঁচবো কি করে? খাটবো আমরা, কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখবো আমরা, আর লাভের সবটাই খাবে মালিক! সারা দিনরাত গতর খাটিয়ে আমরা কি পাই বলতো! দিনকে দিন

কারখানা ফুলে ফেঁপে উঠছে আর আমরা শালা যেমন ছিলাম তেমনই থাকবো। তাও আবার ইচ্ছেমতো ছাঁটাই করবে, বোনাস বাড়াবে না, যখন তখন লক আউট ঘোষণা করবে। এটা কি একটা চাকরী হ'ল?

আনন্দর কথার রেশ টেনেই বদ্রু বলে চলে—এতো গধ্বা কি মাফিক জীবন হ্যায়। সির্ফ কাম করো আউর চাবুক খাও। ক্যায়সা ইয়হ জীবন নিমাইদাদা? অব হী কুছ হোনা চাহিয়ে।

—সে তো আমিও জানি বদ্রু। আমারও তো ইচ্ছে হোচ্ছে আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করি মালিকের বিরুদ্ধে। আটাত্তরের ধর্মঘটের সময় যে মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আবার সেইভাবে ফিরিয়ে আনি নিজেকে।

—সাব্বাস! লেকিন ভাওনা কিঁউ? তুম হমারে গুরুকে জ্যায়দা। তুম আওয়াজ দো তো হম সব স্ট্রাইক করনেকে লিয়ে তুম্‌হারে পাশ খড়া হো জায়েঙ্গে।

আনন্দ বিড়ি ধরিয়ে বলে—তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করো গুরু। তুমি আমাদের সুখে দুঃখে অকৃত্রিম বন্ধু। তোমার পরামর্শ না নিয়ে আমরা কিছুই ক'রবো না।

আনন্দর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফয়ের বলে—আমরা জানি, তুমি যা করবে তা ন্যায্যই করবে। আমরা প্রস্তুত। তুমি বললে কাল থেকেই কাজ বয়কট। কি বলিস বদ্রু?

—জরুর!

নিমাইকে চুপ করে থাকতে দেখে অসীম বলে—আচ্ছা নিমাইদা, এই ধর্মঘটের ব্যাপারে তোমার কি কিছু বলার আছে? তুমি বলছ আমাদের ধর্মঘট করা উচিত অথচ তুমি যেন মনের দিক দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে যাচ্ছো। তুমি কি অন্য কিছু ভাবছো?

—না না। ভাববার কিছু নেই। শুধু...

—শুধু কি?

—তোর বৌদির শরীরটা খুব খারাপ। তাই ভাবছি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে রানীগঞ্জে মামার বাড়ি থেকে ওকে একটু ঘুরিয়ে আনতে হবে। বিয়ের পরে তো বেরোয়নি কোথাও! মনটাও ওর খুব ব্যস্ত হোয়েছে।

—সেটা আর এমন কি ব্যাপার? বরং ভালই হবে। বৌদির দায়িত্ব একটা কোথাও চাপাতে পারলে তুমি তো নিশ্চিন্ত। তারপর লালঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো সামনের সারিতে। আমরাও কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়বো তোমাদের পাশে।

—অব্ সিদ্ধান্ত্ শুনাও গুরু।

—আমায় দু'চারদিন সময় দে বদ্রু। আমি পরশু তোর বৌদিকে নিয়ে রানীগঞ্জে যাচ্ছি। ওকে রেখেই আমি চলে আসছি। তারপর শুরু হবে আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট।

—সাব্বাস গুরু!

মুখের বিড়ি ফেলে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে অসীম—চল্ আনন্দ, খবরটা মধুদাকে এক্ষুনি দিয়ে আসি। তুমি বাড়ি গিয়ে বৌদিকে চায়ের কথা বলে রেখো নিমাইদা, সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই যাবো।

আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে হোয়ে যায় নিমাইয়ের—না, না, গৌরী ভীষণ অসুস্থ। কিছু মনে করিসনে ভাই। ও রানীগঞ্জ থেকে ফিরলে একদিন যাস, কেমন?

অবাক চোখে নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। বন্ধুদের চোখের ভাষা বুঝতে পেরে লজ্জায় মাথা নিচু করে নিমাই। নীরবতা ভেঙে বদ্রু বলে—ঠিক হ্যায়। ওইসা হী হোগা।

গৌরীর জন্যে একজোড়া শাড়ি, জুতো আর কিছু ইমিটেশনের গয়না কিনেছে নিমাই। একটা সুন্দর ভ্যানিটি ব্যাগও নিয়েছে সে। ভীষণ খুশী হবে গৌরী। কিন্তু মনের মধ্যে লড়াই থামে না নিমাইয়ের। হাতে মাত্র দুটো রাত। এর মধ্যে একটা কিছু করতেই হবে তাকে। বড্ড নিঃসঙ্গ লাগে তার। ভীষণ ইচ্ছে হয় সবকিছু গৌরীকে বলতে। কিন্তু আবার পিছিয়ে আসে। গৌরীর এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। ওকে সুখে রাখতেই হবে। নিমাই জানে, ছাঁটাই হ'লে প্রথম সারির আন্দোলনকারীরাই ছাঁটাই হবে। তাহলে সেও বাদ যাবে না। তখন সে গৌরীকে নিয়ে কি করবে? তাছাড়া ধর্মঘট কবে শেষ হবে তারও কোনো ঠিক নেই। নিমাই চায় না অন্য শ্রমিকদের বউয়ের মতো গৌরীও খালের শালুক তুলে খাক। নানা বিশৃঙ্খল চিন্তার জট মাথায় নিয়ে বাসার দিকে হাঁটতে থাকে নিমাই।

আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে ওঠে গৌরী—ভীষণ ভালো হবে গো। কতদিন কোথাও বেড়াতে যাইনি। মামা-মামীমাও আমাদের দেখে খুব খুশী হবেন তাই না? তুমিও তো ওখানে কত বছর যাও না শুনেছি। একা একা বাড়িতে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। কিছুদিন হ'ল তোমার একজন বন্ধুবান্ধবও আমাদের বাসায় আসে না। কেন বলতো?

—আমাদের বাসাটা ওদের বস্তি থেকে অনেক দূর হোয়ে গেছে গৌরী। তাছাড়া সংসারের ঝামেলায় মানুষের সময়ও বড় কম।

—কতদিনের ছুটি নিলে তুমি?

—পনেরো দিনের ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি। যদি ওখানে ভালো লাগে তবে আরো পনেরো দিনের দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবো।

—একমাসের ছুটি! পরের বাড়িতে এতদিন! তাছাড়া অতোদূরে যাতায়াতের খরচ।

—কিছু টাকা ধার করেছি। ওতেই চলে যাবে।

—তোমার অফিসের বন্ধুরা কিছু বলছে না?

—ওরা জানেই না।

—কেন?

—ওদের বলিনি।

—ওমা! কেন?

—ওরা পেছনে লাগবে তাই। যাবার দিন সবাইকে জানিয়ে যাবো। নাও। রাত হোয়েছে অনেক। শোবে চলো।

—না। আমি এখন গোছগাছ করব। তুমি শুয়ে পড়োগে। আমি একটু পরে আসছি।

নিমাইয়ের বন্ধুদের কিছু না জানানোয় সন্দেহ উঁকি মারে গৌরীর মনে।

বস্তি এলাকায় ঢুকতেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে গৌরীর। সেদিনকার মতো কোনো উচ্ছ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। মন্টুর বউ, রসিদের মা, বাসুর বোন প্রত্যেকেই তাকে বসতে দিয়েছে, কথা বলেছে কিন্তু কারো ব্যবহারেই সেই আন্তরিকতা খুঁজে পাচ্ছে না গৌরী। প্রত্যেকের মুখে যেন বিষাদের ছায়া। কি যেন হোয়েছে এই বস্তির মানুষগুলোর। রসিদের হাড় জিরজিরে ছেলেটাকে দুখানা শুকনো রুটি চিবোতে দেখে কৌতূহল চাপতে পারে না গৌরী—তোর ছেলে রুটি খাচ্ছে কেন রে রেহেনা? ওর কি অসুখ?

—না দিদি।

—তবে? রুটি খাচ্ছে কেন ও? ভাত দিসনি কেন?

—ভাত পাবো কোথায় দিদি?

—তার মানে?

—রুটি তাই সবদিন জোগাড় হয় না!

—তুই বলছিস কি রেহেনা? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

—কেন, তুমি ধর্মঘটের কথা শোননি?

—ধর্মঘট! কোথায়!

—কারখানায়। দু'মাস ধরে ধর্মঘট চলছে। দু'মাস মাইনে বন্ধ। এ বস্তিতে কারো হাঁড়িতে আর ভাত জোটে না। বাড়ির লোকেরা বাইরে জন খেটে কোনো রকমে রুটির জোগাড়টা করে যাচ্ছে। বস্তির অনেক মেয়েই শহরে ঝি খাটতে বেরিয়েছে।

এক ঝুড়ি শালুক কাঁখে নিয়ে বিজয়া এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে পড়ে উঠোনে একটা তক্তার ওপর। সামনে রাখে শালুকের ঝুড়ি। বিজয়ার হাত-পা চুপসে সাদা হোয়ে গেছে। রোদ্দুরে ঝলসে গেছে তার মুখ। চোখ দুটো লাল। অস্থির হোয়ে ওঠে গৌরী—শালুক তুলতে কোথায় গিয়েছিলি বিজয়া?

—বিলে।

—এগুলো কি খাবি তোরা?

—না খেয়ে আর কি ক'রবো বৌদি! পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা!

—কিন্তু এসব খেয়ে মানুষ কতদিন বাঁচে!

—বেশীদিন আমাদের কষ্ট করতে হতো না যদি নিমাইদা ধর্মঘটে যোগ দিত। নিমাইদা যে মালিকের লোক হোয়ে যাবে আমরা ভাবতেও পারিনি।

—না রে বিজয়া। ও তোদের ভুল ধারণা। ও মালিকের লোক হোতেই পারে না।

—তবে কেন ধর্মঘটে যোগ দিল না?

—আমি ওকে বুঝিয়ে বলব রে। ও নিশ্চয়ই তোদের সঙ্গে থাকবে। তুই ভিজে কাপড় ছাড় বিজয়া।

—এখন আমার কাপড় ছাড়তে গেলে চলবে না বৌদি। এখন আমাকে সামাদ ভাইয়ের ঘরে যেতে হবে। ওর বউটার খুব অসুখ। ঘরে খাবার কিছু নেই। গণ্ডা কয়েক শালুক ওকে দিয়ে আসব। সেদ্ধ করে খাবে।

—কেন, ওর একটা গাই গরু ছিল না? সেটা তো দুধ দেয়।

—আর দুধ! গরুটাই বিক্রী হোয়ে গেছে। আমি যাই বৌদি। তুমি একটু ব'সো। আমি এক্ষুনি আসব।

—চল বিজয়া, আমি তোর সঙ্গে যাবো। দেখে আসবো সাকিনাকে।

অন্ধকারের বুক ভেঙে এগিয়ে চলেছে দুটো মানুষ। স্টেশনের দিকে। একজন নিমাই। অন্যজন গৌরী। এখন শেষ রাত। চারিদিকে নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। তবে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে কোথা থেকে ডেকে উঠছে একটা কুকুর। মৃদু হাওয়া বইছে মাঝে মাঝে। স্টেশানে পৌঁছে যায় মানুষ দুটো। পাশে বাক্স রেখে বেঞ্চিতে বসে পড়ে গৌরী। টিকিট কাটতে চলে যায় নিমাই। সারারাত ঘুমোতে পারেনি গৌরী। ঘুমোয়নি নিমাইও। গৌরী জানে কেন সে নিজে ঘুমোতে পারেনি। কিন্তু নিমাইয়ের ঘুম না হবার কারণ সে জানে না। নিমাইও জানে তার নিজের কেন ঘুম হয়নি। কিন্তু গৌরীর ঘুম না হবার কারণ তার জানা নেই। হাতে টিকিট নিয়ে গৌরীর পাশে এসে বসে পড়ে নিমাই।

—কি ভাবছো গৌরী?

—ভাবছি, আমরা বিয়ের পর এই প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কারো মনেই যেন আনন্দ নেই।

কোথায় যেন ধাক্কা খায় নিমাই—কে বলেছে আনন্দ নেই? তুমি তো সেই পরশু রাত থেকে গোছগাছ করতে শুরু করেছো।

—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু পরশুদিনের সেই অনুভূতিটুকু আজ আর নেই।

—কি যাতা বকছো? গাড়ি আসতে আর মিনিট পাঁচেক দেরী। কি হল তোমার বলতো? কাল কারখানা থেকে ফিরে তোমার মুখে আর হাসি দেখলাম না।

—আমার মুখে হাসি ছিল না ঠিকই। কিন্তু তোমার হাসিটাও কাল থেকে বড্ড কৃত্রিম মনে হোয়েছে আমার।

আবার বুকের মধ্যে ধাক্কা খায় নিমাই।

—এইসব ভেবেই বুঝি কালরাতে ঘুম এলো না তোমার?

—তুমি ঘুমোলে না কি ভেবে?

চোখ তুলে সোজা তাকিয়ে থাকে গৌরী নিমাইয়ের চোখের দিকে। চোখ নামিয়ে নেয় নিমাই। অনেক চেষ্টা করে হাসি আনে মুখে। দু'জনেরই টেনশান, কি যে বলো?

দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়। সচকিত হোয়ে ওঠে অখ্যাত স্টেশানের মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাত্রী। তল্পিতল্পা নিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে আসে গৌরী আর নিমাই। ট্রেন ঢোকে প্ল্যাটফর্মে। জামাকাপড় বোঝাই ব্যাগ দুটো নিয়ে আগে আগে উঠে যায় নিমাই একটা ফাঁকা কামরায়। ব্যাগ দুটো রেখে জায়গা নেয় সে। তারপর পিছন ফিরে দ্যাখে গৌরী ওঠেনি। জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে স্ট্যাচুর মতো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী।

—উঠে এসো গৌরী। এ কামরাটা একদম ফাঁকা। শিগগির এসো।

—আমি উঠবো না। তুমি যাও।

—কি পাগলামি করছ? ট্রেন ছেড়ে দেবে যে!

—বললাম তো আমি যাবো না।

বিভ্রান্ত হোয়ে পড়ে নিমাই। তাড়াতাড়ি নেমে এসে গৌরীর হাত ধরে—এসো ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে।

হাত ছাড়িয়ে নেয় গৌরী। ট্রেন চলতে শুরু করল।

—যাও উঠে পড়। তোমার মামার বাড়ির ট্রেন চলে যাচ্ছে।

—কিন্তু তুমি কেন যাবে না?

—আমি যাবো। তবে ডাউন ট্রেনে। বিজয়াদের বস্তিতে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নিমাই গৌরীর মুখের দিকে। তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে ট্রেনের শেষ বগীটাও আর দেখতে পায় না নিমাই।

—ব্যাগ দুটো নামানো হয়নি। ওর মধ্যে তোমার নতুন শাড়ীগুলো। ভ্যানিটি ব্যাগটাও রয়েছে! আমার জামাকাপড় সব গেল।

—তাতে আমার সুখের ব্যাঘাত ঘটেনি একটুও।

রেগে ওঠে নিমাই—কি বলতে চাও একটু স্পষ্ট করে বলতো গৌরী। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

—তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছো না!

—না না।

—তুমি কি আমায় সত্যিসত্যি সুখী করতে চেয়েছো? তুমি কি আমায় সত্যিসত্যি ভালবাসো?

—গৌরী! তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি কি না করেছি।

—অমন সুখ আমি চাইনি, চাইনি। কান্নায় ভেঙে পড়ে গৌরী।

গৌরীর হাত ধরে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে এনে বসায় নিমাই।

—তুমি আমাকে এতো ছোট করে দিতে পারলে? তোমার কাছে আমার প্রয়োজন এতো কম?

—আমায় একটু বুঝতে দাও লক্ষ্মীটি।

—তোমাদের কারখানার ধর্মঘটের কথা আমায় বললে না কেন? কেন বন্ধুদের দুর্দশার মুখে ফেলে রেখে, মিথ্যে কথা বলে পালিয়ে যাচ্ছিলে চোরের মতো? তুমি এতো স্বার্থপর!

—কিন্তু তুমি এসব জানলে কি করে?

—কাল দুপুরে আমি গিয়েছিলাম ওদের বস্তিতে। দু'মাস ধরে মানুষগুলো আধপেটা খেয়ে, শালুক খেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। আর তুমি। বউকে সুখে রাখবার জন্যে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

—না গৌরী, না। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

—তবে ধর্মঘটে যোগ দিলে না কেন? শ্রমিকদের দাবী তো অন্যায্য ছিল না। বস্তি থেকে ফিরবার পথে বদ্রুর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তুমি ওদের আশা দিয়েও আজ পালিয়ে যাচ্ছিলে। আর ওরা তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

—আমায় ভুল বুঝো না গৌরী। তোমার বাবা-মার কাছ থেকে তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে এসেছি। তাই আমি চাইনি তুমি কষ্ট পাও, তুমি অসুখী হও। শুধু তোমার মুখের কথা ভেবেই নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

—সুখ কাকে বলে তুমি জানো না, তুমি জানো না। জান না বলেই তুমি আমায় সত্যিকারের সুখ থেকে বঞ্চিত করেছো।

—গৌরী তুমিও জানো না কতদিন ধরে মনের সঙ্গে লড়াই করেছি আমি? বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি…

—তবু সেসব কথা জানবার অধিকার ছিল না গৌরীর।

—কতবার ভেবেছি তোমায় বলব সব কথা। কিন্তু…

—বিশ্বাস করোনি, তাই বলতে পারোনি! মাথা নিচু করে নিমাই।

—বে হেনা, লক্ষ্মী, কমলারা ভাগ্যবতী। ওদের স্বামীরা ওদের বিশ্বাস করে। তাই ওরা ছেঁড়া শাড়ি কোমরে জড়িয়ে রুক্ষ চুলে সারাদিন বিলে শালুক তুলে বেড়ায়। সামাদের বৌ খালি পেটে জ্বর গায়ে শুয়ে শুয়ে ভুল বকে, তবু সে সামাদকে অভিশাপ দেয় না। আর আমি! আমি একা, একেবারে একা, আমার স্বামীর মনে প্রবেশ করবার কোন অধিকার নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়ে গৌরী। বুকের মধ্যে মুখ গোঁজে নিমাইয়ের।

—আর আমার ভুল হবে না। নিমাই বলে।

আবছা অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিমাইয়ের চোখে তৃপ্তির সমুদ্র। জল টলটলে চোখদুটো আরও বড়ো দেখায় গৌরীর। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে পুবের আকাশ। প্ল্যাটফর্মের শেডের নিচে ঘুম ভেঙে গেছে পায়রাগুলোর। বাঁশী শোনা যায় ডাউন ট্রেনের। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন। নিমাইয়ের শক্ত মুঠোয় ঘেমে ওঠে সুখী গৌরীর নরম হাত।

অজয়ের প্রেম

নির্ঝরিণী দেবরায়

পেশার কথা জানতে চাইলেই অজয় একটু মুশকিলে পড়ে। মুখটা কাল হয়ে ওঠে। প্রায় তোতলাতে শুরু করে। না হক অবান্তর কথা বলতে থাকে। এমনিতে অজয় বেশ সপ্রতিভ এবং গম্ভীর। রুজিরোজগারও নেহাৎ খারাপ নয়। বয়স তিরিশের কোঠা পেরোয় নি। অর্থাৎ সামনে তার সম্ভাবনার ভবিষ্যত।

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ড্রাইভার অজয়। যে সংস্থাকে রাজ্যসুদ্ধ লোক দিনরাত গাল পাড়ে। অজয়ের সেটা গায়ে লাগে। দীর্ঘদিন এই সংস্থাতে কাজ করছে অজয়। আজ পর্যন্ত তার হাতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। অজয়ের হাত পাকা, কাজেও ফাঁকি নেই। তার গাড়িতে সামান্য গলদ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ মেকানিককে রিপোর্ট করতে ভোলে না সে। নোংরা ময়লা চোখে পড়ামাত্র ক্লিনারকে নিয়ে পড়ে।

তেমন কোনো পারিবারিক দায়-দায়িত্ব নেই অজয়ের। কিছুটা লেখাপড়াও করেছে। কাজেই সহকর্মী অনেকের সঙ্গে তার মানসিকতা মিশ খায় না। সে নিজে থাকে টিপটপ। নিজের গাড়িখানাকেও ঝকঝকে তকতকে দেখতে ভালবাসে। ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে যায়। অজয় ক্ষুণ্ণ হয়। থাকলই-বা, শত অভাব অসুবিধে। নিজের হাতে যেটুকু করার সেটুকু না করে মাইনে নেয়া কেন? নিজেরা সময়মতো কাজে হাজির হবে না, ঠিকমতো কাজ করবে না, গেটপাস হয়ে গেলেই পথের রাজা বনে যাবে। বি-ডি রিপোর্ট দিয়ে সটকে পড়বে। পাঁচজনের অবহেলার জন্য দশজনের বদনাম। মানুষ উঠতে বসতে স্টেট বাসকে গাল মন্দ করছে। লজ্জায় মাথা কাটা যায় অজয়ের। প্রথম ঘরোয়া আলাপে বীণার মা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কোথায় কাজ কর বাবা?

প্রশ্ন শুনেই মাথা মাটির দিকে নেমে পড়েছিল অজয়ের। মনে হচ্ছিল রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তার সম্পর্কেও একটা খারাপ ধারণা হয়ে যাবে বীণার মায়ের। মুখ তুলতে সময় লেগেছিল তার। কোনো মতে বলেছিল, স্টেট ট্রান্সপোর্টের ড্রাইভার।

মাইনে কত দেয়?

হাজার খানেক—ওভারটাইমও থাকে।

বীণার মায়ের ছানিপড়া চোখে ভাষা ফোটেনি। ঠোঁট নড়েছে, হা-জা-র-টাকা—

বহুবছর এক হাজার টাকার কথা কানেও শোনেনি বীণার মা। স্বামী পরাণ বণিক রুপোর দোকানের কর্মচারী ছিল। তখন মালিকের হাজার হাজার টাকার কথা শুনত তার মুখে। বণিক গত হলে নিম্নবিত্ত ঘরের বিত্তহীন হতে সময় লাগেনি। এখন মা-মেয়ের পেট চালানোই দায়।

বীণার মায়ের বিড়বিড়ানি শুনে মুচকে হেসেছে অজয়। টাকাই আসল। ঐ টাকার অঙ্কটাই এক ধাক্কাতে তাকে অনেক ওপরে তুলে দিয়েছে। অভাবী বীণার মায়ের জন্য কষ্ট

হয়েছে অজয়ের। তার কর্মস্থান নিয়ে এক গাদা বাজে কথা না বলাতে বুড়িটাকে ভাল লেগেছে।

. বীণারা অজয়ের পড়শী। যারা ভালো চাকরি-বাকরি করে খাচ্ছে, ডাঁটে থাকে, গরিব বীণারা তাদের থেকে তফাতে থাকে।

বীণার লেখাপড়া সামান্য। মা-মেয়ে ফুটপাতে লেবু চা বেচে খায়। একখানা নড়বড়ে চটাওঠা টেবিলের ওপর ওদের চায়ের দোকান। টেবিলের নিচেটা তোলা উনুন, কয়লা, স্টোভ, ঠোঙা ইত্যাদি উপাদানে ঠাসা।

বিমর্ষ মেয়েটাকে প্রতি ভোরেই দেখা যায়। ডান দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘর থেকে সাজসরঞ্জাম টেনে আনছে। ছটার মধ্যে উনুনে আঁচ দেয় বীণা। ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচিয়ে দেখে কোনো বাঁধা খদ্দের এসে পড়ছে কিনা।

ক্রমে পাতলা হয়ে আসা ধোঁয়ার জাল বীণাকে জড়িয়ে ফেলতে থাকে। ভোরের কচি নরম রোদ এসে পড়ে ওর ফোলা ফোলা চোখে, ত্রস্ত মুখে। দ্রুত হাতে গ্লাস সাজায় বীণা।

বীণার চায়ের চাহিদা আছে। সস্তায় ভালো চায়ের জোগান দেয় বীণা। রকবাজ ছেলেরা এবং পথচারী সকাল-সন্ধ্যে বীণার দোকানে ভিড় করে থাকে। বীণার মা হিসেব বোঝে না। চোখেও ভালো দেখতে পায় না। মেয়ের পাশে টুলে বসে ভিড় ঠেকায়, খদ্দেরদের হাতে গেলাস ধরিয়ে দেয়।

ঐ লেবু চা পানের নেশাতে বীণা মেয়েটির সঙ্গে অজয়দের আলাপ-পরিচয়। মেয়েটা কথা বলে কম কিন্তু ওর চোখ দুটো শব্দময়। কারা মানী খদ্দের—কাদের আগে চা দিতে হবে সেটা ঠিক বোঝে। কম ভিড়ের সময় অজয় গিয়ে দাঁড়ালে একটা নির্দিষ্ট অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ভালো কাপে চা দেয়। কাপটা আবার নিজের হাতেই অজয়ের দিকে ঠেলে দেয় বীণা।

চোখের কোণাতে দেখে অজয়। এ ধরনের মেয়েদের এসব ছলাকলা ভালোই জানা থাকে।··· কথাটা ঝট্ করে ভেবে ফেলে খারাপ লাগতে থাকল অজয়ের। হয়তো পাড়ার লোক বলে এই খাতিরটুকু করে বীণা। পেটের দায়ে চা বিক্রি করে খেলেই খারাপ মেয়ে হবে এমন কি কথা আছে? তার নিজের জীবনটাও তো এমনি এমনি গড়িয়ে যায়নি। অনেক খেটে, প্রচুর ঘামরক্ত ঝরিয়ে আজ সে টাকার মুখ দেখেছে।

নিজের চেষ্টায় নিচে থেকে ওপরে উঠেছে অজয়। হাতে হঠাৎ পয়সা পড়া সত্ত্বেও তার স্বভাব বাঁকা পথ ধরেনি। বাজে আড্ডাটাড্ডাতে সে যায় না। সময় পেলে পড়াশুনো করে, নয়তো সভা-সমিতিতে যায়। তবে ভালো থাকার দিকে তার ঝোঁকটা কিছু প্রবল। নিজে সে বিড়িটি পর্যন্ত ছোঁয় না। কিন্তু ঐ এক নেশা, বাবু হবার নেশা। দপ্তরের দেয়া ইউনিফর্ম্ সে যথাসাধ্য ব্যবহার করে না। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে থাকে। সামান্য উত্তুরে হাওয়া বইলে তার গায়ের জামায় শাল ওঠে। অথচ এখনো সে বিয়ে করেনি। নিজেদের সমান-সমান ঘরে নাক উঁচু অজয়ের পছন্দমতো মেয়ে মেলা ভার। দুএকটি মেয়েকে যে চোখ পড়েনি তা নয়। কিন্তু নখের কয়েক আঁচড়েই তাদের আসল চেহারা

বেরিয়ে পড়েছে। অজয় কেটে পড়েছে। তাই চালচুলো নেই এমন একটি কিছু-না মেয়ে কেন তার চোখ টানছে সেটা অজয়ের নিজের কাছেই এক হেঁয়ালি। বীণা অবশ্য আর দশটি হাভাতে মেয়ের মতো নয়। ওর চোখেমুখে ঝগড়ার ভূমিকা লেখা নেই। পয়সা নেবার বেলা গুনেও দেখে না। ঠক্ করে টিনের ছোট্ট কৌটোটাতে ফেলে দেয়। অজয় বলে, না দেখে যে পয়সা নাও, যদি কম দিই?

বীণা অল্প হাসে, কম দেয়ার মানুষ কারা সেটা আমরা বুঝি।

অজয় বীণার ঘামে ভেজা মুখ দেখে।

অজয়ের হাতে যে কোনো গাড়ি স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দেয়া যায়। কোনো দুঃসাহসী ট্রিপেও পেছপা হয় না অজয়। সুতরাং ড্রাইভারের ঠেকা পড়লেই অজয়ের খোঁজ পড়ে। কিন্তু হালফিলে তার ব্যতিক্রম ঘটছে। ফালতু কাজে আগের সেই আগ্রহ নেই অজয়ের। আসে ঘড়ি ধরে। ডিউটি শেষে ডিপোতে গাড়ি গ্যারেজ করেই সে হাওয়া। মন ছোটে পাড়ার দিকে।

অজয়ের মতো ড্রাইভারের এমন রঙবদলে ডিপো-ম্যানেজার তাজ্জব। ড্রাইভার নিতাই সাহা টিপ্পনী ছোঁড়ে, অজয় বুঝি অন্য কোনো টানে পড়েছে স্যার—

অজয় মাথা ঘুরিয়ে তাকায়। কিছু বলে না। শুধু তার আগুন-চোখ একবার নিতাইকে ছুঁয়ে যায়।

মেজাজটা বিলকুল বিগড়ে দিয়েছে নিতাই। সকালের ডিউটি চুকিয়েই পাড়ামুখো হয় অজয়।

এক্ষুনি চায়ের তেমন দরকার ছিল না তার। তবু পায়ে-পায়ে দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সময়টা অসময়। খদ্দের নেই। বীণার মা বসে বসে ঢুলছে। দুগালে দুহাত রেখে দশতলা বাড়িখানার দিকে চেয়ে আছে বীণা।

এই সময়ে একা অজয়কে দেখে বীণা চমকায়।

অজয় বলে, এক কাপ চা—

খদ্দের বলতে পাড়ার খদ্দের অজয় ড্রাইভার। চটজলদি স্টোভ ধরায় বীণা।

সহসা এক ঝাপটা দমকা বাতাসে কাগজের ঠোঙাটা উড়ে গিয়ে নিচে পড়ে। স্টোভটাও নিভে যায়।

অজয়ের সারা মুখে কৌতুকের ঝিলিক। পায়ের কাছ থেকে ঠোঙাটা তুলে টেবিলে রাখে।

বীণার মুখে ঈষৎ লালচে আভা। আবার স্টোভ জ্বালছে।

বীণার মা মস্ত হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বলে, আজ তোমার ডিউটি বুঝি আগে ছিল বাবা?…অ বীণা, টিনটা দিয়ে আড়াল দে—হাওয়া মারছে, অজয়ের দিকে ঘোলা ঘোলা চোখে চেয়ে বলে, আজ তুমি আগে এসে পড়েছ কিনা। ভিড়ের আগে তোলা উনুন ধরিয়ে নেয় বীণা। আজ এখনো ধরায়নি।

কেউ সম্মান দিয়ে তোয়াজ করলে ভালোই লাগে অজয়ের। কিন্তু আজ বীণার মায়ের বিনীত কৈফিয়তের সুরে কেমন লজ্জা করতে থাকল তার। বীণার মা এমন ভাব করছে যেন ওরা চা বেচে আর তারা কেনে বলে ওরা তাদের খাতক। না-না-আমার কোনো তাড়া নেই—আজ আর ডিউটি নেই—ইত্যাদি বলে বীণার মাকে তার ডিউটির নিয়ম-কানুন বোঝাতে চেষ্টা করে।

ততক্ষণে এক কাপ চা হয়ে গিয়েছে বীণার। কাপটা অজয়ের হাতে দেয় বীণা।

অকারণে একটু হাসে অজয়। বলে, সেদিন যে বলেছিলে পয়সা কম দেয়ার মানুষ তোমরা দেখলেই চিনতে পার, তা যদি বেশি দিয়ে দিই?

ধরা পড়লে ফেরত দিয়ে দেব—বলে ফিক করে হাসে বীণা। বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ হাসলে এত সুন্দর দেখায়! বীণার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারে না অজয়।

অফিস যেতে দেরি অজয়ের চাকরি জীবনে এই প্রথম। বেশ খারাপ লাগতে থাকে তার। চা খেতে এতটা সময় লাগার কথা নয়। বীণার সঙ্গে খুব যে একটা গল্পগুজব করেছে তাও নয়। কিভাবে সময়টা উড়ে গেল বুঝতেই পারেনি অজয়।

সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি তাকে খাবলাতে থাকে। সে সাধারণ কোনো তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নয়। সে পাইলট, মানুষকে তাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দেবার চালক। অপরের চলাতে গতি সঞ্চারের নিয়ামক। আর সে-ই কিনা ফুটপাতের এক চা-উলী মেয়ের জন্য এতটা সময় খরচ করে এল! পরিচয় দেবার মতো কি আছে ঐ মেয়েটির? ঐ তো চেহারা।

হাসলে কিন্তু বেশ দেখায় ওকে। অজয়ের মুখ চাপা হাসিতে ঝলমল করে। বীণা তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও সে গিয়ে দাঁড়ালে বীণা যে খুশি হয় সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না অজয়ের। না গিয়ে পারে না সে।....বীণা কি তাকে ফাঁদে ফেলছে? না সে নিজেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে?

অকস্মাৎ নিজের মনের মুখোমুখি পড়ে অজয় অসহায়। দিনে রাতে বার কয়েক বীণার ওখানে না গেলে দিনটাকে তার ফিকে পানসে লাগে। তার ঘাম ঝরানো কাজে বীণা এক মুঠো খুশির হাওয়া। তবে কি সে বীণাকে ভালোবাসে?

বীণার পৃথিবীটা বড়ো ছোটো। ঘর এবং ফুটপাতের দোকান ঘিরে তার বৃত্ত। শখ করে বেড়াতে যাওয়া বীণার কাছে বিরল স্মৃতি। অজয়ের সাধ মনের মানুষকে নিয়ে গঙ্গার পাড়ে, রেস্তোরাঁতে, একটু নিরালায় ঘুরে বেড়ানো। ডিউটির হেরফের ঘটিয়ে সুযোগ তৈরি করে নেয় সে। বীণা আপত্তি করে না। তবে বাইরে গিয়ে সহজ হতে পারে না।

বীণা-অজয় এখন পাশাপাশি বসে। বীণা চুপ করে আছে। অজয় দেখছে বীণাকে। অনর্থক বুকের কাপড় টানছে বীণা। গলার চেনটা ধরে টানাটানি করছে। সোনারঙা চেনটা অজয়ই এনে দিয়েছে। অজয়ের সঙ্গে বেরোতে রুপোর চেনটা খুলে ওটা পরে বীণা। অন্য সময় তুলে রাখে। প্রাণ ধরে পরতে পারে না।

বীণার চুল বেশ লম্বা। তেলে পালিশ চুল টেনে বেঁধেছে। অজয় বলে, আজকাল মেয়েরা এত চুল রাখে না।

বীণা কিছু না বলে একটু হাসে।

খানিক পরে বীণা বলে, তুমি একজন পাইলট, বীণা জানে পাইলট কথাটা ব্যবহার করলে খুব খুশি হয় অজয়, আর আমি একটা ফুটপাতের মেয়ে। আমার সঙ্গে তোমার এমন মেলামেশা—

না জেনে অজয়ের বুকের একটা দগদগে ঘায়ে হাত দিয়ে ফেলেছে বীণা। প্রায় ধমকে ওঠে অজয়, ফুটপাতে কাজ করা আর ফুটপাতের মেয়ে এক হলো?

বীণা চুপসে যায়। অজয়ের রাগের কারণ বোঝার চেষ্টা করে।

বীণা গুম হয়ে থাকলে ভাল লাগে না অজয়ের। অজয় গলা নামায়, আজ আমি পাইলট। কিন্তু জান, এক বাবুর বাড়িতে থেকে চাকর খেটে ড্রাইভিংটা শিখেছিলাম—

অজয় অতীতে হাঁটছে। সহসা বর্তমানে ফিরে বলে, তোমার চায়ের দোকানে বসাও আমার ভাল লাগে না।

চায়ের দোকানে বসব না—বীণার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

অজয় কাজের মান দেয়। কিন্তু তার আপনজন কেউ দোকানে বসে চা বিক্রি করছে এটা সে ভাবতেও পারে না।

বীণার মিহি গলা, আমার পড়াশুনো তো বেশি নয়। ক্লাস সেভেনই শেষ। তোমাদের সঙ্গে মেশার মতো নই—

অজয় ভুরু নাচিয়ে বলে, আমার সঙ্গে মিশতে তোমার বুঝি খুব খারাপ লাগছে?

বীণা টকটকে লাল—না—তা কে বলছে—

অন্ধকারের দেয়াল ভেঙে চাঁদের আলো এসে পড়েছে গলিতে। পাঁচিলের গায়ে অজয়ের ভাঙা ভাঙা ছায়া।

এই ফিরলি বুঝি?—সনাতনদার গলা।

সনাতন অজয়ের পাড়াতুত দাদা। অজয়কে স্নেহ করে।

অ—সনাতনদা, অজয় চনমনে, গলিটা আজ আর অন্ধকার নয় সনাতনদা।

কোথাও গিয়েছিলি?

হ্যাঁ—সনাতনদা।

অজয়, তোকে একটা কথা বলব বলব ভাবছি, সনাতন একটু থামে, বি.এ, এম.এ পাশ না করলেও তুই শিক্ষিত ছেলে। ভাল উপার্জন করিস। স্বভাবচরিত্রে দাগ নেই। তুই কি আর মেয়ে পেলি না? কথায় বলে সমানে সমানে দোস্তি—। এদের আচার-ব্যাভার কিছুই যে তোর সঙ্গে মিলবে না—

কে যেন এক ফুঁয়ে অজয়ের মুখের সবটুকু আলো নিভিয়ে দিল।

নিতাই সাহার মতো ঠেস দিয়ে বলা নয়, বন্ধুর মতোই কথাগুলো বলেছে সনাতনদা। তবু বিরক্ত হল অজয়। সে নাবালক নয়। অভিভাবকের মতো এই মোড়লিটা না করলেই পারত সনাতনদা।

আচমকা একটা টাল খায় অজয়। আজ মা বেঁচে থাকলে কি এই হাঘরে মেয়েকে ঘরে নিতে রাজি হতেন? রূপ-গুণ কোনো দিকেই বীণা তার ম্যাচ হতে পারে না। সে

ঘরে ঢুকলে বীণার মায়ের নজর থাকে তার হাতের দিকে। এদের ভালবাসার শেকড় লোভের মাটিতে পোঁতা।

দুই বিরুদ্ধ অনুভূতি অজয়ের মন নিয়ে লোফালুফি খেলে। টানাপোড়েনে অজয় বিপর্যস্ত। ছাড় খুঁজছে। বাবার আয়ুর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য—তাদের দারিদ্র্যের জন্য কি বীণা দায়ী? বীণাকে সে ফিরিয়ে দেবে কোন অজুহাতে? বীণা শিক্ষাদীক্ষায় খাটো। তার প্রতিদিনের সান্নিধ্যে বীণাকে সে সারিয়ে নেবে। বীণা সুন্দরী না হলেও দেখতে খারাপ নয়। না-ই-বা হল ডাকের সুন্দরী। বাবুদের ঘরের বউদের মতো রাখতে পারলে এই চেহারার খোলতাই-ই দেখার মতো হবে। যাকে ভাল লেগেছে তাকেই বিয়ে করবে অজয়।

কি এক ঘোরের মধ্যে দিন কাটছে বীণার। ঠিক বা ভুল যাচাই করে দেখারও সময় পাচ্ছে না। লোকে বলে ছেলেরা নাকি দিন কতক মজা লুটে সটকে পড়ে। অজয়ের ঝকঝকে মুখের দিকে চেয়ে এমন কথা মনেও আনতে পারে না বীণা। অজয় এখন তাদের সকল দরকারের জোগানদার। ক্রমেই তারা অজয়ের হাত ধরা হয়ে পড়ছে।

বীণার মা লাভের অঙ্ক কষে। কোনোদিন যদি ছেলেটার মন উঠে যায় তাহলে কি হবে ভেবে আঁতকে ওঠে। বীণা বাইরে গেলে নিজের খাটুনি বাড়ে। তবু বলে, অজয় যেতে চাইছে—যা এবেলা ঘুরে আয়।

অজয়ের মনে আজ অজস্র কথার ভিড়। বুকে ঝড়। বীণা পাশে বসতেই প্রশ্ন করে, আমার সঙ্গে মিশবে বলে ঠিক করেছ তাহলে—

ঠিক বেঠিকের মালিক কি আমি?

তবে কে?

উত্তর না দিয়ে চোখের ইশারায় অজয়কে দেখিয়ে দেয় বীণা।

বীণার পিঠে হাত রাখে অজয়। ওকে কাছে টানে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মাথা গোঁজে বীণা। ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বীণা হাসছে না কাঁদছে? ওর মুখ তুলে ধরে অজয়। স্টীয়ারিং ঘোরোনো হাতে হাত দু খানায় চাপ দেয়।

গাড়ির চাকা নয়, জ্যান্ত মানুষের উষ্ণ স্পর্শ। শরীরের শিরায় শিরায় আগুনের স্রোত। এ এক অসহ্য শিহরণ। গাড়ি ছোটানোতে বুকের পাটা ফোলে, এখন বুকটা যেন উজাড় হয়ে যেতে চাইছে…

বীণার চোখ মাটির দিকে নামানো, থিরথির কাঁপছে।

প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে এক সময় বলে বীণা, তোমাতে আমাতে কত তফাত—কত দূর—

হাতের বেড় আরো নিবিড় করে অজয় বলে, এখনো দূর মনে হচ্ছে?

বিবশ মুহূর্তগুলো ঝরে পড়ছে।

সহসা একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে বীণা। অজয়ের চমক ভাঙে।

চাপা গলায় বীণা বলে, দোকানে না বসলে পেট চলে না—

কেন স্ত্রীকে ভাতকাপড় দিতে পারার মতো মাইনে আমি পাই না? না আমাকে বিশ্বাস নেই?

ধ্যেৎ—বীণা অন্য দিকে মুখ ঘোরায়।

তোমার দোকানের আয় থেকে আমাকে যদি খেতে দাও তাহলে আমি এই হাড়ভাঙা খাটুনির চাকরি ছেড়ে দিই—

পরিহাসটা বীণাকে বেঁধে। ওর তৎপর জবাব, চা বেচে দিন চলে না ঠিক—কিন্তু একেক দিন ভাল বেচাকেনা হয়।

বীণার অতিরিক্ত দোকানপ্রীতি অজয়কে অসন্তুষ্ট করে।

বাঁকা চেয়ে বলে, দোকান ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে—।

না—ভাবছি—আমি বসে খাব—একা তুমি খাটবে—

অজয় বীণার অনিচ্ছুক মুখে চোখ রাখে। এখানেই বীণা স্বতন্ত্র। অভাবী মেয়েদের মতো স্বার্থপর হ্যাংলা নয়।

আমার কিন্তু বড় ভয় করে—বীণার মুখ জুড়ে শঙ্কা।

অজয়ের কপালে প্রশ্নচিহ্ন।

অত বড় বড় গাড়িগুলো তুমি চালাও। কখন কি হয়—

মস্ত মস্ত দোতলা, আড়াইতলা বাসগুলোকে বেজায় ভয় পায় বীণা। গোঁ গোঁ শব্দে ওগুলো যখন গায়ের ধার দিয়ে ছুটে যায় তখন আতঙ্কে চার হাত পেছিয়ে পড়ে। সামনের পেল্লায় সীটে বসে যারা ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মানুষ বলে মনে হয় না।

দূর পাগল—! এক ঝলক মিষ্টি হাসি উপহার দেয় অজয়।

ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পায় বীণা। তাড়াতাড়ি শুধরে নেয়, আর অত বড় বড় গাড়ি চালাতে কত পরিশ্রম—

মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আসল জায়গায় ধরেছে। বড় গাড়ি চালানোতে অসম্ভব মেহনত। ডিউটির সময়ও যাচ্ছেতাই। সেই শেষরাতে উঠে চাকায় চড়া। নয়তো রাতদুপুরে ঘরে ফেরা। না-না ওসব রাতবিরেতের ডিউটি এখন আর পোষাবে না তার।

বীণাকে ভরসা জোগায় অজয়, ডিউটি বদলের কথা আমিও ভাবছি। কোনো ভাল অফিসারের গাড়ি ধরে ফেলতে পারলে—

বাস নিয়ে রুটে বেরোনোর অনেক অসুবিধে, অনেক ঝক্কি। কিন্তু বড় গাড়ির চালকদের মাইনে বেশি। এদিক-সেদিকের সুযোগও থাকে। এসব কারণে বাস-ড্রাইভাররা সহজে ছোট গাড়িতে যেতে চায় না। অজয়ের লাভক্ষতির হিসাব এখন ভিন্ন। সে আরজি দাখিল করে, স্যার, আমাকে যদি বাস থেকে সরিয়ে ছোট গাড়িতে লাগিয়ে দেন—

স্যার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত। অজয়কে দেখছে।

কারে গেলে মাইনে যে কমে যাবে—! অফিসারের ধারালো জিজ্ঞাসা।

অজয়ের চোখে বীণার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সে না ফেরা পর্যন্ত বীণার চোখ থাকে রাস্তায়।

ডিউটির সময় বড় বাজে পড়ে স্যার। কোনো সাহেবের সঙ্গে দিলে—অজয় শেষ করে না।

অফিসার অজয়কে পছন্দ করে। সে সৎ এবং ভদ্র। সময়ে ডিউটিতে আসে। অতএব খোদ বড় সাহেবের গাড়ি চালানোর দায়িত্বে বহাল হল অজয়।

অজয় দারুণ খুশি। বড় সাহেবের গাড়ির চালক হবার সম্মান পেয়ে নয়। তার ভীষণ দামী সময়ের কিছুটা নিজের দখলে রাখতে পারার কল্পনাতে সে খুশি। এবার বেটাইমে ডিউটি পড়বে কদাচিৎ। পড়লেও পড়বে বড় সাহেবকে নামীদামী মিটিংএ নিয়ে যাবার ডিউটি।

চাকার দৌড়ে নয়, যেন পাখা ঝাপটিয়ে বীণার কাছে গিয়ে পড়ে অজয়। খুশি চেপে বীণা বলে, কিন্তু টাকা যে কমে গেল—

তেজী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকায় অজয়। হাতের পেশি ফুলিয়ে বলে, রাখ তোমার টাকা। এই দুখানা হাত থাকতে টাকা রুজি আটকাবে না।

বীণা অজয়ের শিরাময় হাতের চুলগুলো একমুখো করতে থাকে।

সাহেব যেদিন সময়ে বাড়ি চলে যান সেদিনই বীণাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অজয়। ভয়ে কোঁকড়ানো বীণাকে দোতলা বাসের ওপরে টেনে তোলে। দুচার দিন নিজের গাড়িতে চড়িয়েছে। বড়লোকের ছেলেদের মতন সঙ্গিনীকে পাশে বসিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছে ভিড় ঠেলে।

সত্তর-আশি স্পীডে গাড়ি ছুটিয়েছে অজয়। হু হু বাতাসে চুল উড়ে চোখ মুখ ঢেকে গিয়েছে বীণার। প্রচণ্ড বেগের টাল সামলাতে না পেরে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছে। অজয় আড়চোখে দেখেছে আর মিটিমিটি হেসেছে…।

এক সাহেবের সঙ্গে একবার প্লেনে উড়েছিল অজয়। সেই আশ্চর্য দৃশ্য ও অভিজ্ঞতার গল্প বীণাকে বহুদিন বলেছে। শুনতে শুনতে মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে বীণার।

… ক্রমশ মাটির পৃথিবী দূর হয়ে যাচ্ছে। নিচের হতশ্রী বাড়িঘর, গাছপালাকে খেলার সামগ্রী বলে বোধ হচ্ছে। পাকে পাকে জড়িয়ে থাকা জলরেখাকে প্রাচীন বটগাছের বহুদূর প্রসারিত শেকড়ের মতো দেখাচ্ছে।… চারধারে পেঁজা তুলোর ঢেউ খেলানো পাহাড়। কোনোটা দশ মানুষ উঁচু।

পাহাড়ের পর পাহাড়কে নিচে ফেলে ওপরে আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে তারা। যে এই অসম্ভব ঘটনা ঘটাচ্ছে সেই চালক বীণার একান্ত পাশে। ছবিতে দেখা নভোশ্চরদের মতো তার পোশাক।—ঘাড় ঘুরিয়ে তার মুখ দেখতে চেষ্টা করে বীণা। অজয়—অজয়ের মুখ, সে মুখ হাসছে। অজয়ের বুকের কাছটায় ভীষণ জোরে খিমচে ধরে বীণা। উঃ! শব্দে পাশ ফেরে বীণার মা।

বীণাকে তরতাজা দেখাচ্ছে। ওর চোখের তারায় বাড়তি আলো, চিকচিক করছে। ধোঁয়া-ধুলো, বিরক্তিকর ভিড় কিছুই ওকে ঠেকাতে পারছে না আজ। সব কিছুই ভাল লাগছে বীণার। কারণে অকারণে হাসছে।

দুপর গড়াতে ক্রেতার ভিড় বাড়ে। চার পাঁচটি ছেলে চায়ের জন্য বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। তাগাদা দিচ্ছে, আমাদের দেখি দেখতেই পায় না শালা—

হেসে হেসে বলছে বীণা, এই তো দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের চা। দুমিনিট অপেক্ষা করুন।

ওদের মধ্যে একজন বলে, মাত্র দু'মিনিট—

বখা মতন ছেলেটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, গলা যে শুইকে উঠল—

ব্যস্তহাতে কেটলি নামায় বীণা। হেসে ফেলে বলে, তাহলে জল খান।

শুধু জল?—ছেলেটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করে।

দৃশ্যের অদূরে দাঁড়িয়ে অজয়। কপালের দুপাশের শিরা দপ দপ করছে।

বীণা মাথা ঘোরাতেই চোখাচোখি। ওর মুখ উজ্জ্বল। বলে, চা দেব?

না, অজয়ের নীরস গলা।

বীণা একটা ধাক্কা খায়।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অজয়। মুখ কঠিন। ছেলেগুলো চলে যেতে বলে, চা দেবার মধ্যে এত কথা আর হাসাহাসির কি আছে?

থতমত খেয়ে বীণা বলে, হাসাহাসি আবার কোথায়? খদ্দের একটা কথা বললে জবাব দেব না?

এজন্যই বুঝি দোকানের মায়া ছাড়তে পার না?—লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে অজয়।

বীণার মুখ কাগজের মতো সাদা। গলার ভেতরে কিছু একটা দলা পাকাচ্ছে।

যেন ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে অজয়। তার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জখমী অনুভূতি চুঁইয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

প্রথম দিকে তাকে দেখে অবিকল এই হাসিই হাসত বীণা। কতক্ষণ অপেক্ষা করছে অজয়। হাসি-স্ফূর্তিতে মশগুল বীণার নজরেই পড়েনি।··· সেজেগুজে বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা শাঁসালো খদ্দের ধরে তাদের সঙ্গে এই বীণাদের তফাৎ কতটুকু? চেনের রঙ চটে গেলে এদের মনও মুখ ফেরায়।··· ঠিকই বলেছিল সনাতনদা। এমন মাখামাখি করা ভুল হয়েছে তার।

অজয় আসে না। একদিন গেছে, দুদিন গেল, তিনদিন যাচ্ছে—অজয় আর চা খেতে আসে না। সেদিন অজয়ের রাগ চাপা ছিল না। কিন্তু এতটা রাগের সঠিক হেতু আজো খুঁজে পাচ্ছে না বীণা। বীণার সকল বোধ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে।

মেয়ের অযোগ্যতায় বীণার মা ক্রুদ্ধ। সুযোগ পেলেই গজ্‌গজ্ করে, তোর সাত জন্মের ভাগ্য—অজয়ের মতো ছেলের চোখ পড়েছিল। তুই তার সঙ্গে গেলি ঝগড়া করতে—

বীণা হ্যাঁ না কোনো জবাব করে না। ওর বুকের মধ্যে যেন অসম্ভব ভারী একখানা পাথর চেপে আছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে বীণার।

উটকো ছেলেগুলো আবার এসেছে জ্বালাতে। হল্লা করছে, দিন—দিন—আমাদের চা-টা আগে দিন—

চা করতে যতটা সময় লাগে ততটা সময় দাঁড়াতেই হবে—বীণার কাটা কাটা উত্তর।

বীণার মা কয়লা জ্বলা চোখে মেয়ের দিকে তাকায়।

ছেলেগুলো গা ঠেলাঠেলি করে। মাতব্বর গোছের একজন বলে, অমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বললে দোকান চলে? একটু ভালোভাবে কথাবার্তা বলবেন।

গেলাসের গায়ে পয়সা ছোঁড়ার টুংটাং শব্দ। ওরা চা খেয়ে চলে যাচ্ছে।

এবার গলা ছাড়ে বীণার মা, হ্যাঁরে বীণা, খদ্দের কি তোর বাঁধা গোলাম? অমন টেকটেকে কথা বললে লোক তোর এখানে আসবে কেন? চায়ের দোকানের কি অভাব পড়েছে? খদ্দের হল লক্ষ্মী— গোমড়া মুখ সইবে কেন।

এখনো কোনো উত্তর করে না বীণা।

অসহ্য এক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে অজয়। মন থেকে বীণার চিন্তাকে কিছুতে তাড়াতে পারছে না। কোনো কাজে মন বসে না। গাড়ি চালানোর অভ্যস্ত ব্যায়ামকে বড়ো একঘেয়ে আর জলো লাগে। ছুটির সময় যত এগিয়ে আসে ততই নিজেকে ক্লান্ত অবসন্ন বোধ হতে থাকে।

বাড়ির গলিতে ঢোকার মুখে বীণাদের দোকান। এ কদিন রাত করে ফিরছে অজয়। সে যখন ফেরে তখন বীণারা দোকান উঠিয়ে চলে যায়। শূন্য জায়গাটা থৈ-থৈ অন্ধকারে পড়ে খাঁ খাঁ করে। আজ সেখানে লোকের সাড়া। ডানে বাঁয়ে তাকায় না অজয়। দ্রুত পাশ কাটিয়ে পেরিয়ে যেতে চায়।

তার পা দুখানা কি বেইমানি করছে? ওখানে ভিড় নেই। আবছা আলোতে নড়াচনা করছে দুটি ছায়া মানুষ, চেনা চেনা কাঠামো। গাড়ির আলো এসে পড়ে ছায়াদের মুখে। তাদের শনাক্ত করে অজয়।

বীণার মায়ের খরখরে গলা : ছেলেগুলো দল বেঁধে আসত। দুটো পয়সা পড়ত কৌটোতে। তোর মেজাজ দেখে আর এমুখো হয় না। তোর এখানে আসবে কেন খদ্দের? মুখে এক ফোঁটা হাসি নেই—একটা ভাল কথা নেই। এট্টু হাসিতামাসা করল কি গায়ে ফোসকা পড়ে গেল—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কানে হাত দেয় অজয়।

বীণার তেতো গলা, চা খেতে আসে—পয়সা দেবে চা খাবে। তাতে কথা আর হাসি-মস্করার কি আছে? চা চাইলে করে দেব। কথাটথা কইতে পারব না আমি।

পারবি না তো বুঝলাম। খাবিটা কি? রাততক বসে রইলাম। বেচাকেনা হল নামমাত্র, বীণার মায়ের মিয়ানো গলা, ঘরে চাল বাড়ন্ত। তিন কিলো চাল কেনার টাকা পর্যন্ত হল না। এমন কত ঠেকা সামাল দিত অজয়।…শত্রু—আমার পেটের শত্রুই বড় শত্রু—

অজয়ের বুকের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে ওঠে। হাঁড়ি চাপাবার চাল নেই বীণাদের!… লেন্সের ওপর থেকে একখানা পরদা উঠে যাচ্ছে। ভালোমন্দের একটা নতুন

মানে দেখতে পাচ্ছে অজয়। হাঁড়ি চড়াবার চাল না জুটলে—নিত্যের কাজে নিরাপত্তা না থাকলে কি উপায়ে ভাল থাকবে বীণা? ··· এক ব্যাগ চাল ধরে দেয়ার মতো নৈতিক সাহসটুকুও আজ খুঁজে পাচ্ছে না অজয়।

বীণার মায়ের জ্বর। আজ একাই দোকানে বসেছে বীণা। রগুড়ে ছেলেগুলো কাছেপিঠে ঘুরঘুর করছে। ওদের এগোতে দেখে ঢোঁক গেলে বীণা।

বীণার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে ওরা চোখ টেপাটেপি করছে।

আরে বাপ্‌স্! আজ একদম মা কালীর রূপ—

ফাজিল ছেলেটা দু পা এগিয়ে এসে বলে, আজ আমরা কত নম্বর?

কটা চা চাই আপনাদের?—বীণার শুকনো জিজ্ঞাসা।

তেতো মারা মুখ—তায় আবার চোখাচোখা কথা—

চা খাবেন—পয়সা দেবেন। তাতে এত কথার কি আছে?

লে শালা! এ যে জ্ঞান দিচ্ছেরে বাবা—

আরেকটি বিদ্রূপের গলা, হাসির লোক পেলে ঠিকই হাসবে রে নেড়া। যেখানে সেখানে কি হাসি ফূর্তি সাজে?

একেবারে বেউলা সতী—

আপনারা যাবেন এখানে থেকে—বীণার চড়া গলা, না আমি লোক ডাকব?

না, আর দোকানে বসতে দেয়া যায় না বীণাকে।

কি—হয়েছে কি এখানে? দৃশ্যে অজয়ের প্রবেশ।

ছেলেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। একজন বলে, চল্‌রে নেড়া, মোড়ের দোকানে চল্‌। বেকার ঝামেলা বাড়াস না।

বীণার কান মুখ লাল। বুক ফুলে ফুলে উঠছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে, হাসলে তুমি রাগ কর—না হাসলে মা রাগ করে—এরা টিটকারি দেয়—

সব গুটিয়ে নিয়ে চল—অজয়ের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ।

কোথায়?—বীণা আঁচলে চোখ মুছছে।

যেখানে নিজের ইচ্ছে মতো হাসতে কাঁদতে পারবে।

স্রোতস্বিনী তিস্তার মতো

সুচিত্রা দাস ভৌমিক

চওড়া তিস্তা বাঁধের ওপর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে দীনবন্ধু রায় ও তপন বোস। জলপাইগুড়ি শহরের পুবে উত্তরদিকে বারো মাইল লম্বা এই বাঁধ। তপন জলপাইগুড়ি শহরের নিকটবর্তী পাহাড়পুর অঞ্চলের সূর্য সেন কলোনীর বাসিন্দা। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। মাঝারি গড়ন, ময়লাটে রং। সূর্য সেন কলোনীর একটি ছোট মুদি দোকানের মালিক সে।

দীনবন্ধু রায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক। বয়স ষাট। রাজবংশীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর ঈষৎ ছোট চোখ, গালের হাড় উঁচু। সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর বর্তমান জীবিকা বিড়ি বাঁধা। তিস্তা বাঁধের পশ্চিমে পাহাড়পুর অঞ্চলের বালাপাড়ার বাসিন্দা তিনি।

এই বালাপাড়া নামের একটা ইতিহাস আছে। তখন ফণীন্দ্র দেব রায়কত জলপাইগুড়ির রাজা তথা জমিদার। সেই সময় এই অঞ্চলের তিনশো হালের মতো জমি ছিলো, বালা নাম্নী এক দেউনিয়া তথা জোতদারের অধীনে। বালার মৃত্যুর পর তার ছেলের ইচ্ছানুযায়ী ফণীন্দ্র দেব রায়কত জায়গাটির নামকরণ করেন বালাপাড়া। জলপাইগুড়ি জেলার বহু অঞ্চলের নামের পেছনেই এমন ইতিহাস আছে। স্থানীয় লোকেদের মুখে এসব গল্প শোনা যায়।

পূর্বোক্ত বালা জোতদারের তিনশো হাল জমির অনেকটাই আজ তিস্তা নদীর গর্ভে চলে গেছে। কিছুটা পড়েছে বাঁধের পুবে। এখন বালাপাড়ার চর অঞ্চল সেটা। ঐ চরে যেখানে এখন কিছু বাঁশের বন সেখানে আগে ছিলো দীনবন্ধুদের পাঁচভাই-এর একান্নবর্তী পরিবার।

পঞ্চাশের দশকের উপর্যুপরি বন্যার পর হলো তিস্তার বাঁধ। বাঁধ হওয়ার পর দীনবন্ধুরা চলে এলেন ঐ অঞ্চল ছেড়ে বাঁধের এপারে। পাঁচভাই-এর পরিবার এখন পৃথকভাবে পাশাপাশি রয়ে গেছে।

বালাপাড়ায় বাঁধের ওপর থেকে পুবে তাকালে ছাড়াছাড়া ভাবে চোখে পড়ে এক মাইল দূরের তিস্তার বিশাল খাত ও সাদা জলরেখা। রাজবংশী নরনারীর কাছে পবিত্র দেবী তিস্তাবুড়ি। নদীতে ওরা তিস্তাবুড়ির নামে পূজা দেয়।

তপন ও দীনবন্ধু দুজনেই পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। একজন বয়ঃকনিষ্ঠ ও একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্য। উনিশশো আটাত্তর-এর আগে এই সদস্যপদের অধিকারী ছিলেন রায়বাহাদুর কার্তিক রায়ের মতো জোতদার শ্রেণীর লোকেরা।

কৃষক সভার একটি সমাবেশে যোগ দিতে চলেছে তপন আর দীনবন্ধু। সমাবেশ হবে নিকটবর্তী কালিয়াগঞ্জ অঞ্চলের চৌধুরীপাড়ার কৃষক কামাল মিঞার বাড়িতে। তপন যে পাঁচবছর জনসংগঠনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তার মূলে দীনবন্ধু।

দীনবন্ধুর চোখেমুখে জীবনসংগ্রামের ও অভিজ্ঞতার ছাপ। দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে জনসংগঠনের কাজে তিনি নিয়োজিত। উনিশশো পঞ্চাশ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ছয়বার

তিনি জেল খেটেছেন। শেষ জেল খাটেন উনিশশো যাট সালের খাদ্য আন্দোলনের সময়ে।

সভা শুরু হয় বিকেল চারটেয়। উনিশশো ছিয়াশি সালের শেষ অগ্রহায়ণের অপরাহ্ন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে আসে। চারিদিকে ক্ষেত মাঠ গাছপালার ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। চারিদিকে ক্ষেত মাঠ গাছপালার ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। আকাশে আলো লেগে থাকে আরো অল্প কিছুক্ষণ। পাতা চটের আসনের ওপর উৎসাহী গ্রামবাসীরা বসে আছে। লণ্ঠনের আলো জ্বলছে একধারে।

আজকে সবার আলোচ্য বিষয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। ত্রিশ চল্লিশজন মানুষের জমায়েতে তিনচারজনের পরেই বক্তব্য রাখেন দীনবন্ধু রায়। রাজবংশীদের কথ্য বাংলায় তিনি বলতে থাকেন—আজ যেলা দেশের গরীব সাধারণ মানসিলা এক্‌ঠে হবা ধইল, জোট বান্দিবা ধইল, খেলায় শোষক শ্রেণীর লোকরা গরীব মান্‌সির মন্‌ত জাতিয়ার উস্‌কানি দিয়া জাতিতে জাতিতে লড়াই লাগেবার বৃটিশ কৌশল কইল। তার তানে আজি খালিস্থান, গোর্খাল্যাণ্ড, মুসলিম লীগ, আমরা বাঙালী, তার তানে আজি কামতাপুরি বনাম উত্তরখণ্ড। দীনবন্ধু দৃঢ়স্বরে বলে যেতে থাকেন—ভাইসব মানসিলার উপরত আর জাত নাই। সেই মানসিলার উপরত যারা শোষণ করছে তারাই দেশের শত্রু।

একে একে আরো তিনচারজন কৃষক সভার সদস্য তাদের বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক বলাই পালডার বক্তব্যে প্রসঙ্গক্রমে কামতাপুর রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখ করেন। মহারাজা পৃথুর ছেলে সন্ধ্যা রায় কামতাপুর রাজ্যের সৃষ্টি করেন। ১২২৮ থেকে ১৫১৫ ছিলো ওই রাজ্যের স্থায়িত্বকাল। উত্তরবঙ্গ ও আসাম নিয়ে ছিলো সেই রাজ্য। পরে কামতাপুর রাজ্যের থেকেই উৎপত্তি হয় কোচদের প্রতিষ্ঠিত কোচ রাজ্যের।

কবে চলে গেছে সেইসব রাজত্বকাল। এখন পিছু হটে সেই কামরূপ কামতাপুর রাজ্যের দাবী তোলা বিংশশতাব্দীকে অস্বীকার করা।

সভা শেষে অন্ধকার কাঁচাপথে যে যার বাড়ির পথ ধরে। মানুষগুলি চোখমুখ নতুন শপথে জ্বলজ্বল করে।

তপন ঘরে ঢুকলে তার হাট-ফেরতা বাবা জিজ্ঞাসা করেন—কোথা থিকা ফিরলি? আজ কদিন ধইর‍্যা দুকান একবেলা কইর‍্যা চালাইতেছিস্!

তপন কোনো জবাব দেয় না দেখে ওর বাবা জীবনচরণ বোস আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন—সমাজসেবা আর পার্টিবাজি করলেই জীবন কাটবো? আমি এই বুড়া বয়সে হাটে হাটে ঘুইর‍্যা মরতাছি আর তুই বাবু সাইজ্যা সভাসমিতি করবি খালি?

পাঁচকাঠা জমির এককোণে টিনের চাল দেওয়া বেড়ার একখানা ঘর তপনদের। ঘরের মাঝে বেড়ার পার্টিশন। উঠোনের অন্যধারে ঘরের সমান্তরালভাবে ছনের রান্নাঘর। সেই একপো জমির সামনেই ঘরের লাগোয়া তপনের দোকান। খড়ি, চাল, ডাল, তেল, মশলা, নুন, বিস্কুট, লেখার কাগজ সবই অল্পবিস্তর পাওয়া যায় সেখানে। আর তপনের বাবা হাটে হাটে কাঁচা সব্‌জি বিক্রী করেন।

বাবার কথার উত্তরে তপন শান্তস্বরে জবাব দেয়—আমি সবদিকই বজায় রাখি। তুমি মিছামিছি উত্তেজিত হইতাছ। তোমার প্রেসার আবার বাড়বো।

—বাড়ুক, আপনি এখন মইরতে পারলে বাঁচি।

তপন জানে এটা ওর বাবার তীব্র ক্ষোভের অভিব্যক্তি। বাবার পাশে বসে ও তাঁকে বোঝায়—আমাদের দ্যাশের আইজ বড় দুর্দিন। দার্জিলিংএ গোর্খাল্যাণ্ডের দাবীতে নেপালী নেপালীরে ম্যারতাছে। এখানেও কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের উস্কানিতে উত্তরবঙ্গের পুরানা রাজবংশী বাসিন্দারা পৃথক রাজ্য চাইতাছে।

—কী রাজ্য চাইতাছে উরা?

পৃথক কামতাপুর রাজ্য। ফল হইবো এ অঞ্চলের উন্নতি আরো পিছাইয়া যাইবো।

জীবনচরণ বোস সপরিবারে এদেশে এসেছেন পশ্চিম দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত দিয়ে ১৯৭২-এ। তিন বছর ছিলেন পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে। তারপর আজ বারো বছর এই কলোনীর বাসিন্দা। পূর্বপাকিস্তানে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক সেনাবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা দেশবাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। মানুষ হিংস্র হলে কী রূপ নেয় তা তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেশে তাঁর যে মণিহারী দোকান ছিলো পাক সেনারা তা ভাঙচুর করে জিনিষপত্র লুটে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

তপন তাঁর বড় ছেলে। তার নিচে আরো চার মেয়ে ও এক ছেলে আছে। এদেশে এসে অভাব থাকলেও মোটামুটি একটা নিরাপত্তার মধ্যে ছিলেন। এযাবৎকাল গোর্খাল্যাণ্ড বা কামতাপুর আন্দোলনের কথা তাঁর কানে ভাসা ভাসা এসেছে। তবে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে দৈনিক স্বার্থের মোকাবিলায় ঐসব বৃহত্তর সমস্যা নিয়ে তিনি আদৌ ভাবেননি।

তপনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভাবতে শুরু করেন বিষয়টা নিয়ে। তবে কি এদ্যাশেও শান্তি থাকবো না। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি কাটাকাটি শুরু হইবো! হিংসার আগুনে পুইড়্যা মাইনষে মাইনষের ঘর জ্বালাইবো! তারপরে নূতন রাজ্যের শাসক হইবো যারা তারা গরীব মাইনষের কথা ভাববো কতটুকু? ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়।

স্ত্রী ঊষারাণী স্বামীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে একদিন জানতে চাইলেন—কদিন ধইর‍্যা দেখতাছি তুমি খুব আনমনা হইয়া পড়ছ। কী হইছে কও দেখি! বাজারে কি ধারদেনা বাড়ছে খুব! নাকি তপনের হালচালে তুমি মনমরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জীবনচরণ বলেন—সেসব কিছুই না। ভাবতাছি দ্যাশ ছাইর‍্যা ছিলাম দিনাজপুর, তারপর আইলাম এহানে। এদ্যাশেও শান্তি কয়দিন থাকে কে জানে!

ঊষারাণীর চোখেও দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে। তিনি প্রশ্ন করেন—ক্যান্?

—এখানে আলাদা রাজ্যের দাবী উঠতাছে।

স্বামীর কথা ঊষারাণী স্পষ্ট বুঝতে পারেন না।

জীবনচরণ বলেন—তুমি অতশত বুঝবা না। পশ্চিমে পাঞ্জাবে গণ্ডগোল, উত্তরে দার্জিলিংএ সব কাজ বন্ধ। তাই কই—উত্তরবঙ্গেও অশান্তি কখন লাইগ্যা যায় কে জানে।

বালাপাড়ায় উঠোনে শামগাইনে চিঁড়ে কুটছে দীনবন্ধুর বউ ও ছোট মেয়ে দেবারী। ঘরে দীনবন্ধুর ছেলের বউ তার শিশুটিকে ঘুম পাড়াচ্ছে আর ছড়ার গান গাইছে—

আয় নিন্ আয়, চখুত ভাসা বান্দে
হাটের নিন্ পথের নিন্ চখুত্ ভাসা বান্দে।

মোড়ে মঞ্চে সমাবেশ বসেছে উত্তরখণ্ড দলের।

একজন শিক্ষিত বিত্তশালী নেতা পৃথক উত্তরখণ্ডের সপক্ষে বক্তব্য রাখছেন। গায়ে দামী কাশ্মীরী শাল।

সেই সমাবেশের পাশ কাটিয়ে কামাল মিঞা, ওসমান, তপন এসে বসে দীনবন্ধুর পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ঘরের সামনের উঠোনে। ওদের গায়ে মোটা চাদর। কামাল, ওসমান কৃষিজীবী। দীনবন্ধু এদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র। তাঁর গায়ের পোশাক চাদর তাই আরো জীর্ণ।

নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে দীনবন্ধুর ছিলো ছয় বিঘা জমি। বড় ও মেজ মেয়ের বিয়ে দিতে চার বিঘে জমি বিক্রী করে দিতে হয়েছে। এখন যে দু'বিঘা মাত্র জমি আছে তা চাষ করে তার একমাত্র ছেলে লক্ষ্মণ।

দীনবন্ধুর নিজের কথায়—নিজের সংসারের কাথা কুনোদিন ভাবিবা শিখ নাই। বয়স বাড়িয়া মোর খালি একটায় চিন্তা কী করিয়া সমাজের অন্যায় দূর করা যাবে, গরীব মান্সিলার দুখ্ দূর হোবে।

উঠোনে মাদুরের ওপর বসে লাল চা আর শামে কোটা চিঁড়ে খায় তপনেরা। এরপর দীনবন্ধুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে দীনবন্ধু সহ তপন কামাল ও ওসমান গাঁয়ে গঞ্জের পথে হাঁটতে থাকে। মোড়ের সমাবেশে বিভেদের শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওরা জানে যতদিন ওরা রয়েছে ততদিন স্বার্থান্বেষী শক্তিরা গ্রামবাসীদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। এখন ওদের গ্রামে পুলিশী নির্যাতন নেই, জোতদারের জুলুম নেই। এই অবস্থাকে নিজেদের মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আরো উন্নত করে তুলতে হবে। গ্রামাঞ্চলে শহরে সাধারণ মানুষের অধিকার আরো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত করতে হবে।

রাধাবাড়ি অঞ্চলের কৃষক তফী মুনসী বস্তা ভর্তি ধান বিক্রী করার জন্য রিক্সায় চড়ে যাচ্ছিলো রংধামালী হাটের উদ্দেশ্যে। দীনবন্ধুদের দেখে রিক্সার থেকে নেমে আসে তফী।

দীনবন্ধুকে নমস্কার জানিয়ে তফী বলে—আমার বিষয়টা মনে রাখছেন তো কাকা?

দীনবন্ধু বলেন—তোর বিষয়টা উদিনকা মিটিংয়ত আলাপ করিয়া মেটামেটি হোবে।

তফীকে তপন বলে—বিষয়টা এখন কৃষক সংগঠনের আওতার মধ্যে। সংগঠনের মারফতেই সব সুরাহা হইবো। তোমার কুনো চিন্তার কারণ নাই।

তফীর সমস্যা হলো আধিয়ার হিসেবে সে তার জোতদার তারিণী বিশ্বাসকে জমির যে ধান ভাগ করে দিয়েছিলো তারিণী সেই ধান ভাগের রসিদ তফীকে দিতে টালবাহানা করছেন। অর্থাৎ তফীর জমির ওপর অধিকার তিনি অস্বীকার করার চেষ্টায় আছেন।

দীনবন্ধু তফীকে আশ্বাস দিলেন, তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না। তারিণী বিশ্বাস রসিদ দিতে বাধ্য।

তর্ফী আশ্বাস পেয়ে আবার রিক্সায় উঠে বসে। রিক্সাচালক গণেশ হাজরাকেও দীনবন্ধু প্রশ্ন করে কুশল জেনে নেন। গণেশ পাঁচমাস হলো ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে রিক্সাটা লোনে পেয়েছে। ঝক্‌ঝক্‌ করছে নতুন রিক্সাটা।

দীনবন্ধু হেঁটে চলেন। কোথায় রাস্তা বানাতে হবে, কোথায় কুয়ো লাগবে, কোথায় কার কী ধরণের ঋণের প্রয়োজন এইসব প্রশ্ন ওদের মাথায়।

তপন জনসংগঠনের কাজে নিকটবর্তী ডাহুয়াঝাড় ও করলাভ্যালী চা বাগানেও যায়। চা বাগানের মজুর অগাস্টাস খড়িয়া, জীতু ওঁরাও, মৈসনের সাথে তপনের হৃদ্যতার সম্পর্ক। ওরা ওকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে চা বিড়ি খাওয়ায়। অগাস্টাস অস্থায়ী মজুর। শীতকালে চা গাছ ছেঁটে ফেলার সময়ে অগাস্টাসের কোনো কাজ নেই। সারাদিন ও তখন বাসায় তৈরী হাড়িয়া খেয়ে অগাস্টাসের যকৃৎ এ বয়সেই খারাপ। কিন্তু সেই জন্য তার মা বাপের কোনো বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। চিকিৎসাও নেই লীভারের।

বাগানের বিশাল নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিংবা তিস্তার বাঁধের ওপর দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে তপন উপলব্ধি করে জাত ধর্ম উত্তরখণ্ড দক্ষিণখণ্ডের ওপরে হলো মানুষের খেয়ে পরে শিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা।

তপনের বারোটা বছর কেটে গেলো জলপাইগুড়িতে। এখানে এসে একদিকে রাজবংশী সম্প্রদায় ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেদের সাথে ওর নতুন পরিচয় ঘটলো। রাজবংশীরা ওদের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে গর্বিত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ওরা শিক্ষায় দীক্ষায় অর্থনৈতিক প্রগতিতে পিছিয়ে পড়েছে। একশ্রেণীর নেতা রাজবংশীদের আহত অভিমানে উস্কানি দিয়ে নতুন রাজ্যের জিগির তুলছেন। কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সমাধান এভাবে হবে না। যেমন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে প্রকৃত সমস্যার সুরাহা হয়নি।

শীত বসন্ত শেষ হয়ে আবার এলো গ্রীষ্মকাল। খাল, বিল, পুকুর, নদী সব শুকিয়ে গেছে। তপ্ত রোদ্দুরে মাথায় গামছা বেঁধে দীনবন্ধু রায় পায়ে হেঁটে চলেছেন উত্তরে রংধামালী। রংধামালীর কাছে এসে একটি বাড়িতে ঢুকে তিনি জল চাইলেন। প্রতিটি বাড়িই তাঁর পরিচিত। বাড়ির কৃষ্ণা নামে মেয়েটি তাঁকে সমাদর করে বসিয়ে দুটো নারকেল নাড়ু সহযোগে জল এনে দেয়। জল খেয়ে তেষ্টা মেটে দীনবন্ধুর। কিন্তু শরীরটা অসুস্থ লাগতে থাকে।

তাঁর অস্থির ভাব দেখে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করে—দাদু! আপনের শরীরটা ভালো নাই? দুপুরে ভাত খাইছেন?

দীনবন্ধু মাথা নাড়েন—খাইছু। ভাত খায়া বাহির হনু। কৃষ্ণা বলে—ঐ বিছানায় গিয়া শুইয়া থাকেন একটু। দীনবন্ধু হাসেন—থাকিম! কিন্তু মোর তো এলা থাকিলে চলিবা নাহায়। মেলা কাম আছে। কথাটা বলেন বটে, কিন্তু ক্লান্তভাবে মাথাটা তিনি ধরে থাকেন।

দীনবন্ধুর অবস্থা দেখে কৃষ্ণা একরকম জোর করেই দীনবন্ধুকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কৃষ্ণার মা এসে দীনবন্ধুকে পাখার বাতাস করতে থাকেন। দীনবন্ধু চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। কথা বলতেও এখন তার ক্লান্তি লাগছে।

শেষ দুপুরে কৃষ্ণার মা খাওয়া দাওয়া সেরেছেন সবে। পান মুখে কৃষ্ণার মা দীনবন্ধুকে বলেন—এখন পুরা বিশ্রাম করেন। এই রৌদ্রে এতোখান পথ এই বয়সে হাঁটন, আপনে পারেনও। আইজ আর কোথাও না গেলেন। আমাগো বাসাতেই থাকেন।

দীনবন্ধুকে থাকতেও হলো কৃষ্ণার বাড়িতে। তাঁর আর উঠে চলার শক্তি ছিলো না।

দীনবন্ধুর অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে তপন ও কয়েকজন ছেলে চলে এলো রংধামালী। দীনবন্ধুকে আজ পর্যন্ত কোনোদিন অসুস্থ হতে দেখেনি ওরা। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা পায়ে হেঁটে দীনবন্ধু আট দশ বারো মাইল পর্যন্ত রাস্তা ঘোরাঘুরি করেন। লোকে তাকে জানে ইস্পাত মানব হিসেবে। শুধু শরীর নয় মনও তাঁর ইস্পাতের মতো শক্ত। কোনো প্রলোভন তাকে তার আদর্শ থেকে টলাতে পারে না।

তপনরা দীনবন্ধুকে বালাপাড়ায় নিয়ে এলো। নিজের বাড়িতে আট দশদিন কাটার পর বোঝা গেলো দীনবন্ধুর এ অসুখ কঠিন। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে দীনবন্ধুকে ভর্তি করা হলো। কিন্তু শুধু হাসপাতালের খরচায় এ রোগ সারবে না। টাকাও চাই। সকাল বিকাল বাড়ি বাড়ি ঘুরে তপন ওসমান চাঁদা সংগ্রহ করা শুরু করলো। দোকান প্রতি বেলায় বেশ কিছু সময় বন্ধ পড়ে রইলো তপনের। তপনের বাবা ছেলের কাণ্ডজ্ঞান দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। ওসমানের ক্ষেতের কাজেও ক্ষতি হয়। কিন্তু তার জন্য ওদের মনে কোনো আপশোষ নেই। দীনবন্ধুর মতো মানুষের আজকের হিংসা বিভেদ জর্জরিত সমাজে বেঁচে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং এমন মানুষের জন্য নিজেদের স্বার্থত্যাগ করা কর্তব্য বলে মনে করে ওরা।

তপনের বাবা একদিন বিরক্ত হয়ে তপনকে জিজ্ঞেস করলেন—কার জন্য তুই এতো হাসপাতালে ছোটাছুটি করতেছিস?

—ও তুমি চিনবা না। তপনের বাবা দীনবন্ধু রায়কে কয়েকবার দেখেছেন। কিন্তু তপন তাঁর অসুখের খবর বাবাকে জানায়নি। এখনো তাই কথা চাপা দেয়। জানে সত্যঘটনা জানালে বাবার বিরক্তি আরো বাড়বে।

দীনবন্ধুর শরীরে তখন রক্ত নেই। রক্ত চাই। তপনের সঙ্গে রক্তের গ্রুপ মিল ছিলো দীনবন্ধুর। তপন সবার আগে রক্ত দিলো। কিন্তু শুধু একা তপনের রক্তে কুলোলো না। এবার রক্ত দান করে পরিচিত কৃষিজীবী শামসুদ্দিন। আরো রক্ত চাই। এবার চা বাগান অঞ্চল থেকে হাসপাতালে গিয়ে দাঁড়ালো শুকরু মুণ্ডা। মুণ্ডার রক্তে দীনবন্ধুর জীবন সংশয় পুরোপুরি কাটলো।

দুমাস হাসপাতালে কাটিয়ে গাঁয়ে ফিরে এলেন দীনবন্ধু। চোখেমুখে তখনো ফ্যাকাশে ভাব। কিন্তু মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ। তপন, শামসুদ্দিন ও শুকরু মুণ্ডার রক্তে তার জীবন ফিরেছে। দীর্ঘ ষাট বছরের ওপরের জীবনে এ তাঁর এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা।

দীনবন্ধুর বাড়িতে নারায়ণ পুজো উপলক্ষে এসেছিলো তপন, শামসুদ্দিন ও শুকরু। ওদের একে একে বুকে জড়িয়ে বৃদ্ধ দীনবন্ধু রায় বলেন—"দ্যাখ হামরা চাইরজনে চাইর সম্প্রদায়ের। মুই আজবংশী, তপন ভাটিয়া, শামসুদ্দিন মুসলমান, শুকরু সাঁওতাল। কিন্তু

মোর দেহাত আজি যে অক্তধারা বহছে তাতে চাইরটা দেহার অক্তই মিলিমিশিয়া এক।"

বাড়ীর সামনে তিস্তা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তপন শুকরু ও শামসুদ্দিনকে হাতের ইশারায় পশ্চিমে দেখান দীনবন্ধু।—"দ্যাখ যতদূর চখুলা যাছে ঘরগিলান ভাংগাচুরা, ঐ বাচ্চাগিলার দেহাত জামা নাই, দুইবেলা পেট ভরেয়া খাবা পায় না উমুরা, লেখাপড়া শিখিবা পায়না, হামার আগত মেলা কাম। ঐ উত্তরত কাঞ্চনজঙঘা, পুবত তিস্তা, এইঠে খণ্ড খণ্ড দলের কুনো থান নাই। মোক যেমন তোমরা অক্ত দিয়া বাঁচাইছেন, দেশটাকও আজি তোমরালা সগারে বল দিয়া বাঁচাবা নাগিবে।"

দেখা যায় কখনো মণ্ডলঘাট, কখনো মৌমারির চর, কখনো বার্নিশের আলপথে বা কাঁচারাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ধুতি ফতুয়া পরণে দীনবন্ধু রায়। মাঠে কাজ করছে ওসমান, কমাল মিঞা, শামসুদ্দিন। চা বাগানে পাতা তোলার কাজে মগ্ন শুকরু মুণ্ডা, অগাস্টাস, জীতু। স্রোতস্বিনী তিস্তার মতো অসীম তাদের সেই সম্মিলিত কর্মপ্রবাহ।

স্থানান্তর

অনিতা অগ্নিহোত্রী

আঙিনার করঞ্জ গাছের মাথায় আজ বোধ হয় সূর্য ভর করেছে। গাছটা অস্থির হয়ে মাথা দোলাচ্ছে, কিন্তু ডালপালার জটের মধ্যে থেকে সূর্যটাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছে না। গোরখপ্রসাদ মুখ তুলে দেখলেন রান্নাবাড়ির দেয়ালে জলে মেশা আলো ছায়ার ঝিলিমিলি। তারপর ডান্ হাতে ধরা জলের গ্লাসটি ধীরে ধীরে মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তাঁর মনের মধ্যে যেন কেউ বলে দিল যে, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী চিলের মতো তীক্ষ্ণ চোখে গোরখপ্রসাদের থালার দিকে চেয়েছিলেন। দেখলেন করলা ভাজা পড়ে রইল, অস্পৃষ্ট রয়ে গেল হাটবারে অনেক খুঁজে পেতে নিয়ে আসা কুমড়ো ফুল ভাজাগুলি। তাও সইল। কিন্তু সব শেষে যখন ঘন করে জ্বাল দেওয়া মোষের দুধ ও খেজুর গুড় দিয়ে খাবার জন্য চুড়ো করে রাখা ভাত হাত দিয়ে ঠেলে গোরখপ্রসাদ ডান হাতে জলের গ্লাসটি তুলে নিলেন, লক্ষ্মীর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল। গোরখপ্রসাদ করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর যেন লক্ষ্মীর অন্তরের ভাষা পড়তে পড়তে বলে উঠলেন, লক্ষ্মী সত্যি আজ আর পারছি না। তাঁর মনে হচ্ছিল, নির্বোধ জেদের সঙ্গে গত চারদিন ধরে যে কথাটি তিনি লক্ষ্মীর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে নিজের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করে ফিরছেন, সেটা বোধহয় অবলীলায় তাঁর মুখ থেকে এক্ষুনি বার হয়ে পড়বে। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে জিহ্বাগ্র থেকে কথাটি যেন আবার কোষের মধ্যে ফিরে গেল। নিজের দু চোখ স্ত্রীর ব্যথিত মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন গোরখপ্রসাদ। তারপর চৌবাচ্চার পাড়ে গিয়ে আঁচাতে লাগলেন।

ভাদ্র মাসের রণরঙ্গী রোদ চড় চড় করে তেঁতুল গাছের মগডালে চড়ে বসেছে। আজকাল বেশিক্ষণ রোদে থাকলে চোখ জ্বালা করে, ভিতরটা দুর্বল লাগে ; অথচ হাতে ছাতা বইবার অভ্যেস নেই কোনওকালে, ছাতা নিয়ে বেরোলে বিরক্তি লাগে। গোরখপ্রসাদ কুল্থী ও সরষের ক্ষেতের ধারে ধারে পায়ে-চলা-পথ ধরে নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। চার মাস আগেও নদীর এই খাত একটা বিশাল সাপের খোলসের মতো নির্জীব পড়ে ছিল।

ধু ধু বালির মধ্যে শুধু দু-তিনটে সর্পিল রেখায় জল বইত। ওপরের প্রায় সত্তর-আশি একর জমির ছোট বড়ো কৃষাণদের এক ডেলিগেশন নিয়ে সরপঞ্চ সহদেব রাম, বিডিও অফিসে হানা দিয়েছিলেন। সেইদিনই কথাটা গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে যায়। "পঞ্চায়েতকে কণ্টাক্ট আমি দেব না।" সহদেবের মাথায় যেন লাঠির ঘা পড়ল। "সরকারি কাজ হবে। তবে, ছোটো ডুংরী, কান্হা। আর তেতরা পঞ্চায়েতের জন্য যে তেরো হাজার টাকা রাখা আছে, তার পুরোটাই আমি আপনার পঞ্চায়েতকে দেব। একটি ইমানদার ছেলে দেবেন, আর অন্তত একশোজন কৃষাণকে তিনদিন ধরে শ্রম দান করতে হবে।" ব্যস্! অস্থায়ী যোজনার খসড়া তৈরি হলো, কুন্তী নদী, মাটির বাঁধ, জুনিয়র এঞ্জিনিয়র শত্রুঘ্ণ শর্মাকে জনচাপে তিনদিনের মধ্যে এস্টিমেট তৈরি করে দিতে

হলো, আর পনেরোদিনের মধ্যে এই মিট্রিকা বাঁধ নদীকে আড়াআড়ি বেঁধে ফেলল। পাথর নেই, সিমেণ্ট নেই, অস্থায়ী যোজনা, কাজেই বর্ষার তোড়ে ভেসে যাবে জানা-ই ছিল, কিন্তু কী আশ্চর্য, ভাঙল না। বাঁধের পশ্চিমে টলটল করতে থাকল, কানায় কানায় জল। পুবে ধু ধু বালি। দুই তীরের জমিতে অগুনতি পাঁচ পাঁচ হর্সপাওয়ারের পাম্পের ভট্‌ভট্‌—দুই কূল যেন জেগে উঠেছে রুপোর কাঠির ছোঁওয়ায় রাজকন্যার মতো। ধান লাগল, কুল্‌থী, আখ—ভাদ্রের মাঝামাছি এসেও আজ বাঁধের পশ্চিমে টলমল করছে ঐশ্বর্যময়ী নদী।

পায়ে-চলা কৃশ পথটি নদীতীর ঘেঁষে চলে গেছে পুবে, আম, মহুয়া ও বড় বড় বাবলা গাছের গম্ভীর ছায়া। এক জায়গায় এসে পথ ফুরিয়ে গেছে, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি ছোট বর্গক্ষেত্র। সিমেণ্টে তৈরি একটি স্তম্ভ, তাতে শ্বেতপাথরের ফলক। সপ্তাহে অন্তত দু বার গোরখপ্রসাদ এখানে চলে আসেন, যখনই সময় পান—। বিশ্বনাথের চিতাভস্ম এখানে এনে দিয়েছিলেন নদীকে—তারপর বড়া-ডুংরীর মানুষ চাঁদা তুলে এই স্তম্ভটি তৈরি করে দিয়েছিল।

অফিসের ঘাড়ভাঙা কাজের চাপ, উমেদার, ঠিকেদার ও দালালদের মিলিত কা-কা, গরম ও একঘেয়েমির মধ্যে এই জায়গাটি তাঁকে ডাকে। মনে হয় আরে, বিশ্বনাথকে কতক্ষণ একা রেখে এসেছি। ওপরে সন্ধের আকাশ, সামনে অথৈ বালি, দূরে সবুজ তীরের রেখা, বিকেলের ঝিরঝির বাতাসে এখুনি যেন সে ঘুম ভেঙে উঠে বসল, ঘুমভাঙা চোখে কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না, আর আশ্চর্য, তখন বিশুর তেইশ বছরের চন্দনলিপ্ত মরা মুখ মনে পড়ে না, দেড় বছরের বউয়ার ঘামে ভেজা নিদ্রিত শিশুমুখটিই বার বার মনে আসে—।

ডেপুটি কমিশনার এসেছিলেন—বিশুর মৃত্যুর মাসখানেকের পর, অফিসে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। "যদি আপনি চান—আপনাকে ট্রান্সফার করার কথা আমরা বিবেচনা করব—কবে রিটায়ার করবেন? তা হ'লে আপনার হোমডিস্ট্রিক্টেই—কিংবা কাছাকাছি ধরুন, মুংগের বা ঔরঙ্গাবাদ?" খরার দিনে ঠাণ্ডা জল পানের স্মৃতির মতন এক পরিপূর্ণ তৃপ্তি হঠাৎ আকণ্ঠ ভরে গেছিল।

"নহী স্যর, মুঝে য়ঁহী রহনে দেঁ তো বেহ্‌তহর হোগা, রিটায়ারমেণ্ট তক। য়ঁহা মেরে বচ্চেকো হি মৈ নে খো দিয়া, মৈ আউর কঁহী নহী জানা চাহ্‌তা…।"

উত্তরে সমতলে তাঁর দেশঘর ; আর দক্ষিণে, ছোটনাগপুরের এই পাহাড়ি বিসর্পিল নদীতীরে, সেগুন, মহুয়া ও বাবলার ছায়ায় তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানের দেহাবশেষ রয়ে যাবে—ওকে এঁকা এখানে ফেলে কোথাও কী শান্তি পাবেন গোরখপ্রসাদ? প্রাইমারি স্কুল বিল্ডিংটি সরকারি দাক্ষিণ্য ছাড়াই শেষ হয়ে এলো প্রায়, আজকাল ছেলেমেয়েগুলোকে গাছের নিচে চট পেতে বসতে হয় না, বৃষ্টি এলে ভিজতে হয় না অবলা জন্তুদের মতন!

সামনের মাসে উদ্বোধন হবে, তার পরেও অনেক কাজ বাকি। সরকারি কাজের জন্য ফাইল যাবে রাজধানী, সেখানে ফাইলটিকে তার কক্ষপথে দু একটি বিশ্বস্ত লোক দিয়ে কেবলই তাড়া করে বেড়াতে হবে…নাঃ এখন গোরখপ্রসাদ কোথাও যাবেন না।

ডি সি-র মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠেছিল। "আপনি যা চান তা-ই হবে। আপনার মতামত জানতেই আমি আজ এসেছিলাম। এখানে ওর স্মৃতির ভার আপনাকে হয়তো দিনরাত্রি কষ্ট দেবে তাই ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো বদলি চান।"

এম এল এ কাশীরাম মহতো সত্যিই বিরক্ত হয়েছিলেন। জাহ্নবীপ্রসাদের হার্ডওয়্যারের দোকানে বসে এম. এল. এ. গরম সিঙাড়া খাচ্ছিলেন, সঙ্গে চারপাঁচটি উঠতি মাস্তান ছেলে। গোরখপ্রসাদও জীপ থামিয়েছিলেন। জাহ্নবী এখনও লেভী সিমেণ্ট ওঠায়নি। রোজ টালবাহানা করছে।

"বিডিও সাহাব" কাশীরাম মহতো বাঁকা হেসে বলেছিলেন, "আপ নে হোমডিস্‌ট্রিক্ট মে বদ্‌লী হোনে কা ইত্না বড় মওকা কিস্‌লিয়ে খো দিয়া? বড়া-ডুংরীর লোক তো আপনার স্বর্গবাসের জন্য হাজার বাতি জ্বালিয়ে বসে রইবে?"

গোরখপ্রসাদ সহাস্যে বলেছিলেন—"কিঁউ? য়হ্ মেরা হোম্‌ডিসট্রিক্ট নহী হো সকতা?"

"নহী"। বলে সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল ওঁর ঠিক সামনে। "নর্থকে লোগ্ তো যঁফ। সির্ফা পৈসে কমানে আতে হৈঁ!"

একটি নিস্পন্দ মুহূর্ত। তার পরেই গোরখবাবুর একটি বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় ছেলেটির হাড্ডিসার চোয়ালে এসে পড়েছিল, বাঁ হাত দিয়ে তার নোংরা কলারটা ধরে আরও দুটো রদ্দা মারতেই দোকানের বাইরে ছিট্‌কে পড়েছিল সে। "এই ইঁদুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে কবে থেকে ঘুরছেন?"

কাশীরাম মহতো গোরখপ্রসাদকে এই ঘটনার পর আর কখনও ক্ষমা করেননি। মাঝে মাঝে জেলামন্ত্রীকে বলেছেনও দু-একবার তাতেও লাভ হয়নি। গরম কালের বিষ ফোঁড়ার মতন সইতেই হয়েছে গোরখপ্রসাদকে।

রাজধানীর নির্বোধেরা বুঝেও না বোঝার ভান করে কেন? শুক্রাচার্যের মতো কমণ্ডলুতে বসে যে লোক সব আমদানির রাস্তা সিল করে দেয়, তাকে প্রিয় সরকারি দোকান বললেও, রাজনীতি করে যারা বাঁচে তাদের কী হবে? দেখতে দেখতে তবু কেটে গেল তিনবছর।... সামনের ফেব্রুয়ারিতে গোরখপ্রসাদ রিটায়ারই করে যাবেন এই বড়া-ডুংরী থেকে।

ঈস্ সাড়ে বারোটা বেজে গেল। রিভিউ মিটিং-এর জন্য গ্রামসেবকেরা এসে বসে থাকবে দূর দূরান্ত থেকে। ঐ, কে যেন আসছে!

"সাব, সাব, বড়াবাবু..." পায়ে চলা পথটা ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে অর্জুন মুণ্ডা। উত্তেজনায় মুখটা কাল্‌চে বেগুনি, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। "আঁ-রে বেওকুফ, চেঁচাচ্ছিস কেন? কী হলো বল্ না—"

বিশু যেদিন সদর হাসপাতালে মারা যায়, ওঁর জুনিয়র ক্লার্ক এই ভাবে আর্তনাদ করতে করতে বড় রাস্তা থেকে ঘরের দিকে দৌড়ে আসছিল, যেখানে গোরখপ্রসাদ বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন—দৃশ্যটা তার অবশ্যম্ভাবী সমান্তরালতায় হঠাৎ গোরখপ্রসাদের গা গুলিয়ে তুলল—অশুভ সংকেত।

আর কী অশুভ হবে তাঁর জীবনে—যা হয়ে গেছে তারপর। কিন্তু লক্ষ্মী! লক্ষ্মীর কী কিছু হলো হঠাৎ?

"হজৌর নয়ে সাহাব বৈঠে হৈঁ অফিস মে, গুসসা কর রহেঁ হৈ, উন্‌কা সামান আউর নঈ মেমসাহাব ঘর পঁহুচ গঈ হৈঁ—সাহাব, আপ জলদি চলিয়ে!"

ঈশ্বর! আজই! ঘর থেকে বেরোবার আগে আজও লক্ষ্মীকে কিছু বলে আসা হয়নি। ভেবেছিলেন সন্ধেবেলা বলবেন রয়ে সয়ে।

অমিত কুমার তাঁর আগমনের অগ্রিম সংবাদ পাঠাননি, গোরখপ্রসাদ ভেবেছিলেন, হয়তো আর তিন চারদিনের আগে পৌঁছতে পারবেন না পাটনা থেকে। কেন ভেবেছিলেন সেটাই আশ্চর্য, বাস্তব বুদ্ধিমান মানুষ অনিশ্চিতটাই আগে ভাবে।

"তুই চল্, আগে আগে, আমি যাচ্ছি।" অর্জুন মুণ্ডাকে এগোতে বলে পা চালাচ্ছিল অনভ্যস্ত দ্রুততায়, বেশ বৃষ্টি হয়েছে এবার, আর অন্য বছর, এই সময়ও মাটি পায়ে ফাট ধরায়। তাঁর চিন্তার মধ্যে অজস্র বৃষ্টি পড়ছিল, খসে পড়ছিল রক্তাক্ত ছিন্ন পাতা, ফুল, ফল, অতীতের নিশ্চিন্ত অবলম্বনচ্যুত হয়ে। কুল্‌থী ও মড়ুয়ার ক্ষেত যেখানে শেষ। আলাভোলা পথটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে চলে গেছে—দুদিকে, সরল অন্যমনস্কতায়। এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশর জন্য গোরখপ্রসাদ ভাবলেন, বাড়িই যাবেন, না, অফিস! সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রমহিলা এবং একটি সংসারের জিনিসপত্র যদি অখণ্ড আত্মবিশ্বাসে তাঁর ঘরের বারান্দায় চড়ে বসে, তার ধাক্কা কি ভাবে একা সামলাবেন লক্ষ্মী। কিন্তু মোড় ঘোরার ঠিক আগেই মনের মধ্যে এই একগুঁয়েমিটা তাঁকে অফিসের দিকে ঘুরিয়ে নিল। আগে অফিস। অন্য সব তারপর।

অফিস আজ সরগরম। চার পাঁচজন গ্রামসেবক হাতে খাতা খতিয়ান নিয়ে শুকনো মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। পঞ্চায়েতের সদস্য কয়েকজন, বোধহয় তামাশা লম্বা হবে জেনেই সিঁড়ির কাছে বেঞ্চিতে রুমাল পেতে বসে পড়েছেন। পাড়ার কিছু বেকার ভবঘুরে। এফ সি আই গোদামের ম্যানেজার ও তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিংস্রভাবে দাঁড়িয়ে। পাখা চলছে না—লোডশেডিং।

তাঁরই চেয়ারে, দুই পা সামনের চেয়ারে লম্বা, ইস্ত্রি করা রুমাল চোখের ওপর চেপে ধরে অমিত কুমার বসে আছে। মুখ লালচে। সামনে দাঁড়িয়ে নাজিরবাবু মাথার শাদা পাকা কোঁকড়ানো চুলগুলোকে মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে খামচে ধরছেন। খুব সম্ভবত এঁরাই আনিয়ে দিয়েছেন জলখাবার—সিঙাড়া, পান্তুয়া, একগ্লাস জল ও পান। অমিত কুমার কিছুই এখনও ছোঁননি—ফলে মাছি বসতে আরম্ভ করেছে খাবারে।

আকস্মিক দেখায় অমিতের সুশ্রী গৌরবর্ণ তরুণ মুখ গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে আনন্দ বিষাদের এক তীব্র রেখা টেনে দিল। মনে হলো রাত্রি অন্ধকার। নির্জন বালির ধারে সেই স্মৃতিফলকটি একা দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রাত পাখির দল। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য অব্যর্থ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করে হাত দুটি কপালে তুলে আনলেন। অমিত উঠল না, তার ডান হাত পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম নমস্কারে কপাল না ছুঁয়েই টেবিলে নেমে এলো।

"আপনি আমার টেলিগ্রাম পাননি? গাড়ি পাঠাননি কেন?"

"টেলিগ্রাম? গাড়ি?" গোরখপ্রসাদ বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন। নজিরবাবু পকেট থেকে লজ্জিতভাবে বার করলেন ভাঁজ করা গোলাপি তারের কাগজটি। "এটা আজই এসেছে।"

"হুজুরকে কষ্ট করে জিনিসপত্র নিয়ে বাসে আসতে হয়েছে। কিছুই তো খেলেন না এখনও"

নাজিরবাবুর এই কথা বোমার মতো ফাটিয়ে দিল অমিতের সংযম।

"খাচ্ছেন না! আর আমার স্ত্রী—ওঃ গড! হয়তো একগ্লাস জলও পাননি—কোয়ার্টার রেডি নেই, নট আ সিংগ্‌ল থিং ইন অর্ডার।"

গোরখপ্রসাদ সামনের চেয়ারে বসলেন, অমিতের। হয়তো প্রথমবার, তাঁর নিজেরই অফিসে। পকেট থেকে ছোট ডায়েরিটি বার করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলেন, "লক্ষ্মী, আমার বদলি হয়ে গেছে। বলি বলি করেও তোমাকে তিন চারদিন ধরে বলতে পারিনি। নতুন বিডিও সাহেব—বড় পাস করা অফিসার। এখানে ট্রেনিং-এ এসেছেন। ছ মাস থাকবেন। আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। বাকি কথা তোমার সঙ্গে পরে হবে। তুমি নতুন সাহেবের স্ত্রীর জন্য চা ও কিছু নাস্তা তৈরি করে দিও। ওঁর যেন কোনও অসুবিধে না হয়। লক্ষ্মীটি, আমার সম্মানের জন্য এইটুকু করবে তো?" চিঠিটি ভাঁজ করে অর্জুন মুণ্ডার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোর মা-জীকে দিয়ে আয়।"

অমিতের দিকে ফিরে বললেন, "স্যার, আপনি আমার সন্তানের বয়সী। আজ আপনার যে কষ্ট হলো, তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। টেলিগ্রামটা দুদিন আগে এলেই এইসব এড়ানো যেত। যাইহোক, মাফ করে দেবেন আমাদের। আমি আমার পোস্টিং অর্ডার এখনও পাইনি। আজই রাত্রে রওনা হব পাটনা। দু-তিন দিনের মধ্যে ফিরে এসেই ভাবছি চার্জ দিতে পারব।"

—দু-তিন-দিন! শুনে অমিতের ভ্রূ-যুগলে সংশয় ঘনিয়ে উঠল? উহুঁ! উহুঁ! তাকে অগ্রজ ও বন্ধুরা বার বার করে বলেছে খরবদার। চার্জ নিতে দেরি মানে গণ্ডগোল, কাগজপত্রে হিসেবের গরমিল, বুড়ো অফিসারদের টিপিক্যাল ডিলেয়িং ট্যাকটিক্‌স্—মাঝখান থেকে অর্ডারটাই ক্যানসেল করিয়ে দেবে।

ভীষণ গুমোট হচ্ছে ঘরের মধ্যে—বাইরে শিরীষ গাছটা ভুতুড়ে স্তব্ধতায় বিষণ্ণ। অমিত পকেটে দু হাত ভরে উঠে দাঁড়াল। "না, আমি অপেক্ষা করতে পারব না"। তার না-এর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর দ্বিধা ও সন্দেহ পড়তে পড়তে গোরখপ্রসাদ মনে মনে হাসলেন।

"বেশ তাই হবে। এখনই। নাজিরবাবু হ্যাণ্ডওভার রিপোর্টটা টাইপ করতে দিন।"

দপ্‌ করে, মনে হলো, আলো জ্বলে উঠল। ঝুলমাখা লম্বা আলমারিটির ভিতর তাকে তাকে সাজানো গোরখবাবুর নিজের কেনা বইপত্র, কিছু জরুরি ফাইল, ম্যাপ নকশা, কদিন ধরে একটি নোট তৈরি করছিলেন—উত্তরসূরীর হাতে দেবেন বলে—শেষ করা হয়নি। এই ব্লক—উত্তরে যার ধানক্ষেত, নদী ও সমতল ; দক্ষিণে নীলকৃষ্ণ পাহাড়, মহুয়ার বন,

মিশ্র জঙ্গল ও টাঁড়···নিজের করতলের মতো পরিচিত ছিল ; গাঁয়ের ভিতরে গিয়ে মানুষের নাম ধরে ডাকার অভ্যাস ছিল। মুণ্ডা ও বিরহোর পল্লীতে ছেলেবুড়ো বেরিয়ে এসে আত্মীয়তার আনন্দে ওঁকে ঘিরে ধরত। শীতের রাত্রে রাত জেগে কুয়াশা মাখা পেনশন ক্যাম্পে বসে—পেনশন বাঁটছেন, কাপের পর কাপ চলেছে ধূমায়িত চা। একবার বিনা সশস্ত্র, এসকর্ট, টাকা নিয়ে বেরিয়ে কান্‌হাতে প্রায় ডাকাতের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলেন—কত আনন্দের, কত ব্যর্থতার বেদনাদীর্ণ স্মৃতি, বিশ্বনাথ যাবার পর এরাই তাঁকে বাঁচিয়ে, তরুণ করে রেখে দিয়েছে। লক্ষ্মী শুধু বুড়ো হয়ে কুঁজো হয়ে গেছেন রাতারাতি—চলতে গেলে পা কাঁপে, চোখে ভালো দেখতে পান না—কারণ লক্ষ্মী যে শাবকহারা পাখির মতো শোককে কেবলই লালনপালন করে বড় করে তুলছেন নিজের বুকের মধ্যে আর নিজে ক্ষয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

কত কিছুই যে ভেবেছিলেন গোরখপ্রসাদ। ভেবেছিলেন আদর্শবাদী তরুণ অফিসার আসবেন। স্নিগ্ধ এক সন্ধেবেলা বাড়ির অঙ্গনে বসে চা খেতে খেতে তাকে শোনাবেন নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনী। বলবেন—আমার সন্তানের মতো প্রিয় এই এলাকা এবার তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। এবার আমার মুক্তি হলো। নদীর ধারের তাঁর সেই নির্জন স্মৃতিকুঞ্জটির কথা শোনানোর ছিল, কাকেই বা?

চার্জ রিপোর্টে সই করে উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন, ঘরে যাই, চা খাব।"

ঘরে গিয়ে দেখলেন, চার পাঁচটি লণ্ঠন কোত্থেকে জুটিয়ে অর্জুন তেল ভরছে উঠোনে। যদিও বিজলী এখনও যায়নি। তেল চল্‌কে পড়েছে নিচে। বোধ হয় প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে অর্জুন। শোবার শূন্য ঘরটিতে ক্যাম্পখাট পড়েছে। পাখার হাওয়ায় মশারি ফুলে ফুলে উঠছে ; কেউ শুয়ে আছে খাটে। শুধু রমণীয় দুটি পা দেখা যাচ্ছে দরজার বাইরে থেকে। রান্নাঘরে আলোটা নিষ্প্রভ, ঝুলমাখা। দরজা ধরে লক্ষ্মী ভূতের মতো দাঁড়িয়ে।

"আমার স্ত্রী।"

অমিত হাতটা কপালে ছোঁয়াল।

"আপনারই ঘরে আপনাকে চা খাওয়াই এক কাপ।"

গোরখপ্রসাদ লক্ষ্মীর পিঠে একটি সস্নেহ হাত রাখলেন। "অর্জুনকে ডাকো না—এ অর্জুন—চায় বনা। আর তুমি জিনিষপত্র যা পারো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। ডাকবাংলায় খবর পাঠাচ্ছি—রাত্রে ওখানেই থাকব। বাকি পরে হবে।"

অমিতকে বললেন, "আপনার অনুমতি নিয়ে আমাদের কিছু জিনিস রাতের মতো এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি, কাল সকালেই নিয়ে যাব।"

ডাকবাংলোর চৌকিদার একটা লুপ্তপ্রায় মোমবাতি বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার আলোতে লক্ষ্মীর ম্রিয়মাণ চেহারার আলোকচিত্রটি প্রত্যক্ষ করে গোরখপ্রসাদ ধীরে ধীরে পথে বেরিয়ে পড়লেন। আজ মোড়ের দোকানে দোকানে মৃদু গুঞ্জন। জাহ্নবী তার গদীতে বসে পায়ের ওপর মোটা হাতটি আনন্দে বোলাচ্ছে। ফুটপাথের দোকানিরা বিষণ্ণ। একটা বাল্‌ব কিনলেন গোরখপ্রসাদ। তারপর মিঠাইঅলার দোকানের সামনে গিয়ে একটি দীর্ঘ মলিন ছায়া ফেললেন।

মশা বিন্‌বিন্ করছে। ডাকবাংলোর পিছনের জমিতে আশশ্যাওড়া, বাবলা ও শালের জঙ্গলে অবিশ্রাম ঝিঁঝি ডাকছে। বোধহয় আবারও বৃষ্টি আসবে। অরণ্য তার গাঢ় উৎকর্ণ গন্ধ পাঠাচ্ছে সোঁদা মাটি থেকে। অন্ধকারের মধ্যে অনেক ঢেউ দুলছে, তরঙ্গভঙ্গ হয়েই চলেছে। পাতায় করে দুটি পরোটা ও তরকারি, শেষে মিঠাই খাওয়া হয়ে গেছে কখন।

লক্ষ্মী হঠাৎ আর্ত গলায় বলে উঠলেন, "ভাদ্র মাসে কুকুর বেড়ালও বাড়ি ছেড়ে যায় না ; আর আমাদের—? কেন এমন হলো গো?"

তাঁর মুখের দিকে চোখ-দুটি স্থাপন করেও ফিরিয়ে নিলেন গোরখপ্রসাদ। যেন বলতে চাইলেন—আর কী, আর কী হওয়ার ছিল আমাদের? সন্ধেবেলা কাজ থেকে ফিরে সেই তোমার হাতের ভাত, রুটি, আচার ও তরকারির পৌনঃপুনিকতার মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে মৃত্যুর দিকেই তো ভেসে যাচ্ছিলাম আমরা! কোনও আশাই কী ছিল, কোনও সম্ভাবনা!

লক্ষ্মী আবার বলে উঠলেন, "এতগুলো জেলার কোথাও সরকার ওঁকে ট্রেনিং-এ পাঠাতে পারল না, এই বয়সে তোমাকে শেষে কেন ওরা" বলতে বলতে কান্নায় গলা বুজে গেল ওঁর, আর শেষ করতে পারলেন না।

কথাটা গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে একরাশ শুকনো পাতা উড়িয়ে চলে গেল। আমাকেই কেন? অমিতের স্ত্রীর মাতুলালয় এই বড়া-ডুংরীর থেকে এগারো মাইল দূর। অমিতের শ্বশুরের প্রবল প্রতাপ। তারা কেন বেছে নেবে না তাদের পছন্দের জায়গা, ঘরের কাছের জেলা? গোরখপ্রসাদের ইচ্ছের শক্তি তো দাঁতভাঙা সাপের মতো। নিষ্ফল ব্যথায় সে শুধু নিজের দেহেই দংশন করতে পারে। আর কিছুই না। কালকের নিষ্ফল বাসযাত্রা—রাজধানীর দিকে। সচিবালয়ের বরিষ্ঠ কেরানিদের ঔদাসীন্যের সামনে মানসম্মান লুটিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বারো ঘণ্টা শিরদাঁড়া-ভাঙা জার্নির পর। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বার করে আনতে হবে নিজের ট্রান্সফার অর্ডার—তারপর আবার সেই অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা—সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অন্তর্নিহিত নিরর্থক ক্লান্তি গোরখপ্রসাদকে যেন হঠাৎই লক্ষ্মীরই মতো বার্ধক্যের আঘাতে পরাভূত ও জীর্ণ করে দিল।

আঃ বৃষ্টি আসছে—যতই মশারির ফুটো দিয়ে গলে আসুক জঙ্গলের হিংস্র মশারা, বৃষ্টি তো পড়ছে দূরের পর্বতশৃঙ্গে। মেঘ ক্রমশ ছেয়ে গেল অরণ্যের নীলকৃষ্ণ অন্ধকারে। টুকরো টুকরো স্মৃতি, স্বপ্ন গোরখপ্রসাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যে অনাবিল আসা যাওয়া করে। এবার বিশুকে ছেড়ে যেতে হবে ; ছায়াঘেরা তার নদীতীরের বিছানায় বিশ্বনাথ রয়ে যাবে একা। একেবোরে একা! ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ে···নদীর খাত, নদীর কূল, এবং সেই ফলকটির ওপরেও বৃষ্টি পড়ে। ঐ জলে ভিজে বিশ্বনাথ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ছাতা নিয়ে যায়নি? দরজা ধাক্কাচ্ছে, ইস্ ভিজে চুপসে হয়ে গেল এতক্ষণে—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! টুকরো টুকরো হয়ে যায় ঘুম—সারা ঘরে অন্ধকার। বাকি রাতটা জেগেই কেটে যায়। চিন্তার ফাঁক দিয়ে কোথাও যেন আলো এসে পড়েছে।

ঝড় জল সবে থেমেছে। দরজায় ধাক্কা। অর্জুনের হাতে ধরা পরনের কাপড়ের কষি, ঘুম চোখ কচলতে কচলাতে দরজা খুলতে এসেছে। "হুজৌর, আপ?"

"নয়ে সাহাব উঠে হৈঁ?" অমিত মুখ ধুতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাতজাগা রক্তচোখ, বিস্রস্তকেশ গোরখপ্রসাদকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল—"আপ?"

"আপনি তৈরি হয়ে নিন" গোরখপ্রসাদ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, "এক জায়গায় যেতে হবে, এখুনি। কাল আপনাকে পুরো চার্জ দেওয়া হয়নি।"

"কোথায় যাব?" মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো অমিত মাথা নামিয়ে নিয়েছে। আগে আগে চলেছেন গোরখপ্রসাদ, পিছনে সে। সূর্য উঠছে, নদীর ওপারের সুগন্ধি সবুজের মধ্যে দিয়ে, পায়ে চলা পথটি এখনও রাত্রির স্মৃতিতে আকুল। ঠাণ্ডা। স্মৃতিফলকটির কছে এসে স্নেহে তার সারা শরীরে হাত বুলোলেন।

"এই আমার একমাত্র পুত্র। এখানে একে রেখে যাচ্ছি। আপনি এর চার্জ নিলেন কথা দিন। না হলে আজ তো যেতে পারব না।"

ফলকের সম্পূর্ণ লেখাটি পড়ে অমিত ধীরে ধীরে মাথা তোলে। যেন সূর্যোদয় হয়েছে তার ললাটে। স্মিত মুখে বলে, "আপনি বিশ্বনাথের বাবা? আমি ওর রুমমেট ছিলাম একবছর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে কে যেন আড়াআড়ি বাঁধ বেঁধে দিল—কানায় কানায় ভরে গেল নদীর পুবপারের মতন। "না, না আপনিই আসুন আমার সঙ্গে।"

লক্ষ্মী ঘুমভাঙা চোখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে এসে খুঁজছিলেন স্বামীকে। হাতে ধরে টানতে টানতে অমিতকে সেখানে নিয়ে এলেন গোরখপ্রসাদ। "লক্ষ্মী, এ আমাদের বিশুর বন্ধু। বিশুর দায়িত্ব ওকেই দিয়ে এলাম।"

অর্জুন মুণ্ডা এসে দাঁড়িয়েছি ডাকবাংলার দরজায়। "এ অর্জুন, চায় আন, জিলেবী আন, আজ সাবকে দোস্ত আয়েঁ হেঁ।"

"আপনি আজ পাটনা যাচ্ছেন কখন?" অমিত প্রশ্ন করে।

"আমি? যাচ্ছি না।" লক্ষ্মীও আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

"আমি ও লক্ষ্মী ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আমার বুড়ো মা আছেন সেখানে। সেখান থেকেই ভলানটারি রিটায়ারমেণ্টের চিঠি দেব সরকারকে। আজ বোধ হয় এগারোটায় বাস।"

অর্জুন আসে, হাতে ঢাউস কালিপড়া কেটলিতে চা ও ঠোঙায় সিঙাড়া, জিলিপি। বলে, "এম এল এ সায়েব আসছেন, সরপঞ্চ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। সবার জন্যে হিসেব করে নিয়ে এলাম।" কথার পিঠে পিঠেই কাশী মহতো গাঁক গাঁক করে এসে পড়েন। "একী, একী ভাইয়া, ফেয়ারওয়েল হলো না, তুমি না দিলে মালা পরাতে, না ভাষণ, এভাবে তো তোমায় আমরা ছাড়ব না। মহল্লার ছেলেরা এরই মধ্যে তোড়জোড় আরম্ভ করেছে, ওরা শুনতে চায় না।"

"ওদের তাহলে বারণ করতে হবে।" গোরখপ্রসাদ স্মিতমুখে বললেন, "আর ফেয়ারওয়েলই বা কেন, কাশীবাবু আপনারাই তো বলেছিলেন মিডিল স্কুলের উদ্বোধন

আমাকে দিয়েই করাবেন, যেদিনই হোক, যেখানেই থাকি? এখন দুগাছা মালা পরিয়ে ভাগিয়ে দিতে চান?"

ভিড় হেসে ওঠে। বাসের সময় হয়ে এলো। বাঁধা-ছাঁদা শেষ। জিনিসপত্র মোটামুটি পাঠিয়ে দিয়েছেন আগেভাগে। বাসের মাথায় চড়বে। গোরখপ্রসাদ ও লক্ষ্মী এগিয়ে চলেছেন। পেছনে দুটি বাক্স, একটি বেডিং ও ছাতা নিয়ে অর্জুন। দারোয়ান স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এফ সি আই গোদামে র‍্যাশন দোকানিরা হাত তুলে নমস্কার করল। যত আগে যাচ্ছেন পেছনে ভিড় ঘন হচ্ছে। গোরখবাবু হঠাৎ ঘুরে তাকালেন।

"হুজৌ···র, বাবু···" বলে দূরে কে ডাকছে ব্যাকুল হয়ে।

অর্জুন বলল, "বাবু ও লখমন পর্‌সাদ আ রহা হৈ। লংড়া।" লক্ষ্মণপ্রসাদ! তার বাড়ি তো পীরটাঁড়, বিশ মাইল দূর। সে কোত্থেকে এলো? দু বছর আগে লক্ষ্মণের দুটি পা-ই কাটা গেছিল ট্রেনের তলায়। রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটাকে লোকেরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়েছিল সদর হাসপাতালে। তারপর অনেক দিন পর দুই পা অ্যাম্পুটেশন হয়ে গেলে লক্ষ্মণ অফিসের বারান্দায় এসে বসেছিল। সেদিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় ভিড়ের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দিকে চেয়ে গোরখপ্রসাদ হাসলেন। লক্ষ্মণ পাঁচ হাজার টাকার জন্যে দরখাস্ত করেছিল লোনের, গ্রামে একটি কিনারায় দোকান খুলবে। ম্যানেজার বেঁকে বসেছিলেন। যদি লোন রি-পে না করে? বিডিও সায়েব, আপনারা টাকা দানখয়রাত করেন, আমাদের পাই-পয়সাও হিসেব করে ঘরে তুলতে হয়। গোরখপ্রসাদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। মুখে হেসে বলেছিলেন, "আইয়ার সাহেব, আপনি এই ব্লকে আসার পর যে পাঁচটি পার্টিকে ট্রাক, ট্রাক্টর ও মাটাডর কেনার জন্য লোন দিয়েছেন, তারা আগে এক চৌথাও শুধুক। তারপর এ বেচারার টাকা শোধবার জন্য আমি শিওরিটি রইলাম।"

লোন পেয়েছিল লক্ষ্মণ, বিস্তর অপেক্ষার পর। ইতিমধ্যে জেলা রেডক্রশের সঙ্গে লেখালিখি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন গোরখপ্রসাদ। লক্ষ্মণকে আবার ডাকালেন। "লক্ষ্মণ, তুই জয়পুর যা। ট্রেনভাড়া দেবে সুসাইটি। ওখানে এক ডাক্তার সাহেব পা-কাটা মানুষদের নতুন পা লাগাচ্ছেন। সেই পায়ে লোক গাছে চড়ছে, দৌড়চ্ছে, যাবি?"

শুনে লক্ষ্মণের ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। ওর বাবা-মার ধারণা, ছেলে সেখান থেকে আর জ্যান্ত ফিরবে না। লক্ষ্মণ শুকনো মুখে দু একবার এলো—"কী করব সায়েব, কিছু বুঝতে পারছি না। যাব কি যাব না।"

আরে, লক্ষ্মণের নতুন পা তো লেগে গেছে। জয়পুর থেকে ফিরল কবে? এখনও ক্রাচ নিয়েই হাঁটছে, তবে দেখাচ্ছে তো পুরো মানুষের মতো। অনভ্যাসে একটু বোধ হয় হোঁচট খেয়েই হাঁটছে লক্ষ্মণ, বারবার যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠছে তার মুখে—অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিতেই বোধ হয়। কাছে এসে পড়েছে লক্ষ্মণ। "হুজৌর" হাঁপাচ্ছে বেচারা ; একহাতে তার ফুল ও পাতার এক বিশাল তোড়া।

"রাম রাম হুজৌর…।" কাল হি মৈনে শুনা। আপকী বদলী হো গঈ সাব? আজ সবেরে চার বাজে বস্ পকড়া। লেকিন সুন্দরপুরকে মোড় পর বস্ খরাব্ হো গয়া— ওঁহি সে চল্ রহে হৈঁ হুজৌর!"

সুন্দরপুর—সাত মাইল এখান থেকে। সাত মাইল হাঁটছে লক্ষ্মণ—এক বছর আগের সেই মাংসপিণ্ড। সমস্ত ভিড়টা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লক্ষ্মণের দিকে।

বাস ছাড়বে এবার। সময় হয়ে গেল। ঘন ঘন কাতর হর্ন দিচ্ছে লগনু ড্রাইভার। গোরখপ্রসাদের হঠাৎ মনে হলো, যে লোহার দরজাটা খোলার জন্য হয়রান আকুল হয়ে এতদিন ঠেলাঠেলি করছিলেন, তা যেন এক লহমায় নিঃশব্দে সরে গিয়ে দেখিয়ে দিল ভিতরের অন্ধকারে যা দেখার ছিল। গলার মধ্যে বাষ্পের ভিড় আচ্ছন্ন করে নিল তাঁর কথা বলার শক্তি। শুধু অমিতকে একপাশে ডেকে নিলেন এবং যেন আর কেউ শুনতে না পায়, এইভাবে, মৃদুস্বরে বললেন, "বেটা, যদি কোনওদিন তোমাকে, একজন খঞ্জ বিশ মাইল পথ ভেঙে একগুচ্ছ ফুল দিতে আসে, সেদিন জেনো, তোমার জী ভরে গেছে, ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে তোমার! গর্দীশ-এ-আয়াম, তেরা শুক্রিয়া—" গোরখপ্রসাদ একহাত ধরে লক্ষ্মীকে পাদানিতে চড়ালেন বাসের, "মৈনে হর পহলু সে দুনিয়া দেখ্ লী।"

টুকুর দিনরাত্রি

নন্দিতা ঘোষ

নন্দিনী রায় হাসপাতালে রাউণ্ড দিতে দিতে বারবার আজ বড়ো বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কিন্তু হাসপাতালের প্রতিটি মানুষই জানে, ডাক্তার নন্দিনী রায় নিজের কাজ সম্পর্কে খুব সচেতন, প্রত্যেকটি রুগী সম্পর্কে তার সজাগ দৃষ্টি, অপরিসীম মমত্ববোধ। ডাক্তারি শুধু তার কাছে পেশা নয়, এটিকে সে তার সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করে।

তবে নন্দিনী আজ কেন এত চঞ্চল? বাড়িতে সে তার একমাত্র পিতৃহীন কন্যা টুকুকে একা রেখে এসেছে। গত চার-পাঁচদিনের জ্বরে টুকু বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই তাকে সে আজ স্কুলে যেতে দেয়নি। তার সবসময়ের কাজের মেয়েটি, মানদা দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। তার পরেই টুকু পড়লো জ্বরে। এদিকে বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। কিন্তু আশ্বিন মাস শুরু হয়ে গেছে। গত কয়েকদিন আগেই বর্ষণক্লান্ত আকাশ কালিমামুক্ত হয়ে শরতের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। নির্মল আকাশে শরতের টুকরো সাদা মেঘের দল খেলা করে বেড়াচ্ছিল। সল্টলেকের খালি প্লটগুলোতে কাশের অজস্র গুচ্ছ মাথা নেড়ে আসন্ন পুজোকে যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

কিন্তু গতকাল সকাল থেকেই আকাশ আবার কালো মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। সারাদিন একবারও সূর্যের দেখা মেলেনি। একঘেয়ে বৃষ্টিতে মনটা যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল।

অবশ্য বিষণ্ণ হওয়ার কারণ নন্দিনীর জীবনের চার বছর আগেই ঘটে গিয়েছে। নন্দিনী যখন হাউস স্টাফ, তখন ব্যাঙ্কের অফিসার মনোজের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। সেই আলাপ ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়, তারপর নন্দিনী আর মনোজ বিয়ে করে সুখের নীড় রচনা করেছিল বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে। ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে মনোজ এই ছোটো বাড়িটি তৈরি করেছিল। মা তখন বেঁচে। বিয়ের সময় পুত্রবধূকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের দু'বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। ততদিনে নন্দিনীর কোলে এসেছে টুকু। নন্দিনী নিজেও বাল্যেই পিতৃহীন, মা দিল্লীপ্রবাসী ভাইয়ের কাছে থাকেন।

মা মারা যাওয়ার পর মনোজ ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু স্ত্রী আর সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল। তারপর হঠাৎ ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মনোজ যেদিন নিজের স্ত্রী-কন্যার কাছ থেকে চিরবিদায় নিল, সেদিন নন্দিনী দিশেহারা হয়ে পড়লো। মাত্র পাঁচটি বছরের মধ্যেই তার বিবাহিত জীবন নিঃশেষ হয়ে গেল—স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রইল শুধু টুকু। টুকু ছিল মনোজের নয়নের মণি। টুকুর জন্মের পর মনোজের বন্ধুবান্ধবেরা কেউ বা ক্ষুব্ধ হ'তো, কেউ বা পরিহাস করতো, কারণ, যে-মনোজ ছিল একান্ত বন্ধুবৎসল, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব না করলে যার একটি দিনও কাটত না, সে এখন নিজেকে প্রায় আবদ্ধ করে ফেলেছে বাড়ি আর অফিসের সীমানার মধ্যে।

বাড়ি ফিরে জামাকাপড় বদলেই মেয়েকে নিয়ে তার খেলা আর আমোদ শুরু হতো—ছোট্ট টুকুকে নিয়ে যখন সে লোফালুফি করত, তখন নন্দিনী মাঝে মাঝে ভয় পেত—মনোজের ছেলেমানুষি যেত বেড়ে। সেই আনন্দের উৎসটি চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে মনোজ কোথায় পালিয়ে গেল?

টুকুই এখন নন্দিনীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু কতটুকু সময়ই বা সে মেয়েকে দিতে পারে? হাসপাতাল ছাড়া, দু'টি নার্সিংহোমের সঙ্গে সে যুক্ত। তবে ছোটো হলেও মেয়ে তার খুব বুঝদার। এই বয়সেই মায়ের সম্বন্ধে সে সদা-সতর্ক। মার কষ্ট লাঘব করার জন্য টুকু সবসময় উন্মুখ। কাজের লোক না থাকলে ঘরের কাজেও মাকে সাহায্য করতে যতটা সম্ভব সে চেষ্টা করে।

আজ হয়তো নন্দিনী টুকুকে একা বাড়িতে রেখে কাজে আসত না। সকাল থেকেই জোর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কয়েকজন গুরুতর রকমের অসুস্থ রুগীকে দেখা একান্ত দরকার বলেই সে হাসপাতালে এসেছিল। সকালে উঠে দ্রুত হাতে ঘরের কাজকর্ম রান্নাবান্না সেরে নিজে খেয়ে, মেয়েকে খাইয়ে নন্দিনী হাসপাতালে এসেছে। নতুন কেনা একটি গল্পের বই টুকুকে দিয়ে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলে এসেছে—তুমি গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ো সোনা, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। কিন্তু বাইরে বৃষ্টির ধারা ক্রমশ আরো ঝেঁপে আসছে। এর মধ্যেই রাস্তায় জল জমে গিয়ে যানবাহনের বিভ্রাট শুরু হয়েছে। দ্রুত হাতে হাসপাতালের কাজ সারছে নন্দিনী—এমন সময় সে বুঝতে পারলো, সন্তানসম্ভবা এক মাকে সিজার করতে হবে—কেসটা একটু জটিল। মেয়েটিকে দিনকয়েক আগেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

আজ অপারেশন করতে করতে টুকুর জন্মের দিনটির কথা নন্দিনীর বারবার মনে পড়ছিল। তাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়ে দিয়ে মনোজের সে কী ছট্‌ফটানি—শেষে মেয়ের মুখ দেখে সে শান্ত হলো, উল্লসিত হলো। মেয়েকে দেখেই সে বলে উঠ্‌লো—আরে। এ যে হাত-পা-নাড়া সুন্দর একটা টুক্‌টুকে পুতুল।

কিন্তু আজ মনোজ কোথায়! কেন সে তাদের ফাঁকি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল? নন্দিনীর চোখ দুটি জলে ভরে আসছিল। কিন্তু অন্য ডাক্তার আর নার্সেরা অপারেশন থিয়েটারে ডাঃ রায়ের চোখে জল দেখে বিস্মিত হবে—নন্দিনী নিজেকে সংযত করলো।

হাসপাতালের সব কাজ শেষ করে নন্দিনী যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, তখন সে চোখে অন্ধকার দেখল। এই বিকেলেই যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে—রাস্তায় এক হাঁটু মতো জল—যানবাহন প্রায় বন্ধ। তার টুকু এতক্ষণ একা-একা কী করছে? কেমন করে সে সেই বাঙ্গুরে পৌঁছবে—যেখানে একঘণ্টা বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়? মেয়ের কাছে দ্রুত পৌঁছবার জন্য তার মন হাহাকার করে উঠলো।

নন্দিনীর নিজের ছোটো একটি গাড়ি আছে—কিন্তু গত কয়েকদিন হ'লো মেরামতের জন্য সেটিকে গ্যারেজে পাঠানো হয়েছে। তার ইচ্ছে ছিল, আজ কাজ সেরে সে দ্রুত

ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি? রাস্তায় যে পরিমাণ জল জমেছে তাতে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। শুধু অনেকক্ষণ পর পর এক একটি প্রাইভেট বাস হাঁক দিয়ে, পথচারীদের গায়ে জল ছিটিয়ে, রাস্তার জমা জলে ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে।

নন্দিনীর মানসিক অবস্থা বুঝে হাসপাতালের সহকর্মী ডাক্তারেরা বলেছিলেন, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স আপনাকে পৌছে দেবে।'

কিন্তু নন্দিনী শুনলো, দুটি অ্যাম্বুলেন্সই বের হয়ে গেছে। এই জলরাশি ভেদ করে তারা যে কখন ফিরবে তার কোনো ঠিক নেই। মেয়ের জন্য একান্ত ব্যাকুল আর চঞ্চল হৃদয় নিয়ে তার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সে ছাতা খুলে রাস্তায় বের হয়ে পড়লো।

আজ সকালে মা যখন কাজে বের হয়ে গেল, তখন টুকুর মনটা অভিমানে ভরে উঠেছিল। এই ছোটো জীবনে মা-ই তার একমাত্র অবলম্বন। বাবাকে সে চিনেছে শুধু ছবি দেখে, আর মা'র মুখে তাঁর গল্প শুনে। দিল্লি থেকে মাঝে মাঝে মামা আসেন, দিদা আসেন—কিন্তু তাঁরা তো ক্ষণিকের অতিথি। দিদার শরীর ভালো নয়, চোখে ছানি পড়েছে—ভালো দেখতে পান না, তাই মা তাঁকে নিজের কাছে রাখতে সাহস করেন না। এই ফাঁকা বাড়িতে কে তাঁর দেখাশোনা করবে? টুকুর বাবাও ছিলেন একমাত্র সন্তান। তাই পিতৃকুলের দিক থেকেও সে একা। এই একক জীবনে টুকু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল—কিন্তু আজ শরীর খারাপ, স্কুলেও যেতে পারেনি, তাই টুকুর মনের ওপর একাকিত্বের একটা বোঝা যেন চেপে বসেছিল।

যাই হোক, মা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যখন রওনা হয়ে গেল, তখন টুকু নতুন কেনা গল্পের বইটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল। দুর্বল শরীরে ঘুমটা একটু গাঢ়ই হলো। তার ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বাজে প্রায় চারটে। কিন্তু টুকুর মনে হ'লো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলো। মা'র রেখে যাওয়া খাবার খেয়ে দরজা একটুখানি ফাঁক করে দেখলো, তাদের সামনের উঠোনে জল জমে গেছে—বৃষ্টির ছাঁট লাগতেই সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার গল্পের বই নিয়ে বসলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, মা নিশ্চয়ই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এসে পড়বে।

টুকু যখন অধীরভাবে মায়ের পথ চেয়ে আছে, নন্দিনী তখন বাস স্টপে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে আবার জল ভেঙে হাঁটতে শুরু করেছে। চোখে তার হাই পাওয়ারের চশমা। বৃষ্টির ছাঁটে চশমার কাঁচ দু'টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পায়ের নিচে জলের তোড়, ওপরে প্রবল বৃষ্টির ধারা অগ্রাহ্য করে নন্দিনী হেঁটে চলেছে। একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে-যেতে কোনোরকমে সে নিজেকে সামলে নিল। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর কোনোক্রমে একটা পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসের ঝুলন্ত ভেজা মানুষদের ভিড় ঠেলে সে ভেতরে উঠে পড়লো। কেউবা ভ্রূ কোঁচকালো, কেউ বা একটু কটূক্তি করলো।

নন্দিনীর ভাগ্য ভালো, শেয়ালদা'র কাছে একটা লেডিজ সিটে সে জায়গা পেলো। শ্রান্তিতে আর উদ্বেগে তার শরীর তখন ভেঙে পড়ছে।

টুকুর কথা ভাবতে ভাবতে নন্দিনীর মনে পড়লো নিজের শৈশবের কথা, বাল্যের কথা। টুকুর মতো সে-ও বাবাকে হারিয়েছিল নিতান্ত অল্প বয়সে। তখন তার বয়স দশ আর ছোটো ভাই বুবুনের বয়স ছয়। নন্দিনীর মা ছিলেন সেকালের বি. এ. পাশ। কোনোক্রমে একটি ছোটো মফস্বল শহরে শিক্ষিকার কাজ পেয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। তখন তাদের জীবনে সংগ্রাম যেমন ছিল, তেমনি আনন্দও ছিল। মা একটি ছোটো বাড়ি পেয়েছিলেন। সামনে ছিল লাল সুরকি ঢালা পথ—দু'দিকে দুটি গাছ, একটি রাধাচূড়া, আর একটি কৃষ্ণচূড়া। গাছ দু'টি যখন ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত তখন কী ভালোই না লাগতো। সেখানকার বর্ষা এত নিষ্ঠুর বলে মনে হ'তো না। বিশেষ করে গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টির ছোঁয়া লেগে মাটি থেকে যে সোঁদা গন্ধ উঠে আসতো—সে গন্ধ তার বড়ো প্রিয় ছিল। আর প্রিয় ছিল শীতের ভোরে মায়ের হাত ধরে দুই ভাইবোনের বেড়াতে যাওয়া। শহরটি নামে শহর হ'লেও ছিল গ্রামঘেঁষা। ভোরে খেজুর গাছ থেকে যখন রসের হাঁড়ি নামানো হতো, সে রস খাওয়ার জন্য তারা দুই ভাইবোন উন্মুখ হয়ে থাকতো। সেসব দিন আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়। তার মা তাদের চাকরি করেই মানুষ করেছেন কিন্তু টুকুর মতো এমন নিঃসঙ্গ জীবন তাদের যাপন করতে হয়নি। ভাবতে ভাবতে নন্দিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

গল্পের বই টুকুর বড়ো প্রিয়। কিন্তু আজ সে বইতে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। বৃষ্টির দাপটে, ঝোড়ো হাওয়ায় দরজার কপাট আর জানলার কাঁচের সার্সি কেঁপে উঠ্‌ছে—টুকু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে—ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। টুকুর অস্বস্তি ধীরে ধীরে ভয়ে পরিণত হলো। এক একবার দরজায় হাওয়ার আর বৃষ্টির ছাটের ধাক্কা লাগে, টুকুর মনে হয়, মা বোধহয় এসে গেল। টুকু একবার দরজা খুলে দেখল, উঠোনের জল বাড়তে বাড়তে দুটো সিঁড়ি ডুবে গেছে।

আস্তে আস্তে তার মনটা গভীর অভিমানে ভরে ওঠে—মা এখনো আসছে না কেন? মা তো জানে, তার শরীর ভালো না—এই ঝড়বৃষ্টিতে তার বুঝি একা একা ভয় করে না?

আবার সে গল্পের বই নিয়ে সোফাতে গিয়ে বসে—এবার সে নিজে নিজে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করে। মা'র মুখে সে শুনেছে, দেশ যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তার এক মামা কেমন বীরের মতো প্রাণ দিয়েছিলেন। যার মামা এত সাহসী ছিলেন, সে মেয়ে কেন ভীতু হবে?

আস্তে আস্তে আটটা বাজে—এবার টুকুর কান্না পেতে লাগল—আজ সে রাতে খাবে না। মা অনেক করে সাধলে—অনেক আদর করলেও না।

তারপর কী মনে করে সে উঠে গিয়ে খাবার টেবিলটা গুছিয়ে রাখল—খাবার দুটো থালা ধুয়ে উপুড় করে রাখল।

খাবার টেবিলে বসে বসে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ দরজায় আওয়াজ পেয়ে সে চম্‌কে উঠ্‌লো—কিন্তু দরজা খুললো না, ভাবলো এবারো নিশ্চয়ই হাওয়ার শব্দ। তারপর ডাক শুন্‌লো—'টুকু, আমি এসেছি, দরজা খোল্'—টুকু দরজা খুলে লাফিয়ে

উঠে দেখে, তার মামণি দাঁড়িয়ে আছে,—সমস্ত জামাকাপড় ভেজা—টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে। নন্দিনী মেয়েকে বলে—খুব রাগ করেছিস তো? ভয় পেয়েছিলি নাকি? মায়ের সিক্ত, শ্রান্ত মুখচোখ দেখে রাগ-অভিমান ধুয়ে মুছে গেল। সে তাড়াতাড়ি মায়ের হাত থেকে ভেজা ছাতা আর ব্যাগটা নিল—মাকে তোয়ালেটা এগিয়ে দিল।

স্নান সেরে, শুক্‌নো জামা-কাপড় পরে নন্দিনী বাথরুম থেকে বের হয়ে এসে দেখল—খাবার টেবিলে টুকু খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। মেয়ের কপালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে মেয়ের সঙ্গে খেতে খেতে সে তার বাড়ি ফেরার কাহিনী শোনাতে লাগলো—কেমন করে—অনেকটা পথ জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে, একটা প্রাইভেট বাসে কিছুটা এসে, তারপর পনেরো টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে সে বাড়ি ফিরেছে।

শোয়ার আগে নন্দিনী ঘড়িতে অ্যালার্ম দিল—কাল আবার সকালে উঠে কাজ সেরে হাসপাতালে যেতে হবে—আজ যার অপারেশন করে এসেছে, সেই মেয়েটির অবস্থা ভালো নয়—তাকে দেখতে যেতেই হবে।

মা শুয়ে পড়ার পর টুকু মশারির ধারগুলো গুঁজে দিল—তারপর মায়ের ক্লান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে তার মন অসীম মমতায় ভরে উঠ্‌লো—মা অ্যালার্ম দিয়েছিল ছ'টায়—সে আস্তে কাঁটাটা ঘুরিয়ে সাড়ে ছ'টা করে দিল—মা অন্তত আধ ঘণ্টা বেশি ঘুমোতে পারবে।

সদর দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ করা হয়েছে কিনা দেখতে এসে টুকু একবার দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো—চাঁদ একটুখানি উঁকি দিচ্ছে—সেই চাঁদের আলোয় উঠোনের জমা জল ঝিকমিকিয়ে উঠ্‌ছে—টুকুর হঠাৎ চোখে পড়লো বৃষ্টির জলে ভাসতে ভাসতে একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি তাদের সিঁড়ির পাশে আটকে আছে—তার ওপর চাঁদের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করে উঠ্‌ছে—এতক্ষণের ভয় আর উদ্বেগ কেটে গিয়ে এবার হঠাৎ টুকুর সুন্দর দুটিচোখে দু'ফোঁটা জল চিক্‌চিক্ করে উঠলো।

ছিনতাই

ঝুমুর পাণ্ডে

জগুয়া সর্দার মাদল বাজিয়ে চলেছে। মাঝরাত। জোছনা, তারা, ঘুমন্ত পৃথিবীটা যেন বুকের ভেতর একরাশ কান্না চেপে হাসছে। সুদাম বিছানার উপর উঠে বসে। বাঁশের মাচা শব্দ করে ওঠে। বেশ বাজাচ্ছে জগুয়া সর্দার এই মাঝরাতে মাদল? নিজেকেই প্রশ্ন করে সুদাম? বৃষ্টি আসবে বলে? তাতো নয়। তবে কি জগুয়াও জীবনের কোন যন্ত্রণা ভুলতেই একমনে বাজিয়ে চলেছে? কে জানে মাদলের আওয়াজটা সুদামের রক্তের ভেতর কেমন একটা উগ্র নেশা ছড়াতে থাকে। চিন্তা বলেছিলো—

—"করমে আসিস নাচব।"—

—"দেখি।"— ৲

—"দেখি না, এমন দিনে না আইলেও জাগরণের দিন দেখ ঠিক আসিস। আস্‌বিস্‌ তো?"

একরাশ খুশি মাখা তীব্র ভালোবাসাময় দুটো চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে বলেছিলো চিন্তা।

—"আসব।" কথা দিয়েছিলো সুদাম। কিন্তু শহর থেকে ঐদিন অনেক রাতে ফিরেছিলো সুদাম। আর তারপর? এখনও তাই মাদলের শব্দ শুনলেই সুদামের রক্তের ভেতর একটা চৈত্র নেশা ছড়ায়। তারপর কণা কণা করে জড়ো হতে থাকে বিদ্রোহ। কার প্রতি? এই সমাজটার? মেঝের উপর ভাইবোনগুলোকে নিয়ে মা ঘুমুচ্ছে। খড়ের চালের ফোকর দিয়ে এক চিলতে চাঁদের আলো মায়ের মুখের উপর পড়েছে। কি ফ্যাকাশে আর রক্তশূন্য দেখাচ্ছে মায়ের মুখটা। সুদাম তাকিয়ে দেখে সব থেকে ছোট ভাইটা মায়ের শুকনো বুকে বৃথাই অমৃত খুঁজছে। সুদাম ভাবে মা কতোদিন ভালো মন্দ খায় না। ওরাও কি খেতে পায়? বাপটা কিছুক্ষণ আগে মদ খেয়ে ফিরেছে। সুদাম শুয়ে শুয়ে বমির শব্দ শুনেছে। ভাগ্য ভালো আজ চেঁচামেচি না করেই শুয়ে পড়েছে। আগে বাপ মাতাল হয়ে ফিরলেই বিছানা ছেড়ে উঠতো সুদাম। আজকাল আর উঠতে ইচ্ছে করে না সুদামের। কেন জানি না এক এক সময় মরে যেতে ইচ্ছে করে। দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে সুদাম। তারাভরা বিশাল আকাশটার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে। চারদিকের এই পরিবেশের সাথে নিজেকে একদম মানিয়ে নিতে পারে না সুদাম। ভাবে একেবারে কিছু না জানার হয়তো কিছু সুখ আছে। কিন্তু জানার? কিছু জেনেই তো সুদামের বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। মাদলের আওয়াজ দ্রুতপায়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দূরে যাত্রাগানের আসর বসিয়ে জুয়ো খেলা চলছে। হল্লাটা মিহি হয়ে এদিকে আসছে। সুদামের আবার মনে হয় চিন্তা দুচোখে স্বপ্নের কুয়াশা মেখে বলেছিলো—"করমে আসিস, নাচব।" সুদাম তো ভুলে যেতে চায় তবু কেন বার বার মনে হয়।

—"আর পারছি নাই রে?"—

—"কি পারছিস নাই।"—

—"এমন করে আর বাঁচে থাকতে। লোভী চোখ গিলানের সামনে আমার মদ বেচতে ভাল নাই লাগে রে।"

—"দোস্‌রা কাম করিস নাই কেনে?"—

—"পিসী করতে নাই দেয়। দোস্‌রা কামে যে লাভ নাই। আর উতো হামার নিজের পিসী নাই লাগে।"—

—"জানি।"

—"হামার বাপ কে লাগে জানিস? অমরবাবু।"

—"উ কথাও জানি।"—

—"বাকিন? বাকিন হামার বাপকে হামি ঘিন করি জানিস? মায়ের ইজ্জত লিয়ে উ কেমন দেখ সমাজে নেতাগিরি করছে। উওয়ার বেটাবেটি গিলান কলেজে পড়ছে। আর হামি? এক এক সময় জানিস হামার অমরবাবুর গলাটা টিপে ধরতে মন করে।"—

সুদাম হাসে।

—"হাসছিস কেনে?" ভুরু দুটো কুঁচকে যায় চিন্তার।

—"হামাদের আরও বেজান কিছু মনে করে রে। বাকিন হামারা পারি না।"

—"তুই ঠিকই বলছিস সুদাম।"—

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে চোখে মুখে একরাশ হাসি আর কথা মিশিয়ে জিজ্ঞেস করে চিন্তা—"হামাকে ঘরে কোনদিন লিবি?"

—"কয়দিন সবুর কর চিন্তা।"

দুটো মন হঠাৎ সব কষ্ট ভুলে গিয়ে একটা স্বপ্নের ভেতর ডুবে যায়। অনেক অনেকক্ষণ।

আচমকা একটা রাতজাগা পাখি ডেকে ওঠে। সুদাম চমকে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকায়।

—"সুদাম, শুন।"—

—"কি?"—

—"জাগরণের দিন আসবিস তো?"—

একটা কথা নানাভাবে হাত-পা মেলে সুদামের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যন্ত্রণায় কেমন ফালা ফালা করে।

ভালোমানুষ শমিতদা বলে—রাজনীতি করবি সুদাম?

রাজনীতি! উসব তো হামি বুঝি না।

—"তুই তো পড়াশুনা করেছিস! সুদাম!"—

—"আরে পড়াশুনা করে কি হইল। হামার বাপ হামাকে বাবু বানাবার লাগিন জমিন বেইচে পড়াল। বাকিন না হতে পারলি বাবু, না হতে পারলি শ্রমিক।"—

—"কেন রে?"—

—"চাকরি কোথায় পাইলি। আর এতোদিন অভ্যাস ছুটে যাওয়ায় এখন কামও করতে নাই পারি ভালো করে।"

—"কিন্তু সুদাম, তোর ভেতর প্রতিভা আছে, তেজ আছে।"

—"কিন্তু উমন বড় জটিল জিনিস মাথায় নাই ঢুকে।"

—"মানুষকে ভালোবাসিস তো?"—

—"বাসি।"

—"তবে আয়নারে মানুষকে ভালোবাসার রাজনীতি করবি।"

—"করবো শমিতদা। হামাকে থোড়া ভাবতে দেও।"

মাদলের শব্দটা আবার কান পেতে শোনে সুদাম।

—"সুদাম?"—

সবুজ পাহাড়ের উপর একঝাঁক পাখির কাকলি।

—"ভালো লাগছে নাই।"—

—"কেনে?"—

—"জানি না। কোথাও যাবিস তুই?"—

—"হঁ রে, থোড়া শহরে যাবো।"—

—"হামার ডর লাগছে রে সুদাম।"

—"ডর লাগছে? কেনে?"—

—"অসিতবাবু হামার পিছা লিয়েছে রে।"

—"কোন অসিতবাবু?"—

—"ভুলাই গেলি? হই যে হামার পিসীর জমিনটা দখল করে গেলো। বেজান টাকার মালিক, দুটা গাড়িও আছে।"

—"চিনেছি রে। মদের দোকানের মালিক অসিতবাবুকে কে নাই চিনে।"

—"হামার কেমন খারাপ লাগছে সুদাম।"

—"তুই মিছামিছি ডরাচ্ছিস।"

—"আজ করমের জাগরণ মনে আছে?"

—"আছে রে।"

—"জলদি করে আসবিস তো?"

—"আসব রে আসব।"— হেসে ফেলে সুদাম।

কিন্তু চিন্তার কথা কি ঐদিন রাখতে পেরেছিল সুদাম? পারেনি। শহর থেকে ঐদিন গাড়ি না পেয়ে অনেক রাতে হেঁটে ফিরেছিলো। ঘরে ঢুকে কিছু মুখে না দিয়েই ছুটেছিলো করমের জাগরণে। নাচ তখন খুব জমে উঠেছে। এই জগুয়া সর্দারই তো ঐদিনও বাজাচ্ছিল মাদল।

—"আয় সুদাম নাচবি নাই।"—একসাথে অনেক মিহি কণ্ঠের আমন্ত্রণ। "না, ভালো লাগছে নাই।"—সুদামের তৃষ্ণার্ত চোখ দুটো আঁতি পাঁতি করে চিন্তাকে খোঁজে। না,— কোথাও নেই। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারেনি বলে কি রাগ করে চলে গেল চিন্তা। সুদাম ভাবে।—"হে সুদাম চলে যাচ্ছিস? আয় এক গিলাস খায়ে যা।"—

এবার জড়ানো কণ্ঠের আহ্বান।

—"না, ভালো লাগছে নাই।"

চিন্তার খোঁজে বেরিয়ে আসে সুদাম। বড় রাস্তার মোড়ে চাঁপাতলায় হঠাৎ ফোঁপানো কান্নার শব্দে থমকে দাঁড়ায়।

—"কে এই এইখিনে?"—

ফোঁপানো বেড়ে যায়। জবাব আসে না। সুদাম পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে চমকে ওঠে—"চিন্তা তুই?"—

—"তুই এতো দেরী করে আইলি কেনে সুদাম?"—

—"কি? কি হয়েছে বল হামাকে।"—"অসিত বাবু হামাকে"…

—"কোথায়?"

চাঁদটা লজ্জায় একরাশ মেঘের বুকে মুখ লুকোয়। জোছনাটা তেমনি থিক থিক কাঁপে।

"এই তো, তোখে নাচের ওথায় খুঁজে নাই পায়ে তোর লাগি ঝোপটার সামনে দাঁড়াইছিলাম আর …।" না,—আর কিছু শুনতে চায়নি সুদাম। সে রাতেই অসিতবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তারপর বাবুর গাল, ঘাড় বেয়ে টাটকা রক্তের স্রোত। অনেকের চিৎকার। সুদামের জেল। ভাবতে চায় না সুদাম। তবু কেন মনটা বার বার পা পা করে পিছিয়ে গিয়ে স্মৃতির ভেতর গেঁথে যায়। জেলে বসেই শুনেছিল চিন্তা পদ্মপুকুরে ডুবে মরেছে। সুদাম অনেক ভেবেছে কেন মরল চিন্তা। চিন্তার মা তো মরেনি। চিন্তার দশবছর বয়স পর্যন্ত একরাশ লজ্জা মেখে বেঁচে তো ছিলো চিন্তার মা। জগুয়া সর্দার বলে "ওরা খালি হামাদের জমিন ছিনে নাই। ওরা হামাদের ইজ্জতও নেয়। হামাদের ভালোবাসাও ছিনে লিয়ে টুনাটুনা করে।" কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মাদলের শব্দটা আবার শোনে সুদাম। যন্ত্রণার পাপড়িগুলো এই মুহূর্তে একটা মাথা হয়ে সুদামকে জড়িয়ে ধরে পচাপুকুরে একবার চুবিয়ে আনে। যাত্রার হল্লাটা আচমকা সুদামকে হাতছানি দেয়। ঘরের দিকে তাকায় সুদাম। না, কেউ জেগে নেই। জোছনা ঢালা পথ দিয়ে হাঁটে সুদাম। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখে মদ নিবারণী সভার প্রেসিডেণ্ট (চিন্তার বাপ) অমরবাবু রাস্তার পাশে নর্দমার ভেতর মাতাল হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন। দুটো লোক খিস্তি শুনতে শুনতে অমরবাবুকে নর্দমা থেকে তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো রিক্সোয় তোলে। সুদাম ভালো করে তাকিয়ে দেখে লোক দুটোই অমরবাবুর চামচে। সুদামের কেন জানি বেদম হাসি পায়। বাগানের কাছাকাছি এসে চারদিকে তাকায় সুদাম। জুয়ো খেলার আসরে অনেক ভদ্র মুখের মেলা। মদের গন্ধ। আচমকা সুদামের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। সাথে কয়েকটা শব্দ—"রাজনীতি করবি?" টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে আরও কয়েকটা শব্দ সুদামের কানে আসে।—"এতো শমিত নয়রে, কাকে মারলাম!" "যেই হোক পালিয়ে আয়।" দুমদাম করে ছেলেগুলো পালিয়ে যায়। সুদাম অচৈতন্য হয়ে দেখে যাত্রাটাত্রা কিছু নেই। স্টেজের উপর দুটো লোমশ বাহু অনেক হাড় জিরজিরে লোকের গলা চেপে ধরেছে। সুদাম চারদিকে তাকিয়ে দেখে অনেক যুবকের শীর্ণ মুখ।

—"তোমরা যাও নাগো, দেখছ নাই মানুষ গিলানের গলা টিপছে।" সুদাম চিৎকার করে ওঠে। —"আমরা পারি না।"—

স্টেজে এবার নীল আলো। একটা নগ্ন নারীদেহের উপর অনেকের বলাৎকার।

—"তোমরা যাও নাগো।" সুদামের গলায় এবার চরম আকুতি।

—"আমরা পারি না। পারি না।"—

—কেন পারো না? তোমরাকেও কি হামার মতো—

—"নাগো, দেখছো আমাদের মেরুদণ্ড নাই।" সত্যিই সুদাম তাকিয়ে দেখে অগণিত যুবকরা গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে।

—"তবে কারা পারবেক গো?"

—"আমাদের উত্তরাধিকাররা।"

—"কোথায় ওরা?"

—'আসছে।'

সুদাম মাথাটা ঘুরিয়ে দেখে।—"কোথায় আসছে গো?"—

—"ওরা অনেক দূরে সুদাম। দেখবে কি করে?" অগণিত যুবকের কণ্ঠ মিলিয়ে যায়। সুদাম দেখে চারদিকে কেমন একটা ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সুদামের সবাইকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করছে। বাবা-মা, ভাই-বোনদের সুস্থ মুখগুলো হাসছে। আর চেতনাটা পুরোপুরি লুপ্ত হওয়ার আগে দেখতে পায় সুদাম—একফালি উঠোনে সারা গায়ে চাঁদের আলো মেখে চিন্তা বলছে "এখন হামাদের জমিন আছে, হামার ইজ্জত আছে, শয়তানরা সব লুকায় গেছে সুদাম। ভালোবাসা কেউ টুনা করবেক নাই আয়…।

সতেরো টাকার জীবনবৃত্তান্ত

সুমিতা ভট্টাচার্য্য

মনোহরের মুখের দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা কেমন হিম হয়ে যাচ্ছিল মালতীর।

যন্ত্রণায় দীর্ণ মুখ। এমনিতেই তার ঝুলে পড়া চোয়াল, তোবড়ানো গাল, কোটরগত চোখ। আর কিছুটা অসাড় হয়ে যাওয়া ডান অঙ্গ। এই পঙ্গুত্বের সাথে রয়েছে আবার হাঁপানী রোগ।

সেই হাঁপানীর টানটাই আবার বেড়েছে মনোহরের। সকাল থেকেই দারুণ গোঙাচ্ছে সে। গোঙানির শব্দটা ঠিক চাপা কান্নার মতো। শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটায় কেমন শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ছিল মালতীর।

ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে একটু একটু করে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল সে। যে করেই হোক, ঠিক আটটার মধ্যেই তাকে নার্সিং হোমে পৌঁছতে হবে। একটানা আঠারো দিন পরে কাল সকালেই ছুটি হয়ে যাচ্ছে তার পেশেন্টের। সুতরাং আজ রাতের ডিউটিটা শেষ করতেই হবে। তবেই কাল সকাল আটটায় তার রেহাই। তারপর না হয় দু চারটে দিন আর ডিউটি ধরবে না সে। কিন্তু আজ? এই মুহূর্তে?

একটুক্ষণ ভাবল মালতী।

প্রায় পাঁচ সাত দিন ঘোরাঘুরির পর ছাব্বিশ নম্বর ঘরের এই ডিউটিটা পেয়েছিল। নার্সিং হোমের সব চেয়ে দামী ঘর ওটা। তবে ঘর দামী হলেই যে আয়ার দাম বাড়বে তা নয়। তবু ঐ ঘরে কাজ পাবার লোভে উন্মুখ হয় সবাই। মালতীও হয়েছিল।

আগাগোড়া মোজেইক, এয়ার কণ্ডিশন্‌ড্‌, অ্যাটাচ্‌ড বাথ ঘর—অমন ঘরে ডিউটি করার একটা আলাদা সুখ আছে ঠিকই। তার ওপরে আবার অপারেশন কেস—কম করেও পনেরো দিনের ব্যাপার।

ডান চোখ ছোট করে আড়ে হেসেছিল সতীশদা।

'কি, এবার হয়েছে তো?'

'না হয়নি, আবার—' হেসেছিল মালতীও।

আসলে কাউণ্টারের সতীশদা আর সিস্টার ইনচার্জ নীরাদি—ঐ দুজনেই ডিউটি ধরিয়ে দেয় সবাইকে। ওরাই নার্সিং হোমের সব 'মাসি'দের বাপ-মা। অবশ্য এজন্যে কম তোষামোদ করতে হয় না নীরাদিকে। রোজ সন্ধ্যায় একবার করে ধর্ণা দিতে হয় নার্সিং হোমে। আর ওদিকে সতীশদার সাথে ফষ্টিনষ্টি। ওর ওপরেই তো ডিউটির ভাল মন্দ।

ছোট্ট দেওয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে চুল বাঁধতে বাঁধতে মনোহরকে বার বার দেখে নিচ্ছিল মালতী। অত বড় শরীরটা রোগে ভোগে ব্যথায় যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। শুধু হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো। হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুকখানা। বন্ধ চোখের নিচে ঘন কালির ছোপ। সামান্য হাঁ করা মুখ।

হঠাৎ যদি ভাল মন্দ কিছু একটা ঘটে যায় মানুষটার? যদি রাতের মধ্যেই ···ভাবনাটা একবার মনকে ছুঁয়ে যেতেই গুর্‌গুর্‌ করে উঠেছিল বুকের মধ্যিখানটা। কিন্তু সে আর এক মুহূর্ত? ভাববার মতো যথেষ্ট অবসরই ছিল না তখন। সময় দৌড়চ্ছিল অপরিসীম দ্রুততায়।

নাইলনের দড়ির হাল্‌কা হাত ব্যাগে রাতের ডিউটির জন্য দরকারী জিনিসগুলো দ্রুত গুছিয়ে নিয়েছিল মালতী। দুটো টিফিন বক্স, সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, জর্দার কৌটো, পানের ডিব্বা, টুথপেস্ট, ব্রাশ, চশমা, রুমাল এবং আরও কিছু টুকিটাকি।

আঠা লাগানো নকল টিপটা কপালের ঠিক মাঝখানে সেঁটে নিতে নিতে মনোহরের সামনে এসে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়েছিল সে। চৌকি সংলগ্ন ছোট্ট টুলটার ওপর রাতের খাবার, জলের বোতল, মালিশের শিশি, ওষুধ, মগ আর হাতপাখা। নিচে জলের গামলা। মালতীই গুছিয়ে রেখেছিল সব। মাত্র তের বছরের মেয়ের দায়িত্বে অক্ষম অসুস্থ মানুষটাকে রেখে যেতে হয় তাকে। মেয়ের কাজের বোঝা তাই আর এতটুকুও বাড়াতে চায় না সে।

মনোহরের আতপ্ত কপালে আল্‌তো হাত ছোঁয়াতেই থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠেছিল মানুষটা। চোখের কোণায় একবিন্দু জলকণা টল্‌মল্‌ করে উঠেছিল মুহূর্তে। মালতী সেদিকে তাকায়নি। খুব নিচু স্বরে আলগোছে বলেছিল, 'আমি বেরোচ্ছি। মিনুটা কেরোসিন ধরতে গেছে, এক্ষুনি এসে যাবে বোধহয়। টুলের ওপর সব কিছু রইল। ক্ষিদে পেলে খেয়ে নেবে, আর যা লাগবে মিনুকে বলবে। বুঝলে?'

মনোহর কিছু বুঝেছিল কিনা মালতী বুঝতে পারেনি। বন্ধ চোখও খোলেনি। কিন্তু শীর্ণ বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছিল মালতীর শাড়ির আঁচলটা।

এই এক জ্বালা তার। মনোহরের অবুঝপনা। অসহ্য। এক ঝটকায় শাড়ির আঁচলটা মুক্ত করে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল মালতী—'কি ছেলেমানুষী করছো বল তো? কত দিন বলেছি না বেরোবার সময় ঝামেলা পাকাবে না। কথা কানে নাও না, না? ঘরে বসে এখন তোমাকে নিয়ে সোহাগ করার সময় আছে আমার? নাকি ওতে সংসার চলবে? মরণ—'

দ্রুততার সময় সামান্য বাধাও যেন মাথার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয় কি ভাবে। মেজাজকে তখন কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না সে।

ঘরের মধ্যে আর একটা মুহূর্তও দাঁড়ায়নি মালতী। প্রায় এক লাফে নেমে এসেছে উঠোনে। অমনি পাশের বারান্দা থেকে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে এসেছে মানদামাসি—

'বলি, মনোর নাকি খুব বাড়াবাড়ি শুনছি বৌ।'

'হ্যাঁ তো।'

'তা, অমন মানুষ ঘরে রেখে আজও বেরোচ্ছ কেন গা?'

'বেরোচ্ছি—'

গুম হয়ে প্রায় এক ছুটে চলে এসেছিল সে রাস্তায়। হাড়বজ্জাত সব কটা! শুধু অন্যের ছিদ্রানুসন্ধান! কিন্তু কি আর করা যাবে। ওদের সাথেই থাকতে হবে। ওদের সঙ্গেই ভাগ করে নিতে হবে বাকি দিনগুলোর দুঃখসুখ।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন বড় রাস্তায় চলে এসেছিল সে। শূন্য হাতে মিনু ফিরছিল। মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে ভাঙা গলায় মালতী বলেছিল—'বাবাকে ঠিকমতো ওষুধগুলো দিয়ে দিবি কিন্তু। আর শোন, তেমন বুঝলে মনা কিম্বা কেলোকে দিয়ে নার্সিং হোমে একুটা খবর পাঠাবি, বুঝলি।'

বাসে উঠেও অনেকক্ষণ হাঁপাচ্ছিল সে। প্রায় নার্সিং হোম পর্যন্ত। যেন একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসা। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। ঠিক সিঁড়ির মুখেই হাসিদি। কিলবিল করে হেসে উঠেছিলেন—'তোকে এই জন্যেই বলি মালতী, ঘড়িটা একবার সারাতে দে। তা তুই তো কথা কানে নিবি না মোটেই।'

শুধু এইজন্যেই হাসিদিকে সবাই সমীহ করে নার্সিং হোমে।

একদমে লম্বা করিডর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এসেছিল মালতী। তারপর আরও বেশি ক্ষিপ্রতায় ছাব্বিশ নম্বরে। নিজেকে নিঃশেষে ছেড়ে দিয়েছিল কাজের ঘূর্ণিতে। একের পর এক কাজ। ন বছরের পুরনো রুটিন। পেশেন্টকে খাওয়ানো, ওষুধ দেওয়া, ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া (পয়সা খরচ করে আয়া রেখেছে যখন), বিছানা পরিষ্কার করা, মশারি টাঙানো, এমন কি রাত দশটায় লাস্ট রাউণ্ডে নীরাদি টেম্পারেচার নিতে এলে তার সাথে হেসে কথা বলা পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে মালতীর। বুকের মধ্যে ঘৃণা জমে। কষ্ট হয় নিজের জীবিকার ধরনে। কিন্তু এই কাজটুকুই তো তাকে এনে দেয় টাকা—রোজ সতেরো টাকা—বেঁচে থাকার রসদ। এর বিকল্প জানা নেই তার। এই কাজের জন্যই আবার কত প্রতিযোগিতা, কত উমেদারী, মাথা কুটোকুটি! মালতী নিজেও অবশ্য কম মাথা কোটেনি নীরাদির পায়ে। পঙ্গু স্বামী আর দুটো অভুক্ত শিশুকন্যাকে ঘরে রেখে আগরপাড়া থেকে প্রায় রোজ ছুটে এসেছে নীরাদির বেকবাগানের বাসায়। রেশন তুলেছে। বাজার করেছে। আসলে সে বুঝে গিয়েছিল মনোহর আর ভাল হবে না জীবনেও।

নীরাদির কাছে সে তাই ভীষণভাবে ঋণী। এই ঋণ অপরিশোধ্য।

চলে যাবার সময় দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়েছিল নীরাদি। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলেছিল, 'তোর আবার আজ কি হল রে মালতী? একদম চুপচাপ।'

'কই? কিছু হয়নি তো নীরাদি। এমনিই—' আসলে নিজেকে তখন তার ভাঙতে ইচ্ছা করছিল না এতটুকুও। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল দাউ দাউ করে।

অথচ এই মুহূর্তে ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তার। কেবিনের টিউব আলো নিভিয়ে চেয়ারের ওপর অভিভূতের মতো বসে পড়ল মালতী। গোটা সন্ধ্যেটা যেন ছবির মতো ভেসে আসছে চোখের সামনে। ভেতর থেকে কি যেন একটা গুরু গুরু করে উঠে আসছে ওপরে। ঠিক কান্না বা দুঃখ নয়। খানিকটা ভয় ভয় ভাব। শিরাশিরানি।

এখন রাত গভীর। ক্রমশ শব্দহীন হয়ে পড়ছে আশপাশ। একমাত্র লেবাররুম ছাড়া নার্সিং হোমের বাকি সব কটা ঘরের জোরালো আলো নিভে গেছে। চারপাশ শান্ত। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। মাথার চুলে একটু হাত বোলাতেই আজ পেশেন্টও ঘুমিয়ে পড়েছে

তাড়াতাড়ি। সারা দিনের মধ্যে মাত্র এই সময়টুকুই মালতীর একান্ত নিজস্ব। একান্ত বিশ্রামের সময় এটা। পেশেণ্টের অবস্থা ভাল থাকলে অন্য দিন এই সময়টুকুতেই দুটো চেয়ার জোড়া দিয়ে একটু কাত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে মালতী। আজও করল। কিন্তু কেন যেন কিছুতেই ঘুম এল না তার। বুকটা ভারি হয়ে গেল ক্রমশ। ফেলে আসা গোটা সন্ধ্যেটা যেন পাথর হয়ে চেপে বসল বুকের ওপর। বন্ধ চোখের সামনে বার বার ঘুরে ফিরে চলে এল মনোহরের ক্লিষ্ট মুখ, বিশীর্ণ হাত। যদি আর না বাঁচে মনোহর? যদি আর দেখা না হয় কাল সকালে?

এবার চেয়ারের ওপর ধড়মড় করে উঠে বসল সে। ঠিক এইজন্যেই চিনুকেও হারাতে হয়েছিল। তার বড় মেয়ে—তার আট বছরের চিনুকে। সেদিন সকাল থেকেই কান্নাকাটি করছিল চিনু। শক্ত মুঠোয় বার বার চেপে ধরছিল মালতীর শাড়ির আঁচল। কিছুতেই ছাড়বে না। 'না তুমি যাবে না। তুমি যাবে না।' মেয়েটা ছোট্ট থেকেই জেদী আর কাঁদুনে। একরকম জবরদস্তি মেয়েকে সরিয়ে দিয়েছিল মালতী। কেননা তাকে বেরোতেই হবে। নার্সিং হোমের কাজে সবে ঢুকেছে সে। সেদিন ছিল ডে-ডিউটি। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। বেরোবার সময় দরজার সামনে টলমল পায়ে কাঁপতে কাঁপতে মনোহর। দাঁড়াতে পারে না। তবু দাঁড়িয়েছে। গলা কেঁপে উঠেছে থরথর করে, 'আজ না গেলে হয় না?'

'না, হয় না।'

'কিন্তু মেয়েটা? আমার তো সাধ্যি নেই।'

'কেন নেই শুনি। দিনের পর দিন ঘরে বসে বসে আমার রক্তগুলো চুষে চুষে খেতে পারছ, আর ঐ একরত্তি মেয়েটাকে সামলাবার সাধ্যি নেই তোমার?' বিষের থলিটা নিমেষে উপুড় করে দিয়েছিল মালতী। সেই কোন কাকভোরে উঠে রান্না করেছে সে। সকলের খাবার গুছিয়ে রেখেছে। আর ঠিক বেরোবার মুখটাতেই—

'যা খুশি কর গে। সুটকেসে টাকা আছে। বাটিতে বার্লি জ্বাল দিয়ে রেখেছি। তেমন হলে মানদামাসিকে ডাকবে। আর কেলোকে দিয়ে ওষুধ আনাবে। মাথায় ঢুকলো, নাকি?' দুড়দাড় করে বেরিয়ে পড়েছিল মালতী।

মনোহর নির্বাক নির্বিষ মুহূর্তে।

ঠিক বিকেল চারটের সময় খবরটা নিয়ে নার্সিং হোমে এসেছিল ওরা—মানদামাসির ছেলে কেলো আর মানিক। সারা দিন ধরে মুহুর্মুহু রক্তপায়খানায় চিনু একদম অসাড়। প্রায় সংজ্ঞাহীন। একটুকরো খাবারও দাঁতে কাটেনি মেয়ে।

মালতী তখন আঠারো নম্বরে। পেশেণ্টের স্যালাইন চলছিল। পাশের ঘরে ছুটে এসে রেণুদিকে জড়িয়ে ধরেছিল—'আমাকে বাঁচাও রেণুদি। নইলে চিনুটা মরে যাবে।'

রেণুদি বাঁচিয়ে দিয়েছিল। 'যা না, তুই বাড়ি চলে যা এক্ষুনি। বাকিটুকু আমি দেখছি।'

ঝড়ের মতো বাড়ি চলে এসেছিল মালতী। তারপর বাসি ফুলের মতো নেতিয়ে পড়া চিনুর ক্ষীণ ছোট্ট শরীরটুকু বুকে তুলে সোজা আই.ডি হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব

শেষ। গাড়ির মধ্যেই বার দুয়েক হিক্কা উঠেছিল চিনুর। তারপরেই খিঁচুনি। যে শক্ত হাতের মুঠো শত চেষ্টাতেও খুলতে পারিনি মালতী তা মুহূর্তেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

বুকের গভীর অন্তস্থল থেকে উৎসারিত গোপন কান্না অনেক দিন পরে আবার ভিজিয়ে দিল মালতীকে। বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে ঘাড়ে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে এল সে। হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় পেশেন্টের? কি ভাববে কাঁদতে দেখলে? খুব নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়াল বেডের সামনে। তারপর নাইলনের স্বচ্ছ মশারির ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব নিবিড়ভাবে দেখল রোগীকে। না—একদম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। জেগে ওঠবার সম্ভাবনা নেই আপাতত। আজও কাম্পোজ দেওয়া হয়েছে। সারা ঘরে এবার খুব ধীরে ধীরে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করল সে। তারপর খুব সন্তর্পণে কেবিনের দরজা খুলে বাইরের করিডরে বেরিয়ে এল।

রেণুদি এখন একুশ নম্বরে। ঠিক সিঁড়ির বাঁ দিকের ঘর। একবার বললেই রাজী হয়ে যায় রেণুদি। অথচ সন্ধ্যা থেকে সুযোগই হয়নি দেখা করার। পুরো ব্যাপারটা রেণুদিকে জানানো দরকার। ব্যস্। তারপর শুধু সকাল হওয়া আর নিঃশব্দে বাড়ি চলে যাওয়া। বাকিটুকু সামলে নেবার দায়িত্ব রেণুদির। গত ন বছর ধরে যে মানুষটাকে সে একটা দিনের জন্য ভালবাসেনি, আদর করেনি, এক টুকরো সহানুভূতিও ছুঁড়ে দেয়নি যার দিকে, শুধু বিষাক্ত কথায় দুর্বিসহ করে তুলেছে যার প্রত্যেকটি দিনকে, যে তার কাছে নিতান্ত বাতিল, পঙ্গু, শুধু একটা ক্ষীণ অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, সেই মনোহরের জন্য একবিন্দু মমতা হঠাৎ টলমল করে উঠল মালতীর বুকের মধ্যে। পঙ্গুই হোক আর অক্ষমই হোক, তবু তো একটা মানুষ আছে। তাকে আর মিনুকে ঘিরে একটো ঘেরাটোপ। একটা আড়াল। তের বছরের মেয়েটার জন্য সামান্য হলেও একটু নিরাপত্তার বেড়া। এভাবে মরতে দেওয়া যায় না মনোহরকে।

এখন রাত আরও গভীর। লম্বা করিডর জুড়ে থমথমে নৈঃশব্দ। ল্যাম্পগুলোও মোমের আলোর মতো অনুজ্জ্বল। পেছনে জানলার বাইরে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের মাথায় নিবিড় অন্ধকার। শিন্‌শিন্ করে হাওয়া বইছে বাইরে। প্রথম শীতের নরম ঠাণ্ডা হাওয়া। দূরে কোথায় যেন এক ভিখারী শিশু কেঁদে উঠল। তারপরেই শববাহকদের বিকট হরিধ্বনি—বল হরি হরি বোল্। চার পাশের নৈঃশব্দকে যেন খান খান করে ভেঙে দিয়ে গেল শব্দটা। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল মালতী। পাদুটো কেমন ভারী হয়ে এল। ছমছম করে উঠল বুকের ভেতরটা।

ন বছর আগে এক শীতের রাতে এই করিডরেই লোডশেডিং-এর সুযোগে তাকে আচমকা জড়িয়ে ধরেছিল ক্যান্টিনের ব্রজবিলাস। তখনও নার্সিং হোমে জেনারেটর বসে নি। মালতীও তখন নবাগতা। নিতান্তই ভীরু। নতমুখী। ভাল করে পরিচয়ই হয়নি কারও সাথে। ঘটনার আকস্মিকতায় এত বেশি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যে লজ্জায় আতঙ্কে ব্যাপারটা কারও কাছে প্রকাশ পর্যন্ত করতে পারেনি। অনেকদিন বাদে গভীর রাতে এই লম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে সেই আচমকা চুম্বনের কথা ভাবতেই তার গোটা শরীর শির্‌শির্ করে উঠল আর এক বার।

কয়েক পা এগিয়েও আবার পেছিয়ে এল মালতী। নিচের বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ। কেউ লঘু পায়ে এগিয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। রাত দশটার পর পেশেণ্টকে ঘরে একা রেখে বাইরে বেরনো এমনিতেই নিষিদ্ধ। একবার রিপোর্ট হয়ে যাওয়া মানে—মেট্রনের কানে কথাটা চলে যাওয়া। কাজেই—থাক। কেবিনে ফিরে এসে আবার চোখ বোজার চেষ্টা করল মালতী। এখন শুধু সকাল হবার প্রতীক্ষা। যে করেই হোক রাজী করাতে হবে রেণুদিকে। ঠিক তখনই তার মনে পড়ল কথাটা—আজ সকালেই অপারেশন হয়েছে রেণুদির পেশেণ্টের। আসতে পারবে কি রেণুদি? আর রেণুদি আসতে না পারা মানেই আবার সেই ছোটাছুটি—একই ঘোড়দৌড়।

এখানে ঠিক সকাল সাড়ে ছটায় ডিউটি সিস্টার আসবে পেশেণ্টের বাসি মুখের টেম্পারেচার নিতে। এর পর শুরু হবে সকালের কাজ। পেশেণ্টের মুখ ধোয়ানো, মশারি গোটানো, বিছানা পরিষ্কার করা। গুরুদা চা বিস্কুট দিয়ে যায় সাতটার মধ্যেই। পুরো টিফিন আসে সাড়ে আটটায়। পেশেণ্টের হাতে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিয়েই গরম জলের জন্যে তিন তলায় দৌড় লাগানো। অন্তত একটা ফ্লাস্ক আর দুটো বোতল ভর্তি খাবার জল ছাড়াও আনতে হয় গা মোছাবার জল। ঐ সময় তিন তলায় রীতিমতো হাট বসে যায়। সব ঘরের সব আয়া হাজির। শুধু গরম জল নয়। ঐ সময়টুকুতে যত কথা চালাচালি, খোঁজখবর, চুট্‌কি, ফষ্টিনষ্টি, ডাক্তারবাবু আর সিস্টারদের নিন্দা প্রশংসা, সব। ওর মধ্যেই ঠাকুরের কাছ থেকে ম্যানেজ করে একটু চা নেয় কেউ নিজের গেলাসে। কেবিনে ফিরে এসে এর পর গরম জলে গামছা ভিজিয়ে পেশেণ্টের গা মুছিয়ে দেওয়া, পোশাক পালটানো, চুল আঁচড়ানো, মায় মুখসজ্জা করিয়ে দেওয়াও। এই করতে করতেই আটটা বাজে। তখন দিনের আয়া এলেই ছুটি।

চোখদুটো কেমন জড়িয়ে এল মালতীর। আলস্যে নেতিয়ে এল শরীরটা। সেই কোন কাকভোর থেকে দৌড়দৌড়ি, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা। এখন কেমন আচ্ছন্নতায় জড়িয়ে যাচ্ছে সব কিছু। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিশক্তি। ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে গেল সে।

'মাসি, ও মাসি, মাসি'—খুব ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ স্বর। অনেক—অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ডাকটা। ঘাড় ঘুরিয়ে সাড়া দিতে গিয়েও পারে না মালতী। আচ্ছন্নতায় রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। 'মাসি, ও মাসি'—আবারও ডাক। এবার ঘাড় ঘোরাবার চেষ্টা করতেই ঘুমের ফাঁস আলগা হয়ে গেল মুহূর্তে। অমনি ঝাপসা দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল আবছা জলের জগ, ফ্লাস্ক, বোতল, হরলিক্‌সের শিশি, গেলাস, চামচ। তারপর আরও একটু ঘুরতেই ড্রেসিং টেবিল, চিরুনি, তুলোর প্যাকেট, গজ, ওষুধপত্র—নীলচে মশারি, সাদা দেওয়াল। ধড়মড় করে উঠে বসল মালতী।

এবার ভাল করে চেয়ে দেখল। কাচের জানলার ওপাশে আলোর উকিঝুঁকি। সকাল হয়ে গেছে। পেশেণ্ট ডাকছে। দ্রুত বেডের সামনে এসে দু হাতে মশারি তুলে ধরে সে—'কি হয়েছে দিদিভাই? খুব কষ্ট হচ্ছে, না? ইস্‌। একদম হিম হয়ে গেছে শরীরটা।' রোগীর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় মালতী। 'পাখাটা বন্ধ করে দেব? একটু জল খাবেন?'

'বাথরুমে যাব।'

'দাঁড়ান, এক্ষুনি তুলে দিচ্ছি। লক্ষ্মী সোনা দিদি আমার। ভাগ্যিস্ ডেকেছিলেন।' বুকের মধ্যে জাপটে ধরে পরম মমতায় বসিয়ে দিল সে পেশেন্টকে। তারপর ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। আজ ছুটি হয়ে যাচ্ছে। একটু বেশি খাতির করতেই হবে। অন্তত মোটা বক্‌শিসের কথা ভেবেও। পেশেন্টই তো লক্ষ্মী তাদের। যতক্ষণ রোগী ততক্ষণ টাকার গন্ধ। পুরোপুরি সতেরো টাকা।

চটজলদি ঘরে এসে মাথার দিকের জানলাটা খুলে দিল মালতী। উলটো দিকের ফুটপাথের চায়ের দোকানটার উনুনে আঁচ উঠে গেছে। গুলগুল করে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। ঠিক সাড়ে ছটায় কেটলি বসে যাবে উনুনে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য রাস্তায় চোখ রাখল সে। অমনি মনোহরেরর জন্য, বাড়ির জন্য মনটা ভীষণ ছটফট করে উঠল আবার। মনোহর্ কেমন আছে কে জানে? মিনুকে বারবার বলে এসেছে সে। কিন্তু সারা রাত কোনো খবর আসেনি বাড়ি থেকে। না, সকালেও না। তবে কি ফাঁড়াটা কাটিয়ে উঠেছে মনোহর? নাকি ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে এখনও? মিনুটাই বা একা একা কত পারবে? এই মুহূর্তে বাড়ি যেতে পারলে রেহাই পেত সে। কিন্তু বড় নিরুপায় অবস্থা। এমনিতেই প্রচুর দেরি হয়ে গেছে।

রেণুদিকে তোষামোদ করার মতোও সময় নেই হাতে। দ্রুত কাজের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো ভাবনাগুলো ক্রমাগত ছুঁয়ে যেতে লাগল তার মনকে।

সাড়ে সাতটার মধ্যেই সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেল মালতী। পেশেন্টের বাড়ির লোকজনও এসে গেল এর মধ্যে। এখন শুধু নিচের অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে আসা। চমৎকার বক্‌শিস দিয়েছে পেশেন্ট—সুন্দর নীল ছাপা শাড়ি আর দশ টাকা। হাজার দুঃখের মধ্যেও একবিন্দু টলটলে সুখ। খুশি মনে সিঁড়ি বেয়ে তর্‌তর্ করে নেমে আসতেই কে যেন পেছন থেকে টেনে ধরল শাড়ির আঁচলটা। মালতী মুখ ফেরাল—রেণুদি।

'এই, মালতী না? কোথায় যাচ্ছিস্ তরতরিয়ে?'

'এই তো, অফিস ঘরে।'

'তোর পেশেন্টের আজ ছুটি হয়ে যাচ্ছে, না রে?'

'হ্যাঁ। আর তোমার?'

'সবে শুরু। তাও আবার যা অবস্থা চলছে—'

চলে যেতে যেতেও আবার ফিরে এল রেণুদি।

'ওহো ভাল কথা। এই, তোকে একবার নীরাদি দেখা করতে বলেছেন এক্ষুণি। খুব জরুরী দরকার আছে বুঝলি।'

মুহূর্তে মনের জানলার সামনে ধূসর বিবর্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েও যেন দরজা বন্ধ করে দিল কেউ। নীরাদি কি আর ডাকাডাকির সময় পেলেন না? ঠিক তাড়াহুড়ো করে বেরোবার সময়টাতেই! এইসব মুহূর্তগুলোতে মাথার মধ্যে সহসা আগুন জ্বলে যায় দাউ দাউ করে। কিন্তু এক ফুঁ দিয়ে আগুনটাকে নিভিয়ে দিল মালতী। নীরাদির তলব যখন—যত অশান্তই থাক না কেন মনটা…

বাকি কাজটুকু শেষ করে ঠিক আটটার মধ্যেই ডিউটি রুমে চলে এল মালতী।

'আমাকে ডেকেছেন, নীরাদি?'

নীরাদি নিচু হয়ে একটা চার্ট দেখছিলেন। মাথা না তুলেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

একটু বাদে মুখ তুলে বললেন—'ওদিকে সব কাজ হয়ে গেছে তো তোর? পেশেন্ট চলে গেছে?'

'এক্ষুনি চলে যাবে। বাড়ির লোকজন এসে গেছে। আমিও স্ট্রেচারের জন্য বলে এসেছি।'

'যাক। ভালই হয়েছে। কাল রাতে এগারো নম্বরে একটা পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। সিজার কেস। আজ দশটাতেই অপারেশন। কিন্তু এই মুহূর্তে তোকে ছাড়া আর কাউকেই খালি পাওয়া যাচ্ছে না। মায়া বা রুমাও আসেনি আজ। তাই বলছিলাম, ডিউটিটা—' প্রলোভনের সূক্ষ্ম জালটা চোখের সামনে ছড়িয়ে দিলেন নীরাদি। আচমকা থমকে গেল মালতী। মনের পর্দায় ঝট্ করে ভেসে উঠল মনোহরের ক্লিষ্ট মুখ, বিশীর্ণ হাত, একটানা চাপা গোঙানি, সারা রাত তার উৎকণ্ঠা, ছটফটানি—অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল ছিটকে তার গলা বেয়ে, 'কিন্তু নীরাদি—আমি তো—' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি আমি, তোর একটু কষ্ট হবে। ডবল ডিউটি করতে সকলেরই অসুবিধা হয়। তবে মাঝে মাঝে তো করতেই হবে। আজকের এই একবেলা না হয় একটু কষ্টই করলি—কি রে?'

কোন অতলে যেন তলিয়ে যেতে লাগল মালতী।

দু দিন পরে এসে সে যে আবার কাজ পাবেই এমন নিশ্চয়তা নেই। নার্সিং হোমেও এখন আয়াদের ঢল। সবাই কাজ খুঁজছে। আর মনোহর? সে একটু ভাল আছে নিশ্চয়ই। নইলে কেউ না কেউ আসতোই খবর নিতে। মেয়েটারই যা একটু কষ্ট হবে। কিন্তু স তো শুধু একবেলা—বারো ঘণ্টা। রাত আটটাতেই আবার ডিউটি শেষ। মিনু কি পারবে না আর একটা বেলা একটু কষ্ট করতে? পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।

একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে মনের দুর্বল স্থানগুলিতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে লাগল সে। আসলে তার সামনে এখন রুপোলী হাতছানি। আবারও সতেরোটা করে টাকা প্রতি দিন। তাছাড়া অপারেশন কেস যখন কম করেও পনেরো দিনের বরাত। মেঘ না চাইতেই জল এসে গেছে। এখন কি করবে সে? ডিউটিটা ধরে নেবে? নাকি···

শুকনো ঠোঁট বার বার জিভ দিয়ে চেটে নিল মালতী।

এর আগেও বার দুয়েক গুরুতর অসুস্থ হয়েছিল মনোহর। কিন্তু আবার কাটিয়েও উঠেছিল ঠিক। এবারও তাই হবে। হেঁপো রুগী সহজে মরে নাকি?

অথচ এই মুহূর্তে তার প্রয়োজন অনেক কিছুর। ঘড়ি মেরামতি, মনোহরের ওষুধপত্র, মিনুর ফ্রক। সারা মাস কাজই থাকে না। চাহিদা মেটাবে কোত্থেকে?

না হাতের লক্ষ্মী আর কিছুতেই পায়ে ঠেলবে না সে।

খুব ঘন করে এবার শ্বাস ফেলল সে—'হ্যাঁ, আমিই করবো নীরাদি। আপনি লিখে নিন।'

বলেই এক ছুটে নিচে নেমে এল মালতী। নাইট ডিউটি শেষ করে একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। এক্ষুনি সুধাকে ধরতে হবে। এক পাড়ারই বাসিন্দা সে। ওকেদিয়ে একটা খবর পাঠাতে হবে বাড়িতে।

বিন্দি

কাজল মিত্র

রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়ে শবরী। রাস্তার মধ্যিখানটা উঁচু। আসা-যাওয়া দুটো ট্রামলাইন। ট্রামলাইন দুটোর দুধারে পিচের রাস্তা। দু দুটো একমুখী রাস্তায় গাড়িগুলো ছোটে বাঁধভাঙা জলের মত। এ.পি.সি রোডটা পার হবার সময় কেমন অবশ হয়ে আসে স্নায়ু। শবরীর কথায় চারলেনের রাস্তা। একবার বাস-লরী লক্ষ্য রাখতে গিয়ে চলন্ত ট্রামের সামনে পড়েছিল। আর একবার, দাঁড়িয়ে থাকা ট্রামের পেছন দিক থেকে রাস্তায় পা দিয়েই দেখে মূর্তিমান যমদূতের মত এগিয়ে আসছে ভারী-ট্রাক একটা। ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বার করে বিচ্ছিরি গালাগালি দিয়েছিল শবরীকে। দূরের গাড়িগুলোও মনে হয় যেন ঘাড়ের কাছে এসে পড়বে। তাই ভীষণ ভয় শবরীর রাস্তা পার হবার সময়।

শবরী বাস থেকে নেমে যাবে ওপারে, সায়েন্স কলেজ। যত গাড়ি বোধহয় আজ এখান দিয়ে যাচ্ছে। মিছিল, দুর্ঘটনা, অবরোধ, যানজট এগুলো সহজ ভাবে নেওয়া অভ্যাস করে নিয়েছে মানুষ। হয়ত তেমন কিছু ঘটেছে কোথাও। খুব দ্রুত আসা একটা বাস একদম গায়ের কাছে এসে জোর ব্রেক কষল। অস্ফুট আর্তনাদ করে চমকে লেডিজ পার্কের ফুটপাতে উঠে পড়ল শবরী। আর তখনই চোখে পড়ল সায়েন্স কলেজের সামনে রাধাচূড়া গাছটার তলায় অনীক দাঁড়িয়ে। অনীকের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলছে। ওই লম্বা ছেলেটি শৌভিক না? হ্যাঁ, শৌভিকই। শবরীর মনে পড়ল রাধাচূড়া গাছটার তলায় তারা কতদিন দাঁড়িয়ে আড্ডা দিয়েছে—সে, অনীক, বসুধা আর শৌভিক। বসুধা কোথায় কে জানে। ঐ মেয়েটি কে! ওরা তিনজন এদিকেই তাকিয়ে। সামনে দিয়ে, অনবরত গাড়ি যাচ্ছে। শবরীর চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ফর্সা মুখ রোদের তাতে লাল হয়ে উঠেছে।

ভিড়ে ঠাসা বাস। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের প্রাথমিক বিভাগের একগাদা মেয়ে ও তাদের গার্জেনরা ভিড় বাসটায় ঠিক ঠেসেঠুসে ঢুকে গেল। ব্রাহ্মগার্লসের প্রাক্তন ছাত্রী শববী। ব্যাগ ও ছাতা সামলে কোনক্রমে নেমে এলেন টিচার নীলিমা দি। খুব ভালবাসতেন। চোখাচোখি হতে হাসলেন। প্রিয় ছাত্রী ছিল শবরী।—ভালো তো? প্রতিবর্তক্রিয়া, টুক করে একটা প্রণাম করে ফেলল শববী। নীলিমাদির কত আর বয়স হবে বড় জোর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। কি সুন্দর দেখতে! নীলিমাদির সঙ্গে যার বিয়ের ঠিক ছিল, বিলেতে পড়াশোনা করতে গিয়ে আর ফেরেনি। চাকরি নিয়ে সংসার পেতেছে বিয়ে থা করে, সেখানে। নীলিমাদি আর বিয়েই করল না। বিষণ্ণতা আলতো ঝাঁপ ফেলে থাকে চোখে মুখে। নীলিমাদির প্রেমিক উচ্চশিক্ষিত যুবক নীলিমাদিকে বঞ্চনা করতে পারল কী করে! এমন নরম ব্যক্তিত্বের রুচিশীলা মহিলাকে ঠকালো যে, সে কেমন পুরুষ! স্মৃতি ছুঁয়ে আসা পুরনো ভাবনাটা শবরীকে আনমনা করে। কাছাকাছি দুজন মানুষ পাশাপাশি দুটো সমান্তরাল রাস্তার মত অনেক সময় চলে যায় বহুদূর। মেশে না। কোথায় আবার

অন্য নামে বাঁক নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। লেডিস পার্কের ভেতর বকুল গাছ, বাগান বিলাস গাছ, আরো কত গাছ। ফুলপাতা নিয়ে বাড়ানো ডালপালা পথচলতি মানুষকে ছায়া দেয়, হাওয়া দেয়। পেট্রল ডিজেলের কটুগন্ধ ছাপিয়ে ওঠে বকুলফুলের গন্ধ। পাতার ছায়ার ঝিলিমিলি আলপনা শবরীর শরীরে খেলা করে।

এম. এস. সি. পাশ করে শবরী আর অনীক স্কলারশিপ নিয়ে রিসার্চ করছে সায়েন্স কলেজে। কি একটা সোর্সে শৌভিক স্টেটসে চলে গেল। বসুধা কোথায় চাকরি করছে। ইচ্ছে করে যোগাযোগ রাখল না। রিসার্চ শেষ করে চাকরি টাকরি নিয়ে অনীক আর শবরী ঘর বাঁধবে। রাস্তাটা পার হতে হতে শবরীর মনে হয় অনীকের পাশের মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছে! খুব চেনা লাগছে মেয়েটিকে।

শৌভিক হৈ হৈ করে ওঠে—শবরী দেখছি একেবারে বড়দিমণি মার্কা হয়ে গেছ। তিন বছরে শৌভিকের বয়স যেন অনেকটা কমে গেছে। হতে পারে,—মাটির গুণ। আমেরিকার প্রাচুর্য, বিলাসী জীবন, জল হাওয়া। টাইট জিনস, ঢোলা ব্যাগীস, চোখে দামী রেব্যান রোদচশমা।

—তুমি কী রোজ এতটা সময় নিয়ে রাস্তা পার হও! আর একটু দেরী হলে ধৈর্য হারিয়ে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনতাম। শৌভিক বলে। শবরী অল্প হেসে অনীকের মুখের দিকে তাকাল। অনীকের চোখ দুটো হরিণশিশুর মত মেয়েটির মুখের ফাঁদে আটকে আছে।

—তা সাবধানে পা ফেলা ভাল—জীবন তো একটাই। ফস করে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরায় শৌভিক, অনীককে অফার করে। শবরী মেয়েটিকে দেখছে। কচি দূর্বাঘাসের মত শ্যামলী ; ফিরোজা রং-এর সুন্দর শাড়ি। পানপাতা মুখে ঘন পাতায় ছাওয়া উজ্জ্বল চোখ। টুসটুসে রাঙা ঠোঁট দুটো অভিমানী, ফোলাফোলা। নতুন সিঁদুর। বেলাশেষের রাঙা রোদ থেকে থেকেই ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা মুখে—কর্ণমূলে। দুই ভুরুর মাঝখানে আশ্চর্য সুন্দর একটা বড় ভেলভেটের লাল টিপ—বিন্দি। সূর্যের আলো পড়ে ঝলসে ঝলসে উঠছে।

—আমার শ্রীমতী। শৌভিক আলাপ করিয়ে দিল। মিষ্টি চেহারার পুতুলের মত মেয়েটিকে হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়ে শবরীর মনে পড়ে গেল বসুধার বোন অপালা।

—শবরীদি আমাকে চিনতেই পারলে না ; অনীকদা ঠিক চিনতে পারল। অপালার গলায় অভিমান ; অনুযোগ।

—অনেকদিন বাদে দেখলাম কিনা—তা ছাড়া ঠিক⋯।

—ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না তাই তো? হো হো করে হাসে শৌভিক। —নতুন বউ সকলের কাছেই নতুন নতুন ঠেকে। রহস্য রোমাঞ্চ যা বল ওই নতুনের মধ্যে। চিরকাল যারা ধরে রাখতে পারে তাদের স্বামীরা ভাগ্যবান। শৌভিককে বড় বেশি বাচাল মনে হল শবরীর। অনেক প্রশ্ন অনেক কথা বুকের মধ্যে কুলকুল করে ওঠে। অনীকের চোখে একধরনের ভাললাগা। মুগ্ধতাই বলা যেতে পারে। অপালাকে ঘিরে বিদেশী পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ। আবেশে বুঁদ করে দেবে যেন।

—আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? শবরী রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে। শবরী আসলে কী কথা বলবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। তাছাড়া ইচ্ছেও করছিল না।

শৌভিক ব্যাগ থেকে কার্ড বার করল। —সামনের রবিবার এই ঠিকানায়,—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব খাওয়া-দাওয়া, গোদা ইংরেজিতে যাকে বলে পার্টি।

শবরী দেখল দক্ষিণ কলকাতার জুসলা হাউসের ঠিকানা।

—তোমাদের বিয়ে হল কবে? শবরী জেরার মত প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

অপালা ও শৌভিক চোখাচোখি করে। অনীক হাসে বোকার মত। শবরী ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়। অস্বস্তি নিয়ে শৌভিক বলে—বিয়ে মানে—বাব্বা যা হ্যাঁপা, আমার ছুটিও বেশি নেই তাই রেজেস্ট্রি করলাম। অপালা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। শবরী বুঝতে পারল অপালার বাড়ির অমতে এই বিয়ে।

—সামনের সপ্তাহের শেষে আমি ফিরে যাব। পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা মিটলে অপালা যাবে। যাক্‌গে যাওয়া চাই তোমাদের।

—আসবে কিন্তু শবরীদি, অনীকদা যাবেন। আদুরে গলায় আহ্লাদী পুতুলের মত ভঙ্গি অপালার।

—তুমি বলছ, যাবে না তাই হয়? নিশ্চয়ই যাবে। অতিরিক্ত উৎসাহ অনীকের।

—অপালা তোমার বাস এসে গেছে। শৌভিক ব্যস্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ।

—একটু মায়ের কাছে যাব, চলি কেমন? রূপ-রস-বর্ণ গন্ধে টলটলে মদিরার মত অপালা। শৌভিক কতযত্নে বাসে তুলে দিল। অনীক সতৃষ্ণ তাকিয়ে।

ফুল পাতা নিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটা ঝিরঝির করছে হাওয়ায়। বসুধা বলত গাছটা আমাদের গান শুনিয়ে হাওয়া করছে। অনীক শবরী বসুধা শৌভিক।

—চল্ এবার জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

—হুঁ চল্। অন্যমনস্কের মত অনীক বলল।

শবরী চুপচাপ ওদের অনুসরণ করে। ডিপার্টমেণ্টে একটু নিরিবিলিতে ওরা বসল।

—বসুধার খবর কী শৌভিক? পুরু চশমার ভেতর দিয়ে শবরীর চোখ দুটো অসম্ভব বড় দেখায়। চোখ সরিয়ে নিয়ে হাল্কা ভাবে একটা উত্তর ছুঁড়ে দিল শৌভিক

—মুর্শিদাবাদের ওদিকে শহরতলীর একটা কলেজে আছে। শৌভিকের মুখের ভাবে চাপা বিরক্তি। শবরী ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে থাকে সোজাসুজি।

—তোমাদের দুজনের সম্বন্ধে আমাদের অন্য রকম ধারণা ছিল, মানে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলছি।

—এরকম ধারণা করার হেতু? কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে শৌভিক ভুরু দুটো তুলে বলল।

শবরী গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেল। এ নিয়ে আলোচনা মানে বসুধার অপমান। অনীক পরিবেশটা হালকা করতে চাইল—তোরা মেলামেশা করতিস কিনা তাই।

—মেলামেশা করা মানে কী প্রেম করা? আমরা পড়াশোনার প্রয়োজনে মিশতাম। অনেকেই মেশে। এই যে তোরা মেলামেশা করিস তা বলে কী বিয়ে করা বাধ্যতামূলক?

ফর্সা শবরী লাল হয়ে ওঠে শৌভিকের কথায়। শৌভিক তা লক্ষ্য করে মনে মনে হাসে—বিয়েটা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক— সাবধানে পা ফেলতে হয়।

শৌভিক কী আত্মপক্ষ সমর্থন করছে! অনীক বলে

—তুই ওর সম্বন্ধে যথেষ্ট ইন্টারেস্টেড ছিলি। একসঙ্গে ঘুরেওছিস কত। তোর জন্যে সে কী না করেছে! রাত জেগে তোর জন্যে নোটস তৈরী করে দিয়েছে।

—আমি একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম কোনো মাস্টারনীকে নয়। দুজনেই যদি ফিজিক্স ফিজিক্স করি তো বাড়িতেও সেই ফিজিক্স ঢুকবে। রান্নাঘরে ফিজিক্স, শোবার ঘরে ফিজিক্স, বিছানায় ফিজিক্স, ওঃ হরিবল্। তখন পদার্থবিদ্যার জ্বালায় অপদার্থ জায়গায় আনন্দ পেতে ছুটতে হত।

—ঝেড়ে কাশতো বাবা ভাবী শ্যালিকা কি করে মিসেস হল তাই বল। অনীকের কৌতূহল শবরীর ভাল লাগল না। শবরী বুঝতে পারে সুপ্ত অপরাধ বোধে শৌভিক এমন প্রগল্‌ভের মতো আচরণ করছে। এত সাফাই গাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

—বসুধাকে বিয়ে করব আমি কোনোদিন বলেছি তোদের? বসুধার পাশে অপালাকে ভাব! হতে পারে ও সাধারণ আর্টস গ্রাজুয়েট। অনার্স পেল না বলে এম.এ. পড়া হল না। গান জানে, হাসতে জানে, সাজতে জানে। বই-এর পোকা নয়। পুরুষমানুষ কাজের শেষে একটা মেয়ের কাছে যা চায় তা ও দিতে পারবে। বসুধা আমার সমান বয়সী হলেও আমার কেমন দিদি দিদি লাগত। বুড়িবুড়ি ভাব। শবরীর উপস্থিতি শৌভিক ভুলে গেছে! স্মার্টনেস না বেহায়াপনা! অনীক সতৃষ্ণ চোখে শৌভিকের কথাগুলো গিলছে। তারা তিনজনে সমান বয়সী। ছাব্বিশ বছরের শবরীর মধ্যে মধ্যতিরিশের গাম্ভীর্য। চুপচাপ একপাশে বসে আছে। শবরী জানে সমান বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অনেকটা তফাৎ থেকে যায়। অনীক কত চনমনে ছটফটে। ছেলেমানুষের মত আচরণ। বসুধাকে ফাঁকি দেবার জন্যই শৌভিক তাই আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল! ভাবা যায় না।

অনীক হাসতে হাসতে বলে—মনে আছে পড়ার চাপে মাঝেমাঝে আমরা হালকা বই পড়ে মাথা সাফ করতাম। অপালা তোর সেই হালকা বই, কাজের শেষে মন সাফ করে দেবে।

অনীকের কথায় শবরীর মনে হালকা মেঘ নেমে আসে। চোখে তার ছায়া। অন্যমনস্ক শবরীকে লক্ষ্য করে শৌভিক। তারপর বলল—

—চিন্তা করে দেখ, কাজের শেষে বাড়ি ফিরে কী দেখব? না আমার অধ্যাপিকা স্ত্রী গোমড়া মুখে একরাশ খাতা অথবা বই-এর মধ্যে ডুবে আছে। বলবার সাহস হবে ওগো চট করে সেজে নাও এখনই বেড়াতে যাব। শৌভিক চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল শবরী নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে।

—যা করবি চিন্তা করে করবি, জলে নামবি, চুল ভেজাবি না। শৌভিকের চাপা গলা শবরীর কান এড়াল না। অপরাধ বোধ, কমপ্লেক্স শৌভিককে ইতর করে তুলেছে।

খাতাপত্র বই-এর মধ্যে ডুবে গিয়ে আজকের বিশ্রী ব্যাপারটা ভুলতে চাইল শবরী ; শৌভিক সরু একটা কাঁটা বিঁধিয়ে গেছে। মনটা খচখচ করছে। অনীক ও তার সম্পর্ক নিয়ে অনেকেরই কৌতূহল আছে শবরী তা জানে। রিসার্চ শেষ করে চাকরী নিয়ে তারা ঘর বাঁধবে—এরকম অব্যক্ত বাসনা আছে মনে। অনীক অবশ্য খোলাখুলি কিছু জানায়নি। ফুরসৎই বা কোথায়। থিসিস নিয়ে নাওয়া খাওয়ার সময় নেই তাদের। ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষার মরশুম চলছে। কমনরুমটা ফাঁকা। নির্জনতা ভার হয়ে চেপে বসেছে শবরীর মনে। সামনের দেওয়ালে টাঙান আয়নায় শবরীর প্রতিবিম্ব। অন্যমনস্ক চোখ দুটো আয়নায় ঘোরাফেরা করে।

সব শাদা এতটুকু রঙ নেই। সাদা আইসক্রিমের মত ফর্সা। দুধসাদা ভয়েলের শাড়ী। টানটান করে উল্টে আঁচড়ান চুল গার্টার দিয়ে বাঁধা। চওড়া ডায়ালের ঘড়ি। অন্য কোন আভরণ নেই। কালো ফ্রেমের চশমার ওধারে উজ্জ্বল চোখ। মেধাদীপ্ত চওড়া কপাল। মেয়ে বলে নয়—পড়াশোনায় ভাল ছিল বলে ছোট থেকে সবাই ভাল মেয়ে বলে জানে। রিসার্চ স্কলার। আয়নার মাঝখানে একটা ভেলভেটের লাল টিপ লাগান,—বিন্দি। আয়নার বিন্দির ওপর শবরী তার কপালের ছায়া ফেলে। মনে হচ্ছে বিন্দিটা তার কপালেই লাগান। লাল জ্বলজ্বলে টিপটা শবরীর ফর্সা কপালে যেন ফুটে উঠল। স্থির হয়ে বসে শবরী দেখছে নিজেকে। নার্সিসাসের মতো মুগ্ধ শবরী। শৌভিক কাকে শিক্ষা দিয়ে গেল!—অনীককে না শবরীকে! অনীক যদি তার মধ্যে এবার থেকে রং খোঁজে! দরজাটা ভেজিয়ে শবরী আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চুলের গার্টার খুলে দিল। কোমর পর্যন্ত ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। কোমরে গোঁজা টানটান আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে শবরী আয়নায় লাগান টিপটা তুলে নিয়ে নিজের কপালে লাগিয়ে নিল। নিজেকে আবার দেখে নিয়ে শবরী বাইরে বার হয়ে এল।

টানা করিডর দিয়ে অনীক এগিয়ে আসছে। শবরী—একটু পাশ করে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।—কোথায় ছিলে? শৌভিক যাবার সময় খুঁজছিল। কী ভাবল কে জানে, যা গোমড়া মুখে বসে ছিল।

শবরী সামনে ফিরে সোজাসুজি তাকাল অনীকের চোখের দিকে। দেখতে দেখতে অনীকের চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

—কী লাগিয়েছ কপালে এ্যালার্জিবার হয়ে স্কিন ডিজিজ হয়ে যাবে, বুঝবে তখন। খুলে ফেল।

—তুমি যাবে অনীক অপালার বৌভাতে? অনীক একটুক্ষণ চিন্তা করে বলে

—তোমার কী ইচ্ছে? বসুধা ছাড়া শৌভিককে ভাবা যায় না। কিছুতেই যাব না। অন্তত আমাদের দিক দিয়ে একটা প্রতিবাদ থাক।

শবরী কপাল থেকে লাল বিন্দির টিপটা খুলে ফেলে দিল।

শারদ গন্ধবণিক ১৩৯৯

প্রায়শ্চিত্ত

রেণুকা চক্রবর্তী

"ঠক্ ঠক্ ঠক্" আবার কড়া নড়ে উঠল সদর দরজায়। প্রণাম করতে গিয়ে আবারও থামলেন—উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন উমাকান্ত বাচস্পতি মশাই। সমস্তদিনের কর্মব্যস্ততার পর রাত্রির নির্জনতার অবকাশে দিনান্তের শেষে, প্রণতি রাখছিলেন গোবিন্দজীউর পাদমূলে। চিরকালের অভ্যাস। সমস্ত বাড়ি যখন নিঝুম হয়ে যায়—উমাকান্ত বাচস্পতি তখন বসেন প্রার্থনায়।

সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কোনদিন ব্যতিক্রম ঘটেনি। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা কত বিপর্যয় এসে ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে সংসারের ভিত্তি, সমাজের বনিয়াদ কিন্তু উমাকান্ত বাচস্পতির এই নিয়মে ছেদ পড়েনি কোনদিন।

শয়নে যাবার পূর্বাহ্নে পরিপূর্ণ হৃদয় এবং প্রশান্ত মন নিয়ে নিশ্চিন্তে কিছুক্ষণের জন্য না বসে পারেন না কোনদিন।

দিনে এ সুযোগ ঘটেনা। আর এমন নিশ্চিছ নির্জনতাও পান না কখনোও। অজস্র কোলাহল, সহস্র বাধাবিঘ্ন এসে অশান্ত করে তোলে হৃদয়কে। তাই রাত্রিটাই প্রশস্ত সময়। যতক্ষণ খুশি কাটাতে পারেন ওখানে—কোন উৎপাতের সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত বাড়ি তখন বিছানার আশ্রয়ে বিশ্রাম নেয়।

উমাকান্ত বাচস্পতি তখন ঢোকেন ঠাকুর ঘরে। পরিধানে পট্টবস্ত্র। মাথায় নামাবলী জড়ানো—নগ্ন দেহের ওপরে শুধুমাত্র শ্বেতশুভ্র যজ্ঞোপবীত। আজও শয়নের পূর্বে প্রার্থনা সেরে নিচ্ছিলেন তিনি। মনটা বড় চঞ্চল বোধ করছিলেন। বারবার বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল অন্তর বারবার ভেঙে যাচ্ছিল আবেশ। বারবার মন্ত্র ভুলে যাচ্ছিলেন।

বাহিরে প্রচণ্ড ঝড়—তারই স্পর্শ লেগেছে ওঁর মনের গভীরে। কিছুতেই প্রশান্তি আসছিল না আজ। অস্থির হয়ে উঠছিল সমস্ত হৃদয়টা। ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল অন্তরের মর্মমূল পর্যন্ত।

রুদ্ধকণ্ঠে বারবার লুটিয়ে পড়ছিলেন—আর্তি জানাচ্ছিলেন গোবিন্দজীউকে—"শান্ত কর প্রভু শান্ত কর পৃথিবীকে। বন্ধ কর এই হানাহানি। মুক্ত কর মানবাত্মাকে এই রক্ত-লোলুপতার গ্লানি থেকে, পবিত্র কর মানুষকে এই ভেদাভেদের কলুষতা মুছিয়ে।"

দু'চোখে অশ্রুর বন্যা—আবেশে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন বাচস্পতি মশাই। ঠিক তখনই—"ঠক্ ঠক্ ঠক্" আবার নড়ল কড়াটা স্পষ্ট শুনলেন এবার। এত রাত্রে কে এল? ওঁর পূজার সময় ব্যাঘাত ঘটাতে?

ধীরে ধীরে উঠলেন, দুচোখ মুছলেন নামাবলীর প্রান্ত দিয়ে। কাপড়টা কোমরে জড়ালেন সংযত করে। তারপর দরজা খুলে বেরোলেন মন্দিরেরই প্রদীপটা হাতে নিয়ে। খড়মটা পায়ে দিয়ে দাওয়ায় নেমে এলেন।

আবারও আওয়াজ উঠল—'ঠক্ ঠক্ ঠক্— "যেন দ্রুত অসহিষ্ণু ব্যগ্রতার আবেদন।

—"কে, কে ডাকে?"

দরজার কাছে এগিয়েও প্রশ্ন করলেন বাচস্পতি মশাই।—"দরজাটা খুলুন আগে ঠাকুর মশাই"…

একটা ভীত সন্ত্রস্ত চাপা নারীকণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। চমকে উঠলেন বাচস্পতি মশাই, ক্ষিপ্রহস্তে উন্মুক্ত করলেন কবাট। সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন বাইরে। কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ মোড়া একটি স্ত্রীমূর্তি প্রায় ওঁকে ঠেলেই ভেতরে ঢুকে পড়ল আর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—"বন্ধ করুন, বন্ধ করে দ্যান তাড়াতাড়ি। দেখতে পাবে কেউ"—

—"কে? কে তুমি?"

বিস্মিত প্রশ্ন বাচস্পতির। কেমন যেন হতচকিত।

—"বলছি, বলছি। আগে বন্ধ করুন দরজাটা শীগগীর"…

মন্ত্রমুগ্ধের মত দরজাটা বন্ধ করে দেন তিনি। এবার স্ত্রীমূর্তি আবরণ সরায় ওর মুখের—"আমি…আমি ঠাকুরমশাই"…

প্রদীপটা উঁচু করে ওর মুখের ওপর আলো ফেলেই চমকে উঠলেন বাচস্পতিমশাই।

—"তুমি? তুমি ও পাড়ার ইসমাইলের বৌ না"?

—"জী, ঠাকুরমশাই অনেক আশায় ছুটে এসেছি, তাড়িয়ে দেবেন না বলুন"

একখানা শীর্ণ কুণ্ঠিত করুণ মুখ। দু'চোখে ভয়ের স্তব্ধ ছায়া, দু'গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। কোলে ওর একটি ঘুমন্ত শিশু। এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন বাচস্পতিমশাই।

—"কি ব্যাপার বলত? এত রাতে? আমার এখানে"?

—"বাঁচান ঠাকুরমশাই। খোদা মেহেরবান আপনার ভাল করবেন। একটু আশ্রয়ের জন্য…"

…—" গোবিন্দ, গোবিন্দ! আমি সামান্য মানুষ মা! আমি আশ্রয় দেবার কে? তা ইসমাইল কোথায়"?

—"জানি না ঠাকুরমশাই। সেই সকালে বেরিয়েছে। কদিন থেকে সব বন্ধ। এখনো ফেরেনি। আল্লা জানে সে কোথায়? আর জানে আমার নসীব।" দু'চোখের পল্লব বেয়ে অঝোরে জল পড়তে থাকে ওর। আবারও আপন মনে আউড়ে যায়—"এতক্ষণে বাড়িটা শেষ হয়ে গেছে বোধ হয়! কত কষ্ট করে আধপেটা খেয়ে বর্ষার জন্য চালকটা জমিয়েছিলাম, খানিকটা আলু গুড় ধানের বীজও কিনে রেখেছিলাম। সব ছাই হয়ে গেল ঠাকুরমশাই, সব ছাই হয়ে গেল পুড়ে। হায় আল্লা…"

একটা বুকফাটা হাহাকারের মত আর্তনাদ উঠল ওর গলায়—"কেন এমন হল? আমরা তো কিছু করিনি ঠাকুরমশাই তবে আমরা কেন শাস্তি পেলাম? বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিলে—সারা পাড়াটা দেখতে দেখতে আগুনে লাল হয়ে উঠল? সবাই ছুটল… সবাই বললে 'পালা পালা'। কিন্তু কোথায় পালাব? কার কাছে যাব? কে কোনদিকে ছুটল জানের দায়ে জানি না। তাই শেষ পর্যন্ত আপনার বাড়িতেই ছুটে এলাম ছেলেটাকে নিয়ে। আজকের রাতটা অন্তত থাকতে দিন ঠাকুর মশাই।"

—প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করলে।

নিস্তব্ধ আঙিনার প্রান্তে উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে এসে থমকে দাঁড়ালেন বাচস্পতি মশাই। আজন্মের অন্ধ সংস্কার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমানের দর্প স্পর্ধিত মাথা তুলে রুখতে চাইল একবার। মুহূর্তের দুর্বলতা। পরক্ষণেই মন্দির সংলগ্ন খালি ঘরখানার শিকল খুলছেন। আলো দেখিয়ে ভেতরে চললেন বাচস্পতি মশাই। "এসো আমার সঙ্গে। এইখানে থাকো। কোন ভয় নেই তোমার। ভগবান মঙ্গলময়, সব ঠিক হয়ে যাবে আবার। কাল সকালেই আমি ইসমাইলের খোঁজ করব। কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি খেয়ে নাও। আর ঐ কম্বলটা নাও বিছিয়ে।"

প্রদীপটা এক পাশে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এলেন। নেমে এলেন আবার আঙিনায়, ব্যথাভরা দু'চোখে চাইলেন আকাশের দিকে।

অসীম উদার উন্মুক্ত আকাশ, অসংখ্য তারার ঝিলিমিলি নিয়ে অনন্ত প্রেমের নিমন্ত্রণ সেখানে। সে ডাক তো মাটির পৃথিবীতে পৌঁছয় না।

তাই কি এত হানাহানি এখানে? কবে শান্ত হবে এ অশান্ত পৃথিবী—একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন বাচস্পতি মশাই। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে চিরে ভেসে আসছিল রণোন্মত্ত সহস্র কণ্ঠের পৈশাচিক উল্লাস।

কালো আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ আবীর ছড়িয়ে পড়ছিল অগ্নির লেলিহান শিখার স্পর্শে। কালো আঁচলে মুখ লুকিয়ে রাতের পৃথিবী কাঁদছিল হতমানা লাঞ্ছিতা উনিশশো চৌষট্টির পৃথিবী।

মহানগরী কলকাতা।

কবে শুরু হয়েছে এ কান্না? আজও তা ক্ষান্ত হল না। আজও শুকোল না ওর রক্তক্ষরা ক্ষতগুলো। আজও শেষ হল না ওর চঞ্চল ঘূর্ণি!

চোখ নামালেন বাচস্পতি মশাই। আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরে এল মাটির বুকে। রুক্ষধূসর এই মাটির পৃথিবীতে। সূচীভেদ্য অন্ধকারের আস্তরণে আবৃত রাত্রির পৃথিবী।

সামনে দাঁড়িয়ে বাচস্পতি গৃহিণী। কখন ওঁর ঘুম ভেঙে গেছে, কখন পায়ে পায়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন খেয়াল করেননি তিনি। দুই চোখে ওঁর চোখে অসীম ঘৃণা ও বিরক্তির সংমিশ্রণ—কপালে কুঞ্চনের রেখা।

—"বলি তোমার হয়েছে কি বল তো?"

তীব্র শ্লেষের আভাষ বাচস্পতি গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে।

—"কেন বলত?" নির্বোধের মত প্রশ্ন বাচস্পতির—"তোমার কাছেই আমি যাচ্ছিলাম কিন্তু"...

—"খাবারের জন্য, এইতো? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকেও কি বাহাত্তুরে ধরল?"

—"কেন বলত? একথা বলছ কেন তুমি?"

শিশুর সারল্য ফুটে ওঠে উমাকান্ত বাচস্পতির গলায়।

—"তা নইলে তুমি কিনা আমার ঠাকুরঘরের পাশে ঐ মুসলমানী ম্লেচ্ছটাকে এনে ঢোকালে? একবার আমাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না তুমি?"

—"ঠাকুর ঘর আমারও গিন্নী"—

—"থাম থাম! তাই বলে আমি ঘরের গিন্নী, তুমি আমাকেও জিজ্ঞেস করবে না কিছু?"

অভিমান ঘনিয়ে ওঠে বাচস্পতি গৃহিণীর গলায়

—"আমিও গৃহস্বামী—কিছুটা স্বাধীনতা আমারও থাকা উচিত নয় কি?" সহজভাবেই পাল্টা প্রশ্ন করেন উমাকান্ত বাচস্পতি।

—"ছিঃ ছিঃ! আমি ভাবতে পারছিনা যে শেষ পর্যন্ত বিভীষণের মত ঐ শত্রুদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে তুমি!"

—"আঃ চুপ করো! শুনতে পাবে যে··· আস্তে, বড় কষ্টে পড়ে এসেছে গো। ওদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—ইসমাইলটা এখনো ফেরেনি। তাই বৌটা বাচ্চাটাকে নিয়ে কত আশায়"···

—"থাম, থাম আর বলতে হবে না। ওদের হয়ে আর ওকালতি নাইবা করলে—অন্তত তুমি! আমাদের বাড়ি যে পুড়েছিল ভুলে গেছ এরই মধ্যে? কারা আমার খোকনকে কেড়ে নিলে? কেন আমরা সব হারালাম? কাদের জন্য?" একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা দাউ দাউ করে ওঠে বাচস্পতি গৃহিণীর হৃদয়ে।

বহুদিনের পুরোনো ক্ষতটা নুতন করে টনটনিয়ে ওঠে যেন। একটা নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার জ্বালা উত্তপ্ত করে ওঁর অন্তরকে—

—"বল! জবাব দাও—কাদের জন্য?"

—"ইসমাইল বা তার বৌর জন্য নয় নিশ্চয়ই"··· নির্লিপ্ত সুরে জবাব দেন বাচস্পতি মশাই। স্ত্রীর শাণিত তীরগুলো এতটুকু চিড় ধরাতে পারে না ওঁর সুদৃঢ় ধৈর্যের বর্মে।

—"না হোক'···বিতৃষ্ণায় ঠোঁট উল্টান বাচস্পতি গৃহিণী।

—"ওরা সব সমান। ওকে তুমি সরিয়ে দাও। নইলে আমরা শুদ্ধ বিপদে পড়বো। চারিদিকে গণ্ডগোল"—

—"সুরমা"—জলদ গম্ভীর স্বর উমাকান্ত বাচস্পতির। এ স্বর চেনেন সুরমা দেবী। মর্মান্তিক আহত না হলে নাম ধরে ডাকেন না তাঁকে কখনও। এ স্বর চেনা ওঁর।

ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকান বাচস্পতি গৃহিণী। কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্টর মত মনে হয় স্বামীকে। দুটো চোখের তারা নিষ্পলক, দীর্ঘ ঋজু দেহ, বার্ধক্যের শিথিলতা নামেনি এখনো পর্যন্ত কোনখানে।

ওঁর এই মূর্তিটা কোনদিন বুঝে উঠতে পারেন না সুরমা দেবী।

—"কি দেখছ অমন করে?" ভীতকণ্ঠ সুরমা দেবীর।

—"দেখছি তোমাকে' ···

—"আমাকে কি নতুন দেখছ নাকি?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বাচস্পতি মশাই—"নতুন নয়। কোনদিন তুমি সুন্দরকে গ্রহণ করতে পারলে না সুরমা। কেবল যা কিছু কুৎসিত তাকেই মনের মধ্যে আঁকড়ে রাখলে"—

—'আমি অতশত বুঝি না বাপু! ওদের আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না"—

—"সে দায় এদের নয় সুরমা। একের পাপের শাস্তি অন্যের মাথায় চাপালে ভগবান ক্ষমা করবেন না যে"

—"কিছুতেই ভুলবো না এদেরই জন্য একদিন সব কিছু হারিয়েছি"...

ক্ষুব্ধ কণ্ঠ সুরমা দেবীর—দুঃসহ বেদনা নির্মম করে তোলে ওঁকে।

—"সেই সঙ্গে কেন একবারও বলছ না ওদেরই জন্যে আবার সব পেয়েছিও"—

—"হ্যাঁ পেয়েছি সব পেয়েছি? পেয়েছি আমার খোকনকে?"

আর্তনাদ করে দুইহাতে চোখ ঢাকেন বাচস্পতি গৃহিণী। নির্বাক স্থাণুর মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন উমাকান্ত বাচস্পতি।

ঝনঝন করে কোথায় টিন খসে পড়ল। চড়চড় করে ফাটল কটা বাঁশ। এক ঝলক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অন্ধকার আকাশের বুক রাঙিয়ে দিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল 'দুরুম দুরুম' আগ্নেয়াস্ত্রের উন্মাদ হুঙ্কার। একটা উৎকট বারুদের গন্ধে নৈশবাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। আর উঠছিল উৎপীড়কের নিষ্ঠুর উল্লাসের সঙ্গে উৎপীড়িতের আর্ত কলরোল।

মৃত্যুর তাণ্ডব খেলা দিকে দিকে যুগে যুগে। দু'টো কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরছেন বাচস্পতি মশাই। উঃ আবার আবার তারই পুনরাবৃত্তি। আবার সেই তাণ্ডব —সেই মারণযজ্ঞ এখনও নিভল না। আর কতকাল—কতকাল ঘুমোবে প্রভু? কবে বাজবে তোমার অভয় পাঞ্চজন্য? কবে শেষ হবে এই ধর্মের নামে অন্ধ উন্মত্ততা? গোবিন্দ...

অনেক অতীতে মনটা ডুবে গেল। ঠিক এমনি। সেদিনও এমনি রাত্রি গভীর। উনিশশো সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বর। ঘৃণায়—মানবাত্মার চরম অবমাননায় কালো আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদছিল শোকাতুরা হতমানা পৃথিবী। রক্তস্রোতে পিছল হয়ে উঠেছিল ওর শুষ্ক মাটি। উনিশ শো সাতচল্লিশের পৃথিবী।

নারীর লজ্জার কালিমা মেখে কালো হয়ে উঠেছিল সবুজ অরণ্যানী।

এমনি অমানিশাভরা দুর্যোগরাত্রি। চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলছিল দাউ দাউ করে সমস্ত পূর্ব বাংলার বুকে। পদ্মার দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছিল অসহায় মানুষের অন্তিম ক্রন্দনে। দেশ বিভাগের বিষময় ফলের শিকার হয়েছিল কয়েক কোটি নিরীহ মানুষ। কার বা কাদের পাপের ফলশ্রুতি?

মানবদেহকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিল দলে দলে আদিম বন্য জানোয়ারের দল। রক্তভৃষ্ণায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। আর শ্মশান করে তুলেছিল পৃথিবীর শান্ত বুক। পদ্মার সিক্ত বালুচর চিতাভস্মে ধূসর হয়ে উঠেছিল। গলিত শবের পূতিগন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল নির্মল বাতাস।

সেদিনও প্রার্থনায় বসেছিলেন উমাকান্ত বাচস্পতি। অশান্ত অন্তর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন গোবিন্দজীর পাষাণ মূর্তির সামনে।

সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠের প্রথম বলি খোকন। উমাকান্ত বাচস্পতির একমাত্র বংশধরের বুকের রক্তে উদ্বোধন হয়েছিল এই মারণযজ্ঞের। চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখেও চেতনা হারাননি বাচস্পতি মশাই।

গোবিন্দ জীউর নাটমন্দিরে মানুষ নামের কলঙ্ক এক উদ্ধত জানোয়ারের উদ্যত কৃপাণের নিচে অসহায় জীবন উৎসর্গ করেছিল আঠারো বছরের তরুণ যুবা রতিকান্ত। একান্ত অকস্মাৎ, একান্ত আচম্বিত। বৃদ্ধ বাচস্পতির একমাত্র অবলম্বন, সুরমা দেবীর নয়নের মণি খোকন।

সেই তাজা রক্তের ছাপ তখনও জমাট বেঁধে রয়েছে পাষাণ আঙিনার শুভ্র ফলকে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর লালসার বহ্নিতে এক বুক তাজারক্ত ঢেলেছে উমাকান্ত বাচস্পতির বংশধর। তবু সে আগুন নিভল কৈ?

দু'হাতে ভগ্নপঞ্জর আঁকড়ে ধরে পড়েছিলেন বাচস্পতি মশাই। মূক হয়ে গেছে সারাজীবন সাধনসিদ্ধ অন্তরটাও। এ কি দেখছেন তিনি?

সামনে উন্মুক্ত গীতার পৃষ্ঠা। একটা শ্লোকও ধরে রাখতে পারছিলেন না স্মৃতিতে।

অন্তঃপুরে হাহাকার করছিলেন বাচস্পতি গৃহিণী। পুত্রশোকাতুরা সুরমা দেবীর আকুল আকুতি গোবিন্দজীর মন্দির পর্যন্ত ভেসে আসছিল।

—"ওঃ গোবিন্দ"…একটা অস্ফুট আর্তি কণ্ঠ ঠেলে উঠেছিল উমাকান্ত বাচস্পতির।

ঠিক এমনি সময়। এমনিই গভীর রাত্রে টক্‌টক্ করে মৃদু টোকা পড়েছিল তাঁর বন্ধ দুয়ারে।

ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছিলেন বাচস্পতি গৃহিণী—"ওগো শুনছ, ওরা আবার এসেছে! কি হবে এখন? মেয়েটাকেও যদি কোথাও সরাতে পারতে? কি হবে এখন?" শিরে করাঘাত করে কেঁদে ফেলেছিলেন সুরমা দেবী। পুত্রশোক ভুলে গিয়ে, সব কিছুর ওপরে মেয়ের নিরাপত্তার কথাটাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠল তখন।

ষোড়শোত্তীর্ণা রূপবতী কন্যা রমা পাংশুমুখে পায়ে পায়ে ঠাকুর মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছিল অসহায় পিতার মুখের দিকে নির্ণিমেষে চেয়ে। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করলেন বাচস্পতি মশাই—

—"তাই যদি গোবিন্দজীর ইচ্ছা হয়…তবে তাই হোক'—

—"ওগো তুমি দরজা খুলতে যেও না তাই বলে"…

ছটফটিয়ে বাধা দিয়ে ওঠেন সুরমা দেবী, যেন দরজাই দুর্ভেদ্য।

—"আমাকে দেখতে দাও আগে"…

সকলের বাধা উপেক্ষা করে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি—"কে? কে ডাকে?" একটা চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠ—"আইজ্ঞা আমি, খোলেন তাড়াতাড়ি' …

ঝট করে দরজাটা খুলে ফেলেছিলেন বাচস্পতি, আর ওঁকে প্রায় ঠেলে দিয়েই ঢুকে পড়েছিল একটা ছায়ামূর্তি—"বন্ধ কইরা দ্যান ঠাকুর মশাই"…চাপা গলাতেই নির্দেশ দিয়েছিল ছায়ামূর্তিটা।

দুয়োর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। একটা কালো চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ওসমান এসে দাঁড়িয়েছে।

কালু সেখের বাইশ বছরের যোয়ান ছেলে ওসমান। বংশপরম্পরায় প্রজা ওরা বাচস্পতি পরিবারের।

হঠাৎ ওর এই আকস্মিক উপস্থিতিতে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন উমাকান্ত বাচস্পতি। চেনা মুখগুলো যেন চিনতে পারছেন না। কেমন যেন অচেনা! বুকটা কেমন করে উঠেছিল। পরক্ষণেই সামলে নিয়েছিলেন—

—"কিরে ওসমান? এত রাত্রে"...

—"পালান কর্তামশাই...অখনই পালান"—

একটা ভয়ার্ত সাবধান বাণী ভেসে উঠেছিল ওর বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

—"পালাব? এখনই? কি করে রে?"

বক্ষ ভেদ করে একরাশ হতাশার ঢেউ উদ্বেল হয়ে ওঠে ওঁর।

—"হ, অখনই! বাপজান শুন্যা আইছে আজ রাইতে আবার আপনেগো বাড়ি হানা দিব দুশমনরা। খুকীদিদিকে লইয়া কথা হইছে অগো। তাইতে বাপজান কইল—অক্ষণই কর্তারে খপর দিয়া আয় যাতে এই রাইতেই সইরা পড়তে পারেন"—

—"সরে পড়ব? হা ভগবান! কি করে সরব? কোন পথে? কোথায়? চারিদিকে আগুন"...

অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন বাচস্পতি মশাই।

—"কাইন্দেন না কর্তামশই"...সান্ত্বনা দেয় বিধর্মী যুবক ওসমান। ওর হৃদয়ের সৌন্দর্য...দিয়ে ঢেকে দিতে চায় জাতির কলঙ্ককে।

—"আপনে হক্কলরে লইয়া পিছনের রাস্তা দিয়া ধান ক্ষ্যাতের আইল ধইরা ঘাটে আহেন। আমি নাও লইয়া থাকুম। একবার নাওয়ে তুলতি পারলে আর কারও সাধ্য হইবো না, আপনেগো গায় হাত দেওনের। ইস্টিমার ধরাইয়া দিমুই গোয়ালন্দের যেম্‌তে পারি। আমি যাই—আপনে তাড়াতাড়ি আইয়া পড়েন য্যান্"...

অন্ধকারের মধ্যেই আবার মিলিয়ে যায় ওর ছায়া ছায়া মূর্তিটা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকেন উমাকান্ত বাচস্পতি,

—"ওরই বা কি মতলব কে জানে?"

সন্দিগ্ধভাবে বিড়বিড় করেন বাচস্পতি গৃহিণী। পৃথিবী ভরে উঠেছে বিষাক্ত বাষ্পে—তিলমাত্র বিশ্বাসের স্থান নেই তার কোন এক কোণেও। শুধু সন্দেহ, শুধু সংশয়, শুধু পরস্পরকে অবিশ্বাস।

পৃথিবী আবিল হয়ে উঠেছে জঞ্জালে। কুটিল নাগপাশে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে উঠছে সকলের।

—"ওর কথায় নির্ভর করে কি পথে বেড়ানো ঠিক হবে ?"

আবার অবিশ্বাসের স্বগতোক্তি সুরমা দেবীর ভয়ার্ত কণ্ঠে।

—"অ্যাঁ"...সম্বিত ফিরে পান বাচস্পতি মশাই "সমুদ্রে যার শয্যা তার আর শিশিরে ভয় কিসের গিন্নী...চল, পথেই নামি—"

মন্দিরে ঢুকলেন আবার, বেদী থেকে তুললেন গোবিন্দজীর পাষাণ বিগ্রহ। দু'হাতে জড়িয়ে তুলে নিলেন বুকে এই যদি ওঁর ইচ্ছা—তাই হোক তবে। প্রদীপটা নিভিয়ে দিলেন এক ফুৎকারে। গাঢ় কালোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সারা বাড়ি। বাচস্পতি পরিবারের শেষ দীপশিখা নিভে গেল চিরদিনের মত।

নিশুতি রাতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে স্ত্রীকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে একবস্ত্রে পথে বেরোলেন উমাকান্ত বাচস্পতি। নিস্তব্ধ ধানক্ষেতের আলপথ ধরে শঙ্কিত হৃদয়ে সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে ঘাটের দিকে এগোলেন ওঁরা জন্মভূমিকে অনেক পিছনে ফেলে। হাজার হাজার নামগোত্রহীন বাস্তুহারার ভিড়ে হারিয়ে গেল একটা বর্ধিষ্ণু পরিবার অনিশ্চিতের ভবিতব্য মাথায় নিয়ে।

ঘাটের কাছে পৌঁছতেই এগিয়ে এলো ওসমান, ফিসফিসিয়ে বললে "এই দিগে আহেন, ঐ দিকটায় কাদা বড়। ভয় নাই—আপনে আমার হাত ধরেন কর্তা···বড় আন্ধার"—

একহাতে গোবিন্দ জীউর বিগ্রহ, অন্যহাতে বলিষ্ঠ ওসমানের কাঁধে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠেছিলেন বাচস্পতি মশাই। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ওসমানের ছায়ামূর্তিটাকেই ধ্রুবতারার মত অভ্রান্ত বিশ্বাসে লক্ষ্য রেখে জলে ভেসেছিলেন—কূল ছেড়ে নেমেছিলেন অকূল দরিয়ায়।

ছলছল করে ক্রূর সরীসৃপের মত বেয়ে চলেছিল পদ্মার কালোজল। সেই কাল-নাগিনীর বুক চিরে চিরে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে বৈঠা বেয়ে চলেছিল ওসমান। দু'টো সবল বাহু দিয়ে, অভিশপ্ত রজনীর বুক কেটে পথ করে চলছিল নবদিগন্তের উদ্দেশ্যে।

জন্মভূমির সঙ্গে একমাত্র সন্তানের স্মৃতিকেও দূরে সরিয়ে দিয়ে দিশাহীন ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন বাচস্পতি মশাই। চিরজীবনের মত ফেলে এলেন পৈত্রিক ভদ্রাসন।

কূল ছেড়ে বেশীদূর যাবার আগেই শোনা গেল কতগুলো উন্মত্ত কণ্ঠের মিলিত কোলাহল। ঘাটের কাছে কারা যেন ঘোরাঘুরি করছে। হিংস্র শ্বাপদের মত শিকারীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ঘুরছে কতগুলো ছায়াছায়া প্রেতমূর্তি। হাতে ওদের জ্বলন্ত মশাল। পদ্মার জলে তার প্রতিবিম্বগুলো দুলে দুলে উঠছিল—সৃষ্টি করছিল এক রক্তিম আবর্ত। অন্ধকার নৌকাখানা কালো জলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল—তাই ধরা পড়ল না ওদের সন্ধানী দৃষ্টিতেও। শুধু একটানা বৈঠার শব্দটা আছড়ে পড়ছিল এসে ঘাটে। সেই শব্দতরঙ্গ অনুসরণ করেই হাঁক উঠল তীর থেকে "কে যায়? নাও লইয়া কেডা যায় এই রাইতে?"

রাত্রির নিস্তব্ধতার বুক খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল দানবীয় হুঙ্কারে। নিশ্বাস রুদ্ধ করে বসেছিলেন বাচস্পতি গৃহিণী। ভয়ে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়েছিল মেয়ে। স্থাণুর মত অনড় হয়ে পড়েছিলেন উমাকান্ত বাচস্পতি নিজে। দু'হাত দিয়ে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলেন গোবিন্দজীর নিষ্প্রাণ মূর্তিটাকে শুধু।

নির্মম নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছিলেন নিজেকে। যা হয় হোক! আর ভাববারও শক্তি নেই তাঁর।

—"ভয় নাই"··· ফিসফিসিয়ে বলে ওসমান। তারপর সাড়া দেয় গলা চড়িয়ে, সুরে সুর মিলিয়ে—"আমি ওসমান্যা"···

—"ওসমান্যা? এই রাইতে যাও কই?"

—"আর কও ক্যান"··· নিপুণ অভিনেতার মত অভিনয় করে ও—

—"বাপের সেই প্যাটের ব্যামোটা আবার চাড়া দিয়া উঠছে। যাই এখন হাকিমের কাছে। বুড়োটা যা ভোগাইতে আছে না, এই রাতে যাই—ফিরুম কখন খোদায় জানে।" কূলে কূলে প্রতিধ্বনি ফেরে—তরঙ্গে তরঙ্গে হিন্দোল জাগে। প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠ ওসমানের। অসীম সাহসিকতায় ভরা তরুণ বুকের পাঁজর। চিৎকার করে করে আউড়ায় অবিচলিত কণ্ঠে।

—"যাও, যাও। দেরী কইরো না য্যান, অনেক কাম আছে"—

ধীরে ধীরে মশালগুলো মিলিয়ে যায় তীর থেকে। তবু যেতে যেতে দু'পাশে তাকিয়ে দেখেছেন বাচস্পতি মশাই, আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—আর সে বিধ্বংসী হুতাশনের কুটিল লকলকে জিহ্বা অসীমের বুকও স্পর্শ করেছে। পৃথিবীর বিদ্বেষাগ্নির ধূম্রজাল ধূমায়িত করেছে দিগন্তের সীমানা।

আর শুনেছেন পদ্মার কূলে কূলে কোটি কোটি অসহায় মানুষের আর্ত ক্রন্দন। কোটি কোটি মানুষের তাজা রক্তে লাল হয়েছে পদ্মার কালো জল। বিদীর্ণ হয়ে উঠেছে পৃথিবীর বুক মানুষের পৈশাচিক পাশবিকতায়।

নিশ্বাস ফেললেন বাচস্পতি মশাই। সেই পৃথিবী! আজও শান্ত হল না। আজও থামল না ওর কান্না। আজও ঘুচল না মানুষে মানুষে হানাহানির পালা। নিভল না আজও বিভেদের বহ্নি। এখনও মরল না মানুষের আদিম বৃত্তিগুলো। নিপীড়িতা ধরিত্রী আজও মুক্তি পেল না দানবের কবল থেকে। বার বার তারই পুনরাবৃত্তি!

আবার নিঃশ্বাস পড়ল বাচস্পতি মশাই-এর। কিছুই ভোলেননি—ভোলা যায় না জীবনের সেই বীভৎস অভিজ্ঞতার দুঃস্বপ্ন। যেমন ভোলেননি কালু সেখের সেই চরম বেদনাময় পত্রখানার প্রতিটি ছত্র। আজও চোখের ওপর সেই হিজিবিজি অক্ষরগুলো যেন একের পর এক সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে।

দেশ ছেড়ে ইহুদী সেজেছিলেন বাচস্পতিপরিবার ভারতবর্ষের মাটিতে এসে। ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে দীর্ঘদিন পর একটা স্থায়ী ঠিকানা করতে পেরেছিলেন মহানগরীর এক শহরতলীর প্রান্তে। সেই সময়ই পেয়েছিলেন কালু সেখের সেই হৃদয়বিদারক পত্রখানা। এক নিশ্বাসে পড়েছিলেন সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাহিনী। কালু সেখ লিখেছিল—

—"কি কমু কর্তামশাই, অমুন যোয়ান পোলাডারে আমার রামদার একটা কোপে কাইটা ফ্যালল। সেই রাতেই আপনেগো বাড়ি গিয়া দুশমনেরা আপনেগো না পাইয়া বাড়িডারেই জ্বালাইয়া দিল। তারপর আমারে ধরল, জিগাইল—"কও তারা কই?"

কইলাম—"আমি জানিনা"...

তখন কইল—"তোমার পোলা কই? তোমার ব্যামো কইয়া কই গ্যালো রাইতে? তাগো পাচার করতে নি"...

কইলাম—"ওসমান গ্যাছে ফুফুর বাড়ি, সাদি আছে... পেতয় গেল না অরা—"সে যে কইল হাকিমের বাড়ি?"

ওসমান আইলেই তারে লইয়া পড়ল—"নিচ্চয় কইরা কও... কই গেছিলা! ঠাকুরগো বাড়ির খপর জানো তুমি—সত্য কও কই তারা?'

যোয়ান বয়স, খুন গরম। পোলাডা আমার কইয়া বসল—

—"হ জানি। কমু না"...

—"কইবা না? বাঁচবারে চাওত এখনও কও বলতে আছি"

—"কমু না"...

—"আল্লার কসম, কও অখনও কই গেল দুশমনেরা?"

—"আল্লা কসম, কমু না। অনেক নিমক খাইছি তাগো"...

—"বেইমান, কাফেরের বান্দা বাঁচনের সাধ আছে?"

—"মুখ সামলায়ে কবি... মুনিম আছে আমাগো"—

—"হ, হ, মুনিমইতো... হিন্দুর কুত্তা, কাফেরগো লগে খাতির"—

—"এই ভাল না কিন্তু—কেডা কয় এই সব, কোন কোরানে ল্যাখছে? আমি কোরান পড়ছি, মন্দ কথা কইবা না... যাও গিয়া"—

—"না, মিষ্ট কইরা কমু তরে... এখনও কও বলতে আছি"...

—"কমু না, কমু না, কমু না"...

"এই না যেই কওয়া, হাতে ছিল রামদাও—এককোপে দুইখানা আমার চক্ষের সামনেই—কি কমু কর্তা মশাই—পেরানডা এখনও যে ক্যান ন্যায়না খোদায়... কি হইল দ্যাশের অবস্থা? কেডা চাইছিল দ্যাশ ভাগ—মিলল্যা মিশ্যা ছিলামতো আমরা! একি হইল?"

কালু সেখের সেই কাতরোক্তি নিজের বুকে অনুভব করেছিলেন বাচস্পতি মশাই। পুত্রশোকের তীব্র যন্ত্রণা তাঁর বুকেও আগুন জ্বেলেছিল। তাই মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন কালু সেখের অন্তরের সীমাহীন বেদনা।

ওসমান বলেছে—কোরান পড়েছিল। তিনিও তো গীতা, বেদ, উপনিষদ পড়েছেন। কোন ধর্ম তো বলেনি মানুষে মানুষে বিভেদের কথা!

আজও সে দাহন শেষ হল না। আজও থামল না পৃথিবীর কান্না! আজও নিভল না পদ্মার দু'কূলের খাণ্ডবদাহন। সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াল দিকে দিকে। এপার ওপার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল সেই আগুনের বেড়াজালে। আজ এত বছর পরও তারই পুনরাবৃত্তি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে এত মানুষের আত্মবলিদান কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? জয়ী হবে অসুরেরা? হেরে যাবে মানবাত্মার শুভবুদ্ধি? না—কখনও না—দুর্বৃত্তেরা কখনও বিজয়ী হতে পারে না ভগবান...

—"কি গো, কি ভাবছ অত? ওকে সরাবে না তুমি?"

সম্বিত ফিরে পেলেন বাচস্পতি মশাই। ফিরে এলেন বাস্তব পৃথিবীর রূঢ় পটভূমিতে। তন্দ্রা ভেঙে গেল স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে।

—"অ্যাঁ কি বলছ তুমি সুরমা?"

—"বলছি ওকে তুমি সরাবে কিনা?"

—"না। বিপন্নকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম সুরমা, আমি মানুষ"...

—"যদি আমাদের বিপদ হয়...তবু?"

—"হোক! আমাদের আর কি হবার বাকি আছে বল? যা ছিল তাতো আমরা হারিয়েইছি...আর কি আছে?"

—"তবু তুমি এত উদার হতে চাইছ কেন? আমি বুঝছি না বাপু"...

—"উদার নয় সুরমা, এ যে আমার ধর্ম। ওসমানের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে তুমি? খোকনের মতই নিষ্পাপ এক তরুণ। আমাদের বাঁচাবার ঝুঁকি নিতে গিয়ে মরেছিল ও। ভাবো তো সেদিনের সেই অবস্থা। চারিদিকে আগুন—কি অসীম সাহসে ওইটুকু ছেলে আমাদের কূলে পৌঁছে দিয়েছিল নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও। একটা বিধর্মী যুবক যা পেরেছিল, আমি ন্যায়নিষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তা পারব না? আজ যদি ওকে আমি আশ্রয় না দিই, ওসমানের আত্মা কি কোনদিন আমাদের ক্ষমা করবে? বার বার বলে গেছেন মহাপুরুষেরা—সবার ওপরে মানবিকতা। সেখানে ধর্মাধর্ম বর্ণবৈষম্য আর কিছু নেই। শুধু আছে আর্ত মানবাত্মার আকুল আবেদন।

তুমি যাও সুরমা, ওরা হয়ত সারাদিন অভুক্ত আছে। ওদের আগে খাওয়াও কিছু। খোকনের রক্তের ঋণ শোধ করেছিল নিরপরাধ ওসমান। ওর মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তও আমাকে করতে দাও সুরমা। তাতে যদি আমাদের এ গৃহ আবার পোড়ে—পুড়ুক'...

ধীরে ধীরে আবার ঠাকুরঘরে ঢুকলেন বাচস্পতি মশাই। আবার লুটিয়ে পড়লেন রুদ্ধ আবেগে। অসহায় আকুতিতে ভেঙে পড়লেন টুকরো টুকরো হয়ে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, নিস্তব্ধ হয়ে আসছে চারিদিক। স্তিমিত হয়ে আসছে নারকীয় মত্ততা। সারারাত্রির ক্লেদগুলো মুছে দিতে আলোর তলোয়ার হাতে সপ্তঘোড়ার রথে চড়ে আসছেন বুঝি দিনমণি। রাত্রিগুলো নির্মম, নিষ্ঠুর, অতন্দ্র। দিন আসুক এবার সমস্ত পঙ্ক মুছিয়ে দিতে। পৃথিবী ক্লান্ত হয়ে এসেছে। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত গোবিন্দজীর পা দুটো বুকে আঁকড়ে পড়ে থাকেন উমাকান্ত বাচস্পতি। এতক্ষণে যেন প্রশান্তি নামছে, আবেশ আসছে সারা দেহে ওঁর। দু'চোখ জড়িয়ে নামছে অলস নিদ্রা। দূরে কোন গির্জায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল। শান্ত হয়ে আসছে যেন ঝড়।

পুবাকাশ রক্তিম হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে—একটা নূতন দিনের সূচনা নিয়ে আসছে একটা নূতন প্রভাত— কে জানে মানুষের জন্য কোন আশ্বাস নিয়ে আসছে এ নূতন দিন।

জানালা দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ দুটো রাখলেন অসীম নীলিমায়। তারপর চোখ নেমে এল রুক্ষ ধূসর মাটির বুকে—দূরের পথটা যেখানে মিলেছে দিগন্তের গায়। অনেক

কোলাহল—অনেক লোকের মিছিল। ওরা কারা? পায়ে পায়ে ছন্দ মিলিয়ে বহু লোকের পদযাত্রা। প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে গগনবিদারী শান্তির বাণী।

আকাশের বুকে ধুলো উড়িয়ে ঋজু ঋজু মানুষগুলো কোথায় চলেছে? প্রতিবাদে ফেটে পড়া দৃঢ় মুষ্টি—দুই হাত উর্ধ্বে তুলে কোথায় চলেছে ওরা? ওরা কে? ঐ মিছিলের সামনের সারিতে? কচি কচি দুটো মুখে পৃথিবীর লাবণ্য। ওতো ওসমান! ঐ তো রতিকান্ত! কোথা থেকে এলো ওরা? যুগান্তের অন্ধকারের পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে আলোর সন্ধানে। হাতে হাত জড়ানো—উদাত্তকণ্ঠে ঐক্যের বাণী! কত মানুষ? একশ? দুইশ? পাঁচশ? হাজার? নাকি লক্ষ, অযুত?

অশ্রুঝাপসা দু'চোখে আর গুনতে পারছেন না বাচস্পতি মশাই। নাকি আরো বেশী সংখ্যাতীত! হিসেব করতে পারছেন না আর। মুখে তাদের নূতন মন্ত্র! "মৃত্যু নয়—জীবন চাই! ধ্বংস নয়—সৃষ্টি চাই! বিভেদ নয়—ঐক্য চাই! মানুষ মানুষ ভাই ভাই!" সবাই একসঙ্গে হাঁটছে—ঐ তো ইসমাইলও আছে! একটা কেমন সবুজ অনুভূতি, আত্মার দর্পণে ভেসে উঠছে একটা রোমাঞ্চকর নূতন ছবি।

বাচস্পতি মশাই-এর দু'চোখে নিদ্রার প্রশান্তি—ভগ্নপাঁজরে যেন নূতন আশ্বাসের আহ্বান। বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দিনের শেষে শ্রাবণের শীতল ধারা। ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া প্লাবনের পলিমাটিতে আবার অঙ্কুরোদ্‌গমের নিবিড় আয়োজন। নূতন সৃষ্টির অদম্য উন্মাদনা!